ঝুম্পা লাহিড়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

বেদনার ভাষ্যকার' এবং 'অপরিচিত ভূমি', এই দুই পর্বের মোট সতেরোটি গল্প নিয়ে এ বই।

'বেদনার ভাষ্যকার'-এর গল্পগুলি প্রবাসী ভারতীয় জীবনের অসামান্য চিত্রণ। বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত, আজন্ম লালিত দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন ভিন্নতর জীবনযাপনের নিত্য সংঘর্ষই এই পর্বের গল্পগুলির প্রতিপাদ্য। গল্পের প্রেক্ষাপট ছড়িয়ে আছে বস্টনে, বঙ্গভূমিতে। সূক্ষ্ম রসবোধে এবং সুচারু বিবরণীতে প্রবাস জীবনের অনুভবগুলি হৃদয়স্পর্শী।

'অপরিচিত ভূমি'-র গল্পগুলিতে ধরা আছে, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেকার নাটকীয়তা, করুণ পরিণতি এবং সব আলোড়ন শেষে আবার নিত্য গতানুগতিকতার মধ্যে ফিরে যাবার কথা। পারিবারিক জীবনের নানাবিধ গভীর সূক্ষ্ম মুহূর্তের ঘন বুনোট গল্পগুলিকে নতুনতর মাত্রায় উন্নীত করেছে।

৪০০.০০

ISBN 978-81-7756-851-6

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুম্পা লাহিড়ীর জন্ম ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে, লন্ডনে। বড় হয়েছেন রোড আইল্যান্ডে। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ঝুম্পা স্বামী এবং দুই সন্তানসহ এখন ব্রুকলিন (নিউইয়র্ক) বাসী। ঝুম্পা লাহিড়ীর প্রথম বই 'ইন্টারপ্রেটার অব ম্যালডিজ' নামে গল্প সংকলন। ২০০০ সালে গদ্যের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিল এই বই। এ ছাড়াও এ বই পেয়েছে পেন/হেমিংওয়ে পুরস্কার, নিউ ইয়র্কার ডেবিউ অব দ্য ইয়ার, আমেরিকান অকাদেমি অফ লেটার্স অ্যাডিসন মেটকাফ পুরস্কার। ছোট গল্পের জন্য তিনি পেয়েছেন ও' হেনরি পুরস্কার। ২০০২ সালে পেয়েছেন গুগেনহাইম ফেলোশিপ। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি নেমসেক' (২০০৩)। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'আনঅ্যাকাসটমড আর্থ' (২০০৮)।

.....

প্রচ্ছদ অমিতাভ চন্দ্র।

লেখিকার আলোকচিত্র © ইলিনা সিবার্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প সপ্তদশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প সপ্তদশ

ঝুম্পা লাহিড়ী

অনুবাদ

কমলিকা মিত্র

পায়েল সেনগুপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Interpreter of Maladies by Jhumpa Lahiri
এবং Unaccustomed Earth by Jhumpa Lahiri
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

Interpreter of Maladies
প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯
Houghton Mifflin Company, USA
© Jhumpa Lahiri 1999

Unaccustomed Earth
প্রথম প্রকাশ ২০০৮
Alfred A. Knopf, New York
© Jhumpa Lahiri 2008

এই গ্রন্থের গল্পগুলিতে ব্যবহৃত সমস্ত নাম, চরিত্র, স্থান এবং ঘটনা কাল্পনিক। কোথাও কোনওভাবে যদি কোনও বাস্তবের সঙ্গে মিল ঘটে থাকে তা নিতান্তই কাকতালীয়।

প্রথম আনন্দ সংস্করণ নভেম্বর ২০০৯
চতুর্থ মুদ্রণ মার্চ ২০১৩

গল্প সপ্তদশ © ঝুম্পা লাহিড়ী
বাংলা অনুবাদ © আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-851-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

GALPA SAPTADASH
[Stories]
by
Jhumpa Lahiri

Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Kolkata 700 009
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

বেদনার ভাষ্যকার

একটি সাময়িক ব্যাপার ৫
মি. পিরজ়াদা ২৮
বেদনার ভাষ্যকার ৪৯
পাহারাদার ৭৬
সেক্সি ৮৮
মিসেস সেন ১১৭
মহিমান্বিত ১৪৩
বিবি হালদারের চিকিৎসা ১৬৬
তৃতীয় এবং অন্তিম মহাদেশ ১৮২

অপরিচিত ভূমি

প্রথম পর্ব

অপরিচিত ভূমি ২১৭
পাতাল-আকাশ ২৭৭
ঘরের খোঁজে ৩০৩
শুধুই ভাল ৩৫৩
অনধিকার চর্চা ৪০৪

দ্বিতীয় পর্ব

হেমা ও কৌশিক

জীবনে একবার ৪৫৭
বছর শেষ ৪৮৯
তীরের অভিমুখে ৫৩৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদনার ভাষ্যকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা-বাবা ও আমার বোনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধন্যবাদজ্ঞাপন
দ্য ফাইন আর্টস ওয়ার্ক সেন্টার, প্রভিন্স টাউন
জ্যানেট সিলভার ও সিন্ডি ক্লেইন রোশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি সাময়িক ব্যাপার

নোটিশে লেখা ছিল যে, এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। পাঁচ দিনের জন্য, সন্ধে আটটা থেকে শুরু করে এক ঘণ্টা তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। শেষ বৈশাখঝড়ে একটা তার পড়ে গিয়েছে, আর এই কোমল সন্ধেগুলোর সুযোগ নিয়ে মেরামতকারীরা কাজটা সেরে নিতে চায়। শুধু এই শান্ত, গাছের সারি দিয়ে ঘেরা রাস্তার বাড়িগুলোর ওপরই মেরামতের প্রভাব পড়বে। বাড়িগুলো একসারি ইটের দেওয়ালের দোকান আর একটা ট্রলি স্টপের থেকে হাঁটা দূরত্বে। এরই একটায় শোভা আর সুকুমার তিন বছর হল বসবাস করছে।

"আমাদের সাবধান করে ভালই করেছে," সুকুমারের সুবিধের চেয়ে নিজের সুবিধের জন্যই নোটিশটা জোরে জোরে পড়ে শোভা মেনে নিল। তার চামড়ার অফিসের ব্যাগটা ফাইল ঠেসে মোটা হয়ে ছিল। শোভা ব্যাগের স্ট্র্যাপটা কাঁধ থেকে খসে পড়তে দিল। তারপর সেটা হলওয়েতে ফেলে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তার পরনে ছিল সাদা স্লিকার্স আর ধূসর রঙের সোয়েটপ্যান্টের ওপর একটা নেভি ব্লু রঙের পপলিনের বর্ষাতি। তেত্রিশ বছর বয়সে তাকে ঠিক সেই মহিলাদের মতোই লাগছিল, যাদের সঙ্গে তার কোনওদিনও কোনও মিল পাওয়া যাবে না বলে সে দাবি করেছিল।

শোভা সবে জিম থেকে ফিরেছে। তার ক্র্যানবেরি লিপস্টিক শুধু তার ঠোঁটের বাইরের দিকেই লেগে আছে, আর আইলাইনারটা ধেবড়ে চোখের নীচে কালচে ছোপ পড়েছে। সুকুমার ভাবল, মাঝে মাঝে কোনও পার্টি বা বার এ রাত কাটানোর পর শোভাকে এরকম লাগত। যখন শোভার মুখ ধোয়ারও উৎসাহ থাকত না, অথচ সে সুকুমারের কাছাকাছি আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। শোভা এক বান্ডিল চিঠি না দেখেই টেবিলের ওপর ফেলে দিল। তখনও সে তার অন্য হাতে ধরা নোটিশটার দিকেই তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। "কিন্তু এই ধরনের কাজ তো সকালের দিকে করা উচিত।"

"তার মানে যখন আমি এখানে থাকি," সুকুমার বলল। কড়ায় চাপানো পাঁঠার মাংসর ওপর সে একটা কাচের ঢাকা চাপাল যাতে অতি সামান্য ধোঁয়াই বেরোতে পারে। জানুয়ারি থেকে সুকুমার বাড়িতেই কাজ করছে। ভারতের কৃষি-বিদ্রোহের ওপর তার ডেসার্টেশনের শেষ অধ্যায়গুলো লিখছিল সে। "মেরামত কখন শুরু হবে?"

"লিখেছে ১৯ মার্চ। আজ কি ১৯?" শোভা কর্কবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। ফ্রিজের পাশের দেওয়ালে ঝোলানো, ফ্রেমে আঁটা কর্কবোর্ডটায় একটা উইলিয়াম মরিস ওয়ালপেপারের ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছু নেই। শোভা যেন প্রথমবার দেখছে, এমনভাবে সেটার দিকে তাকাল। তারিখগুলো দেখার আগে ওপরের ওয়ালপেপারটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। ক্যালেন্ডারটা এক বন্ধু ক্রিসমাসের উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিল, যদিও শোভা আর সুকুমার সে বছর ক্রিসমাস পালন করেনি।

"তা হলে আজকেই," শোভা ঘোষণা করল। "পরের শুক্রবার তোমার ডেন্টিস্টের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কিন্তু।"

সুকুমার দাঁতের ওপর জিভ বোলাল। সে সকালে দাঁত মাজতে ভুলে গিয়েছে। এরকম যে এই প্রথমবার হয়েছে, তা নয়। সে সারাদিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি, গতকালও বেরোয়নি। শোভা যত বাইরে বাইরে থাকে, যত বেশি সময় কাজে কাটায়, বেশি বেশি প্রোজেক্ট হাতে নেয়, তত সুকুমার বাড়িতে থাকতে চায়। চিঠি আনতে বা ট্রলি স্টপের কাছের দোকানগুলো থেকে ফল বা মদ কিনতেও বেরোতে চায় না।

ছ'মাস আগে, সেপ্টেম্বরে সুকুমার বাল্টিমোরে একটা আকাদেমিক কনফারেন্সে গিয়েছিল। তখন নির্ধারিত তারিখের তিন সপ্তাহ আগেই শোভার প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সুকুমার কনফারেন্সে যেতে চায়নি। শোভাই জোর করেছিল, বলেছিল পরিচিতি বাড়ানো ভাল, কারণ পরের বছর সুকুমার চাকরির জগতে পা রাখবে। শোভা তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল তার কাছে সুকুমারের হোটেলের নম্বর আছে, প্লেনের নম্বর আর সময় আছে, আর সে তার বন্ধু জিলিয়ানের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছে যে, কোনও এমার্জেন্সি হলে জিলিয়ান তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। সেদিন সকালে এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য যখন ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল, তখন শোভা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ট্রাউজারের পরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল। আর-একটা হাত সে এমনভাবে তার স্ফীত পেটের ওপর রেখেছিল, যেন সেটা তার শরীরের একটা সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক অংশ।

সুকুমার যখনই সেই মুহূর্তটার কথা ভাবে, সেই শেষবার যখন সে শোভাকে গর্ভবতী অবস্থায় দেখেছিল, তখন তার সবচেয়ে বেশি ট্যাক্সিটার কথাই মনে পড়ে। গাড়িটা ছিল একটা লাল রঙের স্টেশন ওয়াগন, ওপরে নীল হরফে লেখা। তাদের গাড়ির তুলনায় সেটা ছিল গুহার মতো বিশাল। যদিও সুকুমার ছ'ফিট লম্বা এবং তার হাতগুলো এতই বড় যে, সেগুলো কখনওই জিনসের পকেটে স্বচ্ছন্দভাবে ঢুকিয়ে রাখা যায় না, তবুও গাড়িটার পিছনের সিটে বসে তার নিজেকে কেমন যেন বামনের মতো লাগছিল। ফিফটি স্ট্রিট দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় সুকুমার কল্পনা করার চেষ্টা করেছিল যে, তার আর শোভারও একদিন একটা স্টেশন ওয়াগন কেনার প্রয়োজন হতে পারে। ছেলেমেয়েদের মিউজিক ক্লাস আর ডেন্টিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে আসা-যাওয়া করার জন্য। সে কল্পনা করেছিল তার হাতে থাকবে স্টিয়ারিং হুইল, আর শোভা সামনের সিট থেকে পিছনে ঘুরে বাচ্চাদের কলের রসের বাক্স দেবে। একসময়, বাবা হওয়ার এই ছবিগুলো সুকুমারকে দুশ্চিন্তায় ফেলত, তার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলত। কারণ, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে সে তখনও ছাত্র ছিল। কিন্তু সেই হেমন্তের সকালে, যখন গাছগুলো লাল-সোনা পাতায় ভরে গেছে, তখন প্রথমবার সুকুমার ছবিটা কল্পনা করে আনন্দ পেল।

একইরকম দেখতে কনভেনশন রুমগুলোর মধ্যে একজন কর্মচারী কোনওভাবে তাকে খুঁজে বের করে, তার হাতে একটা শক্ত কাগজের টুকরো ধরিয়ে দিয়েছিল। তাতে শুধুই একটা টেলিফোন নম্বর লেখা। কিন্তু সুকুমার জানত যে, নম্বরটা হাসপাতালের। সে যখন বস্টনে ফিরল, ততক্ষণে সব শেষ। বাচ্চাটা মৃত জন্মেছিল। শোভা একটা খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরটা এতই ছোট ছিল যে, শোভার পাশে দাঁড়ানো যাচ্ছিল না। হাসপাতালের এই দিকটায় তারা আগে কখনও আসেনি। শোভার প্ল্যাসেন্টা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, তাই সিজারিয়ান করতে হয়েছিল। কিন্তু তা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি করা হয়নি। ডাক্তার তাকে বোঝালেন যে, মাঝে মাঝে এমন হয়। শুধুই পেশার সূত্রে যাদের সঙ্গে পরিচয়, তাদের দিকে তাকিয়ে যতটা সদয়ভাবে হাসা যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেভাবেই হেসেছিলেন তিনি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শোভা নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে। ভবিষ্যতে তাদের বাচ্চা হবে না, এমন আশঙ্কা করারও কোনও কারণ নেই।

আজকাল সুকুমার যখন ঘুম থেকে ওঠে, ততক্ষণে শোভা কাজে বেরিয়ে যায়। সুকুমার চোখ খুলে, শোভার বালিশে কয়েকটা লম্বা কালো চুল পড়ে থাকতে দেখে। সে ভাবে, শোভা ততক্ষণে পরিপাটি হয়ে, শহরের বাণিজ্যকেন্দ্রে নিজের অফিসে বসে তার তিন নম্বর কফি খাচ্ছে। শোভা পাঠ্যবইয়ে ছাপার ভুল খুঁজে বের করে আর বিশেষ রঙের পেনসিল দিয়ে সেগুলোয় দাগ দিয়ে রাখে। কোন ভুলে কোন রং ব্যবহার হবে, এই নিয়মটা সে একবার সুকুমারকে বুঝিয়েছিল। সে কথা দিয়েছিল যে, সুকুমারের গবেষণামূলক প্রবন্ধে সে একইভাবে ভুল খুঁজে দেবে। নিজের কাজের ভাসা-ভাসা বিষয়ের তুলনায়, শোভার কাজের সুনির্দিষ্টতা দেখে সুকুমারের প্রায় হিংসে হত। সুকুমার একজন সাধারণ ছাত্র, যে বিনা কৌতূহলে কোনও বিষয়ের খুঁটিনাটি মনে রাখতে পারত। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সে নিষ্ঠাবান না হলেও অধ্যাবসায়ী ছিল। অধ্যায়গুলোর সারমর্ম করে, তর্কের যুক্তিগুলো হলদে লাইনটানা কাগজে টুকে রাখত। কিন্তু এখন সে যতক্ষণ না একঘেয়ে বোধ করে, ততক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে। দেওয়াল-আলমারিতে, তার জামাকাপড়ের যে দিকটা শোভা সবসময়ই খানিকটা খুলে রাখে, সেদিকে তাকিয়ে থাকে। এই সেমেস্টারে, আর ক্লাসে পড়াতে যাওয়ার জন্য তাকে টুইডের কোট আর কর্ডুরয় প্যান্টের মধ্যে থেকে কোনওটা বেছে নিতে হবে না। সে ওই কোটপ্যান্টগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। বাচ্চাটা মারা যাওয়ার পর, সুকুমারের পড়ানোর ডিউটি থেকে পিছিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার উপদেষ্টা এমনভাবেই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যে, স্প্রিং সেমেস্টারটা সুকুমার নিজের মতো করে পড়াশোনা করতে পারছিল। সে তখন গ্র্যাজুয়েট স্কুলের ষষ্ঠ বর্ষে। "এটা আর গরমকালটা তোমাকে ভাল উৎসাহ দেবে," তার উপদেষ্টা বলেছিলেন। "পরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে তুমি সবকিছু গুছিয়ে নিতে পারবে।"

কিন্তু সে কিছুতেই কোনও উৎসাহ পাচ্ছিল না। বরং সে ভাবছিল যে, সে আর শোভা কেমন পরস্পরকে এড়িয়ে চলায় কুশলী হয়ে উঠেছে। তাদের এই তিন বেডরুমের বাড়িতে তারা যথাসম্ভব আলাদা আলাদা তলায় সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাতায়। সে এখন আর শনি-রবিবারের ছুটির অপেক্ষায় থাকে না। তখন শোভা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোফায় তার রং পেনসিল আর ফাইল নিয়ে বসে থাকবে এবং সুকুমারের মনে হবে, নিজের বাড়িতে রেকর্ড বাজানোটাও যেন তার অভদ্রতা। কতদিন হয়ে গিয়েছে, শোভা তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসেনি। এখনও যদি কোনও বিরল মুহূর্তে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে তারা পরস্পরের শরীরের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন শোভা তার নামটা ফিসফিস করে না।

প্রথমে সুকুমারের বিশ্বাস ছিল যে, এই অবস্থাটা কেটে যাবে। সে আর শোভা কোনওভাবে এই সবকিছু কাটিয়ে উঠতে পারবে। শোভার বয়স তো মাত্র তেত্রিশ। সে বলিষ্ঠ, সে আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এগুলো কোনও সান্ত্বনা নয়। অনেকদিনই, সুকুমার যখন নিজেকে খাট থেকে টেনে তুলে, শোভা তার জন্য যেটুকু কফি রেখে যেত তা নিতে নীচে কফিপটের দিকে এগোত এবং যতক্ষণে কাউন্টারটপের ওপর শোভার রেখে যাওয়া খালি মগে সেটুকু কফি ঢেলে নিত, ততক্ষণে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে যেত।

সুকুমার পেঁয়াজের খোসাগুলো জড়ো করে, মাংসের চর্বির যে অংশগুলো কেটে ডাস্টবিনে ফেলেছিল, তার ওপর ফেলে দিল। সিঙ্কে জল চালিয়ে, ছুরি আর কাটিং বোর্ডটা ভিজতে দিয়ে, রসুনের গন্ধ তাড়ানোর জন্য আধখানা পাতিলেবু নিজের আঙুলে ঘষতে লাগল। এই কায়দাটা সে শোভার কাছে শিখেছে। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। জানলা দিয়ে নরম কালো পিচের মতো আকাশটা দেখা যাচ্ছে। ফুটপাথের ধারে ধারে বরফের অসমান স্তূপ জমে উঠেছে। যদিও তখনও লোকজন টুপি বা দস্তানা না পরেই বাইরে বেরোতে পারছিল। শেষ ঝড়ে প্রায় তিন ফিট উঁচু বরফ জমেছিল তাই, এক সপ্তাহ ধরে পথচারীদের একটা সরু লাইনের ওপর দিয়েই হাঁটতে হচ্ছিল। গত এক সপ্তাহ ধরে সেটাই ছিল সুকুমারের বাড়ি থেকে না বেরোনোর অজুহাত। কিন্তু এখন রাস্তাটা আস্তে আস্তে চওড়া হচ্ছে। আর জলটা একটানা ফুটপাথের ধারগুলিতে গড়িয়ে পড়ছিল।

"আটটার মধ্যে মাংসটা তৈরি হবে না," সুকুমার বলল। "আমাদের বোধহয় অন্ধকারেই খেতে হবে।"

AMARBOI.COM

"মোমবাতি জ্বালিয়ে নিতে পারি," শোভা বলল। সে তার ঘাড়ের কাছে পরিপাটি খোঁপা করে রাখা চুল থেকে ক্লিপটা খুলল। স্নিকারের ফিতে না খুলেই সেগুলো পা থেকে খুলে ফেলল। "আলো চলে যাওয়ার আগে আমি চান করে নিই," সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে সে বলল। "নীচে আসছি।"

সুকুমার শোভার ব্যাগ আর স্নিকার্সগুলো ফ্রিজের পাশে সরিয়ে রাখল। শোভা আগে এরকম ছিল না। নিজের কোট হ্যাঙারে ঝুলিয়ে, স্নিকার্স দেওয়াল-আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখত। কোনও বিল আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা মিটিয়ে দিত। কিন্তু এখন সে বাড়িতে এমনভাবে থাকে, যেন হোটেলে আছে। লিভিংরুমে আরামকেদারার হলুদ ছিটকাপড়টা যে নীল আর মেরুন তুর্কি কার্পেটটার সঙ্গে বেমানান, তা নিয়ে শোভার আর কোনও মাথাব্যথা নেই। বাড়ির পিছনদিকে, ঢাকা দেওয়া বারান্দাটায়, লম্বা বেতের চেয়ারের ওপর, একটা কড়কড়ে সেই সাদা ব্যাগ ভরতি লেস এখনও পড়ে আছে, যা দিয়ে শোভা একবার পরদা করবে ভেবেছিল।

শোভা চান করছে দেখে সুকুমার নীচের বাথরুমে গেল। সিঙ্কের তলায় বাক্সে একটা নতুন টুথব্রাশ রাখা। সস্তা, শক্ত দাঁড়াতে সুকুমারের মাড়ি কেটে গেল। সে মুখ থেকে বেসিনে কিছুটা রক্ত ফেলল। বাড়তি ব্রাশটা আরও অনেকগুলোর সঙ্গে একটা মেটালের ঝুড়িতে রাখা ছিল। যদি কোনও অতিথি শেষ মুহূর্তে তাদের বাড়িতে রাতে থাকতে চায়, ভেবে শোভা একবার একটা সেল-এ এগুলো কিনেছিল।

এটা শোভার স্বভাবসিদ্ধ আচরণ। সে সেইরকম মানুষ, যারা যে-কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে চায়, তা ভাল হোক বা খারাপ। যদি তার কোনও স্কার্ট বা পার্স পছন্দ হত, তা হলে সে একেবারে দুটো কিনে রাখত। চাকরি থেকে সে যা বোনাস পেত, সবই নিজের নামে একটা আলাদা অ্যাকাউন্টে জমা করত। তাতে সুকুমারের কোনও আপত্তি ছিল না। তার মা, বাবার মৃত্যুতে একেবারে অথই জলে পড়েছিলেন। সে যে বাড়িতে বড় হয়েছিল, সেই বাড়িটা ছেড়ে, সুকুমারের কাঁধে সবকিছু গুছিয়ে তোলার দায়িত্ব দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে যান। শোভা যে অন্যরকম স্বভাবের, সেটা সুকুমারের ভাল লাগত। শোভার দূরদর্শিতা দেখে সে অবাক হয়ে যেত। শোভা যখন বাজার করত, তখন, তারা ইতালিয়ান খাবার রাঁধছে না ভারতীয়, তার ওপর নির্ভর করে তাদের ভাঁড়ার সবসময় অলিভ আর কর্ন

AMARBOI.COM

তেলের বাড়তি বোতলে ভরতি হয়ে থাকত। অসংখ্য বাক্সে সবরকম আকার ও রঙের পাস্তা, বাসমতী চালের বস্তা, হে-মার্কেটের মুসলিম মাংসওয়ালাদের কাছে কেনা মাংসের গোটা গোটা অংশ কেটে, হিমশীতল করে রাখা থাকত অগুন্তি প্যাকেটে। প্রতি শনিবার অন্তর তারা দোকানের গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াত, শেষে সুকুমারের পুরোটাই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। শোভা আরও খাবার কিনত, সকালের রোদে দোকানের ছেলেগুলোর সঙ্গে তর্ক জুড়ত। ছেলেগুলোর তখনও দাড়ি কামানোর বয়স হয়নি, কিন্তু কারও কারও ইতিমধ্যেই দাঁত পড়ে গিয়েছে। তারা আর্টিচোক, প্লাম, জিঞ্জারব্রুট, ইয়্যাম ব্রাউনপেপারের ব্যাগে ঢেলে, সেগুলো মুড়ে ওজনদাঁড়িতে ফেলত আর একের পর এক শোভাকে ছুড়ে দিত। ভিড় ঠেলে ক্যানভাসের ব্যাগ হাতে শোভার পিছনে ঘুরতে ঘুরতে সুকুমার তখন শোভার দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে থাকত। শোভা ঠেলাঠেলিতে অস্বস্তি বা বিরক্ত বোধ করত না। এমনকী সে যখন গর্ভবতী ছিল তখনও। শোভা দীর্ঘাঙ্গী, কাল চওড়া। তার ডাক্তার বলেছিল যে, তার নিতম্ব সন্তানধারণের জন্য আদর্শ। বাড়ি ফেরার পথে চার্লসের পাশ দিয়ে গাড়িটা ঘোরাক নেওয়ার সময় প্রত্যেকবার তারা ভেবে অবাক হয়ে যেত যে, তারা কী পরিমাণে খাবার কিনে ফেলেছে।

খাবারগুলো কখনও নষ্ট হত না। যখন বন্ধুরা আসত, তখন শোভা এমন সব খাবার তৈরি করত, যা দেখে মনে হত সেগুলো তৈরি করতে বোধহয় অর্ধেক দিন কেটে গিয়েছে। সেসব খাবার শোভা বোতলে ঠান্ডা করে জমিয়ে রাখত। টিনে ঠাসা সস্তা খাবার নয়। শোভার নিজের হাতে রোজমেরি মিশ্রণে ভিনিগারে রাখা গোলমরিচ, রবিবারে, কড়ায় ফুটন্ত টম্যাটো এবং আলুবোখরা নাড়তে নাড়তে সে যে চাটনি রেঁধেছিল, সেইসব। তার লেবেলসাঁটা পাথরের বোয়ামগুলো সিলকরা পিরামিডের মতো রান্নাঘরের তাকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত। তারা ভাবত যে, ওই রসদ তাদের নাতি-নাতনিরাও চেখে দেখতে পারবে। কিন্তু সেসব খাবার এতদিনে খাওয়া হয়ে গিয়েছে। সুকুমার তাদের ভাঁড়ার থেকে তাদের দু'জনের জন্য খাবার তৈরি করেছে। কাপে করে চাল মেপে বার করেছে, মাংসের তালের ঠান্ডা কাটিয়েছে দিনের পর দিন। সে প্রতি দুপুরে শোভার রান্নার বইগুলো পড়ে। শোভার পেনসিলে লেখা নির্দেশ মেনে চলে— একের বদলে দু' চা-চামচ ধনেগুঁড়ো, হলুদের বদলে লাল মুসুর ডাল ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকটা রেসিপির ওপর

AMARBOI.COM

একটা করে তারিখ লেখা। সেইদিন তারা প্রথম একসঙ্গে সেই রান্নাটা খেয়েছিল। ২ এপ্রিল, মৌরি দিয়ে রাঁধা ফুলকপি। ১৪ জানুয়ারি, আমন্ড আর সুলতানা দিয়ে মুরগি। সুকুমারের এসব খাওয়ার কথা একদম মনে পড়ে না। কিন্তু তাও তারিখগুলো লেখা আছে, শোভার পরিষ্কার প্রুফরিডারের হাতের লেখায়। সুকুমারের এখন রান্না করতে বেশ ভাল লাগে। এই একটা জিনিস করতেই তার নিজেকে সৃজনশীল বলে মনে হয়। সে জানে যে, সে যদি রান্না না করে, তা হলে শোভা রাতে এক বাটি সিরিয়াল খেয়েই চালিয়ে দেবে।

আজ রাতে, কোনও আলো ছাড়াই, তাদের একসঙ্গে খেতে হবে। কয়েক মাস ধরে তারা স্টোভ থেকে নিজেদের খাবার নিজেরাই নিয়ে নেয়। সুকুমার নিজের প্লেটটা স্টাডিতে নিয়ে গিয়ে ডেস্কের ওপর রেখে সেটা ঠান্ডা হতে দেয়। তারপর খাবারটা একটানা মুখে ঠুসতে থাকে। শোভা লিভিংরুমে গিয়ে গেম শো দেখে বা হাতের কাছে তার রং পেনসিলের ভাণ্ডার নিয়ে ফাইলের প্রুফরিডিং করে।

সন্ধেবেলায় কোনও একসময় শোভা সুকুমারের কাছে আসে। সে আসছে শুনতে পেলেই সুকুমার নিজের উপন্যাসটা সরিয়ে রেখে টাইপ করতে শুরু করে। শোভা এসে তার কাঁধে হাত দুটো রেখে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কম্পিউটারের নীল উজ্জ্বলতার দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'-এক মিনিট পর, "বেশি খাটাখাটনি কোরো না," বলে সে শুতে চলে যায়। দিনে এই একবারই শোভা সুকুমারের কাছে আসে। কিন্তু এইসময়টাকেই সুকুমার ভয় পায়। সে জানে যে, শোভা নিজেকে বাধ্য করে এটুকু করতে। সে এসে ঘরের দেওয়ালগুলোর দিকে তাকায়। গত গ্রীষ্মে, দেওয়ালগুলো তারা একসঙ্গে সাজিয়েছিল। বর্ডারে হাঁস আর খরগোশের দল ট্রাম্পেট আর ড্রাম বাজাতে বাজাতে মার্চ করছে। আগস্ট শেষ হওয়ার আগেই জানলার নীচে একটা চেরি রঙের বেবিকট এসে গিয়েছিল, পুদিনা-সবুজ নব লাগানো একটা সাদা চেঞ্জিং টেবিল আর একটা চেক করা ছিটের কুশনওয়ালা দোলনা চেয়ার। শোভাকে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনার আগে সুকুমার এ সবকিছু খুলে রেখে দিয়েছিল। হাঁস আর খরগোশদের একটা স্প্যাটুলা দিয়ে চেঁছে ফেলেছিল। এই ঘরটা তাকে ততটা কষ্ট দেয় না, যতটা শোভাকে দেয়। জানুয়ারিতে, সুকুমার যখন লাইব্রেরিতে কাজ বন্ধ করে দিল, তখন সে ইচ্ছে করেই নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবেছিল এই ঘরে বসিয়েছিল। এইজন্য যে ঘরটা তাকে শান্তি দেয় এবং কিন্তু, শোভা এই ঘরটা এড়িয়ে চলে বলে।

সুকুমার রান্নাঘরে ফিরে একের পর এক ড্রয়ার খুলতে শুরু করল। কাঁচি, টিন ফোটানোর যন্ত্র, হুইস্ক, কলকাতার বাজার থেকে শোভার কেনা রান্নাবান্নার আর নোড়া যা দিয়ে সে রসুনের কোয়া আর এলাচের খোসা থেঁতলাত, যখন সে রান্না করত— এইসবের মধ্যে সুকুমার একটা মোমবাতি খোঁজার করার চেষ্টা করছিল। সে একটা টর্চ পেল, কিন্তু কোনও ব্যাটারি পেল না। আর জন্মদিনে যে মোমবাতি জ্বালানো হয়, তার একটা অর্ধেক খালি বাক্স পেল। গত মে মাসে শোভা তার জন্য একটা সারপ্রাইজ় বার্থডে পার্টির আয়োজন করেছিল। একশো কুড়ি জন লোক ঠাসাঠাসি করে ঢুকেছিল এই বাড়িতে— সেইসব বন্ধু এবং বন্ধুর বন্ধু, যাদের তারা এখন সাবধানে এড়িয়ে চলে। বাথটাবে বরফের বিছানায় ভিনহো ভেয়ারডে-র বোতল রাখা ছিল। শোভার তখন পঞ্চম মাস। সে মার্টিনির গেলাস থেকে জিন্জার এল খাচ্ছিল। সে কাস্টার্ড আর স্পান সুগার দিয়ে একটা ভ্যানিলা ক্রিম কেক বানিয়েছিল। সারা রাত, পার্টির অতিথিদের মধ্যে ঘোরাফেরা করার সময় সে সুকুমারের লম্বা আঙুলগুলো নিজের আঙুলের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছিল।

সেপ্টেম্বরের পর তাদের একমাত্র অতিথি ছিলেন শোভার মা। শোভা হাসপাতাল থেকে ফেরার পর তিনি অ্যারিজোনা থেকে এসে দু'মাস কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রোজ রাতে রান্না করতেন, নিজে গাড়ি চালিয়ে সুপারমার্কেটে যেতেন, তাদের জামাকাপড় কাচতেন, সেগুলো গুছিয়ে রেখে দিতেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক মহিলা। গেস্টরুমে, খাটের পাশের টেবিলটার ওপর একটা ছোটখাটো মন্দির তৈরি করেছিলেন। এক দেবীর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি আর একপ্লেট গাঁদাফুলের পাপড়ি। তিনি তার সামনে প্রতিদিন দু'বার প্রার্থনা করতেন ভবিষ্যতে সুস্থসবল নাতি-নাতনি পাওয়ার জন্য। বন্ধুর মতো না হলেও, সুকুমারের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতেন। তার সোয়েটারগুলো ভাঁজ করতেন এমন এক নৈপুণ্যের সঙ্গে, যা তিনি তাঁর ডিপার্টমেন্ট স্টোরের কাজে আয়ত্ত করেছিলেন। সুকুমারের শীতের কোট থেকে খুলে যাওয়া একটা বোতাম সেলাই করে দিয়েছিলেন। তার জন্য একটা বেজ আর বাদামি রঙের

AMARBOI.COM

স্কার্ফ বুনে এমনই নিরুত্তাপভাবে তাকে সেটা দিয়েছিলেন, যেন সে সেটা ভুলে কোথাও ফেলে রেখেছিল। তিনি সুকুমারের সঙ্গে শোভার ব্যাপারে কথা বলতেন না। একবার, যখন সে বাচ্চাটার মৃত্যুর উল্লেখ করেছিল, তখন তিনি উলবোনা থেকে মুখ তুলে বলেছিলেন, "কিন্তু তুমি তো সেখানে ছিলেও না।"

সুকুমারের অদ্ভুত লাগল যে, বাড়িতে কোনও ঠিকঠাক মোমবাতিই নেই, শোভা এত সাধারণ একটা দরকারের জন্য কোনও ব্যবস্থা রাখেনি। সে জন্মদিনের মোমবাতিগুলো কোথায় পোঁতা যায় তা খুঁজতে লাগল এবং শেষে একটা পটে রাখা আইভিলতার মাটিটাই বেছে নিল। পটটা সাধারণত সিঙ্কের ওপরের জানলার কার্নিশে থাকে। যদিও গাছটা কলের থেকে ইঞ্চিকয়েক দূরেই থাকে, তাও সেটার মাটি এতই শুকনো যে, মোমবাতিগুলো সোজা করে দাঁড় করানোর জন্য সুকুমারকে আগে মাটিতে জল দিতে হল। সে কিচেনটেবিলের ওপরের জিনিসগুলো— চিঠির বান্ডিল, লাইব্রেরির না পড়া বই ইত্যাদি একপাশে সরিয়ে রাখল। তাদের দুজনের প্রথম একসঙ্গে খেতে বসার কথা তার মনে আছে। যখন তারা বিয়ে করে, শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে পেরে এতই রোমাঞ্চিত ছিল যে, খাওয়ার চেয়ে বেশি ভালবাসার জন্য উৎসুক হয়ে শুধুই নির্বোধের মতো পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিত। সে দেটা এমব্রয়ডারি করা ম্যাট পাতল। লখনউ থেকে এক আত্মীয় তাদের বিয়েতে এগুলো উপহার দিয়েছিলেন। সেইসব প্লেট আর ওয়াইনগ্লাস বের করে সাজাতে লাগল, যেগুলো সাধারণত তারা অতিথিদের জন্য রেখে দেয়। আইভিটা সে মধ্যিখানে রাখল। তারার মতো দেখতে, সাদা বর্ডার দেওয়া পাতাগুলো ঘিরে দশটা ছোট্ট মোমবাতি। ডিজিটাল ঘড়ি-কাম রেডিয়োটা অন করে একটা জ্যাজ় স্টেশন চালিয়ে দিল।

"এসব কী?" নীচে এসে শোভা জিজ্ঞেস করল, তার চুলে একটা মোটা, সাদা তোয়ালে জড়ানো। সে তোয়ালেটা খুলে একটা চেয়ারের পিঠে মেলে দিল। ভিজে কালো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। অন্যমনস্কভাবে স্টোভের দিকে এগোতে এগোতে শোভা আঙুল দিয়ে চুলের কয়েকটা জট ছাড়াল। সে পরিষ্কার সোয়েটপ্যান্ট, একটা টি-শার্ট আর একটা পুরনো ফ্ল্যানেলের রোব পরেছিল। তার পেট আবার সমান হয়ে গিয়েছে। চওড়া নিতম্বের ওপরে সরু কোমরে রোবের বেল্ট একটা আলগা গিঁটে বাঁধা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘড়িতে প্রায় আটটা। সুকুমার ভাতটা টেবিলে রেখে আগের রাতের ডালটা মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে টাইমারে নম্বর টিপে দিল।

'রোগান যোশ করেছ,' কাচের ঢাকার মধ্যে দিয়ে লালমরিচের স্টু দেখে শোভা বলল।

সুকুমার এক টুকরো মাংস বের করে সেটায় চট করে দু'আঙুলে চিমটি কাটল যাতে আঙুল পুড়ে না যায়। একটা চামচ দিয়ে আর-একটা বড় টুকরোয় খোঁচা মেরে দেখল হাড় থেকে মাংস সহজেই খুলে আসছে কি না। "রেডি হয়ে গিয়েছে," সে ঘোষণা করল।

মাইক্রোওয়েভটা সবে আওয়াজ করেছে, এমন সময় আলো চলে গেল আর সংগীত থেমে গেল।

"নিখুঁত টাইমিং," শোভা বলল।

"শুধু জন্মদিনের মোমবাতিগুলোই খুঁজে পেলাম," সুকুমার আইভির পাশে মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে বাকি মোমবাতি আর একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিজের প্লেটের পাশে রাখল।

"তাতে কিছু এসে যায় না," শোভা তার ওয়াইনগ্লাসের কানায় আঙুল ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল। "খুব সুন্দর লাগছে।"

আলো-আঁধারির মধ্যে, সুকুমার জানত যে শোভা কেমনভাবে বসে আছে। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে, চেয়ারের সবচেয়ে নীচের ধাপে গোড়ালি দুটো আড়াআড়ি করে, বাঁ হাতের কনুইটা টেবিলের ওপর রেখে। মোমবাতি খোঁজার সময় একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সে, সুকুমার যেটা ফাঁকা ভেবেছিল, একটা ওয়াইনের বোতল খুঁজে পেয়েছিল। বোতলটা দু'হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে সে কর্কস্ক্রুটা ঘোরাল। বাইরে যাতে না পড়ে যায়, তাই গেলাসগুলো ভরার সময় সেগুলো সে নিজের কোলের খুব কাছে তুলে ধরল। কাঁটাচামচ দিয়ে ভাত নাড়তে নাড়তে, চোখ কুঁচকে স্টু থেকে তেজপাতা আর লবঙ্গ বের করতে করতে তারা নিজেরাই খাবার নিয়ে নিল। কয়েক মিনিট বাদে বাদে সুকুমার আরও কয়েকটা জন্মদিনের মোমবাতি জ্বেলে টবের মাটিতে গুঁজে দিচ্ছিল।

"ভারতের মতো লাগছে," সুকুমারের কাজ-চালানো মোমবাতিদান সামলানো দেখতে দেখতে শোভা বলল। "মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কারেন্ট থাকে না। আমাকে একবার একটা গোটা অন্নপ্রাশন লোডশেডিং-এর

AMARBOI.COM

মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। একটা বাচ্চা কেঁদেই গেল। নিশ্চয়ই প্রচণ্ড গরম লাগছিল।"

তাদের বাচ্চাটা কখনও কাঁদেইনি, সুকুমার ভাবল। তাদের বাচ্চার কখনও কোনও অন্নপ্রাশন হবে না। যদিও শোভা আগেই অতিথিদের তালিকা বানিয়ে ফেলেছিল। সে এ-ও ঠিক করে ফেলেছিল যে, যখন ছেলেটা ছ'মাসের বা মেয়েটা সাত মাসের হবে তার তিন ভাইয়ের মধ্যে কাকে সে বাচ্চাটাকে তার প্রথম শক্ত খাবার খাওয়াতে বলবে।

"তোমার কি গরম লাগছে?" সুকুমার জিজ্ঞেস করল। সে আইভির আলোকোজ্জ্বল টবটা টেবিলের অন্য প্রান্তে বই আর চিঠির দিকে ঠেলে তাদের পরস্পরকে দেখতে পাওয়াটা আরও কঠিন করে দিল। ওপরে গিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসতে পারছে না বলে তার বিরক্ত লাগল।

"না। দারুণ হয়েছে খেতে," শোভা তার কাঁটাচামচ দিয়ে প্লেটের ওপর টোকা মারল। "সত্যিই।"

সুকুমার শোভার ওয়াইনগ্লাস আবার ভরে দিল। শোভা ধন্যবাদ জানাল।

তারা আগে এরকম ছিল না। এখন সুকুমারকে কষ্ট করে ভেবে বের করতে হয়, এমন কী বলা যায় যাতে শোভা আগ্রহী হবে, যাতে সে তার প্লেট বা প্রুফরিডিং ফাইল থেকে চোখ তুলে তাকাবে। শেষে সুকুমার শোভার মন ফেরানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিল। তার আর নীরবতায় অস্বস্তিবোধ হত না।

"আমার মনে আছে, আমার দিদিমার বাড়িতে, কারেন্ট চলে গেলে আমাদের সকলকে কিছু না কিছু বলতে হত," শোভা বলল। সুকুমার শোভার মুখ প্রায় দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু শোভার গলা শুনে বুঝতে পারছিল যে, শোভা চোখ দুটো সরু করে আছে, যেন কোনও দূরের জিনিস দেখার চেষ্টা করছে। ওটা শোভার অভ্যেস।

"যেমন?"

"জানি না। কোনও ছড়া, কোনও হাসির কথা। জগৎ সম্পর্কে কোনও তথ্য। আমার আত্মীয়রা সবসময় চাইতেন যে, আমি তাঁদের আমার আমেরিকান বন্ধুদের নাম বলি। জানি না ওই বিষয়ে তাঁদের এত আগ্রহ ছিল কেন। শেষ যখন আমার এক আত্মীয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি সেই চারজন মেয়ের নাম জানতে চেয়েছিলেন, যারা আমার সঙ্গে টাকসনের এলিমেন্টারি স্কুলে পড়ত। আমার তো তাদের কথা প্রায় মনেই পড়ে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোভা ভারতে যত সময় কাটিয়েছে, সুকুমার ততটা কাটায়নি। তার মা-বাবা নিউ হ্যাম্পশায়ারে থাকতেন। যখন নিজেদের দেশে তাঁরা যেতেন, সুকুমারকে নিয়ে যেতেন না। শিশু অবস্থায় প্রথমবার ভারতে গিয়ে সে আমাশায় প্রায় মরতে বসেছিল। তার বাবা ছিলেন ভীতু প্রকৃতির, আবার যদি কিছু হয়ে যায় ভেবে তিনি তাকে আর কখনও নিয়ে যেতে চাননি। মা-বাবা ভারতে গেলে সে কাকা-কাকিমার সঙ্গে কনকর্ডে থাকত। আর-একটু বড় হয়ে, কিশোর বয়সে সে গরমের ছুটিতে কলকাতা যাওয়ার বদলে সেলিং ক্যাম্পে যাওয়া বা আইসক্রিমের স্কুপ তুলতে বেশি পছন্দ করত। কলেজের শেষ বছরে, যখন তার বাবা মারা গেলেন, তখন প্রথম ওই দেশটার প্রতি একটা আগ্রহ জন্মাতে শুরু করল। পাঠ্যবই থেকে অন্যান্য বিষয়ের মতো ভারতের ইতিহাসও সে পড়তে আরম্ভ করল। এখন সুকুমারের মনে হয় যে, তারও ভারতের সঙ্গে জড়িত ছেলেবেলার কোনও গল্প থাকলে ভাল হত।

"চলো আমরা ওইরকম করি," শোভা হঠাৎ বলে উঠল।

"কী করব?"

"অন্ধকারের মধ্যে পরস্পরকে কিছু একটা বলি।"

"কী বলব? আমি তো কোনও হাসির কথা জানি না।"

"না না, হাসির কথা নয়," শোভা এক মিনিট ভাবল। "যদি আমরা একে অন্যকে এমন কিছু বলি, যা আগে কখনও বলিনি?"

"ওই খেলাটা আমি হাই স্কুলে খেলতাম," সুকুমারের মনে পড়ল। "মাতাল হয়ে গেলে।"

"তুমি 'ট্রুথ অর ডেয়ার'-এর কথা ভাবছ। এটা আলাদা। আচ্ছা, আমি শুরু করছি," শোভা ওয়াইনে চুমুক দিল। "প্রথম যখন তোমার অ্যাপার্টমেন্টে আমি একলা ছিলাম, তখন আমি তোমার অ্যাড্রেস বুক খুলে দেখেছিলাম আমার নাম লিখেছ কি না। তখন বোধহয় আমাদের সপ্তাহ দুয়েকের আলাপ।"

"আমি কোথায় ছিলাম?"

"তুমি অন্য ঘরে ফোন ধরতে গিয়েছিলে। তোমার মা ফোন করেছিলেন আর আমি ধরে নিয়েছিলাম যে তোমার কিছুক্ষণ লাগবে। আমি জানতে চাইছিলাম যে, তোমার খবরের কাগজের মার্জিন থেকে আমার পদোন্নতি করেছ কিনা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"করেছিলাম?"

"না। কিন্তু তাও আমি হাল ছাড়িনি। এবার তোমার পালা।"

সুকুমার কী বলবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না, কিন্তু শোভা অপেক্ষা করছিল। বহু মাস হল তাকে এত দৃঢ়সংকল্প মনে হয়নি। কী বলা বাকি আছে শোভাকে? সুকুমার তাদের প্রথম দেখা হওয়ার কথা ভাবল। চার বছর আগে কেমব্রিজের এক লেকচার হলে। একদল বাঙালি কবি আবৃত্তি করছিলেন। ওরা দু'জনে পাশাপাশি কাঠের ফোল্ডিং চেয়ারে বসেছিল। কিছুক্ষণ বাদেই সুকুমারের একঘেয়ে লাগতে শুরু করে। সে সাহিত্যিক শব্দচয়ন বুঝতে পারছিল না। কোনও বিশেষ অংশের পর শ্রোতারা যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ছিল, তখন সে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেনি। কোলে মুড়ে রাখা খবরের কাগজটায় উঁকি দিয়ে সে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরের তাপমাত্রা পড়ছিল। গতকাল সিঙ্গাপুরে ৯১ ডিগ্রি, স্টকহোমে ৫১। বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল একটা মেয়ে বসে বসে একটা ফোল্ডারের পেছনে বাজারের ফর্দ বানাচ্ছে। মেয়েটা সুন্দরী দেখে সে চমকে গিয়েছিল।

"আচ্ছা," সুকুমারের মনে পড়ল। "প্রথম যেবার আমরা ডিনারে বেরিয়েছিলাম, সেই পর্তুগিজ জায়গাটায়, সেবার আমি ওয়েটারকে বখশিস দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। পরদিন সকালে ফিরে গিয়ে, তার নাম খুঁজে বের করে, ম্যানেজারের কাছে টাকাটা রেখে এসেছিলাম।"

"তুমি আবার সমারভিল অবধি গেলে স্রেফ একটা ওয়েটারকে বখশিস দেওয়ার জন্যে?"

"ট্যাক্সি নিয়েছিলাম।"

"বখশিস দিতে ভুলে গিয়েছিলে কেন?"

মোমবাতিগুলো জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অন্ধকারে সুকুমার শোভার মুখটা পরিষ্কার কল্পনা করতে পারছে। বড় বড় টানা-টানা চোখ, আঙুর রঙের ভরাট ঠোঁট, চিবুকের কাছে একটা 'কমা'-র মতো দাগ। দু'বছর বয়সে একটা উঁচু চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার চিহ্ন। সুকুমার লক্ষ করল যে, শোভার রূপ, যা একসময়ে তাকে অভিভূত করেছিল, তা প্রতিদিন একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে। যে প্রসাধনদ্রব্যগুলো একসময় অনর্থক মনে হয়েছিল, সেগুলো এখন প্রয়োজনীয় মনে হয়। শোভাকে আরও সুন্দর দেখানোর জন্য নয়, যেন তাকে বর্ণনা করার জন্যই সেগুলো দরকার।

AMARBOI.COM

"খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল যে, আমি বোধহয় তোমাকে বিয়ে করব," সেই প্রথমবার সুকুমার শুধু শোভার কাছেই নয়, নিজের কাছেও স্বীকার করল। "সেইজন্যই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম হয়তো।"

পরের সন্ধেবেলায় শোভা অন্যদিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। আগের দিনের মাংস কিছুটা পড়ে ছিল। সুকুমার সেটা গরম করে নিল যাতে তারা সাতটার মধ্যে খেয়ে নিতে পারে। সে সেদিন গলতে শুরু করা বরফের মধ্যে বেরিয়ে কোণের দোকান থেকে এক প্যাকেট মোমবাতি আর টর্চের জন্য ব্যাটারি কিনে এনেছিল। পদ্মফুলের মতো দেখতে পিতলের মোমবাতিদানে মোমবাতিগুলো দাঁড় করিয়ে সুকুমার সেগুলো কাউন্টারটপে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু টেবিলের ওপর ছাদ থেকে যে তামার শেডের আলোটা ঝোলে, তারা তারই আলোয় সেদিন খাবার খেল।

খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সুকুমার একটু অবাক হয়ে দেখল যে, শোভা নিজের প্লেটটা তার প্লেটের ওপর চাপিয়ে সেগুলো সিঙ্কে নিয়ে যাচ্ছে। সে ধরেই নিয়েছিল যে, শোভা লিভিং রুমে ঢুকে পড়বে, তার ফাইলের আড়ালের পিছনে।

"প্লেটগুলোর কথা ভাবতে হবে না," শোভার হাত থেকে সেগুলো নিয়ে সুকুমার বলল।

"সেটা বোকামি হয়ে যাবে," শোভা স্পঞ্জে এক ফোঁটা ডিটারজেন্ট ঢেলে উত্তর দিল। "প্রায় আটটা বাজে তো।"

সুকুমারের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সারাদিন ধরে সে আলো চলে যাওয়ার পরের সময়টার জন্য অপেক্ষা করছে। সে, শোভা আগের রাতে যা বলেছিল, তার অ্যাড্রেস বই খুলে দেখার কথা ভাবল। তখনকার শোভার কথা মনে করলে সুকুমারের ভাল লাগে। যখন তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল, শোভা কত সাহসী, আবার একইসঙ্গে কেমন নার্ভাস ছিল। কত আশা ছিল তার। তারা সিঙ্কের সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। জানলার ফ্রেমের ভিতর তাদের দু'জনেরই ছায়া দেখা যাচ্ছিল। সুকুমারের একটু লাজুক লাগল, যেমন তার প্রথমবার লেগেছিল যখন তারা একসঙ্গে একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল। শেষ কবে তাদের দু'জনের ফোটো একসঙ্গে তোলা হয়েছে তার মনে পড়ে

AMARBOI.COM

না। তারা পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। একসঙ্গে কোথাও বেরোয়ও না। তার ক্যামেরার ফিল্মে এখনও শোভার ছবি আছে। গর্ভবতী অবস্থায় উঠোনে দাঁড়িয়ে তোলা।

প্লেট ধোয়া শেষ করার পর, তারা কাউন্টারে হেলান দিয়ে একই তোয়ালের দু'প্রান্তে হাত মুছল। আটটা বাজতেই বাড়িটা অন্ধকার হয়ে গেলে সুকুমার মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে দিল। লম্বা, অকম্পিত শিখাগুলো দেখে তার ভাল লাগল।

"চলো বাইরে গিয়ে বসি," শোভা বলল। "এখনও গরম আছে বোধহয়।"

দুজনেই একটা করে মোমবাতি নিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে বসল। মাটিতে তখনও বরফের ছোট ছোট টুকরো পড়ে আছে। বাইরে বসতে অদ্ভুত লাগছিল। কিন্তু সে রাতে সকলেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছে। হাওয়াটা এতই তাজা যে, ভিতরে কারও মন টিকছিল না। দরজা খুলছিল, বন্ধ হচ্ছিল। পড়শিদের একটা ছোট প্যারেড টর্চ হাতে হেঁটে গেল।

"আমরা বইয়ের দোকানে যাচ্ছি বই দেখতে," রুপোলি চুলওয়ালা এক ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ডাকলেন। তাঁর স্ত্রী রোগা, গায়ে উইন্ডব্রেকার। সঙ্গে গলায় বকলশ বাঁধা একটা কুকুর। এঁদের নাম ব্র্যাডফোর্ড। এঁরা সেপ্টেম্বর মাসে শোভা আর সুকুমারের মেলবক্সে একটা সমবেদনা জানিয়ে কার্ড গুঁজে দিয়েছিলেন। "শুনছি ওদের পাওয়ার আছে।"

"থাকলেই ভাল," সুকুমার বলল। "নয়তো তোমাদের অন্ধকারে বই দেখতে হবে।"

মহিলাটি হাসলেন। তাঁর স্বামীর কনুইয়ে হাত গলিয়ে বললেন, "আসবে আমাদের সঙ্গে?"

"না, ধন্যবাদ," শোভা আর সুকুমার একসঙ্গে বলে উঠল। সুকুমার আশ্চর্য হল যে তার সঙ্গে শোভার ইচ্ছে মিলে গেল।

সে ভাবছিল শোভা তাকে অন্ধকারে কী বলবে। সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাগুলো সে আগেই ভেবে ফেলেছিল। শোভার কোনও অবৈধ সম্পর্ক হয়েছে। কিংবা সুকুমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও ছাত্রই আছে বলে শোভার মনে তার প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নেই। অথবা সেই সময়ে বাল্টিমোরে থাকার জন্য শোভার মায়ের মতো শোভাও সুকুমারকে দোষ দেয়। কিন্তু সুকুমার জানে যে, এগুলোর কোনওটাই সত্যি নয়। সে এবং শোভা কেউই ব্যভিচারী নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ওপর শোভার বিশ্বাস আছে। শোভাই তার বাল্টিমোর যাওয়ার ওপর জোর দিয়েছিল। তারা পরস্পরের সম্পর্কে কি জানে? সুকুমার জানে শোভা ঘুমোনোর সময় আঙুলগুলো শক্ত করে পাকিয়ে রাখে। দুঃস্বপ্ন দেখলে তার শরীরটা ঘুমের মধ্যে কেঁপে ওঠে। সে জানে যে, শোভা ফুটির চেয়ে হানিডিউ বেশি পছন্দ করে। সে এও জানে যে, তারা যখন হাসপাতাল থেকে ফিরেছিল, তখন শোভা বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই তাদের জিনিসপত্রগুলো তুলে হলওয়েতে একটা স্তূপে ছুড়ে ফেলছিল। তাক থেকে বই, জানলার কার্নিশ থেকে গাছ, দেওয়াল থেকে পেন্টিং, টেবিল থেকে ফোটো, স্টোভের ওপরের হুক থেকে ঝোলানো কড়া, হাঁড়ি। সুকুমার শোভার পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিল। কেমন সুশৃঙ্খলভাবে সে একটার পর একটা ঘরে ঢুকছে। শোভার মন ভরার পর, যে স্তূপটা সে তৈরি করেছিল, সেটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে শোভার মুখ বিতৃষ্ণায় এমন বেঁকে গিয়েছিল যে, সুকুমার ভেবেছিল সে বোধহয় এবার থুতু ফেলবে। তারপর শোভা কাঁদতে শুরু করেছিল।

সিঁড়িতে বসে সুকুমারের ঠান্ডা লাগছিল। তার মনে হচ্ছিল যে, শোভার আগে কথা বলা দরকার, যাতে সে উত্তরে কিছু বলতে পারে।

"সেবার, যখন তোমার মা আমাদের সঙ্গে থাকতে এলেন," অবশেষে শোভা বলল, "যে রাতে আমি বলেছিলাম আমাকে দেরি করে কাজ করতে হবে, আমি সেবার জিলিয়ানের সঙ্গে বেরিয়ে মার্টিনি খেয়েছিলাম।"

সুকুমার শোভার মুখের দিকে তাকাল। পাতলা নাক, একটু যেন পুরুষালি চোয়াল। সেই রাতের কথা সুকুমারের ভালভাবে মনে আছে। পরপর দুটো ক্লাস পড়িয়ে সে ক্লান্ত। মায়ের সঙ্গে খেতে বসে সে ভাবছিল শোভা থাকলে ভাল হত। শোভা সময়োপযোগী কথাবার্তা ভাল বলতে পারত। কারণ, সে নিজে শুধু উলটোপালটা কথাই বলছিল। ততদিনে বাবার মৃত্যুর বারো বছর হয়ে গিয়েছে। তার মা তাদের সঙ্গে দু'সপ্তাহ কাটাতে এসেছিলেন, সকলে মিলে বাবার স্মৃতিকে সম্মান জানাবেন বলে। প্রতি রাতে তার মা, বাবার পছন্দের কোনও রান্না করতেন, কিন্তু তিনি নিজে সেগুলো খাওয়ার মতো মনের অবস্থায় থাকতেন না। তাঁর চোখ জলে ভরে আসত। শোভা তাঁর হাতে হাত বুলিয়ে দিত। "কী মর্মস্পর্শী," সেই সময় শোভা বলেছিল। এখন সুকুমার কল্পনা করার চেষ্টা করল, শোভা আর জিলিয়ান বার-এ, স্ট্রাইপ-কাটা

AMARBOI.COM

মখমলের সোফায় বসে আছে। সেই বার এ, যেটায় তারা ফিল্ম দেখার পর যেত। শোভা তার বাড়তি অলিভ পেল কি না দেখছে, জিলিয়ানের কাছে সিগারেট চাইছে। সে কল্পনা করল, শোভা অভিযোগ করছে শ্বশুর-শাশুড়িদের থাকতে আসা নিয়ে আর জিলিয়ান সহানুভূতি প্রকাশ করছে। জিলিয়ানই গাড়ি চালিয়ে শোভাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।

"এবার তোমার পালা," সুকুমারের ভাবনা থামিয়ে শোভা বলল।

রাস্তাটার মুখে সুকুমার তুরপুনের আওয়াজ আর ইলেকট্রিশিয়ানদের চেঁচামেচি শুনতে পেল। সে রাস্তার ধারে বাড়িগুলোর সামনের অন্ধকার দেওয়ালের দিকে তাকাল। একটা বাড়ির জানলায় মোমবাতি জ্বলছিল। অল্প গরম থাকা সত্ত্বেও, চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছিল।

"কলেজের ওরিয়েন্টাল সিভিলাইজেশন পরীক্ষায় আমি চিটিং করেছিলাম," সুকুমার বলল। "আমার শেষ সেমেস্টার ছিল, শেষ পরীক্ষার পর্ব। কয়েক মাস আগে বাবা মারা গিয়েছিলেন। পাশের ছেলেটার নীল খাতাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। ছেলেটা আমেরিকান, একটা উন্মাদ। উর্দু আর সংস্কৃত জানত। আমার মনে পড়ছিল না যে, আমাদের যেটা চিনতে হবে, সেটা একটা গজলের উদাহরণ কিনা। আমি ওর খাতাটা দেখে উত্তরটা টুকেছিলাম।"

ঘটনাটা প্রায় পনের বছর আগে হয়েছিল। এতদিনে শোভাকে বলে সুকুমারের স্বস্তি হল।

শোভা সুকুমারের দিকে ফিরল, কিন্তু মুখের দিকে না তাকিয়ে জুতোর দিকে দেখল। একজোড়া পুরনো মোকাসিন, যেগুলো সুকুমার চপ্পলের মতো পরে। পিছনের চামড়াটা বরাবরের মতো চ্যাপটা হয়ে গিয়েছে। সুকুমার ভাবছিল, সে যা বলল, তাতে শোভার বিব্রত লাগছে কি না। শোভা তার হাতে আলতো চাপ দিল। "কেন করেছিলে সেটা আমাকে বলার কোনও দরকার নেই," সে সুকুমারের আরও কাছে ঘেঁষে বসল।

ন'টার সময় আলো আসা পর্যন্ত তারা একসঙ্গে বসে থাকল। শুনতে পেল রাস্তার ওধারে কিছু লোক তাদের বারান্দা থেকে হাততালি দিচ্ছে। কয়েকটি টেলিভিশন চালানো হল। ব্র্যাডফোর্ড-দম্পতি আইসক্রিম খেতে খেতে আর হাত নাড়তে নাড়তে রাস্তা দিয়ে হেঁটে ফিরলেন। শোভা আর সুকুমারও হাত নাড়ল। তারপর তারা উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে ভিতরে ঢুকে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনওভাবে কিছু না বলেই ব্যাপারটা এরকম হয়ে গিয়েছিল। স্বীকারোক্তি দেওয়া নেওয়া। যে, ছোট ছোট ব্যাপারে তারা পরস্পরকে এবং নিজেদের দুঃখ দিয়েছে বা হতাশ করেছে। পরের দিন সুকুমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভাবল শোভাকে কী বলা যায়। শোভা যে ফ্যাশন পত্রিকাগুলো কিনত, তার একটা থেকে সুকুমার একবার একটা মেয়ের ছবি ছিঁড়ে এক সপ্তাহ নিজের বইয়ের মধ্যে নিয়ে ঘুরেছিল। সে দোটানায় পড়ে গিয়েছিল যে, সেই কথাটা বলবে, নাকি বলবে যে, তাদের তৃতীয় বিবাহবার্ষিকীতে শোভা তাকে যে সোয়েটার ভেস্টটা কিনে দিয়েছিল, সেটা সে হারায়নি, বরং ফিলিন্স-এ সেটা বদলে টাকা নিয়ে নিয়েছিল আর দিনের বেলা, একটা হোটেলের বার-এ, একা একা মাতাল হয়েছিল। তাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে শোভা শুধু তারই জন্য একটা দশ পদের ডিনার রান্না করেছিল। ভেস্টটা দেখে তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। "আমার বউ আমাকে আমাদের অ্যানিভার্সারিতে একটা সোয়েটার-ভেস্ট দিয়েছে," সে বারটেন্ডারের কাছে নালিশ করেছিল। তার মাথা কলিয়াকের দৌলতে ভারী হয়ে ছিল। "আবার কী আশা করো?" বারটেন্ডারটি জবাব দিয়েছিল। "তুমি তো বিবাহিত।"

মেয়েটার ছবিটা যে সে কেন ছিঁড়ে নিয়েছিল, জানে না। মেয়েটা শোভার মতো সুন্দরী নয়। একটা সাদা, স্লিভলেস বসানো জামা পরেছিল। মুখটা গোলগাল আর পা-গুলো হেলানো, পুরুষালি। তার নগ্ন হাতগুলো ওঠানো ছিল, মাথার পাশে মুঠি পাকানো, যেন সে নিজের কানে ঘুঁষি মারতে যাচ্ছে। সেটা ছিল একটা স্টকিং-এর বিজ্ঞাপন। শোভা তখন অন্তঃসত্ত্বা। তার পেট হঠাৎ এতটাই বিশাল হয়ে উঠেছিল যে, সুকুমারের তাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হত না। প্রথম যখন সুকুমার ছবিটা দেখে, তখন সে শোভার পাশে শুয়ে ছিল। শোভা পত্রিকাটা পড়ছিল আর সুকুমার তাকে দেখছিল। পত্রিকাটা রিসাইকেল করার স্তূপে দেখে সে মেয়েটার ছবিটা বার করে পাতাটা যথাসম্ভব সাবধানে ছিঁড়ে নিয়েছিল। সপ্তাহখানেক সে নিজেকে দিনে একবার ছবিটা দেখার অনুমতি দিত। সে মেয়েটার জন্য একটা তীব্র কাম অনুভব করত, কিন্তু সেই কাম দু'-এক মিনিট পরেই বিরক্তিতে, ঘৃণায় পরিণত হত। বিশ্বাসভঙ্গতা বা ব্যভিচারের এর চেয়ে কাছে সুকুমার কখনও যায়নি।

সুকুমার শোভাকে তৃতীয় রাতে সোয়েটারের কথা আর চতুর্থ রাতে ছবিটার কথা বলল। সে যখন কথা বলছিল, তখন শোভা চুপ করে ছিল।

AMARBOI.COM

কোনও প্রতিবাদ, কোনও নিন্দা করল না। চুপ করে সুকুমারের কথা শুনল। তারপর তার হাতে আগের মতোই আলতো করে চাপ দিল। একবার তারা একটা লেকচারে গিয়েছিল যেখানে ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার সময় সুকুমারের চিবুকে এক টুকরো খাবার লেগে ছিল। তৃতীয় রাতে শোভা সুকুমারকে বলল যে, সে সেটা দেখতে পেয়েও সুকুমারকে সাবধান করেনি। তখন সে সুকুমারের প্রতি কোনও কারণে বিরক্ত ছিল। তাই সুকুমার যখন নিজের ফেলোশিপের কথা বলেই যাচ্ছিল, শোভা একবারও সংকেত হিসেবে নিজের চিবুকের দিকে ইশারা করেনি। চতুর্থ রাতে শোভা বলল যে, উটার একটা সাহিত্য পত্রিকায়, সুকুমারের লেখা একমাত্র যে কবিতাটা প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা তার কোনও দিনও ভাল লাগেনি। শোভার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সুকুমার কবিতাটা লিখেছিল। শোভার কবিতাটা বেশি সেন্টিমেন্টাল মনে হয়েছে।

বাড়িটা অন্ধকার হয়ে গেলে কী যেন একটা হত। তারা আবার পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারত। তৃতীয় রাতে, খাবার পর তারা একসঙ্গে সোফায় বসল। একবার অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর সুকুমার ইতস্তত শোভার কপালে আর মুখে চুমু খেতে শুরু করল। অন্ধকার সত্ত্বেও তার চোখ বন্ধ ছিল। সে জানত, শোভাও চোখ বুজে আছে। চতুর্থ রাতে তারা সাবধানে ওপরে উঠল, তাদের বিছানায়, সিঁড়ির শেষ ধাপটা তাদের পা দিয়ে ছুঁয়ে নিশ্চিন্ত হল। ভালবাসায় সেই ব্যাকুলতা অনুভব করল, যা তারা প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। শোভা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলল। ফিসফিস করে সুকুমারের নাম আওড়াল। অন্ধকারে সুকুমারের ভুরুর ওপর নিজের আঙুল বুলিয়ে দিল। ভালবাসার সময়, তার পরের রাতে সে শোভাকে কী বলতে পারে, শোভা তাকে কী বলতে পারে ভেবে সুকুমার উত্তেজিত বোধ করল। "ধরে থাকো আমায়," সে বলল। "ধরে থাকো তোমার কাছে।" যতক্ষণে নীচে আলো জ্বলে উঠল, ততক্ষণে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পঞ্চম রাতের পর যখন সকাল হল, তখন সুকুমার ডাকবাক্সে বিদ্যুৎ কোম্পানির আর-একটা নোটিশ পেল। তাতে লেখা ছিল নির্ধারিত সময়ের আগেই লাইন ঠিক হয়ে গিয়েছে। সুকুমার হতাশ হল। সে ভেবেছিল শোভার জন্য মালাই চিংড়ি রাঁধবে। কিন্তু দোকানে যাওয়ার পর তার আর রান্না করতে

AMARBOI.COM

ইচ্ছে করল না। আলো আর নিভে যাবে না জানার ফলে ব্যাপারটা যেন আর আগের মতো ছিল না। দোকানে চিংড়িগুলো দেখে কেমন পাঁশুটে আর শীর্ণ মনে হল। নারকেল দুধের টিনটার ওপর ধুলো আর বড্ড চড়া একটা দামের লেবেল লাগানো ছিল। তাও সে জিনিসগুলো কিনল। আর একটা বিজওয়্যাক্স মোমবাতি আর দুটো ওয়াইনের বোতল কিনল।

শোভা সাড়ে সাতটায় বাড়ি ফিরল। তাকে নোটিশটা পড়তে দেখে সুকুমার বলল, "আমাদের খেলা বোধহয় এবার শেষ হল।"

শোভা সুকুমারের দিকে তাকাল। "চাইলে মোমবাতিগুলো জ্বালাতে পারো।" সে আজ জিমে যায়নি। বর্ষাতির নীচে সে একটা সুট পরেছিল। দেখে মনে হল, তার মেকআপ একটু আগেই ঠিক করা হয়েছে।

শোভা ওপরে জামাকাপড় ছাড়তে যাওয়ার পর সুকুমার নিজের জন্য একটা ওয়াইন ঢালল। থেলোনিয়াস মঙ্কের একটা রেকর্ড চালাল। সে জানত, অ্যালবামটা শোভার পছন্দ।

শোভা নীচে এলে তারা একসঙ্গে খাবার খেল। শোভা কোনও ধন্যবাদ জানাল না বা তার প্রশংসা করল না। শুধু আলো কমানো ঘরটাতে বসে বিজওয়্যাক্স মোমবাতির আলোয় খাবার খেল। তারা দু'জনে একটা কঠিন সময় পেরিয়ে এসেছে। তারা চিংড়িটা শেষ করল। ওয়াইনের প্রথম বোতলটা শেষ করে দ্বিতীয় বোতল শুরু করল। একসঙ্গে বসে থাকল যতক্ষণ না মোমবাতিটা জ্বলে প্রায় শেষ হয়ে গেল। শোভা তার চেয়ারে একটু নড়ে বসল। সুকুমার ভাবল সে হয়তো কিছু বলবে। কিন্তু শোভা মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে আলোর সুইচটা অন করে আবার বসে পড়ল।

"আলোগুলো নিভিয়ে রাখলেই হয় না?" সুকুমার জিজ্ঞেস করল। শোভা তার প্লেটটা সরিয়ে রেখে টেবিলের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করে রাখল। "আমি চাই যে, আমি যখন তোমাকে কথাটা বলব, তখন তুমি আমার মুখ দেখতে পাও," সে মৃদুস্বরে বলল।

সুকুমারের বুক ধকধক করতে লাগল। যেদিন শোভা তাকে বলেছিল যে সে অন্তঃসত্ত্বা, সেদিন সে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল, ঠিক এরকমই মৃদুস্বরে। সুকুমার তখন টিভিতে একটা বাসকেটবল ম্যাচ দেখছিল। শোভা টিভিটা বন্ধ করে দিয়েছিল। সুকুমার সেদিন প্রস্তুত ছিল না। এখন সে প্রস্তুত।

AMARBOI.COM

শুধু সুকুমার চায় না যে, শোভা আবার অন্তঃসত্ত্বা হোক। সে খুশি হওয়ার ভান করতে চায় না।

"আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছিলাম। একটা খুঁজে পেয়েছি," শোভা বলল। সে চোখদুটো সরু করে সুকুমারের বাঁ কাঁধের পিছনে কোনও জিনিসের দিকে তাকিয়ে ছিল। দুজনের কেউই এর জন্য দায়ী নয়, সে বলল। তারা দু'জনেই যথেষ্ট সহ্য করেছে। তার নিজের জন্য কিছু সময় দরকার। একটা সিকিয়োরিটি ডিপোজিটের জন্য সে টাকা জমিয়ে রেখেছিল। অ্যাপার্টমেন্টটা বিকন হিল-এ। কাজেই সে হেঁটে-হেঁটেই কাজে যেতে পারবে। সেই রাতেই, বাড়ি ফেরার আগে সে লিজে সই করে এসেছে।

শোভা সুকুমারের দিকে তাকাচ্ছিল না, কিন্তু সে শোভার দিকে তাকিয়ে ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল যে, শোভা কথাগুলো আগে থেকে প্রস্তুত করে রেখেছে। এতদিন ধরে সে অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজেছে, রিয়্যাল্টরকে জিজ্ঞেস করেছে ভাড়ার মধ্যে ঘর গরম করা আর গরম জল ধরা আছে কি না। গত সন্ধেগুলো শোভা তাকে বাদ দিয়ে একটা অন্য জীবনের জন্য তৈরি হচ্ছিল এই ভেবে সুকুমার অসুস্থ বোধ করল। তার আশ্বস্ত লাগল, আবার অসুস্থও লাগল। এই কথাটাই শোভা তাকে গত চার সন্ধেয় বলার চেষ্টা করেছে। এটাই ছিল তার খেলার উদ্দেশ্য।

এবার সুকুমারের বলার পালা। একটা কথা সে কখনও শোভাকে বলবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। ছ'মাস ধরে সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে নিজের মন থেকে কথাটা মুছে ফেলতে। আলট্রাসাউন্ড হওয়ার আগে শোভা ডাক্তারকে বলেছিল যে, সে জানতে চায় না তার সন্তান ছেলে না মেয়ে। সুকুমারও রাজি হয়েছিল। শোভা চেয়েছিল অজানার আনন্দ পেতে।

পরে যে ক'বার তারা ঘটনাটা নিয়ে কথা বলেছিল, ততবার শোভা বলেছিল যে, অন্তত সেই জানাটুকু থেকে তারা বেঁচে গিয়েছে। সে নিজের সিদ্ধান্তে প্রায় গর্ববোধ করত, কারণ, সেই না-জানার মধ্যেই সে আশ্রয় নিতে পারত। সুকুমার জানত যে, শোভা মনে করে সুকুমারের কাছেও তাদের সন্তান এক রহস্য হয়েই রয়েছে। তার বাল্টিমোর থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। যখন সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। শোভা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ছিল। কিন্তু সুকুমারের অত দেরি হয়নি। সে এসে তার বাচ্চাকে দেখতেও পেয়েছিল এবং তাকে দাহ করার আগে নিজের কোলেও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিল। প্রথমে সে প্রস্তাবটায় রাজি হয়নি। কিন্তু ডাক্তার বলেছিলেন যে, বাচ্চাটাকে কোলে নিলে সুকুমারের শোক অনেকটা সহনীয় হয়ে যাবে। শোভা তখন ঘুমোচ্ছিল। বাচ্চাটাকে পরিষ্কার করা হয়েছিল, চোখের পাতাগুলো মেলে আর সে পৃথিবীর আলো দেখবে না।

"আমাদের ছেলে হয়েছিল," সুকুমার বলল। "তার গায়ের রং যত না বাদামি, তার চেয়ে বেশি লালচে। মাথার চুল কালো। প্রায় পাঁচ পাউন্ড ওজন। হাতের আঙুলগুলো মুঠি করে পাকানো ছিল, ঠিক যেমন রাতে তোমার আঙুলগুলো থাকে।"

শোভা এতক্ষণে সুকুমারের দিকে তাকাল। তার মুখটা কষ্টে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল। সুকুমার কলেজের পরীক্ষায় টুকেছিল, একটা পত্রিকা থেকে একটা মেয়ের ছবি ছিঁড়ে নিয়েছিল, সে সোয়েটার ফেরত দিয়ে সেই টাকায় দিনের বেলা মাতাল হয়ে গিয়েছিল। এই কথাগুলো সে শোভাকে আগেই বলেছিল। সে তাদের ছেলেকে কোলে নিয়েছিল। যে ছেলে শুধু শোভার মধ্যেই বেঁচে ছিল, তাকে হাসপাতালের এক অজানা অংশে, একটা অন্ধকার ঘরে নিজের বুকের কাছে নিয়েছিল। সে তাকে ধরেই ছিল যতক্ষণ না একজন নার্স দরজায় টোকা মেরে এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে যায়। সেদিন সুকুমার প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে কোনওদিন এ কথাটা শোভাকে বলবে না। কারণ, সে তখনও শোভাকে ভালবাসত। আর তার জীবনের এই একটি কথাই অনাগত সন্তান ছেলে না মেয়ে শোভা আগে থেকে জানতে চায়নি।

সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে তার প্লেটটা শোভার প্লেটের ওপর রাখল। প্লেটগুলো সিঙ্কে নিয়ে গিয়ে, কলটা খুলে দেওয়ার বদলে সে জানলার বাইরে তাকাল। বাইরে উষ্ণ সন্ধে। ব্র্যাডফোর্ড-দম্পতি হাতে হাত ধরে হাঁটছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। সুকুমার চমকে ঘুরে দাঁড়াল। শোভা আলো নিভিয়ে দিয়ে টেবিলে এসে বসল। এক মুহূর্ত পর সুকুমার তার পাশে এসে বসল। যে কথাগুলো তারা এখন জানে, সেগুলোর জন্য তারা একসঙ্গে কাঁদতে থাকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মি. পিরজ়াদা

১৯৭১ সালের হেমন্তে এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে আসতেন। তাঁর পকেটে থাকত লজেন্স-চকোলেট আর বুকে তাঁর পরিবারের জীবন-মৃত্যুর নিশ্চিত খবর পাওয়ার আশা। তাঁর নাম ছিল মি. পিরজ়াদা। তিনি ঢাকা থেকে এসেছিলেন। ঢাকা এখন বাংলাদেশের রাজধানী, কিন্তু তখন পাকিস্তানের অংশ ছিল। সে বছর পাকিস্তান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই পূর্ব সীমান্ত যেখানে ঢাকা অবস্থিত, পশ্চিমের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করছিল। মার্চ মাসে পাকিস্তানি সেনা ঢাকায় হানা দিয়ে, আগুন লাগিয়ে, গুলিগোলা চালিয়েছিল। শিক্ষকদের রাস্তায় টেনে এনে গুলি করে মারা হয়েছিল। মেয়েদের ব্যারাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছিল। শোনা যাচ্ছিল যে, গ্রীষ্মকালের মধ্যে ৩,০০,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল। ঢাকায় মি. পিরজ়াদার একটা তিনতলা বাড়ি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপনা ছিল, কুড়ি বছরের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন এবং ছ' থেকে ষোলোর সাতটি মেয়ে ছিল, যাদের সকলের নাম শুরু হয়েছিল ইংরেজি 'এ' অক্ষর দিয়ে। "ওদের মায়ের ইচ্ছে," তিনি একদিন আমাদের, তাঁর মানিব্যাগ থেকে একটা সাদা-কালো ছবি বের করে দেখিয়ে বুঝিয়েছিলেন। সাতটি মেয়ে একটা পিকনিকে সারি দিয়ে বাবু হয়ে বসে কলাপাতায় মুরগির মাংসের ঝোল খাচ্ছে। সকলের বিনুনি ফিতে দিয়ে বাঁধা। "কী করে চিনব আমি? আয়েষা, আমিরা, আমিনা, অজ়িজ়া, বুঝতে পারছ তো, কত কঠিন?"

প্রতি সপ্তাহে মি. পিরজ়াদা স্ত্রীকে চিঠি লিখতেন এবং প্রত্যেকটি মেয়েকে কমিক্স বই পাঠাতেন। কিন্তু ঢাকায় আর সবকিছুর মতোই ডাকব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছিল। ছ' মাসের ওপর তিনি তাদের কোনও খবর পাননি। সেই সময় মি. পিরজ়াদা এক বছরের জন্য আমেরিকায় এসেছিলেন। কারণ পাকিস্তানি সরকার তাঁকে নিউ ইংল্যান্ডের গাছের পএালি নিয়ে পড়াশোনা

AMARBOI.COM

করার জন্য জলপানি দিয়েছিল। বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে তিনি ভার্মান্ট এবং মেন থেকে তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন। হেমন্তকালে তিনি বস্টনের উত্তরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন তাঁর আবিষ্কার নিয়ে একটি ছোট বই লিখতে। আমরা সেখানেই থাকতাম। জলপানিটা খুবই সম্মানের ছিল, যদিও ডলারে তার মূল্য নির্ধারণ করতে গেলে সেটা পর্যাপ্ত মনে হত না। তাই মি. পিরজাদা একটি গ্র্যাজুয়েট ডর্মেটরিতে থাকতেন। তাঁর কোনও নিজস্ব টিভি বা স্টোভও ছিল না, সেজন্য তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন টিভিতে সন্ধেবেলার খবর দেখতে এবং রাতের খাবার খেতে।

প্রথমদিকে আমি তাঁর আসার কারণ কিছুই বুঝতাম না। আমার তখন মাত্র দশ বছর বয়স। আমার মা-বাবা ছিলেন ভারতীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের পরিচিত অনেক ভারতীয় ছিল। তাই মি. পিরজাদাকে তাঁরা আমাদের সঙ্গে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানানোয় আমি অবাক হইনি। ছোট ক্যাম্পাসটায় ইটের সরু ফুটপাথ এবং সাদা থামওয়ালা বিল্ডিং ছিল। যে শহরের প্রান্তে ক্যাম্পাসটা অবস্থিত, সেটা যেন আরও ছোট। সুপারমার্কেটে সরষের তেল পাওয়া যেত না, ডাক্তাররা বাড়িতে রুগি দেখতে যেতেন না, বিনা নিমন্ত্রণে কেউ পড়শিদের বাড়ি যেত না, এইসব নিয়ে আমার মা-বাবা খুব অভিযোগ করতেন। স্বদেশবাসীর খোঁজে প্রতি সেমেস্টারের শুরুতে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টরিতে আঙুল দিয়ে নাম খুঁজতেন। তাঁদের দেশে পরিচিত পদবির কোনও নাম পেলে সেটা গোল দাগ দিয়ে রাখতেন। এইভাবেই তাঁরা মি. পিরজাদাকে খুঁজে পেয়ে ফোন করেছিলেন এবং বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

তাঁর প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার আসার কথাও আমার মনে নেই। কিন্তু সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আমি আমাদের বসার ঘরে মি. পিরজাদার উপস্থিতির সঙ্গে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, একদিন জলের জাগে বরফ ঢালার সময় আমি মাকে চতুর্থ গেলাসটা আমার নাগালের বাইরের একটা তাক থেকে পেড়ে দিতে বলেছিলাম। মা স্টোভের সামনে এক কড়াই ভরতি ভাজা পালং শাক আর মুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। একজস্ট ফ্যান আর জোরে জোরে ছাতা নাড়ানোর শব্দে আমার কথা শুনতে পাননি। বাবা ফ্রিজে হেলান দিয়ে মুঠো থেকে তুলে মশলা মাখানো কাজুবাদাম খাচ্ছিলেন। আমি তাঁর দিকে ফিরলাম।

AMARBOI.COM

"কী হয়েছে লিলিয়া?"

"ভারতীয় ভদ্রলোকটির জন্য একটা গেলাস চাই।"

"মি. পিরজ্জাদা আজ আসবেন না। তার চেয়েও বড় কথা, মি. পিরজ্জাদাকে আর ভারতীয় মনে করা হয় না," বাবা ঘোষণা করলেন। তাঁর পরিপাটি করে ছাঁটা কালো দাড়ি থেকে কাজুর নুন ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "পার্টিশনের পর থেকে আর না। ১৯৪৭-এ আমাদের দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছিল।"

আমি যখন বললাম যে, আমার ধারণা ছিল সেটা ব্রিটেনের শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতার তারিখ, তখন বাবা বললেন, "সেটাও ঠিক। এক মুহূর্ত আমরা স্বাধীন হলাম, পরমুহূর্তে আমাদের ভাগ করে দেওয়া হল।" কাউন্টারটপের ওপর আঙুল দিয়ে একটা ক্রশ চিহ্ন এঁকে তিনি বোঝালেন, "ঠিক একটা পিঠের মতো ভাগ করা হল। হিন্দুরা এখানে, মুসলমানরা ওখানে। ঢাকা আর আমাদের নেই।" তিনি বললেন, পার্টিশনের সময় হিন্দু-মুসলমানরা পরস্পরের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। এখনও অনেকের কাছেই, অন্য ধর্মের কারও উপস্থিতিতে খাওয়া অভাবনীয়।

আমি এর কিছুই বুঝতে পারলাম না। মি. পিরজ্জাদা এবং আমার মা-বাবা একই ভাষায় কথা বলতেন, একই কথায় হাসতেন, অনেকটা একইরকম দেখতেও ছিল ওঁদের। তাঁরা খাবারের সঙ্গে আমের চাটনি খেতেন, প্রতি রাতে হাত দিয়ে ভাত খেতেন। আমার মা-বাবার মতো মি. পিরজ্জাদাও ঘরে ঢোকার আগে জুতো খুলে ঢুকতেন, হজমের জন্য খাওয়ার পর মৌরি চিবোতেন, মদ খেতেন না, খাওয়ার পর মিষ্টির বদলে একের পর এক চায়ের কাপে কোনও সাধারণ বিস্কুট ডুবিয়ে খেতেন। এসব সত্ত্বেও, বাবা চাইছিলেন যেন আমি তাঁদের মধ্যে তফাতটা বুঝতে পারি। তিনি তাঁর ডেস্কের ওপরের দেওয়ালে সাঁটা পৃথিবীর একটা মানচিত্র দেখাতে নিয়ে গেলেন। মনে হল, বাবা যেন এই ভেবে চিন্তিত যে, ভুল করে মি. পিরজ্জাদাকে ভারতীয় বলে ফেললে তিনি অপমানিত বোধ করতে পারেন। আমি অবশ্য কল্পনাই করতে পারছিলাম না, মি. পিরজ্জাদা কোনও কথাতেই অপমানিত বোধ করবেন। "মি. পিরজ্জাদা বাঙালি, কিন্তু তিনি মুসলমান," বাবা আমাকে বোঝালেন। "তাই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে থাকেন, ভারতে নয়।" তাঁর আঙুল অতলান্তিকের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল। ইউরোপ, মেডিটেরানিয়ান, মিডল ইস্ট এবং অবশেষে সেই ছড়িয়ে থাকা কমলা রঙের হিরেটা। মা বলেছিলেন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা দেখে মনে হয় যেন কোনও শাড়ি পরা মহিলা বাঁ হাতটা বাড়িয়ে আছে। আমার মা বাবার সফর বোঝানোর জন্য অনেকগুলো শহরের চারপাশে গোল করে দাগ দেওয়া ছিল। সেই শহরগুলো একটা লাইন দিয়ে জোড়া। এবং তাঁদের জন্মস্থান কলকাতা একটা ছোট তারা দিয়ে চিহ্নিত ছিল। আমি সেখানে শুধু একবারই গিয়েছিলাম। সেই যাত্রার কোনও স্মৃতি ছিল না আমার। "দেখছিস লিলিয়া, ওটা একটা আলাদা দেশ, আলাদা রং," বাবা বললেন। পাকিস্তানের রং কমলা নয়, হলুদ। আমি লক্ষ করলাম যে, দেশটার দুটো আলাদা অংশ আছে। একটা অন্যটার চেয়ে অনেক বড়। ভারতের এক বিস্তৃত অংশ দিয়ে দুটো ভাগ করা। আমেরিকার থেকে আলাদা হয়ে, ক্যালিফর্নিয়া আর কানেকটিকাট দিয়ে একটা দেশ তৈরি হলে যেমন হয়, তেমন।

বাবা তাঁর আঙুলের গাঁট দিয়ে আমার মাথায় টোকা মারলেন। "তুই নিশ্চয়ই বর্তমান পরিস্থিতি জানিস? জানিস তো যে পূর্ব পাকিস্তান সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য লড়াই করছে?"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম যদিও আমি কিছুই জানতাম না।

আমরা রান্নাঘরে ফিরে এলাম। মা একটা ঝাঁঝরি দিয়ে এক হাঁড়ি সেদ্ধ ভাত থেকে জল ঝরাচ্ছিলেন। বাবা কাউন্টারের ওপরের ক্যানটা খুলে আরও কাজু খেতে খেতে চশমার ফ্রেমের ওপর দিয়ে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। "তোকে স্কুলে ঠিক কী পড়ায় বল তো? ইতিহাস পড়িস? ভূগোল?"

"লিলিয়ার স্কুলে অনেক কিছুই পড়ায়," মা বললেন। "আমরা এখন এখানেই থাকি। ও তো এখানেই জন্মেছে।" মা'র কথা শুনে মনে হল তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব গর্বিত, যেন সেটা আমার কোনও ব্যক্তিগত গুণ। আমি জানতাম যে, তাঁর ধারণা অনুযায়ী, আমার জন্য এক নিরাপদ সহজ জীবন, ভাল শিক্ষাদীক্ষা এবং সব রকমের সুযোগ নিশ্চিত ছিল। আমাকে কখনও রেশনের খাবার খেতে হবে না, কারফিউ মানতে হবে না, ছাদে দাঁড়িয়ে কোনও দাঙ্গার সাক্ষী হতে হবে না বা কোনও পড়শিকে গুলি খেয়ে মরা থেকে বাঁচানোর জন্য জলের ট্যাঙ্কে লুকিয়ে রাখতে হবে না, যেমন তাঁদের করতে হয়েছিল। "একবার ভাবো, ওকে একটা ভদ্রসভ্য স্কুলে ভরতি করা, লোডশেডিং হলে কেরোসিনের লণ্ঠনের আলোয় পড়তে বসানো।

AMARBOI.COM

পড়ার চাপ, টিউটর, একের পর এক পরীক্ষা," মা তাঁর ব্যাঙ্ক টেলারের কাজের উপযোগী ছাঁটা চুলের মধ্যে দিয়ে হাত চালালেন। "তুমি কী করে আশা করো যে ও পার্টিশন সম্পর্কে জানবে। বাদামগুলো রাখো এবার।"

"কিন্তু ও পৃথিবীর সম্পর্কে কী শিখছে?" বাবা কাজুর কৌটোটা হাতে ঝাঁকিয়ে বললেন। "কী শিখছে ও?"

বলাবাহুল্য, আমরা আমেরিকার ইতিহাস শিখতাম এবং আমেরিকার ভূগোল। সে বছর এবং মনে হত যেন প্রতি বছরই, আমরা রেভলিউশনারি ওয়ার দিয়ে পড়াশোনা শুরু করতাম। স্কুলবাসে চেপে আমাদের প্লাইমাউথ রক দেখতে, ফ্রিডম ট্রেল-এর ওপর হাঁটতে এবং বাঙ্কার হিল মনুমেন্ট-এর ওপর চড়তে নিয়ে যাওয়া হত। রঙিন কাগজ দিয়ে মডেল তৈরি করতাম, জর্জ ওয়াশিংটন ডেলাওয়্যার নদীর উত্তাল জল পার হচ্ছেন। সাদা রঙের টাইট্স এবং কালো রঙের বো পরা কিং জর্জের পুতুল তৈরি করতাম। পরীক্ষার সময় আমাদের তেরোটি কলোনির ফাঁকা ম্যাপ দিয়ে নাম, তারিখ এবং রাজধানী লিখতে বলা হত। আমি চোখ বুজে ওই কাজগুলো করতে পারতাম।

AMARBOI.COM

পরের দিন সন্ধেবেলা, মি. পিরজ্জাদা নিয়মমতো ছ'টার সময় আমাদের বাড়ি এলেন। অনেকদিনের পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এবং আমার বাবা দেখা হওয়ার সময় হাত মেলানোর অভ্যেসটা ছাড়তে পারেননি।

"আসুন। লিলিয়া, মি. পিরজ্জাদার কোটটা নাও।"

নিখুঁত সুট, স্কার্ফ এবং কলারে সিল্কের টাই পরিহিত মি. পিরজ্জাদা সামনের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। প্রতিদিন তিনি প্লাম, অলিভ এবং চকোলেট ব্রাউন রঙের সাজে উপস্থিত হতেন। পিরজ্জাদা ছিলেন একজন পরিপাটি মানুষ। যদিও তাঁর দুটো পা বাইরের দিকে ছড়িয়ে থাকত এবং একটু ভুঁড়ি ছিল, তাও তিনি বেশ একটা কর্মদক্ষ ভঙ্গি বজায় রাখতেন, যেন দু'হাতে দুটো সমান ওজনের সুটকেস ধরে আছেন। তাঁর কানে কয়েকটি চুলের গোছা পেকে গিয়েছিল। দেখে মনে হত, সেগুলো জীবনের অপ্রীতিকর শব্দ থেকে তাঁর কান ঢেকে রেখেছে। তাঁর ঘন পলকওয়ালা চোখে ছিল ধূসরের ছোঁয়া। হৃষ্টপুষ্ট গোঁফটি যেন মজা করে দু'পাশে উঠে আছে আর, বাঁ গালের ঠিক মধ্যিখানে একটা চ্যাপটা কিশমিশের মতো জড়ুল। মাথায় পারসি ভেড়াদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোম থেকে বানানো একটি কালো রঙের ফেজটুপি পরতেন। ববি পিন দিয়ে আটকানো এই টুপিটি ছাড়া আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। আমার বাবা সবসময়ই তাঁকে আমাদের গাড়ি করে নিয়ে আসার প্রস্তাব দিতেন, কিন্তু তিনি ভার্মিটারি থেকে আমাদের পাড়ার গাছপালা, ঝোপঝাড় দেখতে দেখতে হেঁটে আসাই বেশি পছন্দ করতেন। পায়ে হেঁটে মিনিট কুড়ির পথ ছিল। তিনি যখন এসে পৌঁছোতেন, তখন হেমন্তের তাজা হাওয়ায় তাঁর আঙুলের গাঁটগুলো গোলাপি হয়ে যেত।

"তারপরে আরও এক উদ্বাস্তু।"

"শেষ যা গোনা হয়েছে, তাতে আন্দাজ ন'মিলিয়ন দাঁড়িয়েছে," আমার বাবা বললেন।

মি. পিরজাদা আমাকে তাঁর কোটটা দিলেন। আমার কাজ ছিল সিঁড়ির নীচের র‍্যাকে সেটা ঝুলিয়ে রাখা। ধূসর আর নীল রঙের উল দিয়ে ছোট ছোট চেক কাটা, কোটটায় ডোরাকাটা লাইনিং এবং শিং-এর বোতাম লাগানো। বুনটের মধ্যে লেবুর হালকা গন্ধ থাকত। ভিতরে চেনার মতো কোনও লেবেল লাগানো ছিল না। শুধু হাতে সেলাই করা একটা লেবেলে টানা টানা হাতের লেখায় চকচকে কালো সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারি করা ছিল 'হেড সৈয়দ, সুটর্স'। কোনও কোনও দিন বার্চ বা মেপল গাছের একটা পাতা পকেটে ঢোকানো থাকত। তিনি জুতোর ফিতে খুলে জুতোজোড়া বেসবোর্ডের গায়ে হেলান দিয়ে রাখলেন। আমাদের ভিজে, পাতাঝরা লনের ওপর দিয়ে হাঁটায় তাঁর জুতোর ডগায় এবং গোড়ায় এক ধরনের সোনালি কাদাটে মিশ্রণ লেগে ছিল। এইসব পোশাকআশাক থেকে মুক্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর বেঁটে, অস্থির আঙুলগুলো আমার গলায় চাপড়ে দিলেন, ঠিক যেমনভাবে কেউ দেওয়ালে পেরেক গাঁথার আগে সেই জায়গাটা চাপড়ে দেখে নেয় সেটা নিরেট কি না। তারপর তিনি বাবার পিছন পিছন বসবার ঘরে ঢুকলেন। সেখানে টিভিতে স্থানীয় খবর চালানো ছিল। তাঁরা বসার সঙ্গে সঙ্গে মা রান্নাঘর থেকে এক প্লেট কিমার কাবাব আর ধনেপাতার চাটনি নিয়ে আসলেন। মি. পিরজাদা একটা নিয়ে মুখে পুরলেন।

"আমরা শুধুমাত্র আশা করতে পারি যে," আর-একটা কাবাবের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, "ঢাকার রিফিউজিরাও এত ভাল খেতে পায়। এই কথা থেকে মনে পড়ে গেল।" তিনি সুটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে

AMARBOI.COM

দারচিনির হার্ট ভরতি একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের ডিম বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "বাড়ির 'লেডি'র জন্য"। তার সঙ্গে ওই ছড়ানো পায়ে প্রায় বোঝাই যায় না এমনভাবে সামান্য ঝুঁকে আমাকে 'বাও' করলেন।

"সত্যি মি. পিরজ্জাদা," মা আপত্তি জানালেন। "রাতের পর রাত। আপনি ওকে বিগড়ে দিচ্ছেন একেবারে।"

"আমি শুধু সেই বাচ্চাদেরই বিগড়ে দিই, যারা বিগড়ে যেতে পারে না।"

আমার কাছে সেটা ছিল একটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে আমি এই মুহূর্তর জন্য অপেক্ষা করতাম। মি. পিরজ্জাদার হৃষ্টপুষ্ট, দরাজ আভিজাত্য আমাকে মুগ্ধ করত, আমার প্রতি তাঁর মনোযোগে যে আধা-নাটকীয়তা ছিল, তাতে আমি তৃপ্ত বোধ করতাম, কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গিতে যে চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলত। মুহূর্তের জন্য মনে হত যেন, আমি নিজের বাড়িতেই আগন্তুক। আমাকে কিছু দেওয়াটা তাঁর একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক সপ্তাহ ধরে, পরস্পরের সঙ্গে আরও সহজ হওয়ার আগে ওটাই একমাত্র উপলক্ষ ছিল, যখন তিনি আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতেন। আমার কোনও উত্তর ছিল না। কোনও মন্তব্য করতাম না আমি। ভাবলেশহীন মুখে আমি তাঁর কাছ থেকে মধুভরা লজেন্স, র‍্যাম্পবেরি ট্রাফল, টক প্লাস্টিলের সরু সরু রোল গ্রহণ করে যেতাম। আমি তাঁকে ধন্যবাদও জানাতে পারতাম না। কারণ, একবার বেগুনি সেলোফেনে মোড়া বিশেষভাবে লোভনীয় পিপারমেন্ট ললিপপ পাওয়ার জন্য আমি যখন তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, "ধন্যবাদ আবার কীসের? ব্যাঙ্কের ভদ্রমহিলা আমাকে ধন্যবাদ জানান, দোকানের ক্যাশিয়ার আমাকে ধন্যবাদ জানান, নির্ধারিত তারিখের পর বই ফেরত দিলে লাইব্রেরিয়ান আমাকে ধন্যবাদ জানান, ঢাকায় আমার ফোনটা লাগানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে ওভারসিস অপারেটর আমাকে ধন্যবাদ জানান। আমাকে যদি এই দেশে সমাধিস্থ করা হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ও আমাকে ধন্যবাদ জানানো হবে।"

মি. পিরজ্জাদার দেওয়া মিষ্টিটা যেমন তেমন ভাবে খাওয়া আমার অশোভন মনে হত। প্রতিটি সন্ধের উপহারের মূল্য আমার কাছে ধনরত্ন বা গুপ্তধনের একটি রত্ন বা মুদ্রার মতোই ছিল। আমি সেটি আমার খাটের পাশে একটি কারুকার্য করা ছোট চন্দনকাঠের বাক্সে রাখতাম। বহু বছর আগে

AMARBOI.COM

আমার ঠাকুরমা ওই বাক্সে চানের পর খাওয়ার জন্য সুপারি রাখতেন। যে ঠাকুরমাকে আমি কোনওদিন দেখিনি, আমার কাছে সেই ঠাকুরমার একমাত্র চিহ্ন ছিল সেই বাক্সটি। মি. পিরজাদা আমাদের জীবনে আসার আগে পর্যন্ত আমি ওই বাক্সে রাখার মতো কিছুই খুঁজে পেতাম না। মাঝে মাঝেই দাঁত মাজার এবং পরের দিনের জন্য স্কুলের জামাকাপড় বের করে রাখার আগে আমি বাক্সের ঢাকনা খুলে তাঁর দেওয়া মিষ্টিগুলোর মধ্যে একটি খেতাম।

রোজ রাতের মতো সেই রাতেও আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে খেলাম না। কারণ টেবিলে বসে ভাল করে টিভি দেখা যেত না। তাই আমরা বাকালাপ ছাড়াই, কফি টেবিলের চারপাশে, হাঁটুর ওপর খাবার প্লেট রেখে জড়ো হয়ে বসলাম। মা রান্নাঘর থেকে একের পর এক খাবার আনলেন। ভাজা পেঁয়াজ দেওয়া মুসুরডাল, নারকেল দেওয়া সবুজ বিন, দই-কিশমিশ দেওয়া মাছ। জলের গেলাস, প্লেটভরতি লেবুর টুকরো এবং লঙ্কা নিয়ে আমি তাঁর পিছন পিছন এলাম। শেষের বস্তুটি প্রতি মাসে চায়নাটাউনে গিয়ে পাইকারদরে কেনা হত এবং ফ্রিজে জমিয়ে রাখা হত। বড়রা সেগুলো ছিঁড়ে, আচারে মেখে খেতে ভালবাসতেন।

খাওয়ার আগে মি. পিরজাদা সবসময় এক অদ্ভুত কাজ করতেন। শার্টপকেট থেকে একটা ব্যান্ডহীন, সাদাসিধে রুপোর ঘড়ি বের করতেন, কয়েক মুহূর্তের জন্য সেটি কানের কাছে ধরতেন এবং তারপর তর্জনী এবং বুড়ো আঙুলের তিনটে দ্রুত টোকায় ঘড়িটায় দম দিতেন। তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, তাঁর পকেটঘড়িটা তাঁর রিস্টওয়াচের মতো নয়। সেটা ঢাকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী ঠিক করা আছে। আমাদের সময়ের চেয়ে ১১ ঘণ্টা এগিয়ে। খাওয়ার সময় ঘড়িটা কফি টেবিলে, তাঁর মুড়ে রাখা কাগজের ন্যাপকিনের ওপর রাখা থাকত। তিনি কখনও ঘড়িটা দেখতেন বলে মনে হত না।

মি. পিরজাদা ভারতীয় নন, এটা জানতে পারার পর আমি তাঁকে ভালভাবে লক্ষ করতাম। কোন দিক দিয়ে তিনি আমাদের চেয়ে আলাদা, তা বোঝবার চেষ্টা করতাম। মনে হল যে, পকেটঘড়িটা তেমনই একটা জিনিস। সে রাতে, তাঁকে সেটি দম দিয়ে কফিটেবিলের ওপর রাখতে দেখে আমার কেমন অস্বস্তি হল। উপলব্ধি করলাম যে, জীবনটা আগে ঢাকায় প্রবাহিত হচ্ছে। কল্পনা করলাম, মি. পিরজাদার মেয়েরা ঘুম থেকে উঠছে, চুলে ফিতে

AMARBOI.COM

বাঁধছে, প্রাতরাশের তোড়জোড় করছে, স্কুলের জন্য তৈরি হচ্ছে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া, আমাদের কাজকর্ম সবই সেখানে আগেই ঘটে যাওয়া কাজকর্মের ছায়ামাত্র। মি. পিরজ়াদা আদতে যেখানকার মানুষ, সেই জায়গাটির এক পিছিয়ে পড়া ছায়া।

সাড়ে ছ'টা জাতীয় খবরের সময়। বাবা ভলিউম বাড়িয়ে অ্যান্টেনাগুলো ঠিক করে দিতেন। আমি সাধারণত কোনও বই নিয়ে বসতাম, কিন্তু সে রাতে বাবা বললেন আমার মন দিয়ে খবরটা শোনা উচিত। দেখলাম ধুলোয় ঢাকা রাস্তার ওপরে ট্যাঙ্ক গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছে, কত বিল্ডিং ধসে পড়েছে, অচেনা গাছের জঙ্গলে পূর্ব পাকিস্তানের রিফিউজিরা পালিয়ে ভারতের সীমান্তে আশ্রয় খুঁজছে। পাখার মতো পালতোলা নৌকো প্রশস্ত কফি রঙের নদীতে ভেসে যাচ্ছে, কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা পড়েছে ব্যারিকেডের পিছনে, খবরের কাগজের অফিস পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি মি. পিরজ়াদার দিকে তাকালাম। ছবিগুলো ছোট্ট হয়ে একের পর এক তাঁর চোখের ওপরেও ভেসে উঠছিল। দেখার সময় তাঁর মুখে এক অচঞ্চল ভাব ছিল। অবিচলিত, কিন্তু সজাগ। যেন কেউ তাঁকে অচেনা কোনও জায়গায় পৌঁছোনোর নির্দেশ দিচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের বিরতির সময় আরও ভাত আনতে মা রান্নাঘরে গেলেন। বাবা এবং মি. পিরজ়াদা ইয়াহিয়াহ খান নামে কোনও জেনারেলের নীতির নিন্দে শুরু করলেন। তাঁরা যেসব চক্রান্তের আলোচনা করছিলেন, আমি সে-সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আমি সেই বিপর্যয়ের কিছুই বুঝছিলাম না। আমাকে আর-এক টুকরো মাছ দিতে দিতে বাবা বললেন, "দেখ, তোর বয়সি সব ছেলেমেয়ে, বেঁচে থাকার জন্য কী করতে হচ্ছে তাদের।" কিন্তু আমি আর খেতে পারছিলাম না। আমি শুধু আড়চোখে মি. পিরজ়াদার দিকে তাকাচ্ছিলাম। তিনি জলপাই-সবুজ জ্যাকেট গায়ে আমার পাশে বসে শান্তভাবে তাঁর ভাতের স্তূপে দ্বিতীয় হাতা ডালের জন্য কুয়ো তৈরি করছিলেন। ওই ধরনের গুরুগম্ভীর ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষকে যেমন লাগে বলে আমার ধারণা ছিল, তার সঙ্গে মি. পিরজ়াদার মিল ছিল না। আমি ভাবতাম, উনি কি সবসময় অত পরিপাটিভাবে জামাকাপড় পরে থাকেন যাতে আকস্মিক কোনও দুঃসংবাদ পেলে যথোচিত গাম্ভীর্য এবং সম্মানের সঙ্গে তা সহ্য করতে পারেন? এমনকী দরকার পড়লে মুহূর্তের মধ্যে কারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হতে পারেন? আরও ভাবতাম, কেমন হবে, যদি হঠাৎ তাঁর সাত মেয়েকে টিভিতে দেখা যায়? যদি তারা কোনও বারান্দা থেকে মি. পিরজ়াদার দিকে হেসে, হাত নাড়িয়ে চুমু ছুড়ে দেয়? কল্পনা করতাম, তা হলে তিনি কত আশ্বস্ত হবেন। কিন্তু সেরকম কখনও হত না।

সে রাতে যখন আমি দারচিনির হার্টওয়ালা প্লাস্টিকের ডিমটা আমার খাটের পাশে বাক্সে রাখলাম, তখন অন্যদিনের মতো প্রাপ্তির আনন্দ হল না। আমি লেবুর গন্ধওলা ওভারকোট পরা মি. পিরজ়াদার কথা মনে না করার চেষ্টা করছিলাম। কয়েক ঘণ্টা আগে, আমাদের উজ্জ্বল, কার্পেট-বিছানো বসবার ঘরে আমরা যে বিশৃঙ্খল, গরমে ঝলসানো জগতের ছবি দেখছিলাম, তার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে আমি ওই কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারলাম না। টিভির পরদায় মাঝে মাঝেই যে তাড়িত, অশান্ত মানুষের দল দেখা যাচ্ছিল, মি. পিরজ়াদার স্ত্রী এবং সাত মেয়ে তেমন কোনও দলের সদস্য, এই দুর্ভাবনায় আমার পেটের ভিতর কীরকম করছিল। ছবিটা মন থেকে তাড়ানোর জন্য আমি ঘরের চারপাশে তাকালাম। হলুদ চাদর দেওয়া আমার বিছানা, তার সঙ্গে রং মিলিয়ে জালি দেওয়া পরদা, সাদা-বেগুনি কাগজ লাগানো দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে সাঁটা ক্লাসের ছবি, দেওয়াল-আলমারির দরজার ওপর পেনসিলের লেখা, যেখানে বাবা প্রতি জন্মদিনে আমার উচ্চতা মাপেন। কিন্তু যতই আমি নিজের মনটাকে অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করলাম, ততই আমি নিজেকে বোঝাতে থাকলাম যে, মি. পিরজ়াদার স্ত্রী-কন্যারা হয়তো মারাই গিয়েছেন। শেষে আমি বাক্স থেকে এক টুকরো চৌকো সাদা চকোলেট বের করে, মোড়ক খুললাম। তারপর আমি এমন একটা কাজ করলাম, যা আগে কখনও করিনি। চকোলেটটা মুখে পুরে, সেটা মুখে রেখে যথাসম্ভব গলে যেতে দিলাম। তারপর আস্তে আস্তে সেটা চিবোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করলাম যে, মি. পিরজ়াদার পরিবার যেন নিরাপদে সুস্থ থাকে। আমি এর আগে কখনও কিছুর জন্য প্রার্থনা করিনি। আমাকে কখনও প্রার্থনা করতে বলা বা শেখানোও হয়নি। কিন্তু আমি ঠিক করলাম যে, সেই পরিস্থিতিতে আমার প্রার্থনা করা উচিত। সে রাতে বাথরুমে গিয়ে আমি শুধু দাঁত মাজার ভান করলাম। কারণ, আমার ভয় হচ্ছিল, সত্যি সত্যি দাঁত মাজলে হয়তো তার সঙ্গে আমার প্রার্থনাও ধুয়ে যাবে। আমি ব্রাশটা ভিজিয়ে, টুথপেস্টের টিউবটা

AMARBOI.COM

একটু সরিয়ে রাখলাম যাতে আমার মা বাবা কোনও প্রশ্ন না করেন। তারপর জিভে চিনি লেগে থাকা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

যে যুদ্ধের বৃত্তান্ত আমাদের বসবার ঘরে এত বিশ্বস্তভাবে শোনা হত, সেই যুদ্ধ নিয়ে আমাদের স্কুলে কোনও কথা হত না। আমরা আমেরিকান বিদ্রোহ নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম। প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর মকুব করা কত অন্যায় তা শিখলাম এবং ডিক্লেয়ারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স-এর কয়েকটি অংশ মুখস্থ করলাম। টিফিন টাইমে ছেলেরা দু'দলে ভাগ হয়ে দোলনা, ঢেঁকির চারদিকে পরস্পরকে তাড়া করে বেড়াত। একপক্ষে লালকোট, বিপক্ষে কলোনি। ক্লাসরুমে আমাদের শিক্ষিকা মিসেস কেনিয়ন মাঝে মাঝেই আমাদের একটা ম্যাপ দেখাতেন। সিনেমার পরদার মতো মানচিত্রটা চকবোর্ডের ওপর থেকে বেরিয়ে আসত, মিসেস কেনিয়ন আমাদের 'মে-ফ্লাওয়ারের' যাত্রাপথ বা লিবার্টি বেল কোথায় অবস্থিত দেখাতেন। প্রতি সপ্তাহে ক্লাসের দু'জন সদস্য রেভলিউশন-এর কোনও একটি বিশেষত্বের ওপর রিপোর্ট পেশ করত। তাই একদিন, ইয়র্কটাউনে আত্মসমর্পণের অধ্যায় সম্পর্কে শেখার জন্য আমার বন্ধু ডোরার সঙ্গে স্কুলের লাইব্রেরিতে পাঠানো হল। মিসেস কেনিয়ন আমাদের একটা কাগজে তিনটে বইয়ের নাম লিখে দিলেন যেগুলো কার্ড ক্যাটালগে খুঁজে বের করতে হবে। আমরা বইগুলো একবারেই খুঁজে পেলাম; পড়ে নোটস নেওয়ার জন্য একটা নিচু গোল টেবিলে বসলাম। কিন্তু আমি পড়ায় মন দিতে পারছিলাম না। ব্লন্ডউডের তাকগুলোর যে অংশে আমি 'এশিয়া' লেখা লেবেল দেখেছিলাম সেখানে ফিরে গেলাম। চিন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া সম্পর্কে বই রয়েছে সেখানে। শেষে 'পাকিস্তান: আ ল্যান্ড অ্যান্ড ইটস পিপল' নামে একটা বই দেখে একটা টুলে বসে বইটা খুললাম। বইয়ের মলাটটা আমার আঙুলের ভিতর খসখস করে উঠল। নদী, ধানখেত, সৈন্যর পোশাক-পরা লোকদের ছবিওয়ালা পাতাগুলো ওলটাতে শুরু করলাম। একটা অধ্যায় ঢাকা নিয়ে লেখা। আমি ঢাকার বৃষ্টিপাত আর চটের উৎপাদন সম্পর্কে পড়তে শুরু করলাম। জনসংখ্যার ওপর একটা চার্ট পড়ছিলাম, এমন সময় ডোরা এসে দাঁড়াল।

"এখানে কী করছিস? মিসেস কেনিয়ন লাইব্রেরিতে এসেছেন। আমরা ঠিক করে পড়ছি কি না দেখতে এসেছেন।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চটাস করে বইটা বন্ধ করলাম। শব্দটা একটু বেশি জোরেই হয়ে গেল। মিসেস কেনিয়ন এলেন। তাকের মাঝখানের সরু চলাচল-পথটা তাঁর পারফিউমের সুবাসে ভরে গেল। তিনি তাঁর আঙুলের ডগা দিয়ে বইটার পুট (স্পাইন) ধরে এমনভাবে তুললেন যেন আমার সোয়েটারে লেগে থাকা কোনও চুল তুলছেন। মলাটটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তারপর আমার দিকে তাকালেন।

"এই বইটা কি তোমার রিপোর্টে কাজে লাগবে, লিলিয়া?"

"না, মিসেস কেনিয়ন।"

"তা হলে আমি বইটা পড়ার কোনও কারণ দেখছি না," তিনি বইটা তাকের সরু ফাঁকে রেখে দিয়ে বললেন। "তুমি কি দেখছ?"

গত সপ্তাহ যেতে লাগল, খবরে ঢাকার কোনও ছবি দেখতে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। প্রথম বা কখনও দ্বিতীয় বিরতির পর রিপোর্ট পাওয়া যেত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে, সাংবাদিকদের সরিয়ে, আটকে, অন্য পথে চালিত করা হচ্ছিল। কোনও কোনও দিন, প্রায়দিনই, শুধু মৃতের সংখ্যা জানানো হত। আর তার আগের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি। আরও কয়েকজন কবিকে মেরে ফেলা হয়েছিল, আরও কয়েকটি গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতসব হওয়া সত্ত্বেও, মা-বাবা এবং মি. পিরজ়াদা রাতের পর রাত সময় নিয়ে, ধীরে সুস্থে রাতের খাবার খেতেন। টিভি বন্ধ করার পর, থালাবাসন ধুয়ে শুকোনো হয়ে গেলে, তাঁরা মজা করতেন, গল্প করতেন এবং চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খেতেন। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা একঘেয়ে হয়ে গেলে আলোচনার বিষয় ছিল, নিউ ইংল্যান্ডের পর্ণমোচী বৃক্ষ সম্পর্কে মি. পিরজ়াদার বই কদ্দুর এগোল, আমার বাবার কার্যকালের মেয়াদের মনোনয়ন বা মায়ের ব্যাংকের আমেরিকান সহকর্মীদের খাওয়া-সংক্রান্ত অদ্ভুত অভ্যেস ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পর আমাকে হোমওয়ার্ক করার জন্য ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হত, কিন্তু কার্পেটের মধ্যে দিয়ে আমি শুনতে পেতাম যে তাঁরা আরও চা খাচ্ছেন, ক্যাসেটে কিশোরকুমারের গান শুনছেন, কফি টেবিলের ওপর স্ক্র্যাবল খেলছেন, গভীর রাত পর্যন্ত ইংরেজি শব্দের বানান নিয়ে তর্কাতর্কি, হাসাহাসি করছেন। আমি ওঁদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইতাম। সবচেয়ে বেশি ইচ্ছে করত মি. পিরজ়াদাকে কোনওমতে সান্ত্বনা জানাতে। কিন্তু তাঁর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারের কথা ভেবে এক টুকরো চকোলেট খাওয়া এবং নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না। তাঁরা এগারোটার খবর শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত স্ক্র্যাবল খেলতেন। তারপর মাঝরাত নাগাদ মি. পিরজ়াদা হেঁটে তাঁর ডর্মিটরিতে ফিরে যেতেন। সেইজন্য আমি কখনও তাঁকে চলে যেতে দেখিনি, কিন্তু রোজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমি তিনজনের কথাবার্তা শুনতে পেতাম। পৃথিবীর অপর প্রান্তে এক নতুন দেশের জন্মের সম্ভাবনার কথা।

অক্টোবর মাসে একদিন মি. পিরজ়াদা এসে জিজ্ঞেস করলেন, "সব বাড়ির দরজায় ওই বড় বড় কমলা রঙের সবজিগুলো কী? কোনও ধরনের লাউ নাকি?"

"ওটা কুমড়ো," মা বললেন। "লিলিয়া, মনে করিয়ে দিস তো সুপারমার্কেট থেকে একটা কিনতে হবে।"

"ওটা দিয়ে কী করে? এটা কীসের চিহ্ন?"

"এটা দিয়ে জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন বানায়," আমি জানালাম। বোঝানোর জন্য দাঁত খিঁচিয়ে একটা হিংস্র হাসি হাসলাম। "এভাবে। সকলকে ভয় পাওয়ানোর জন্য।"

"বুঝলাম," মি. পিরজ়াদা প্রত্যুত্তরে হাসলেন। "খুবই উপকারী মনে হচ্ছে।"

পরের দিন মা একটা দশ পাউন্ডের মোটাসোটা, গোলগাল কুমড়ো কিনলেন। সেটা ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা হল। খাওয়ার আগে, যখন বাবা এবং মি. পিরজ়াদা স্থানীয় খবর দেখছিলেন, তখন মা আমাকে বললেন পেন দিয়ে ফলটা সাজাতে। কিন্তু আমি পাড়ায় যেমন দেখেছিলাম, সেভাবে ওটাকে কেটে সাজাতে চাইছিলাম।

"হ্যাঁ, চলো, ওটাকে কেটে সাজানো যাক," মি. পিরজ়াদা সোফা থেকে উঠলেন। "আজ খবর চুলোয় যাক।" কিছু জিজ্ঞেস না করে তিনি রান্নাঘরে গেলেন, একটা ড্রয়ার খুললেন, তারপর একটা লম্বা খাঁজকাটা ছুরি নিয়ে ফিরে এলেন। সম্মতির জন্য তিনি আমার দিকে তাকালেন। "আমি করি?"

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। সেই প্রথমবার আমরা সকলে ডাইনিং টেবিলের চারপাশে জড়ো হলাম। মা, বাবা, মি. পিরজ়াদা এবং আমি। টিভি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলা সত্ত্বেও কেউ আর ওদিকে মন দিল না। আমরা খবরের কাগজ দিয়ে টেবিলটা ঢাকলাম। মি. পিরজ্জাদা তাঁর জ্যাকেটটা খুলে একটা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে উপল পাথরের এক জোড়া কাফলিঙ্ক খুলে রেখে তাঁর মাড় দেওয়া শার্টের হাতাগুলো গুটিয়ে নিলেন।

"প্রথমে ওপরদিকটা কাটুন। এভাবে," আমি তর্জনী ঘুরিয়ে কায়দাটা দেখিয়ে নির্দেশ দিলাম।

মি. পিরজ্জাদা প্রথমে ছুরিটা ফলের গায়ে ঢুকিয়ে সেটাকে চারপাশে ঘোরালেন। একটা গোটা বৃত্ত কাটা হয়ে যাওয়ার পর তিনি ওপরের ঢাকার মতো অংশটা বোঁটা ধরে তুললেন। সেটা খুব সহজেই আলগা হয়ে উঠে আসল। এক মুহূর্তের জন্য মি. পিরজ্জাদা ফলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে ভিতরটা দেখলেন এবং শ্বাস ভরে গন্ধটা নিলেন। তারপর মা তাঁকে একটা লম্বা ধাতব চামচ দেওয়াতে সেটা দিয়ে ভিতরের অংশটা পরিষ্কার করে চেঁছে বের করলেন যতক্ষণ না শেষ সুতো, শেষ বীজটাও বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে বাবা শাঁস থেকে বীজ বাদ দিয়ে একটা বিস্কুট করার শিট-এর ওপর শুকোতে দিয়েছিলেন, যাতে পরে আমরা সেগুলো ঝালসে খেতে পারি। ফলটার দাগকাটা গায়ে আমি দুটো ত্রিভুজ আঁকলাম। মি. পিরজ্জাদা সে দুটো কেটে দিলেন। তারপর আমি ভুরুর জন্য দুটো অর্ধচন্দ্রাকার এবং নাকের জন্য আর একটা ত্রিভুজ আঁকলাম। শুধু মুখটাই বাকি ছিল। মনে হল দাঁত তৈরি করাটা একটু কঠিন হবে, আমি ইতস্তত করছিলাম।

"হাসবে, নাকি মুখ বেঁকিয়ে থাকবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমিই বলো," মি. পিরজ্জাদা বললেন।

সমঝোতা করার জন্য আমি একটা সোজাসাপটা গম্ভীর মতো মুখ আঁকলাম, বিষণ্ণও নয়, হাসি-হাসিও নয়। মি. পিরজ্জাদা একটুও না দমে গিয়ে কাটতে শুরু করলেন, যেন তিনি সারাজীবন জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন কেটে এসেছেন। তাঁর কাজ প্রায় শেষ হয়েই গিয়েছিল যখন জাতীয় খবর শুরু হল। সাংবাদিক ঢাকার নাম উল্লেখ করলেন এবং আমরা সকলেই শোনার জন্য টিভির দিকে ফিরলাম। একজন ভারতীয় কর্মকর্তা ঘোষণা করলেন যে, বাকি পৃথিবী যদি পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দেয়, তা হলে ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। খবরটা শোনানোর সময় সাংবাদিকটির মুখ থেকে ঘাম ঝরে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ছিল। কোনও টাই বা জ্যাকেট ছাড়াই এমন জামাকাপড় পরেছিলেন যেন, তিনি নিজেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ক্যামেরাম্যানকে চিৎকার করে কথাগুলো বলার সময় তিনি তাঁর রোদে পোড়া মুখটা সূর্যের তাপ থেকে বাঁচানোর জন্য হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। মি. পিরজ্জাদার হাত থেকে ছুরিটা ফসকে পড়ে গিয়ে কুমড়োটার নীচের দিকটা কেটে গেল।

"প্লিজ আমাকে ক্ষমা করবেন," মি. পিরজ্জাদা তাঁর মুখের একপাশে একটা হাত তুললেন, যেন কেউ তাঁকে সেই গালে থাপ্পড় মেরেছে। "আমি— এ তো ভয়ংকর ব্যাপার। আমি আর-একটা কিনে দেব। আমরা আবার চেষ্টা করব।"

"আরে না, না," বাবা বললেন। তিনি মি. পিরজ্জাদার হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে ফলটা এমনভাবে কাটলেন যাতে ভুলটা ঢাকা পড়ে যায়। আমার আঁকা দাঁতগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। তার জায়গায় একটা বেখাপ্পা রকমের বড় পাতিলেবুর মাপের ফুটো তৈরি হল এবং তার ফলে আমাদের জ্যাক-ও-ল্যান্টার্নের মুখে এক শান্ত স্তম্ভিত ভাব এসে গেল। ভুরুগুলো আর রাগী রাগী দেখতে রইল না। বরং এক শূন্য জ্যামিতিক দৃষ্টির ওপর বিস্ময়ে স্থির হয়ে ভাসতে থাকল।

AMARBOI.COM

হ্যালোউইনে আমি ডাইনি সেজেছিলাম। আমার ট্রিক-অর-ট্রিট-এর সঙ্গী ডোরাও ডাইনি হয়েছিল। বালিশের ওয়াড় রং করে আমরা কালো কেপ (হাতকাটা ক্লোক) বানিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে কার্ডবোর্ডের চওড়া কানাওয়ালা আইসক্রিম কোনের মতো টুপি। ডোরার মায়ের একটা ভাঙা আইশ্যাডো দিয়ে আমরা আমাদের মুখে সবুজ রং লাগালাম। আমার মা লজেন্স রাখার জন্য আমাদের দুটো মোটা ক্যানভাসের বস্তা দিলেন, যার মধ্যে একসময় বাসমতী চাল ছিল। সে বছর আমাদের মা-বাবাদের মনে হয়েছিল যে, আমরা একা একা পাড়ায় ঘুরে বেড়ানোর জন্য যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েছি। কথা ছিল আমি আমাদের বাড়ি থেকে ডোরার বাড়ি হেঁটে যাব, সেখান থেকে ফোন করে জানাব যে আমি নিরাপদে পৌঁছেছি এবং তারপর ডোরার মা আমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। বাবা আমাদের টর্চ দিলেন। আমাকে ঘড়ি পরতে হল এবং তাঁর ঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে নিতে হল। আমাদের ন'টার চেয়ে বেশি দেরি করার অনুমতি ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সন্ধেয় মি. পিরজাদা এসে আমাকে এক বাক্স মিন্ট ভরতি চকোলেট দিলেন।

"এর মধ্যে," আমি বস্তাটা খুলে ধরে বললাম। "ট্রিক অর ট্রিট।"

"বুঝতে পেরেছি যে, আজ তোমার আমার উপহারের অত দরকার নেই," বাক্সটা জমা দিয়ে তিনি বললেন। মি. পিরজাদা আমার সবুজ মুখ এবং টুপির দিকে তাকালেন। টুপিটা একটা সুতো দিয়ে আমার চিবুকের তলায় বাঁধা ছিল। খুব সাবধানে তিনি আমার কেপটার প্রান্ত একটু তুলে ধরলেন। আমি কেপের নীচে একটা সোয়েটার এবং ভেড়ার লোমের চেন দেওয়া জ্যাকেট পরেছিলাম। "তোমার শীত করবে না তো?"

আমি ঘাড় নাড়লাম। টুপিটা একদিকে হেলে গেল।

মি. পিরজাদা টুপিটা সোজা করে দিলেন। "স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই বোধহয় ভাল।"

আমাদের সিঁড়ির নীচটা ছোট ছোট লজেন্সের বাক্সে ভরতি হয়ে ছিল। মি. পিরজাদা জুতো খুলে অন্যদিনের মতো সেখানে না রেখে দেওয়াল আলমারির ভিতর রেখে কোটের বোতাম খুলতে শুরু করলেন। আমি তাঁর কোটটা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু ডোরা বাথরুম থেকে আমাকে ডেকে বলল যে, চিবুকে একটা জড়ুল আঁকার জন্য আমার সাহায্য চাই। আমরা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর মা ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড় করিয়ে আমাদের একটা ফোটো তুললেন। তারপর আমি বেরোব বলে সদর দরজা খুললাম। মি. পিরজাদা এবং আমার বাবা তখনও বসার ঘরে যাননি, সামনের ঘরেই ঘোরাঘুরি করছিলেন। বাইরে আঁধার নেমে এসেছিল। হাওয়ায় ভিজে পাতার গন্ধ। দরজার পাশে ঝোপের সামনে আমাদের জ্যাক ও ল্যান্টার্নটা মিটমিট করে কিন্তু সদর্পে জ্বলছিল। দূর থেকে দ্রুতপায়ে দৌড়োনোর শব্দ, যে বড় ছেলেরা শুধুই একটি করে রাবারের মুখোশ পরে বেরিয়েছিল, তাদের চিৎকার এবং ছোট ছোট বাচ্চাদের জামাকাপড়ের খসখসানি ভেসে এল। কেউ কেউ এত ছোট ছিল যে, মা-বাবারা কোলে করে তাদের দরজায় দরজায় নিয়ে যাচ্ছিলেন।

"যে বাড়িটা চেনো না, সেখানে যেয়ো না যেন," মা সাবধান করলেন।

মি. পিরজাদা ভুরু কোঁচকালেন। "কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে নাকি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না না," মা তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। "সব ছেলেমেয়েই বেরোবে আজকে। এটা তো একটা ঐতিহ্য।"

"আমার বোধহয় ওদের সঙ্গে যাওয়া উচিত?" মি. পিরজ়াদা প্রস্তাব দিলেন। মোজা পরা, ছড়ানো পায়ে দাঁড়ানো দেখে হঠাৎ কেমন ক্লান্ত, ছোটখাটো মনে হল তাঁকে। তাঁর চোখে একটা আতঙ্কের ছাপ দেখলাম, যা আগে কখনও দেখিনি। যথেষ্ট ঠান্ডা সত্ত্বেও আমি আমার বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ঘামতে শুরু করলাম।

"না না মি. পিরজ়াদা," মা বললেন। "লিলিয়া ওর বন্ধুর সঙ্গে একদম নিরাপদ থাকবে।"

"কিন্তু যদি বৃষ্টি পড়ে? যদি ওরা হারিয়ে যায়?"

"চিন্তা করবেন না," আমি বললাম। সেই প্রথমবার আমি ওই কথাগুলো মি. পিরজ়াদাকে বললাম। খুব সামান্য কয়েকটি কথা, কিন্তু যেগুলো সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁকে বলার চেষ্টা করেও পারিনি। শুধু আমার প্রার্থনাতেই বলতে পেরেছিলাম। এবার আমার লজ্জা লাগল ভেবে যে, আমি শুধু নিজের জন্যই কথাগুলো বললাম।

মি. পিরজ়াদা তাঁর একটা মোটাসোটা আঙুল আমার গালে রাখলেন। তারপর আঙুলটা নিজের হাতের পিছনে চেপে ধরলেন। একটা হালকা সবুজ ছাপ পড়ল। "যদি 'লেডি' তাই চান," তিনি মেনে নিলেন। তারপর ছোট্ট করে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের কালো ছুঁচোলো সস্তা জুতো পায়ে অল্প হোঁচট খেতে খেতে এগোলাম। ড্রাইভওয়ের শেষে হাত নাড়ার জন্য ফিরে তাকিয়ে দেখলাম দরজার ফ্রেমের মধ্যে, আমার মা আর বাবার মাঝখানে বেঁটেখাটো মানুষটি দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন।

"ওই লোকটি আমাদের সঙ্গে আসতে চাইছিলেন কেন?" ডোরা জিজ্ঞেস করল।

"ওঁর মেয়েদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার আফশোস হল। মনে হল যেন আমার বলার জন্য কথাটা সত্যি হয়ে গেল, যে মি. পিরজ়াদার মেয়েদের সত্যিই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং তিনি আর কখনও তাদের দেখতে পাবেন না।

"মানে তাদের কি ছেলেধরায় ধরে নিয়ে গিয়েছে?" ডোরা প্রশ্ন করল।

AMARBOI.COM

"পার্ক বা কোনও জায়গা থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে?"

"ঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তা নয়। আমি বলতে চাইছিলাম যে, মেয়েদের কথা ওঁর খুব মনে পড়ে। তারা একটা অন্য দেশে থাকে আর তিনি অনেকদিন তাদের দেখেননি তো, তাই।"

আমরা ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কলিং বেল বাজালাম। কেউ কেউ ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য সব আলো নিভিয়ে রেখেছিলেন। কেউ জানলায় রাবারের বাদুড় ঝুলিয়েছিলেন। ম্যাকিন্টায়ারদের দরজার সামনে একটা কফিন রাখা ছিল। মি. ম্যাকিন্টায়ার চকের গুঁড়ো মাখা মুখে নিঃশব্দে কফিন থেকে উঠে আমাদের বস্তার ভিতর চকোলেটের ক্যান্ডি কর্ন ঢেলে দিলেন। অনেকেই আমাকে বললেন যে, তাঁরা আগে কখনও ভারতীয় ডাইনি দেখেননি। অন্যরা কোনও মন্তব্য না করে যা দেওয়ার দিয়ে দিলেন। টর্চের সমান্তরাল আলোর রেখা ফেলে এগোতে এগোতে আমরা দেখলাম রাস্তার মাঝখানে ফাটা ডিম, শেভিং ক্রিম মাখানো গাড়ি, গাছের ডালে মালার মতো করে ঝোলানো টয়লেট পেপার। যতক্ষণে আমরা ডোরার বাড়ি পৌঁছোলাম, ততক্ষণে ভারী বস্তাগুলো বয়ে আমাদের হাতে দাগ হয়ে গিয়েছে। পা ফুলে ব্যথা করছে। ডোরার মা আমাদের কালশিটের জন্য ব্যান্ডেজ দিলেন, উষ্ণ সিডার এবং ক্যারামেল পপকর্ন খেতে দিলেন। তিনি আমাকে মনে করালেন যে, মা-বাবাকে ফোন করে জানাতে হবে আমি নিরাপদে পৌঁছে গিয়েছি। আমি যখন ফোন করলাম তখন পিছনে টিভির আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার গলা শুনে মা যে খুব আশ্বস্ত হলেন তা মনে হল না। ফোনটা রাখার পর খেয়াল হল যে, ডোরার বাড়িতে টিভি চলছিলই না। ডোরার বাবা সোফায় শুয়ে একটা পত্রিকা পড়ছিলেন। কফি-টেবিলের ওপর এক গেলাস ওয়াইন রাখা ছিল। স্টিরিয়োতে স্যাক্সোফোন সংগীত বাজছিল।

ডোরা আর আমি আমাদের লুট পরীক্ষা করলাম। গোনাগুনি, নমুনা চেখে দেখা, লেনদেন ইত্যাদি করার পর আমরা সন্তুষ্ট হলে ডোরার মা তাঁদের গাড়িতে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে দরজা অবধি পৌঁছোনো পর্যন্ত তিনি ড্রাইভওয়েতে অপেক্ষা করলেন। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখতে পেলাম যে, আমাদের কুমড়োটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মোটা খোসাটা টুকরো টুকরো হয়ে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

আমার চোখ জ্বালা করে উঠল, গলার কাছে হঠাৎ একটা ব্যথা অনুভব করলাম। যেন আমার অবসাদগ্রস্ত পায়ের তলায় প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে যে ছোট্ট ধারালো নুড়িপাথরগুলো আওয়াজ তুলছিল, সেগুলো কেউ আমার গলায় ঠেসে দিয়েছে। আমি দরজা খুললাম। ভেবেছিলাম যে, ওঁরা তিনজন সামনের ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষা করবেন। আমাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া কুমড়োটার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবেন। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। বসার ঘরে মি. পিরজ়াদা, বাবা এবং মা সোফার ওপর পাশাপাশি বসে ছিলেন। টিভিটা বন্ধ। মি. পিরজ়াদা মাথায় হাত দিয়ে বসে।

সেই সন্ধে এবং তার পরবর্তী অনেক সন্ধেবেলায় তাঁরা যা শুনেছিলেন, তা এই যে, ভারত এবং পাকিস্তান ক্রমশই যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে। দু'পক্ষের সৈন্যরাই সীমান্তে উপস্থিত। স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনও কিছুতেই ঢাকা সন্তুষ্ট হতে চাইছিল না। শোনা গেল যে, যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতেই হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থন করছিল। ভারত এবং শীঘ্রই যা বাংলাদেশ বলে পরিচিত হবে, তাদের পক্ষে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ৪ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষিত হল। বারো দিন পর, তাদের রসদের থেকে ৩,০০০ মাইল দূরে যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সৈন্য ঢাকায় আত্মসমর্পণ করল। এসব কথা আমি এখন জানতে পেরেছি। কারণ, এখন যে-কোনও ইতিহাস বই, যে-কোনও গ্রন্থাগারে এসব তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সময়, কয়েকটি এলোমেলো যোগসূত্র ছাড়া ব্যাপারটা বেশিরভাগই আমার কাছে এক রহস্য ছিল। সেই বারো দিনের যুদ্ধের যেটুকু স্মৃতি আমার আছে, তা হল, বাবা আমাকে আর তাঁদের সঙ্গে খবর শুনতে বলতেন না। মি. পিরজ়াদা আমার জন্য লজেন্স আনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মা রাতের খাবারের জন্য ভাত আর সেদ্ধ ডিম ছাড়া কিছুই রাঁধতেন না। মনে আছে কোনও কোনও রাতে আমি মাকে সোফার ওপর চাদর-কম্বল পাততে সাহায্য করতাম যাতে মি. পিরজ়াদা সেখানে শুতে পারেন। মাঝরাতে যখন মা-বাবা কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজনদের ফোন করে পরিস্থিতির খুঁটিনাটি খবরাখবর জানতে চাইতেন, তখন আমি তাঁদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের উচ্চস্বরে কথোপকথন শুনতে পেতাম। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, সেই সময় তিনজন যেন একজন মানুষের মতোই ব্যবহার করছিলেন যেন একটাই শরীর, একই খাবার, একই নৈঃশব্দ্য এবং একই ভয়।

AMARBOI.COM

জানুয়ারি মাসে মি. পিরজ্জাদা ঢাকায় তাঁর তিনতলা বাড়িতে ফিরে গেলেন বাড়িটার কতটা অবশিষ্ট আছে দেখার জন্য। বছরের সেই শেষ সপ্তাহগুলোয় আমরা তাঁর বেশি দেখা পেতাম না। তিনি তাঁর লেখা শেষ করতে ব্যস্ত ছিলেন। আমরাও ফিলাডেলফিয়া গিয়েছিলাম মা-বাবার বন্ধুর সঙ্গে বড়দিনের ছুটি কাটাতে। ঠিক যেমন আমাদের বাড়িতে তাঁর প্রথমবার আসার কথা আমার মনে নেই, তেমনই তাঁর শেষবার আসার কথাও মনে নেই। এক দুপুরে, আমি যখন স্কুলে ছিলাম, তখন বাবা মি. পিরজ্জাদাকে গাড়ি করে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলেন। তারপর অনেকদিন আমরা তাঁর কোনও খবর পাইনি। টিভিতে খবরের সামনে রাতের খাবার খেতে খেতে আমাদের সন্ধেগুলো আগের মতোই কাটতে লাগল। একমাত্র তফাত ছিল যে, মি. পিরজ্জাদা এবং তাঁর বাড়তি ঘড়িটি আমাদের সঙ্গে আর থাকত না। খবর অনুযায়ী, ঢাকা একটি নতুন সংসদীয় সরকার গঠন করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। নতুন নেতা শেখ মুজিবর রহমান সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। যুদ্ধে যে দশ লক্ষেরও বেশি বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তার জায়গায় নতুন নির্মাণের জন্য তিনি অন্যান্য দেশের কাছ থেকে নির্মাণ-সামগ্রী চাইলেন। ভারত থেকে অসংখ্য উদ্বাস্তু ফিরে আসল। আমরা জানলাম, বেকারত্ব এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তাদের স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝেই আমি বাবার ডেস্কের ওপর টাঙানো মানচিত্রটা খুঁটিয়ে দেখতাম এবং সেই ছোট্ট হলুদ অংশটায় গলদঘর্ম মি. পিরজ্জাদাকে কল্পনা করার চেষ্টা করতাম। কল্পনা করতাম যে, একটা সুট পরিহিত অবস্থায় তিনি তাঁর পরিবারকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ততদিনে অবশ্য সেই ম্যাপটা অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে কয়েক মাস পর, ইসলামি নববর্ষের স্মরণে মি. পিরজ্জাদা আমাদের একটি কার্ড এবং একটি ছোট চিঠি পাঠালেন। তিনি লিখেছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছেন। সকলেই ভাল আছেন। আগের বছরের ঘটনাগুলোর সময় তাঁর স্ত্রী-কন্যারা শিলং-এর পাহাড়ে, তাঁর স্ত্রীর দাদু-দিদিমার এস্টেটে থেকে নিজেদের রক্ষা করেছেন। তাঁর সাত মেয়ে আগের চেয়ে বেশি লম্বা হওয়া ছাড়া একইরকম আছে। তিনি এখনও তাদের নাম মনে রাখতে পারেন না। চিঠির শেষে তিনি আমাদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিখলেন যে, যদিও তিনি এখন 'থ্যাঙ্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউ' কথাটির অর্থ জানেন, তবুও কথাগুলো তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট নয়। সুসংবাদ পাওয়ার খুশিতে মা সে রাতে ভাল ভাল রান্না করলেন। কফিটেবিলে খেতে বসে আমরা নিজেদের জলের গেলাস তুলে শুভকামনা করলাম। কিন্তু আমার শুভ সংবাদ পালন করতে ইচ্ছে করছিল না। যদিও আমি তাঁকে কয়েক মাস দেখিনি, মি. পিরজ্জাদার অনুপস্থিতি আমি যেন তখনই উপলব্ধি করলাম। সেই মুহূর্তেই, তাঁর নামে আমার জলের গেলাসটা উঠিয়ে, আমি যেন বুঝতে পারলাম যে, বহু মাইল এবং অনেক সময়ের দূরত্বে থাকা কারও কথা মনে পড়লে কীরকম মনখারাপ লাগে। যেমন অতদিন ধরে মি. পিরজ্জাদার তাঁর স্ত্রী-কন্যার কথা মনে পড়ত। তাঁর আমাদের কাছে ফিরে আসার কোনও কারণ ছিল না। মা-বাবা ঠিকই বলেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের আর কখনও দেখা হবে না। জানুয়ারি মাস থেকে, মি. পিরজ্জাদার পরিবারের কথা মনে করে প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার আগে আমি হ্যালোউইন থেকে বাঁচিয়ে রাখা একটা করে লজেন্স খেতাম। সে রাতে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন আমি পড়ে-থাকা উপহারগুলো ফেলে দিলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদনার ভাষ্যকার

মি. এবং মিসেস দাস, টিনাকে টয়লেটে নিয়ে কে যাবে তাই নিয়ে চায়ের দোকানে তর্ক জুড়ে দিলেন। শেষে, মি. দাস যখন মনে করিয়ে দিলেন যে, আগের রাতে তিনি মেয়েকে চান করিয়েছেন, তখন মিসেস দাস রাজি হলেন। রিয়ারভিউ আয়নায় তাকিয়ে মি. কাপাসি দেখলেন, মিসেস দাস আস্তে আস্তে পিছনের সিট থেকে তাঁর কামানো, অনেকাংশে অনাবৃত পা দুটো টেনে টেনে বড়সড় সাদা অ্যামবাসাডরটা থেকে বেরোলেন। টয়লেটে যাওয়ার সময় তিনি ছোট মেয়ের হাত ধরলেন মা।

তাঁরা কোনারকের সূর্যমন্দির দেখতে যাচ্ছিলেন। শনিবার দিনটা ছিল শুকনো, উজ্জ্বল। মধ্য জুলাইয়ের গরমের সঙ্গে সামুদ্রিক হাওয়া মিশে দিনটা ঘুরে বেড়ানোর পক্ষে আদর্শ। সাধারণত মি. কাপাসি এত তাড়াতাড়ি রাস্তায় থামেন না। কিন্তু সকালে হোটেল স্যান্ডি ভিলার সামনে থেকে এই পরিবারটিকে তাঁর গাড়িতে তোলার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ছোট মেয়েটি বায়না ধরেছিল। হোটেলের পোর্টিকোর তলায় ছেলেমেয়েসহ দাসদম্পতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমেই যে জিনিসটা মি. কাপাসি লক্ষ করেছিলেন, তা হল তাদের অল্প বয়স। হয়তো বছর তিরিশও হবে না। টিনা ছাড়াও তাদের আরও দুটি ছেলে, রনি এবং ববি, দেখে মনে হচ্ছিল, তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুব কম। চকচকে রুপোর তারে দু'জনেরই দাঁত ঢাকা। পরিবারটিকে দেখে যদিও ভারতীয় মনে হচ্ছিল, কিন্তু তাঁরা বিদেশিদের মতো জামাকাপড় পরেছিলেন। বাচ্চাদের পরনে কড়কড়ে, উজ্জ্বল রঙের জামা এবং স্বচ্ছ ভিসরওয়ালা টুপি। বিদেশি পর্যটকদের সঙ্গে কাজ করতে মি. কাপাসি অভ্যস্ত। তিনি ইংরেজি বলতে পারেন বলে বিদেশি পর্যটকদের দায়িত্ব নিয়মিত তাঁকেই নিতে হত। গতকাল স্কটল্যান্ডের এক বয়স্ক দম্পতিকে তাঁর গাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। দু'জনেরই মুখ দাগ ভরতি এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

সাদা তুলোর মতো চুল এতই পাতলা যে, তার নীচে তাঁদের রোদে পোড়া মাথাটা দেখা যাচ্ছিল। সেই তুলনায় দাসদম্পতির তামাটে, অল্পবয়সি মুখ আরও আশ্চর্য করেছিল তাঁকে। আলাপ করার সময় মি. কাপাসি নমস্কারের ভঙ্গিতে দু'হাত জোড় করেছিলেন, কিন্তু মি. দাস আমেরিকান কায়দায় এমনভাবে হাত মিলিয়েছিলেন যে, মি. কাপাসি নিজের কনুই পর্যন্ত তার জোর অনুভব করেছিলেন। মিসেস দাস তাঁর ঠোঁট একদিকে একটু বেঁকিয়ে হেসেই কাজ সেরেছিলেন, আর কোনও আগ্রহ দেখাননি।

তাঁরা যখন চায়ের দোকানে অপেক্ষা করছিলেন, তখন রনি— যাকে দেখে দুই ছেলের মধ্যে বড় মনে হচ্ছিল— একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছাগল দেখে কৌতূহলে আচমকা পিছনের সিট থেকে নেমে পড়ল।

"হাত দিয়ো না," মি. দাস সাবধান করলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ-সংক্রান্ত বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন। বইটার প্রচ্ছদে হলুদ অক্ষরে INDIA লেখা। দেখে মনে হচ্ছিল, বইটা বিদেশে প্রকাশিত। তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন দ্বিধান্বিত এবং একটু তীক্ষ্ণ, যেন তা তখনও পরিণত হয়নি।

"আমি ওকে একটা চুয়িং গাম দিতে চাই," ছেলেটা এগোতে-এগোতে চেঁচিয়ে বলল।

মি. দাস গাড়ি থেকে বেরিয়ে পা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে মুহূর্তের জন্য মাটিতে উবু হয়ে বসলেন। তাঁর গোঁফদাড়ি পরিষ্কার ভাবে কামানো। দেখতে অবিকল রনির বড় সংস্করণ। চোখে উজ্জ্বল নীল রঙের ভিসর। পরনে শর্টস, স্নিকার্স এবং টি-শার্ট। তাঁর গলায় ঝোলানো প্রচুর বোতাম এবং দাগওয়ালা ক্যামেরাটায় একটা দারুণ টেলিফোটো লেন্স লাগানো। ওই যন্ত্রটিই তাঁর সঙ্গের একমাত্র জটিল বস্তু। রনিকে ছাগলটার কাছে ছুটে যেতে দেখে তিনি ভুরু কোঁচকালেন, কিন্তু ছেলেকে থামানোর তাঁর কোনও উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হল না। "ববি, দেখো তোমার ভাই যেন কোনও বোকামি না করে।"

"আমার ইচ্ছে করছে না," ববি নিজের জায়গা থেকে না নড়ে বলল। সে কাপাসির পাশের সিটে বসে গ্লাভ কমপার্টমেন্টের গায়ে আটকানো গণেশঠাকুরের একটা ছবি দেখছিল।

"চিন্তা করার কিছু নেই," মি. কাপাসি বললেন। "ওরা বেশ শান্তশিষ্ট।" কাপাসির বয়স ছেচল্লিশ। চুল পাতলা হতে শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে রুপোলি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর মাখনের মতো ত্বক এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিভাঁজ কপাল (যাতে তিনি সময় পেলে পদ্মফুলের তেলের মলম লাগান) দেখে সহজেই কল্পনা করা যায় যে, তাঁকে অল্প বয়সে কেমন দেখতে ছিল। তিনি ধূসর রঙের ফুলপ্যান্ট এবং জ্যাকেটের মতো শার্ট পরেছিলেন। শার্টটা কোমরের কাছে সরু, হাতা ছোট এবং কলার বড় এবং ছুঁচোলো। শার্টের সিন্থেটিক কাপড়টা পাতলা কিন্তু টেকসই। কাপড় এবং কায়দা, দুটোই কাপাসি নিজের পছন্দমতো বলে দিয়েছিলেন। ট্যুরে যাওয়ার সময় এটাই তাঁর পছন্দের ইউনিফর্ম। কারণ, স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও, এই ধরনের কাপড়ে বেশি ভাঁজ পড়ে না। উইন্ডশিল্ডের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখলেন, রনি ছাগলটার চারপাশে চক্কর কাটল, তারপর চট করে সেটার গায়ে একবার হাত দিয়েই গাড়িতে ফিরে এল।

"আপনি কি ছেলেবেলাতেই ভারত ছেড়েছিলেন?" মি. দাস পিছনের সিটে ফিরে এসে বসার পর কাপাসি জিজ্ঞেস করলেন।

"ওঃ, মিনা এবং আমার দু'জনেরই জন্ম আমেরিকায়," মি. দাস হঠাৎ আত্মবিশ্বাসের সুরে বললেন। "ওখানেই জন্ম, ওখানেই মানুষ। আমাদের মা-বাবারা এখন এখানে থাকেন। ওঁরা রিটায়ার করেছেন। বছর দুয়েক অন্তর আমরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসি।" তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে ছোট মেয়েকে গাড়ির দিকে ছুটে আসতে দেখলেন। মেয়েটার সরু বাদামি কাঁধের ওপর তার সানড্রেসের চওড়া বেগুনি ফিতের ফুলগুলো পতপত করছিল। সে তার বুকের কাছে হলুদ চুলওয়ালা একটা পুতুল ধরে ছিল। পুতুলটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন, কোনও শাস্তিস্বরূপ একটা ভোঁতা কাঁচি দিয়ে সেটার চুল ছেঁটে ফেলা হয়েছে। "টিনা এই প্রথম ভারতে বেড়াতে এল, তাই না টিনা?"

"আমাকে আর বাথরুম যেতে হবে না," টিনা ঘোষণা করল।

"মিনা কোথায়?" মি. দাস জিজ্ঞেস করলেন।

মি. কাপাসির একটু অদ্ভুত লাগল যে, মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সময়ও মি. দাস তাঁর স্ত্রীর নাম ধরলেন। টিনা আঙুল দিয়ে দেখাল চায়ের দোকানের কয়েকজন কর্মী, যাদের গায়ে কোনও শার্ট ছিল না, মিসেস দাস তাদের একজনের কাছ থেকে কিছু কিনছিলেন। তিনি গাড়ির দিকে ফিরে আসার সময় তাদের একজন একটা জনপ্রিয় হিন্দি গানের কলি গেয়ে উঠল। কিন্তু মিসেস দাস গানের কথা বুঝতে পারলেন বলে মনে হল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ, তিনি লোকটির গানে বিরক্ত বা অস্বস্তি, কিছুই প্রকাশ করলেন না।

কাপাসি মিসেস দাসকে লক্ষ করলেন। তাঁর লাল-সাদা চেক-কাটা স্কার্টটা হাঁটুর ওপর এসে থেমে গিয়েছে। পায়ে সহজেই গলিয়ে পরার মতো চৌকো কাঠের হিলতোলা জুতো। ছেলেদের শার্টের নীচে পরার গেঞ্জির মতো ব্লাউজ, বুকের কাছে স্ট্রবেরি ফলের আকারে ক্যালিকো-অ্যাপ্লিকের কাজ করা। মহিলা উচ্চতায় খাটো, থাবার মতো ছোট-ছোট হাত, আর গোলাপি নখের রং লিপস্টিকের সঙ্গে মিলিয়ে করা। গড়ন একটু গোলগাল। স্বামীর চুলের চেয়ে সামান্য লম্বা করে ছাঁটা চুলের একপাশে সিঁথি কাটা। তিনি গোলাপি আভাওয়ালা বড় গাঢ় বাদামি রঙের সানগ্লাস পরেছিলেন। সঙ্গে বাটির আকারের, প্রায় নিজের দেহের মতো চওড়া একটা ঘাসের ব্যাগ, যার ভিতর থেকে একটা জলের বোতল উঁকি দিচ্ছিল। একটা ঠোঙা থেকে মুড়ি-বাদাম-লঙ্কা মাখা খেতে খেতে ধীরেসুস্থে হাঁটছিলেন। কাপাসি মি. দাসের দিকে ফিরলেন।

"আপনারা আমেরিকায় কোথায় থাকেন?"

"নিউ ব্রুন্সউইক, নিউ জার্সি।"

"নিউ ইয়র্কের পাশে?"

"ঠিক তাই। আমি ওখানে মিডল স্কুলে পড়াই।"

"কী বিষয়?"

"বিজ্ঞান। প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের নিউ ইয়র্ক শহরের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম দেখাতে নিয়ে যাই। এক দিক দিয়ে বলতে পারেন যে, আপনার আর আমার মধ্যে অনেক মিল আছে। আপনি কতদিন ধরে ট্যুর গাইডের কাজ করছেন, মি. কাপাসি?"

"পাঁচ বছর।"

মিসেস দাস গাড়িতে এসে দরজা বন্ধ করে "কতক্ষণ লাগবে যেতে?" জিজ্ঞেস করলেন।

"এই ধরুন আড়াই ঘণ্টা," কাপাসি উত্তর দিলেন।

শুনে মিসেস দাস অধৈর্যভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন তিনি সারা জীবন ধরে অবিরাম ঘুরেই বেড়াচ্ছেন। ইংরেজিতে লেখা মুম্বইয়ের একটা চলচ্চিত্র পত্রিকা দিয়ে নিজেকে হাওয়া করলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি ভেবেছিলাম যে, সান টেম্পল পুরীর থেকে মাত্র আঠারো মাইল উত্তরে," মি. দাস ট্যুরবইটায় টোকা মেরে বললেন।

"কোনারক যাওয়ার রাস্তাটা বেশ খারাপ। আসলে বাহান্ন মাইলের রাস্তা," কাপাসি বোঝালেন।

মি. দাস মাথা নাড়লেন। তাঁর ঘাড়ের পিছনে ক্যামেরার স্ট্র্যাপটা ঘষে যাচ্ছিল। সেটা সরিয়ে ঠিক করলেন।

ইঞ্জিন চালু করার আগে কাপাসি পিছনে হাত দিয়ে দেখে নিলেন, পিছনের দরজা দুটোর ইংরেজির 'এল' অক্ষরের মতো লকগুলো ঠিক আটকেছে কি না। গাড়ি চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ছোট মেয়েটি তার দিকের লকটা নিয়ে খেলতে শুরু করল। চেষ্টা করে সেটাকে আগেপিছে নড়াতে লাগল। কিন্তু মিসেস দাস তাকে থামানোর জন্য কিছুই বললেন না। তিনি পিছনের সিটের এক পাশে একটু হেলে বসে ছিলেন। কাউকে তাঁর মুড়িমাখা খেতে বললেন না। তাঁর দু'দিকে রনি এবং টিনা বসে ক্যাটকেটে সবুজ রঙের চুয়িং গাম চিবোচ্ছিল।

"দেখো," গাড়িটা গতি বাড়ানোর সময় ববি বলে উঠল। সে আঙুল দিয়ে রাস্তার ধারের লম্বা গাছগুলো দেখাল। "ওই দেখো। বাঁদর!" রনি চেঁচিয়ে উঠল। "আরিব্বাস!"

চকচকে কালো মুখ, রুপোলি শরীর, সোজা সোজা ভুরু আর মাথায় ঝুঁটিওয়ালা বাঁদরগুলো দল বেঁধে গাছের ডালে বসে ছিল। তাদের লম্বা ধূসর লেজগুলো সারি সারি দড়ির মতো পাতার ফাঁক দিয়ে ঝুলছিল। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ কালো চামড়ার মতো হাত দিয়ে নিজেদের গা চুলকোচ্ছিল বা পা দোলাচ্ছিল।

"আমরা ওদের হনুমান বলি," কাপাসি বললেন। "ওদের এখানে খুব দেখতে পাওয়া যায়।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা হনুমান লাফ দিয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে পড়ল। কাপাসিকে আচমকা ব্রেক কষতে হল। আর-একটা গাড়ির হুডে লাফিয়ে উঠল, তারপর আবার লাফিয়ে চলে গেল। কাপাসি হর্ন বাজালেন। বাচ্চারা উত্তেজিত হয়ে জোরে শ্বাস নিয়ে মুখে হাত চাপা দিল। মি. দাস বললেন, তারা কখনও চিড়িয়াখানার বাইরে কোনও বাঁদর বা হনুমান দেখেনি। তিনি কাপাসিকে গাড়িটা থামাতে বললেন যাতে হনুমানগুলোর ছবি তুলতে পারেন।

AMARBOI.COM

মি. দাস তাঁর টেলিফোটো লেন্স ঠিক করতে করতে, মিসেস দাস তাঁর ঘাসের ব্যাগ থেকে একটা রং-হীন নেলপালিশ বের করে তর্জনীর নখে লাগাতে শুরু করলেন।

ছোট্ট মেয়েটা একটা হাত বাড়িয়ে আবদার করল, "আমাকেও মা। আমাকেও লাগিয়ে দাও।"

"বিরক্ত কোরো না," মিসেস দাস বললেন। নখের ওপর ফুঁ দিয়ে মেয়ের দিক থেকে একটু ঘুরে বসলেন। "তুমি আমারটা নষ্ট করে দিচ্ছ।"

তখন মেয়েটা পুতুলের জামার বোতাম খুলতে আর লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"হয়ে গিয়েছে," লেন্সের ঢাকা আটকে মি. দাস বললেন।

ধুলোময় রাস্তার ওপর গাড়িটা দৌড়োতে গিয়ে বেশ ঝাঁকুনি খেল। মাঝে মাঝেই সকলে সিট থেকে লাফিয়ে উঠছিলেন। কিন্তু মিসেস দাস তার মধ্যেই নখ রং করতে থাকলেন। যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় কাপাসি অ্যাক্সিলারেটরের ওপর চাপ কমিয়ে দিলেন। গিয়ারশিফটের দিকে হাত বাড়ানোর সময় সামনের সিটে বসা ছেলেটি তার রোমহীন পা দুটো সরিয়ে নিল। কাপাসি লক্ষ করলেন যে, এই ছেলেটি তার ভাইবোনের চেয়ে একটু বেশি ফ্যাকাশে। "বাবা, এই গাড়িটাতেও ড্রাইভার উলটো দিকে বসেছে কেন?" ছেলেটি জিজ্ঞেস করল।

"এখানে সকলে ওদিকেই বসে, ক্যাবলা," রনি বলল।

"ভাইকে ক্যাবলা বোলো না," মি. দাস বললেন। কাপাসির দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আমেরিকায়, জানেন তো... ওদের একটু গুলিয়ে যায়।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি," কাপাসি বললেন। যথাসম্ভব সাবধানে তিনি গিয়ার বদলালেন। সামনে একটা টিলা আসছে দেখে গতি বাড়ালেন, "আমি 'ডালাস'-এ দেখেছি, স্টিয়ারিং হুইল বাঁ দিকে থাকে।"

"ডালাস কী?" কাপাসির সিটের পিছনে নগ্ন পুতুলটাকে পেটাতে-পেটাতে টিনা জিজ্ঞেস করল।

মি. দাস বোঝালেন, "একটা টিভি শো। এখন আর দেখানো হয় না।"

এক সারি খেজুর গাছের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে মি. কাপাসি ভাবলেন, এরা সব ভাইবোনের মতো। দাসদম্পতি বড় বোন এবং বড় ভাইয়ের মতো আচরণ করেন, মা বাবার মতো নয়। মনে হচ্ছিল যেন, বাচ্চাদের দায়িত্ব শুধু

AMARBOI.COM

সেই দিনের জন্যই তাঁদের দেওয়া হয়েছে। নিজেদের ছাড়া অন্য কিছু বা অন্য কারও দায়িত্ব তাঁরা, নিয়মিত সামলান ভাবতে অসুবিধে হচ্ছিল। মি. দাস তাঁর লেন্স এবং ট্যুরবইয়ে টোকা মারছিলেন। মাঝে মাঝে বুড়ো আঙুলের নখটা সশব্দে বইয়ের পাতার ওপর দিয়ে টানছিলেন। মিসেস দাস তখনও নখে রং করছিলেন, চোখে সানগ্লাস। কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তর টিনা নখে রং লাগিয়ে দেওয়ার বায়না ধরছিল। একসময় মিসেস দাস এক ফোঁটা পলিশ ছোট মেয়ের নখে লাগিয়ে বোতলটা তাঁর ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলেন।

"গাড়িটা এয়ারকন্ডিশনড্ নয়?" নখে ফুঁ দিতে দিতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। টিনার দিকের জানলাটা ভাঙা ছিল। নামানো যাচ্ছিল না।

"খুঁতখুঁত কোরো না," মি. দাস বললেন। "এমন কিছু গরম নেই।"

"আমি তোমাকে বলেছিলাম একটা এয়ারকন্ডিশনড্ গাড়ি নিতে," মিসেস দাস অনুযোগ করলেন। "কেন এগুলো করো বলো তো, রাজ? স্রেফ কয়েকটা ফালতু টাকা বাঁচাতে? কত টাকা বাঁচাচ্ছ এভাবে? ক' পয়সা?"

'ডালাস' নয়, কিন্তু অন্য আমেরিকান টিভি অনুষ্ঠানে অভিনেতারা যে ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেন, এঁরাও ঠিক সেই ভাবে কথা বলছেন, ভাবলেন কাপাসি।

"আচ্ছা আপনার একঘেয়ে লাগে না, মি. কাপাসি? রোজ সকলকে একই জিনিস দেখাতে?" মি. দাস তাঁর জানলাটা পুরোপুরি নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। "আরে, আপনি কি একবার গাড়িটা থামাবেন। আমি এই লোকটার একটা ছবি তুলতে চাই।"

কাপাসি গাড়িটা রাস্তার একপাশে দাঁড় করালেন। একটা লোক খালিপায়ে, মাথায় একটা নোংরা পাগড়ি বেঁধে একটা গোরুর গাড়ির মধ্যে ধানগমের বস্তার ওপর বসে ছিল। মি. দাস তার ছবি তুললেন। লোকটা আর গোরু দুটো, সকলেই শীর্ণকায়। পিছনের সিটে বসে মিসেস দাস অন্য একটা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। সেখানে প্রায় স্বচ্ছ মেঘ একে অন্যের পাশ কাটিয়ে ভেসে যাচ্ছিল।

"সত্যি কথা বলতে কী, আমার বেশ ভালই লাগে," পুনরায় যাত্রা শুরু করে কাপাসি বললেন। "সান টেম্পল আমার খুব প্রিয় জায়গা। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে এতে আমার সুবিধেই হয়। আমি তো শুধু শুক্র-শনিবার ট্যুর করি, বাকি সপ্তাহ আমার অন্য কাজ থাকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাই বুঝি। কোথায়?" মি. দাস জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি এক ডাক্তারের অফিসে কাজ করি।"

"আপনি ডাক্তার?"

"আমি ডাক্তার নই। একজন ডাক্তারের সঙ্গে কাজ করি। দোভাষী, হিসেবে।"

"ডাক্তারের দোভাষীর কীসের প্রয়োজন?"

"তাঁর অনেক গুজরাতি রুগি আছে। আমার বাবা গুজরাতি ছিলেন, কিন্তু এ অঞ্চলের অনেকেই গুজরাতি বোঝে না। ডাক্তারও না। তাই তিনি আমাকে তাঁর অফিসে কাজ করতে বললেন, তাঁর রুগিদের কথা বোঝানোর জন্য।"

"বাহ, ইন্টারেস্টিং! আমি এরকম কিছু আগে শুনিনি," মি. দাস বললেন।

কাপাসি কাঁধ ঝাঁকালেন। "অন্য যে-কোনও কাজের মতোই।"

"কিন্তু খুব রোমান্টিক," মিসেস দাস তাঁর এতক্ষণের নীরবতা ভেঙে স্বপ্নালু গলায় বললেন। তাঁর গোলাপি-বাদামি সানগ্লাস খুলে মাথার ওপর টায়রার ভঙ্গিতে বসালেন। সেই প্রথমবার, রিয়ারভিউ আয়নাতে তাঁর এবং মি. কাপাসির চোখাচোখি হল। ফ্যাকাশে, একটু ছোট ঘুমজড়ানো চোখগুলো একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

মি. দাস ঘাড় উঁচু করে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। "এতে আবার রোমান্টিক কী আছে?"

"জানি না। তবে কিছু একটা আছে," তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন। মুহূর্তের জন্য ভুরু কোঁচকালেন। "একটা চুয়িং গাম নেবেন, মি. কাপাসি?" তিনি সপ্রতিভ হয়ে বললেন। তাঁর ঘাসের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে সবুজ-সাদা ডোরাকাটা কাগজে মোড়া একটা ছোট চৌকো চুয়িং গাম বার করে কাপাসিকে দিলেন। কাপাসি সেটা মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের ভিতর একটা ঘন, মিষ্টি, তরল পদার্থ চুয়িং গাম ফেটে বেরিয়ে আসল।

"আপনার কাজের সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন, মি. কাপাসি," মিসেস দাস বললেন।

"আপনি কী জানতে চান বলুন ম্যাডাম?"

"তা জানি না," মিসেস দাস আবার কাঁধ ঝাঁকালেন। মুড়িমাখা চিবোতে চিবোতে ঠোঁটের কোণ থেকে এক ফোঁটা সরষের তেল চেটে নিলেন।

"কোনও একটা ঘটনার উদাহরণ দিন।" তিনি সিটে হেলান দিয়ে বসে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ফালি রোদের মধ্যে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। "আমি কল্পনা করতে চাই কী ঘটতে পারে।"

"ঠিক আছে। এই সেদিনই একজন লোক গলা ব্যথা নিয়ে এসেছিল।"

"সে কি সিগারেট খেত?"

"না। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। তার অভিযোগ ছিল যে, তার মনে হচ্ছিল যেন গলায় লম্বা-লম্বা খড়ের টুকরো আটকে গিয়েছে। আমি ডাক্তারকে বলার পর তিনি লোকটাকে সঠিক ওষুধ লিখে দিলেন।"

"বাহ, কী ভাল।"

"হ্যাঁ," কাপাসি সামান্য ইতস্তত করে সায় দিলেন।

"এই রুগিরা তা হলে আপনার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে," মিসেস দাস বললেন। তিনি আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন। যেন নিজের মনের ভাবনাগুলো আওড়াচ্ছেন। "দেখতে গেলে, ওরা ডাক্তারের চেয়েও আপনার ওপর বেশি নির্ভরশীল।"

"মানে? তা কী করে হতে পারে?"

"যেমন ধরুন, আপনি ডাক্তারকে বলতে পারেন যে, ব্যথাটা খড়ের মতো নয়, জ্বালার মতো। রুগি কখনও জানতে পারবে না যে, আপনি ডাক্তারকে কী বললেন, ডাক্তারও কখনও জানবে না যে, আপনি ভুল জিনিসটা বললেন। এটা তো খুব বড় দায়িত্ব।"

"হ্যাঁ, আপনার কাজটা খুবই দায়িত্বের কাজ, মি. কাপাসি," মি. দাস সায় দিলেন।

কাপাসি কখনও নিজের কাজটাকে এরকম প্রশংসাযোগ্য ভাবেননি। তাঁর কাছে কাজটা প্রতিদানহীন মনে হত। মানুষের ব্যাধির, বেদনার ব্যাখ্যা করার মধ্যে তিনি মহৎ কিছুই খুঁজে পেতেন না। হাড় ফুলে যাওয়া, পেটের এবং নাড়িভুঁড়ির অসংখ্য খিল ধরে যাওয়া, লোকের হাতের তেলোয় কোনও দাগের মাপ, আকার বা রং পালটে যাওয়া লক্ষণগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করার মধ্যে তিনি রোমান্টিক কিছু দেখতেন না। ডাক্তারের বয়স ছিল প্রায় তাঁর অর্ধেক। বেলবটম ফুলপ্যান্টের প্রতি ডাক্তারটির একটু দুর্বলতা ছিল। কংগ্রেস পার্টিকে নিয়ে মাঝে মাঝে কৌতুকহীন রসিকতা করতেন। তাঁরা একসঙ্গে একটি জরাজীর্ণ ছোট্ট হাসপাতালে কাজ করতেন। সেখানে মাথার ওপর একটা ঘূর্ণায়মান সিলিং ফ্যানের কালো হয়ে যাওয়া পাখা গরম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাওয়া দেওয়া সত্ত্বেও, কাপাসির পরিপাটি করে তৈরি করা জামাকাপড় তাঁর গায়ে সেঁটে যেত।

এই কাজটা ছিল তাঁর ব্যর্থতার চিহ্ন। যৌবনে তিনি ছিলেন বিদেশি ভাষার একনিষ্ঠ ছাত্র। তাঁর অভিধানের সংগ্রহ রীতিমতো সম্ভ্রম জাগাত। স্বপ্ন দেখতেন কূটনীতিবিদ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের জন্য দোভাষীর কাজ করবেন। মানুষে-মানুষে, দু'দেশের মধ্যে সমস্যার সমাধান করবেন। সেইসব তর্কে ইতি টানবেন, যেখানে দু'পক্ষের বক্তব্য একমাত্র তাঁর পক্ষেই বোঝা সম্ভব। তিনি স্বশিক্ষিত ছিলেন। মা-বাবা তাঁর বিয়ের বন্দোবস্ত করার আগে তিনি সন্ধেবেলা একের পর এক নোটবইয়ে নানা শব্দের ব্যুৎপত্তির তালিকা তৈরি করতেন। একসময় তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সুযোগ পেলে ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, পর্তুগিজ এবং ইতালীয় ভাষায় কথোপকথন চালাতে পারবেন। হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া এবং গুজরাতি তো বলাই বাহুল্য। এখন শুধু কয়েকটি ইউরোপীয় শব্দবন্ধ তাঁর মনে আছে। এলোমেলো সব কথা, যেমন পাত্র বা চেয়ারকে কী বলা হয়। বিদেশি ভাষা বলতে একমাত্র ইংরেজিটাই তিনি এখন সাবলীলভাবে বলতে পারেন। কাপাসি জানতেন যে, সেটা কোনও অসামান্য প্রতিভা নয়। মাঝে মাঝে তাঁর আশঙ্কা হত যে, তাঁর ছেলেমেয়ে শুধুমাত্র টিভি দেখেই তাঁর চেয়ে বেশি ভাল ইংরেজি শিখে গিয়েছে। যাই হোক, ভাষাটা তাঁর ট্যুরের কাজে সাহায্য করে।

তাঁর বড় ছেলের যখন সাত বছর বয়স, তখন টাইফয়েড হয়। সেই সময়ই কাপাসির ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ এবং তখনই তিনি দোভাষীর কাজটা নিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি এক গ্রামার স্কুলে ইংরেজি পড়াতেন। চিকিৎসার ক্রমবর্ধমান খরচ মেটানোর জন্যই তাঁর ভাষার জ্ঞান কাজে লাগাতে শুরু করেছিলেন। শেষে ছেলেটা তার মায়ের কোলেই মারা যায়। জ্বরে তার গা-হাত-পা পুড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপরও তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। তারপর আরও ছেলেমেয়েও হয়েছিল। নতুন বড় বাড়ি, ভাল স্কুল, ভাল টিউটর, ভাল জুতো আর টিভি, এবং আরও অসংখ্য নানা উপায়ে তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যাতে তিনি ঘুমের মধ্যে না কাঁদেন। তাই ডাক্তার যখন গ্রামার স্কুলের চেয়ে দ্বিগুণ মাইনে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন, তখন তিনি সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। কাপাসি জানতেন যে, স্ত্রী তাঁর কাজ সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। কাজটা তাঁর স্ত্রীকে পরলোকগত ছেলের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং তিনি এও জানতেন যে, অন্যদের প্রাণ বাঁচাতে তাঁর ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুযায়ী যে সাহায্য করেন, তা তাঁর স্ত্রী বিদ্বেষের চোখে দেখেন। কখনও কাজের সম্বন্ধে বলতে গেলে, তাঁর স্ত্রী 'ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট' কথাটি ব্যবহার করতেন। যেন ব্যাখ্যা করার কাজটা কারও তাপমাত্রা নেওয়া বা বেডপ্যান বদলে দেওয়ার সমতুল্য। তিনি কখনও কাপাসিকে রুগিদের কথা জিজ্ঞেস করতেন না বা বলতেন না যে, তাঁর কাজটা বেশ দায়িত্বপূর্ণ।

তাই মিসেস দাসকে তাঁর কাজ সম্বন্ধে এত উৎসুক দেখে কাপাসি আত্মসন্তুষ্টি অনুভব করলেন। মিসেস দাস তাঁর কাজে যে বুদ্ধি, বিচারশক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যা তাঁর স্ত্রী কখনও করেন না। তিনি 'রোমান্টিক' কথাটিও ব্যবহার করেছিলেন। মিসেস দাস তাঁর স্বামীর সঙ্গে কোনওরকম রোমান্টিক আচরণ করেননি, কিন্তু কাপাসির সঙ্গে কথা বলার সময় কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। কাপাসি ভাবলেন, তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর মতো দাসদম্পতিও পরস্পরের পক্ষে অনুপযুক্ত কি না। তাঁদেরও হয়তো, তিন ছেলেমেয়ে এবং দাম্পত্য জীবনের একদশক ছাড়া আর কোনও মিল নেই। তাঁর নিজের বিয়ের ব্যর্থতার চিহ্ন তিনি এঁদের মধ্যেও দেখতে পেয়েছিলেন। সেই খিটখিট করা, সেই নিস্পৃহতা, সেই দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা। মিসেস দাসের তাঁর সম্বন্ধে আচমকা আগ্রহবোধ করা, যে আগ্রহ তিনি তাঁর ছেলেমেয়ে বা স্বামী কারও প্রতিই প্রকাশ করেননি, তা কাপাসিকে মৃদুভাবে আপ্লুত করল। মিসেস দাস যেভাবে 'রোমান্টিক' কথাটি বলেছিলেন, তা ভেবে কাপাসির মোহগ্রস্ততা বেড়ে গেল।

গাড়ি চালাতে-চালাতে কাপাসি রিয়ারভিউ আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগলেন। বাদামি সুটটা হাঁটুর কাছে একটু ঝুলে থাকে। সেটা না পরে ধূসর রঙের সুটটা পরায় আশ্বস্ত বোধ করলেন। কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তর তিনি আয়নায় মিসেস দাসের দিকে তাকালেন। শুধু তাঁর মুখের দিকেই না, তাঁর বুকের কাছে স্ট্রবেরি ফলটার দিকে, তাঁর গলার সোনালি-হলুদ কোটরের দিকেও তাকালেন। তিনি ঠিক করলেন যে, মিসেস দাসকে আর-একজন রুগি এবং আরও একজন রুগির কথা বলবেন। সেই যে অল্পবয়সি মেয়েটি শিরদাঁড়ায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার ভাব অনুভব করত। সেই যে ভদ্রলোকের জন্মদাগ থেকে চুল গজাতে শুরু করেছিল। একটা ছোট, ডিম্বাকৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লাস্টিকের ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে মিসেস দাস কাপাসির কথা মন দিয়ে শুনলেন। প্রশ্ন করলেন, আরও উদাহরণ শুনতে চাইলেন। বাচ্চাগুলো চুপচাপ বসে ছিল, গাছের ওপর আরও হনুমান দেখার চেষ্টা করছিল। মি. দাস তাঁর ট্যুর-বইয়ে ডুবে ছিলেন। তাই মনে হচ্ছিল যেন কাপাসি এবং মিসেস দাসের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত কথোপকথন চলছে। এইভাবেই আধঘণ্টা কেটে গেল। তারপর তাঁরা দুপুরের খাবারের জন্য রাস্তার ধারের এক রেস্তোরাঁয় থামলেন যেখানে চপ এবং ওমলেট স্যান্ডউইচ পাওয়া যায়। সাধারণত কাপাসি যাত্রার এই অংশটা উপভোগ করেন। কারণ, এখানে তিনি গরম চা খেতে খেতে শান্তিতে বসতে পারেন। কিন্তু আজ তিনি এখানে পৌঁছে হতাশ হলেন। দাস পরিবার একসঙ্গে একটা সাদা-কমলা টাসেল ঝোলানো ম্যাজেন্টা রঙের ছাতার নীচে একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন। তিনকোনা টুপি পরা যে বেয়ারারা ঘুরছিল, তাদের একজনকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিলেন। মি. কাপাসি অনিচ্ছুকভাবে পাশের একটা টেবিলের দিকে এগোলেন।

"মি. কাপাসি, দাঁড়ান। এখানে জায়গা আছে," মিসেস দাস ডাকলেন। তিনি টিনাকে নিজের কোলে বসিয়ে কাপাসিকে তাঁদের সঙ্গে বসার জন্য জোর করলেন। সুতরাং তাঁরা একসঙ্গে বসে বোতলে ভরা আমের রস, স্যান্ডউইচ, পেঁয়াজি এবং আলুর পকোড়া খেলেন। দুটো ওমলেট স্যান্ডউইচ শেষ করার পর মি. দাস সকলের খাওয়ার ছবি তুললেন।

"আর কতক্ষণ?" ক্যামেরায় ফিল্মের নতুন রোল ভরতে ভরতে তিনি কাপাসিকে জিজ্ঞেস করলেন।

"এই ধরুন আধঘণ্টা।"

ততক্ষণে বাচ্চারা আশপাশের গাছের হনুমানগুলোকে দেখার জন্য টেবিল থেকে উঠে পড়েছিল। অতএব মিসেস দাস এবং মি. কাপাসির মধ্যে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছিল। মি. দাস ক্যামেরাটা তাঁর মুখের কাছে ধরে একটা চোখ টিপে বন্ধ করলেন। তাঁর মুখের এক কোণ দিয়ে জিভটা উঁকি মারছিল। "তোমাদের দেখতে অদ্ভুত লাগছে। মিনা, তুমি মি. কাপাসির দিকে আর-একটু সরে যাও।"

মিসেস দাস একটু সরে আসলেন। কাপাসি তাঁর গায়ের সুবাস পাচ্ছিলেন। কেমন যেন হুইস্কি আর গোলাপজলের মিশ্রণের মতো। তাঁর হঠাৎ দুশ্চিন্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল যে, মিসেস দাস হয়তো তাঁর গা থেকে সিন্থেটিক শার্টের তলায় জমা ঘামের গন্ধ পাবেন। তিনি এক ঢোকে আমের রস শেষ করে তাঁর রুপোলি চুলে হাত বুলিয়ে নিলেন। চিবুকে এক ফোঁটা রস পড়েছিল। তিনি ভাবলেন মিসেস দাস সেটা দেখতে পেয়েছেন কি না।

মিসেস দাস সেটা দেখেননি। "আপনার ঠিকানাটা কী, মি. কাপাসি?" তিনি তাঁর খাসের ব্যাগে কিছু খুঁজতে-খুঁজতে বললেন।

"আপনি আমার ঠিকানা চান?"

"ফোটোর কপি যাতে আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি," মিসেস দাস বললেন। তাঁর ফিল্ম পত্রিকা থেকে চট করে এক ফালি কাগজ ছিঁড়ে তিনি কাপাসিকে দিলেন। লেখার জন্য জায়গা কমই ছিল। কারণ, চিরকুটটায় ওরিত লেখা, তার সঙ্গে একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় একজোড়া নায়ক নায়িকার আলিঙ্গনের ফোটো।

কাপাসি সযত্নে পরিষ্কার করে, তাঁর ঠিকানা লিখলেন। কাগজটা কুঁচকে গেল। মিসেস দাস তাঁকে চিঠি লিখবেন, ডাক্তারের অফিসে তাঁর দোভাষীর কাজের কথা জিজ্ঞেস করবেন। তিনিও স্বচ্ছন্দে উত্তর দেবেন। বেছে-বেছে সবচেয়ে মজার ঘটনার কথাই লিখবেন। যা পড়ে মিসেস দাস তাঁর নিউ জার্সির বাড়িতে সশব্দে হেসে উঠবেন। একসময় তাঁরা নিজেদের বিয়ের আলাভঙ্গের কথা লিখবেন। এভাবেই তাঁদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে, তার শ্রীবৃদ্ধি হবে। তাঁর কাছে তাঁদের দু'জনের একটা ছবি থাকবে। ম্যাজেন্টা ছাতার তলায় বসে পেঁয়াজি খাওয়ার ছবি। কাপাসি ঠিক করলেন যে, তিনি ছবিটা তাঁর রুশ ব্যাকরণের বইয়ের পাতার ভিতর ঢুকিয়ে রাখবেন। তাঁর মন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল। কাপাসি একটা মৃদু, সুখপ্রদ চাঞ্চল্য অনুভব করলেন। অনেকদিন আগে, মাসের পর মাস ধরে অভিধানের সাহায্যে অনুবাদ করার পর অবশেষে কোনও ফরাসি উপন্যাসের কয়েকটি লাইন বা ইতালীয় সনেট পড়তে পারলে, নিজের অজ্ঞতার বাধা কাটিয়ে শব্দগুলো একের পর এক বুঝতে পারলে তিনি ঠিক এইরকম তৃপ্তি পেতেন। সেই সব মুহূর্তে কাপাসির মনে হত যে, পৃথিবীতে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে। সব পরিশ্রমের পুরস্কার পাওয়া যায়, জীবনের সব ভুলের অর্থ মিলে যায় যাত্রার শেষে। মিসেস দাসের যোগাযোগ করার প্রতিশ্রুতি কাপাসিকে একই আশ্বাস দিল।

ঠিকানা লেখার পর কাপাসি মিসেস দাসকে কাগজটা ফেরত দিলেন, কিন্তু

AMARBOI.COM

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুশ্চিন্তা শুরু হল যে, তিনি হয় নামের বানান ভুল লিখেছেন, না হয় তাঁর পোস্টাল কোডের সংখ্যাগুলো উলটো করে ফেলেছেন। তাঁর আশঙ্কা হল, চিঠিটা হারিয়ে যেতে পারে, ফোটোটা কখনও তাঁর কাছে পৌঁছোতে নাও পারে। এমনও হতে পারে, হয়তো সেটা ওড়িশাতেই দিশেহারা হয়ে ঘুরবে, কাপাসির থেকে খুব দূরে নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাপাসি তার হদিশ পাবেন না। তিনি ভাবলেন আর-একবার কাগজটা চেয়ে দেখে নিশ্চিত হন যে, নির্ভুল ঠিকানাই লিখেছেন। কিন্তু মিসেস দাস ইতিমধ্যে কাগজটা তাঁর অগোছালো ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছিলেন।

আড়াইটের সময় তাঁরা কোনারক পৌঁছোলেন। জীবনের মহান অধীশ্বর সূর্যের প্রতি উৎসর্গ করা মন্দিরটা বালুশিলা দিয়ে একটা বিশাল রথের আকারে তৈরি। প্রতিদিন আকাশের এপার থেকে ওপার যাত্রা করার সময় সূর্যদেব সৌধটির তিন দিকে তাঁর আলো ফেলেন। বেদির উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে চব্বিশটি প্রকাণ্ড চাকা খোদাই করা। গোটা জিনিসটাই সাতটি ঘোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এমন গতিতে, যেন স্বর্গের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে। মন্দিরের দিকে এগোতে-এগোতে কাপাসি বললেন যে, মন্দিরটা ১২৪৩ থেকে ১২৫৫ সালের সময়কালে বারোশো কারিগর মিলে তৈরি করেছিল। গঙ্গা সাম্রাজ্যের মহান সম্রাট রাজা প্রথম নরসিংহদেব মুসলমান সৈন্যদের পরাজিত করার স্মারকরূপে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।

মি. দাস তাঁর ট্যুর-বই পড়ে বললেন, "এখানে লিখেছে যে, মন্দিরটি আন্দাজ একশো সত্তর একর জমির ওপর অবস্থিত।"

"জায়গাটা মরুভূমির মতো লাগছে," রনি বলল। তার চোখ মন্দিরের চারপাশের বিস্তীর্ণ বালিতে ঘুরছিল।

"একসময় এর এক মাইল উত্তরে চন্দ্রভাগা নদী বইত। এখন শুকিয়ে গিয়েছে," কাপাসি ইঞ্জিন বন্ধ করে বললেন।

তাঁরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে মন্দিরের দিকে হাঁটা লাগালেন। মন্দিরের সিঁড়ির দু'পাশে যে সিংহজোড়া সিঁড়ির শোভাবর্ধন করে, তার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুললেন। তারপর কাপাসি তাঁদের রথের একটা চাকার কাছে নিয়ে গেলেন। কোনও মানুষের চেয়ে উঁচু চাকা, ন'ফিট ব্যাস।

"চাকাগুলো আমাদের জীবনচক্রের চিহ্নস্বরূপ," মি. দাস পড়লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এগুলো সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং উপলব্ধির চক্রকে চিত্রিত করে। বাহ!" তিনি পাতা ওলটালেন। "প্রতিটি চাকা আটটি মোটা এবং সরু পাখিতে বিভক্ত। অর্থাৎ একটি দিন আটটি সমান ভাগে ভাগ করা। পরিধিতে পশুপাখির ছবি খোদাই করা। চাকার পাখিতে যে সজ্জাফলক আছে, সেখানে বিলাসবহুল ভঙ্গিমায় নারীমূর্তি খোদাই করা, প্রধানত কাম বিষয়ক।"

তিনি অসংখ্য আলিঙ্গনবদ্ধ নগ্ন দেহের কারুকার্যখচিত সারির কথা বলছিলেন। ভালবাসার বিভিন্ন ভঙ্গিমায়, পুরুষের গলা জড়িয়ে থাকা নারীদেহ, তাদের জানু চিরকালের জন্য তাদের প্রেমিকের উরুদেশে জড়ানো। এ ছাড়াও আছে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের দৃশ্য, শিকার, ব্যাবসা, তির-ধনুক দিয়ে হরিণবধ, তলোয়ার হাতে যোদ্ধাদের সারি।

মন্দিরে প্রবেশ করা আর সম্ভব ছিল না। কারণ, অনেক বছর আগেই ভিতরের অংশটি ইটপাথরের টুকরোয় ভরে গিয়েছিল। কিন্তু এর চারদিকে ঘুরে, ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে তাঁরা বাইরের অংশটির প্রশংসা করলেন, যেমন কাপাসির নিয়ে আসা অন্যান্য পর্যটকরাও করে। মি. দাস ছবি তুলতে তুলতে এগোচ্ছিলেন বলে পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন। বাচ্চারা নগ্ন মূর্তিগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে সকলের আগে ছুটল। তারা বিশেষভাবে নাগমিথুনদের দেখে কৌতূহলী হয়েছিল। কাপাসি তাদের বললেন যে, সেই অর্ধমানব-অর্ধসর্পিল দম্পতিরা সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর অংশে থাকে। তাঁদের মন্দিরটা ভাল লেগেছে দেখে কাপাসি খুশি হলেন। মন্দিরটি মিসেস দাসের আকর্ষণীয় লেগেছে দেখে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হলেন। মিসেস দাস তিন-চার পা এগিয়েই থেমে যাচ্ছিলেন। প্রেমিক-প্রেমিকাদের যুগলমূর্তির দিকে, হাতিদের শোভাযাত্রার দিকে, অনাবৃতবক্ষ নারী-বাদ্যকারিণীদের ঢোল বাজানোর দিকে নীরবে তাকিয়ে ছিলেন।

কাপাসি এর আগে অসংখ্যবার মন্দিরে এসেছেন, কিন্তু সেদিন নগ্ন নারীমূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হল, তাঁর স্ত্রীকেও কখনও সম্পূর্ণভাবে নগ্ন অবস্থায় দেখেননি, এমনকী তাঁদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেও, তাঁর স্ত্রী ব্লাউজের হুকগুলো লাগিয়ে রাখেন, কোমর ঘিরে সায়ার দড়ি বেঁধে রাখেন। তিনি কখনও সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর স্ত্রীর পায়ের পিছন দিকটি দেখেননি, যেভাবে তিনি এখন মিসেস দাসের পা দুটি দেখছিলেন। মিসেস দাস যেন শুধু তাঁর জন্যই হাঁটছিলেন। তিনি যে পর্যটকদের এখানে নিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে

AMARBOI.COM

আমেরিকান এবং ইউরোপিয়ান মহিলাদের অনাবৃত হাত-পা তিনি এর আগে অসংখ্যবার দেখেছেন। কিন্তু মিসেস দাস তাদের সকলের চেয়ে আলাদা। অন্য মহিলারা শুধু মন্দিরেই আগ্রহী হন। গাইডবইয়ে নাক ডুবিয়ে রাখেন বা ক্যামেরার লেন্সের পিছনে চোখ আটকে রাখেন। মিসেস দাস শুধু মন্দিরই নয়, কাপাসির প্রতিও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কাপাসি মিসেস দাসের সঙ্গে একলা থাকার জন্য, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথন আবার শুরু করার জন্য অধীর হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি মিসেস দাসের পাশে হাঁটার সাহস পাচ্ছিলেন না। মিসেস দাস তাঁর সানগ্লাসের পিছনে হারিয়ে গিয়েছিলেন। আর-একটা ছবির জন্য তাঁর স্বামীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে, ছেলেমেয়েদের এমনভাবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন যেন তাদের চেনেন না। বিরক্ত করার ভয়ে কাপাসি আগে-আগে হাঁটছিলেন। প্রতিবারের মতো এবারও মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন ব্রোঞ্জের তৈরি সূর্যদেবতার তিনটি মানবাকৃতি অবতার। মন্দিরগাত্রে, নিজস্ব স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ণে দেবতাকে প্রণাম জানানোর জন্য। তাঁদের মাথায় অলংকৃত শিরোভূষণ। ঢুলু ঢুলু, টানা টানা চোখ বুজে আছে, অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গে কারুকার্যখচিত শৃঙ্খল এবং তাবিজ জড়ানো। ধূসর-সবুজ পায়ের কাছে আগের পর্যটকদের নিবেদন করা জবাফুলের পাপড়ি ছড়ানো। মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়ালে শেষ মূর্তিটি কাপাসির সবচেয়ে প্রিয়। সূর্যের এই মূর্তিটির মুখে ক্লান্তির ছাপ। সারাদিনের পরিশ্রমের পর পা মুড়ে ঘোড়ার ওপর বসে আছেন। এমনকী ঘোড়ার চোখও যেন ক্লান্তিতে বুজে আসছে। তাঁর শরীরের চারপাশে জোড়ায় জোড়ায় ছোট মাপের নারীমূর্তির ভাস্কর্য। তাদের নিতম্ব একদিকে হেলানো।

"ইনি কে?" মিসেস দাস জিজ্ঞেস করলেন। কাপাসি চমকে উঠে দেখলেন যে, মহিলা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"ইনি অস্তাচল-সূর্য" কাপাসি বললেন। "অস্তগামী সূর্য।"

"তার মানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সূর্য ঠিক এখানেই অস্ত যাবে?" মিসেস দাস তাঁর চৌকো হিলতোলা জুতো থেকে একটা পা বের করে পায়ের আঙুল অন্য পায়ের পিছনে ঘষলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

AMARBOI.COM

মিসেস দাস এক মুহূর্তের জন্য তাঁর সানগ্লাস উঠিয়ে আবার চোখে পরলেন। "নিট।"

কথাটির সঠিক অর্থ সম্বন্ধে কাপাসি নিশ্চিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মনে হল যে, এটি মিসেস দাসের সন্তোষসূচক প্রতিক্রিয়া। তিনি আশা করলেন, মিসেস দাস সূর্যের সৌন্দর্য, সূর্যের শক্তি উপলব্ধি করতে পারবেন। হয়তো তাঁরা তাঁদের চিঠিতে এই নিয়ে আরও আলোচনা করবেন। তিনি মিসেস দাসকে ভারতের নানা ব্যাপার বুঝিয়ে বলবেন এবং মিসেস দাস তাঁকে আমেরিকার কথা বলবেন। একদিক দিয়ে এই যোগাযোগ তাঁর স্বপ্নপূরণ করবে। দুই দেশের মধ্যে ভাষ্যকারের কাজ করার স্বপ্ন। তিনি মিসেস দাসের ঘাসের ব্যাগটি দেখলেন। ব্যাগটার মধ্যে তাঁর ঠিকানাও গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে ভেবে উৎফুল্ল হলেন। মিসেস দাস অত হাজার মাইল দূরে চলে যাবেন ভেবে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। তীব্র আকাঙ্ক্ষা হল মিসেস দাসকে জড়িয়ে ধরার। অন্তত এক মুহূর্তের জন্য, তাঁর প্রিয় সূর্যকে সাক্ষী রেখে মিসেস দাসের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে। কিন্তু মিসেস দাস ইতিমধ্যে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

"আপনারা আমেরিকায় কবে ফিরছেন?" কাপাসি তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন।

"দশ দিনের মধ্যে।"

কাপাসি মনে মনে হিসেব করলেন। ফিরে গিয়ে সব গুছিয়ে নিতে এক সপ্তাহ, ফোটো তৈরি হয়ে আসতে আরও এক সপ্তাহ। চিঠি লিখতে কয়েক দিন, ভারতে চিঠি পৌঁছোতে দু'সপ্তাহ। তাঁর হিসেব অনুযায়ী, বিভিন্ন জায়গায় দেরি হলেও, আন্দাজ ছ'সপ্তাহের মধ্যে তিনি মিসেস দাসের চিঠি পাবেন।

সাড়ে চারটের একটু পরে, হোটেল স্যান্ডি ভিলায় ফেরার পথে দাস-পরিবার চুপচাপ ছিলেন। বাচ্চারা একটি স্যুভেনিরের দোকান থেকে গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি রথের চাকার কয়েকটি ক্ষুদ্র সংস্করণ কিনেছিল, সেগুলোই নেড়েচেড়ে দেখছিল। মি. দাস বই পড়ছিলেন। মিসেস দাস তাঁর ব্রাশ দিয়ে টিনার চুলের জট ছাড়িয়ে দুটি ঝুঁটি বেঁধে দিচ্ছিলেন।

তাঁদের হোটেলে নামিয়ে দেওয়ার কথা ভেবে কাপাসি শঙ্কিত বোধ করতে

AMARBOI.COM

শুরু করলেন। মিসেস দাসের চিঠির জন্য ৮ সপ্তাহের অপেক্ষা শুরু করার জন্য তিনি তখনও প্রস্তুত হননি। মিসেস দাস টিনার চুলে ইলাস্টিকের ব্যান্ড জড়াচ্ছিলেন। রিয়ারভিউ আয়নায় তাঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কাপাসি ভাবার চেষ্টা করলেন কীভাবে আরও একটু দেরিতে ফেরা যায়। সাধারণত তিনি একটা শর্টকাট নিয়ে পুরীর দিকে গাড়ি ছোটান। বাড়ি ফেরার জন্য, চন্দন সাবান দিয়ে হাত-পা ধুয়ে, সন্ধেবেলা খবরের কাগজ এবং তাঁর স্ত্রী নীরবে তাঁকে যে চায়ের কাপ ধরিয়ে দেন সেটি উপভোগ করার জন্য অধীর হয়ে থাকেন। স্ত্রীর সেই নীরবতায় তিনি অনেকদিনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আজ সেই নীরবতার কথা ভেবে তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসল। তখনই তিনি উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরির পাহাড় দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। সেখানে এক গিরিসংকটের দু'পাশে কয়েকটি মঠের মতো সন্ন্যাসীদের বাসস্থান যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে। "জায়গাটা কয়েক মাইল দূরে, কিন্তু দেখলে ভাল লাগবে," বললেন মি. কাপাসি।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে লেখা আছে জায়গাটার কথা," মি. দাস বললেন। "কোনও জৈন রাজা বা ওইরকম কেউ নাকি বানিয়েছিলেন।"

"তা হলে কি আমরা যাব?" রাস্তার একটা বাঁকের কাছে থেমে কাপাসি জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে যাওয়ার রাস্তাটা বাঁ দিকে।"

মি. দাস স্ত্রীর দিকে ঘুরে তাকালেন। দু'জনেই কাঁধ ঝাঁকালেন।

"বাঁ দিকে, বাঁ দিকে," বাচ্চারা বলে উঠল।

কাপাসি গাড়ি ঘোরালেন। খুশিতে তাঁর প্রায় আত্মহারা লাগছিল। একবার পাহাড়ে পৌঁছোনোর পর তিনি মিসেস দাসকে কী বলবেন বা করবেন তা জানতেন না। হয়তো বলবেন তাঁর হাসিটা কত সুন্দর। হয়তো তাঁর স্ট্রবেরি শার্টের প্রশংসা করবেন, যা তাঁকে ভীষণভাবে মানিয়েছিল। হয়তো, মি. দাস ফোটো তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তিনি মিসেস দাসের হাত ধরবেন।

তাঁর অত চিন্তা করার দরকার ছিল না। ঘন নিবিড় গাছের নীচ দিয়ে খাড়া পথ বেয়ে পাহাড়ে পৌঁছোনোর পর মিসেস দাস গাড়ি থেকে নামতে রাজি হলেন না। হনুমানের দল সারা পথ জুড়ে পাথরের ওপর এবং গাছের ডালে বসে ছিল। তাদের পিছনের পা'গুলো সামনের দিকে টানটান করে কাঁধ পর্যন্ত ওঠানো, হাত হাঁটুর ওপর রাখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার পা দুটো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে," সিটে আরও গা এলিয়ে বসে মিসেস দাস বললেন। "আমি এখানেই থাকছি।"

"ওই বাজে জুতোগুলো পরতে গেলে কেন?" মি. দাস বললেন। "তোমার তা হলে ফোটো উঠবে না।"

"ধরে নাও আমি ওখানেই আছি।"

"কিন্তু ফোটোগুলোর মধ্যে কোনও একটা এ বছর ক্রিসমাস কার্ডের জন্য ব্যবহার করা যেত। সূর্যমন্দিরে আমাদের পাঁচজনের একটাও ফোটো তোলা হয়নি। মি. কাপাসি এখানে একটা তুলে দিতে পারেন।"

"আমি আসছি না। আর এমনিতেও, ওই বাঁদরগুলোকে দেখলে আমার অস্বস্তি হয়।"

"কিন্তু ওরা তো কোনও ক্ষতি করে না," মি. দাস বললেন। তিনি মি. কাপাসির দিকে ফিরলেন। "তাই না?"

"ওরা যত না বিপজ্জনক, তার চেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত," কাপাসি বললেন। "ওদের খাবারের লোভ দেখাতে যাবেন না, তা হলে ওরাও আপনাকে বিরক্ত করবে না।"

মি. দাস ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিরিসংকটের দিকে এগোলেন। ছেলেরা তাঁর পাশে, মেয়ে তাঁর কাঁধের ওপর। কাপাসি তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারা এক জাপানি পুরুষ এবং মহিলার মুখোমুখি হলেন। জাপানি দু'জন ছাড়া সেখানে আর কোনও পর্যটক ছিল না। জাপানিরা শেষ ফোটোর জন্য থেমে, তারপর কাছেই একটা গাড়িতে বসে চলে গেলেন। গাড়িটা যেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, কয়েকটা হনুমান মৃদু উল্লাসধ্বনি করে ডেকে উঠল, তারপর তাদের চ্যাপটা কালো হাত-পায়ে হেঁটে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেল। এক জায়গায় কয়েকটা হনুমান মি. দাস এবং বাচ্চাদের ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। টিনা উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার করে উঠল। রনি তার বাবাকে ঘিরে গোল-গোল হয়ে ছুটতে শুরু করল। ববি নিচু হয়ে মাটি থেকে একটা মোটাসোটা কাঠি তুলে নিল। কাঠিটা বাড়িয়ে ধরতেই একটা হনুমান এগিয়ে এসে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে কয়েকবার পেটাল।

"আমি ওদের সঙ্গে যাই," কাপাসি নিজের দিকের দরজাটা খুলে বললেন। "গুহাগুলো সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে।"

"না। এক মিনিট দাঁড়ান," মিসেস দাস বললেন। তিনি পিছনের সিট থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেমে কাপাসির পাশে এসে বসলেন। "রাজের কাছে ওই বোকা-বোকা বইটা তো আছেই।" কাপাসি এবং মিসেস দাস একসঙ্গে বসে উইন্ডশিল্ডের মধ্যে দিয়ে দেখলেন, ববি এবং হনুমানটা কাঠিটা দেওয়া-নেওয়া করতে লাগল।

"সাহসী ছেলে," কাপাসি মন্তব্য করলেন।

"সেটা খুব একটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়," মিসেস দাস বললেন।

"না?"

"ও ওর নয়।"

"আমি ঠিক বুঝলাম না।"

"রাজের। ও রাজের ছেলে নয়।"

কাপাসির মনে হল যেন তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। যে পদ্মফুল তেলের মলমটি তিনি সবসময় সঙ্গে রাখেন, সেটার জন্য পকেটে হাত ঢোকালেন। কপালে তিন জায়গায় এক ফোঁটা করে মলম লাগালেন। তিনি জানতেন যে, মিসেস দাস তাঁকে দেখছেন, কিন্তু মুখ ফেরালেন না। মি. দাস এবং বাচ্চাদের ঘিরে হনুমানের সংখ্যা বাড়ছিল। কাপাসি সামনে তাকিয়ে দেখলেন যে, মাঝেমধ্যে ছবি তোলার জন্য থেমে, খাড়া পথটা ধরে উঠতে উঠতে, তাঁদের দেহ ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে।

"আপনি কি অবাক হলেন?" যে সুরে মিসেস দাস প্রশ্নটা করলেন, তাতে কাপাসি বুঝলেন যে, তাঁকে খুব সাবধানে উত্তর দিতে হবে।

"এরকম একটা কথা তো কেউ ধরে নেয় না," কাপাসি ধীরে ধীরে বললেন। লোটাস-অয়েলের টিনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

"না, নিশ্চয়ই না। এবং বলাই বাহুল্য, কেউ জানেও না। কেউই না। আটটা বছর ধরে আমি কথাটা গোপন রেখেছি।" মিসেস দাস তাঁর চিবুক বেঁকিয়ে কাপাসির দিকে তাকালেন। যেন তাঁকে নতুন কোনও পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করছেন। "কিন্তু আজ আপনাকে বলে দিলাম।"

কাপাসি মাথা নাড়ালেন। তাঁর গলাটা হঠাৎ ভীষণ শুকনো লাগছিল। কপালটা মলম লাগানোর পর উষ্ণ এবং সামান্য অবশ লাগছিল। তিনি ভাবলেন মিসেস দাসের কাছে এক চুমুক জল খেতে চাইবেন কি না। তারপর ঠিক করলেন, চাইবেন না।

"আমাদের খুব অল্পবয়সে পরিচয় হয়," মিসেস দাস বললেন। তিনি তাঁর খাসের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে এক প্যাকেট মুড়ি বের করলেন। "খাবেন?"

AMARBOI.COM

"না, ধন্যবাদ।"

মিসেস দাস একমুঠো মুখে পুরে সিটে আর-একটু গা এলিয়ে বসলেন। কাপাসির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের জানলার বাইরে তাকালেন। "আমরা কলেজে থাকতেই বিয়ে করেছিলাম। যখন হাই স্কুলে ছিলাম, তখনই ও প্রোপোজ করে। বলা বাহুল্য আমরা একই কলেজে পড়েছিলাম। সেই সময় আমরা আলাদা থাকার কথা কল্পনা করতে পারতাম না। এক দিনের জন্য না, এক মিনিটের জন্যও না। আমাদের মা-বাবারা ভীষণ ভাল বন্ধু ছিলেন। একই শহরে থাকতেন। সারা জীবন আমাদের শনি-রবিবার দেখা হয়েছে। হয় আমার বাড়িতে, না হয় ওর। আমাদের ওপরের ঘরে খেলতে পাঠিয়ে আমাদের মা-বাবারা আমাদের বিয়ে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ারকি করতেন। একবার ভাবুন, তাঁরা কখনও আমাদের ধরতে পারেননি। যদিও আমার মনে হয় যে, এক দিক দিয়ে গোটা ব্যাপারটাই সেট-আপ ছিল। সেই শনি-রবিবারের রাতগুলোয়, যখন আমাদের মা-বাবারা নীচে বসে চা খেতেন, তখন আমরা যা-যা করতাম... আমি আপনাকে অনেক গল্প শোনাতে পারি, মি. কাপাসি।"

কলেজে সর্বক্ষণ রাজের সঙ্গেই থাকার জন্য, তাঁর বেশি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না, মিসেস দাস বললেন। কোনও সমস্যাপূর্ণ দিনের শেষে রাজের সম্বন্ধে কথা বলার কেউ ছিল না। কেউ ছিল না যার সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা ভাগ করে নেওয়া যায়। তাঁর মা-বাবা তখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকতেন। এমনিতেও তিনি কখনও মা-বাবার খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারেননি। অত অল্পবয়সে বিয়ে করার পর তিনি সবকিছু সামলাতে গিয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। অত তাড়াতাড়ি বাচ্চা হওয়া, তার দেখাশোনা করা, দুধের বোতল গরম করা, কবজিতে সেই বোতলের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা। রাজ সোয়েটার এবং কর্ডের প্যান্ট পরে কাজে বেরিয়ে যেত। ছাত্রদের পাথর এবং ডাইনোসর সম্পর্কে পড়াত। রাজকে দেখে কখনও বিরক্ত বা ব্যস্তসমস্ত মনে হত না। প্রথম বাচ্চাটি হওয়ার পর তিনি যেমন মোটা হয়ে গিয়েছিলেন, সে তেমন হয়নি।

সবসময় ক্লান্ত বোধ করায় তিনি কলেজের যে দু'-একজন বান্ধবী ছিল, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা বা ম্যানহাটনে কেনাকাটা করার নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিতেন। ধীরে ধীরে তারা তাঁকে ফোন করা বন্ধ করে দিল। ফলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাদিন তিনি বাচ্চাটার সঙ্গে বাড়িতেই পড়ে থাকতেন। বাচ্চাটার খেলনাগুলো চারপাশে ছড়িয়ে থাকত, হাঁটার সময় হোঁচট খেতেন। কোনওটার ওপর ভুল করে বসে পড়তেন। সবসময় ক্লান্ত, সবসময়ই বিরক্ত লাগত। রনি জন্মানোর পর তাঁরা খুবই কম বেড়াতে যেতেন। কাউকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন তার চেয়েও কম। রাজের কোনও অসুবিধে হত না। সে পড়ানোর পর বাড়ি ফিরে এসে টিভি দেখতে এবং রনিকে কোলে বসিয়ে নাচাতে পছন্দ করত। রাজের এক পঞ্জাবি বন্ধু নিউ ব্রুন্সউইক এলাকায় কয়েকটি চাকরির ইন্টারভিউর জন্য আসছিল। মিসেস দাসের সঙ্গে একবার তার দেখা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাকে মনে করতে পারছিলেন না। সে এক সপ্তাহের জন্য তাদের সঙ্গে থাকতে আসবে শুনে তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন।

ববিকে তিনি গর্ভে ধারণ করেন এক দুপুরে, রাবারের খেলনা ছড়ানো একটা সোফার ওপর। বন্ধুটি তার আগেই জানতে পেরেছিল যে, লন্ডনের এক ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিতে সে একটি চাকরি পেয়েছে। রনি তার প্লে-পেন থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য কান্না জুড়েছিল। মিসেস দাস কফি তৈরি করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বন্ধুটি তার পিছনে স্পর্শ করে তারপর নিজের নীল সুট পরা শরীরের দিকে টেনে নেয়। মিসেস দাস কোনও প্রতিবাদ করেননি। বন্ধুটি নিঃশব্দে, ত্বরিতগতিতে তাঁর সঙ্গে সহবাস করেছিল। এমন এক নৈপুণ্যের সঙ্গে, যার অভিজ্ঞতা তাঁর আগে কখনও হয়নি। রাজ সবসময় ভালবাসার পরে যে অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি এবং হাসির ওপর জোর দিত, বন্ধুটির সে সব বালাই ছিল না। তার পরের দিন রাজ গাড়ি চালিয়ে বন্ধুটিকে জে এফ কে-তে পৌঁছে দিয়েছিল। বন্ধুটি এক পঞ্জাবি মেয়েকে বিয়ে করেছে, তারা এখনও লন্ডনে থাকে। প্রতি বছর তাদের সঙ্গে দাসদম্পতির ক্রিসমাস কার্ডের আদানপ্রদান হয়। দু'পক্ষই খামে তাদের পরিবারের ফোটো গুঁজে দেয়। বন্ধুটি জানে না যে, ববি তার সন্তান। কোনওদিন জানবেও না।

অবশেষে মিসেস দাস কথা বলা শেষ করে কাপাসির দিকে ফিরলেন। কাপাসি বললেন, "ক্ষমা করবেন, মিসেস দাস, কিন্তু আপনি আমাকে এই কথাগুলো জানালেন কেন?"

"দয়া করে আমাকে মিসেস দাস বলা বন্ধ করুন। আমার আটাশ বছর বয়স। আপনার ছেলেমেয়েই হয়তো আমার বয়সি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, ঠিক তা না।" কাপাসি ভেবে অস্বস্তি বোধ করলেন যে, মিসেস দাস তাঁকে এক পিতা হিসেবে ভাবছেন। মিসেস দাসের প্রতি তাঁর মনে যে অনুভূতি জন্ম নিয়েছিল, যে জন্য তিনি গাড়ি চালানোর সময় রিয়ারভিউ আয়নায় নিজেকে দেখছিলেন, তা সামান্য ফিকে হয়ে গেল।

"আমি আপনাকে বললাম আপনার বিশেষ দক্ষতার জন্য।" মিসেস দাস মুড়ির প্যাকেটের মুখটা না মুড়েই সেটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলেন।

"ঠিক বুঝলাম না।" কাপাসি বললেন।

"বুঝতে পারছেন না? আট বছর ধরে আমি কথাটা কাউকে জানাতে পারিনি। কোনও বন্ধুকে না। রাজকে তো নয়ই। ও কিছু সন্দেহও করে না। ও ভাবে যে, আমি এখনও ওকে অতটাই ভালবাসি। আপনার কিছু বলার নেই এ ব্যাপারে?"

"কী ব্যাপারে?"

"যে জন্য আমি এইমাত্র আপনাকে এতগুলো কথা বললাম। আমার জীবনের গোপন কথা। আমার কতটা খারাপ লাগে এ-ব্যাপারে সেই কথা। আমার বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে, রাজের দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। সবসময় ভীষণ খারাপ লাগে মি. কাপাসি। আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়, জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে দেওয়ার। একদিন আমার ইচ্ছে হয়েছিল আমার যা-যা আছে সব জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়ার। টিভি, বাচ্চাগুলো, সবকিছু। আপনার কি মনে হয় না যে, এটা অস্বাস্থ্যকর?"

কাপাসি চুপ করে থাকলেন।

"মি. কাপাসি, আপনার কি কিছুই বলার নেই? আমি ভেবেছিলাম যে, এটাই আপনার কাজ।"

"আমার কাজ পর্যটকদের ট্যুরে নিয়ে যাওয়া, মিসেস দাস।"

"ওই কাজটা নয়। আপনার অন্য কাজ— দোভাষীর কাজ।"

"কিন্তু আমাদের মধ্যে তো ভাষাগত বাধা নেই। দোভাষীর দরকারটা কোথায়?"

"আমি তা বলতে চাইনি। আমি নয়তো আপনাকে কিছু বলতামই না। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, আমার আপনাকে এই কথাগুলো বলার অর্থ কী?"

"কী অর্থ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই যে, আমি সবসময় এত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আট বছর, মি. কাপাসি। আট বছর ধরে আমি এই বেদনা সহ্য করছি। আমার আশা ছিল যে, আপনি আমার ব্যথা লাঘব করতে পারবেন। আমার কথার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। কোনও প্রতিকার বাতলে দিতে পারবেন।"

কাপাসি মিসেস দাসের দিকে তাকালেন। লাল চেক-কাটা স্কার্ট, স্ট্রবেরি টি-শার্ট পরা, এমন এক মহিলা, যে তার স্বামীকে ভালবাসে না, ছেলেমেয়েদের ভালবাসে না, যে ইতিমধ্যেই জীবনের প্রতি সব ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছে। তার স্বীকারোক্তি কাপাসিকে বিষাদগ্রস্ত করল। আরও বিষণ্ন লাগল যখন তিনি মি. দাসের কথা ভাবলেন। কাঁধের ওপর টিনাকে বসিয়ে আমেরিকায় তাঁর ছাত্রছাত্রীদের দেখানোর জন্য পাহাড়ের গা কেটে তৈরি করা প্রাচীন মঠের কক্ষের ছবি তুলছেন। অসন্দিগ্ধ, অপরিজ্ঞাত যে, তাঁর একটি সন্তান তাঁর নিজের নয়। মিসেস দাস তাঁকে এমন সাধারণ, তুচ্ছ, গোপন কথার ব্যাখ্যা করতে বলেছেন এই ভেবে মি. কাপাসি অপমানিত বোধ করলেন। ডাক্তারের অফিসের রুগিদের সঙ্গে তাঁর কোনওই মিল নেই। তারা নিষ্প্রভ চোখে, মরিয়া হয়ে আসে। সহজে ঘুমোতে বা নিশ্বাস নিতে বা প্রস্রাব করতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, নিজেদের বেদনাকে কথায় প্রকাশ করতে পারে না। তা সত্ত্বেও, কাপাসির মনে হল, মিসেস দাসকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য। হয়তো তাঁর মিসেস দাসকে বলা উচিত যে, তিনি যেন মি. দাসের কাছে সব কথা স্বীকার করেন। তিনি মিসেস দাসকে বোঝাবেন যে, সততাই সবচেয়ে ভাল উপায়। মিসেস দাস যে খারাপ লাগার অনুভূতির কথা বলছিলেন, সততাই তা কমাতে পারে। হয়তো তিনি সেই আলোচনায় মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দেবেন। তিনি ঠিক করলেন যে, সবচেয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরু করবেন যাতে সমস্যার গভীরে যাওয়া যায়। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সমস্যাটা কি সত্যিই কোনও বেদনা, মিসেস দাস, নাকি অপরাধবোধ?"

মিসেস দাস ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন। তাঁর শীতল, গোলাপি ঠোঁটের ওপর সর্ষের তেল ঘন হয়ে লেগে ছিল। তিনি কিছু বলবেন বলে মুখ খুললেন, কিন্তু কাপাসির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি যেন কোনও বিশেষ সত্য উপলব্ধি করে থেমে গেলেন। কাপাসি চূড়ান্তভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দমে গেলেন। সেই মুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি যথার্থভাবে অপমান করারও যোগ্য নন। মিসেস দাস গাড়ির দরজা খুলে, তাঁর চৌকো কাঠের হিলের ওপর সামান্য টাল খেতে খেতে হাঁটতে শুরু করলেন। ঘাসের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে মুঠোভরতি মুড়ি খেলেন। মুড়িগুলো তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে রাস্তার ওপর আঁকাবাঁকা চিহ্ন রেখে গেল। একটা হনুমান গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে সাদা ছোট্ট দানাগুলো রসিয়ে-রসিয়ে খেল। তারপর আরও মুড়ির খোঁজে মিসেস দাসের পিছনে হাঁটতে শুরু করল। তার জাতভাইরাও যোগ দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই, আন্দাজ আধডজন হনুমান মিসেস দাসের পিছন পিছন যেতে লাগল। তাদের মখমলের মতো লেজগুলো মাটিতে লুটোচ্ছিল।

কাপাসি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। তিনি চিৎকার করতে চাইছিলেন, কোনওভাবে মিসেস দাসকে সাবধান করতে চাইছিলেন। কিন্তু তাঁর ভয় হল যে, হনুমানগুলো তাঁর পিছনে আসছে জানলে মিসেস দাস নার্ভাস হয়ে পড়বেন। হয়তো তাঁর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবেন। হয়তো ওরা তাঁর ব্যাগ বা চুল ধরে টানাটানি শুরু করবে। কাপাসি দ্রুত পদক্ষেপে রাস্তা দিয়ে এগোলেন। হনুমানদের তাড়ানোর জন্য মাটি থেকে ডাল তুলে নিলেন। মিসেস দাস কোনও দিকে কিছু খেয়াল না করে মুড়ির চিহ্ন তৈরি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ঢালুর শেষপ্রান্তে, এক শ্রেণিবদ্ধ কক্ষের সামনে পাথরের এক সারি বেঁটেমোটা থাম আছে। মি. দাস সেখানে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে ক্যামেরার লেন্স ফোকাস করছিলেন। বাচ্চারা খিলানে ঢাকা পথে একবার দেখা দিচ্ছিল, আবার লুকিয়ে পড়ছিল।

"অপেক্ষা করো," মিসেস দাস ডাকলেন। "আমি আসছি।"

টিনা লাফাতে শুরু করল। "মা আসছে!"

"বাহ," মি. দাস ক্যামেরা থেকে মুখ না তুলেই বললেন। "ঠিক সময়ে এসেছ। মি. কাপাসিকে বলছি আমাদের পাঁচজনের একটা ফোটো তুলে দিতে।"

কাপাসি তাঁর হাঁটার গতি বাড়ালেন। হনুমানগুলোকে ছত্রভঙ্গ করতে ডালটা হাওয়ায় নাড়ালেন।

"ববি কোথায়?" থেমে গিয়ে মিসেস দাস জিজ্ঞেস করলেন।

মি. দাস ক্যামেরা থেকে চোখ তুললেন। "জানি না তো। রনি, ববি কোথায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রনি কাঁধ ঝাঁকাল। "এখানেই তো ছিল।"

"কোথায় ছেলেটা?" মিসেস দাস কড়া স্বরে আবার জিজ্ঞেস করলেন। "কী হয়েছে কী তোমাদের সকলের?"

তাঁরা রাস্তার এদিক-ওদিক গিয়ে ববির নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন। ডাকাডাকির জন্যই প্রথমে ছেলেটার চিৎকার শুনতে পাননি। যখন কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের তলায় তাকে খুঁজে পেলেন, তখন এক ডজনেরও বেশি হনুমান ঘিরে ধরে তাদের লম্বা কালো আঙুল দিয়ে তার শার্ট ধরে টানছিল। মিসেস দাসের ফেলা মুড়ি হনুমানগুলো হাতে করে তার পায়ের কাছে জড়ো করেছিল। ছেলেটা ভয়ে সিঁটিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। চমকে যাওয়া মুখে ঝরঝর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল। তার অনাবৃত পা ধুলোময় হয়ে গিয়েছিল। যে কাঠিটা সে একটা হনুমানকে দিয়েছিল, সেটা দিয়ে হনুমানটা সমানে তার পায়ে আঘাত করার ফলে পায়ে লাল দাগড়া-দাগড়া দাগ হয়ে গিয়েছিল।

"বাবা, বাঁদরটা ববিকে মারছে," টিনা বলে উঠল।

মি. দাস তাঁর হাতের তালু দুটো শর্টসের সামনে মুছলেন। ঘাবড়ে গিয়ে ভুল করে ক্যামেরার শাটার টিপে ফেললেন। ফিল্মের ঘরঘর শব্দে হনুমানগুলো উত্তেজিত হয়ে ববিকে আরও জোরে মারতে লাগল। "আমাদের এখন কী করা উচিত? ওরা যদি হামলা করতে শুরু করে?"

"মি. কাপাসি," কাপাসিকে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিসেস দাস চিৎকার করে উঠলেন। "কিছু একটা করুন, দয়া করে, কিছু একটা করুন।"

কাপাসি তাঁর হাতের ডালটা দিয়ে হনুমানগুলোকে তাড়ালেন। যেগুলো থাকল, সেগুলোকে 'হুস-হুস' করলেন, ভয় পাওয়ানোর জন্য মাটিতে পা দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন। জন্তুগুলো আস্তে আস্তে মাপা-মাপা পদক্ষেপে পিছু হটল। বাধ্য, কিন্তু আদৌ পরাস্ত নয়। কাপাসি ববিকে কোলে তুলে যেখানে তার মা-বাবা এবং ভাইবোন দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে নিয়ে এলেন। তাকে কোলে নেওয়ার সময় তাঁর লোভ হচ্ছিল ছেলেটার কানে কানে একটা গোপন কথা বলে দেন। কিন্তু ববি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, ভয়ে কাঁপছিল। পায়ের কোনও কোনও জায়গায় ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। কাপাসি তাকে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার পর মি. দাস তার টি-শার্ট থেকে ধুলো ঝেড়ে ভিসরটা সোজা করে দিলেন। মিসেস দাস তাঁর ঘাসের ব্যাগ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে একটা ব্যান্ড-এড বার করে ববির পায়ে লাগিয়ে দিলেন। রনি ভাইকে এক টুকরো তাজা চুয়িং গাম দিতে চাইল। "ও ঠিক আছে। শুধু একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই না, ববি?" মি. দাস ববির মাথা চাপড়ে দিলেন।

"বাব্বাহ, এখান থেকে বেরোই, চলো," মিসেস দাস বললেন। তিনি তাঁর ব্লেরি টি-শার্টের ওপর হাতদুটো ভাঁজ করলেন। "এই জায়গাটায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

"হ্যাঁ, হোটেলে ফিরে যেতেই হবে, নিশ্চয়ই," মি. দাস সায় দিলেন।

"বেচারা ববি," মিসেস দাস বললেন। "একবার এখানে আয়। মা তোর চুলটা ঠিক করে দেবে।" আবার তাঁর ঘাসের ব্যাগে হাত ঢোকালেন। এবার চিরুনিটা বার করে ববির স্বচ্ছ ভিসরের চারপাশে আঁচড়াতে শুরু করলেন। চিরুনিটা টান মেরে বের করার সময় মি. কাপাসির ঠিকানা লেখা কাগজটা বেরিয়ে হাওয়ায় উড়ে গেল। কাপাসি ছাড়া কেউ সেটা লক্ষ করলেন না। কাপাসি দেখলেন যে, কাগজটা হাওয়ার দাপটে অনেক ওপরে উঠে গেল। যে গাছগুলোর ডালে হনুমানের দল বসে গম্ভীরভাবে নীচের দৃশ্য দেখছিল, কাগজটা অত উঁচুতে উড়ে গেল। কাপাসিও দৃশ্যটি দেখলেন। তিনি জানতেন যে, দাস-পরিবারের এই ছবিটিই চিরকাল তাঁর মনে থেকে যাবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহারাদার

বুড়িমা দু'রাত্তির ঘুমোয়নি। তাই তৃতীয় দিন সকালে সে বিছানার তোশকগুলোকে নিয়ে একবার ডাকবাক্সর তলায় যেখানে সে থাকে, আর একবার গলির মুখে নিয়ে গিয়ে ঝেড়ে পোকা বের করতে লাগল। গলির মুখে একদল কাক শাকসবজির খোসা খেতে ব্যস্ত ছিল, সেগুলো ঘাবড়ে গিয়ে চারদিকে উড়ে গেল।

বুড়িমা চারতলা বিল্ডিং-এর সিঁড়িগুলো ঝাঁট দেয়। একতলা থেকে ওপরে ওঠা শুরু করার আগে সে যে হাঁটুটা প্রতি বছর বর্ষার শুরুতে ফুলে ওঠে, সেটার ওপর একটা হাত রাখল। অর্থাৎ বালতি, তোশক আর ঝাঁটা সব একসঙ্গে জড়িয়ে ধরতে হল আর-এক হাতে। ইদানীং বুড়িমার মনে হয় সিঁড়িগুলো যেন বড্ড বেশি খাড়া হয়ে গিয়েছে। ওগুলো ভেঙে ওঠা প্রায় মই দিয়ে ওঠার সামিল হয়ে পড়েছে। বুড়িমার বয়েস চৌষট্টি। চুলটা একটা আখরোটের মাপের ছোট্ট খোঁপায় বাঁধা। দেহটা সামনে থেকে আর পাশ থেকে প্রায় সমান সরু।

একমাত্র বুড়িমার গলার স্বরেই কিছুটা জোর আছে বলে মনে হয়। বহু দুঃখ-কষ্টে ভঙ্গুর, দইয়ের মতো অম্ল আর এমন খনখনে যে নারকেলের শাঁস বের করে আনবে। এই গলাতেই প্রতিদিন দু'বার সিঁড়ি ঝাঁট দিতে দিতে বুড়িমা তার দুঃখের কথা শোনায়। দেশভাগের পরে কলকাতায় নির্বাসিত হয়ে আসার পর তার কষ্ট ও দুরবস্থার কথা। সেই গোলমালে বুড়িমা তার স্বামী, চার মেয়ে, একটা দোতলা বাড়ি, একটা গোলাপকাঠের আলমারি আর একাধিক সিন্দুকের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই সিন্দুকের চাবি এখনও তার সারাজীবনের সঞ্চয়ের সঙ্গে আঁচলের প্রান্তে বাঁধা থাকে।

দুঃখের কথা ছাড়া বুড়িমা যেটা শোনাতে ভালবাসে, সেটা হল সুখের কথা। তাই তিনতলার ল্যান্ডিং এ পৌঁছোতে পৌঁছোতে গোটা বিল্ডিং-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক বুড়িমার সেজ মেয়ের বিয়ের মেনু জানতে পেরে যায়। "একটা স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলুম। গোলাপজলে ভাত রান্না হয়েছিল গো। নগরপালকে নেমন্তন্ন করেছিলুম। কাঁসার বাটিতে হাত ধুয়েছিল সকলে।" এই অবধি বলে বুড়িমা একটু হাঁপিয়ে নেয়। হাতের মালপত্রগুলো একটু গুছিয়ে নিয়ে আর সিঁড়ির রেলিং থেকে একটা আরশোলা তাড়িয়ে আবার শুরু করে, "সর্ষে-চিংড়ির পাতুরি হয়েছিল। কোনও খাবার বাদ যায়নি! এসব অবিশ্যি আমাদের বাড়াবাড়ি ছিল না। সপ্তায় দু'বার মাংস রান্না হত আমাদের বাড়িতে। জমিতে পুকুর ছিল— কিলবিল করছে মাছ!"

ইতিমধ্যে ছাদ থেকে সিঁড়ির ধাপে এসে পড়া আলোর চিলতে দেখা যায়। সবে সকাল আটটা হলেও কড়া রোদে বুড়িমার পায়ের তলায় সিমেন্টের সিঁড়ির ধাপগুলো তেতে ওঠে। এই ফ্ল্যাটবাড়িটা খুবই পুরনো। এখানে এখনও চানের জল চৌবাচ্চায় রাখতে হয়। জানলাগুলোয় কাচ নেই।

"আমাদের বাড়িতে খেজুর আর পেয়ারা পাড়তে একটা লোক আসত। আর-একজন এসে জবাগাছগুলো ছেঁটে দিয়ে যেত। হ্যাঁ বাবা, জীবনের স্বাদ পেয়েছিলাম বটে! এখানে তো ভাতের হাঁড়ি থেকে খেতে হয়।" অ্যাদ্দুর এসে বুড়িমার কান ঝনঝন করে। ফোলা হাঁটুটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। "মোটে একগাছা চুড়ি পরে এপারে এয়েচি, বলেছি তোমাদের? আর একসময় শ্বেতপাথরের মেঝেয় ছাড়া পা পড়ত না আমার! বিশ্বাস করো কি না-ই করো, সেসব সুখসাচ্চন্দ স্বপ্নেও ভাবা যায় না!"

বুড়িমার দাবিগুলো কতটা সত্যি আর কতটা অতিরঞ্জিত কেউই ঠিক করে বলতে পারত না। এক তো প্রতিদিনই তার সম্পত্তি আর জমিজমার পরিমাণ একটু একটু করে বাড়ত। তার ওপর আলমারি আর সিন্দুকের ভিতরের জিনিসেরও মূল্যবৃদ্ধি হত। তবে সে যে উদ্বাস্তু সেই ব্যাপারে কারও কোনও সন্দেহ ছিল না। তার ভাষা শুনলেই বোঝা যেত ওপারের লোক। কিন্তু আরও হাজার হাজার লোকের সঙ্গে ট্রাকের পিছনে, খড়ের গাদার মধ্যে বসে বুড়িমা পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে এসেছে, এ কথা বিশ্বাস করা গেলেও, তার ধনদৌলতের গল্প বিল্ডিং-এর বাসিন্দারা বিশ্বাস করতে পারত না। কোনওদিন আবার বুড়িমা বলত যে, সে সীমান্ত পার করেছিল গোরুর গাড়িতে চেপে। "ট্রাক না গোরুর গাড়ি?" ফ্ল্যাটের ছেলেমেয়েরা সিঁড়ির মধ্যে চোর-পুলিশ খেলতে খেলতে জিজ্ঞেস করত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অত জেনে কী হবে?" বুড়িমার আঁচলের প্রান্তে চাবির গোছা ঝনঝনিয়ে উঠত। "পান থেকে চুন খসার উপায় নেই? বিশ্বাস করো কি না-ই করো, আমার জীবনে যে কত দুঃখ-কষ্ট গেচে, সে তোমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।"

তার কথাবার্তার ঠিক থাকত না। কোনওদিন এক রকম আর কোনওদিন উলটো কথা বলত। গল্পগুলোয় নিত্যনতুন রং চড়াত। কিন্তু কথাগুলো এত জোর দিয়ে বলত, এত খুঁটিনাটি নিয়ে হা-হুতাশ করত যে, সেগুলো ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়াও যেত না।

চারতলার দালালবাবু কলেজ স্ট্রিটের প্লাম্বিং-এর এলাকায় রবারের টিউব, পাইপ আর ভালভের পাইকারি বিক্রেতার অফিসে রসিদ লিখতেন। রোজ অফিস যাওয়া-আসার পথে বুড়িমার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হলেই তাঁর মনে হত, কোনও অবস্থাপন্ন বাড়ির বউ শেষজীবনটা সিঁড়ি ঝাঁট দিয়ে কাটায়? বেচারি! নিজের পরিবারকে হারানোর দুঃখ এইভাবে গল্প বানিয়ে প্রকাশ করে, এই ছিল বিভিন্ন ফ্ল্যাটের গৃহিণীদের সমবেত মতামত।

আর চ্যাটার্জিবাবুর বক্তব্য ছিল, "বুড়িমার মুখে ছাই, কিন্তু বেচারা পরিবর্তনের শিকার তো বটেই।" দেশ স্বাধীনতালাভ করার পর থেকে চ্যাটার্জিবাবু একটা খবরের কাগজও খুলে দেখেননি। নিজের বারান্দা থেকে একবারও নড়ে বসেছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বা হয়তো সেই কারণেই, তাঁর মতামতকে সব সময়েই খুব গুরুত্ব দেওয়া হত।

শেষে সকলে ধরে নিল যে, বুড়িমা নিশ্চয়ই অতীতে কখনও পূর্ববঙ্গের কোনও জমিদারের বাড়ি কাজ করেছে। তাই এত বিশদ বিবরণ দিয়ে গল্পগুলো বলতে পারে। মিথ্যে কথাগুলো জোর গলায় বললেও তাতে কারও কোনও ক্ষতি তো হত না। বরং সকলে একবাক্যে স্বীকার করল যে, বিনোদনের এর চেয়ে ভাল উপায় আর হতে পারে না। তা ছাড়াও, ডাকবাক্সর তলায় থাকার অনুমতির বদলে বুড়িমা বাঁকাচোরা সিঁড়িগুলো ঝাঁট দিয়ে ঝকঝকে-তকতকে করে রাখত। সবচেয়ে বড় কথা, কোলাপসিবল গেটটার পিছনে শুয়ে বুড়িমা রোজ রাত্রে বাইরের জগৎটার থেকে তাদের যেন আগলে রাখত বলে, ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা বেশ নিশ্চিন্ত ছিল।

অবশ্য চুরি করার মতো মূল্যবান এই বিল্ডিং-এ কারও কিছু ছিল না। একমাত্র তিনতলায় বিধবা মিসেস মিশ্রর একটা টেলিফোন ছিল, এই যা।

AMARBOI.COM

তাও বুড়িমা গলির কাণ্ডকারখানার ওপর নজর রাখত, চিরুনি, শাল ইত্যাদি বিক্রি করতে আসা ফেরিওয়ালাদের বেশি কাছে ঘেঁষতে দিত না। বলতে না বলতেই রিকশা ডেকে এনে হাজির করতে পারত আর এক ধমকেই, গলিতে কুমতলবে আসা কোনও সন্দেহজনক লোককে ভাগিয়ে দিতে পারত। ফ্ল্যাটের লোকজন তাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমা বাড়িটার পাহারাদার হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত এই কাজটা কোনও মহিলার নয়। কিন্তু বুড়িমা আন্তরিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করত। লোয়ার সার্কুলার রোড বা যোধপুর পার্ক বা শহরের অন্য কোনও অভিজাত এলাকার বাড়িগুলোরও বোধহয় এত কড়া পাহারাদার ছিল না।

ছাদে গিয়ে বুড়িমা তোশকগুলো কাপড়ের দড়িতে মেলে দিল। ছাদের এক কোণ থেকে আর-এক কোণে টাঙানো দড়িটা অন্যান্য ছাদের টিভির অ্যান্টেনা, বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং আর বহুদূরের ধোঁয়াটে হাওড়া ব্রিজটার ওপর দিয়ে টানা একটা কালো দাগের মতো লাগত। বুড়িমা চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছাদের কলে মুখ-হাত-পা ধুয়ে দু আঙুল দিয়ে দাঁতটাও মেজে নিল। তারপর ঝাঁটা দিয়ে তোশকগুলো পেটাতে লাগল। আর কয়েক মিনিট অন্তর-অন্তর হাত চালানো থামিয়ে, ঝুঁকে পড়ে মাটিতে তার রাত জাগার কারণটা খুঁজতে লাগল। এই কাজে বুড়িমা এত মগ্ন ছিল যে, কখন চারতলার দালালগিন্নি রোদে লেবুর আচার শুকোতে দিতে এসেছে সে টেরই পায়নি।

"তোশকের মধ্যে যে কী ঢুকেছে, রাতে ঘুমোতে দিচ্ছে না," বুড়িমা বলল। "দেখো তো বাছা, কোনও কিছু দেখতে পাচ্ছ কি না?"

বুড়িমার ওপর দালালগিন্নির একটু দুর্বলতা ছিল। মাঝে মাঝে সে বুড়ো মানুষটাকে রান্নার জন্য এক চিমটে আদাবাটা দিয়ে যেত। "আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না," তিনি বললেন। দালালগিন্নির চোখের পাতাগুলো খুব পাতলা। পায়ের সরু সরু আঙুলে রিং পরা।

"তা হলে নিশ্চয়ই ওগুলোর পাখা আছে," বলল বুড়িমা। ঝাঁটাটা রেখে মাথার ওপর একটা মেঘকে আর-একটা মেঘের পিছনে সরে যেতে দেখল। "মারার আগেই উড়ে যায়। কিন্তু আমার পিঠটা একবার দেখো। কালশিটে পড়ে গেচে গো!"

দালালগিন্নি বুড়িমার পিঠ থেকে পুকুরের নোংরা জলের মতো রঙের

AMARBOI.COM

পাড়ওয়ালা সস্তা সাদা শাড়িটা সরিয়ে দেখলেন। আজকাল অমন গলার ব্লাউজ আর তৈরি হয় না। ব্লাউজের ওপর দিকের আর নীচের চামড়া খুঁটিয়ে দেখে দালালগিন্নি বললেন, "ও তোমার মনের ভুল বুড়িমা।"

"আমি বলছি তোমায়! পোকাগুলো আমায় খেয়ে ফেলছে একেবারে!"

"ঘামাচি হয়েছে হয়তো," বললেন দালালগিন্নি।

বুড়িমা আঁচল দুলিয়ে চাবির গোছা ঝনঝনিয়ে বলল, "ঘামাচি আমি চিনি। এটা ঘামাচি নয়। তিন রাত্তির কি চার রাত্তির ঘুমোইনি— কে শুনবে? বিছানাপত্তর পরিষ্কার করে রাখতাম আমি। মুসলিনের চাদর ছিল আমাদের। বিশ্বাস করো কি না-ই করো, আমাদের মশারিগুলো সিল্কের মতো নরম ছিল। এত সুকসাচ্চন্দ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।"

"স্বপ্নেও ভাবতে পারব না," আওড়ালেন দালালগিন্নি। চোখের পাতলা পাতা দুটো নিচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না বুড়িমা। দুটো ভাঙাচোরা ঘরে থাকি। এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, যে বাথরুমের জিনিসপত্র বিক্রি করে," দালালগিন্নি মুখ ঘুরিয়ে তোশকগুলোর দিকে তাকালেন। সেলাইয়ের ওপর একটা আঙুল বুলিয়ে বললেন, "বুড়িমা, কত বছর এই বিছানায় শুচ্ছ?"

ঠোঁটে আঙুল রেখে কিছুক্ষণ ভাবার পর বুড়িমা বলল যে, তার মনে পড়ে না।

"তা হলে আজ অবধি বলোনি কেন? তুমি কি ভাবো আমরা একটা পরিষ্কার তোশকও এনে দিতে পারব না তোমাকে? বা অন্তত পক্ষে একটা অয়েলক্লথ?" ক্ষুব্ধ স্বরে দালালগিন্নি বললেন।

"কোনও দরকার নেই বাছা," বুড়িমা বলল। "এখন তো পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি এই ঝাঁটা দিয়ে ঝেড়ে নিয়েছি।"

"আমি কোনও কথা শুনব না," দালালগিন্নি বললেন। "তোমার একটা নতুন বিছানা দরকার। তোশক, বালিশ, শীতকালে একটা লেপ," দালালগিন্নি দরকারি জিনিসগুলো আঙুলে গুনতে লাগলেন।

"পুজো-আচ্চার দিনে গরিবগুর্বোরা আমাদের বাড়িতে খেতে আসত," বুড়িমা বলল। সে ছাদের অন্য দিক থেকে কয়লা নিয়ে বালতি ভরতি করছিল।

"উনি বাড়ি ফিরলে আমি একবার কথা বলব," সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে

AMARBOI.COM

দালালগিন্নি ডেকে বললেন। "দুপুরবেলা এসো একবার। একটু আচার করেছি, দেব। আর তোমার পিঠে লাগানোর জন্য একটু পাউডার।"

"ওগুলো ঘামাচি নয়," বুড়িমা বলল। বর্ষাকালে ঘামাচি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বুড়িমা ভাবতে চাইছিল যে, রাতে যেটা তাকে বিরক্ত করত, ঘুমোতে দিত না, তার কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় মরিচের মতো জ্বালা ধরাত, সেটা ঘামাচির চেয়ে বড় কোনও কারণ।

বুড়িমা সবসময়ই ওপর থেকে নীচে নামতে নামতে ঝাঁট দেয়। এখনও ঝাঁট দিতে দিতে নামছিল আর এইসব কথা ভাবছিল, এমন সময় বৃষ্টিটা এল। একটা বাচ্চা ছেলে বড় সাইজের হাওয়াই চটি পরে ঘুরলে যেমন শব্দ হয়, তেমন চটাস-চটাস শব্দ করে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছাদের ওপর পড়তে লাগল। দালালগিন্নির লেবুর আচার নর্দমায় ভেসে গেল। পথচারীরা ছাতা খোলার আগেই বৃষ্টিটা তাদের কলারে, পকেটে ও জুতোয় প্রবেশ করল। এই বাড়ি আর আশপাশের বাড়িগুলোয় জানলার খড়খড়ি টেনে সায়ার দড়ি দিয়ে গরাদের সঙ্গে বেঁধে বন্ধ করা হল।

বুড়িমা তখন তিনতলার ল্যান্ডিং-এ পৌঁছেছে। সে মুখ তুলে মইয়ের মতো সিঁড়িগুলোর দিকে তাকাল। তার চারপাশে বৃষ্টির আওয়াজ ভারী হয়ে উঠছিল। বুড়িমা বুঝল তার তোশকগুলো কাদা হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তারপর তার দালালগিন্নির আশ্বাসবাণী মনে পড়ল। তাই সে মুখ ফিরিয়ে আগের মতোই ধুলো, সিগারেটের টুকরো, লজেন্সের খোসা ইত্যাদি ঝাঁট দিতে দিতে একতলায় ডাকবাক্সের কাছে পৌঁছোল। হাওয়াটা একটু আটকাতে বাক্সপ্যাঁটরা ঘেঁটে কিছু খবরের কাগজ বের করে কোলাপসিবল গেটটার বরফির মতো ফাঁকফোঁকরগুলোয় গুঁজে দিল। তারপর কয়লার বালতিটার ওপর ভাত চাপিয়ে একটা তালপাতার পাখা দিয়ে আগুনে আঁচ দিতে লাগল।

অভ্যাসমতো সেই দিন দুপুরেও বুড়িমা খোঁপাটাকে নতুন করে বাঁধল। আঁচলের গিঁট খুলে সেখানে বেঁধে রাখা সারা জীবনের সঞ্চিত টাকাপয়সা গুনল। খবরের কাগজের বিছানায় শুয়েই সে মিনিট কুড়ি ঘুমিয়ে নিয়েছে। বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গিয়েছে। ভিজে আমপাতার টক গন্ধ সারা গলিটায় ছড়িয়ে আছে।

মাঝে মাঝে দুপুরবেলায় বুড়িমা তার কোনও পড়শির সঙ্গে দেখা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত। দু'-একটা ফ্ল্যাটে অল্পক্ষণের জন্য ঘুরে আসতে তার বেশ ভালই লাগত। বুড়িমার জন্য সব ফ্ল্যাটেরই দরজা খোলা। রাতে ছাড়া দরজায় তালা দেওয়ার প্রয়োজনও হত না। ছেলেমেয়েদের বকাঝকা, মাসকাবারি হিসেবপত্র করা, চালের কাঁকর বাছা— যে যার কাজ করে যেত। শুধু মাঝেমধ্যে বুড়িমাকে এক গেলাস চা দেওয়া হত বা হয়তো বিস্কুটের টিনটা এগিয়ে দেওয়া হত তার দিকে। কখনও কখনও বুড়িমা ছেলেমেয়েদের ক্যারামবোর্ডের ঘুঁটি চালতেও সাহায্য করত। বুড়িমা নিজের জায়গা জানত। সে কখনও কোনও আসবাবের ওপর বসত না। দরজায় বা প্যাসেজে উবু হয়ে বসে সকলের হাঁটাচলা, কথাবার্তা লক্ষ করত। যেভাবে কেউ বিদেশে গিয়ে গাড়িঘোড়ার ওপর নজর রাখে, সেইভাবে।

এই দিন দুপুরে বুড়িমার দালালগিন্নির আমন্ত্রণের কথা মনে পড়ল। খবরের কাগজে শুয়ে ঘুমোনোর পরও ওর পিঠটা জ্বালা করছিল। ঘামাচির পাউডারের দরকারটা আর অগ্রাহ্য করা যাচ্ছিল না। ঝাঁটাটা তুলে— ওটা হাতে ধরা না-থাকলে বুড়িমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হত— সে ওপরে উঠতেই যাচ্ছিল, এমন সময় কোলাপসিবল গেটটার সামনে একটা রিকশা এসে থামল।

রিকশা থেকে নামলেন দালালবাবু। বছরের পর বছর রসিদ লিখে লিখে তাঁর চোখের কোণে কালি পড়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে, জিভটা অস্থিরভাবে দাঁতের ফাঁকে ঘোরাফেরা করছে। দুই হাঁটুর মাঝে সেরামিকের দুটো ছোট বেসিন ধরে রাখা।

"বুড়িমা, তোমার একটা কাজ আছে। এই বেসিনগুলো ওপরে নিয়ে যাব, একটু হাত লাগাও তো।" তিনি পাট করা রুমালটা কপালে আর গলায় বুলিয়ে রিকশাওয়ালাকে একটা পয়সা দিলেন। তারপর তিনি আর বুড়িমা মিলে বেসিনগুলোকে চারতলা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেলেন। আরও দু'-একজন বাসিন্দা কৌতূহলবশত তাদের পিছন পিছন উঠেছিলেন। কিন্তু ফ্ল্যাটের ভিতর পা রাখার আগে দালালবাবু মুখ খুললেন না। তারপর তাঁর স্ত্রী, বুড়িমা ও বাকিদের জানালেন যে, রবারের টিউব, পাইপ আর ভালভের রসিদ লেখার কাজ এবার শেষ। পাইকারি বিক্রেতাটির নিজেরও হাওয়াবদলের দরকার পড়েছিল। তাঁর লাভও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। তাই বর্ধমানে তিনি একটি দ্বিতীয় শাখা খুলবেন ঠিক করেছেন। দালালবাবু এত বছরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশ্রমের পুরস্কার পেতে চলেছেন। তাঁকে কলেজ স্ট্রিটের শাখার ম্যানেজার করা হয়েছে। উত্তেজনার বশে প্লাম্বিং এলাকা থেকে বাড়ি ফেরার সময় দালালবাবু দুটি বেসিন কিনে ফেলেছেন।

"এই দুটো ঘরের মধ্যে দুটো বেসিন নিয়ে কী হবে?" দালালগিন্নি জানতে চাইলেন। তাঁর আচারের দুঃখ এখনও যায়নি। "কে কবে এমন কথা শুনেছে? এখনও কেরোসিনে রান্না করি। কিছুতেই ফোনের জন্য দরখাস্ত করতে চাও না। বিয়ের সময় যে ফ্রিজের কথা শুনেছিলাম সেটা আজ অবধি দেখে উঠতে পারিনি। এই সবকিছুর খেসারত কি দুটো বেসিন দিয়ে হবে?"

এর পরের তর্কটা ডাকবাক্সের কাছেও শোনা যাচ্ছিল। সন্ধেবেলা বৃষ্টিটা আর-একবার নামার পরেও তর্কটা চলল এবং বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে চলল। এমনকী বুড়িমাও দ্বিতীয় বার ওপর থেকে নীচে সিঁড়ি ঝাঁট দেওয়ার সময় ঝগড়াটা শুনে চুপ করে গেল। তার আর সুখ-দুঃখের কথা শোনানো হল না। রাতটা সে খবরের কাগজের বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দিল।

পরদিন সকালে যখন কয়েকজন মিস্ত্রি খালিপায়ে বেসিনগুলো ফিট করতে এল, তখনও ঝগড়াটার প্রভাব ছিল। সারারাত পায়চারি করে কাটানোর পর দালালবাবু ঠিক করেছিলেন যে, একটা বেসিন তাঁদের বসবার ঘরে লাগানো হবে আর অন্যটা দোতলার ল্যান্ডিং-এ। "তা হলে সকলেই ব্যবহার করতে পারবে আর কী," তিনি দরজায়-দরজায় গিয়ে বোঝালেন। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা বেজায় খুশি। বছরের পর বছর তাদের মগ থেকে জল ঢেলে দাঁত মাজতে হয়েছে।

দালালবাবু অবশ্য অন্য কথা ভাবছিলেন। সিঁড়িতে একটা বেসিন থাকলে সেটা যে-ই আসবে তারই চোখে পড়বে। তিনি এখন কোম্পানির ম্যানেজার। কে যে কখন বাড়িতে আসবে তার তো ঠিক নেই।

মিস্ত্রিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা, দৌড়োদৌড়ি— ভাতও খেল চাতালে উবু হয়ে বসে। হাতুড়ি পেটাল, হাঁকডাক করল, থুতু ফেলল, গালিগালাজ দিল। মাথায় বাঁধা গামছা দিয়ে ঘাম মুছল। মোটের ওপর বুড়িমার পক্ষে সেদিন সিঁড়ি ঝাঁট দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ল।

সময় কাটাতে বুড়িমা ছাদে উঠে গেল। সেখানে কিছুক্ষণ পায়চারি করে কাটাল, কিন্তু কাগজের ওপর শুয়ে তার কোমরে বেশ ব্যথা হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকের দৃশ্য খুঁটিয়ে দেখার পর তোশকগুলোর যা বাকি ছিল সেটাকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ন্যাকড়া করে ফেলল। ভাবল যে, সেগুলো সিঁড়ির রেলিংগুলো পরে কখনও পরিষ্কার করবে। সারা দিনের কাজের প্রশংসা করবে বলে বিকেলবেলাই ফ্ল্যাটের লোকজন বেসিনের কাছে জড়ো হল। বুড়িমাকে দিয়েও কলের জলে হাত ধোয়ানো হল। একটু শুঁকেটুকে বুড়িমা বলল, "আমাদের স্নানের জল ফুলের পাপড়ি আর আতর দিয়ে সুগন্ধ করা হত। বিশ্বাস করো কি নাই করো, সেসব বিলাসিতা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।"

দালালবাবু বেসিনের নানা গুণ সকলকে বিশদে বোঝাতে শুরু করলেন। দুটো কলই সম্পূর্ণভাবে খুলে আর বন্ধ করে দেখালেন। দুটো একসঙ্গে খুলে জলের চাপের তফাত বোঝালেন। কলগুলোর মাঝখানে একটা ছোট জিনিস ওপরে করে দিলে বেসিনে জল জমিয়ে রাখা যায়, সেটাও দেখালেন।

"এরচেয়ে ভাল জিনিস আর হয় না," তিনি বললেন।

"যা বুঝছি, সময় পালটে যাচ্ছে," চ্যাটার্জিবাবু তাঁর বারান্দা থেকে সর্বসমক্ষে স্বীকার করলেন।

গৃহিণীদের মধ্যে অবশ্য বচসা শুরু হতে বেশি সময় লাগল না। প্রতিদিন সকালে দাঁত মাজার জন্য লাইন করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে, ব্যবহারের পর নিয়ম করে কল মুছতে মুছতে আর সরু বেসিনে নিজের সাবান আর টুথপেস্ট না রাখতে পেরে সকলে বিরক্ত হয়ে পড়ছিলেন। দালালদের নিজস্ব বেসিন রয়েছে। তাদের কেন ভাগ করে ব্যবহার করতে হবে?

"আমাদের কি একটা নিজস্ব বেসিন কেনারও সামর্থ্য নেই?" একজন আর থাকতে না পেরে বলে ফেললেন একদিন।

"দালালরাই কি কেবল এই ফ্ল্যাটবাড়িটার অবস্থা শুধরোতে পারে?" শুধোলেন আর-একজন।

অনেক রকমের গুজব শোনা যাচ্ছিল। ঝগড়ার পর বউকে সান্ত্বনা দিতে দালালবাবু নাকি তাঁকে দু'কিলো সর্ষের তেল, একটা কাশ্মীরি শাল ও এক ডজন চন্দনের গন্ধওলা সাবান কিনে দিয়েছেন। টেলিফোনের দরখাস্তও নাকি করা হয়ে গিয়েছে। দালালগিন্নি নাকি আজকাল সারাদিন তাঁর বেসিনে হাত ধুয়েই কাটিয়ে দেন। এতেও যেন হচ্ছিল না, তাই পরের দিন হাওড়া স্টেশনগামী একটা ট্যাক্সি গলির মধ্যে কষ্টেসৃষ্টে ঢুকে দাঁড়াল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দালালরা দশ দিনের জন্য সিমলায় ছুটি কাটাতে যাচ্ছে।

"বুড়িমা, আমি কিন্তু ভুলিনি। পাহাড় থেকে একটা ভেড়ার লোমের তৈরি শেল এনে দেব তোমাকে," দালালগিন্নি ট্যাক্সির জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন। তাঁর শাড়ির নীল পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করা একটা চামড়ার পার্স তাঁর কোলে পড়ে ছিল।

"দুটো শেল এনে দেব।" স্ত্রীর পাশে বসে, পকেট চাপড়ে মানিব্যাগ ঠিক আছে কি না দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে বললেন দালালবাবু।

গোটা বিল্ডিংটার সব লোকের মধ্যে একমাত্র বুড়িমা-ই কোলাপসিবল গেটটার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের যাত্রা শুভ হওয়ার আশা জানাল।

দালালরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য বউরা তাঁদের ইচ্ছেমতো বিল্ডিং মেরামতের ব্যবস্থা শুরু করলেন। একজন তাঁর বিয়ের একগাছা চুড়ির বদলে সিঁড়ির দু'পাশের দেওয়াল চুনকাম করাবেন বলে ঠিক করলেন। আর-একজন তাঁর সেলাইয়ের মেশিন বন্ধক রাখলেন বাড়িটা লোক ডেকে পোকামাকড় মুক্ত করবেন বলে। আরও একজন তাঁর দুটো রুপোর বাটি বিক্রি করে দিলেন খড়খড়িগুলো হলুদ রং করাবেন বলে।

তারপর রাতদিন ওই বিল্ডিং-এ ছুতোর-মিস্ত্রিদের আসা-যাওয়া শুরু হল। ভিড় এড়াতে বুড়িমা ছাদে শুতে শুরু করল। এতলোক আজকাল কোলাপসিবল গেটটা দিয়ে আনাগোনা করে, এতজন গলিটায় ভিড় করে থাকে যে, সকলের হিসেব রাখা সম্ভবও হয় না আর তার কোনও মানেও হয় না।

কিছুদিন পর বুড়িমা তার বাক্সপ্যাঁটরা আর রান্নার বালতিউনুনটাকেও ছাদে উঠিয়ে নিয়ে গেল। নীচের বেসিনটা ব্যবহার না করলেও চলে, কারণ ছাদের কলটা তো আছেই। সে ঠিক করে রাখল সিঁড়ির রেলিংগুলো তার তোশক থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করবে। এখনও খবরের কাগজ দিয়েই তার পিতানায় তোশকের কাজ চলছিল।

আরও বৃষ্টি এল। একটা খবরের কাগজ মাথায় চেপে ধরে, কোনওমতে পা বাঁচিয়ে উবু হয়ে বসে বুড়িমা দেখল, বর্ষাকালে পিঁপড়েরা কেমন ডিম মুখে নিয়ে কাপড়ের দড়িটার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ভিজে হাওয়া লেগে তার পিঠে অনেক আরাম বোধ হচ্ছিল। খবরের কাগজের স্টক ফুরিয়ে আসছিল।

AMARBOI.COM

বুড়িমার সকালগুলো ও তার থেকেও বেশি, দুপুরগুলো লম্বা বোধ হতে লাগল। শেষ কবে সে এক গেলাস চা খেয়েছে মনে পড়ে না। পুরনো দিনের কথা, কষ্টের কথা, সব ভুলে গিয়ে বুড়িমা শুধু ভাবছিল দালালরা কবে তার জন্য নতুন তোশক কিনে ফিরবে।

ছাদে থেকে থেকে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই একটু হাঁটাচলা হবে ভেবে সে দুপুরে পাড়া ঘুরতে বেরোনো শুরু করল। হাতে ঝাঁটা, শাড়িতে খবরের কাগজের কালি— বুড়িমা বাজারে বাজারে ঘুরতে ও সঞ্চিত টাকাপয়সা দিয়ে নিজের ছোট ছোট শখের জিনিস কিনতে শুরু করল। আজ এক প্যাকেট মুড়ি, তো কাল কয়েকটা কাজুবাদাম, পরশু এক গেলাস আখের রস। একদিন সে হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেল। পরদিন আরও দূর, বউবাজার অবধি গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁঠাল দেখতে দেখতে একদিন বুড়িমার আঁচলে টান পড়ল। সে যখন মুখ ফিরিয়ে তাকাল, তখন তার আঁচলের গিঁট খুলে তার চাবির গোছা আর সারা জীবনের সঞ্চয় উধাও হয়ে গিয়েছে।

সেই দুপুরে বুড়িমা যখন কোলাপসিবল গেটটার কাছে পৌঁছোল, তখন ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সিঁড়ির ওপর থেকে নীচে অনেক গলার অভিযোগ শোনা গেল। অভিযোগ একটাই, সিঁড়ির বেসিনটা চুরি হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি চুনকাম করা দেওয়ালটায় শুধু একটা বড় গর্ত থেকে গিয়েছে। সেটা থেকে কিছু জটপাকানো রবারের টিউব আর পাইপ বেরিয়ে এসেছে। সিঁড়ির ল্যান্ডিং নোংরা করে পড়ে রয়েছে প্লাস্টারের গুঁড়ো। বুড়িমা তার ঝাঁটাটাকে শক্ত করে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অধৈর্য বাসিন্দারা বুড়িমাকে প্রায় কোলে তুলে ছাদে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাকে কাপড়ের দড়িটার এক দিকে দাঁড় করিয়ে অন্য দিক থেকে তার ওপর চিৎকার শুরু করলেন।

"এ সব ওর কাজ," বুড়িমার দিকে আঙুল তুলে চেঁচালেন একজন। "ও-ই চোরগুলোকে খবর দিয়েছিল। যখন গেট পাহারা দেওয়ার কথা, কোথায় ছিল তখন ও শুনি?"

"কয়েকদিন ধরেই ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, অচেনা লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে," আর-একজন খবর দিলেন।

"আমাদের কয়লা ব্যবহার করতে দিলাম, শুতে জায়গা দিলাম, কী করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন বিশ্বাসঘাতকতা করল আমাদের সঙ্গে?" তৃতীয় জন জানতে চাইলেন।

যদিও কেউই বুড়িমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলছিল না, তা-ও সে বলল, "বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, আমি চোরদের কোনও খবর দিইনি।"

"অনেক বছর ধরে তোমার মিথ্যে কথা শুনেছি," জবাব দিল সকলে, "তুমি কি ভাব এখন তোমাকে আমরা বিশ্বাস করব?"

তাঁদের নালিশ থামল না। দালালদের কী বলা হবে? শেষে তাঁরা চ্যাটার্জিবাবুর পরামর্শ চাইলেন। তিনি তখন তাঁর বারান্দায় বসে রাস্তায় ট্র্যাফিকের করুণ অবস্থা লক্ষ করছিলেন।

তিনতলার একজন বললেন, "বুড়িমা বিল্ডিং-এর নিরাপত্তাহানি করেছে। আমাদের আরও দামি দামি জিনিসপত্র আছে। মিসেস মিশ্র তো তাঁর টেলিফোন নিয়ে একলা থাকেন। কী করা যায় বলুন তো?"

চ্যাটার্জিবাবু তাঁদের দাবিদাওয়া শুনলেন। ব্যাপারটা বিবেচনা করতে করতে তিনি শালটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তাঁর বারান্দা ঘিরে গড়ে ওঠা বাঁশের মাচাগুলোর দিকে তাকালেন। তিনি যতদূর মনে করতে পারেন, তাঁর পিছনের খড়খড়িগুলো বর্ণহীন ছিল। এখন সেগুলোর গায়ে হলুদ রং লেগেছে।

অবশেষে তিনি বললেন, "বুড়িমার মুখে ছাই। কিন্তু সেটা নতুন কোনও কথা নয়। যেটা নতুন লাগছে, সেটা হল এই বিল্ডিং-এর চেহারা। আর এইরকম একটা বিল্ডিং-এর যেটা দরকার সেটা হল একজন প্রকৃত পাহারাদার।"

সুতরাং ফ্ল্যাটের লোকজন মিলে বুড়িমার বালতি, ন্যাকড়া, বাক্সপ্যাঁটরা আর ঝাঁটা, সবকিছু সিঁড়ির তলায়, ডাকবাক্সর থেকে দূরে, কোলাপসিবল গেটের বাইরে গলিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর তাঁরা বুড়িমাকেও দূর করে দিলেন। তাঁরা সকলে এক প্রকৃত পাহারাদারের খোঁজ শুরু করতে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।

তার সব জিনিসপত্রর মধ্যে থেকে বুড়িমা শুধু তার ঝাঁটাটা উঠিয়ে নিল। সরে যেতে যেতে সে আরও একবার বিড়বিড় করল, "বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো," তার আঁচল দুলে উঠল, কিন্তু এবার আর চাবির গোছা ঝনঝনিয়ে উঠল না।

AMARBOI.COM

সেক্সি

যে কোনও স্ত্রীর পক্ষে এটাই সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্ন। লক্ষ্মী মিরান্ডাকে জানাল যে, ন'বছরের বিবাহিত জীবনের পর, তার এক ভগ্নিপতি একটি অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছে। দিল্লি থেকে মন্ট্রিল যাওয়ার পথে প্লেনে সেই মেয়েটার পাশে বসেছিল তার ভগ্নিপতি। তারপর বাড়িতে স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফেরার বদলে সেই মেয়েটার সঙ্গে হিথরো এয়ারপোর্টেই নেমে গিয়েছিল। স্ত্রীকে ফোন করে বলেছিল যে, একটি কথোপকথন তার জীবনটাই বদলে দিয়েছে। এখন তার সবকিছু ভাল করে বোঝার জন্য একটু সময় চাই। লক্ষ্মীর বোন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে।

"আমি অবশ্য বোনটাকে দোষ দিতে পারি না," লক্ষ্মী বলল। সে 'হট মিক্স'-এর দিকে হাত বাড়াল। ওই জিনিসটা সে সারা দিনই চিবোতে থাকে। মিরান্ডার ওই খাবারটা দেখে ধুলোভরতি কমলা রঙের সিরিয়ালের মতো লাগে। "ভাবো একবার। একটা ইংরেজ মেয়ে, ওর বরের অর্ধেক বয়স।" লক্ষ্মী মিরান্ডার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড়, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তার কিউবিকল মিরান্ডার পাশেই।

তাজমহলের সামনে একটা সাদা পাথরের বেঞ্চে বসে তোলা তার এবং স্বামীর ফোটো কিউবিকলের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ফোনে লক্ষ্মী তার বোনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কেউ লক্ষ করেনি কারণ তারা একটা পাবলিক রেডিয়ো স্টেশনের ফান্ড-রেজিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। তাদের চারপাশে সকলে সবসময়ই ফোনে কথা বলে। চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির আবেদন করে।

"আমার তো ছেলেটার জন্যই সবচেয়ে খারাপ লাগছে," লক্ষ্মী যোগ করল। "কতদিন ধরে বাড়িতে পড়ে আছে। আমার বোন বলল যে, ওকে স্কুলেও নিয়ে যেতে পারছে না।"

AMARBOI.COM

"ভীষণ খারাপ লাগছে শুনে," মিরান্ডা বলল। মিরান্ডা চিঠি টাইপ করে, রেডিয়ো স্টেশনের সদস্যদের বলে, একটি টোট-ব্যাগ বা ছাতার বিনিময়ে তাদের বার্ষিক প্রতিশ্রুতির পরিমাণ বাড়াতে। সাধারণত লক্ষ্মীর ফোনে বাক্যালাপ— প্রধানত তার স্বামীকে রাতে কী রাঁধা হবে তার নির্দেশ দেওয়া— মিরান্ডার মনোযোগ নষ্ট করে। তাদের ডেস্কের মাঝখানের ল্যামিনেটেড দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে সে লক্ষ্মীর কথাগুলো, এখানে ওখানে কয়েকটা ভারতীয় শব্দ গুঁজে দেওয়া স্পষ্টভাবে শুনতে পায়। কিন্তু সেই দুপুরে মিরান্ডা লক্ষ্মীর কথাবার্তা শুনছিল না। সে নিজেই দেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল, সেই সন্ধেয় কোথায় দেখা করবে তাই নিয়ে।

"আবার দেখতে গেলে, কয়েকদিন বাড়িতে থাকলেও ছেলেটার কোনও ক্ষতি হবে না," লক্ষ্মী আরও কিছুটা হট মিক্স খেয়ে সেটা একটা দেরাজে ঢুকিয়ে রেখে দিল। "ছেলেটা একটা জিনিয়াস ধরনের। মা পঞ্জাবি আর বাবা বাঙালি। স্কুলে ফরাসি আর ইংরেজি শেখে বলে ইতিমধ্যেই চারটে ভাষায় কথা বলতে পারে। আমার মনে হচ্ছে ও দুটো ক্লাস টপকে উঠেছে।"

দেবও বাঙালি। প্রথমে মিরান্ডা ভেবেছিল যে, বাঙালি বোধহয় কোনও ধর্ম। কিন্তু তারপর 'দ্য ইকনমিস্ট'-এর ছাপা একটা ম্যাপে দেব তাকে ভারতের মধ্যে বেঙ্গল বলে একটা জায়গা দেখিয়ে দেয়। পত্রিকাটা দেব বিশেষভাবে মিরান্ডার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়েছিল কারণ, তার কাছে কোনও অ্যাটলাস বা মানচিত্র আঁকা কোনও বই ছিল না। দেব তাকে যেখানে তার জন্ম হয়েছে এবং তার বাবার জন্ম হয়েছে সেই শহরগুলো দেখিয়েছিল। একটা শহরের চারপাশে একটা চৌকো আঁকা ছিল, দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। মিরান্ডা তার অর্থ জিজ্ঞেস করায়, দেব পত্রিকাটা মুড়ে ফেলে বলেছিল, "এমন কিছু না যা নিয়ে তোমাকে কখনও চিন্তা করতে হবে।" তারপর পত্রিকাটা দিয়ে খেলাচ্ছলে মিরান্ডার মাথায় টোকা মেরেছিল।

দেব যখনই আসত, তিনটে সিগারেট খেত। সেই সিগারেটের টুকরোগুলোর সঙ্গে সেদিন পত্রিকাটাও সে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার গাড়ি যখন কমনওয়েলথ অ্যাভিনিউ দিয়ে শহরতলির যে বাড়িতে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে থাকে, সে দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মিরান্ডা পত্রিকাটা বের করে এনে, তার ওপর থেকে ছাই ঝেড়ে, সেটা সোজা করার জন্য অন্যদিকে মুড়ল। বিছানাটা তখনও তাদের ভালবাসার জন্য এলোমেলো হয়ে

AMARBOI.COM

ছিল। সেখানে বসে মিরান্ডা বাংলার সীমান্তরেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। নীচে একটি উপসাগর। ওপরে পর্বত। মানচিত্রটা 'গ্রামীণ ব্যাংক' নামে কোনও জিনিসের ওপর একটি লেখার সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। যে শহরে দেবের জন্ম, তার ছবি দেখতে পাওয়ার আশায় মিরান্ডা পাতা ওলটাল, কিন্তু তার বদলে শুধুই লেখচিত্র এবং বর্গক্ষেত্র দেখতে পেল। তাও সে পাতার দিকে তাকিয়ে থাকল। সমস্তক্ষণ সে দেবের কথাই ভাবছিল। ভাবছিল যে, মাত্র পনেরো মিনিট আগেই, দেব মিরান্ডার পায়ের পাতা দুটো নিজের কাঁধে উঠিয়ে, তার হাঁটু দুটো নিজের বুকে চেপে ধরে বলেছিল যে, সে মিরান্ডাকে যতই পায়, ততই তার মন ভরে না।

দেবের সঙ্গে মিরান্ডার এক সপ্তাহ আগে ফিলিন্স-এ দেখা হয়। লাঞ্চব্রেকের সময় মিরান্ডা সেখানকার বেসমেন্ট থেকে ছাড়ে প্যান্টিহোস কিনছিল। পরে সে এস্কালেটরে চড়ে দোকানের প্রধান অংশে, প্রসাধনের দিকটায় গেল, যেখানে সাবান আর ক্রিম ধনরত্নের মতো সাজানো ছিল। নিরাপত্তামূলক কাচের পিছনে আইশ্যাডো এবং পাউডার পিন দিয়ে আটকানো প্রজাপতির মতো ঝিকমিক করছিল। যদিও মিরান্ডা কখনও লিপস্টিক ছাড়া কিছুই কেনেনি, তাও তার সেই স্বল্প পরিসর বদ্ধ, গোলকধাঁধার মধ্যে হাঁটতে ভাল লাগত। জায়গাটা তার কাছে পরিচিত ঠেকত। বস্টনের বাকি অংশ তার সেইভাবে জানা হয়নি। প্রতিটি বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে তার ভাল লাগত। তারা কার্ডে পারফিউম স্প্রে করে হাওয়ায় ছড়িয়ে দিত। মাঝে মাঝে, সে পরে তার কোটের পকেটে কোনও কার্ড খুঁজে পায়। ঠান্ডা সকালে টি-এর জন্য অপেক্ষা করার সময় সেই ক্ষীণভাবে সংরক্ষিত সুগন্ধ তাকে কিছুটা উত্তাপ দেয়।

সেদিন, বেশি মনকাড়া একটি সুগন্ধি কার্ড শুঁকে দেখার জন্য থেমে মিরান্ডা লক্ষ করল যে, একটা কাউন্টারে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে ধরা এক ফালি নির্ভুল, মেয়েলি হাতের লেখায় ভরতি কাগজ। একজন সেলসউওম্যান কাগজটার দিকে একবার তাকিয়ে বিভিন্ন টানা খুলতে শুরু করলেন। একটি কালো খাপে রাখা লম্বাটে সাবান, একটি হাইড্রেটিং মাস্ক, এক শিশি সেল রিনিউয়াল বড়ি এবং দুটি ফেস ক্রিমের টিউব বের করলেন। লোকটির রং তামাটে, চুল কালো। হাতের গাঁটেও কয়েকগাছা চুল আছে। পরনে ফ্লেমিংগো পিংক শার্ট, নেভি ব্লু রঙের সুট, চকচকে চামড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোতামওয়ালা উটের চামড়ার ওভারকোট। টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সে হাত থেকে শুয়োরের চামড়ার তৈরি দস্তানা খুলেছিল। বার্গান্ডি রঙের স্ফীত মানিব্যাগ থেকে কড়কড়ে নোট বের করল। লোকটির আঙুলে বিয়ের আংটি ছিল না।

"তোমাকে কী দেব সোনা?" সেলসউওম্যানটি মিরান্ডাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে মিরান্ডার ত্বক কেমন, তা বোঝার চেষ্টা করলেন।

মিরান্ডা জানত না সে কী চায়। শুধু জানত যে, সে চায় না লোকটি সেখান থেকে চলে যাক। লোকটিকে দেখে মনে হল যে, সে ইচ্ছে করে বিলম্ব করছে। সেলসউওম্যানটির মতো, মিরান্ডা কিছু বলুক, তার অপেক্ষা করছে। মিরান্ডা কতগুলো বোতলের দিকে তাকাল। কয়েকটা বেঁটে, কয়েকটা লম্বা। একটা ডিম্বাকৃতি ট্রে-র ওপর সাজানো। যেন কোনও পরিবার ফোটো তোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"একটা ক্রিম," মিরান্ডা শেষপর্যন্ত বলল।

"তোমার বয়স কত?"

"বাইশ।"

মহিলাটি মাথা নেড়ে একটা ঘষা কাচের বোতল খুললেন। "তুমি এমনি যা লাগাও, তার চেয়ে এটা একটু বেশি ভারী মনে হতে পারে, কিন্তু আমি বলি কী এখনই এটা লাগানো শুরু করে দাও। পঁচিশের মধ্যে তোমার সব বলিরেখা তৈরি হয়ে যাবে। তারপর শুধু সেগুলোই চোখে পড়বে।"

মহিলাটি যতক্ষণ মিরান্ডার মুখে ক্রিমটা মাখিয়ে দিলেন, লোকটি দাঁড়িয়ে দেখল। মিরান্ডাকে যখন বলা হল ক্রিমটা মাখার সঠিক উপায় কী— গলার নীচ থেকে শুরু করে দ্রুত হাতে নীচ থেকে ওপরের দিকে লাগানো— ততক্ষণ লোকটি লিপস্টিক রাখার জায়গাটা ঘোরাল। যে পাম্পটা থেকে সেলুলাইট জেল বেরিয়ে আসে, সেটা টিপে জেল বের করে তার অনাবৃত হাতের পিছনে মাসাজ করল। একটা শিশি খুলে এত নিচু হয়ে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়ল যে, তার নাকে এক ফোঁটা ক্রিম লেগে গেল।

মিরান্ডা হাসল, কিন্তু মহিলাটি তার মুখের ওপর একটা বড় ব্রাশ বুলোচ্ছিলেন। সেটার জন্য তার হাসি ঢাকা পড়ে গেল। "এটা হল দু'নম্বর ব্লাশার," মহিলাটি বললেন। "তোমার মুখে কিছুটা রং এনে দেবে।"

AMARBOI.COM

কাউন্টারের ওপরের আয়নাগুলোর একটায় নিজের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে মিরান্ডা মাথা নাড়ল। তার চোখদুটো রুপোলি। ত্বক কাগজের মতো ফ্যাকাশে। চুল কফিবিনের মতো কালচে এবং চকচকে। লোকে বলত, চুল আর ত্বকের বৈষম্যের জন্য সুন্দর না হলেও, চেহারায় একটা চটক ছিল। তার মাথাটা লম্বা, ডিমের মতো ওপরের দিকটা সরু। নাকটা এতই পাতলা যে, দেখে মনে হত যেন কাপড় টাঙানোর ক্লিপ দিয়ে চিমটি কেটে দেওয়া হয়েছে। এখন তার মুখ থেকে রক্তিম আভা বেরোচ্ছিল। ভ্রূর নীচটা ধোঁয়াটে। ঠোঁট চকচক করছিল।

লোকটিও আয়নার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে চট করে নাক থেকে ক্রিমটা মুছে ফেলল। মিরান্ডা বোঝার চেষ্টা করল সে কোথাকার লোক। তার মনে হল যে, লোকটি স্প্যানিশ কিংবা লেবানিজ হতে পারে। যখন লোকটি একটা বয়াম খুলে, বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না করেই বলল যে, "আনারসের মতো গন্ধ।" তখন মিরান্ডা তার উচ্চারণে খুব ক্ষীণ একটা টান টের পেল।

"তোমার কি আর কিছু লাগবে আজকে?" মিরান্ডার ক্রেডিট কার্ড নিয়ে সেলসউওম্যানটি জিজ্ঞেস করলেন।

"না, ধন্যবাদ।"

মহিলাটি ক্রিমটা লাল টিস্যু কাগজের কতগুলো স্তরে মুড়ে দিলেন। "তুমি খুব সন্তুষ্ট হবে এই প্রডাক্টটা ব্যবহার করে।" রসিদে স্বাক্ষর করার সময় মিরান্ডার হাত কেঁপে গেল। লোকটি তার জায়গা থেকে সরেনি।

মিরান্ডাকে একটা ছোট শপিং ব্যাগ ধরিয়ে মহিলাটি বললেন, "আমাদের নতুন আই-জেল-এর একটা নমুনাও দিয়ে দিয়েছি।" কাউন্টারের ওপর দিয়ে ক্রেডিট কার্ডটা ফেরত দেওয়ার আগে কার্ডটার দিকে তাকালেন। "বাই-বাই মিরান্ডা।"

মিরান্ডা হাঁটতে শুরু করল। প্রথমে সে হাঁটার গতি বাড়াল। তারপর, বাণিজ্যকেন্দ্রের চৌমাথার দিকে যে দরজাগুলো খোলে, সেগুলো দেখতে পেয়ে গতি কমিয়ে দিল।

"তোমার নামের একটা অংশ ভারতীয়," তার সঙ্গে পা মিলিয়ে লোকটি বলল।

তারা দু'জনেই একটা গোল টেবিলের সামনে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাইনকোন এবং মখমলের বো দিয়ে সাজানো সোয়েটার উপুড় করে রাখা। "মিরান্ডা?"

"মীরা। আমার এক কাকিমা আছেন যাঁর নাম মীরা।"

তার নাম দেব। সে এক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে কাজ করে। অফিসটা কোনদিকে দেখানোর জন্য সে সাউথ স্টেশনের দিকে মাথা বেঁকিয়ে দেখাল। মিরান্ডা মনে মনে ঠিক করল যে, সে-ই প্রথম পুরুষ, গোঁফ থাকা সত্ত্বেও যাকে তার সুদর্শন মনে হয়েছে।

তারা একসঙ্গে সস্তা বেল্ট এবং হ্যান্ডব্যাগের দোকানের সামনে দিয়ে পার্ক স্ট্রিট স্টেশনের দিকে এগোল। জানুয়ারির তীব্র হাওয়া মিরান্ডার চুলের সিঁথি নষ্ট করে দিচ্ছিল। কোটের পকেটে একটা টোকেন খুঁজতে গিয়ে তার দেবের শপিং ব্যাগের ওপর চোখ পড়ল। "আর ওইগুলো কি তাঁর জন্য?"

"কার জন্য?"

"তোমার মীরাকাকিমা।"

"ওগুলো আমার স্ত্রীর জন্য," দেব মিরান্ডার চোখে চোখ রেখে, আস্তে আস্তে বলল। "ও কয়েক সপ্তাহের জন্য ভারতে যাচ্ছে," সে চোখ ঘোরাল। "ও এইসব জিনিসের খুব ভক্ত।"

AMARBOI.COM

কোনও কারণে, দেবের স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ব্যাপারটা অত অন্যায় মনে হত না। প্রথমদিকে দেব এবং মিরান্ডা প্রায় প্রতিটি রাত একসঙ্গে কাটাত। দেব তাকে বুঝিয়েছিল যে, সে গোটা রাত মিরান্ডার সঙ্গে কাটাতে পারবে না। কারণ, তার স্ত্রী ভারত থেকে প্রতিদিন ভোর ছ'টার সময় তাকে ফোন করে। ভারতে তখন বিকেল চারটে বাজে। তাই সে মিরান্ডার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে রাত দুটো, তিনটে, এমনকী ভোর চারটের সময়ও কখনও বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে শহরতলিতে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। দিনের বেলা মনে হত যেন, প্রতি ঘণ্টায় সে মিরান্ডাকে অফিস থেকে বা সেলফোন থেকে ফোন করত। মিরান্ডার প্রাত্যহিক রুটিন জানতে পারার পর সে প্রত্যেক দিন বিকেলে সাড়ে পাঁচটার সময়, যখন মিরান্ডা টি-তে চেপে অ্যাপার্টমেন্টে ফেরে, তখন তার ফোনে মেসেজ রেখে দিত, যাতে মিরান্ডা দরজা দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতেই দেবের গলা শুনতে পায়। "আমি তোমার কথাই ভাবছি," দেব টেপ-এ বলত। "তোমাকে দেখার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।" মিরান্ডার অ্যাপার্টমেন্টে রান্নাঘরের কাউন্টারটা একটা পাঁউরুটির বাক্সের চেয়ে বেশি বড় নয়। আঁচড়-কাটা ঢালু মেঝে। লবির ঘণ্টাটা টিপলেই অস্বস্তিকর আওয়াজ করে। দেব তাকে বলত যে, তার ওই অ্যাপার্টমেন্টে সময় কাটাতে ভাল লাগে। সে বলত যে, যেখানে মিরান্ডা মানুষ হয়েছে এবং কলেজে গিয়েছে, সেই মিশিগানে থাকার বদলে সে যে বস্টনে এসেছে, যে শহরে সে কাউকে চেনে না, সেটা দেবের প্রশংসনীয় মনে হয়। মিরান্ডা যখন বলত যে, সেটা প্রশংসা করার মতো কিছুই নয়, যে দেব নিজেও ঠিক একই কারণে বস্টনে থাকতে এসেছে, তখন সে ঘাড় নাড়ত। "আমি জানি একাকিত্ব কাকে বলে," বলে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেত। সেই মুহূর্তেই মিরান্ডার মনে হত যে, দেব তাকে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যে, কয়েক রাতে একা-একা কোনও ফিল্ম দেখার পর বা কোনও বইয়ের দোকানে গিয়ে পত্রিকা পড়ার পর বা লক্ষ্মীর সঙ্গে— যার সবসময়ই দু'-এক ঘণ্টার মধ্যে স্বামীর সঙ্গে এলওয়াইফ স্টেশনে দেখা করার তাড়া থাকত— কয়েকটা ড্রিঙ্কসের পর, টি-তে চেপে বাড়ি ফেরার সময় মিরান্ডার কেমন লাগে। কোনও মধুর মুহূর্তে দেব বলত যে, তার খুব ভাল লাগে যে, মিরান্ডার পা দুটো তার দেহের উপরাংশের চেয়ে বেশি লম্বা। মিরান্ডা প্রথমবার নগ্ন অবস্থায় ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে যাওয়ার সময় দেব এটা লক্ষ করেছিল। "তুমিই প্রথম," বিছানা থেকে তাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে দেব বলেছিল। "আমার পরিচিত প্রথম মেয়ে যার পা দুটো এত লম্বা।"

দেবই প্রথম তাকে এই কথা বলেছিল। সে কলেজে যে ছেলেদের সঙ্গে ডেটিং করত, তারা হাইস্কুলের ছেলেগুলোরই একটু বেশি লম্বা এবং ভারী সংস্করণ ছিল। দেব তাদের মতো নয়। দেবই প্রথম, যে সবসময় সবকিছুর দাম মিটিয়ে দিত। তার জন্য দরজা খুলে ধরত, রেস্তোরাঁয় বসে টেবিলের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে মিরান্ডার হাতে চুমু খেত। সে-ই প্রথম পুরুষ, যে মিরান্ডাকে ফুলের এত বড় তোড়া এনে দিয়েছিল যে, মিরান্ডাকে ফুলগুলো ছ'টি গেলাসে ভাগ করে রাখতে হয়েছিল। প্রথম পুরুষ যে ভালবাসার সময় বারবার ফিসফিস করে মিরান্ডার নাম আওড়াত। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই, অফিসে বসে মিরান্ডার মনে হল যে, তার কিউবিকলের ভিতরেও তার এবং দেবের একটা ফোটো থাকলে ভাল হত। যেমন তাজমহলের সামনে তোলা লক্ষ্মী এবং তার স্বামীর ফোটো ছিল। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্মীকে দেবের কথা বলেনি। কাউকেই বলেনি। তার মনের এক কোণে একটা ইচ্ছে ছিল লক্ষ্মীকে সব কথা জানানোর। হয়তো শুধু এই জন্যই যে, লক্ষ্মীও ভারতীয়। কিন্তু লক্ষ্মী আজকাল সমস্তক্ষণ তার সেই বোনের সঙ্গে ফোনে কথা বলে। তার বোন এখনও শয্যাশায়ী, স্বামী এখনও লন্ডনে, ছেলে তখনও স্কুলে যাচ্ছে না। "তোকে কিছু খেতেই হবে," লক্ষ্মী জোর করত। "শরীর খারাপ করলে তো চলবে না।" বোনের সঙ্গে না হলে সে তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলত। সেই বাক্যালাপগুলো অবশ্য সংক্ষেপ হত। শেষ হত, রাতে লক্ষ্মী পাঁঠার মাংস খাবে না মুরগির, সেই তর্কে। "সরি," একসময় মিরান্ডা তাকে ক্ষমা চাইতে শুনেছিল। "এই গোটা ব্যাপারটাই আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।"

মিরান্ডা এবং দেব তর্ক করে না। তারা নিকেলোডিয়নে ফিল্ম দেখতে গিয়ে গোটা সময়টা চুমু খেয়ে কাটায়। ডেভিস স্কোয়্যারে কর্নব্রেড এবং ঝলসানো শুয়োরের মাংস খায়। দেবের শার্টের কলারে একটা কাগজের ন্যাপকিন গলাবন্ধের কায়দায় ঢোকানো থাকে। একটা স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় গিয়ে বার-এ বসে তারা সাংরিয়া খায়। তাদের মাথার ওপর একটা হাস্যমুখ শুয়োরের মাথা তাদের কথাবার্তা শোনে। তারা এম-এফ-এ-তে গিয়ে মিরান্ডার শোবার ঘরের জন্য একটা জলপদ্মের পোস্টার কিনল। এক শনিবার, সিমফোনি হলে আফটারনুন কনসার্টের পর, দেব মিরান্ডাকে শহরে তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গাটি দেখাল। খ্রিশ্চান সায়েন্স সেন্টারের ভিতর ম্যাপেরিয়াম। তারা যে ঘরটার ভিতর দাঁড়িয়ে ছিল সেটা উজ্জ্বল, রং করা কাচের প্যানেল দিয়ে তৈরি। আকারে একটা গ্লোবের ভিতরদিকটার মতো, কিন্তু দেখতে গ্লোবটার বাইরের অংশের মতো। ঘরটার মধ্যিখানে একটা স্বচ্ছ সেতু ছিল। তাদের মনে হচ্ছিল যেন তারা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। দেব ভারতের দিকে নির্দেশ করল। সেই অংশটায় 'দ্য ইকনমিস্ট'-এর লাল ম্যাপের চেয়ে অনেক বেশি খুঁটিনাটি ছিল। সে বোঝাল যে, তার মধ্যে অনেক দেশ, যেমন শ্যাম দেশ এবং ইতালীয় সোমালিল্যান্ডের, আর অস্তিত্ব নেই। ততদিনে নাম পালটে গিয়েছে। ময়ূরের বুকের মতো নীল মহাসাগরটা জলের গভীরতার ওপর নির্ভর করে রঙের দুই মাত্রায় দেখা যাচ্ছিল। দেব তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর অংশটি দেখিয়ে দিল। সাত মাইল গভীর, মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিকে। মিরান্ডা সেতু থেকে ঝুঁকে পায়ের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যান্টার্কটিক দ্বীপপুঞ্জ দেখল। গলা বাড়িয়ে মাথার ওপর একটা বিশাল ধাতব নক্ষত্র দেখল। দেব কথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর কাচে ক্ষিপ্তভাবে ঠোক্কর খাচ্ছিল। কখনও জোরে, কখনও আস্তে। কখনও মনে হচ্ছিল যেন কথাগুলো মিরান্ডার বুকে এসে নামছে। কখনও একেবারেই তার কান এড়িয়ে যাচ্ছিল। একদল পর্যটক যখন সাঁকোর ওপর হেঁটে আসল, তখন তাদের গলা খাঁকরানির আওয়াজ সে এমনভাবে শুনতে পাচ্ছিল, যেন মাইক্রোফোনে শুনছে। দেব বোঝাল যে, এ সবই শব্দবিজ্ঞানের কেরামতি।

মিরান্ডা লন্ডন খুঁজে পেল, যেখানে লক্ষ্মীর বোনের স্বামী আছে সেই প্লেনে আলাপ হওয়া মেয়েটির সঙ্গে। সে ভাবল, কে জানে ভারতের কোন শহরে দেবের স্ত্রী আছে। মিরান্ডা সবচেয়ে দূরযাত্রা করেছে বাহামা পর্যন্ত, ছেলেবেলায়। কাচের প্যানেলগুলোর মধ্যে সে বাহামা খুঁজে পেল না। পর্যটকরা বেরিয়ে যাওয়ার পর, সে এবং দেব আবার একলা হয়ে গেলে, দেব তাকে বলল সাঁকোর এক প্রান্তে দাঁড়াতে। সে বলল যে, ৩০ ফিট ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরের ফিসফিস করে বলা কথাও শুনতে পাবে।

"আমি বিশ্বাস করি না," মিরান্ডা বলল। ভিতরে ঢোকার পর সে সেই প্রথম কোনও কথা বলল। মনে হল, যেন, তার কানে স্পিকার বসানো আছে।

"চলো না," দেব পিছনে হেঁটে অন্য প্রান্তে চলে গেল। তার গলা নেমে আসল ফিসফিসানিতে। "কিছু বলো।" মিরান্ডা দেখল কথাগুলো আওড়ানোর সময় দেবের ঠোঁট নড়ল। একই সঙ্গে সে কথাগুলো এত পরিষ্কারভাবে শুনতে পেল যে, কথাগুলো তার ত্বকের নীচে, তার শীতের কোটের নীচে অনুভব করল। এত কাছে এবং এত উত্তাপে ভরা যে, সে অনুভব করল যে তার নিজের শরীরই যেন গরম হয়ে যাচ্ছে।

"হাই," আর কী বলবে বুঝতে না পেরে মিরান্ডা ফিসফিস করল।

"ইউ আর সেক্সি," ফিসফিস করে দেবের উত্তর আসল।

পরের সপ্তাহে, অফিসে গিয়ে লক্ষ্মী মিরান্ডাকে জানাল যে, তার ভগ্নিপতির সেটাই প্রথম অবৈধ সম্পর্ক নয়। "ও ঠিক করেছে যে, বরের হুঁশ ফেরার একটা সুযোগ দেবে," এক সন্ধেয় অফিস থেকে বেরোনোর তোড়জোড় করতে করতে লক্ষ্মী বলল। "ও বলছে সবই ছেলেটার কথা ভেবে করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটার কথা ভেবেই বরকে ক্ষমা করে দিতে রাজি আছে।" মিরান্ডা লক্ষ্মীর কম্পিউটার বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করছিল। "বরটা ঠিক গুটগুট করে ফিরে আসবে। আর ও-ও আসতে দেবে," লক্ষ্মী মাথা নাড়িয়ে বলল। "আমি হলে করতাম না। আমার বর যদি অন্য কোনও মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাত, বাড়ির তালাচাবি পালটে ফেলতাম।" সে তার কিউবিকলে রাখা ছবিটা দেখল। ছবিতে লক্ষ্মীর স্বামী তার কাঁধ জড়িয়ে ধরেছিল। হাঁটু দুটো লক্ষ্মীর দিকে হেলানো ছিল। লক্ষ্মী মিরান্ডার দিকে ফিরল। "তুমিও কি তাই করবে না?"

মিরান্ডা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। দেবের স্ত্রী পরের দিন ভারত থেকে ফিরে আসছে। সেই দুপুরে দেব মিরান্ডাকে অফিসে ফোন করেছিল জানাতে যে, তাকে এয়ারপোর্ট যেতে হবে স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য। সে কথা দিয়েছিল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিরান্ডাকে ফোন করবে।

"তাজমহল কেমন?" মিরান্ডা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করল।

"পৃথিবীর সবচেয়ে রোম্যান্টিক জায়গা," মনে করে লক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "প্রেমের প্রতি উৎসর্গ করা অমর সৌধ।"

দেব যখন এয়ারপোর্টে ছিল, মিরান্ডা তখন ফিলিন্স-এ গেল। তার ধারণায় একজন রক্ষিতার যা যা থাকা উচিত, সেই জিনিসগুলো কিনতে। একজোড়া কালো, উঁচু হিলতোলা জুতো খুঁজে পেল। বকলশগুলো শিশুর দাঁতের চেয়েও ছোট। একটা আজানুলম্বিত সিল্কের রোব এবং একটা স্যাটিনের স্লিপ খুঁজে বার করল। ধারে ঝিনুকের খোলের মতো কাটা কাটা। সে সাধারণত অফিসে যে প্যান্টিহোস পরে যায়, তার বদলে সিম করা ফিনফিনে স্টকিং খুঁজে বের করল। বিভিন্ন স্তূপ খুঁজে, বিভিন্ন তাকের মাঝে ঘোরাঘুরি করে, হ্যাঙারের পর হ্যাঙার সরিয়ে দেখে অবশেষে একটা ককটেল ড্রেস খুঁজে পেল যার পাতলা রুপোলি কাপড় তার চোখের রঙের সঙ্গে মিলে যায়। পোশাকটার কাঁধে স্ট্র্যাপের জায়গায় ছোট ছোট চেন লাগানো। কেনাকাটা করতে করতে সে দেবের কথা ভাবল। ম্যাপেরিয়ামে দেব তাকে যা বলেছিল, সেই কথা ভাবল। সেই প্রথম কোনও পুরুষমানুষ তাকে 'সেক্সি' বলেছিল। চোখ বুজলে সে তখনও অনুভব করতে পারছিল যে, তার ত্বকের নীচে দেবের ফিসফিস করে বলা কথাগুলো ভেসে যাচ্ছে। ফিটিং রুম বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটাই বড় ঘর ছিল। দেওয়ালে আয়না লাগানো। সে এক বয়স্ক মহিলার পাশে জায়গা পেল। মহিলাটির মুখ চকচকে এবং চুল রুক্ষ। তিনি খালিপায়ে শুধু অন্তর্বাস পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটি বডি স্টকিং-এর কালো জালি আঙুলের মধ্যে ধরে শক্ত করে টেনে দেখছিলেন।

"সবসময় দেখে নেবে কোথাও টান পড়ছে কি না," তিনি মিরান্ডাকে উপদেশ দিলেন।

মিরান্ডা স্যাটিনের স্লিপটা টেনে বের করে বুকের কাছে ধরল।

মহিলাটি সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। "একদম ঠিক।"

"আর এটা?" মিরান্ডা রুপোলি ককটেল ড্রেসটা তুলে ধরল।

"একদম," মহিলাটি বললেন। "তোমার গা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইবে।"

মিরান্ডা কল্পনা করল যে তারা সাউথ এন্ড-এর একটা রেস্তোরাঁয় গিয়েছে। সেখানে তারা আগে গিয়েছিল। দেব foie grass এবং শ্যাম্পেন ও র‍্যাম্পবেরি দিয়ে তৈরি একটা সুপ অর্ডার দিয়েছিল। সে কল্পনা করল সে ককটেল ড্রেসটা পরে আছে। দেব একটা সুট পরে গিয়েছে। টেবিলের ওপর হাত বাড়িয়ে মিরান্ডার হাতে চুমু খাচ্ছে। কিন্তু তার পরের বার দেব জিম-এর জামাকাপড় পরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসল। সেটা এক রবিবারের দুপুর। বেশ কয়েকদিন তাদের দেখা হয়নি। তার স্ত্রী ফিরে আসার পর ওটাই তার অজুহাত ছিল। রবিবার সে গাড়ি চালিয়ে বস্টন শহরে আসত। তারপর চার্লসের ধারে দৌড়োতে শুরু করত। প্রথম রবিবার মিরান্ডা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সিল্কের রোবটা পরে দরজা খুলেছিল, কিন্তু দেব সেটা লক্ষও করেনি। সে সোয়েটপ্যান্ট এবং স্নিকার্স পরে মিরান্ডাকে তুলে সোজা বিছানায় নিয়ে গেল। কোনও কথা না বলেই তার ভিতর প্রবেশ করল। পরে, তার সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য পিরিচ আনার সময় মিরান্ডা রোবটা গায়ে গলিয়েছিল, কিন্তু দেব অনুযোগ করল, সে তাকে তার লম্বা পা দুটো দেখতে দিচ্ছে না। এবং দাবি জানাল যে, সে রোবটি খুলে ফেলুক। তাই পরের রবিবার মিরান্ডার ওটা পরার আগ্রহ হয়নি, জিনসই পরেছিল। লঁজারিটা সে একটা দেরাজের পিছনদিকে মোজা এবং রোজকার অন্তর্বাসের পিছনে ঢুকিয়ে রাখল। রুপোলি ককটেল ড্রেসটা তার দেওয়াল-আলমারিতে ঝোলানো থাকল। দাম লেখা কাগজটা তখনও সিম থেকে ঝুলছিল। অনেক সময়, মিরান্ডা সকালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে দেখত যে, পোশাকটা স্তূপাকৃতি হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। চেন-স্ট্র্যাপগুলো সবসময় ধাতবের হ্যাঙার থেকে খসে পড়ত।

তাও, মিরান্ডা রবিবারের আশায় বসে থাকত। সকালবেলা দোকানে গিয়ে লম্বা পাউরুটি এবং দেবের পছন্দের খাবারের ছোট ছোট কৌটো কিনে আনত। পিকল্ড হেরিং, আলুর স্যালাড, পেস্তোর টর্টে, মাস্কার্পোন চিজ। তারা খাটেই শুয়েই খাবার খেত। আঙুল দিয়ে হেরিংটা তুলত। হাত দিয়ে পাউরুটি ছিঁড়ত। দেব তাকে তার ছেলেবেলার গল্প বলত। তখন সে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ট্রে-তে পরিবেশন করা আমের রস খেত। তারপর সাদা জামাকাপড় পরে একটা লেকের ধারে ক্রিকেট খেলতে যেত। তার যখন আঠারো বছর বয়স, তখন এমার্জেন্সি বলে কিছু একটা হয়েছিল। দেবকে উত্তর নিউ ইয়র্কের এক কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা সত্ত্বেও ফিল্মে আমেরিকান বাচনভঙ্গি বুঝতে তার অনেক বছর লেগেছিল। কথা বলতে বলতে সে তিনটে সিগারেট খেত। শেষ হয়ে গেলে খাটের পাশে একটা পিরিচে দুমড়ে ফেলে দিত। মাঝে মাঝে সে মিরান্ডাকে প্রশ্ন করত। এর আগে তার কতজন প্রেমিক ছিল (তিনজন), প্রথমবার তার বয়স কত ছিল (উনিশ) ইত্যাদি। লাঞ্চের পর তারা খাবারের টুকরো ছড়ানো চাদরের ওপর ভালবাসায় ব্যস্ত হয়ে পড়ত। তারপর দেব বারো মিনিটের জন্য ঘুমিয়ে নিত। মিরান্ডা আর কোনও প্রাপ্তবয়স্ককে চিনত না যে দিনের বেলা এরকম ঘুমোয়। কিন্তু দেব বলত যে, সে ভারতে এই অভ্যাসেই মানুষ হয়েছে কারণ সেখানে এত গরম যে, সূর্যাস্তের আগে কেউ বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না। "তা ছাড়া এভাবে আমরা একসঙ্গে ঘুমোতেও পারি," নিজের হাতটা একটা বড় বালার মতো মিরান্ডার দেহের চারপাশে জড়িয়ে সে দুষ্টুমিভরা গলায় বিড়বিড় করত।

কিন্তু মিরান্ডা কখনও ঘুমোত না। সে খাটের পাশের টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকত কিংবা দেবের আঙুলের ওপর নিজের মুখটা চেপে থাকত। তাদের আঙুলগুলো একসঙ্গে জড়ানো থাকত। দেবের এক-একটা আঙুলের গাঁটে ছ'টা রোম। ছ'মিনিট পর সে দেবের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে নিশ্বাস ফেলত, আড়মোড়া ভাঙত। দেব সত্যিই ঘুমোচ্ছে কি না পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু দেব সত্যিই তখন ঘুমোত । নিশ্বাস নেওয়ার সময় তার বুকের তলায় পাঁজরের হাড়গুলো ফুটে উঠত। তা সত্ত্বেও তার পেটে ভুঁড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। দেব নিজের কাঁধের রোম নিয়ে অভিযোগ করত। কিন্তু মিরান্ডার তাকে নিখুঁত মনে হত। সে কিছুতেই তাকে অন্য কোনওভাবে কল্পনা করতে রাজি হত না।

বারো মিনিট হয়ে গেলে দেব এমনভাবে চোখ খুলত যেন সে গোটা সময়টা জেগেই ছিল। মিরান্ডার দিকে তাকিয়ে এমন তৃপ্ত হাসি হাসত যে মিরান্ডার নিজেরও সেই তৃপ্তি অনুভব করতে ইচ্ছে হত। "সপ্তাহের সবচেয়ে ভাল ১২টা মিনিট," দেব মিরান্ডার পায়ের পিছনে হাত বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। তারপর সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠত। সোয়েটপ্যান্ট পরে, স্নিকার্সের ফিতে বাঁধত। বাথরুমে গিয়ে মুখ থেকে ধোঁয়ার গন্ধ দূর করার জন্য তর্জনী দিয়ে দাঁত মাজত। সে মিরান্ডাকে বলেছিল যে, সব ভারতীয়রাই নাকি এই কাজটা করতে পারে। তাকে বিদায়-চুম্বন দেওয়ার সময় মিরান্ডা মাঝে মাঝে তার চুলে নিজের গন্ধ পেত। কিন্তু সে জানত, দেব অজুহাত দিত যে সে সারা দুপুর জগিং করে কাটিয়েছে, যাতে সে বাড়ি ফিরেই সবচেয়ে আগে চান করতে পারে।

লক্ষ্মী এবং দেব ছাড়া, মিরান্ডার পরিচিত একমাত্র ভারতীয় পরিবারটির নাম ছিল দীক্ষিত। সে যেখানে বড় হয়েছে, দীক্ষিত-পরিবারটি সেই পাড়ায় থাকত। পাড়ার আঁকাবাঁকা রাস্তায় মি. দীক্ষিত প্রতি সন্ধেয় তাঁর রোজকার শার্ট-প্যান্ট পরে জগিং করতে বেরোতেন। ব্যায়ামের পোশাক হিসেবে শুধু পায়ে একজোড়া সস্তা কেডস পরতেন। দীক্ষিত পরিবারের বাচ্চারা ছাড়া, পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের তাঁর জগিং করার এই পোশাক দেখে খুব মজা লাগত। মিরান্ডারও। প্রতি সপ্তাহশেষে, গোটা পরিবার— মা, বাবা, দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে— গাড়িতে চেপে বেড়াতে যেতেন। কোথায় কেউ জানত না। পাড়ার অন্যান্য বাবারা অভিযোগ করতেন যে, মিস্টার দীক্ষিত তাঁর লনে ভাল করে সার দেন না। সময়মতো ঝরা পাতাগুলো পরিষ্কার করেন না। এবং নিজেদের মধ্যে একমত হতেন যে, দীক্ষিতদের বাড়িটা— সেই পাড়ায় একমাত্র ভিনাইলের সাইডিংওয়ালা বাড়ি— পাড়াটার সৌন্দর্য হ্রাস করত। মায়েরা কখনও মিসেস দীক্ষিতকে আর্মস্ট্রংদের সুইমিং পুলের পাশে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ডাকতেন না। স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষা করার সময় দীক্ষিত-ছেলেমেয়েরা এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। অন্য ছেলেমেয়েরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচু গলায় বলত, "দ্য দীক্ষিতস ডিগ শিট," এবং হাসিতে ফেটে পড়ত।

কোনও এক বছর, পাড়ার সব বাচ্চাদের দীক্ষিত-মেয়েটির জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মিরান্ডার মনে আছে যে, বাড়ির ভিতর ধূপ এবং পেঁয়াজের গন্ধে ভরে ছিল। বাড়ির দরজার সামনে একরাশ জুতো জমেছিল। কিন্তু তার সবচেয়ে বেশি মনে আছে একটা বালিশের ওয়াড়ের মাপের কাপড়ের টুকরো। সিঁড়ির নীচে একটা কাঠের পেরেকে টাঙানো ছিল। একজন নগ্ন মহিলার ছবি ছিল যাঁর সৈনিকের ঢালের মতো আকারের মুখটা লাল। রঙের দিকে টানা বিশাল বড়-বড় সাদা চোখ। চোখের মণি বলতে দুটো বিন্দু মাত্র। বুকের জায়গায় দুটো বৃত্ত। তাদের মধ্যিখানে একই রকম দুটো বিন্দু। এক হাতে তিনি একটি খাঁড়া ধরেছিলেন। এক পা দিয়ে একটি লোককে মাটিতে পিষে ফেলেছিলেন। লোকটি মুক্ত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। মহিলার দেহ ঘিরে একটি রক্তাক্ত নরমুণ্ডের মালা পপকর্ন চেনের কায়দায় গাঁথা। তিনি মিরান্ডার দিকে জিভ ভেঙাচ্ছিলেন।

"ইনি মা কালী," মিসেস দীক্ষিত হাসি হাসি মুখে বুঝিয়েছিলেন। ছবিটা সোজা করার জন্য কাঠের পেরেকটা একটু সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে হেনা দিয়ে আঁকাবাঁকা তারার মতো জটিল নকশা আঁকা ছিল। "এসো প্লিজ, কেক খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।"

মিরান্ডার তখন ন'বছর বয়স। সে এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, কেক খেতে পারেনি। তারপর বহু মাস ধরে সে ভয়ের চোটে দীক্ষিতদের বাড়ি যে দিকে, রাস্তার সেই দিক দিয়ে হাঁটতেই পারেনি। তাকে রোজ দু'বার দীক্ষিতদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হত। একবার বাসস্টপে যাওয়ার জন্য, আর-একবার বাড়ি ফেরার সময়। প্রথম কয়েকদিন তো সে পরের বাড়ির লনের কাছে পৌঁছোনো পর্যন্ত দমবন্ধ করে থাকত। ঠিক যেরকম কোনও গোরস্থানের পাশ দিয়ে স্কুলবাসটা যাওয়ার সময় করত।

এখন তার এসব কথা ভাবলে লজ্জা হয়। এখন, যখন সে এবং দেব পরস্পরকে ভালবাসে, তখন সে চোখ বুজে মরুভূমি, হাতির দল, পূর্ণিমা রাতে জলের ওপর শ্বেতপাথরের শিবির দেখতে পায়। এক শনিবার, আর কিছু করার ছিল না বলে, সে হেঁটে হেঁটে সেন্ট্রাল স্কোয়্যার পর্যন্ত গেল। সেখানে একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁয় এক প্লেট তন্দুরি চিকেন অর্ডার দিল। খেতে খেতে সে মেনুর নীচের দিকে লেখা কথাগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করল। 'ডিলিশিয়াস' বা 'ওয়াটার' বা 'চেক, প্লিজ'-এর ভারতীয় প্রতিশব্দ। কিন্তু কথাগুলো তার মনে রইল না। তাই সে মাঝেমধ্যে কেনমোর স্কোয়্যারের এক বইয়ের দোকানের বিদেশি ভাষার অংশে যাওয়া শুরু করল। সেখানে 'নিজে শেখো' সিরিজ থেকে সে বাংলা অক্ষর শেখার চেষ্টা করত। একদিন সে এতদূর এগিয়েছিল যে, তার নামের ভারতীয় অংশ 'মীরা' ফিলোফ্যাক্সে লেখার চেষ্টাও করেছিল। তার অনভ্যস্ত হাত সরে সরে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে, ঘুরে যাচ্ছিল, পেনটা তুলে নিচ্ছিল। বইয়ে দেওয়া নির্দেশ মেনে চলে সে বাঁদিক থেকে ডান দিকে একটা লাইন টানল যেটা থেকে অক্ষরগুলো ঝুলবে। একটা অক্ষর দেখে অক্ষরের চেয়ে সংখ্যা বলেই মনে হচ্ছিল, আর-একটাকে মনে হচ্ছিল পাশ ফেরানো ত্রিভুজ। অনেকবার চেষ্টার পর তার নামের অক্ষরগুলো এবং বইয়ে দেওয়া নমুনার মধ্যে কিছু মিল পাওয়া গেল। যদিও তখনও সে নিশ্চিত ছিল না যে, সে 'মীরা' লিখেছে, না 'মারা'। তার কাছে ওটা আঁকিবুঁকি ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও এই আঁকিবুঁকির যে কোনও অর্থ আছে, সেই ভাবনাটা তার মনকে নাড়া দিয়ে গেল।

সারা সপ্তাহ তার অত খারাপ লাগত না, সে কাজে ব্যস্ত থাকত। লক্ষ্মীর সঙ্গে মোড়ের একটা নতুন ভারতীয় রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করা শুরু করেছিল। খাওয়ার সময় লক্ষ্মী তার বোনের বিবাহিত জীবনের সাম্প্রতিকতম খবর দিত। মাঝে মাঝে মিরান্ডা বিষয় পালটানোর চেষ্টা করত। একবার কলেজে সে এবং তার বয়ফ্রেন্ড একটা ভিড়ে ভরা প্যানকেকের দোকান থেকে দাম না মিটিয়েই বেরিয়ে এসেছিল কাজটা করা যায় কি না দেখার জন্য। তখন তার যেমন লেগেছিল, লক্ষ্মীর কথা শুনলেও তেমনই লাগত। কিন্তু লক্ষ্মী আর কোনও বিষয়ে কথাই বলত না। "ওর জায়গায় আমি হলে সোজা লন্ডনে গিয়ে দু'জনকেই গুলি করে মেরে ফেলতাম," সে একদিন ঘোষণা করল। একটা পাঁপড় আধখানা করে চাটনিতে ডোবাল। "জানি না, কী করে ও এভাবে শুধু অপেক্ষাই করে থাকে।"

মিরান্ডা জানে কী করে অপেক্ষা করতে হয়। সন্ধেবেলা সে তার ডাইনিং টেবিলে বসে নখে স্বচ্ছ নেলপালিশ লাগায়। সরাসরি স্যালাডের পাত্র থেকে স্যালাড খায়। টিভি দেখে এবং রবিবারের অপেক্ষা করে। শনিবারগুলোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে কঠিন, কারণ ততদিনে মনে হয় যেন রবিবার আর কখনও আসবে না। এক শনিবার যখন দেব ফোন করেছিল, তখন সে পিছনে লোকের হাসি, কথা বলার আওয়াজ পেয়েছিল। এতজনের গলা শোনা যাচ্ছিল যে, সে জিজ্ঞেস করেছিল দেব কোনও কনসার্ট হল-এ আছে কি না। কিন্তু দেব শহরতলিতে তার বাড়ি থেকেই ফোন করছিল। "তোমার কথা ভাল করে শুনতে পাচ্ছি না," দেব বলল। "বাড়িতে লোক এসেছে। তুমি কি মিস করছ আমাকে?" মিরান্ডা টিভির দিকে তাকাল। একটা সিরিয়াল চলছিল। ফোন আসার পর সে শব্দ বন্ধ করে দিয়েছিল। সে কল্পনা করল দেব ফিসফিস করে ফোনে কথা বলছে। ওপরের কোনও ঘরে, দরজার হাতলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হলওয়েতে ভরতি অতিথি। "মিরান্ডা, মিস করছ কি আমাকে?" দেব আবার জিজ্ঞেস করল। মিরান্ডা উত্তর দিল যে, সে দেবকে 'মিস' করছে।

পরের দিন, দেব আসার পর মিরান্ডা জিজ্ঞেস করল, তার স্ত্রীকে কেমন দেখতে। দেব শেষ সিগারেটটা খেয়ে দৃঢ় হাতে সেটা পিরিচের ওপর দুমড়ে ফেলে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর প্রশ্নটা করল। সে ভাবল এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বাধবে কিনা। দেব কিন্তু প্রশ্ন শুনে অবাক হল না। ক্র্যাকারের ওপর স্মোকড হোয়াইটফিশ লাগাতে লাগাতে সে বলল, তার স্ত্রীকে মুম্বইয়ের এক অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতের মতো দেখতে।

এক মুহূর্তের জন্য মিরান্ডার হৃৎস্পন্দন থমকে গেল। কিন্তু না, দীক্ষিতদের মেয়েটির অন্য নাম ছিল। 'প' দিয়ে কোনও নাম। তবু, সে ভাবল ওই অভিনেত্রী এবং দীক্ষিতদের মেয়েটির মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি না। মেয়েটি ছিল সাধারণ চেহারার। হাইস্কুলে যখন পড়ত সবসময় চুলটা দুটো বিনুনিতে বেঁধে রাখত।

কয়েকদিন পর মিরান্ডা সেন্ট্রাল স্কোয়্যারে এক ভারতীয় মুদিখানায় গেল। সেখানে ভিডিও ভাড়াও দেওয়া হয়। দরজা খুলতেই একটা ঘণ্টার অদ্ভুত যদিও মৃদু শব্দ শোনা গেল। খাওয়ার সময়ে মিরান্ডাই ছিল একমাত্র খদ্দের। দোকানের এক কোণে একটা টিভিতে ভিডিও চলছিল। এক সারি যুবতী হারেম প্যান্ট পরে একটি সমুদ্রতটে একই তালে নিতম্ব দোলাচ্ছে।

"আপনাকে কি কোনও সাহায্য করতে পারি?" ক্যাশ কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানো লোকটি জিজ্ঞেস করল। সে একটা কাগজের প্লেটের ওপর কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঢ় বাদামি সসে শিঙাড়া ডুবিয়ে খাচ্ছিল। কোমরের কাছে কাচের কাউন্টারের নীচে ট্রে-তে আরও মোটাসোটা শিঙাড়া রাখা ছিল। সেই সঙ্গে আর-একটা কোনও খাবার যেটা দেখতে হিরে আকারের ফলকে মোড়া ফাজ-এর মতো। একটা ক্যাটকেটে কমলা রঙের প্যাস্ট্রি রসে ভাসছিল। "কোনও ভিডিও চাই?"

মিরান্ডা তার ফিলোফ্যাক্স খুলল। সেখানে সে 'মটারি দিক্ষিত' লিখে রেখেছিল। সে কাউন্টারের পিছনের তাকে ভিডিওগুলোর দিকে তাকাল। মেয়েদের স্কার্টগুলো কটির কাছে নিচু করে পরা। ঊর্ধ্বাঙ্গে জামাগুলো ব্যান্ডানার মতো বুকের মাঝে বাঁধা। কেউ কেউ পাথরের দেওয়াল বা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যেরকম সমুদ্রতটে নৃত্যরতা মেয়েগুলো সুন্দরী এই মেয়েগুলো সেইরকমই সুন্দরী।। চোখে কাজল, মাথায় লম্বা কালো চুল। মিরান্ডা তখন বুঝতে পারল যে, মাধুরী দীক্ষিতও সুন্দরী।

"আমাদের কাছে সাবটাইটেল দেওয়া কপিও আছে মিস," লোকটি বলল। সে চট করে আঙুলগুলো শার্টে মুছে তিনটে ফিল্মের ভিডিও বের করল।

"না," মিরান্ডা বলল। "ধন্যবাদ, না।" সে দোকানটায় খানিক ঘোরাঘুরি করল। লেবেলহীন প্যাকেট এবং টিনে ভরতি তাকগুলো খুঁটিয়ে দেখল। ফ্রিজার কেসটা পিটা-ব্রেড এবং অপরিচিত শাকসবজিতে ঠাসা ছিল। একমাত্র যে জিনিসটা সে চিনতে পারল, সেটা হল একটা তাকে সারি করে রাখা ব্যাগের পর ব্যাগ হট মিক্স, যেটা লক্ষ্মী সবসময় খায়। সে লক্ষ্মীর জন্য কিনবে ভাবল, তারপর ইতস্তত করল। সে ভারতীয় মুদিখানায় কী করছিল, সে ব্যাপারে কী বলবে ভেবে পেল না।

"খুব মশলাদার," লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল। মিরান্ডার শরীরে চোখ বুলিয়ে বলল, "আপনার পক্ষে বড্ড বেশি মশলাদার।"

ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেও লক্ষ্মীর ভগ্নিপতির হুঁশ ফিরল না। সে মন্ট্রিলে ফিরে দু'সপ্তাহ ধরে স্ত্রীর সঙ্গে তিক্ত তর্কাতর্কি চালিয়ে, তারপর দুটো সুটকেস গুছিয়ে লন্ডনে ফিরে গিয়েছিল। এখন সে ডিভোর্স চায়।

মিরান্ডা তার কিউবিকলে বসে শুনল যে, লক্ষ্মী তার বোনকে ক্রমাগত বলে চলেছে, পৃথিবীতে আরও অনেক ভাল ছেলে আছে। শুধু তাদের দেখা দেওয়ার অপেক্ষা। পরের দিন বোনটি জানাল যে, সে তার ছেলেকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যালিফোর্নিয়ায় তার মা-বাবার কাছে চলে যাচ্ছে, এই আঘাত কাটিয়ে ওঠার আশায়। লক্ষ্মী তাকে রাজি করাল শনি-রবিবার বস্টনে কাটিয়ে যেতে। "এই চেঞ্জটা তোর পক্ষে ভাল হবে," সে মৃদুভাবে জোর দিল। "তা ছাড়া, আমি তো তোকে কত বছর দেখিইনি।"

মিরান্ডা নিজের ফোনের দিকে তাকাল। সে চাইছিল, দেব ফোন করুক। তাদের শেষ কথা হয়েছে চারদিন আগে। শুনতে পেল, লক্ষ্মী ডিরেক্টরি অ্যাসিস্ট্যান্সের নম্বর ডায়াল করে একটা বিউটি পার্লারের নম্বর চাইছে। "আরামদায়ক কিছু," লক্ষ্মী অনুরোধ করল। সে মাসাজ, ফেশিয়াল, ম্যানিকিওর, পেডিকিওরের সময় নির্ধারিত করে ফোর সিজনস-এ লাঞ্চের জন্য একটা টেবিল বুক করল। বোনের মন ভাল করার দৃঢ় সংকল্পে সে ছেলেটার কথা ভুলে গিয়েছিল। সে ল্যামিনেট করা দেওয়ালে টোকা মারল।

"তুমি কি শনিবার ব্যস্ত আছ?"

ছেলেটা রোগা। পিছনে একটা হলুদ রঙের ন্যাপস্যাক বাঁধা। পরনে লাল রঙের ভি-গলা সোয়েটার, ধূসর রঙের হেরিংবোন ট্রাউজার আর কালো চামড়ার জুতো। ঘন চুলটা চোখের ওপর দিয়ে কাটা। চোখের তলায় কালি পড়েছে। মিরান্ডা প্রথম সেটাই লক্ষ করল। চোখ দুটোর জন্য ছেলেটাকে দেখে মনে হয় যেন তার চোখমুখ বসে গিয়েছে। যেন সে খুব সিগারেট খায় এবং খুব কম ঘুমোয়। যদিও তার বয়স মাত্র সাত বছর। সে স্পাইরাল বাইন্ডিং-এর একটি বড় আঁকার খাতা ধরে ছিল। তার নাম রোহিন।

"আমাকে একটা রাজধানী জিজ্ঞেস করো," সে মিরান্ডার দিকে তাকিয়ে বলল।

মিরান্ডা তার দিকে তাকিয়ে থাকল। শনিবার সকালে তখন সাড়ে আটটা বাজে। সে কফিতে চুমুক দিল। "কী বলছ?"

"ও এখন এই খেলাটা খেলছে," লক্ষ্মীর বোন বোঝাল। সে তার ছেলের মতোই রোগা। লম্বাটে মুখ। চোখের তলায় একই রকম কালি পড়েছে। কাঁধে একটা মরচে রঙের ভারী কোট ঝুলছিল। কালো চুল ব্যালেরিনার মতো টেনে বাঁধা। রগের কাছে কয়েক গাছা চুল পাকা। "তুমি একটা দেশের নাম বলো আর ও তোমাকে তার রাজধানীর নাম বলবে।"

AMARBOI.COM

"তোমার ওকে গাড়িতে শোনা উচিত ছিল," লক্ষ্মী বলল। "ইতিমধ্যেই গোটা ইউরোপের রাজধানী মুখস্থ করে ফেলেছে।"

"এটা মোটেই খেলা নয়," রোহিন বলল। "স্কুলে একটা ছেলের সঙ্গে আমার কম্পিটিশন হচ্ছে। সব রাজধানী মুখস্থ করার কম্পিটিশন। আমি ওকে হারাবই।"

মিরান্ডা মাথা নাড়ল। "আচ্ছা। ভারতের রাজধানী কী?"

"ওটা তো কোনও প্রশ্নই নয়," রোহিন কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে খেলনা সৈনিকের মতো হাত দুলিয়ে সরে গেল। তারপর একই ভাবে লক্ষ্মীর বোনের কাছে গিয়ে তার ওভারকোটের পকেট ধরে টানতে লাগল। "শক্ত একটা জিজ্ঞেস করো।"

"সেনেগাল," তার মা বলল।

"ডাকার!" রোহিন বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে উঠে গোল গোল করে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতে সে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। মিরান্ডা শুনতে পেল যে, সে ফ্রিজ খুলছে, আর বন্ধ করছে।

"রোহিন, না জিজ্ঞেস করে কিছুতে হাত দেবে না," লক্ষ্মীর বোন ক্লান্তস্বরে ডাক দিল। মিরান্ডার দিকে তাকিয়ে কোনওমতে হাসল। "চিন্তা কোরো না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ও ঘুমিয়ে পড়বে। আর ওকে দেখতে রাজি হওয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

AMARBOI.COM

"তিনটের সময় ফিরছি," বোনের সঙ্গে হলওয়েতে অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে লক্ষ্মী বলে গেল, "ডাবল পার্ক করা আছে।"

মিরান্ডা দরজার চেন আটকে রোহিনকে খুঁজতে রান্নাঘরে গেল। কিন্তু ছেলেটা ততক্ষণে লিভিং রুমে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে ডিরেক্টর-চেয়ারের একটায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। ন্যাপস্যাকটা খুলে, মিরান্ডার নখ-পরিচর্যার সরঞ্জাম টেবিলের এক পাশে সরিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর নিজের ক্রেয়ন ছড়িয়ে ফেলল। মিরান্ডা তার কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে দেখল যে, সে একটা নীল ক্রেয়ন দিয়ে একটা এরোপ্লেনের আকারে দাগ টানল।

"খুব সুন্দর হয়েছে," মিরান্ডা বলল। রোহিন কোনও উত্তর দিল না দেখে সে রান্নাঘরে গিয়ে নিজের জন্য আরও কফি ঢেলে নিল।

"আমাকেও একটু দিয়ো প্লিজ," রোহিন বলে উঠল।

মিরান্ডা লিভিং রুমে ফিরে গেল। "একটু কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একটু কফি। পটে অনেক আছে। আমি দেখেছি।"

মিরান্ডা টেবিলে গিয়ে রোহিনের উলটোদিকে বসল। রোহিন মাঝে মাঝে একটা ক্রেয়ন নেওয়ার জন্য প্রায় উঠে দাঁড়াচ্ছিল। তার বসার ফলে ডিরেক্টর-চেয়ারটা একটুও দেবে যায়নি বললেই চলে।

"তোমার এখনও কফি খাওয়ার বয়স হয়নি।"

রোহিন আঁকার খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ল। তার ছোট্ট বুক এবং কাঁধ প্রায় খাতায় ঠেকে গেল। মাথাটা একদিকে হেলিয়ে বলল, "স্টুয়ার্ডেস তো আমাকে কফি খেতে দিয়েছিল। দুধ আর অনেকটা চিনি দিয়ে বানিয়ে দিয়েছিল।" সে সোজা হয়ে বসল, প্লেনের পাশে একটি মেয়ের মুখ দেখা গেল। লম্বা ঢেউ খেলানো চুল এবং তারার মতো চোখ। "ওর চুলটা আরও চকচকে ছিল," সে বিবেচনা করে জানাল। "বাবারও প্লেনে একজন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।" সে মিরান্ডার দিকে তাকাল। তাকে কফিতে চুমুক দিতে দেখে তার মুখ কালো হয়ে উঠল। "অল্প একটু কফিও কি খেতে পারি না? প্লিজ?"

যদিও ছেলেটার অভিব্যক্তি শান্ত, মনমরা, তাও মিরান্ডা ভাবল যে, সে কান্নাকাটি, চেঁচামেচি করবে কিনা। কল্পনা করল রোহিন তাকে তার চামড়ার জুতো পায়ে লাথি মারছে, কফির জন্য চিলচিৎকার জুড়েছে, আর যতক্ষণ না তার মা এবং লক্ষ্মী তাকে নিতে আসে ততক্ষণ চেঁচিয়েই যাচ্ছে, কেঁদেই যাচ্ছে। সে রান্নাঘরে গিয়ে রোহিনের অনুরোধ অনুযায়ী এক কাপ কফি তৈরি করল। যদি হাত থেকে ফেলে দেয় আশঙ্কায় সে একটা মগ নিল যেটা তার অপছন্দ।

"ধন্যবাদ," টেবিলের ওপর মগটা রাখার পর রোহিন বলল। সে দু'হাত দিয়ে মগটা ভাল করে ধরে ছোট ছোট চুমুক দিল।

আঁকার সময় মিরান্ডা তার সঙ্গে বসে থাকল। কিন্তু নখে এক কোট স্বচ্ছ নেলপালিশ লাগাতে গেলেই রোহিন প্রতিবাদ করল। নিজের ন্যাপস্যাক থেকে একটা পেপারব্যাক বিশ্বপঞ্জিকা বের করে মিরান্ডাকে বলল তাকে প্রশ্ন করতে। দেশগুলো মহাদেশ অনুযায়ী সাজানো ছিল। প্রতি পাতায় ছ'টি দেশ, মোটা অক্ষরে রাজধানীর নাম লেখা। তারপর জনসংখ্যা, সরকার এবং অন্যান্য তথ্য নিয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা। মিরান্ডা আফ্রিকার অংশে একটা পাতা খুলে তালিকাটা পড়ল। "মালি," সে জিজ্ঞেস করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বামাকো," রোহিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

"মালাউয়ি।"

"লিলঙ্গে।"

মিরান্ডার মনে পড়ল সে ম্যাপেরিয়ামে আফ্রিকা দেখেছিল। মনে পড়ল যে, দেশের মোটা অংশটা সবুজ রঙের ছিল।

"আরও বলো," রোহিন বলল।

"মরিটানিয়া।"

"নউয়াকচট।"

"মরিশাস।"

রোহিন থেমে চোখ দুটো চিপে বন্ধ করল, তারপর হেরে গিয়ে চোখ খুলে ফেলল। "মনে করতে পারছি না।"

"পোর্ট লুই," মিরান্ডা বলে দিল।

"পোর্ট লুই," রোহিন বারবার নামটা আওড়াতে শুরু করল। নিচুস্বরে মন্ত্রের মতো নামটা জপ করল।

আফ্রিকার শেষ দেশে পৌঁছোনোর পর রোহিন বলল যে, সে কার্টুন দেখতে চায়। মিরান্ডাকে বলল তার সঙ্গে বসে দেখতে। কার্টুন শেষ হওয়ার পর সে মিরান্ডার পিছন-পিছন রান্নাঘরে গেল। মিরান্ডা যতক্ষণ ধরে কফি তৈরি করল সে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মিনিট পর যখন মিরান্ডা বাথরুমে গেল, তখন সে সেখানেও তার পিছন পিছন গেল না বটে, কিন্তু বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসার সময় মিরান্ডা তাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে গেল।

"তোমার কি যাওয়া দরকার?"

রোহিন ঘাড় নাড়ল, কিন্তু বাথরুমে ঢুকে টয়লেটের ঢাকাটা নামিয়ে তার ওপর উঠে দাঁড়াল। সিঙ্কের ওপর যে কাচের সরু তাকটায় মিরান্ডার টুথব্রাশ এবং মেকআপ রাখা থাকে, সেটা জরিপ করল।

"এটা কীসের জন্য?" দেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন মিরান্ডা যে আই-জেলের নমুনা পেয়েছিল, সেটা তুলে রোহিন জিজ্ঞেস করল।

"ফোলাভাব কমাতে।"

"ফোলাভাব বলতে?"

"এখানে," মিরান্ডা চোখের দিকে নির্দেশ করে বোঝাল।

AMARBOI.COM

"কান্নাকাটি করার পর?"

"তাই হবে।"

রোহিন টিউবটা খুলে গন্ধ নিল। এক ফোঁটা আঙুলে ঢেলে হাতে মাখল। "ঝাঁজালো," সে তার হাতের পিছনদিকটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। যেন সেটা রং পালটে ফেলবে। "মায়েরও চোখ ফোলা। মা বলে ওটা ঠান্ডা লাগার জন্য, কিন্তু আসলে কান্নাকাটি করে। মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝে মাঝে ডিনারের পুরো সময়টা। কখনও কখনও এত কাঁদে যে, চোখ দুটো কোলাব্যাঙের মতো ফুলে ওঠে।"

মিরান্ডা ভাবল তার রোহিনকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত কি না। সে রান্নাঘরে গিয়ে এক ব্যাগ রাইস-কেক আর কয়েকটা লেটুস পাতা খুঁজে পেল। বেরিয়ে দোকান থেকে কিছু কিনে এনে দেওয়ার প্রস্তাব দিল, কিন্তু রোহিন বলল যে, তার খুব একটা খিদে পায়নি। সে একটা রাইস-কেক নিল। "তুমিও একটা নাও," সে বলল। তারা টেবিলে বসে ছিল। রাইস-কেকগুলো তাদের মাঝখানে রাখা। রোহিন আঁকার খাতায় একটা নতুন পাতা খুলল। "তুমি আঁকো।"

মিরান্ডা একটা নীল ক্রেয়ন বেছে নিল। "কী আঁকব?"

রোহিন একটু ভাবল, "আমি বলছি," বলে সে মিরান্ডাকে লিভিং রুমের আসবাবপত্র সোফা, ডিরেক্টর-চেয়ার, টিভি, টেলিফোন আঁকতে বলল। "তা হলে আমি মনে রাখতে পারব।"

"কী মনে রাখতে পারবে?"

"আমাদের একসঙ্গে কাটানো এই দিনটা," রোহিন আর-একটা রাইস-কেকের দিকে হাত বাড়াল।

"তুমি দিনটা মনে রাখতে চাও কেন?"

"কারণ, আমাদের আর কখনও দেখা হবে না। কোনও দিনও না।"

কথাটা যে কত নির্ভুল, ভেবে মিরান্ডা চমকে উঠল। সে রোহিনের দিকে তাকিয়ে সামান্য বিষণ্ণ বোধ করল। রোহিনকে দেখে কিন্তু বিষণ্ণ মনে হল না। সে পাতায় টোকা মারল। "আঁকো না।"

তাই মিরান্ডা আসবাবগুলো যথাসাধ্য আঁকল। সোফা, ডিরেক্টর-চেয়ার, টিভি, টেলিফোন। রোহিন তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এত কাছে ঝুঁকে পড়েছিল যে, মাঝে মাঝে মিরান্ডা কী আঁকছে দেখতেই পাচ্ছিল না। রোহিন তার ছোট

AMARBOI.COM

তামাটে রঙের হাতটা মিরান্ডার হাতের ওপর রাখল। "এবার আমি।"

মিরান্ডা তাকে ক্রেয়নটা দিল।

রোহিন ঘাড় নাড়ল। "না। এবার আমাকে আঁকো।"

"আমি পারব না," মিরান্ডা বলল। "তোমার মতো দেখতে হবে না।"

রোহিনের মুখে মনমরা ভাবটা দেখা দিতে শুরু করল। যেমন মিরান্ডা তাকে কফি দিতে না চাওয়ার পর হয়েছিল। "প্লিজ?"

মিরান্ডা রোহিনের মুখ আঁকল তার মাথা এবং ঘন চুল আঁকল। রোহিন মুখে একটা ভদ্র, দুঃখী ভাব নিয়ে, একপাশে তাকিয়ে সম্পূর্ণভাবে স্থির হয়ে বসে থাকল। মিরান্ডার মনে হচ্ছিল যদি সে ছবিতে কাঙ্ক্ষিত সাদৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে পারত। তার হাত তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছিল। যেমন সেদিন বইয়ের দোকানে তার নামটা বাংলায় লিখতে গিয়ে হচ্ছিল। মুখটা মোটেও রোহিনের মতো দেখতে হল না। মিরান্ডা যখন তার নাক আঁকছে, রোহিন টেবিল থেকে উঠে গেল।

"আমার একঘেয়ে লাগছে," ঘোষণা করে রোহিন মিরান্ডার শোওয়ার ঘরের দিকে এগোল। মিরান্ডা শুনতে পেল, সে দরজা খুলছে, দেরাজের টানা খুলছে-বন্ধ করছে।

মিরান্ডা যখন ভিতরে গেল রোহিন তখন দেওয়াল-আলমারির ভিতর ঢুকে পড়েছে। এক মুহূর্ত পর সে বাইরে বেরিয়ে এল। তার চুল এলোমেলো। হাতে রুপোলি ককটেল ড্রেসটা। "এটা মাটিতে পড়ে ছিল।"

"ওটা খালি হ্যাঙার থেকে পড়ে যায়।"

রোহিন পোশাকটার দিকে তাকাল। তারপর মিরান্ডার শরীরের দিকে তাকাল। "এটা পরো।"

"কী বলছ?"

"পরে ফেলো।"

পোশাকটা পরার কোনও কারণ ছিল না। ফিলিন্স-এর সেই ফিটিং রুম ছাড়া মিরান্ডা কখনও জামাটা পরেনি। সে জানত যে, যতদিন সে দেবের সঙ্গে আছে, তার ওটা পরা হবেও না। কারণ সে জানত যে, তারা কখনও রেস্তোরাঁয় যাবে না, যেখানে দেব হাত বাড়িয়ে তার হাতে চুমু খাবে। মিরান্ডার অ্যাপার্টমেন্টেই তাদের দেখা হবে। দেব সব সময় সোয়েটপ্যান্ট, জিনস পরে থাকবে। সে রোহিনের কাছ থেকে পোশাকটা নিয়ে ঝেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোজা করল। যদিও পাতলা কাপড়টায় কখনও ভাঁজ পড়ে না। একটা খালি হ্যাঙারের জন্য দেওয়াল-আলমারির ভিতর হাত বাড়াল।

"প্লিজ পরো না," রোহিন হঠাৎ তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। রোগা হাত দুটো দিয়ে মিরান্ডার কোমর জড়িয়ে ধরে তার শরীরে মুখ চেপে ধরল। "প্লিজ?"

"ঠিক আছে," মিরান্ডা বলল। সে রোহিনের গায়ের জোর দেখে বিস্মিত হল।

রোহিন খুশির হাসি হেসে মিরান্ডার খাটের এক ধারে গিয়ে বসল।

"তোমাকে বাইরে অপেক্ষা করতে হবে," দরজার দিকে দেখিয়ে মিরান্ডা বলল। "আমার হয়ে গেলে আমি বেরিয়ে আসব।"

"কিন্তু মা তো সবসময় আমার সামনেই জামাকাপড় বদলায়।"

"তাই বুঝি?"

রোহিন মাথা নাড়ল। "তারপর ছেড়ে ফেলা জামাগুলো মাটি থেকে তোলেও না। সব দলা পাকিয়ে খাটের পাশে মেঝেতে ছড়িয়ে রাখে।

"একদিন মা আমার ঘরে ঘুমিয়েছিল," রোহিন বলে চলল। "বলল নিজের বিছানার থেকে আমারটাই বেশি ভাল লাগছে। এখন বাবা চলে গিয়েছে তো।"

"আমি তোমার মা নই," মিরান্ডা বলল। রোহিনকে বগলের তলায় ধরে খাট থেকে নামিয়ে দিল। রোহিন দাঁড়াচ্ছে না দেখে তাকে কোলে তুলে নিল। দেখে যা মনে হয় রোহিনের ওজন তার চেয়ে বেশি। সে মিরান্ডাকে আঁকড়ে ধরে থাকল। পা দুটো শক্ত করে মিরান্ডার কটিদেশে জড়িয়ে তার বুকের ওপর মাথা রাখল। মিরান্ডা ছেলেটাকে হলওয়েতে নামিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বাড়তি সাবধানতা হিসেবে ছিটকিনিও আটকে দিল। পোশাকটা গায়ে গলিয়ে দরজার পিছনে পেরেক দিয়ে সাঁটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত উঁচু আয়নাটায় তাকাল। তার মোজাগুলো বেখাপ্পা লাগছিল, তাই সে একটা দেরাজ খুলে স্টকিংগুলো খুঁজে বের করল। দেওয়াল-আলমারির পিছন দিকে খুঁজে ছোট্ট বকলশ লাগানো উঁচু হিলতোলা জুতোগুলো পরল। জামার চেন-স্ট্র্যাপগুলো তার কণ্ঠার হাড়ের ওপর পেপার-ক্লিপের মতো হালকা হয়ে বসেছিল। পোশাকটা গায়ে একটু ঢিলে হয়েছিল। মিরান্ডা নিজে নিজে চেনটা লাগাতে পারছিল না।

AMARBOI.COM

রোহিন দরজায় টোকা মারতে শুরু করল। "এবার আসতে পারি?"

মিরান্ডা দরজা খুলে দিল। রোহিন পঞ্জিকা হাতে ধরে বিড়বিড় করে কী সব আওড়াচ্ছিল। মিরান্ডাকে দেখে সে বড় বড় চোখে তাকাল। "চেনটা লাগাতে তোমার সাহায্য চাই," মিরান্ডা বলল। সে খাটের এক প্রান্তে বসে পড়ল।

রোহিন জামার চেনটা পুরোপুরি লাগিয়ে দিল। তারপর মিরান্ডা উঠে দাঁড়িয়ে এক পাক ঘুরে গেল। রোহিন পঞ্জিকাটা নামিয়ে রাখল। "ইউ আর সেক্সি," সে ঘোষণা করল।

"কী বললে?"

"ইউ আর সেক্সি।"

মিরান্ডা আবার বসে পড়ল। যদিও সে জানত যে, কথাটার কোনও মানেই নেই, তাও, তার বুকটা মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল। রোহিন সম্ভবত সব মেয়েকেই 'সেক্সি' বলে। সম্ভবত সে কথাটা কোনও ফিল্মে শুনেছে বা কোনও পত্রিকার প্রচ্ছদে পড়েছে। তার ম্যাপেরিয়ামে যাওয়ার দিনটার কথা মনে পড়ে গেল। সাঁকোর এক প্রান্তে সে, আর-এক প্রান্তে দেব। সেই সময় সে ভেবেছিল যে, সে জানে দেব কী বলতে চাইছে। সেই সময় তার কাছে কথাগুলোর একটা অর্থ ছিল।

মিরান্ডা বুকের কাছে হাত দুটো ভাঁজ করে রোহিনের চোখে চোখ রাখল। "একটা কথা বলো তো।"

রোহিন চুপ করে রইল।

"ওটার মানে কী?"

"কোনটার?"

"ওই কথাটা, 'সেক্সি'। ওটার মানে কী?"

রোহিন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল। "বলতে পারব না।"

"কেন নয়?"

"ওটা একটা গোপন কথা।" রোহিন তার ঠোঁট দুটো চেপে বন্ধ করে ফেলল। এতই জোরে যে, ঠোঁটের কিছুটা অংশ পাংশু হয়ে গেল।

"গোপন কথাটা আমাকে বলো। আমি জানতে চাই।"

রোহিন মিরান্ডার পাশে বসে তোশকের ধারে তার জুতোর পিছন দিকটা দিয়ে ঠোকা মারতে শুরু করল। কিছুটা নার্ভাসভাবে ফিকফিক করে হাসতে

AMARBOI.COM

লাগল। তার রোগা শরীরটা সরে-সরে পিছিয়ে যাচ্ছিল, যেন কেউ তাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

"বলো," মিরান্ডা দাবি জানাল। সে ঝুঁকে পড়ে রোহিনের গোড়ালি দুটো চেপে ধরল যাতে সে স্থির হয়ে বসে।

রোহিন তার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটো চেরা দাগের মতো সরু হয়ে গিয়েছিল। সে আবার তোশকে মারবে বলে ছটফট করে উঠল, কিন্তু মিরান্ডা তাকে চেপে ধরল। রোহিন খাটে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, পিঠটা বোর্ডের মতো সোজা। হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ওটার মানে এমন কাউকে ভালবাসা, যাকে তুমি চেনো না।"

মিরান্ডা রোহিনের কথাগুলো তার ত্বকের নীচে অনুভব করল, যেভাবে দেবের কথাগুলো অনুভব করেছিল। কিন্তু এবারে তার দেহ গরম হয়ে উঠল না বরং সে অবশ বোধ করল। মনে পড়ে গেল সেই ভারতীয় মুদিখানায় কীরকম লেগেছিল, যখন কোনও ছবি না দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল যে, দেবের স্ত্রীকে যার মতো দেখতে, সেই মাধুরী দীক্ষিত সুন্দরী।

"আমার বাবা তো তাই করেছে," রোহিন বলতে থাকল। "বাবা যার পাশে বসেছিল তাকে চিনত না। সে সেক্সি ছিল। আর এখন বাবা মায়ের বদলে তাকেই ভালবাসে।"

রোহিন জুতো খুলে সেগুলো পাশাপাশি মেঝের ওপর রাখল। তারপর সে কমফর্টারটা সরিয়ে পঞ্জিকা হাতে নিয়ে গুটিসুটি মেরে মিরান্ডার বিছানায় ঢুকে পড়ল। এক মিনিট পর বইটা তার হাত থেকে পড়ে গেল, চোখ বুজে আসল। মিরান্ডা ঘুমন্ত রোহিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার নিশ্বাসের সঙ্গে কমফর্টারটা উঠছিল, নামছিল। সে দেবের মতো বারো মিনিট পর উঠে পড়ল না। কুড়ি মিনিট পরেও জাগল না। মিরান্ডা রুপোলি ককটেল ড্রেসটা ছেড়ে ফেলে আবার জিনস পরল, উঁচু হিলতোলা জুতোগুলো দেওয়াল-আলমারিতে পিছনে ঢুকিয়ে রাখল। স্টকিংগুলো মুড়ে দেরাজে রেখে দিল। রোহিন একবারও চোখ খুলল না।

সবকিছু গুছিয়ে মিরান্ডা খাটের এক পাশে বসে রোহিনের দিকে ঝুঁকল। এতটাই কাছে ঝুঁকে পড়ল যে, দেখতে পেল রোহিনের ঠোঁটের কোণে রাইস-কেকের সামান্য সাদা গুঁড়ো লেগে আছে। মিরান্ডা পঞ্জিকাটা তুলে নিল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে ভাবার চেষ্টা করল যে, মস্ত্রিলের বাড়িতে

AMARBOI.COM

রোহিন নিশ্চয় অনেক ঝগড়া শুনতে পেয়েছে। "মেয়েটা কি সুন্দরী?" রোহিনের মা নিশ্চয়ই তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে একই বাথরোব পরে থেকেছে। নিজের সুন্দর মুখটা বিদ্বেষে কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছে, "সেক্সি?" রোহিনের বাবা প্রথমে অস্বীকার করার চেষ্টা করবে, বিষয়টা পালটানোর চেষ্টা করবে। "বলো," রোহিনের মা চিৎকার করে উঠবে। "বলো আমাকে মেয়েটা সেক্সি কি না।" শেষে রোহিনের বাবা স্বীকার করবে যে, হ্যাঁ, তাই, এবং রোহিনের মা খাটের ওপর বসে কাঁদতেই থাকবে। চারপাশে দলা পাকানো জামাকাপড় ছড়ানো। তার চোখ দুটো কোলাব্যাঙের মতো ফুলে উঠবে। "কী করে," সে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করবে। "কী করে এমন একটা মেয়েকে ভালবাসলে যাকে তুমি চেনোও না?"

দৃশ্যটা কল্পনা করে মিরান্ডা নিজেই একটু কাঁদতে শুরু করল। সেই দিন ম্যাপেরিয়ামে সব দেশগুলো যেন তার হাতের নাগালে এসে গিয়েছিল। দেবের কণ্ঠস্বর এলোমেলোভাবে কাচে ঠোক্কর খাচ্ছিল। সেতুর ওপারে, ৩০ ফিট দূর থেকে, তার কথাগুলো মিরান্ডার কানে এসে পৌঁছেছিল। এত ঘনিষ্ঠ এবং এত উষ্ণ যে, দিনের পর দিন কথাগুলো তার ত্বকের নীচে ভেসে বেড়াচ্ছিল। মিরান্ডার বুক ফেটে আরও কান্না আসল। সে থামতে পারল না। কিন্তু রোহিন তখনও ঘুমোচ্ছিল। মিরান্ডা আন্দাজ করল যে, রোহিন এতদিনে নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

AMARBOI.COM

রবিবার দেব মিরান্ডাকে ফোন করে জানাল যে, সে দেখা করতে আসছে। "প্রায় রেডি হয়ে গিয়েছি। দুটো নাগাদ পৌঁছোচ্ছি।"

মিরান্ডা টিভিতে একটা রান্নার অনুষ্ঠান দেখছিল। একজন মহিলা এক সারি আপেলের দিকে দেখিয়ে বোঝাচ্ছিলেন যে, কোনটা বেক করার জন্য সবচেয়ে ভাল। "তোমার আজ আসা উচিত নয়।"

"কেন নয়?"

"আমার ঠান্ডা লেগেছে," মিরান্ডা মিথ্যে কথা বলল। অবশ্য সত্যিটা খুব একটা অন্যরকম ছিল না। কেঁদে কেঁদে তার নাক-গলা বুজে গিয়েছিল। "আমি সারা সকাল শুয়ে ছিলাম।"

"তোমার গলা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।" কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। "তোমার কিছু লাগবে?"

"আমার কাছে সবই আছে।"

"বেশি করে তরল জিনিস খাও।"

"দেব?"

"বলো, মিরান্ডা?"

"মনে আছে যেদিন আমরা ম্যাপেরিয়ামে গিয়েছিলাম?"

"অবশ্যই।"

"মনে আছে আমরা কেমন ফিসফিস করে কথা বলেছিলাম?"

"মনে আছে," দেব খেলাচ্ছলে ফিসফিস করল।

"তুমি কী বলেছিলে মনে আছে?"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দেব মৃদুস্বরে হাসল। "চলো তোমার বাড়িতে ফিরে যাই। পরের রবিবার তা হলে?"

আগের দিন, কাঁদতে কাঁদতে, মিরান্ডা বিশ্বাস করেছিল যে, সে কোনওদিন কিছু ভুলবে না— তার নামটা বাংলায় লিখে কেমন দেখতে লাগে, সেটাও না। শেষ পর্যন্ত সে রোহিনের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন জেগে উঠল, তখন রোহিন এরোপ্লেন আঁকছিল। যে 'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকাটা সে বাঁচিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, সেটার ওপর। "দেবজিৎ মিত্র কে?" ঠিকানার লেবেলটার দিকে তাকিয়ে রোহিন জিজ্ঞেস করেছিল।

মিরান্ডা কল্পনা করল দেব তার সোয়েটপ্যান্ট এবং স্নিকার্স পরে ফোনে কথা বলতে বলতে হাসছে। এক মুহূর্ত পরেই সে নীচে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলবে যে, সে আজ জগিং করতে যাচ্ছে না, কোনও একটা পেশিতে টান লেগে গিয়েছে, তারপর কাগজ পড়তে বসে যাবে। সবকিছু সত্ত্বেও, দেবের জন্য তার মন আকুল হয়ে উঠল। সে সিদ্ধান্ত নিল যে, সে আর-একটা রবিবার দেবের সঙ্গে দেখা করবে। হয়তো আর দুটো রবিবার। তারপর সে দেবকে সেই কথাগুলো বলবে, যা সে সবসময়ই মনে মনে জানত। যে এটা মিরান্ডার সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে এবং দেবের স্ত্রীর সঙ্গেও অন্যায় করা হচ্ছে। যে তারা দু'জনেই এর চেয়ে ভাল ভাবে বাঁচার যোগ্য। এই ব্যাপারটা টেনে নিয়ে যাওয়ার আর কোনও অর্থ হয় না।

কিন্তু পরের রবিবার তুষারপাত হল। এমন বরফ পড়ল যে, দেব তার স্ত্রীকে বলতে পারল না যে, সে চার্লসের ধারে জগিং করতে যাচ্ছে। তার পরের রবিবার বরফ গলে গিয়েছিল, কিন্তু মিরান্ডা লক্ষ্মীর সঙ্গে ফিল্ম দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। যখন দেবকে সে কথা জানাল, তখন দেব তাকে ফিল্ম দেখা বাদ দিতে বলল না। তৃতীয় রবিবার মিরান্ডা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে বেরিয়ে পড়ল। ঠান্ডা থাকলেও, রোদ উঠেছিল। তাই সে কমনওয়েলথ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত হাঁটল। যে রেস্তোরাঁগুলোয় দেব তাকে চুমু খেয়েছিল, তার পাশ দিয়ে। তারপর সে হেঁটে হেঁটে খ্রিশ্চান সায়েন্স সেন্টার পর্যন্ত গেল। ম্যাপেরিয়াম বন্ধ ছিল, কিন্তু সে এক কাপ কফি কিনে গির্জার বাইরের খোলা চত্বরে, একটা বেঞ্চের ওপর বসল। গির্জার প্রকাণ্ড থাম, বিশাল গম্বুজ আর শহরের ওপর বিস্তৃত পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসেস সেন

প্রায় একমাস হয়ে গেল এলিয়ট মিসেস সেনের বাড়িতে যাচ্ছে। সেই সেপ্টেম্বর মাস থেকে, যখন তার স্কুল শুরু হয়েছিল। তার আগের বছর অ্যাবি নামে রোগা, মুখে ফুটকি ফুটকি দাগওয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী তার দেখাশোনা করতে আসত। এলিয়টের জন্য মাংস দেওয়া কোনও রান্না করতে তার আপত্তি ছিল। সে যে বইগুলো পড়ত সেগুলোর মলাটে কোনও ছবি থাকত না। তারও আগে, রোজ দুপুরবেলা এলিয়ট যখন বাড়ি ফিরত, মিসেস লিন্ডেন নামে এক বয়স্কা মহিলা তাকে দেখাশোনা করতেন। এলিয়ট আপন মনে খেলত এবং তিনি শব্দসন্ধান করতেন আর একটা থার্মোস থেকে চুমুক দিয়ে কফি খেতেন। অ্যাবি তার ডিগ্রি পেয়ে অন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেল। মিসেস লিন্ডেনের থার্মোসে কফির চেয়ে বেশি হুইস্কি থাকত জানতে পেরে এলিয়টের মা তাঁকে ছাড়িয়ে দিলেন। তারপর একদিন সুপারমার্কেটের বাইরে, একটা ইন্ডেক্স কার্ডের ওপর, পরিষ্কার বলপয়েন্ট পেনে লেখার মাধ্যমে মিসেস সেন তাদের কাছে এলেন। 'অধ্যাপকের স্ত্রী, দায়িত্ববান ও দয়ালু। আমার বাড়িতে আপনার সন্তানের দেখাশোনা করতে পারি।' টেলিফোনে এলিয়টের মা মিসেস সেনকে বললেন যে, আগের সব বেবিসিটারই তাদের বাড়িতে আসত। এলিয়টের বয়েস এগারো। ও নিজে নিজে খেতেও পারে, সময় কাটাতেও পারে। "আমি শুধু চাই, যদি কখনও কোনও এমার্জেন্সি হয়, সেইজন্য বাড়িতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক কেউ থাকুক।" কিন্তু মিসেস সেন গাড়ি চালাতে পারতেন না।

"দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের বাড়িটা যথেষ্ট পরিষ্কার, কোনও বাচ্চা ছেলের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ", প্রথম সাক্ষাতে মিসেস সেন বলেছিলেন। ক্যাম্পাসের প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর বাড়ি। লবিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বিশ্রী দেখতে চৌকো ট্যান রঙের টাইল দেওয়া, এক সারি চিঠির বাক্স মাস্কিং টেপ বা সাদা লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করা। ভিতরে, একটা দামি, নাশপাতি রঙের কার্পেটের ওপর ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের আঁকিবুঁকি কাটা দাগ দেখা যাচ্ছিল। সোফা আর চেয়ারের সামনে অন্যান্য রঙের কার্পেট রাখা ছিল, যেন কার পা কোথায় পড়বে ভাবার চেষ্টা করে আলাদা আলাদা জায়গায় বিভিন্ন ওয়েলকাম ম্যাট রাখা হয়েছে। সোফার পাশে সাদা, ড্রামের আকারের ল্যাম্পশেডগুলো তখনও, দোকানি যে প্লাস্টিকে মুড়ে দিয়েছিল, সেই প্লাস্টিকেই মোড়া। টিভি আর টেলিফোন হলুদ কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢাকা দেওয়া। কাপড়ের ধারগুলো শামুকের খোলের মতো কাজ করা। একটা লম্বা, ধূসর রঙের পটে চা, তার সঙ্গে কয়েকটা কফিমাগ আর একটা ট্রে-র ওপর মাখনবিস্কুট রাখা ছিল। মি. সেনও সেখানে ছিলেন। তিনি বেঁটে হৃষ্টপুষ্ট, চোখ দুটো যেন কোটর থেকে একটু বেরিয়ে এসেছে, চোখে চৌকো কালো চশমা। পায়ের ওপর পা তুলে বসতে তাঁকে একটু কষ্ট করতে হচ্ছিল। যখন কফি খাচ্ছিলেন না, তখনও কফিমাগটা দু'হাতে মুখের খুব কাছে ধরে ছিলেন। মি. সেন বা মিসেস সেন কেউই পায়ে জুতো পরেননি। এলিয়ট দেখেছিল সামনের দরজার পাশে, একটা ছোট বুকশেলফের তাকে বেশ কয়েক জোড়া জুতো রাখা ছিল। দু'জনেরই পায়ে চটি ছিল। "মি. সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক পড়ান", আলাপ-পরিচয়ের সময়ে মিসেস সেন বললেন। যেন মি. সেন তাঁর অল্প-পরিচিত কেউ।

মিসেস সেনের বয়েস বছর তিরিশেক হবে। তাঁর দাঁতের মাঝে অল্প ফাঁক আছে, মুখে পক্সের প্রায় মিলিয়ে যাওয়া দাগ। কিন্তু চোখ দুটো খুব সুন্দর। মোটা, স্পষ্ট ভুরু যেন তুলি দিয়ে আঁকা হয়েছে চোখের দু'পাশ ছাড়িয়ে। তিনি যে কমলা রঙের কলকা আঁকা চকচকে সাদা শাড়িটা পরেছিলেন, সেটা সেই শান্ত, হালকা বৃষ্টি পড়া আগস্টের দুপুরের চেয়ে কোনও সান্ধ্য নিমন্ত্রণের জন্য বেশি মানানসই। তাঁর প্রবাল রঙের লিপস্টিকের অল্প একটুখানি ঠোঁটের বাইরে লেগে গিয়েছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, এলিয়টের মনে হল যে, বেজ রঙের কাফ্‌ড শর্টস আর রোপ-সোল্ড জুতো পরা তার মাকেই বেশি অদ্ভুত লাগছিল। তাঁর ছোট করে ছাঁটা চুল, যার রং অনেকটা তাঁর শর্টসের মতোই, যেন বড্ড বেশি পাতলা আর কেজো। আর সেই ধরটায়, যেখানে সব কিছুই অত সাবধানে ঢেকে রাখা

AMARBOI.COM

ছিল, সেখানে মায়ের রোমহীন উরু আর হাঁটু বড্ড বেশি অনাবৃত মনে হচ্ছিল। মিসেস সেন যতবারই এলিয়টের মা'র দিকে বিস্কুটের প্লেটটা বাড়িয়ে দিলেন, ততবারই তিনি সেটা ফিরিয়ে দিলেন। তিনি মিসেস সেনকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন এবং সেগুলোর উত্তর একটা স্টেনো প্যাডে লিখে নিলেন। বাড়িতে কি অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও থাকবে? মিসেস সেন কি আগে কোনও বাচ্চার দেখাশোনা করেছেন? তিনি এ দেশে কতদিন আছেন? তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় ছিল যে, মিসেস সেন গাড়ি চালাতে পারেন না। এলিয়টের মা উত্তরে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি অফিসে কাজ করেন। আর তিনি যা শেষ শুনেছিলেন, সে অনুযায়ী এলিয়টের বাবা পশ্চিমে দু'হাজার মাইল দূরে থাকেন।

"আসলে আমি ওকে চালানো শেখাচ্ছি", কফিমাগটা টেবিলের ওপর রেখে মি. সেন বললেন। সেই প্রথম তিনি কথা বললেন। "আমার আন্দাজে, ডিসেম্বর মাস নাগাদ মিসেস সেন তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে যাবেন।"

"তাই নাকি?" এলিয়টের মা কথাটা তাঁর প্যাডে নোট করে নিলেন।

"হ্যাঁ, আমি শিখছি", মিসেস সেন বললেন। "কিন্তু আস্তে আস্তে। আমাদের বাড়িতে, জানেন তো, আমাদের একটা ড্রাইভার ছিল।"

"মানে সোফার?"

মিসেস সেন মি. সেনের দিকে তাকালেন তিনি ঘাড় নাড়লেন।

এলিয়টের মা-ও ঘরের চারদিকে তাকাতে তাকাতে ঘাড় নাড়লেন। "আর সেই সবই... ইন্ডিয়ায়?"

"হ্যাঁ", মিসেস সেন বললেন। ওই কথাটার উল্লেখে যেন তাঁর মধ্যে মুক্ত কোনও হৃদয়াবেগের প্রকাশ হল। তিনি বুকের কাছে আঁচলের পাড়টা একটু ঠিক করে নিলেন। তারপর তিনিও ঘরের চারদিকে তাকালেন। যেন ল্যাম্পশেড, টিপট, কার্পেটে স্থির হয়ে যাওয়া ছায়ার মধ্যে তিনি এমন কিছু দেখতে পারছেন, যা অন্যরা পারছে না। "সবকিছুই সেখানে।"

স্কুলের পর মিসেস সেনের বাড়ি যেতে এলিয়টের খারাপ লাগত না। যে ছোট্ট বিচহাউসে সে তার মায়ের সঙ্গে থাকত, সেটাতে সেপ্টেম্বর মাসেই ঠান্ডা লাগত। এলিয়ট আর তার মা যখনই একটা ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতেন, তাঁদের একটা পোর্টেবল হিটার সঙ্গে নিয়ে যেতে হত। আর জানলাগুলো

AMARBOI.COM

প্লাস্টিকের শিট আর হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে সিল করতে হত। সমুদ্রতট একদম ফাঁকা হয়ে যেত। সেখানে একলা একলা খেলতে এলিয়টের বিশ্রী লাগত। লেবার ডে-র পরে তাদের একমাত্র পড়শি ছিলেন এক অল্পবয়স্ক বিবাহিত দম্পতি। তাঁদের কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। আর বালতিতে ভাঙা শামুক কুড়োতে বা বালির ওপরে পান্না রঙের লাক্সানের মতো ছড়ানো সামুদ্রিক আগাছায় হাত বুলোতে এলিয়টের আর ভাল লাগছিল না। মিসেস সেনের অ্যাপার্টমেন্টটা ছিল গরম। মাঝে মাঝে বেশিই গরম। রেডিয়েটরগুলো সমানে প্রেশারকুকারের মতো হিসহিস আওয়াজ করত। এলিয়ট শিখেছিল, মিসেস সেনের দরজায় পৌঁছে সবচেয়ে আগে তার স্নিকার্সগুলো খুলে ওই বুককেসের একটা তাকে রাখতে হবে। সেখানে পাশাপাশি মিসেস সেনের চপ্পলও রাখা ছিল। এক-একটা এক-এক রঙের। চপ্পলগুলোর তলাগুলো কার্ডবোর্ডের মতো চ্যাপটা। তার ওপর মিসেস সেনের বড়সড় বুড়ো আঙুল ঢোকানোর জন্য চামড়ার রিং।

এলিয়টের সবচেয়ে ভাল লাগত মিসেস সেনের মেঝের ওপর খবরের কাগজ পেতে বসে শাকসবজি কাটা দেখতে। তিনি ছুরির বদলে যে জিনিসটা ব্যবহার করতেন, সেটা এমনভাবে বাঁকানো যেন দূর সমুদ্রে যুদ্ধের জন্য পাড়ি দেওয়া ভাইকিংদের জাহাজের মাস্তুল। ব্লেডটা একদিকে একটা সরু কাঠের টুকরোর সঙ্গে আটকানো। স্টিলের রঙটা রুপোলির চেয়ে বেশি কালো আর সব জায়গায় সমান চকচকে নয়। চুড়োটা খাঁজকাটা, যাতে সেখানে শাকসবজি কোরা যায়, মিসেস সেন এলিয়টকে বললেন। প্রতিদিন দুপুরবেলা মিসেস সেন ব্লেডটা তুলে কাঠের টুকরোটার সঙ্গে কোনাকুনিভাবে আটকে দিতেন। ধারালো দিকটার মুখোমুখি বসে, কিন্তু সেটা কখনও না ছুঁয়েই, তিনি গোটা গোটা সবজি তাঁর দু'হাতের মধ্যে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বাটারনাট স্কোয়াশ। তিনি সেগুলোকে প্রথমে দু'টুকরো করতেন, তারপর চার টুকরো। ছোট ছোট ফুল, চারচৌকো, ফালি বা ছিলে করা টুকরো। তিনি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটা আলুর খোসা ছাড়াতে পারতেন। মাঝে মাঝে বাবু হয়ে বসতেন, মাঝে মাঝে পা ছড়িয়ে। একগাদা ছাঁকনি আর জলভরতি বাটি তাঁর চারদিকে ছড়ানো থাকত। কাটা তরকারিগুলো তিনি সেখানে ডুবিয়ে রাখতেন। কাজ করতে করতে তিনি টিভি আর এলিয়টের দিকে নজর রাখতেন, কিন্তু বঁটিটার দিকে

AMARBOI.COM

কখনও তাকাতেন না। তবুও, যখন সবজি কাটতে বসতেন, তখন এলিয়টের হেঁটে বেড়ানো বারণ ছিল। "একটু বোসো, বোসো প্লিজ, আমার ঠিক দু'মিনিট লাগবে", তিনি সোফাটা দেখিয়ে বলতেন। সোফাটা সবসময় একটা সবুজ আর কালো বেডকভার দিয়ে ঢাকা থাকত। বেডকভারটায় সারি সারি হাতি পালকি বইছে ছাপা ছিল। রোজকার এই কাজটায় ঘণ্টাখানেক লাগত। এলিয়টকে ব্যস্ত রাখার জন্য তিনি খবরের কাগজের কমিকসের পাতাটা কিংবা ক্র্যাকারের ওপর পিনাট বাটার লাগিয়ে বা মাঝে মাঝে একটা পপসিক্ল বা বঁটি দিয়ে কাটা একটা গাজরের টুকরো দিতেন। তিনি পারলে যেন জায়গাটা দড়ি দিয়েই ঘিরে ফেলতেন। একবার অবশ্য, তিনি নিজের নিয়ম নিজেই ভেঙেছিলেন। তাঁর আরও শাকসবজির দরকার ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর চারপাশের চরম অগোছালো অবস্থা থেকে উঠতে চাইছিলেন না বলে, এলিয়টকে বলেছিলেন রান্নাঘর থেকে বাটি এনে দিতে। "যদি কিছু মনে না করো ফ্রিজের পাশে ক্যাবিনেটটায় একটা প্লাস্টিকের বাটি আছে, এই শাকের আঁটিটা ধরে যাবে এত বড়। সাবধানে, দেখো, খুব সাবধানে", তিনি এলিয়টকে সতর্ক করছিলেন, সে যখন তাঁর কাছে এল। "শুধু কফি টেবিলটার ওপর রেখে দাও, যেখানে আমার হাত যাবে। থ্যাঙ্ক ইউ।"

তিনি ব্লেডটা ইন্ডিয়া থেকে এনেছিলেন। সেখানে নাকি সব বাড়িতেই একটা করে ওইরকম ব্লেড থাকে। "যখনই বাড়িতে কোনও বিয়ে হয়", তিনি একদিন এলিয়টকে বললেন, "বা কোনও বড় ধরনের উৎসব, আমার মা পাড়ার সব মহিলাদের বলে পাঠান ঠিক এইরকম একটা করে বঁটি আনতে, আর তারপর তাঁরা আমাদের ছাদের ওপর একটা বিশাল গোল করে বসেন, আর হাসাহাসি গল্পগুজব করতে করতে সারারাত ধরে পঞ্চাশ কিলো তরকারি কেটে ফেলেন। তাঁর মুখটা আগলানোর ভঙ্গিতে চারপাশে স্তূপ করা শশা, বেগুন গাছ আর পেঁয়াজের খোসার ওপর ঘোরাফেরা করছিল। "সেই সব রাতে তাঁদের আড্ডার আওয়াজে ঘুমোনো যায় না।" তিনি একটু থেমে বসার ঘরের জানলার বাইরে একটা পাইন গাছের দিকে তাকালেন। "এখানে, যেখানে মি. সেন আমাকে এনেছেন, মাঝে মাঝে এত নিস্তব্ধ যে আমি ঘুমোতে পারি না।"

আর-একদিন মিসেস সেন মুরগির মাংসের টুকরো থেকে হলুদ চর্বি বের করে থাই আর ঠ্যাঙে ভাগ করছিলেন। হাড়গুলো বঁটির আঘাতে ভাঙার

AMARBOI.COM

সময় তাঁর সোনার চুড়িগুলো সরে-সরে যাচ্ছিল এদিক-ওদিক, হাত চকচক করছিল। নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একসময় তিনি কাজ থামিয়ে, দু'হাত দিয়ে মাংসের টুকরোটা ধরে জানলার বাইরে তাকালেন। চর্বি আর পেশি তাঁর আঙুলে জড়িয়ে ছিল।

"এলিয়ট, আমি যদি এক্ষুনি তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করি, তা হলে কি কেউ আসবে?"

"কী হয়েছে মিসেস সেন?"

"কিছু না, শুধু জিজ্ঞেস করছি যে, কেউ আসবে কি না।"

এলিয়ট কাঁধ ঝাঁকাল। "আসতে পারে।"

"বাড়িতে ওইটুকুই করলেই হয়। সকলের তো আর টেলিফোন নেই। কিন্তু শুধু একটু গলা তুলে কথা বলো বা কোনও ব্যাপারে খুশি বা দুঃখ প্রকাশ করো, আর সারা পাড়ার লোক, এমনকী পাশের পাড়ারও অর্ধেক লোক এসে হাজির হয় খবরটা শুনতে, সাহায্য করতে।"

ততদিনে এলিয়ট বুঝতে পেরেছিল যে, মিসেস সেন বাড়ি বলতে ভারতের কথা বোঝাতেন, এই অ্যাপার্টমেন্টটা নয়, যেখানে বসে তিনি তরকারি কাটতেন। সে পাঁচ মাইল দূরে নিজের বাড়ির কথা ভাবত। আর সেই অল্পবয়স্ক দম্পতির কথা, যারা গোধূলির সময় সমুদ্রের তীরে জগিং করতে করতে মাঝে মাঝে তাদের দিকে হাত নাড়ত। লেবার ডে-তে তাদের একটা পার্টি হয়েছিল। ডেকের ওপর লোকজন ঠাসাঠাসি করে পানভোজন করছিল। ঢেউয়ের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ছাপিয়ে তাদের হাসির আওয়াজ ভেসে আসছিল। এলিয়ট এবং তার মাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। তার মায়ের খুব অল্পসংখ্যক ছুটির মধ্যে সেইটা এক ছুটির দিন ছিল, কিন্তু তারা কোথায় যায়নি। মা জামাকাপড় কাচলেন, চেকবই ব্যালান্স করলেন আর এলিয়টের সাহায্যে গাড়ির ভিতরটা ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করলেন। এলিয়ট প্রস্তাব দিয়েছিল যে, কয়েক মাইল দূরে কার-ওয়াশে যাওয়া হোক, যেখানে তারা মাঝে মাঝেই যায়, যাতে তারা দু'জন শুকনো, নিরাপদ হয়ে গাড়ির ভিতর বসে থাকতে পারে আর সাবান, জল আর ক্যানভাস ফিতের একটা বিশাল বৃত্ত উইন্ডশিল্ডে এসে আছড়ে পড়ে। কিন্তু তার মা বললেন যে, তিনি খুব ক্লান্ত। গাড়িটা তিনি জলের হোসপাইপ দিয়েই স্প্রে করে ধুলেন। সন্ধেবেলা যখন পড়শিদের ডেকের ওপর নিমন্ত্রিতরা নাচানাচি শুরু করল,

AMARBOI.COM

তখন তিনি ফোনবুকে তাদের নম্বর খুঁজে বের করে ফোন করে বললেন আওয়াজটা কমাতে।

"হয়তো ওরা আপনাকে ফোন করতে পারে," অবশেষে এলিয়ট মিসেস সেনকে জানাল। "কিন্তু ওরা নালিশ করতে পারে যে, আপনি বেশি আওয়াজ করছেন।"

সোফায় যেখানে এলিয়ট বসত, সেখান থেকে সে মিসেস সেনের গা থেকে মথবল আর জিরের গন্ধ মেশানো একটা অদ্ভুত গন্ধ পেত। তাঁর নিখুঁত সিঁথিটাও দেখতে পাওয়া যেত। সিঁথির সিঁদুর দেখে মনে হত যেন লজ্জায় লাল হয়ে আছে। প্রথমে এলিয়ট ভাবত যে, মিসেস সেনের মাথায় কেটে গিয়েছে বা কোনও পোকায় কামড়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপর একদিন সে দেখতে পেয়েছিল যে, বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, একটা জ্যামের জার থেকে লাল রঙের গুঁড়ো নিয়ে, সেটা একটা বোর্ডপিনের মাথা দিয়ে মিসেস সেন গম্ভীর মুখে নিজের সিঁথিতে নতুন করে লাগাচ্ছেন। তাঁর ভুরুর মাঝখানে পিনের মাথাটা দিয়ে একটা ছোট্ট বৃত্ত আঁকতে গিয়ে অল্প একটু গুঁড়ো মিসেস সেনের নাকের ওপর পড়ে গেল। গুঁড়োটা কীসের জন্য জিজ্ঞেস করায় এলিয়টকে মিসেস সেন বললেন, "আমাকে রোজ এটা লাগাতে হয়। যতদিন আমি বিবাহিত থাকব, ততদিন।"

"মানে বিয়ের আংটির মতো।"

"ঠিক তাই, এলিয়ট। ঠিক বিয়ের আংটির মতো। শুধু এটা প্লেট ধোয়ার জলে হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই।"

এলিয়টের মা ছ'টা কুড়িতে আসতেন। ততক্ষণে মিসেস সেন নিশ্চিতভাবে তাঁর কাটাকুটির সব সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলতেন। বঁটিটা ঘষে, ধুয়ে, শুকিয়ে, মুড়ে, একটা ঘড়াঞ্চিতে উঠে কাবার্ডের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হত। এলিয়টের সাহায্যে সব খোসা, বীজ আর ছালসুদ্ধ খবরের কাগজগুলো মুড়ে ফেলে দেওয়া হত। কাউন্টারটপের ওপর সারি দিয়ে টইটম্বুর বাটি আর ঝাঁঝরি দাঁড়িয়ে থাকত। মশলা আর নানারকমের বাটা মাপজোক করে একসঙ্গে মেশানো হত। অবশেষে স্টোভের পেরিউইঙ্কল ফুলের মতো নীল আঁচের ওপর নানা স্বাদের ঝোল ফুটতে শুরু করত। কখনওই কোনও বিশেষ উপলক্ষ থাকত না। তিনি শুধু নিজের এবং মি. সেনের জন্যই রান্না করতেন।

AMARBOI.COM

বসার ঘরের এক কোণে একটা চারচৌকো ফরমিকা টেবিলের ওপর কোনও ন্যাপকিন বা রুপোর বাসন ছাড়া শুধু দুটো প্লেট এবং দুটো গেলাস দেখেই বোঝা যেত যে, তিনি কোনও অতিথির আশাও করছেন না।

ডাস্টবিনের ভিতর খবরের কাগজগুলো ঠেসে ঢোকাতে-ঢোকাতে এলিয়টের মনে হত যে, সে এবং মিসেস সেন যেন কোনও অলিখিত নিয়ম লঙ্ঘন করছে। হয়তো সেটা এইজন্য যে, মিসেস সেন খুব দ্রুতগতিতে কাজগুলো সারতেন। নখের মধ্যে চিমটি কেটে নুন-চিনি তোলা, ডাল জল দিয়ে ধোয়া, যা কিছু মোছা যেতে পারে, সে সবকিছু স্পঞ্জ দিয়ে মোছা, কাবার্ডের দরজাগুলো একের পর এক 'ক্লিক' শব্দ করে বন্ধ করা। স্বচ্ছ স্টকিং এবং কাঁধে প্যাডিং দেওয়া অফিসে পরে যাওয়ার সুট পরে এলিয়টের মা হঠাৎ এসে মিসেস সেনের অ্যাপার্টমেন্টের আনাচেকানাচে উঁকি দিলে এলিয়ট যেন চমকে উঠত। তার মা সবসময় দরজার ফ্রেমের ওই পাশটায় দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে এলিয়টকে ডেকে, স্লিকার্স পায়ে গলিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলতেন। কিন্তু মিসেস সেন তা হতে দিতেন না। প্রতি সন্ধেয় তিনি জোর দিয়ে এলিয়টের মাকে বলতেন, সোফায় এসে বসতে। সেখানে তাঁকে কিছু একটা খেতে দেওয়া হত, এক গেলাস উজ্জ্বল গোলাপি রোজ় সিরাপ দেওয়া ঘোলের শরবত, এক বাটি সিমাইয়ের হালুয়া।

"না না, মিসেস সেন, আমি খুব দেরিতে লাঞ্চ খাই। আপনার এত কষ্ট করা উচিত না।"

"এটা কোনও কষ্ট নয়। এলিয়টের মতোই। কোনও কষ্টই নয়।"

এলিয়টের মা মিসেস সেনের দেওয়া খাবারগুলো কুট কুট করে কামড়াতেন আর ওপরের দিকে তাকাতেন। হাঁটুদুটো একসঙ্গে চেপে থাকতেন। যে উঁচু হিলজুতোগুলো তিনি কখনও খুলতেন না, সেগুলো পিচ রঙের কার্পেটটার ওপর চেপে বসে থাকত। দু'-এক কামড়ের পর প্লেটটা নামিয়ে রেখে তিনি বলতেন, "দারুণ সুস্বাদু।" এলিয়ট জানত যে, তাঁর ওই খাবারের স্বাদ ভাল লাগত না। তিনি একবার গাড়িতে তাকে সেকথা বলেছিলেন। সে এও জানত যে, তার মা অফিসে কোনও লাঞ্চ খেতেন না। কারণ, বিচহাউসে ফেরার পর প্রথমেই তিনি নিজের জন্য এক গেলাস মদ ঢালতেন আর পাঁউরুটি চিজ খেতেন। মাঝে মাঝে এত বেশি যে, পরে ডিনারের জন্য সাধারণত তারা যে পিৎজা অর্ডার দিত, সেটার জন্য তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর খিদে থাকত না। এলিয়টের খাওয়ার সময় তিনি টেবিলে বসে থাকতেন, আরও মদ খেতেন আর জিজ্ঞেস করতেন এলিয়টের দিনটা কেমন কেটেছে, কিন্তু শেষে তিনি উঠে ডেকে চলে যেতেন সিগারেট খাওয়ার জন্য। পড়ে থাকা খাবারগুলো এলিয়ট গুছিয়ে তুলে রাখত।

প্রতিদিন দুপুরবেলা মিসেস সেন বড় রাস্তার পাশে পাইন গাছের কাছটায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। স্কুল বাসটা এলিয়ট এবং আশপাশের আরও দু'-তিনটে ছেলেমেয়েকে নামিয়ে দিয়ে যেত। এলিয়টের সবসময়ই মনে হত যে, মিসেস সেন সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন অনেক বছর দেখা হয়নি এমন কারও সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন। রগের কাছে চুলের গোছাগুলো হাওয়ায় উড়ত। সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর লাগানো। নেভি ব্লু সানগ্লাস মুখের তুলনায় একটু বড়। তাঁর শাড়ি— এক-এক দিন এক-এক ধরনের— একটা চেক-কাটা অল-ওয়েদার কোটের নীচে হাওয়ায় কাঁপত। আন্দাজ ডজনখানেক ইটের বাড়ির কমপ্লেক্সটা ঘিরে যে অ্যাসফ্যাল্টের বাঁকা রাস্তাটা ছিল, সেটার ওপর ওক গাছের বীজ এবং শুঁয়োপোকারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। সবকটা বিল্ডিং অবিকল একরকমের— যেন কাঠের টুকরো দিয়ে গাঁথা কোনও জনগোষ্ঠীর এলাকা। বাসস্টপ থেকে হেঁটে ফেরার সময় মিসেস সেন তাঁর পকেট থেকে একটা স্যান্ডউইচের ব্যাগ বের করে এলিয়টকে খোসা ছাড়ানো কমলালেবুর কোয়া অথবা অল্প নুন দেওয়া, খোসা ছাড়ানো বাদাম খেতে দিতেন।

তাঁরা সরাসরি গাড়িতে গিয়ে উঠতেন। কুড়ি মিনিট ধরে মিসেস সেন গাড়ি চালানো অভ্যেস করতেন। টফি রঙের সেডান গাড়িটার সিটগুলো ভিনাইলের। ক্রোম রঙের বোতামওয়ালা একটা এ এম রেডিয়ো আর সিটের পিছনে একটা ক্লিনেক্সের বাক্স আর একটা আইস-স্ক্রেপার। মিসেস সেন মুখে বলতেন যে, এলিয়টকে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে একলা ফেলে আসতে ভাল লাগে না, কিন্তু এলিয়ট জানত যে, তিনি চান যে সে তাঁর পাশে বসে থাকুক। কারণ, তিনি ভয় পেতেন। ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার সময়ের আওয়াজটাকে তিনি ভয় পেতেন। তাঁর চটি পরা পা দিয়ে গ্যাসে চাপ দেওয়ার সময়, ইঞ্জিন চালু করার সময়, তিনি আওয়াজটা আটকানোর জন্য দু'কানে হাত চাপা দিতেন।

"মি. সেন বলেন যে, একবার আমি লাইসেন্স পেয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে

AMARBOI.COM

যাবে। তোমার কী মনে হয় এলিয়ট? সব কি ঠিক হয়ে যাবে?"

"আপনি অনেক জায়গায় যেতে পারবেন," এলিয়ট পরামর্শ দিল। "আপনি যেখানে খুশি যেতে পারবেন।"

"আমি কি কলকাতা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যেতে পারব? তাতে কত সময় লাগবে, এলিয়ট? ১০,০০০ মাইল, ঘণ্টায় ৫০ মাইল চালালে?"

এলিয়ট মনে মনে অঙ্কটা কষতে পারত না। সে দেখত, মিসেস সেন ড্রাইভারের সিটটা, রিয়ারভিউ আয়না এবং তাঁর মাথার ওপর সানগ্লাসটা ঠিকঠাক করছেন। তিনি রেডিয়োটা এমন এক স্টেশনে চালাতেন, যেখানে সিমফনি বাজায়। "এটা কি বিঠোফেন?" তিনি একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, সংগীতজ্ঞের নামটা 'বে' নয়, 'বি' উচ্চারণ করে, যেমন করে মৌমাছির নাম উচ্চারণ করা হয়। তিনি নিজের দিকের জানলার কাচটা নামিয়ে দিয়ে এলিয়টকেও বলতেন তার কাচটা নামিয়ে দিতে। তারপর ব্রেকের ওপর পা দিয়ে চেপে, অটোম্যাটিক গিয়ারশিফ্‌টটা এমনভাবে নাড়াতেন, যেন সেটা একটা বিশাল বড়, কালি-বেরোনো পেন। এক ইঞ্চি ইঞ্চি করে তিনি পার্কিং স্পেসের বাইরে বেরোতেন। একবার, তারপর আরও একবার অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটা চক্কর কাটতেন।

"আমি কীরকম চালাচ্ছি, এলিয়ট? আমি কি পাশ করে যাব?"

মিসেস সেন সমানে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন। রেডিয়োতে কিছু শোনার জন্য অথবা রাস্তায় কোনও কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য কোনও সাবধানবাণী ছাড়াই গাড়ি থামিয়ে দিতেন। কারও পাশ দিয়ে গেলে হাত নাড়তেন। কুড়ি ফিট দূরে একটা পাখি দেখতে পেলেও, কড়ে আঙুল দিয়ে হর্ন বাজিয়ে সেটা উড়ে যাওয়ার অপেক্ষা করতেন। তিনি বলতেন যে, ভারতে ড্রাইভার গাড়ির বাঁ দিকে নয়, ডান দিকে বসে। আস্তে আস্তে তারা দোলনা, লন্ড্রি-বিল্ডিং, গাঢ় সবুজ ডাস্টবিন, সারি সারি দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতেন। পাইন গাছের ছোট্ট বনটার কাছে, যেখানে অ্যাসফ্যাল্টের রাস্তাটা বড় রাস্তাটায় মিশে যায়, সেখানে তাঁরা যতবারই আসতেন, ততবার মিসেস সেন সামনে ঝুঁকে তাঁর গোটা ওজনটা ব্রেকের ওপর চাপিয়ে দিতেন। গাড়িগুলো প্রচণ্ড বেগে তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যেত। সরু রাস্তাটার ওপর হলুদ রঙের লাইন টানা ছিল। এক-এক দিকের ট্রাফিক লাইনটার এক-এক ধারে।

AMARBOI.COM

"অসম্ভব, এলিয়ট। আমি ওখানে কী করে যাব?"

"যতক্ষণ না রাস্তাটা একটু খালি হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।"

"কেউ গাড়ি আস্তে করছে না কেন?"

"এখন কেউ আসছে না।"

"কিন্তু ডান দিক থেকে যে গাড়িটা আসছে? দেখতে পাচ্ছ? আর দেখো, সেটার পিছনে একটা ট্রাক। এমনিতেও, মি. সেনের সঙ্গে ছাড়া আমার বড় রাস্তায় গাড়ি চালানোর অনুমতি নেই।"

"আপনাকে মোড়টা ঘুরে তাড়াতাড়ি গতি বাড়াতে হবে", এলিয়ট বলল। তার মা সেইভাবেই চালান, যেন একটুও না ভেবেই। মায়ের পাশে বসে থাকলে ব্যাপারটা কত সহজ মনে হয়। যখন তারা সন্ধেবেলা মসৃণ গতিতে বিচহাউসে ফিরে যায়। তখন রাস্তাটা শুধুই একটা রাস্তা, অন্য গাড়িগুলো শুধুই চারপাশের দৃশ্যের অংশ। কিন্তু সে যখন মিসেস সেনের পাশে বসে, আর গাছের ফাঁক দিয়ে হেমন্তের সূর্য উজ্জ্বল হয়ে থাকে, তখন সে দেখতে পায় যে, সেই একই চলমান গাড়ির সারির জন্য মিসেস সেনের আঙুলের গাঁট ফ্যাকাশে হয়ে যায়, কবজি কাঁপতে থাকে আর তাঁর ইংরেজিতে গন্ডগোল হয়ে যায়।

"এইসব লোকজন, সকলে বড্ড বেশি নিজেদের জগতে ব্যস্ত।"

AMARBOI.COM

এলিয়ট বুঝতে পেরেছিল যে, দুটো জিনিস মিসেস সেনকে আনন্দ দেয়। এক, তাঁর বাড়ি থেকে আসা চিঠি। তাঁর অভ্যেস ছিল ড্রাইভিং প্র্যাকটিসের পর ডাকবাক্স খুলে দেখার। তিনি বাক্সটা খুলতেন, কিন্তু তারপর এলিয়টকে বলতেন ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কী খুঁজতে হবে। তারপর তিনি নিজের চোখে হাত চাপা দিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকতেন। এলিয়ট মি. সেনের নামে আসা বিল আর পত্রিকাগুলো ঘাঁটত। প্রথম প্রথম মিসেস সেনের এই উদ্বেগ এলিয়টের কাছে অবোধ্য মনে হত। তার মায়ের একটা পি ও বক্স ছিল শহরে। তিনি এত কম সময় সেটা খুলে দেখতেন যে, একবার তিন দিনের জন্য তাদের বিদ্যুৎ কেটে দেওয়া হয়েছিল। মিসেস সেনের বাড়িতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর সে একটা নীল এয়ারোগ্রাম খুঁজে পেল। চিঠিটা হাতে কিরকির করছিল, সারা গায়ে স্ট্যাম্প আঁটা, সেগুলোর

ওপর একটা চরকার সামনে এক টাকমাথা ভদ্রলোকের ছবি। পোস্টমার্কের দাগে কালো হয়ে ছিল চিঠিটা।

"এইটা কি, মিসেস সেন?"

সেই প্রথমবার মিসেস সেন তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তার মুখটা তাঁর শাড়িতে চেপে ধরে তাকে তাঁর মথবল আর জিরের গন্ধে ঘিরে দিয়েছিলেন। চিঠিটা তিনি এলিয়টের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন।

অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পায়ের চটি এদিক-সেদিকে ছুড়ে দিয়ে, মাথা থেকে একটা তারের মতো পিন বের করে তিন টানে চিঠির ওপর দিক আর দু'পাশ ছিঁড়ে ফেললেন। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ দুটো দ্রুতবেগে এপাশ থেকে ওপাশ আসা-যাওয়া করতে লাগল। পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি টেলিফোনের ওপর এমব্রয়ডারি করা ঢাকাটা পাশে সরিয়ে, নম্বর ডায়াল করে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ, মি. সেন আছেন? আমি মিসেস সেন বলছি। খুব জরুরি দরকার।"

তারপর তিনি তাঁর নিজের ভাষায় কথা বলা শুরু করলেন। এলিয়টের মনে হল যেন, কথাগুলো এক তোড়ে, হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসছে। পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি চিঠির প্রতিটি কথা মি. সেনকে পড়ে শোনাচ্ছেন। পড়ার সময় তাঁর গলা জোরে হয়ে গিয়েছিল। গলার সুরটাও যেন বদলে গিয়েছিল। তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও, এলিয়টের মনে হচ্ছিল যেন মিসেস সেন আর সেই নাশপাতির রঙের কার্পেটওয়ালা ঘরটার ভিতর নেই।

এরপরই, অ্যাপার্টমেন্টটায় হঠাৎ মিসেস সেনের থাকতে ইচ্ছে করল না। তারা বড় রাস্তা পেরিয়ে, কিছুদূর হেঁটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারকোনা চত্বরে পৌঁছোলেন। সেখানে একটা পাথরের টাওয়ারে একটা ঘড়ি ঘণ্টা বাজিয়ে সময় জানান দিল। তাঁরা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ভিতর ঘুরলেন, একটা ট্রে একসঙ্গে ক্যাফেটেরিয়ার কাউন্টারের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলেন আর তারপর গোল টেবিলে আড্ডারত ছাত্রছাত্রীদের মাঝখানে বসে একটা পিচবোর্ডের নৌকো ভরতি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেলেন। এলিয়ট একটা কাগজের কাপে সোডা খেল। মিসেস সেন একটা টি-ব্যাগ দিয়ে চিনি আর ক্রিম ঢাললেন। খাওয়ার পর তাঁরা আর্টের বিল্ডিংটা ঘুরে দেখলেন। ঠান্ডা করিডোরে ভেজা রং আর মাটির গাঢ় গন্ধের মধ্যে ভাস্কর্য আর সিল্কের পরদা

AMARBOI.COM

দেখলেন। অঙ্কের বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন, যেখানে মি. সেন পড়ান।

অবশেষে তাঁরা কোলাহলমুখর, ক্লোরিনের গন্ধওয়ালা অ্যাথলেটিক বিল্ডিং-এ এসে পৌঁছোলেন। সেখানে, পাঁচতলার একটা বিশাল খোলা জানলা থেকে তাঁরা ঝকঝকে, ফিরোজা রঙের পুলে সাঁতারুদের এপাশ থেকে ওপাশ সাঁতার কাটতে দেখলেন। মিসেস সেন তাঁর পার্স থেকে ভারতের এয়ারোগ্রামটা বের করে সামনে, পিছনে পরীক্ষা করলেন। চিঠিটা আবার খুলে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে পড়লেন। পড়া শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ সাঁতারুদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

"আমার বোনের মেয়ে হয়েছে। যতদিনে আমি তাকে দেখতে পাব— যদি মি. সেন তাঁর কার্যকালের মেয়াদ জানতে পারেন, তা হলেই— ততদিনে সে তিন বছরের হয়ে যাবে। ততদিন পর্যন্ত সে তার নিজের মাসিকে চিনবে না। আমরা যদি পাশাপাশি কোনও ট্রেনের কামরায় বসেও থাকি, আমরা কেউ কাউকে চিনব না।" তিনি চিঠিটা সরিয়ে রেখে এলিয়টের মাথায় হাত রাখলেন। "তোমার মায়ের কথা মনে হয় না, এলিয়ট? আমার সঙ্গে দুপুরবেলা থাকার সময়?"

কথাটা কখনও তার মাথায় আসেনি।

"তোমার নিশ্চয়ই তাঁর কথা মনে পড়ে। আমি যখন তোমার কথা ভাবি, এইটুকু ছেলে, দিনে এতক্ষণ মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকো, আমার লজ্জা বোধ হয়।"

"আমার মায়ের সঙ্গে রাত্তিরে দেখা হয়।"

"আমার যখন তোমার মতো বয়স ছিল, আমি জানতাম না যে, একদিন আমি এত দূরে চলে আসব। তুমি আমার চেয়ে বেশি ভাল বোঝো, এলিয়ট। পরে যা হবে, তার ধারণা তোমার এখন থেকেই হয়ে গেছে।"

আর একটা যে জিনিস মিসেস সেনকে খুশি করত, তা হল সামুদ্রিক মাছ। তিনি সবসময় গোটা মাছই চাইতেন, চিংড়ি বা গলদা চিংড়ি বা ফিলেট নয়। এলিয়টের মা কয়েক মাস আগে এক রাতে ফিলেট এনে ঝলসেছিলেন। তাঁর অফিস থেকে একজন সহকর্মীকে খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেদিন। সে রাতটা এলিয়টের মায়ের ঘরেই সে কাটিয়েছিল, কিন্তু এলিয়ট তাকে আর

AMARBOI.COM

কখনও দেখেনি। এক সন্ধেবেলা, এলিয়টের মা তাকে নিতে আসার পর মিসেস সেন তাঁকে টুনা-র ক্রোকেট পরিবেশন করলেন। "জিনিসটা আসলে ভেটকিমাছ দিয়ে তৈরি করার কথা", তিনি বোঝালেন। "এত খারাপ লাগে", মিসেস সেন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "সমুদ্রের এত কাছে থাকি, কিন্তু সেরকম মাছ পাওয়া যায় না।" গরমকালে, তিনি বিচের কাছে একটা বাজারে যান। যদিও সেখানকার মাছ ভারতের মাছের স্বাদের ধারেকাছেও আসে না, তা হলেও সেই মাছগুলো অন্তত তাজা থাকে। এই যে শীত পড়ছে, নৌকোগুলো এখন আর নিয়মিত মাছ ধরতে বেরোচ্ছে না, মাঝে মাঝে সপ্তাহের পর সপ্তাহ গোটা মাছ পাওয়া যায় না।

"আপনি সুপারমার্কেটে দেখতে পারেন," এলিয়টের মা বললেন।

মিসেস সেন মাথা নাড়লেন। "সুপারমার্কেটে আমি একটা বেড়ালকে বত্রিশটা টিন থেকে বত্রিশ রকমের খাবার খাওয়াতে পারি, কিন্তু নিজের পছন্দমতো একটা মাছও কখনও খুঁজে পাই না। একটা মাছও না।" তিনি বললেন, দিনে দুটো করে মাছ খেয়ে তিনি বড় হয়েছেন। এও বললেন যে, কলকাতায় লোকে সকালে উঠে সবচেয়ে আগে মাছ খায়, শুতে যাওয়ার আগে সব শেষে মাছ খায় আর কপাল ভাল থাকলে স্কুলের পর জলখাবারেও মাছ খায়। ল্যাজা, ডিম, এমনকী মুড়োও বাদ দেয় না। কলকাতায় যে-কোনও বাজারে মাছ পাওয়া যায়, যে-কোনও সময় ভোরবেলা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত। "আপনাকে শুধু বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতে হবে, আর পেয়ে যাবেন।"

কয়েক দিন অন্তর অন্তর মিসেস সেন ইয়েলো পেজ খুলে একটি দাগ দিয়ে রাখা নম্বরে ফোন করতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন যে, কোনও মাছ পাওয়া যাচ্ছে কি না। পাওয়া গেলে তিনি বলতেন সেটা তাঁর জন্য রেখে দিতে। "সেন-এর নামে। হ্যাঁ, স্যামের এস, নিউ ইয়র্কের এন। মি. সেন এসে নিয়ে যাবেন।" তারপর তিনি মি. সেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোন করতেন। কয়েক মিনিট পর মি. সেন বাড়ি ফিরতেন। এলিয়টের মাথা আলতো করে চাপড়ে দিতেন, কিন্তু মিসেস সেনকে চুমু খেতেন না। ফরমিকা টেবিলে বসে তিনি তাঁর চিঠিপত্র পড়তেন। তারপর এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন আধঘণ্টা পরে, হাসিমুখ গলদা চিংড়ি আঁকা একটা কাগজের ব্যাগ হাতে। সেটা মিসেস সেনকে ধরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সন্ধের ক্লাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়াতে চলে যেতেন। একদিন মিসেস সেনকে কাগজের ব্যাগটা দিয়ে তিনি বললেন, "কয়েকদিন আর মাছ পাওয়া যাবে না। ফ্রিজের চিকেনটাই রান্না কোরো। আমার এবার অফিসটাইম শুরু করা দরকার।"

তার পরের কয়েকদিন মাছের বাজারে ফোন করার বদলে মিসেস সেন রান্নাঘরের সিঙ্কে ঠান্ডা মুরগির ঠ্যাং বের করে গলতে দিলেন এবং তাঁর বঁটি দিয়ে ঠ্যাংগুলো টুকরো টুকরো করলেন। একদিন তিনি সবুজ বিন আর টিনের সার্ডিন মাছ দিয়ে একটা স্টু রাঁধলেন। কিন্তু তার পরের সপ্তাহে মাছের বাজারের এক দোকানদার মিসেস সেনকে ফোন করল। সে ধরেই নিয়েছিল যে, তিনি মাছ কিনতে চাইবেন এবং বলল যে সারাদিন তাঁর জন্য মাছটা রেখে দিতে পারে। মিসেস সেন খুশি হয়ে এলিয়টকে বললেন, "লোকটা কী ভাল না? ও নাকি টেলিফোনের বইয়ে আমার নাম খুঁজে বের করেছে। ও বলল সেখানে নাকি একটাই সেন আছে। কলকাতার টেলিফোন বইয়ে কতগুলো সেন আছে বলো তো?"

এলিয়টকে তার জ্যাকেট আর জুতো পরতে বলে তিনি মি. সেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোন করলেন। এলিয়ট বুক-কেসের কাছে দাঁড়িয়ে স্নিকার্সের ফিতে বেঁধে অপেক্ষা করছিল কখন মিসেস সেন এসে তাঁর চটির সারি থেকে একটা বেছে নিয়ে পরবেন। কয়েক মিনিট পর সে তাঁর নাম ধরে ডাকল। মিসেস সেন উত্তর দিচ্ছেন না দেখে সে স্নিকার্সের ফিতে খুলে বসবার ঘরে ফিরে গেল। মিসেস সেন সোফায় বসে কাঁদছিলেন। তিনি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন, কিন্তু আঙুলের ফাঁক দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল। সেভাবেই তিনি বিড়বিড় করে বললেন যে, মি. সেনের কোনও মিটিং-এ যাওয়া দরকার। আস্তে আস্তে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে টেলিফোনের ঢাকাটা ঠিক করে রাখলেন। এলিয়ট তাঁর পিছন পিছন গেল। সেই প্রথমবার সে নাশপাতি রঙের কার্পেটটার ওপর জুতো পায়ে হাঁটছিল। মিসেস সেন তার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের কোল ফুলে উঠে পাতলা গোলাপি অর্ধচন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিল। "বলো তো এলিয়ট, আমি কি খুব বেশি কিছু চাইছি?"

সে কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি তার হাত ধরে বেডরুমে নিয়ে গেলেন। ওই ঘরের দরজা সাধারণত বন্ধ করা থাকত। হেডবোর্ড-হীন বিছানা ছাড়া ঘরটায় শুধু একটা সাইডটেবিল যার ওপর একটা টেলিফোন, একটা ইস্তিরি করার বোর্ড এবং একটা বুরো ছিল। মিসেস সেন একটানে

দেরাজের টানা আর দেওয়াল-আলমারির দরজা খুলে ফেললেন। যতরকম কাপড়ের এবং রঙের শাড়ি হতে পারে, সব যেন আলমারির মধ্যে ঠাসা ছিল। কোনওটা সোনালি এবং রুপোলি জরির কাজ করা। আবার কয়েকটা স্বচ্ছ, টিস্যুর মতো পাতলা, কয়েকটা আবার পরদার কাপড়ের মতো মোটা। সেগুলোর ধারে গিঁটবাঁধা টাসেল ঝুলছে। আলমারিটার ভিতর শাড়িগুলো হ্যাঙারে টাঙানো ছিল। দেরাজের ভিতর সেগুলো পাট করে বা আঁটসাঁটভাবে পাকিয়ে রাখা ছিল। তিনি দেরাজগুলো হাতড়াতে লাগলেন। শাড়িগুলো দেরাজ থেকে উপচে পড়তে লাগল। "আমি কোনওদিন এটা পরেছি? আর এটা? এটা?" তিনি একটা একটা করে শাড়ি দেরাজ থেকে বের করে ছুড়ে ফেলতে শুরু করলেন। তারপর হ্যাঙার থেকেও অনেকগুলো টেনে নামালেন। জট পাকানো চাদরের স্তূপের মতো সেগুলো খাটের ওপর গিয়ে পড়ল। ঘরটা মথবলের তীব্র গন্ধে ভরে গিয়েছিল।

"ওরা লেখে ছবি পাঠাও । তোমার নতুন জীবনের ছবি পাঠাও। কী ছবি পাঠাব আমি?"

তিনি বিধ্বস্ত হয়ে খাটের একধারে বসে পড়লেন। সেখানে আর প্রায় কোনও জায়গা খালি ছিল না। "ওরা ভাবে আমি রানির হালে আছি, এলিয়ট।" তিনি ঘরের ফাঁকা দেওয়ালগুলোর দিকে তাকালেন। "ওরা ভাবে, আমি একটা বোতাম টিপলেই বাড়িটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি বোধহয় কোনও প্রাসাদে থাকি।"

ফোনটা বাজতে শুরু করল। ফোনটা অনেকবার বাজার পর মিসেস সেন খাটের পাশের এক্সটেনশনটা তুললেন। যে কথাবার্তা হল, তাতে তিনি শুধুই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন বলে মনে হল। কথা বলতে বলতে তিনি একটা শাড়ির কোণ দিয়ে নিজের মুখ মুছলেন। ফোন রাখার পর শাড়িগুলো পাট না করেই দেরাজে ঠেসে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর তিনি এবং এলিয়ট জুতো পরে মি. সেনের জন্য অপেক্ষা করতে গাড়ির কাছে গেলেন।

মি. সেন আসার পর গাড়ির হুডে আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা মেরে বললেন, "তুমিই আজকে চালাও না।" এলিয়ট উপস্থিত থাকলে তাঁরা সবসময় ইংরেজিতে কথা বলতেন।

"আজকে না। অন্য কোনওদিন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি পরীক্ষায় পাশ করবে কী করে, যদি কখনও রাস্তায় অন্য গাড়ির পাশাপাশি না চালাও?"

"আজকে এলিয়ট আছে।"

"এলিয়ট তো রোজই থাকে। তোমার ভালর জন্যই তো বলছি। এলিয়ট, মিসেস সেনকে বলো তো, এটা ওঁর ভালর জন্যই।"

মিসেস সেন কিন্তু রাজি হলেন না।

যে রাস্তা ধরে রোজ সন্ধেবেলা এলিয়ট এবং তার মা বিচহাউসে ফেরে, সেই রাস্তা দিয়ে তাঁরা নীরবে গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু মি. এবং মিসেস সেনের গাড়ির পিছনের সিটে বসে এলিয়টের রাস্তাটা কেমন যেন অচেনা এবং লম্বা মনে হচ্ছিল। যে গালপাখিগুলোর একঘেয়ে চিৎকার রোজ সকালে এলিয়টের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তাদের আকাশে ডুব দেওয়া আর পাখা ঝাপটানো দেখে এখন তার রোমাঞ্চিত লাগল। তাঁরা একটার পর একটা বিচ পেরিয়ে গেলেন। যে ঝুপড়িগুলোয় গরমকালে বরফঠান্ডা লেমোনেড এবং কোয়াহগ বিক্রি হয়, সেগুলো এখন তালাবন্ধ হয়ে পড়ে ছিল। শুধু একটা ঝুপড়িই খোলা ছিল। মাছের বাজারের ঝুপড়িটা।

মিসেস সেন দরজা খুলে মি. সেনের দিকে তাকালেন। তিনি তখনও তাঁর সিট-বেল্ট খোলেননি। "তুমি আসবে?"

মি. সেন তাঁর মানিব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বের করে মিসেস সেনকে দিলেন। "কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার একটা মিটিং আছে," ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন। "প্লিজ সময় নষ্ট কোরো না।"

এলিয়ট মিসেস সেনের সঙ্গে সেই ছোট্ট স্যাঁতস্যাঁতে দোকানটার ভিতর ঢুকল। দোকানটার দেওয়ালগুলো জাল, তারামাছ আর বয়া দিয়ে সাজানো। গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে একদল টুরিস্ট কাউন্টারের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ স্টাফড ক্ল্যামের নমুনা দেখছিল, তো কেউ আঙুল দিয়ে একটা বিশাল বড় চার্ট দেখাচ্ছিল, যেখানে উত্তর অতলান্তিকের পঞ্চাশটি বিভিন্ন রকমের মাছের ছবি আঁকা ছিল। মিসেস সেন কাউন্টারের মেশিন থেকে একটা টিকিট কেটে লাইনে দাঁড়ালেন। এলিয়ট গলদা চিংড়ির কাছাকাছি দাঁড়াল। সেগুলো তাদের নোংরা ট্যাঙ্কে গাদাগাদি করে একটার ওপর আর-একটা পড়ে নড়াচড়া করছিল। দাঁড়াগুলো হলদে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা ছিল। সে দেখল, মিসেস সেনের পালা এলে তিনি একটা কালো

AMARBOI.COM

রাবারের অ্যাপ্রন পরা, উজ্জ্বল লাল মুখ এবং হলদে দাঁতওয়ালা লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললেন। লোকটা দু'হাতে দুটো ম্যাকারেল লেজ দিয়ে ধরেছিল।

"আপনি নিশ্চিত তো আপনি আমাকে যেটা বিক্রি করছেন সেটা একদম ফ্রেশ?"

"আর বেশি ফ্রেশ হলে তো এ কথার জবাব ওরা নিজেরাই দিয়ে দেবে!" স্কেলের ডায়ালটা কাঁপতে কাঁপতে তার রায় জানাল।

"এটা কি পরিষ্কার করে দেব, মিসেস সেন?"

মিসেস সেন ঘাড় নাড়লেন। "মুড়োগুলোও দিয়ে দেবেন, প্লিজ।"

"আপনার বাড়িতে কি বেড়াল আছে?"

"বেড়াল নয়, শুধু একটি স্বামী আছেন।"

পরে, অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে তিনি বঁটিটা কাবার্ড থেকে বের করে, কার্পেটের ওপর খবরের কাগজ ছড়িয়ে তাঁর ধনসম্পত্তি খুঁটিয়ে দেখতে বসলেন। একটা একটা করে কাগজের মোড়ক থেকে কুঁকড়োনো রক্তমাখা মাছগুলো বের করলেন। তিনি ল্যাজায় আঙুল বুলিয়ে, পেট টিপে টিপে দেখে, নাড়িভুঁড়ি বের করা মাছটাকে খুলে ফেললেন। একটা কাঁচি দিয়ে পাখনাগুলো কেটে বাদ দিলেন। কানকোর নীচে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দেখলেন। সেই লাল রঙের কাছে তাঁর সিঁদুরও যেন ম্লানাকাশে মনে হচ্ছিল। লাল কালির মতো দাগ লাগা মাছটাকে দু'দিকে ধরে বঁটি দিয়ে এখানে ওখানে খাঁজ কাটতে লাগলেন।

"ওরকম করছেন কেন?" এলিয়ট জিজ্ঞেস করল।

"ক'টা টুকরো হয় দেখব বলে। ঠিক করে কাটতে পারলে এই মাছটা থেকে আমি তিনবারের খাবার রান্না করতে পারব।" তিনি মুড়োটা কেটে একটা পাই-প্লেটের ওপর রেখে দিলেন।

নভেম্বর মাসে পরপর কয়েকদিন মিসেস সেন ড্রাইভিং অভ্যেস করতে আপত্তি জানালেন। বঁটিটা কাবার্ড থেকে বেরোলই না। মাটিতে খবরের কাগজ পাতাও হল না। তিনি মাছের দোকানে ফোন করলেন না। মুরগির ঠ্যাং নিয়ে বরফ গলাতেও দিলেন না। এলিয়টের জন্য তিনি নীরবে ক্র্যাকারের ওপর পিনাট-বাটার মাখিয়ে দিয়ে একটা জুতোর বাক্স থেকে পুরনো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এয়ারোগ্রাম বের করে পড়তে থাকলেন। এলিয়টের যাওয়ার সময় হলে তিনি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতেন, কিন্তু তার মাকে সোফায় বসে কিছু খেতে বলতেন না। শেষে একদিন এলিয়টের মা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে মিসেস সেনের ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন লক্ষ করেছে কি না, তখন বলল যে, সে তেমন কিছু লক্ষ করেনি। তাঁকে বলল না যে, মিসেস সেন অ্যাপার্টমেন্টে পায়চারি করেন। প্লাস্টিক ঢাকা দেওয়া ল্যাম্পশেডগুলোর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যেন সেগুলো প্রথমবার দেখছেন। সে বলল না যে, তিনি টিভি চালিয়ে বসে থাকেন, কিন্তু কখনও সেটা দেখেন না। নিজের জন্য চা তৈরি করেন, কিন্তু সেটা কফি টেবিলের ওপর ঠান্ডা হয়। একদিন তিনি কীসের একটা টেপ চালিয়েছিলেন, সেটাকে নাকি রাগ বলে। কেউ খুব আস্তে আর তারপর খুব তাড়াতাড়ি বেহালা বাজালে যেমন শোনায়, সেটা খানিকটা তেমন শোনাচ্ছিল। মিসেস সেন বললেন যে, রাগটা শুধু বিকেলে, সূর্য ডোবার সময়ই শুনতে হয়। সংগীত চলাকালীন প্রায় এক ঘণ্টা তিনি চোখ বন্ধ করে সোফায় বসে রইলেন। পরে তিনি বললেন, "তোমাদের বিঠোফেনের চেয়েও বেশি দুঃখের, না?" আর-একদিন তিনি একটা ক্যাসেট চালালেন, যেটায় লোকজন তাঁর ভাষায় কথা বলছিল। তাঁর পরিবার ক্যাসেটটি তাঁর বিদায় উপহার হিসেবে বানিয়ে দিয়েছিল, তিনি এলিয়টকে বললেন। একের পর এক কণ্ঠস্বর কথা বলছিল আর হাসছিল এবং মিসেস সেন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। "আমার মাসতুতো কাকা, আমার পিসতুতো বোন, আমার বাবা, আমার দাদু।" একজন একটি গান গাইলেন। একজন কবিতা আবৃত্তি করলেন। শেষ কণ্ঠস্বরটি মিসেস সেনের মায়ের। তাঁকে অন্যদের চেয়ে বেশি শান্ত এবং গম্ভীর শোনাচ্ছিল। তিনি প্রতিটি বাক্যের আগে একটু করে থামছিলেন। এই ফাঁকে মিসেস সেন মায়ের কথাগুলো এলিয়টকে অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। পাঁঠার মাংসের দাম দু'টাকা বেড়ে গিয়েছে। বাজারের আমগুলো খুব একটা মিষ্টি নয়। কলেজ স্ট্রিট বৃষ্টির জলে ভেসে গিয়েছে। মিসেস সেন টেপ বন্ধ করে দিলেন। "আমি যেদিন দেশ ছেড়ে এসেছিলাম, সেদিন এই সবকিছু হয়েছিল।" তার পরের দিন তিনি আবার একই ক্যাসেট চালালেন। এবার তাঁর দাদু কথা বলার সময়ই তিনি টেপ বন্ধ করে দিলেন। এলিয়টকে বললেন যে, তিনি শনিবার একটা চিঠি পেয়েছিলেন। তাঁর দাদু মারা গিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সপ্তাহ পর মিসেস সেন আবার রান্না করা শুরু করলেন। একদিন তিনি বসবার ঘরে বসে বাঁধাকপি কাটছিলেন, এমন সময় মি. সেন ফোন করলেন। মিসেস সেন এবং এলিয়টকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যেতে চান। সেই উপলক্ষে মিসেস সেন একটা লাল শাড়ি পরলেন, লাল লিপস্টিক লাগালেন। নতুন করে সিঁদুর লাগিয়ে নতুন করে চুল বাঁধলেন। চিবুকের তলায় একটা স্কার্ফ বেঁধে, মাথার ওপর সানগ্লাস আটকে পার্সে একটা পকেট ক্যামেরা ঢুকিয়ে নিলেন। পার্কিং লট থেকে গাড়িটা পিছিয়ে বের করার সময় মি. সেন তাঁর হাতটা সামনের সিটের ওপর রাখলেন। মনে হচ্ছিল যেন তিনি মিসেস সেনের কাঁধে হাত রেখেছেন। "বড্ড ঠান্ডা পড়ছে," তিনি একসময় বললেন। "এই কোটটায় কাজ হবে না। তোমাকে আরও গরম কিছু কিনে দিতে হবে।" দোকানে তাঁরা ম্যাকারেল, বাটারফিশ এবং সি-বাস কিনলেন। সেদিন মি. সেন তাঁদের সঙ্গে দোকানের ভিতর ঢুকলেন। মি. সেনই জিজ্ঞেস করলেন মাছটা তাজা হবে কি না, সেটা এইভাবে কাটতে, ওইভাবে কাটতে ইত্যাদি। তাঁরা এত মাছ কিনেছিলেন যে, এলিয়টকে একটা ব্যাগ ধরতে হল। ব্যাগগুলো ট্রাঙ্কে ঢোকানোর পর মি. সেন বললেন যে, তাঁর খিদে পেয়েছে। মিসেস সেন রাজি হওয়াতে তাঁরা রাস্তা পার হয়ে যেটার টেক-আউটের জানলা তখনও খোলা ছিল সেই রেস্তোরাঁয় গেলেন। একটা পিকনিক টেবিলে বসে দু'টুকরি ক্ল্যাম কেক খেলেন। মিসেস সেন তাঁর কেকগুলোর ওপর অনেকটা করে টাবাস্কো সস এবং গোলমরিচ ঢেলেছিলেন।

"ঠিক পকোড়ার মতো লাগছে, তাই না?" তাঁর মুখ রক্তিম দেখাচ্ছিল। লিপস্টিক আবছা হয়ে গিয়েছিল। মি. সেন যা-ই বলছিলেন, তিনি তাতেই হাসছিলেন।

রেস্তোরাঁর পিছনে একটা ছোট্ট বিচ ছিল। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ তাঁরা সমুদ্রতীরে হাঁটলেন। অবশ্য তাঁদের দিকে এত জোরে হাওয়া দিচ্ছিল যে, পিছনদিকে হাঁটতে হচ্ছিল। মিসেস সেন জলের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন যে, একটা বিশেষ মুহূর্তে, প্রত্যেকটি ঢেউকে দেখে মনে হয় যেন দড়ির ওপর শুকোতে দেওয়া শাড়ি। "অসম্ভব!" শেষে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। ছলছল চোখে হাসতে হাসতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি নড়তে পারছি না।" তার বদলে তিনি বালির ওপর দাঁড় করিয়ে মি. সেন এবং এলিয়টের ছবি তুললেন। "এবার আমাদের একটা" বলে তিনি ক্যামেরাটা মি. সেনকে দিয়ে এলিয়টকে

AMARBOI.COM

তাঁর চেক-চেক কোটের কাছে জড়িয়ে ধরলেন। অবশেষে ক্যামেরাটা এলিয়টকে দেওয়া হল। "নড়িয়ে ফেলো না", মি. সেন বললেন। এলিয়ট ক্যামেরার ছোট্ট জানলায় চোখ রেখে মি. এবং মিসেস সেনের কাছাকাছি দাঁড়াবার অপেক্ষা করল, কিন্তু তাঁরা কাছাকাছি এলেন না। তাঁরা পরস্পরের হাত ধরলেন না বা কোমর জড়িয়ে ধরলেন না। দু'জনেই তাঁদের ঠোঁট ফাঁক না করে হাসছিলেন। হাওয়ার তেজে তাঁদের চোখ কুঁচকে গিয়েছিল। মিসেস সেনের লাল শাড়ি তাঁর কোটের তলায় আগুনের শিখার মতো লাফিয়ে উঠছিল।

গাড়ির ভিতর বসে, অবশেষে একটু গরম হয়ে, হাওয়া আর ক্ল্যামকেকের দৌলতে ক্লান্ত হয়ে, তাঁরা বালিয়াড়ি, দূরে যে জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছিল, লাউটহাউসটা, পিচফল আর বেগুনি রঙের আকাশটা, সবকিছুর প্রশংসা করলেন। কিছুক্ষণ পর মি. সেন রাস্তার ধারে গাড়ি থামালেন।

"কী হয়েছে?" মিসেস সেন জিজ্ঞেস করলেন।

"আজকে তুমি গাড়ি চালিয়ে ফিরবে।"

"আজকে না।"

"হ্যাঁ আজকেই।" মি. সেন গাড়ি থেকে নেমে মিসেস সেন যেপাশে বসে ছিলেন সেদিকে দরজা খুলে দিলেন। একটা দমকা হাওয়া গাড়ির ভিতর এসে ঢুকল। তার সঙ্গে সমুদ্রের পাড়ে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ। অবশেষে মিসেস সেন সরে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসলেন, কিন্তু তারপর অনেকক্ষণ ধরে তিনি তাঁর শাড়ি এবং সানগ্লাস ঠিক করলেন। এলিয়ট ঘুরে পিছনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। রাস্তাটা ফাঁকাই ছিল। মিসেস সেন রেডিয়ো চালিয়ে দিলেন। গাড়ির ভিতরটা বেহালার সুরে ভরে গেল।

"কোনও দরকার নেই," মি. সেন রেডিয়ো বন্ধ করে দিয়ে বললেন।

"আমার মনোযোগ দিতে সুবিধে হয়," বলে মিসেস সেন আবার সেটা চালিয়ে দিলেন।

"সিগনাল অন করো," মি. সেন নির্দেশ দিলেন।

"আমি জানি কী করতে হবে।"

মাইলখানেক তিনি ঠিকই চালালেন, যদিও যে গাড়িগুলো তাঁকে ছেড়ে এগিয়ে গেল তাদের চেয়ে অনেক ধীরে চালাচ্ছিলেন। কিন্তু যেই শহর এসে পড়ল, দূরে তারের ওপর ট্রাফিকের আলো দেখা গেল, মিসেস সেন গাড়ির গতি আরও কমিয়ে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওই লেনে যাও," মি. সেন বললেন। "রোটারির কাছে তোমাকে বাঁ দিক নিতে হবে।"

মিসেস সেন গেলেন না।

"ওই লেনে যাও, বলছি না," মি. সেন রেডিয়ো বন্ধ করে দিলেন। "তুমি কি শুনছ আমার কথাটা?"

একটা গাড়ি হর্ন বাজাল। তারপর আর-একটা। মিসেস সেন উত্তরে বেপরোয়াভাবে হর্ন বাজালেন। তারপর থেমে, কোনও সিগন্যাল না দিয়েই রাস্তার ধারে গাড়িটা দাঁড় করালেন। "আর না," স্টিয়ারিং হুইলের ওপর মাথা রেখে তিনি বললেন। "আমার একদম ভাল লাগে না। আমার ড্রাইভিং করতে একদম ভাল লাগে না। আমি আর এগোব না।"

মিসেস সেন গাড়ি চালানো বন্ধ করে দিলেন। তার পরের বার যখন মাছের দোকান থেকে ফোন এল, তখন তিনি মি. সেনকে অফিসে ফোন করলেন না। তিনি অন্য একটা উপায় ভেবে বের করেছিলেন। একটা টাউনবাস প্রতি ঘণ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমুদ্রপাড়ে যাতায়াত করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পর সেটা দুটো জায়গায় থামত। প্রথমবার একটা নার্সিংহোমে, তারপর একটা নামহীন শপিং প্লাজায়, যেখানে একটা বইয়ের দোকান, একটা ওষুধের দোকান, একটা পোষ্যদের দোকান আর একটা রেকর্ডের দোকান ছিল। পোর্টিকোর তলায়, বেঞ্চের ওপর নার্সিংহোমের বয়স্ক মহিলারা জোড়ায় জোড়ায় বসে ছিলেন। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বিশাল বড় বোতামওয়ালা ওভারকোট পরে বসে বসে লজেন্স খাচ্ছিলেন।

"এলিয়ট," বাসে বসে মিসেস সেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন। "তোমার মায়ের বয়স হয়ে গেলে কি তুমি তাঁকে কোনও নার্সিংহোমে রেখে আসবে?"

"হয়তো", সে উত্তর দিল। "কিন্তু আমি রোজ তাঁকে দেখতে যাব।"

"সেটা তুমি এখন বলছ, কিন্তু দেখবে, তুমি বড় হয়ে যাওয়ার পর তোমার জীবনটা যে তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে তা তোমার পক্ষে এখন জানা সম্ভব নয়।" তিনি আঙুলে গুনলেন, "তোমার স্ত্রী হবে, নিজের ছেলেমেয়ে হবে, তারা একই সময় বিভিন্ন জায়গায় যেতে চাইবে। যতই উদার হোক না কেন, একদিন তারা তোমার মাকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে অনুযোগ করবে। আর তোমারও ইচ্ছে হবে না, এলিয়ট। একদিন বাদ পড়বে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর আর-একদিন, তারপর আর-একদিন, আর তারপর তাঁকে শুধু এক ব্যাগ লজেন্সের জন্য নিজেকে টেনে একটা বাসে উঠতে হবে।"

মাছের দোকানে বরফের চাঁই আর গলদা চিংড়ির ট্যাঙ্কগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ট্যাঙ্কে জলের মধ্যে মরচের দাগ দেখা যাচ্ছিল। এক জায়গায় লেখা ছিল যে, সেই মাসের শেষে দোকানটা শীতকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। কাউন্টারের পিছনে শুধু একটা অল্পবয়সি ছেলে কাজ করছিল। সে মিসেস সেনকে চিনতে পারল না। শুধু তাঁর নামে রাখা একটা ব্যাগ তাঁকে ধরিয়ে দিল।

"এটা কি পরিষ্কার করে আঁশ ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?" মিসেস সেন জিজ্ঞেস করলেন।

ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকাল। "আমার বস আগে বেরিয়ে গিয়েছে। শুধু বলে গিয়েছে আপনাকে এটা দিয়ে দিতে।"

পার্কিং লট-এ গিয়ে মিসেস সেন বাসের টাইমটেবিলটা দেখলেন। পরের বাসটার জন্য তাঁদের পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। অতএব তাঁরা রাস্তা পেরিয়ে আগের দিনের টেক-আউট জানলায় গিয়ে ক্ল্যামকেক কিনলেন। বসার কোনও জায়গা ছিল না। পিকনিক টেবিলগুলো আর ব্যবহার করা হচ্ছিল না। বেঞ্চগুলো উলটে টেবিলের ওপর চেন দিয়ে আটকে রাখা ছিল।

বাড়ি ফেরার সময় একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা তাঁদের ওপর নজর রাখছিলেন। তাঁর দৃষ্টি সমানে মিসেস সেন, এলিয়ট আর তাঁদের পায়ের মাঝে রাখা রক্তের দাগ লাগা ব্যাগটার দিকে যাচ্ছিল। বৃদ্ধা একটা কালো ওভারকোট পরেছিলেন। কোলের ওপর ফ্যাকাশে, শিরা বার করা হাত দিয়ে ওষুধের দোকানের একটা সাদা, পরিপাটি ব্যাগ ধরে ছিলেন। অন্যান্য সহযাত্রী বলতে ছিল দু'জন কলেজ স্টুডেন্ট প্রেমিক-প্রেমিকা— পরস্পরের সঙ্গে রং মিলিয়ে সোয়েট শার্ট পরেছিল, আঙুল জড়াজড়ি করে পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসেছিল। মিসেস সেন এবং এলিয়ট নীরবে বাকি ক্ল্যামকেকগুলো খেলেন। মিসেস সেন ন্যাপকিন আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখের কোণে অল্প গুঁড়ো লেগেছিল। নার্সিংহোম পৌঁছে ওভারকোট পরা ভদ্রমহিলা উঠে, ড্রাইভারকে কয়েকটি কথা বলে বাস থেকে নেমে গেলেন। ড্রাইভার মাথা ঘুরিয়ে মিসেস সেনের দিকে তাকাল। "ব্যাগের ভিতর কী আছে?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসেস সেন চমকে মুখ তুলে তাকালেন।

"আপনি কি ইংরেজি বোঝেন?" বাসটা আবার চলতে শুরু করল। ড্রাইভার তার বিশাল বড় রিয়ারভিউ আয়নায় মিসেস সেন এবং এলিয়টের দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ, বলতে পারি।"

"তা হলে ব্যাগে কী আছে?"

"একটা মাছ", মিসেস সেন জবাব দিলেন।

"গন্ধে অন্য প্যাসেঞ্জারদের অসুবিধে হচ্ছে। খোকা, তুমি না হয় ওঁর পাশের জানলাটা খুলে দাও।"

কয়েকদিন পর এক দুপুরে ফোনটা বাজল। খুব সুস্বাদু কয়েকটি হ্যালিবাট নৌকোয় এসে পৌঁছেছে। মিসেস সেন কি একটাও নিতে চান? তিনি মি. সেনকে ফোন করলেন, কিন্তু তিনি নিজের ডেস্কে ছিলেন না। মিসেস সেন দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ফোন করলেন। শেষে তিনি রান্নাঘরে গিয়ে বঁটি, একটা বেগুন আর কয়েকটা খবরের কাগজ নিয়ে এলেন। এলিয়টকে কিছু বলার দরকার ছিল না। সে সোফায় বসে মিসেস সেনের বেগুন কাটা দেখতে লাগল। প্রথমে তিনি লম্বা, সরু টুকরো কাটলেন। তারপর সেগুলোকে ছোট থেকে আরও ছোট সুগারকিউবের মতো চারচৌকো টুকরোয় কাটলেন।

"এগুলো আমি মাছ আর কাঁচকলার সঙ্গে দিয়ে খুব সুস্বাদু একটা স্টু রাঁধব," মিসেস সেন জানালেন। "শুধু কাঁচকলাটা বাদ দিতে হবে।"

"আমরা কি মাছ আনতে যাব?"

"আমরা মাছ আনতে যাব।"

"মি. সেন কি আমাদের নিয়ে যাবেন?"

"জুতো পরে নাও।"

তাঁরা খোসাটোসা পরিষ্কার না করেই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে এত ঠান্ডা পড়েছিল যে, এলিয়টের দাঁত শিরশির করছিল। তাঁরা গাড়িতে উঠে বসলেন। মিসেস সেন অনেকবার অ্যাসফাল্টের বাঁকা রাস্তাটার চারদিকে গাড়ি চালালেন। প্রতিবার পাইন গাছের ছোট্ট বনটার কাছে এসে বড় রাস্তার ট্র্যাফিক লক্ষ করলেন। এলিয়ট ভাবল যে, মি. সেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসা পর্যন্ত বুঝি তিনি অভ্যেস করবেন। কিন্তু তারপর তিনি একটা সিগনাল দিয়ে গাড়ি ঘোরালেন।

অ্যাক্সিডেন্টটা খুব তাড়াতাড়িই হল। মাইলখানেক যাওয়ার পর যেখানে বাঁ দিকে ঘোরার কথা মিসেস সেন তার আগেই ঘুরলেন। সামনের গাড়িটা যদিও কোনওমতে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল, তিনি হর্নের আওয়াজে এতই ঘাবড়ে গেলেন যে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটোদিকের একটা টেলিফোন পোলে গিয়ে ধাক্কা খেলেন। একজন পুলিশ এসে তাঁর লাইসেন্স দেখতে চাইল, কিন্তু তাঁর কাছে লাইসেন্স ছিল না। "মি. সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক পড়ান।" কৈফিয়ত হিসেবে তিনি শুধু এইটুকুই বলতে পারলেন।

ক্ষতি সামান্যই হয়েছিল। মিসেস সেনের ঠোঁট কেটে গিয়েছিল। এলিয়টের পাঁজরে অল্প সময়ের জন্য একটু ব্যথা হয়েছিল। গাড়ির মাডগার্ডটা বেঁকে গিয়েছিল। পুলিশটি ভেবেছিল যে, মিসেস সেনের বোধহয় মাথায়ও কেটে গিয়েছে, কিন্তু সেটা রক্ত নয়, তাঁর সিঁদুরের দাগ ছিল। মি. সেন যখন এক সহকর্মীর গাড়িতে এসে পৌঁছোলেন, তখন তিনি পুলিশটির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন, কয়েকটা ফর্ম ভরতি করলেন। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথেও তিনি মিসেস সেনকে কিছু বললেন না। গাড়ি থেকে নেমে মি. সেন এলিয়টের মাথা চাপড়ে বললেন, "পুলিশ অফিসার বলল যে তোমার কপাল খুব ভাল। কপাল খুব ভাল যে, তোমার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি।"

চটি খুলে বুককেসে রেখে দেওয়ার পর মিসেস সেন বঁটিটা সরিয়ে রাখলেন। সেটা তখনও বসবার ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল। বেগুনের টুকরো আর খবরের কাগজগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। এক প্লেট ক্র্যাকারে পিনাট বাটার মাখিয়ে কফি টেবিলের ওপর রেখে এলিয়টের জন্য টিভি চালিয়ে দিলেন। "ওর খিদে না মিটলে ফ্রিজে একটা বাক্সে কাঠি-আইসক্রিম রাখা আছে। বের করে দিয়ো," তিনি মি. সেনকে বললেন। মি. সেন ফরমিকা টেবিলে বসে চিঠিপত্র ঘাঁটছিলেন। মিসেস সেন বেডরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। পৌনে ছ'টায় এলিয়টের মা আসার পর মি. সেন তাঁকে অ্যাক্সিডেন্টের খুঁটিনাটি জানিয়ে নভেম্বর মাসের টাকাটা ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। চেক লেখার সময় তিনি মিসেস সেনের তরফ থেকে ক্ষমা চাইলেন। তিনি বললেন যে, মিসেস সেন বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিন্তু বাথরুম

AMARBOI.COM

যাওয়ার সময় এলিয়ট মিসেস সেনকে কাঁদতে শুনেছিল। তার মা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে তিনি এলিয়টের কাছে স্বীকার করলেন যে, একদিক থেকে তিনি কিছুটা আশ্বস্তও হয়েছেন। সেই শেষবার এলিয়ট দুপুরবেলা মিসেস সেনের সঙ্গে বা কোনও বেবি-সিটারের সঙ্গে কাটিয়েছিল। তারপর থেকে তার মা তাকে একটা চাবি দিয়ে যেতেন, যেটা সে একটা সুতোয় ঝুলিয়ে গলায় পরে থাকত। ঠিক হল যে, স্কুলের পর সে নিজেই বিচহাউসে ঢুকবে এবং কোনও দরকার বা বিপদ হলে পড়শিদের ডাকবে। প্রথম দিন, সে সবে কোটটা খুলছে, এমন সময় ফোন বাজল। তার মা অফিস থেকে ফোন করছিলেন। "তুমি এখন বড় হয়ে গিয়েছ, এলিয়ট", তিনি বললেন। "তুমি ঠিক আছ তো?" এলিয়ট রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ধূসর রঙের ঢেউগুলো সমুদ্রের তীর থেকে পিছিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, "আমি ঠিক আছি।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিমান্বিত

প্রথম জিনিসটি তারা স্টোভের ওপরের কাবার্ডের ভিতর, একটা মল্ট-ভিনিগারের না-খোলা বোতলের পাশে আবিষ্কার করেছিল। "আমি কী খুঁজে পেয়েছি বলো তো?" টুইঙ্কল বসার ঘরে ঢুকল। ঘরটার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত টেপ-লাগানো প্যাকিং বাক্সে ঠাসা। তার এক হাতে ভিনিগারের বোতল, আর-এক হাতে যিশুর একটা সাদা পোর্সিলিনের পুতুল, প্রায় বোতলটার মাপেরই।

সঞ্জীব মুখ তুলে তাকাল। সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে 'পোস্ট-ইট'-এর টুকরো ছিঁড়ে যেখানে রং করার দরকার বেসবোর্ডের সেই অংশগুলোয় লাগাচ্ছিল। "ফেলে দাও।"

"কোনটা?"

"দুটোই।"

"কিন্তু ভিনিগারটা দিয়ে তো কিছু রাঁধতেও পারি। এটা একেবারে নতুন।"

"তুমি তো কখনও ভিনিগার দিয়ে কোনও রান্না কর না।"

"কিছু একটা খুঁজে বের করব ওই আমাদের বিয়েতে পাওয়া রান্নার বইগুলোর থেকে।"

সঞ্জীব বেসবোর্ডের দিকে ফিরল। একটা খসে পড়া পোস্ট-ইট যথাস্থানে আটকে দিল। "এক্সপায়ারি ডেটটা দেখে নাও। না হলে ওই বোকা বোকা মূর্তিটা দূর করো।"

"কিন্তু এটা তো মূল্যবান হতে পারে। কে জানে?" টুইঙ্কল পুতুলটাকে উলটে পালটে দেখে সেটার ছোট কঠিন জামার ভাঁজে আঙুল বোলাল। "সুন্দর দেখতে।"

"আমরা তো খ্রিশ্চান নই," সঞ্জীব বলল। সম্প্রতি সে লক্ষ করছিল যে, এরকম বহু কথাই টুইঙ্কলকে ভাল করে বোঝাতে হয়। আগের দিন তাকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে হয়েছিল যে, দেরাজটা সরানোর সময় টুইঙ্কল যদি তার দিকটা মেঝে থেকে না তুলে ঘষটে নিয়ে যায়, তা হলে কাঠের পাটাতনওয়ালা মেঝেটায় দাগ হয়ে যাবে।

টুইঙ্কল কাঁধ ঝাঁকাল। "না, আমরা খ্রিশ্চান নই। আমরা ছোট্ট ভাল হিন্দু ছেলেমেয়ে।" সে যিশুর কপালে একটা চুমু খেয়ে ফায়ারপ্লেসের তাকের ওপর পুতুলটা রেখে দিল। সঞ্জীবের খেয়াল হল যে, তাকটার ধুলো ঝাড়তে হবে।

সপ্তাহের শেষেও তাকটার ধুলো ঝাড়া হল না, ইতিমধ্যে অবশ্য তাকটার ওপর বেশ কয়েকটি টুকিটাকি খ্রিশ্চান জিনিসপত্র সাজানো হয়েছিল। চার রঙে আঁকা সেন্ট ফ্রান্সিসের একটি থ্রি-ডি কার্ড যা টুইঙ্কল ওষুধের ক্যাবিনেটের পিছনে টেপ দিয়ে সাঁটা অবস্থায় পেয়েছিল। একটা কাঠের ক্রুশ-ওলা চাবির রিং, যেটা সঞ্জীব টুইঙ্কলের স্টাডিতে বাড়তি তাক লাগানোর সময় খালি পায়ে মাড়িয়ে ফেলেছিল। কালো মখমলের ওপর তিন জ্ঞানী পুরুষের একটি পেন্ট-বাই-নাম্বার, ফ্রেমে বাঁধিয়ে কাপড়ের দেওয়াল-আলমারির ভিতর রাখা ছিল। সোনালি চুলওয়ালা, গোঁফদাড়িহীন যিশুর ছবি একটি টাইলের তেপায়ার ওপর আঁকা। যিশু একা পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। খাবার ঘরের চায়না ক্যাবিনেটের একটা ড্রয়ারে টাইলটা পাওয়া গিয়েছিল।

"তোমার কি মনে হয় বাড়ির আগের মালিকরা 'ধর্মান্তরিত খ্রিশ্চান' ছিল?" পরের দিন টুইঙ্কল জিজ্ঞেস করল। সে একটা বরফভরা ছোট প্লাস্টিকের গম্বুজের জন্য ফায়ারপ্লেসের ওপরের তাকে জায়গা করছিল। জিনিসটার ভিতরে ছিল 'নেটিভিটি' দৃশ্যের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। রান্নাঘরে, সিঙ্কের পাইপের পিছনে পড়ে ছিল।

সঞ্জীব বইয়ের তাকে এমআইটির ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাঠ্যবইগুলো বর্ণানুক্রমিকভাবে গুছিয়ে রাখছিল। অবশ্য অনেক বছর হল, তাকে বইগুলোর একটারও সাহায্য নিতে হয়নি। স্নাতক হওয়ার পর সে বস্টন থেকে কানেকটিকাটে চলে যায়, হার্টফোর্ডের কাছে একটা কোম্পানিতে কাজ করার জন্য। এবং সম্প্রতি সে জানতে পেরেছিল যে, ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তাকে বিবেচনা করা হচ্ছে। তেত্রিশ বছর বয়সে তার নিজস্ব

AMARBOI.COM

সেক্রেটারি আছে। এবং তার তত্ত্বাবধানে ডজনখানেক লোক কাজ করে যারা তাকে খুবই আগ্রহের সঙ্গে যে-কোনও তথ্য খুঁজে দেবে। তা সত্ত্বেও, ঘরে কলেজের বইগুলো তার জীবনের এমন এক প্রিয় সময়ের কথা মনে পড়ায়, যে দিনগুলোয় সে প্রতি সন্ধেবেলা মাস অ্যাভিনিউ ব্রিজ পার করে চার্লসের অপরদিকে তার প্রিয় ভারতীয় রেস্তোরাঁ থেকে পালং শাক দেওয়া মোগলাই চিকেন অর্ডার দিতে যেত এবং ডর্মিটরিতে ফিরে এসে প্রবলেম সেট-এর পরিষ্কার কপি লিখতে বসত।

"কিংবা এটা হয়তো লোককে ধর্মান্তরিত করার এক প্রচেষ্টা," টুইঙ্কল চিন্তামগ্ন স্বরে বলল।

"স্পষ্টতই, তোমার ক্ষেত্রে প্ল্যানটা কাজ করেছে।"

টুইঙ্কল সঞ্জীবকে অগ্রাহ্য করে গম্বুজটা ঝাঁকাল। বরফের কুচিগুলোর ঘূর্ণি উঠল তাতে।

সঞ্জীব ফায়ারপ্লেসের তাকের ওপর রাখা জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবল, আলাদাভাবে প্রত্যেকটি জিনিস এত ফালতু হতে পারে কী করে। একথা পরিষ্কার যে এগুলির মধ্যে কোনও ঐশ্বরিক ব্যাপার নেই। সে আরওই অবাক হচ্ছিল যে, টুইঙ্কলের মতো সুরুচিসম্পন্ন মেয়ে কী করে এগুলো দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গেল। টুইঙ্কল এই জিনিসগুলোর মধ্যে কোনও অর্থ খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু সে ওগুলো দেখে বিরক্তবোধ করছিল। "আমাদের রিয়্যাল্টরকে ফোন করা উচিত। জানানো দরকার যে এসব ফালতু জিনিস এখানে থেকে গিয়েছে। এগুলো নিয়ে যেতে বলা উচিত।"

"ওহো সাঁজ," টুইঙ্কল কাতরভাবে বলে উঠল। "প্লিজ, আমার খুব খারাপ লাগবে এগুলো ফেলে দিতে। বোঝাই যাচ্ছে যে, যারা এখানে থাকত, তাদের কাছে জিনিসগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেমন লাগবে, মানে... অধার্মিক হয়ে যাবে না কি কাজটা?"

"অতই যদি মূল্যবান হত ওগুলো, তা হলে সারা বাড়িতে লুকোনো ছিল কেন? আগের লোকেরা তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়নি কেন?"

"নিশ্চয়ই এরকম আরও আছে," টুইঙ্কল বলল। তার দৃষ্টি ঘরের ফাঁকা অফ-হোয়াইট দেওয়ালে ঘুরছিল, যেন পলেস্তারার পিছনে আরও জিনিস লুকিয়ে রাখা আছে। "তোমার কী মনে হয়, আমরা আর কী খুঁজে পেতে পারি?"

AMARBOI.COM

কিন্তু তাদের বাক্সপ্যাঁটরা খুলে শীতের জামাকাপড় এবং জয়পুরে, তাদের মধুচন্দ্রিমায় কেনা হাতিদের শোভাযাত্রার সিল্ক-পেন্টিং টাঙিয়ে রাখার সময় টুইঙ্কল আর কিছুই খুঁজে না পেয়ে হতাশ হল। প্রায় এক সপ্তাহ বাদে এক শনিবার দুপুরে, গেস্ট-বেডরুমের একটা রেডিয়েটারের পিছনে পাওয়া গেল জলরঙে আঁকা যিশুর বিশাল বড় এক পোস্টার। তাঁর চোখ থেকে বাদামের খোলের মাপের স্বচ্ছ অশ্রু ঝরে পড়ছে। মাথায় কাঁটার মুকুট। সঞ্জীব প্রথমে ভুল করে সেটাকে জানলার শেড ভেবেছিল।

"ওঃ, এটা টাঙাতে হবে, এটা টাঙাতেই হবে। এটা খুবই চমৎকার।" টুইঙ্কল একটা সিগারেট ধরিয়ে সেটা তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল। সিগারেট সমেত হাতটা এমনভাবে সঞ্জীবের মাথার কাছে ঘোরাল, যেন একতলায় স্টিরিয়োতে যে মাহলারের ফিফথ সিমফোনি বাজছে তার কনডাক্টরের ব্যাটন।

"শোনো, আমি আপাতত বসার ঘরে তোমার বাইবেলের প্রদর্শনী সহ্য করতে পারি। কিন্তু এটা আমি কিছুতেই মেনে নেব না, আমাদের বাড়ির ভিতর।" একটি রং করা বাদামের মতো অশ্রুর দিকে টুসকি মেরে সঞ্জীব বলল।

টুইঙ্কল তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে শান্তভাবে নিশ্বাস ফেলল, নাক থেকে দুটো পাতলা নীলচে ধারায় সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে এল। সে পোস্টারটা আস্তে আস্তে গোল করে পাকিয়ে ফেলল। ঘন, হেনার রেখা আঁকা চুল বাঁধার জন্য তার কবজিতে যে ইল্যাস্টিক ব্যান্ড সবসময় জড়ানো থাকে, তার একটা নিয়ে পোস্টারটার গায়ে জড়াল। "আমি এটা আমার স্টাডিতে রাখব," সে জানাল। "তা হলে তোমাকে আর এটা দেখতে হবে না।"

"হাউসওয়ার্মিং-এর সময় কী হবে? সকলে তো সবক'টা ঘরই দেখতে চাইবে। আমি অফিসের কতজনকে ডেকেছি।"

টুইঙ্কল চোখ ঘোরাল। সঞ্জীবের খেয়াল হল যে, সিমফোনিটা তৃতীয় মুভমেন্ট-এ এসে একটি চরম পর্বে পৌঁছেছে, করতালের ধ্বনির সঙ্গে স্পন্দিত হচ্ছে।

"আমি না হয় এটা দরজার পিছনে ঝুলিয়ে রাখব," টুইঙ্কল বলল। "সে ক্ষেত্রে, ওরা এসে উঁকি মারলেও, কিছু দেখতে পাবে না। খুশি তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্জীব দাঁড়িয়ে টুইঙ্কলের পোস্টার এবং সিগারেট নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া দেখল। টুইঙ্কল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে মেঝেতে সিগারেটের সামান্য ছাই পড়েছে। সঞ্জীব নিচু হয়ে আঙুলের মধ্যে সেগুলো তুলে অন্য হাতে জমা করল। সিমফোনির মৃদু চতুর্থ মুভমেন্ট adagietto শুরু হয়েছিল। প্রাতরাশের সময় সঞ্জীব লাইনার নোটসে পড়েছিল যে, সিমফোনির এই অংশের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েই মাহলার তাঁর স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এও জানতে পেরেছিল যে ফিফথ সিমফোনিতে ট্র্যাজেডি এবং সংগ্রামের উপাদান থাকলেও, এটি প্রধানত ভালবাসা এবং আনন্দের সংগীত।

সে টয়লেট ফ্লাশের শব্দ পেল। "আর শোনো," টুইঙ্কল চিৎকার করে বলল। "যদি চাও যে লোকে তারিফ করুক, তা হলে এই মিউজিকটা চালিয়ো না। এটা শুনে আমার ঘুম আসছে।"

ছাইগুলো ফেলার জন্য সঞ্জীব বাথরুমে গেল। সিগারেটের টুকরোটা তখনও প্যানে ভেসে ছিল। কিন্তু ট্যাঙ্কে জল পুরোপুরি ভরেনি বলে, ফ্লাশ করার আগে তাকে অপেক্ষা করতে হল। ওষুধের ক্যাবিনেটের আয়নায় সে নিজের চোখের টানা টানা পলকগুলো খুঁটিয়ে দেখল। টুইঙ্কল তাকে খেপানোর জন্য বলে যে, তার পলকগুলো মেয়েদের চোখের মতো। তার গড়ন মাঝারি, কিন্তু গালদুটো ভরাট। সঞ্জীবের ধারণা ছিল যে তার পাশ-ফেরা মুখে বেশ বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু গাল আর চোখের বড় বড় পাতার জন্য সেটা কিছু খর্ব হয়। তার উচ্চতাও মাঝারি। এবং যেদিন থেকে তার লম্বা হওয়া থেমে গিয়েছে, সেদিন থেকেই সে ভাবে যে তার উচ্চতা যদি আর মাত্র এক ইঞ্চি বেশি হত, তা হলেই সে সন্তুষ্ট হত। এই কারণেই টুইঙ্কল উঁচু হিলওয়ালা জুতো পরতে চাইলেই সে বিরক্ত হয়। কয়েক রাত আগে ম্যানহাটনে ডিনার খেতে যাওয়ার সময় যেমন হল। এই বাড়িতে আসার পর সেটাই প্রথম উইকএন্ড ছিল। ততদিনে ফায়ারপ্লেসের তাকটা জিনিসপত্রে রীতিমতো ঠাসাঠাসি হয়ে গিয়েছে। গাড়ি করে খেতে যাওয়ার সময় তারা এই নিয়ে খিটখিটও করেছিল। কিন্তু তারপর অ্যালফাবেট সিটির এক নামহীন বার-এ চার গেলাস হুইস্কি খেয়ে টুইঙ্কল ওই ব্যাপারে সব ভুলে গিয়েছিল। সে সঞ্জীবকে টেনে সেন্ট মার্ক্স প্লেস-এর একটা ছোট্ট বইয়ের দোকানে নিয়ে যায়। সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে বেরোনোর পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুটপাথে অচেনা লোকজনের সামনে দু'জনে মিলে ট্যাঙ্গো নাচার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে।

পরে, সে সঞ্জীবের হাতে ভর দিয়ে টলতে টলতে হাঁটছিল। সোয়েডের তিন ইঞ্চি লম্বা লেপার্ড-প্রিন্ট পাম্প জুতো পরে তাকে সঞ্জীবের চেয়ে সামান্য লম্বা দেখাচ্ছিল। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে অসংখ্য ব্লক পেরিয়ে তাদের ওয়াশিংটন স্কোয়ারের একটা পার্কিং গ্যারেজে যেতে হল। কারণ, সঞ্জীব শুনেছিল যে, ম্যানহাটনে গাড়ি পার্ক করে রাখলে কী কী সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে পারে। বাড়ি ফেরার পথে যখন সঞ্জীব বলল, টুইঙ্কলের জুতোগুলো দেখে খুব একটা আরামদায়ক মনে হচ্ছে না এবং হয়তো সে ওই জুতোজোড়া না পরলেই পারে, তখন টুইঙ্কল ঘ্যানঘ্যানে স্বরে বলল, "কিন্তু আমি সারাদিন আমার ডেস্কে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করি না। টাইপ করার সময় তো আর হিল পরতে পারি না।" সঞ্জীব আর তর্ক বাড়ায়নি, কিন্তু সে জানত যে, টুইঙ্কল সারাদিন তার ডেস্কে বসে কাটায় না। সেই দুপুরেই এক দফা দৌড়ে এসে সঞ্জীব দেখেছিল যে, কোনও কারণে টুইঙ্কল খাটে শুয়ে বই পড়ছে। অবেলায় শুয়ে আছে কেন জিজ্ঞেস করায় টুইঙ্কল উত্তর দেয় যে, তার একঘেয়ে লাগছিল। সঞ্জীব তখন বলতে চেয়েছিল যে, একঘেয়ে লাগলে তুমি কয়েকটা বাক্স খুলে গোছাতে পারো। চিলেকোঠার ঘরটা ঝাঁট দিতে পারো। বাথরুমের জানলাটা আর-একবার রং করা দরকার, সেই কাজটা করতে পারো। আর তারপর আমাকে সাবধান করে দিতে পারো যাতে আমি ভুল করে সদ্য রং করা জানলার চৌকাঠে ঘড়িটা না রেখে দিই। এই বিষয়গুলো নিয়ে, এই ছড়ানো-ছিটানো নিয়ে টুইঙ্কল মাথা ঘামায় না। সে দেওয়াল-আলমারি খুলে সামনে যা জামাকাপড় খুঁজে পায়, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। হাতের কাছে যা পত্রিকা পায়, রেডিয়ো খুলে যা-ই গান শুনতে পায় তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। সন্তুষ্ট, কিন্তু কৌতূহলী। আর এখন তার সমস্ত কৌতূহল পরবর্তী কোন গুপ্তধন আবিষ্কার হবে, তাই ঘিরে আবর্ত হচ্ছিল।

কয়েকদিন পর সঞ্জীব অফিস থেকে ফিরে দেখল টুইঙ্কল সিগারেট খেতে-খেতে ফোনে তার এক ক্যালিফোর্নিয়াবাসী বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছে। যদিও সে সময় দূরবর্তী ফোনকলের সর্বোচ্চ হার জারি ছিল কারণ তখনও পাঁচটা বাজেনি। "অত্যন্ত ধার্মিক লোকজন," সে বলছিল। মাঝে মাঝে ধোঁয়া ছাড়ার জন্য থামতে হচ্ছিল। "প্রতিদিনই যেন গুপ্তধনের খোঁজ করি। সত্যি

www.amarboi.com ~

বলছি। বললে বিশ্বাস করবি না, বেডরুমের সুইচবোর্ডগুলো বাইবেলের নানা দৃশ্য দিয়ে সাজানো ছিল। ওই যে নোয়ার আর্ক আর ওইসব। বেডরুম তিনটে, কিন্তু একটা আমার স্টাডি। সঞ্জীব হার্ডওয়্যারের দোকানে গিয়ে প্রত্যেকটা বদলে এনেছে। ভাবতে পারিস? প্রত্যেকটা।"

এবার বান্ধবীর কথা বলার পালা। টুইঙ্কল মাথা নাড়ল। তার পরনে কালো স্ট্রাপ প্যান্ট এবং একটা হলুদ ভেলভেটের মতো কাপড়ের সোয়েটার। ফ্রিজের সামনে মেঝেতে বসে লাইটারের জন্য আশপাশ হাতড়াচ্ছিল। সঞ্জীব টের পেল, স্টোভের ওপর কোনও সুগন্ধি রান্না চাপানো আছে। সে মেক্সিকান টেরাকোটা টাইলের ওপর জড়িয়ে পড়ে থাকা টেলিফোনের লম্বা তার এড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। একটা পাত্রের ঢাকনা খুলে দেখল, রান্নাটা ফুটে গিয়ে কী এক লালচে-বাদামি সস পাত্রটার বাইরে উপচে পড়ছে।

"ওটা মাছ দিয়ে রাঁধা একটা স্টু। আমি ভিনিগারটা দিয়েছিলাম," টুইঙ্কল বান্ধবীকে থামিয়ে, আঙুল ক্রস করে সঞ্জীবকে বলল। "সরি, কী বলছিলি?" টুইঙ্কল ওরকমই। ছোটখাটো ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যে-কোনও ব্যাপার একটু অনিশ্চিত হলে নিজের আঙুল ক্রস করে। যেমন, কোনও নতুন স্বাদের আইসক্রিম চাখার আগে কিংবা ডাকবাক্সে কোনও চিঠি ফেলার আগে। তার চরিত্রের এই দিকটা সঞ্জীব বুঝতে পারে না। টুইঙ্কলকে দেখে তার নিজেকে কেমন বোকা মনে হয়। যেন, পৃথিবীতে নানা বিস্ময় লুকিয়ে আছে যা সে দেখতে বা ভাবতে পারছে না। সে টুইঙ্কলের মুখের দিকে তাকাল। লক্ষ করল, তার মুখ এখনও শৈশব কাটিয়ে ওঠেনি। চোখে কোনও উদ্বেগ নেই, সুন্দর মুখের গড়নে এখনও বালিকাসুলভ সৌকুমার্য রয়েছে, যেন এখনও কিছু সময় লাগবে পূর্ণতায় পৌঁছতে। এক নার্সারি রাইমের নামে তার নাম, যেন ছেলেবেলার কোনও আদরের ডাক সে এখনও আঁকড়ে আছে। এখন, বিয়ের দ্বিতীয় মাসে, টুইঙ্কলের কয়েকটি ব্যাপার সঞ্জীবকে সামান্য বিরক্ত করে। মাঝে মাঝে কথা বলার সময় টুইঙ্কলের মুখ দিয়ে বাচ্চাদের মতো অল্প থুতু বেরিয়ে আসে। রাতে অন্তর্বাস ছাড়ার পর সে সেগুলো লন্ড্রির ঝুড়িতে ফেলার বদলে খাটের এক প্রান্তে ফেলে রেখে দেয়।

মাত্র চার মাস আগে তাদের দেখা হয়েছিল। টুইঙ্কলের মা-বাবা, যাঁরা ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকেন, এবং সঞ্জীবের মা-বাবা, যাঁরা এখনও কলকাতায়

AMARBOI.COM

থাকেন, অনেকদিনের বন্ধু। এক মহাদেশ থেকে আর-এক মহাদেশে যোগাযোগ করে তাঁরা টুইঙ্কল এবং সঞ্জীবের প্রথম সাক্ষাতের দিনক্ষণ ঠিক করেছিলেন— আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কারও একজনের মেয়ের ষোলো বছরের জন্মদিন। সঞ্জীব তখন কাজের সূত্রে পালো অল্টোতে ছিল।

রেস্তোরাঁয় তারা একটা গোল টেবিলে পাশাপাশি বসেছিল। টেবিলের ওপর শুয়োরের মাংস, ডিমের রোল, মুরগির পাত্র ঘুরছিল। দু'জনেরই মনে হয়েছিল যে, সবক'টি খাবার একইরকম খেতে। তা ছাড়াও, দু'জনেরই উডহাউসের উপন্যাসের জন্য তখনও এক কিশোরসুলভ কিন্তু স্থায়ী ভাললাগা ছিল। দু'জনেরই সেতার অপছন্দ। পরে টুইঙ্কল স্বীকার করেছিল যে, বাক্যালাপের সময় সঞ্জীব টুইঙ্কলের চায়ের কাপ দায়িত্বশীলভাবে ভরে দিয়েছিল দেখে সে খুব প্রসন্ন হয়েছিল।

আর সেইভাবেই শুরু হয় ফোন করাকরি, আরও বেশিক্ষণ কথা বলা, তারপর দেখাসাক্ষাৎ। প্রথমে সঞ্জীব স্ট্যানফোর্ডে যেত, তারপর টুইঙ্কল কানেকটিকাট আসত। তারপর, শনি-রবিবার টুইঙ্কল যে সিগারেটগুলো খেত, সঞ্জীব ব্যালকনিতে ফেলে রাখা একটা অ্যাশট্রেতে তার দুমড়োনো টুকরোগুলো জমিয়ে রাখত— টুইঙ্কল আবার আসা পর্যন্ত। সে আসার আগে সঞ্জীব অ্যাপার্টমেন্টটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করত, চাদরগুলো ধুয়ে রাখত, এমনকী গাছের পাতাগুলোরও ধুলো ঝেড়ে রাখত টুইঙ্কলের সম্মানে। টুইঙ্কলের তখন সাতাশ বছর। সেই সময় তার কোনও প্রেমিক তাকে সদ্য ছেড়ে গিয়েছিল। সঞ্জীব জানতে পেরেছিল যে, ছেলেটি আমেরিকান, অভিনেতা হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। সঞ্জীবের সমস্যা ছিল একাকিত্ব। একা পুরুষ হিসেবে সে অত্যন্ত বেশি উপার্জন করত এবং সে কখনও প্রেমে পড়েনি। তাদের ঘটকদের পীড়াপীড়িতে তারা ভারতে গিয়ে বিয়ে করেছিল। কয়েকশো শুভাকাঙ্ক্ষী এসেছিলেন, যাদের সঞ্জীব ছেলেবেলায় দেখেছিল এবং প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আগস্টের অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে, ম্যান্ডেভিল রোডে, ক্রিসমাসের আলো দিয়ে সাজানো একটা লাল-কমলা তাঁবুর নীচে তাদের বিয়ে হয়েছিল।

"চিলেকোঠাটা ঝাঁট দিয়েছিলে?" সঞ্জীব পরে জিজ্ঞেস করল। টুইঙ্কল কাগজের ন্যাপকিন ভাঁজ করে প্লেটের পাশে গুঁজে রাখছিল। বাড়ির মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিলেকোঠার ঘরটাই এখনও একবারও পরিষ্কার করা হয়নি।

"এখনও করিনি। তবে করব। প্রমিস। আশা করি এটা খেতে ভাল হবে," টুইঙ্কল বলল। সে যিশুর ছবি আঁকা তেপায়াটার ওপর ধোঁয়া ওঠা পাত্রটা রাখল। একটা ছোট ঝুড়িতে ইতালীয় পাউরুটির একটা ছোট্ট খণ্ড ছিল। তার সঙ্গে আইসবার্গ লেটুস, এবং গাজর কুরে বোতলের ড্রেসিং আর ক্রোটনের সঙ্গে মেশানো। আর লাল ওয়াইনের গেলাস। রান্নাবান্নার ব্যাপারে টুইঙ্কল খুব উৎসাহী নয়। সে সুপারমার্কেট থেকে প্রি-রোস্টেড মুরগি কিনে আনে, তার সঙ্গে আলুর স্যালাড খেতে দেয় যা ছোট প্লাস্টিকের বোতলে পাওয়া যায়, কখন রান্না করা খেতে তা কেউ জানে না। সে অভিযোগ করত যে ভারতীয় রান্নার বড্ড হ্যাঙ্গাম। তার রসুন কুটতে, আদার খোসা ছাড়াতে খুব খারাপ লাগত। সে ব্লেন্ডার চালাতে পারত না। তাই শনি-রবিবার সঞ্জীবই সরষের তেলে এলাচ-দারচিনি ফুটিয়ে ঠিকমতো তরকারি রান্না করার চেষ্টা করত।

অবশ্য সেদিন তাকে স্বীকার করতেই হল যে, টুইঙ্কল যা রেঁধেছিল, সেটা যা-ই হোক না কেন, ভীষণ সুস্বাদু, এমনকী দেখতেও দারুণ। মাছের উজ্জ্বল সাদা চারচৌকো টুকরো, তার ওপর পার্সলে ছড়িয়ে দেওয়া। গাঢ় বাদামি ঝোলের মধ্যে থেকে উঁকি মারছে চকচকে তাজা টোম্যাটো।

"কী করে রাঁধলে এটা?"

"বানিয়ে ফেললাম।"

"কী করে?"

"স্রেফ কড়ায় কয়েকটা জিনিস ঢেলে দিলাম আর সব শেষে ওই মল্ট ভিনিগারটা যোগ করলাম।"

"কতটা ভিনিগার?"

টুইঙ্কল খানিকটা পাঁউরুটি ছিঁড়ে নিজের বাটিতে ডুবিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল।

"জানো না মানে আবার কী? তোমার লিখে রাখা উচিত। যদি আবার রান্না করতে হয়? কোনও পার্টি বা অন্য কিছু হলে?"

"সে আমার মনে থাকবে," টুইঙ্কল বলল। পাঁউরুটির ঝুড়িটার ওপর সে একটা ডিশ-তোয়ালে চাপা দিল। সঞ্জীব হঠাৎ লক্ষ করল যে, তোয়ালেটা ওপর টেন কমান্ডমেন্টস ছাপা। টুইঙ্কল তার দিকে তাকিয়ে প্রফুল্ল হাসি হাসল। টেবিলের তলায় তার হাঁটুতে আলতো চাপ দিয়ে বলল, "তোমাকে মানতেই হবে এই বাড়িটা ভগবানের আশীর্বাদধন্য।"

AMARBOI.COM

অক্টোবর মাসের শেষ শনিবারটা হাউসওয়ার্মিং পার্টির জন্য ঠিক করা হল। তারা আন্দাজ ত্রিশ জনকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সকলেই সঞ্জীবের পরিচিত, তার অফিসের সহকর্মী এবং কানেকটিকাটের কয়েকটি দম্পতি। দ্বিতীয় দলের অনেককেই সঞ্জীব ভাল করে চেনে না, কিন্তু তারা সঞ্জীবকে তার বিয়ের আগে নিয়মিত শনিবার রাতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করত। সে অনেক বার ভেবেছে কেন তারা তাকে নিজেদের দলে টানত। কারণ সেই দম্পতিদের কারও সঙ্গেই তার খুব একটা মিল ছিল না। কিন্তু সে সবসময় তাদের আড্ডায় উপস্থিত থাকত, ঘুগনি আর চিংড়ির কাটলেট খাওয়া, আড্ডা দেওয়া এবং রাজনীতি আলোচনা করার জন্য। কারণ, বেশিরভাগ সময়ই তার আর অন্য কিছু করার থাকত না। এদের কারও সঙ্গে টুইঙ্কলের আগে কখনও দেখা হয়নি। বিয়ের আগে সঞ্জীব তার এবং টুইঙ্কলের একত্রে কাটানো শনি-রবিবারের সংক্ষিপ্ত সময়টুকু এমন কারও সঙ্গে কাটিয়ে নষ্ট করতে চায়নি, যাকে সে মনে মনে নিজের একাকিত্বের সঙ্গে জড়াত। সঞ্জীব এবং এক প্রাক্তন প্রেমিক ছাড়া (যে সম্ভবত ব্রুকফিল্ডের এক পটারি স্টুডিয়োয় কাজ করে), টুইঙ্কল কানেকটিকাটে আর কাউকে চিনত না। টুইঙ্কল স্ট্যানফোর্ডে তার স্নাতকোত্তর থিসিসের কাজ করছিল। থিসিসটা এক আইরিশ কবির ওপর, যার নাম সঞ্জীব আগে কখনও শোনেনি।

বিয়ের জন্য ভারতে যাওয়ার আগেই সঞ্জীব নিজেই বাড়িটা খুঁজে বার করেছিল। দামটা ভালই। পাড়াটায় ভাল স্কুলের ব্যবস্থা আছে। রট-আয়রনের রেলিং-ওলা রুচিশীল, বাঁকানো সিঁড়ি, গাঢ় রঙের কাঠের আচ্ছাদন, রডোডেনড্রন ঝোপের পাশে রোদ উপভোগ করার জন্য কাচের ঘর এবং কিছুটা টিউডর কায়দার সদরে পেরেক দিয়ে সাঁটা নিরেট পেতলের '২২' নম্বরটা (ঘটনাচক্রে ২২ সঞ্জীবের জন্মতারিখ) তার পছন্দ হয়েছিল। বাড়িটায় দুটো ব্যবহারযোগ্য ফায়ারপ্লেস, দুটো গাড়ি রাখার মতো গ্যারেজ আছে। রিয়্যাল্টর দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, চিলেকোঠার ঘরটিও দরকার হলে একটি বাড়তি শোওয়ার ঘরে পরিণত করা যাবে। ততক্ষণে সঞ্জীব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। ঠিক করে ফেলেছিল যে, টুইঙ্কল এবং সে একসঙ্গে, চিরকাল এই বাড়িতে থাকবে। তাই সুইচবোর্ডে সাঁটা বাইবেলের স্টিকার বা প্রধান শোওয়ার ঘরের জানলায়, টুইঙ্কল যাকে বলে 'হাফ শেল', তার ওপর ভার্জিন মেরির স্বচ্ছ স্টিকারটা সে লক্ষ করেনি।

AMARBOI.COM

বাড়িতে আসার পর স্টিকারটা উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে গিয়ে সে জানলার কাচে দাগ করে ফেলেছিল।

পার্টির আগের সপ্তাহশেষে তারা লনের ঝরা পাতা পরিষ্কার করছিল, এমন সময় সে টুইঙ্কলের চিৎকার শুনতে পেল। কোনও মৃত পশুপাখি বা সাপ দেখতে পেয়েছে ভেবে সঞ্জীব আঁকশি হাতেই তার দিকে দৌড়োল। হলুদ-বাদামি পাতাগুলোর ওপর তার স্নিকার্সের কড়মড় শব্দ হচ্ছিল। অক্টোবরের সতেজ হাওয়া কানের ওপর তীক্ষ্ণভাবে স্পর্শ করছিল। সে যখন টুইঙ্কলের কাছে পৌঁছোল, টুইঙ্কল তখন ঘাসের ওপর প্রায়-নিঃশব্দ হাসিতে লুটিয়ে পড়েছে। একটা প্লাস্টারের তৈরি ভার্জিন মেরি, অত্যধিক বেড়ে ওঠা একটা ফরসাইথিয়া ঝোপের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। মূর্তিটা তাদের কোমর পর্যন্ত লম্বা। মাথার ওপর ভারতীয় বউদের কায়দায় নীল রঙের ঘোমটা দেওয়া। টুইঙ্কল নিজের টি-শার্টের প্রান্ত দিয়ে মূর্তিটার কপালের ধুলো মুছতে শুরু করল।

"এটাকে বোধহয় তুমি আমাদের খাটের পাশে, পায়ের দিকে রাখতে চাইবে?" সঞ্জীব বলল।

টুইঙ্কল স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকাল। তার পেট দেখা যাচ্ছিল। সঞ্জীব দেখতে পেল যে, তার নাভির চারপাশের রোম খাড়া হয়ে গিয়েছে। "কী ভাবছ তুমি? অবশ্যই আমরা এটা আমাদের শোবার ঘরে রাখতে পারি না।"

"তাই বুঝি? পারি না?"

"না, বোকা সাঁজ। এটা বাইরে রাখার জন্য। লনে রাখার জন্য।"

"হায় ভগবান, না! টুইঙ্কল, না!"

"কিন্তু রাখতেই হবে, নয়তো আমাদের খারাপ হতে পারে।"

"কিন্তু পড়শিরা যে দেখতে পাবে, তখন সকলে ভাববে আমরা পাগল।"

"কেন ভাববে? আমাদের লনে ভার্জিন মেরির একটা মূর্তি রাখার জন্য? এই পাড়ায় অর্ধেক লোকের লনে মেরির একটা করে মূর্তি আছে। আমরা তাদের সঙ্গে একদম মানিয়ে যাব।"

"আমরা তো খ্রিশ্চান নই।"

"সে কথা তো তুমি আমাকে সবসময়ই মনে করাও।" টুইঙ্কল আঙুলের ডগায় থুতু ফেলে মেরির চিবুকের একটি দাগ তোলার জন্য মন দিয়ে ঘষতে

AMARBOI.COM

শুরু করল। "কী মনে হয় বলো তো? এটা কি দাগ? নাকি কোনও ফাঙ্গাস?"

সঞ্জীব আর পারছিল না। এই মেয়েটি, যার সঙ্গে তার মাত্র চার মাসের পরিচয়, যাকে সে বিয়ে করেছে, যে এখন তার জীবনসঙ্গী, তার মনের কাছে সে পৌঁছোতে পারছিল না। মার কলকাতা থেকে পাঠানো ফোটোগুলোর কথা মনে করে তার একটু আপশোস হল। বিবাহযোগ্য পাত্রীদের ফোটো যারা গান গাইতে পারে, সেলাই করতে পারে, কোনও রান্নার বই না দেখেই ডালে ফোড়ন দিতে পারে। সঞ্জীব এদের কথা বিবেচনা করেছিল, এমনকী পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়েওছিল। কিন্তু তারপর তার টুইঙ্কলের সঙ্গে দেখা হয়। "টুইঙ্কল, আমার সহকর্মীরা এই জিনিসটা আমার লনে দেখবে, এটা আমি মেনে নিতে পারি না।"

"তুমি খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাস করো বলে তো তারা তোমাকে চাকরি থেকে বের করে দিতে পারে না। সে তো বৈষম্যমূলক আচরণ হবে।"

"সেটা কোনও কাজের কথা নয়।"

"অন্য লোকে কী ভাবল তাই নিয়ে তোমার এত চিন্তা কেন?"

"টুইঙ্কল প্লিজ।" সঞ্জীব ক্লান্ত বোধ করছিল। সে আঁকশিটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। টুইঙ্কল মূর্তিটাকে যে ল্যাম্পপোস্টটা ইটের ফুটপাথের শোভাবর্ধন করে, তার পাশে মার্টলের একটি ডিম্বাকৃতি কেয়ারির দিকে টানতে শুরু করল। "দেখো সঞ্জু, কী সুন্দর।"

সঞ্জীব ঝরাপাতার স্তূপের কাছে ফিরে গিয়ে পাতাগুলো মুঠোভরে একটা প্লাস্টিকের ময়লা ফেলার ব্যাগে ফেলতে শুরু করল। তার মাথার ওপর নীল মেঘমুক্ত আকাশ। লনে একটা গাছ তখনও পাতায় ভরতি। যে তাঁবুর নীচে সে টুইঙ্কলকে বিয়ে করেছিল, সেই তাঁবুর মতো লাল-কমলা রঙের পাতা।

সঞ্জীব ঠিক জানে না, সে টুইঙ্কলকে ভালবাসে কি না। প্রথমবার যখন টুইঙ্কল তাকে এ প্রশ্ন করেছিল, তখন সঞ্জীব বলেছিল যে সে তাকে ভালবাসে। পালো অল্টোয়, এক দুপুরে তারা এক আধো-অন্ধকার, প্রায় ফাঁকা সিনেমাহলে পাশাপাশি বসে ছিল। জার্মান ভাষায় টুইঙ্কলের প্রিয় কোনও এক ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল যেটা সঞ্জীবের অত্যন্ত বিমর্ষ লেগেছিল। ফিল্মটা শুরু হওয়ার আগে টুইঙ্কলের নাকের ডগা সঞ্জীবের নাকে ছুঁয়েছিল। সঞ্জীব তার মাসকারার প্রলেপ লাগানো চোখের পলকের ওঠানামা অনুভব করতে পারছিল। সেই দুপুরেই সে বলেছিল যে, হ্যাঁ, সে টুইঙ্কলকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালবাসে। টুইঙ্কল উৎফুল্ল হয়ে তাকে একটা পপকর্ন খাইয়েছিল। বোধহয় সঠিক উত্তর দেওয়ার পুরস্কার হিসেবেই, নিজের আঙুলটা সঞ্জীবের ঠোঁট থেকে সরিয়ে নেওয়ার আগে এক মুহূর্ত দেরি করেছিল।

যদিও টুইঙ্কল নিজে সে কথা বলেনি, তাও সঞ্জীব ধরে নিয়েছিল যে, সে-ও তাকে ভালবাসে। কিন্তু এখন সঞ্জীব সে বিষয় নিশ্চিত হতে পারছিল না। সত্যি বলতে কী, ভালবাসা কাকে বলে তা সঞ্জীব জানত না। সে শুধু জানে কাকে ভালবাসা বলা চলে না। সে ঠিক করেছিল যে, প্রতি রাতে একটা ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে ফেরা, রান্নাঘরের ছুরি-চামচের মধ্যে শুধু একটাই ব্যবহার করা, ভালবাসা নয়। এবং সপ্তাহশেষের ডিনারপার্টিতে যখন অন্য পুরুষরা তাদের স্ত্রী বা প্রেমিকার কোমর জড়িয়ে ধরে মাঝেমধ্যেই ঝুঁকে পড়ে তাদের কাঁধ বা গলায় চুমু খায়, তখন ভদ্রভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটাও ভালবাসা নয়। ডাকে ক্যাটালগের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রধান সুরকারদের ধ্রুপদী সংগীতের সিডি নিয়মানুযায়ী সংগ্রহ করা এবং সময়মতো সেগুলোর দাম মিটিয়ে দেওয়া, এর কোনওটাই ভালবাসা নয়। টুইঙ্কলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের মাসগুলোতেই, সঞ্জীব ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছিল। "তোর তো তিনটে সংসার চালানোর মতো পয়সা হয়েছে," তার মা মনে করিয়ে দিতেন, যখন প্রতি মাসের শুরুতে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হত। "তোর একটা বউ দরকার। দেখাশোনা করবি, ভালবাসবি।" এখন সঞ্জীবের একটি বউ আছে। সুশ্রী দেখতে, উপযুক্ত উচ্চবর্ণের। খুব তাড়াতাড়ি সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও পাবে। তবে ভাল না বাসার কী আছে?

সেই সন্ধেয়, সঞ্জীব নিজের জন্য এক পেগ জিন আর টনিক ঢালল। খবরের একটা অংশ শেষ হতে না হতে সে দেড় পেগ খেয়ে ফেলল। তারপর সে টুইঙ্কলের দিকে এগোল। টুইঙ্কল ঘোষণা করেছিল যে, লন পরিষ্কার করে তার গা-হাত-পায়ে ব্যথা হয়েছে। আগে কখনও সে এমন কোনও অভিযোগ করেনি। তাই আরামের জন্য সে বাব্‌ল বাথ নিচ্ছিল। সঞ্জীব দরজায় টোকা দিল না। টুইঙ্কল মুখে একটা উজ্জ্বল নীল রঙের মাস্ক লাগিয়ে রেখেছিল। সিগারেট খেতে খেতে বরফ দেওয়া বুর্বোনে চুমুক দিচ্ছিল এবং একটা মোটা পেপারব্যাক বইয়ের পাতা উলটোচ্ছিল। বইয়ের পাতাগুলো জল লেগে কুঁচকে, ধূসর হয়ে গিয়েছিল। সঞ্জীব প্রচ্ছদের দিকে তাকাল। প্রচ্ছদে শুধু গাঢ়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল অক্ষরে 'সনেট' লেখা ছিল। সে বড় করে শ্বাস নিল। তারপর খুব শান্তস্বরে টুইঙ্কলকে জানাল যে, ড্রিঙ্কটা শেষ করার পর সে পায়ে জুতো গলিয়ে, বাইরে গিয়ে সামনের লন থেকে ভার্জিনকে সরিয়ে দেবে।

"কোথায় রাখবে?" চোখ বন্ধ করে স্বপ্নালু স্বরে টুইঙ্কল জিজ্ঞেস করল। সাবানের ফেনার ভেতর থেকে তার একটা পা সাবলীল ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসল। পায়ের আঙুলগুলো খোলা-বন্ধ করল।

"আপাতত গ্যারেজে রাখব। তারপর কাল সকালে অফিস যাওয়ার সময় ওটা ডাম্প করে দেব।"

"একদম এমন দুঃসাহস দেখিও না," টুইঙ্কল উঠে দাঁড়াল। বইটা জলে পড়ে গেল। তার উরু থেকে বুদবুদ গড়িয়ে পড়ছিল। "আমি তোমাকে ঘৃণা করি" সে ঘোষণা করল। 'হেট' কথাটি বলার সময় তার চোখ দুটো সরু হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে বাথরোবটা তুলে নিয়ে সেটা গায়ে গলিয়ে কোমরের চারপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল। কাঠের মেঝের ওপর ভেজা পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। সে সামনের ঘরে পৌঁছোনোর পর সঞ্জীব বলল, "তুমি কি এইভাবেই বাড়ি থেকে বেরোনোর প্ল্যান করছ?" তার মাথা দপদপ করছিল। কথা বলার সময় সে নিজের কণ্ঠস্বরে একটা অপরিচিত কর্কশভাব টের পেল।

"কী এসে যায়? কার কী এসে যায় আমি কীভাবে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই তা নিয়ে?"

"এই সময় তুমি কোথায় যাবে ভাবছ?"

"তুমি ওই মূর্তিটা ফেলে দিতে পারো না। আমি তোমাকে ফেলতে দেব না।" টুইঙ্কলের মাস্ক এতক্ষণে শুকিয়ে পাঁশুটে বর্ণ ধারণ করেছিল। চুল থেকে জল গড়িয়ে টপটপ করে মুখের জমে থাকা রেখার ওপর পড়ছিল।

"হ্যাঁ পারি। এবং আমি সেটাই করব।"

"না," টুইঙ্কলের গলা হঠাৎ খুব নিচু হয়ে আসল। "এটা আমাদের বাড়ি। আমাদের দু'জনেরই বাড়ি। মূর্তিটা আমাদের সম্পত্তির একটা অংশ।" সে কাঁপতে শুরু করেছিল। গোড়ালির চারপাশে স্নানের জলের একটা ছোট্ট পুকুর তৈরি হয়েছিল। তার ঠান্ডা লেগে যাবে এই ভয়ে সঞ্জীব জানলা বন্ধ করতে গেল। তারপর সে লক্ষ করল যে, কয়েকটি জলের ফোঁটাও টুইঙ্কলের চোখ থেকে শক্ত নীল মুখের ওপর গড়িয়ে পড়েছে।

AMARBOI.COM

"হায় ভগবান, টুইঙ্কল! প্লিজ, আমি ওরকম বলতে চাইনি।" সে আগে কখনও টুইঙ্কলকে কাঁদতে দেখেনি। কখনও তার চোখে এত দুঃখ দেখেনি। টুইঙ্কল মুখ ফিরিয়ে নিল না বা চোখের জল থামানোর চেষ্টা করল না। বরং তাকে অদ্ভুতভাবে শান্ত মনে হচ্ছিল। এক মুহূর্তের জন্য সে তার চোখ বন্ধ করল। বাকি মুখের নীল রঙের তুলনায় চোখের ফ্যাকাশে পাতাগুলো অসহায় মনে হচ্ছিল। সঞ্জীবের হঠাৎ কেমন অসুস্থ লাগল, যেন সে খুব কম বা খুব বেশি খেয়ে ফেলেছে।

টুইঙ্কল সঞ্জীবের কাছে গিয়ে ভিজে, তোয়ালে পরিহিত হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। বুকে মুখ রেখে কাঁদতে কাঁদতে শার্ট ভিজিয়ে দিল। মাস্কের শুকনো কুচি সঞ্জীবের কাঁধের ওপর ঝরে পড়ল।

শেষে তারা একটা সমঝোতা করল যে, মূর্তিটা বাড়ির একপাশে একটি কুলুঙ্গিতে রাখা হবে। তা হলে, রাস্তা দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে মূর্তিটা চট করে তার চোখে পড়বে না, কিন্তু বাড়িতে কেউ এলে সেটা ভালভাবেই দেখতে পাবে।

পার্টির মেনুর মধ্যে কোনও আড়ম্বর ছিল না। এক বোতল শ্যাম্পেন, হার্টফোর্ডের এক ভারতীয় দোকানের শিঙাড়া এবং বড় বড় থালায় মুরগি, আমন্ড ও কমলালেবুর খোসা মেশানো ভাত। শেষোক্ত পদটি সঞ্জীব সকাল ও দুপুরের বেশিরভাগ সময় নিয়ে তৈরি করেছিল। সে আগে কখনও এতজন লোককে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করেনি। যদি পানীয় যথেষ্ট না হয় এই ভয়ে সে একবার দৌড়ে গিয়ে আর-এক বোতল শ্যাম্পেন কিনে আনল। তার মধ্যে আবার এক থালা ভাত পুড়ে যাওয়ায় তাকে আবার সেটা রান্না করতেও হল। টুইঙ্কল মেঝে ঝাঁট দিল। শিঙাড়াগুলো দোকান থেকে নিয়ে আসতে চাইল। এমনিতেই তার সেইদিকে ম্যানিকিয়োর এবং পেডিকিয়োর করাতে যাওয়ার কথা ছিল। সঞ্জীব একবার ভেবেছিল যে, তাকে জিজ্ঞেস করবে, অন্তত পার্টির সময়টুকু ফায়ারপ্লেসের তাক থেকে ওই জিনিসগুলো সরিয়ে রাখার কথা সে ভেবে দেখবে কি না। কিন্তু সঞ্জীব যখন স্নানে ঢুকেছিল, তখনই টুইঙ্কল বেরিয়ে গিয়েছিল। তিনটি ঘণ্টার আগে সে ফিরল না, অতএব সঞ্জীবই বাকি বাড়িটা পরিষ্কার করল। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বাড়িটা ঝকঝক করছিল। টুইঙ্কল হার্টফোর্ডে কয়েকটি সুবাসিত মোমবাতি কিনেছিল।

AMARBOI.COM

সেগুলো তাকের জিনিসগুলোকে আলোকিত করল। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে গাছের টবের মাটিতে গেঁথে দেওয়া হল। তাকটার পাশ দিয়ে যেতে গেলেই সঞ্জীব সংকুচিত হয়ে উঠছিল এই আশঙ্কায় যে, সেরামিকের সন্তজন এবং মেরি এবং জোসেফের আদলে তৈরি নুন-গোলমরিচ রাখার ছোট ছোট শিশি দেখে তার অতিথিরা ভুরু ওপরে তুলবে। তা সত্ত্বেও, সে আশা করল যে, চমৎকার বে উইন্ডো, ঝকঝকে কাঠের পাটাতন দেওয়া মেঝে, ঘোরানো সিঁড়ি, এবং কাঠের আচ্ছাদন দেখে, চাটনিতে শিঙাড়া ডুবিয়ে খেতে খেতে এবং শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে তারা মনে মনে তার বাড়ির তারিফ না করে পারবে না।

প্রথম এসে পৌঁছোল সঞ্জীবের অফিসের এক নতুন কনসাল্ট্যান্ট ডগলাস এবং তার প্রেমিকা নোরা। দু'জনেই লম্বা। দু'জনেরই সোনালি চুল, চোখে একই ধরনের তারের ফ্রেমের চশমা এবং পরনে লম্বা কালো ওভারকোট। নোরা একটা কালো টুপিও পরেছিল, যার সরু তীক্ষ্ণ পালকগুলো তার রোগা মুখের, তীক্ষ্ণ রেখার সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। তার বাঁ হাত ডগলাসের হাতে ধরা ছিল। ডান হাতে ছিল গলায় লাল ফিতে বাঁধা কনিয়াকের একটা বোতল। সেটা সে টুইস্কলকে দিল।

"লনটা দারুণ, সঞ্জীব," ডগলাস মন্তব্য করল। "আমাদেরও পাতা জড়ো করার আঁকশিটা বের করতে হবে নোরা। আর ইনি নিশ্চয়..."

"আমার স্ত্রী, তনিমা।"

"আমাকে টুইস্কল বলেই ডাকতে পারো।"

"কী অদ্ভুত নাম," নোরা বলল।

টুইস্কল কাঁধ ঝাঁকাল। "এমন কিছু অদ্ভুত নয়। মুম্বইতে একজন অভিনেত্রী আছে যার নাম ডিম্পল কাপাডিয়া। এমনকী তার এক বোনও আছে যার নাম সিম্পল।"

ডগলাস এবং নোরা একসঙ্গে তাদের চোখ কপালে তুলে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, যেন উদ্ভট নামগুলো হজম করতে সময় লাগছে। "তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগল, টুইস্কল।"

"তোমরা শ্যাম্পেন নাও। অনেক আছে।"

"জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে কোরো না," ডগলাস বলল। "কিন্তু আমি বাইরে মূর্তিটা দেখলাম। তোমরা কি খ্রিশ্চান? আমি ভেবেছিলাম তোমরা ভারতীয়।"

AMARBOI.COM

"ভারতেও অনেক খ্রিশ্চান আছে," সঞ্জীব উত্তর দিল। "কিন্তু আমরা খ্রিশ্চান নই।"

"তোমার জামাটা আমার দারুণ লাগছে," নোরা টুইঙ্কলকে বলল।

"আর তোমার টুপিটা আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। এসো গ্র্যান্ড টুর শুরু করা যাক?"

দরজার বেল বাজল। তারপর বারবার বাজতে লাগল। মনে হল যেন, মুহূর্তের মধ্যে বাড়িটা নানা মানুষ, কথোপকথন এবং অপরিচিত সুবাসে ভরে উঠেছে। মেয়েদের পায়ে হিলতোলা জুতো এবং ফিনফিনে স্টকিং। পরনে ক্রেপ এবং শিফনের তৈরি খাটো কালো ড্রেস। তারা নিজেদের শাল এবং কোট সঞ্জীবকে দিল, সে জামাকাপড়গুলো সাবধানে কোটের প্রশস্ত দেওয়াল, আলমারির ভিতর হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখল। টুইঙ্কল অবশ্য সকলকে বলছিল যে, রোদ-পোহানো ঘরের ওটোম্যানের ওপর শাল-কোটগুলো ছুড়ে ফেললেই হবে। ভারতীয় মেয়েদের কেউ কেউ তাদের সবচেয়ে ভাল শাড়ি পরে এসেছিল। সূক্ষ্ম সোনালি কাজ করা, আঁচল মার্জিত ভঙ্গিতে কাঁধের ওপর পাট করা। পুরো হাতা জ্যাকেট, টাই পরে লেবুর গন্ধওয়ালা আফটারশেভ মেখে এসেছিল। সকলে এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নীচের হলের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা চেরি কাঠের টেবিলটা উপহারে বোঝাই হয়ে উঠল।

সঞ্জীবের আশ্চর্য লাগছিল ভেবে যে, তার জন্য, তার বাড়ির জন্য, তার স্ত্রীর জন্য সকলে এত কিছু করেছে। এর আগে শুধু তার বিয়েতেই এত কিছু হয়েছিল। কিন্তু এই উপলক্ষটি তার বিয়ের চেয়ে আলাদা। কারণ, এই অতিথিরা তার আত্মীয়স্বজন নয়। এদের সঙ্গে তার কোনও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই নেই। সুতরাং তার প্রতি এদের কোনও দায়দায়িত্ব বা কর্তব্যও নেই। সকলে তাকে অভিনন্দন জানাল। আর-এক সহকর্মী লেস্টার ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, খুব বেশি হলে আর দু'মাস, তারপরেই সঞ্জীব ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবে। সকলে চেটেপুটে শিঙাড়া খেল। নিয়মমতো ছাদ এবং দেওয়ালের নতুন রঙের, ঝুলন্ত গাছগুলোর, বে-উইন্ডোগুলোর এবং জয়পুরের সিল্ক-পেন্টিং-এর প্রশংসা করল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেল টুইঙ্কল, তার পিঠে নিচু খাঁজ কাটা, খেজুরগাছের রঙের ব্রোকেডের সালওয়ার কামিজ, নিপুণভাবে মাথায় পেঁচানো সাদা গোলাপের পাপড়ির

AMARBOI.COM

একটা ছোট্ট মালা এবং তার গলার নীলা বসানো মুক্তোর চোকার। টুইঙ্কলের তদারকিতে বাজানো ঝমঝমে জ্যাজ রেকর্ডের শব্দ ছাপিয়ে হাসির রোল উঠল। টুইঙ্কলকে ঘিরে অতিথিদের ভিড় বেড়েই চলেছিল। তার মন্তব্য এবং গল্প শুনে তারা হেসে উঠছিল। সঞ্জীব শিঙাড়াগুলো ওভেনে সমানভাবে গরম করল, অতিথিদের প্লেট ফাঁকা হলে শিঙাড়ার জোগান দিল, পানীয়র গ্লাসে বরফ ঢালল, একটু কষ্ট করে শ্যাম্পেনের আরও বোতল খুলল এবং বার চল্লিশেক বোঝাল যে, সে খ্রিশ্চান নয়। টুইঙ্কলই অতিথিদের আলাদা আলাদা দলে ঘোরানো সিঁড়ির ওপরে-নীচে নিয়ে গেল পিছনদিকের লন দেখানোর জন্য বা সেলারের সিঁড়িতে উঁকি মারার জন্য। একবার পরস্পরের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময়, টুইঙ্কল সঞ্জীবের পিঠে হাত রেখে বিজয়ীর স্বরে বলল, "আমার ঘরের পোস্টারটা তোমার বন্ধুদের দারুণ লেগেছে।"

সঞ্জীব ফাঁকা রান্নাঘরে ঢুকে, কেউ দেখছে না ভেবে হাত দিয়েই কাউন্টারের ওপরের থালা থেকে এক টুকরো মুরগির মাংস তুলে খেল। দ্বিতীয় টুকরো খাওয়ার পর সরাসরি বোতল থেকে এক ঢোঁক জিন গলায় ঢালল।

"দারুণ বাড়ি! দারুণ ভাত!" সুনীল, নামে একজন অ্যানাস্থেসিয়োলজিস্ট, কাগজের প্লেট থেকে চামচে করে খাবার মুখে পুরতে পুরতে রান্নাঘরে ঢুকল। "আর শ্যাম্পেন আছে?"

"তোমার স্ত্রী একেবারে ফাটাফাটি," সুনীলের পিছন পিছন ঢুকে প্রবাল যোগ করল। অবিবাহিত প্রবাল ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। এক মুহূর্ত শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর সঞ্জীবের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। একবার এক ডিনার পার্টিতে প্রবাল ঘোষণা করেছিল যে, সোফিয়া লরেন নাকি ফাটাফাটি। অড্রে হেপবার্নও। "ওর কোনও বোনটোন আছে নাকি?"

সুনীল ভাতের থালা থেকে একটা কিশমিশ তুলে নিল। "ওর পদবি কি লিটল স্টার?"

হেসে উঠে দু'জনে প্লাস্টিকের চামচ দিয়ে আরও ভাত তুলে খেতে শুরু করল। আরও পানীয় আনার জন্য সঞ্জীব সেলারে নামল। কয়েক মিনিটের জন্য সে সেলারের সিঁড়ির ওপর, ঠান্ডা, স্যাঁতসেঁতে নীরবতায় শ্যাম্পেনের দ্বিতীয় ঝুড়িটা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। মাথার ওপর অতিথিরা ঘুরে

AMARBOI.COM

বেড়াচ্ছিল। তারপর সে নতুন বোতলগুলো নিয়ে গিয়ে খাবার টেবিলের ওপর রাখল।

"হ্যাঁ, সবকিছু। সবকিছুই আমরা বাড়ির ভিতরেই খুঁজে পেয়েছি। একদম অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায়," বসার ঘর থেকে সে টুইঙ্কলের গলা পেল। "প্রতিদিনই প্রায় কিছু না কিছু পেয়ে যাই।"

"যাহ!"

"হ্যাঁ! প্রতিটি দিনই যেন গুপ্তধনের খোঁজ। এত দারুণ না, বলে বোঝাতে পারব না। ভগবানই জানেন আমরা আর কী খুঁজে পাব। আমি দ্ব্যর্থকভাবে কিছু বলতে চাইছি না।"

ব্যাপারটা সেই থেকেই শুরু হল। যেন কোনও অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী, অতিথিরা মিলে প্রতিটি ঘরের চিরুনিতল্লাশি শুরু করল। নিজে থেকেই দেওয়াল-আলমারির পাল্লা খুলে ফেলল, চেয়ারের তলায়, গদির তলায় উঁকিঝুঁকি দিল, পরদার পিছনে হাতড়ে দেখল, বইয়ের তাক থেকে বই সরিয়ে ফেলল। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপর-নীচে খিলখিল করে হাসতে হাসতে, টলতে টলতে বিভিন্ন দল দৌড়োদৌড়ি শুরু করল।

"চিলেকোঠার ঘরটা আমাদের খুঁজে দেখা হয়নি," টুইঙ্কল হঠাৎ ঘোষণা করল। অতএব সকলে তার পিছন পিছন ছুটল।

"ওখানে উঠব কী করে?"

"হলওয়েতে একটা মই আছে। ছাদের কোথাও একটা।"

সঞ্জীব অবসন্নভাবে ভিড়ের পিছন পিছন গেল কোথায় মই রাখা আছে দেখিয়ে দেবে বলে। কিন্তু টুইঙ্কল ইতিমধ্যে নিজেই সেটা খুঁজে বের করে ফেলেছিল। "ইউরেকা!" সে চিৎকার করে উঠল।

ডগলাস চেন টেনে সিঁড়ির ধাপগুলো নামিয়ে আনল। তার মুখ রক্তিম হয়ে গিয়েছিল এবং সে মাথায় নোরার পালকের টুপিটা পরেছিল। অতিথিরা এক এক করে অদৃশ্য হয়ে গেল। পুরুষেরা মইয়ের সরু ধাপে মেয়েদের উঁচু হিল পরে উঠতে সাহায্য করল। ভারতীয় মেয়েরা তাদের দামি শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিল। পুরুষেরাও পিছন পিছন চলল। সকলে চট করে চিলেকোঠার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ঘোরানো সিঁড়ির নীচে সঞ্জীব একা দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথার ওপর পায়ের শব্দ দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। ওপরের দলে যোগ দিতে তার কোনও ইচ্ছে হল না। সে ভাবল

AMARBOI.COM

ছাদটা ধসে পড়বে কি না। মুহূর্তের জন্য কল্পনা করল সেই সব মাতাল, সুবাসিত দেহগুলো হুড়মুড় করে তার চারপাশে জড়াজড়ি করে পড়ে গেলে কেমন লাগবে। সে একটা চিৎকার শুনতে পেল। তারপর বেসুরোভাবে হাসির রোল উঠে ছড়িয়ে পড়ল। কিছু একটা পড়ে গেল। কিছু একটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। কোনও এক ট্রাঙ্ক নিয়ে হট্টগোল শোনা গেল। ওপরে ওরা বোধহয় ট্রাঙ্কটা খোলার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, দুমদাম করে সেটার ঢাকাটা পিটিয়ে যাচ্ছিল।

তার মনে হল টুইঙ্কল হয়তো তাকে সাহায্য করার জন্য ডাকবে, কিন্তু তার ডাক এল না। সে চারপাশে, হলওয়ে এবং নীচের ল্যান্ডিং-এর দিকে তাকিয়ে শ্যাম্পেন গ্লাস, আধখাওয়া শিঙাড়া, এবং প্রতিটি কোণে, সবকিছুর ওপর পড়ে থাকা লিপস্টিক লাগা ন্যাপকিনগুলো দেখল। লক্ষ করল যে, তাড়াহুড়োয় টুইঙ্কল তার জুতোজোড়া মইয়ের নীচে খুলে রেখে গিয়েছে। কালো রঙের পেটেন্ট-লেদারের চটি দুটোর হিল গল্‌ফ খেলার টি-এর আকারের। সামনে, আঙুলের অংশ খোলা। ভিতরে সিল্কের লেবেলগুলো সামান্য নোংরা হয়ে গিয়েছিল। মই দিয়ে নামতে গিয়ে যাতে কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে না যায়, সেই জন্য সঞ্জীব জুতোগুলো তাদের শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে সরিয়ে রাখল।

সে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে কিছু খোলা হল শুনতে পেল। কর্কশ কণ্ঠস্বরগুলো এক মৃদু গুঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। সঞ্জীবের মনে হল যে, সে এখন বাড়িতে কার্যত একা। রেকর্ডটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। চেষ্টা করলে সে ফ্রিজের চাপা আওয়াজ, বাইরে গাছের পাতার খসখসানি এবং জানলার কাচে গাছের ডালের টোকাও শুনতে পাচ্ছিল। সে একবার হাত নাড়ালেই মইটা স্প্রিং-এ ছিটকে উঠে আবার ছাদের সঙ্গে আটকে যাবে। তারপর যদি সে আবার চেন টেনে না দেয়, তা হলে অতিথিদের নেমে আসার আর কোনও উপায়ই থাকবে না। সে ভেবে দেখল যে, একা, কোনও বাধা-বিরক্তি ছাড়া সে কী কী করতে পারে। সে টুইঙ্কলের জমা করা জঞ্জাল একটা ময়লা ফেলার ব্যাগে ঢেলে, গাড়ি চালিয়ে গিয়ে ডাম্পে ফেলে আসতে পারে। ক্রন্দনরত যিশুর পোস্টারটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে, অথবা একটা হাতুড়ি নিয়ে ভার্জিন মেরিকে ভাঙতে পারে। তারপর সে ফাঁকা বাড়িতে ফিরে আসবে। খুব সহজেই সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাপ আর প্লেটগুলো পরিষ্কার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলতে পারে। নিজের জন্য একটা জিন আর টনিক ঢেলে, এক প্লেট গরম ভাত খেতে খেতে বাখের নতুন সিডিটা শুনতে পারে। তার সঙ্গে, বাখের সংগীত ভাল করে বোঝার জন্য লাইনার নোটসগুলোও পড়বে। সে মইটায় আলতো ধাক্কা দিল। কিন্তু মইটা মেঝের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেটা সরাতে গেলে যথেষ্ট জোর দিতে হবে।

"ওহ ভগবান, আমার একটা সিগারেট চাই," টুইঙ্কল ওপর থেকে বলে উঠল।

সঞ্জীবের মনে হল যেন তার ঘাড়ের পিছনে গিঁট পড়ছে। তার মাথা ঘুরতে লাগল, ইচ্ছে হল শুয়ে পড়ে। সে শোওয়ার ঘরের দিকে এগোল, কিন্তু দরজার কাছে টুইঙ্কলের জুতোজোড়া দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে কল্পনা করল টুইঙ্কল চটিগুলোয় পা গলাচ্ছে। কিন্তু এ বাড়িতে একসঙ্গে থাকতে আসার পর থেকে সে যত বিরক্তি অনুভব করছিল, টুইঙ্কলের কথা ভেবে আর তেমন বিরক্ত লাগল না তার। বরং টুইঙ্কল ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে টলমল করে ছুটে নামছে, মেঝেতে তার পায়ের সামান্য আঁচড় পড়ছে ভেবে, হঠাৎ এক ঝলক প্রত্যাশার ব্যথায় তার বুক মুচড়ে উঠল। লিপস্টিক উজ্জ্বল করার জন্য টুইঙ্কল ছুটে বাথরুমে যাচ্ছে, ছুটে গিয়ে সকলকে তাদের কোট এনে দিচ্ছে এবং অবশেষে হাউসওয়ার্মিংএ পাওয়া উপহারগুলো খুলে দেখার জন্য চেরিকাঠের টেবিলটার কাছে ছুটে যাচ্ছে ভেবে ব্যথাটা আরও তীব্র হল। বিয়ের আগে, কথা বলার পর ফোন নামিয়ে রেখে বা এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে আকাশে কোনও প্লেনে টুইঙ্কল বসে আছে ভাবতে ভাবতে সঞ্জীব এমনই ব্যথা অনুভব করত।

"সাঁজ, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না।"

সঞ্জীবের দিকে পিছন ফিরে টুইঙ্কল হাত দুটো মাথার ওপর উঠিয়ে নেমে আসছে। অনাবৃত কাঁধ দুটো ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছে। সে হাতে কী ধরেছিল তখনও দেখা যাচ্ছিল না।

"তুমি ঠিক করে ধরেছ তো, টুইঙ্কল?" কেউ একজন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, তুমি ছেড়ে দিতে পারো।"

তখন সঞ্জীব দেখতে পেল যে জিনিসটা টুইঙ্কল জড়িয়ে ধরেছিল। নিরেট রুপোর যিশুর আবক্ষ মূর্তি। মাথাটা হেসেখেলে সঞ্জীবের মাথার তিন গুণ বড় হবে। নাকটা অভিজাতসুলভ ফোলা, চমৎকার কোঁকড়ানো চুল নেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে কণ্ঠার স্পষ্ট জেগে ওঠা হাড়ের ওপর। প্রশস্ত কপালে চারপাশের দেওয়াল, দরজা, ল্যাম্পশেড সবকিছুর ক্ষুদ্র প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। অভিব্যক্তিতে আত্মবিশ্বাসের ছাপ, যেন তার ভক্তদের সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। অনমনীয় ঠোঁট দুটো ভরাট এবং আবেগপ্রবণ। মাথায় নোরার পালকের টুপি। টুইঙ্কল নামার সময় তার ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য সঞ্জীব তার কোমর জড়িয়ে ধরল। সে মাটিতে নেমে আসার পর সঞ্জীব তার হাত থেকে মূর্তিটা নিয়ে নিল। কম করে ত্রিশ পাউন্ড ওজন হবে জিনিসটার। বাকিরাও আস্তে আস্তে নামতে শুরু করল। সকলেই তল্লাশি করে বিধ্বস্ত। কয়েকজন সেলারের দিকে নেমে গেল আর-এক পেগ তাজা পানীয়র জন্য।

টুইঙ্কল নিশ্বাস নিয়ে, ভুরু উঠিয়ে আঙুল ক্রস করল। "তোমার কি খুব খারাপ লাগবে যদি এটা ম্যান্টেলের ওপর রাখি? শুধু আজ রাতটার জন্য? আমি জানি তোমার খুব খারাপ লাগবে।"

সঞ্জীবের সত্যিই খারাপ লাগছিল। মূর্তিটার বিশালত্ব, নিখুঁত, মসৃণ ত্বক এবং তর্কাতীত মূল্য তার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। সে সহ্য করতে পারছিল না যে, মূর্তিটা তার বাড়িতে রয়েছে এবং সে সেটার মালিক। মূর্তিটা খুঁজে-পাওয়া অন্যান্য জিনিসগুলোর মতো নয়। এটার একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য আছে, মর্যাদা আছে, এমনকী সৌন্দর্যও আছে। কিন্তু সে অবাক হয়ে ভাবল যে, এই গুণগুলোই মূর্তিটার প্রতি তার বিদ্বেষ বাড়িয়ে তুলছে। আর তার অপছন্দের সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, সে জানত টুইঙ্কল মূর্তিটাকে ভালবেসে ফেলেছে।

"কাল থেকে আমি এটা আমার স্টাডিতে রাখব," টুইঙ্কল যোগ করল। "কথা দিচ্ছি।"

সঞ্জীব জানত যে, টুইঙ্কল কোনওদিন মূর্তিটা তার স্টাডিতে রাখবে না। তাদের যৌথজীবনের বাকি দিনগুলো মূর্তিটা ম্যান্টেলের মধ্যিখানে রাখবে। দু'পাশে বাকি জিনিসগুলো মূর্তিটার শোভাবর্ধন করবে। যখনই তাদের বাড়িতে কোনও অতিথি আসবে, তখনই টুইঙ্কল তাদের শোনাবে যে, কী করে সে মূর্তিটা খুঁজে পেয়েছিল। অতিথিরা গল্প শুনে তার প্রশংসা করবে। সে টুইঙ্কলের চুলে মূর্ছিত গোলাপের পাপড়ি, গলার মুক্তো এবং নীলার চোকার এবং পায়ের নখে চকচকে লাল পালিশের দিকে তাকিয়ে। মনে-মনে যে জিনিসগুলোর জন্য প্রবালের টুইঙ্কলকে ফাটাফাটি লেগেছে, এগুলোও

AMARBOI.COM

তার একটা কারণ। জিনের প্রভাবে তার মাথা ঝিমঝিম করছিল। হাত ব্যথা করছিল মূর্তিটার ভারে। সে বলল, "তোমার জুতোগুলো বেডরুমে রেখেছি।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু আমার পায়ে ভীষণ লাগছে," টুইঙ্কল সঞ্জীবের কনুইয়ে একটা আলতো চাপ দিয়ে বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

সঞ্জীব সেই প্রকাণ্ড রুপোলি মুখটা নিজের বুকে চেপে ধরে, পালকের টুপিটা যাতে মাথা থেকে না পড়ে, সে দিকে খেয়াল রেখে টুইঙ্কলের পিছন পিছন চলল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবি হালদারের চিকিৎসা

বিবি হালদার তার উনত্রিশ বছরের জীবনের অধিকাংশ সময়টাই এমন এক অসুখে ভুগে কাটিয়েছিল, যা তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, পুরোহিত, জ্যোতিষী, অমুক-তমুক 'মা', রত্ন বিশেষজ্ঞ, দৈবজ্ঞ এবং মূর্খদের ধন্দে ফেলে দিয়েছিল। তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য আমাদের শহরের উদ্বিগ্ন লোকেরা সাতটি পবিত্র নদী থেকে পবিত্র জল তাকে এনে দিয়েছিল। রাতে যখন তার চিৎকার এবং যন্ত্রণা শুনতে পাওয়া যেত, যখন দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে তার গায়ে ঝাঁজালো পুলটিস চেপে ধরা হত, তখন আমরা তার জন্য প্রার্থনা করতাম। গুণিনরা তার কপালে ইউক্যালিপটাস মলম মাসাজ করে দিয়েছিলেন। ভেষজ নির্যাসের তাপ মুখে লাগিয়েছিলেন। একজন অন্ধ খ্রিস্টান ভদ্রলোকের পরামর্শমতো একবার বিবিকে ট্রেনে করে সন্ত এবং শহিদদের সমাধি চুম্বন করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার হাত এবং গলায় নানা তাবিজ তাকে কুনজর থেকে রক্ষা করত। শুভ রত্ন বসানো আংটি আঙুলের শোভাবর্ধন করত।

ডাক্তারদের চিকিৎসায় ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে গিয়েছিল। অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদিক— এক-এক করে সবরকমের চিকিৎসাই করে দেখা হয়েছিল। উপদেশের অন্ত ছিল না। এক্স-রে, প্রোব, স্টেথোস্কোপ, ইঞ্জেকশন হয়ে যাওয়ার পর কেউ বিবিকে উপদেশ দিলেন ওজন বাড়ানোর জন্য, তো কেউ বললেন ওজন কমাতে। একজন যদি বললেন ভোরবেলার পর না ঘুমোতে, তো আর-একজন জোর দিয়ে বললেন তার দুপুর পর্যন্ত শুয়ে থাকা উচিত। ইনি বললেন মাথার ওপর দাঁড়াতে, তো উনি বললেন সারাদিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বেদের মন্ত্র জপ করতে। "সম্মোহনের জন্য কলকাতায় নিয়ে যাও," এমনও প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেউ কেউ। এক বিশেষজ্ঞ থেকে আর এক বিশেষজ্ঞের কাছে ঘুরতে ঘুরতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটাকে রসুন ছেড়ে দেওয়ার, তেতো খাওয়ার, ধ্যান করার, ডাবের জল খাওয়ার এবং হাঁসের কাঁচা ডিম দুধে ফেটিয়ে গিলে ফেলার মতো বিভিন্ন বিধিনির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মোটের ওপর, বিবির জীবনটা একের পর এক রোগপ্রতিষেধক ওষুধের ব্যর্থ মোকাবিলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিবি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ত। আর অসুখের ধরনটা এমনই ছিল যে, একটা রঙহীন চারতলা বিল্ডিং-এর মধ্যেই তার জগৎটা আটকে পড়েছিল। বিল্ডিং-এর তিনতলায় বিবির এক বড় দাদা এবং তার স্ত্রী একটা ভাড়ার ফ্ল্যাটে থাকত, তারাই একমাত্র তার কাছাকাছি থাকত। যে-কোনও সময় অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে এবং নির্লজ্জ প্রলাপ বকতে শুরু করতে পারে বলে বিবিকে একলা রাস্তা পার হতে বা ট্রামে চড়তেও দেওয়া হত না। আমাদের বিল্ডিং-এর ছাদের ভাঁড়ারঘরে বসে তার সময় কাটত। ঘরটায় বসা হয়তো যেত, কিন্তু ভাল করে দাঁড়ানো যেত না। সঙ্গে লাগোয়া একটা বাথরুম ছিল। ঘরে ঢোকার মুখে পরদা টাঙানো, গরাদবিহীন একটা জানলা আর পুরনো দরজার তক্তা ভেঙে বানানো কয়েকটা তাক। এই ঘরে, একটা চারচৌকো চটের ওপর বাবু হয়ে বসে, বিবি তার দাদা হালদারের কসমেটিকসের দোকানের জিনিসপত্রের তালিকা লিখে রাখত। বিবির দাদাই আমাদের উঠোনের মুখের দোকানটার মালিক ছিল এবং নিজেই দোকানটা চালাত। এই কাজ করার জন্য বিবি কোনও মাইনে পেত না। কিন্তু খাবার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং প্রতি অক্টোবরের ছুটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুতির কাপড় দেওয়া হত, যাতে প্রয়োজনমতো জামাকাপড় বানিয়ে নিতে পারে। রাতে সে নীচের তলায় একটা ক্যাম্পখাটে ঘুমোত।

সকালবেলায় বিবি ভাঁড়ারঘরে এসে হাজির হত। পায়ে ফেটে যাওয়া প্লাস্টিকের চটি। গায়ে একটা হাউসকোট, যেটা হাঁটুর কয়েক ইঞ্চি নীচে গিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে। ওই ঝুলের জামা আমরা পনেরো বছর বয়সের পর কখনও পরিনি। ওর রোমহীন পায়ে ফ্যাকাশে মেচেতার দাগ ছিল অনেক। আমরা যখন ভেজা জামাকাপড় শুকোতে দিতাম বা মাছের আঁশ ছাড়াতাম, তখন সে তার ভাগ্য নিয়ে হা-হুতাশ করত। বিবি সুন্দরী ছিল না। তার ওপরের ঠোঁট ছিল বড্ড পাতলা, দাঁতগুলো বড্ড ছোট। কথা বলার সময় তার মাড়ি দেখতে পাওয়া যেত। "তোমরাই বলো তো এটা কি ঠিক? একটা মেয়ে, সারা জীবন বসে কাটাচ্ছে। কোনও দেখাশোনা নেই, কোনও ভবিষ্যৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই, শুধু লেবেল সেঁটে আর দাম লিখে দিন কেটে গেল?" তার কণ্ঠস্বর বেশ জোরালো ছিল যেন সে কানে খাটো কারও সঙ্গে কথা বলছে। "আমার তোমাদের দেখে যদি হিংসে হয়, সেটা কি অন্যায়? তোমরা সব মা-বউরা, ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত! আমার চোখে শ্যাডো লাগাতে চাওয়া, চুলে গন্ধ মাখতে চাওয়া কি খারাপ? একটা ছেলে মানুষ করব, তাকে টক থেকে মিষ্টি আলাদা করতে শেখাব, ভাল-খারাপ বাছবিচার করতে শেখাব, এসব চাওয়া কি খারাপ?"

প্রতিদিন বিবি তার অফুরন্ত অভাব-বঞ্চনার কথা আমাদের শোনাত। শেষে একটা কথা সহ্যাতীতভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার একটা পুরুষ চাই। সে চায় কেউ তার হয়ে কথা বলুক, তাকে রক্ষা করুক। সে-ও তার নিজস্ব জীবনযাপন করতে পারুক। আমাদের মতো সে-ও চাইত খাবার বেড়ে দিতে, চাকরবাকরদের বকাঝকা করতে আর আলমারিতে একটু টাকা সরিয়ে রাখতে, যাতে প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর চাইনিজ বিউটি পার্লারে ভুরু প্লাক করতে পারে। সে আমাদের বিয়ের খুঁটিনাটি শোনার জন্য বিরক্ত করত। গয়নাগাটি, নেমন্তন্ন, ফুলশয্যার খাটের ওপর ঝোলানো রজনীগন্ধার সুবাস। সে খুব জোর করলে আমরা যখন তাকে আমাদের প্রজাপতির নকশা করা বিয়ের অ্যালবাম দেখাতাম, তখন সে অনুষ্ঠানের ছবিগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ত। আগুনে ঘি ঢালা, মালাবদল, সিঁদুর রাঙানো মাছ, শাঁখ আর রুপোর টাকার ট্রে। "অনেক লোক এসেছিল তো," সে বলত। ছবিতে আমাদের ঘিরে থাকা মুখগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে দিত। "যখন আমার বিয়ে হবে, তখন তোমরা সকলে আসবে।"

বিয়ের ভাবনা বিবিকে এতই ভীষণভাবে পীড়িত করতে লাগল যে, মাঝে মাঝে ভয় হত, যে বরের সঙ্গে তার সব আশা জড়িয়ে ছিল, তার চিন্তাই না তাকে আবার অসুস্থ করে ফেলে। ভাঁড়ার ঘরের মেঝেতে, পাউডারের টিন আর ববি পিনের বাক্সের মাঝখানে বিবি গুঁজড়ে মুজড়ে শুয়ে আবোলতাবোল বকত। "আমি কখনও দুধে পা ডোবাতে পারব না," সে ফোঁপাত। "আমার মুখে কখনও চন্দন লাগানো হবে না। কে আমার গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেবে? কোনও কার্ডে কখনও আমার নাম লাল কালিতে ছাপা হবে না।"

বিবির স্বগতোক্তি এবং চিন্তাভাবনাগুলো বিরক্তিকর রকমের ভাবপ্রবণ ছিল। জ্বরোভাবের মতো একটা অসুস্থতাবোধ যেন তার গা থেকে ঝরে

AMARBOI.COM

পড়ত। তার সবচেয়ে তিক্ত মুহূর্তগুলোয় আমরা তার গায়ে শাল জড়িয়ে, চৌবাচ্চার কল খুলে তার মুখ ধুইয়ে দিতাম। গেলাসে করে গোলাপজল দেওয়া দইয়ের ঘোল এনে দিতাম। সে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো অবস্থায় থাকলে আমরা তাকে উৎসাহ দিতাম আমাদের সঙ্গে দর্জির কাছে গিয়ে নতুন সায়া-ব্লাউজ বানাতে। এতে বিবির কিছুটা হাওয়াবদলও হত। আর আমরা মনে করতাম যে, এতে তার বিয়ে হওয়ার সুযোগ একটু বাড়বে। "কোনও ছেলেই এমন কোনও মেয়েকে চায় না যে বাসন মাজার লোকের মতো জামাকাপড় পরে থাকে," আমরা তাকে বলতাম। "তুই কি চাস তোর সব কাপড় পোকায় খেয়ে শেষ করুক?" বিবি মুখ ভার করত, আপত্তি জানাত, দীর্ঘশ্বাস ফেলত। "আমি কোথায় যাব? কার জন্য সাজগোজ করব?" সে জানতে চাইত। "কে আর আমায় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়? চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায়? সোডা আর কাজুবাদাম কিনে দেয়? তোমাদের মানতেই হবে যে, এগুলো আমার ভাবা উচিত নয়। আমি কখনওই ঠিক হব না। কখনওই আমার বিয়ে হবে না।"

কিন্তু তারপর বিবির জন্য এক নতুন চিকিৎসার খোঁজ পাওয়া গেল। সবচেয়ে উদ্ভট, সবচেয়ে সাংঘাতিক চিকিৎসা। এক সন্ধেবেলা, খাবার খেতে যাওয়ার সময় বিবি চারতলার ল্যান্ডিং-এ পড়ে গিয়ে ঘুষি মারতে লাগল, পা ছুড়তে লাগল। গলগল করে ঘামছিল, তার কোনও কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সিঁড়ি পেরিয়ে তার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। তালপাতার পাখা, চিনির ডেলা আর তার মাথায় ঢালার জন্য ফ্রিজের ঠান্ডা জল নিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম তাকে শান্ত করতে। ছেলেমেয়েরা বিবির ফিট দেখতে সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাকরবাকরদের পাঠানো হল বিবির দাদাকে ডেকে আনার জন্য। দশ মিনিট কেটে যাওয়ার পর হালদার তার দোকান থেকে বেরোল। তার মুখ লাল, কিন্তু নির্বিকার। সে আমাদের বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে বলল। তারপর নিজের অবজ্ঞা ঢাকার কোনও চেষ্টা না করে বিবিকে একটায় রিকশায় চাপিয়ে পলিক্লিনিকে পাঠিয়ে দিল। সেখানেই, নানারকম রক্তপরীক্ষা করার পর, বিবির ডাক্তার বীতশ্রদ্ধ হয়ে বললেন যে, একমাত্র বিয়ে দিলেই বিবির অসুখ সারতে পারে।

আমাদের জানলার গরাদ, কাপড় শুকোতে দেওয়ার দড়ি, ছাদের কার্নিশে ছড়িয়ে থাকা পায়রার নোংরা, সবকিছুর মধ্যে দিয়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দিন সকালের মধ্যেই, তিনজন দৈবজ্ঞ বিবির হাত দেখে নিশ্চিত জানিয়ে দিল যে, বিবির হাতে আসন্ন বিয়ের রেখা আছে। কাটলেট স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে, একটু নোংরা ধরনের, কয়েকজন কয়েকটী অশালীন মন্তব্য করল। দিদিমা-ঠাকুমারা পাঁজি দেখে বিয়ের জন্য শুভ লগ্ন খুঁজতে শুরু করলেন। অনেক দিন ধরে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যেতে যেতে, ধোপার কাছে জাপাকাপড় নিতে নিতে, রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়িয়ে, আমরা ফিসফাস করলাম। আপাতদৃষ্টিতে, এতদিন বিবির কোনও সাংসারিক কাজেরই দরকার ছিল। সেই প্রথম, আমরা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম হাউসকোটের তলায় বিবির দেহরেখা কেমন হতে পারে। পুরুষমানুষকে সে কেমন সুখ দিতে পারে তা আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। সেই প্রথম আমরা লক্ষ করলাম তার পরিষ্কার ত্বক, তার লম্বা ঢুলুঢুলু চোখের পাতা, তার অনস্বীকার্যভাবে সুডৌল বাহু। "ডাক্তার বলছে এটাই নাকি একমাত্র আশা। সমস্যাটা অতি-উত্তেজনা। বলছে," এখানে আমরা একটু থেমে যেতাম। লজ্জায় লাল হয়ে যোগ করতাম, "কোনও সম্পর্ক হলে তবেই ওর রক্ত শান্ত হবে।"

বলাই বাহুল্য, বিবি এই রোগনির্ণয়ে অত্যন্ত পুলকিত বোধ করছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিত জীবনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। হালদারের দোকানের কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসপত্র দিয়ে সে তার পায়ের নখ পালিশ করল, কনুইয়ের চামড়া নরম করল। ভাঁড়ারঘরে নতুন আসা মালপত্র অবহেলা করে সে আমাদের পিছনে পড়ল বিভিন্ন রান্না শেখার জন্য। সিমাইয়ের পায়েস, পেঁপের স্টু ইত্যাদি রান্নাগুলো সে আঁকাবাঁকা অক্ষরে তার হিসেবখাতার পাতায় লিখে রাখল। অতিথির তালিকা, মিষ্টির তালিকা, কোথায় মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যাবে সেই সব জায়গার তালিকা, সবই তৈরি করল সে। ঠোঁট মসৃণ করার জন্য গ্লিসারিন লাগাল, ওজন কমাবে বলে মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিল। একদিন সে আমাদের একজনকে বলল তাকে দর্জির কাছে নিয়ে যেতে, সেখানে সে সেই সময়ের ফ্যাশন অনুযায়ী একটা নতুন আমব্রেলা-কাট সালওয়ার কামিজ করতে দিল। রাস্তায় সে আমাদের প্রতিটি গয়নার দোকানে টেনে নিয়ে যেত, দোকানের কাচের জানলার মধ্যে উঁকি মেরে দেখত, টায়রার নকশা আর লকেটের সেটিং সম্পর্কে আমাদের মতামত চাইত। শাড়ির দোকানে সে একটা ম্যাজেন্টা রঙের, একটা ফিরোজা

AMARBOI.COM

রঙের আর-একটা গাঁদাফুল রঙের বেনারসি দেখাল। "প্রথম দিন এইটা পরব। তারপর এটা, তারপর ওইটা।"

কিন্তু হালদার এবং তার বউ ভিন্নমত পোষণ করত। তারা বিবির কল্পনার প্রতি উদাস, আমাদের আশঙ্কার প্রতি নিস্পৃহ ছিল। তাদের ওয়ার্ডরোবের মাপের কসমেটিক্সের দোকানটার তিন দিকের দেওয়ালে হেনা, চুলের তেল, পিউমিস, ফেয়ারনেস ক্রিম ঠাসা থাকত। আর সেখানে একসঙ্গে বসে তারা আগের মতোই ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। বিবির স্বাস্থ্য নিয়ে কেউ কোনও কথা তুললেই হালদার উত্তর দিত, "আমার এসব উলটোপালটা পরামর্শ শোনার সময় নেই। যা সারানো যাবে না তা সহ্য করতে হবে। বিবি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ভুগিয়েছে, যথেষ্ট টাকা খরচ করিয়েছে। পরিবারের নাম নষ্ট করেছে।" হালদারের বউ কাচের ছোট্ট কাউন্টারটার পিছনে বরের পাশে বসে নিজেকে পাখা করতে করতে মাথা নাড়ত। হালদারের বউয়ের শরীরটা ভারী ছিল। সে সবসময় নিজের গায়ের রঙের চেয়ে বেশি ফ্যাকাশে পাউডার ব্যবহার করত যার একটা প্রলেপ তার গলার ভাঁজে ভাঁজে আটকে থাকত। "তা ছাড়া, কে ওকে বিয়ে করবে? মেয়েটা তো কোনও কিছুই জানে না। উলটোপালটা কথা বলে। প্রায় ত্রিশ বছর বয়স হতে চলল অথচ একটা কয়লার স্টোভ জ্বালাতে পারে না, ভাত রাঁধতে পারে না, মৌরি-জিরের মধ্যে তফাত করতে পারে না। একটা পুরুষমানুষকে রেঁধে খাওয়াতে গেলে কী কাণ্ড করবে ভেবে দেখো!"

তাদের কথাতেও কিছু সত্যি ছিল। বিবিকে কখনও একজন স্বাভাবিক মেয়ের মতো হতে শেখানোই হয়নি। তার অসুস্থতার জন্য রোজকার জীবনের বেশিরভাগ কাজে সে অনুপযুক্ত ছিল। হালদারের বউয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিবির ওপর শয়তান ভর করেছে। সে বিবিকে আগুনের থেকে দূরে রাখত। চার জায়গায় সেফটিপিন না আটকে কী করে শাড়ি পরতে হয় তা বিবি শেখেনি। সে যে খুব ভাল এমব্রয়ডারি বা শালে ক্রোসের কাজ করতে পারত, তা-ও নয়। তার টিভি দেখার অনুমতি ছিল না (হালদার ধরে নিয়েছিল যে, টিভির ইলেকট্রনিক গুণাগুণ বিবিকে উত্তেজিত করবে), তাই আমাদের জগতের সংবাদ বা বিনোদন, কোনওটা সম্পর্কেই সে কিছু জানত না। নবম শ্রেণির পরই তার পড়াশোনার আনুষ্ঠানিক পাট চুকে গিয়েছিল।

বিবির খাতিরেই আমরা তার জন্য বর খোঁজার পক্ষে কথা বলতাম। "এটাই ওর দরকার ছিল এতদিন ধরে," আমরা বোঝালাম। কিন্তু হালদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তার বউকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছিল না। যে-সুতো দিয়ে তারা তাদের দোকানের জিনিস বেঁধে দিত, তাদের ঠোঁটগুলো যেন সেই সুতোর চেয়েও সরু ছিল। আর বিবির প্রতি তিক্ততা যেন তাদের ঠোঁটে লেগে থাকত। আমরা যখন বললাম যে, নতুন চিকিৎসাটা চেষ্টা করে দেখা উচিত, তখন তারা উলটে বলল, "বিবির আত্মসম্মানবোধ বা নিজের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই। ও ইচ্ছে করে অসুখটা বেশি বেশি করে দেখায়, লোকের নজরে পড়ার জন্য। ওকে ব্যস্ত রাখতে পারলেই সবচেয়ে ভাল। যে-সব ঝামেলা পাকায়, তার থেকে দূরে থাকবে তা হলে।"

"তাই যদি হয়, তা হলে ওর বিয়ে দিচ্ছ না কেন? অন্তত তোমার ঝামেলা তো কমবে?"

"আর আমাদের লাভের টাকা ওর বিয়েতে নষ্ট করি আর কী! লোকজন খাওয়ানো, গয়নাগাটি অর্ডার দেওয়া, খাট কিনে দেওয়া আর পণের টাকা?"

কিন্তু বিবির অভিযোগ কমল না। একদিন বেলার দিকে, আমাদের তদারকিতে একটা বেগুনি শিফনের শাড়ি পরে আর সেই বিশেষ উপলক্ষে তাকে ধার দেওয়া কার একটা কাচ বসানো চটি পায়ে গলিয়ে সে ব্যস্ত এলোমেলো পায়ে হালদারের দোকানে গিয়ে বলল তাকে যেন ফোটোগ্রাফারের স্টুডিয়োয় নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে অন্যান্য বিবাহযোগ্য পাত্রীদের মতো তারও ফোটো উপযুক্ত ছেলেদের বাড়িতে চক্কর লাগাতে পারে। আমরা জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাকে দেখছিলাম। ইতিমধ্যে তার বগলে কালো চাঁদের মতো ঘামের দাগ হয়ে গিয়েছিল। "এক্স-রে ছাড়া আমার কখনও কোনও ছবি তোলা হয়নি," সে ক্ষুব্ধ স্বরে বলল। "ছেলের বাবা-মা'র তো জানা দরকার আমাকে কেমন দেখতে।" কিন্তু হালদার কিছুতেই রাজি হল না। সে বলল যে, যার খুশি সে-ই এসে বিবিকে দেখে যেতে পারে, কেমনভাবে সে চিৎকার করে কান্নাকাটি করে দোকানের গ্রাহকদের তাড়িয়ে দেয়। সে বলল বিবি নাকি তার ব্যাবসার সর্বনাশ করছে। আসলে একটা দায়, লোকসান ছাড়া কিছুই নয় সে। এ শহরে কাকে আবার বিবির ফোটো দেখে সে কথা জানতে হবে?

পরের দিন থেকে বিবি দোকানের হিসেব করা একেবারেই বন্ধ করে দিল। তার বদলে সে হালদার এবং তার বউয়ের সম্পর্কে অসংগত খুঁটিনাটি জানিয়ে আমাদের চরিতার্থ করতে লাগল। "রোববার রোববার ও বউয়ের

AMARBOI.COM

চিবুক থেকে চুল তুলে দেয়। ওরা ওদের টাকাপয়সা ফ্রিজের মধ্যে তালাচাবি লাগিয়ে রেখে দেয়।" আশপাশের ছাদে শোনানোর জন্য সে গটগট করে পায়চারি করা আর চিৎকার-চেঁচামেচি করা শুরু করল। তার প্রতিটি ঘোষণার সঙ্গে শ্রোতার সংখ্যা বাড়ছিল। "চান করার সময় হালদারের বউ হাতে কাবলিছোলার গুঁড়ো মাখে। ভাবে তাতে ও ফরসা হবে। ওর ডান পায়ের তিন নম্বর আঙুলটা নেই। ওরা দুপুরবেলা এতক্ষণ ধরে ঘুমোয় কারণ, বউকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না।"

বিবিকে শান্ত করার জন্য, শহরের খবরের কাগজে হালদার পাত্রের খোঁজে একটা এক লাইনের বিজ্ঞাপন দিল। "মেয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন, উচ্চতা ১৫২ সেন্টিমিটার, পাত্র চাই।" পাত্রীর পরিচয় কোনও ছেলের মা-বাবার কাছেই গোপন ছিল না। কোনও পরিবারই এত বড় ঝুঁকি নিতে চাইত না। তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। অনেকেই বলত যে, বিবি নিজের সঙ্গে অনর্গল কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অবোধ্য ভাষায় বাক্যালাপ করে। সে নাকি ঘুমিয়ে কোনও স্বপ্ন দেখে না। মাত্র চারটে দাঁতওয়ালা যে বিপত্নীক নিঃসঙ্গ লোকটি বাজারে আমাদের ব্যাগ সেলাই করে দিত, সে পর্যন্ত বিবিকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে রাজি হল না। তা সত্ত্বেও, বিবির মন ভোলানোর জন্য আমরা তাকে বিবাহিত মেয়ের উপযুক্ত চালচলন শেখাতে লাগলাম। "ভাতের হাঁড়ির মতো মুখ করে থাকলে কোনও লাভই হবে না। ছেলেরা চায় যে, তুই তোর মুখের ভাব দিয়েই তাদের সোহাগ দেখা।" কোনও সম্ভাব্য পাত্রের সঙ্গে যদি দেখা হয়, সেই ভেবে আমরা তাকে আশপাশের পুরুষমানুষদের সঙ্গে অল্পস্বল্প কথোপকথন অভ্যেস করতে বললাম। তাকে উপদেশ দিলাম, জলওয়ালা যখন সারা পাড়া ঘুরে তাকে জল দিতে আসবে, তখন বিবি যেন তাকে বলে, "কেমন আছ?" যখন কয়লাওয়ালা ছাদে কয়লা এনে ফেলবে, তখন যেন সে হেসে আবহাওয়া সম্পর্কে দু'-চার কথা বলে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা তাকে পাত্রপক্ষের দেখতে আসার জন্য প্রস্তুত করতাম। "যা মনে হয়, ছেলেটা মা অথবা বাবা, দাদু-ঠাকুমার মধ্যে একজন আর কোনও এক কাকা বা পিসিকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। তোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে, অনেক প্রশ্ন করবে। তোর পায়ের তলা দেখবে, বিনুনি কত মোটা দেখবে। তোকে প্রধানমন্ত্রীর নাম বলতে বলবে, কবিতা আবৃত্তি করতে বলবে, বলবে 'কী করে এক ডজন লোকের খিদে আধ ডজন ডিম দিয়ে মেটাবে?' "

AMARBOI.COM

তারপর যখন দু'মাস কেটে গেল কিন্তু বিজ্ঞাপনের একটাও উত্তর এল না, তখন হালদার এবং তার বউয়ের মনে হল যে, তাদের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। "এবার কি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে, ও বিয়ে দেওয়ার যোগ্য নয়? এখন কি বুঝছ যে, মাথা ঠিক থাকলে কোনও ছেলেই ওর ধারেকাছে ঘেঁষতে চাইবে না?"

বাবা বেঁচে থাকতে বিবির এমন দুরবস্থা ছিল না। বিবির মা মেয়েকে জন্ম দিয়েই মারা যান। বৃদ্ধ মানুষটি আমাদের প্রাথমিক স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। শেষ বয়সে বিবির অসুখের কারণ খুঁজে বের করার আশায় তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মেয়ের অসুখের বিবরণ রাখতেন। যখনই আমরা খোঁজ নিতাম যে তিনি কদ্দুর এগোলেন, তখনই তিনি উত্তর দিতেন, "সব সমস্যারই সমাধান আছে।" তিনি বিবিকে আশ্বস্ত করতেন। একটা সময় ছিল যখন তিনি আমাদের সকলকেই আশ্বস্ত করেছিলেন। ইংল্যান্ডের ডাক্তারদের চিঠি লিখতেন, সন্ধেবেলাগুলো লাইব্রেরিতে কেসবুক পড়ে কাটাতেন, গৃহদেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য শুক্রবার মাংস খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষে তিনি স্কুলে পড়ানোও ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাড়িতে বসে ছাত্রদের পড়াতেন যাতে সবসময় বিবির খেয়াল রাখতে পারেন। অল্পবয়সে তিনি স্মৃতি থেকে বর্গমূল বের করতে পারার জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ের অসুখের রহস্যভেদ করতে পারলেন না। এত কাজ, এত গবেষণা করে তিনি শুধু এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছোতে পেরেছিলেন যে, বিবির ফিটগুলো শীতকালের চেয়ে গরমকালে বেশি হত। এবং মোটের ওপর বিবি আন্দাজ পঁচিশ বার গুরুতর আক্রান্ত হয়েছে। তিনি বিবির অসুখের লক্ষণ এবং তাকে শান্ত করার উপায়ের নির্দেশ দিয়ে একটি চার্ট তৈরি করেছিলেন এবং সেটা সারা পাড়ায় বিলিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলো শেষপর্যন্ত হয় হারিয়ে গিয়েছিল, না হয় আমাদের ছেলেমেয়েরা সেগুলো দিয়ে নৌকো তৈরি করেছিল। অথবা সেগুলোর উলটোপিঠে আমাদের বাজারের ফর্দ লেখা হত।

বিবিকে কিছুটা সঙ্গ দেওয়া, তার দুঃখ কিছুটা লাঘব করা আর, মাঝে মাঝে তার ওপর নজর রাখা ছাড়া তার জন্য আমাদের খুব একটা কিছু করার ছিল না। আমাদের কারও পক্ষেই ওইরকম একাকিত্ব বোঝা সম্ভব ছিল না। কোনও কোনও দিন দুপুরে ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা তার চুল আঁচড়ে দিতাম। মাঝে মাঝে মনে করে অন্য দিকে সিঁথি করে দিতাম, যাতে সিঁথি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটা না হয়ে যায়। তার অনুরোধে আমরা তার ঠোঁটের ওপর আর গলায় পাউডার লাগিয়ে দিতাম, পেনসিল দিয়ে ভুরু এঁকে দিতাম আর তার সঙ্গে পুকুরের ধারে হাঁটতে যেতাম, যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা দুপুরবেলায় ক্রিকেট খেলত। সে তখনও কোনও পুরুষমানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

"আমার এই অবস্থা ছাড়া আমার স্বাস্থ্য কিন্তু একদম ভাল," সে বেঞ্চের ওপর বসে বলত। ফুটপাথে প্রেমিক-প্রেমিকারা হাত ধরাধরি করে হেঁটে যেত। "আমার কখনও ঠান্ডা লাগেনি, জ্বর হয়নি। কখনও জন্ডিস হয়নি, কখনও কলিক বা বদহজমও হয়নি।" কখনও সখনও আমরা তাকে পাতিলেবুর রস মাখানো ভুট্টা বা দু'পয়সার ক্যারামেল কিনে দিতাম। তাকে সান্ত্বনা দিতাম। যদি তার মনে হত কোনও ছেলে তাকে দেখছে, তা হলে তার মন রাখার জন্য সায় দিতাম। কিন্তু বিবি আমাদের কারও দায়িত্ব ছিল না। এবং কোনও ব্যক্তিগত মুহূর্তে সে কথা ভেবে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করতাম।

নভেম্বর মাসে জানা গেল যে, হালদারের বউ অন্তঃসত্ত্বা। সেই সকালে, ভাঁড়ারঘরের মধ্যে বসে বিবি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ও বলছে আমি নাকি ছোঁয়াচে, পক্সের মতো। বলছে আমার জন্য নাকি বাচ্চাটার খারাপ হবে।" সে হাপরের মতো শ্বাস নিচ্ছিল। দেওয়ালে পলেস্তারা উঠে যাওয়া একটা অংশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। "কী হবে আমার?" খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের তখনও কোনও জবাব আসেনি। "আমাকে এই অভিশাপ সহ্য করতে হয়, সেটাই কি যথেষ্ট শাস্তি নয়? এবার আর-একজনকে খারাপ করার দোষও সহ্য করতে হবে আমাকে?" হালদারবাড়িতে অশান্তি বেড়ে গেল। হালদারের বউ ধরেই নিয়েছিল যে, বিবির উপস্থিতি বাচ্চাটার ক্ষতি করবে। সে তার স্ফীত পেটের চারপাশে উলের শাল জড়িয়ে রাখতে শুরু করল। বাথরুমে বিবির জন্য আলাদা সাবান-তোয়ালে বরাদ্দ হল। কাজের লোকের খবর অনুযায়ী, বিবির প্লেটও অন্যদের প্লেটের সঙ্গে ধোয়া হত না।

তারপর একদিন দুপুরে, কোনও কথা বা সাবধানবাণী ছাড়াই, আবার সেই কাণ্ড ঘটল। পুকুরের ধারে বিবি ফুটপাথের ওপর পড়ে গেল। সে থরথর করে কাঁপছিল, ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে, যে-কোনও উপায়ে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে, অসুস্থ মেয়েটার চারপাশে একদল লোক জড়ো হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে লোকটা সোডার বোতল খোলে, সে বিবির অস্থির হাত-পা মাটিতে আটকে ধরল। যে লোকটা ফালি ফালি করে কাটা শশা বিক্রি করে, সে বিবির মুঠো করা আঙুলগুলো ছাড়ানোর চেষ্টা করল। একজন পুকুর থেকে জল এনে বিবির গায়ে ঝাপটা দিল। আর-একজন সুগন্ধি রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল। কাঁঠালওয়ালা বিবির মাথাটা ধরে ছিল। কারণ, সে এপাশ-ওপাশ ছটফট করছিল। যে লোকটা আখের রস বিক্রি করে আর তালপাতার পাখা দিয়ে মাছি তাড়ায়, সেই পাখাটা দিয়ে সে যতদিক থেকে সম্ভব বিবিকে হাওয়া করছিল।

"এখানে কোনও ডাক্তার আছেন কি?"

"দেখো জিভটাই না গিলে ফেলে।"

"হালদারকে কি কেউ খবর দিয়েছে?"

"এর গা তো কয়লার চেয়েও গরম!"

আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও, দাপাদাপি থামল না। বিবি তার অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি করতেই থাকল। যন্ত্রণায় দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকল। হাঁটু কাঁপতে লাগল। দু'মিনিটের বেশি কেটে গিয়েছিল। আমাদের দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, ভাবছিলাম আর কী করা যায়।

"চামড়া!" হঠাৎ কে একজন চেঁচিয়ে উঠল। "ওকে চামড়া শোঁকাতে হবে।" তখন আমাদের মনে পড়ল যে, শেষ যখন বিবির এরকম অবস্থা হয়েছিল, তখন তার নাকের তলায় গোরুর চামড়া ধরার পরই সে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

"বিবি, কী হয়েছে? বলো তো কী হয়েছিল?" বিবি চোখ খোলার পর আমরা জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার গরম লাগছিল। তারপর আরও গরম লাগল। আমার চোখের সামনে সব ধোঁয়া হয়ে গিয়েছিল। চারদিকটা অন্ধকার হয়ে গেল। তোমরা দেখতে পাওনি?"

আমাদের স্বামীরা কয়েকজন মিলে বিবিকে বাড়ি পৌঁছে দিল। সন্ধে ঘনিয়ে এসেছিল। শাঁখ বাজানো হল। পুজো-প্রার্থনার ধূপের গন্ধে চারপাশ ভরে উঠল। বিবি বেসামালভাবে হাঁটছিল, বিড়বিড় করছিল, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলল না। তার গাল ছড়ে গিয়েছিল, দু'-এক জায়গায় কেটেও গিয়েছিল। চুল ধুলো লেগে জটার মতন, কনুইয়ে ধুলোর প্রলেপ। সামনের

AMARBOI.COM

একটা দাঁত একটু ভেঙে গিয়েছিল। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমরা ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বিবির পিছন-পিছন চললাম।

তার একটা কম্বল, একটা সেঁক দেওয়ার ব্যাগ আর শান্ত হওয়ার জন্য একটা ট্যাবলেট দরকার ছিল। তাকে চোখে চোখে রাখাও দরকার ছিল। কিন্তু বাড়ির উঠোনে পৌঁছোতেই হালদার এবং তার বউ বলল যে, তারা বিবিকে ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেবে না। "শিগগিরি বাচ্চা হবে, এই সময় ওর হিস্টিরিয়ার রুগির কাছাকাছি থাকার মতো বড় ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়," হালদার বলল।

সে রাতে বিবি ভাঁড়ারঘরেই ঘুমোল।

জুন মাসের শেষে হালদারদের একটি মেয়ে হল। ততদিনে বিবি আবার নীচেই ঘুমোচ্ছিল। যদিও তার ক্যাম্পখাটটা বাইরে করিডোরে রাখা হয়েছিল এবং তাকে বাচ্চাটাকে ছুঁতে দেওয়া হত না। প্রতিদিন তারা বিবিকে ছাদে পাঠিয়ে দিত, দুপুরে খাওয়ার সময় পর্যন্ত হিসেব লেখার জন্য। খাওয়ার সময় হালদার তার কাছে সকালের বিক্রির রসিদ আর এক বাটি হলুদ কড়াইশুঁটি এনে দিত। রাতে বিবি সিঁড়িতে একা বসে দুধ-পাঁউরুটি খেত। পরপর আরও দু'বার বিবির ফিট হয়ে গেল। কেউ জানতে বা থামাতে পারল না।

আমরা আমাদের দুশ্চিন্তা জানাতে গেলে হালদার বলল, এটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। বিষয়টা নিয়ে কোনওরকম আলোচনা করতে স্পষ্টই বারণ করে দিল সে। অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য আমরা অন্য দোকানে কেনাকাটা করা শুরু করলাম। এটাই আমাদের প্রতিশোধের একমাত্র উপায় ছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ গেল, হালদারের দোকানের তাকে জিনিসপত্রের ওপর ধুলো পড়তে থাকল। লেবেলের ওপর লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেল। কোলোন-পারফিউমের গন্ধ ঝাঁজিয়ে গেল। সন্ধেবেলা দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমরা দেখতাম, হালদার একলা বসে চটি দিয়ে পোকা মারছে। তার বউকে প্রায় দেখতেই পাওয়া যেত না। কাজের লোকটা বলেছিল, বউটা নাকি শয্যাশায়ী। প্রসবের সময় সম্ভবত কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

শরৎকাল এসে পড়ল, সেই সঙ্গে অক্টোবর মাসের ছুটির প্রতিশ্রুতি। গোটা শহর পুজোর কেনাকাটা আর অন্যান্য পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত হয়ে

AMARBOI.COM

পড়ল। গাছে বাঁধা লাউডস্পিকার থেকে তারস্বরে ফিল্মের গান বাজতে শুরু করল। বাজারদোকান যে-কোনও সময়ে খোলা পাওয়া যেত। আমরা ছোটদের বেলুন আর রঙিন ফিতে কিনে দিলাম। কিলোদরে মিষ্টি কেনা হল। সারা বছর যেসব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়নি, ট্যাক্সি করে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দিন ছোট হয়ে আসল। সন্ধেগুলো ঠান্ডা হতে শুরু করল। আমরা সোয়েটারের বোতাম লাগালাম। মোজা পরতে শুরু করলাম। তারপর এমন শীত পড়ল যে, সকলের গলা খুসখুস করতে শুরু করল। আমরা ছেলেমেয়েদের নুন-গরমজলে কুলকুচি করাতাম, গলায় মাফলার জড়াতাম। কিন্তু শেষে হালদারদের বাচ্চাটাই অসুস্থ হয়ে পড়ল।

মাঝরাতে জ্বর কমানোর জন্য ডাক্তার ডাকা হল। "দয়া করে ওকে সারিয়ে দিন," হালদারের বউ মিনতি করল। তার চিৎকার-চেঁচামেচি আমাদের সকলের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল। "আমরা আপনাকে যা চান দিতে পারি। শুধু আমার মেয়েটাকে সারিয়ে তুলুন।" ডাক্তার একটা গ্লুকোজ ফর্মুলা আর অ্যাসপিরিনের গুঁড়ো লিখে দিয়ে গেলেন। বললেন বাচ্চাটাকে লেপ-কম্বলে জড়িয়ে রাখতে।

পাঁচ দিন পরও জ্বর কমল না।

"এ বিবির কাজ," হালদারের বউ বিলাপ করতে লাগল। "ও-ই করেছে। ওরই ছোঁয়াচ লেগেছে আমাদের বাচ্চাটার। ওকে নীচে আসতে দেওয়াই উচিত হয়নি। ওকে এই বাড়িতেই আসতে দেওয়া উচিত হয়নি।"

তাই বিবি আবার ভাঁড়ারঘরে রাত কাটাতে শুরু করল। বউ জোরাজুরি করায় হালদার বিবির ক্যাম্পখাটটাও সেখানে তুলে দিয়ে আসল। তার সঙ্গে একটা টিনের ট্রাঙ্ক, যাতে জিনিসপত্র ছিল। সিঁড়ির ওপর একটা ঝাঁঝরি চাপা দিয়ে তার খাবার রাখা থাকত।

"আমি কিছু মনে করি না," বিবি আমাদের বলল। "ওদের থেকে আলাদা থাকাই ভাল। নিজের মতো করে সব কিছু গুছিয়ে নেওয়া যায়।" সে ট্রাঙ্ক খুলে কয়েকটা হাউসকোট, তার বাবার একটা বাঁধানো ছবি, সেলাইয়ের সরঞ্জাম আর কয়েকটা কাপড়ের টুকরো বের করে কয়েকটা ফাঁকা তাকে সেগুলো গুছিয়ে রাখল। সপ্তাহের শেষে বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বিবিকে নীচে ফিরে আসতে বলা হয়নি। "চিন্তা কোরো না। এমন তো নয় যে ওরা আমাকে এখানে আটকে রেখেছে," বিবি আমাদের আশ্বস্ত করার জন্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল। "সিঁড়ির তলাতেই দুনিয়াটা শুরু হয়। এবার আমি ইচ্ছেমতো পৃথিবীটা দেখতে পারব।"

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, বিবি বাইরে যাওয়াই বন্ধ করে দিল। আমাদের সঙ্গে পুকুরের ধারে বা মন্দিরের সাজ দেখতে যেতে বললে সে রাজি হত না। বলত ভাঁড়ারঘরে ঢোকার দরজার জন্য একটা নতুন পরদা সেলাই করছে। তার গায়ের রং পাঁশুটে হয়ে যাচ্ছিল। তাজা হাওয়ায় শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। "বর খোঁজার কী হবে?" আমরা বললাম। "এখানে সারাদিন বসে থাকলে কোনও ছেলের মন জয় করবি কী করে?"

কিন্তু কিছুতেই সে রাজি হল না।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হালদার তার দোকানের সব বিক্রি না হওয়া জিনিস তাক থেকে পরিষ্কার করে বাক্সয় পুরে ভাঁড়ারঘরে উঠিয়ে দিল। তার ব্যাবসা লাটে ওঠাতে আমরা মোটামুটি সফল হয়েছিলাম। বছর শেষ হওয়ার আগেই তাদের পরিবার সেখান থেকে চলে গেল। একটা খামে তিনশো টাকা ভরে বিবির দরজায় রেখে গিয়েছিল। তাদের আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

আমাদের একজনের কাছে বিবির হায়দরাবাদের কোনও আত্মীয়ের ঠিকানা ছিল। সে তাকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে একটা চিঠি লিখল। চিঠিটা না-খোলা অবস্থাতেই ফিরে এল। ঠিকানা অজানা। বেশি শীত পড়ার আগে আমরা ভাঁড়ারঘরের খড়খড়িগুলো সারিয়ে দিলাম। ঢোকার মুখে একটা টিনের পাত লাগিয়ে দেওয়া হল, যাতে বিবি অন্তত কিছুটা আড়াল পায়। কেউ একজন তাকে একটা কেরোসিনের লণ্ঠন দান করল। আর-একজন একটা পুরনো মশারি দিল। সঙ্গে একজোড়া মোজা যার গোড়ালির অংশটা ছিল না। যখনই সুযোগ পেতাম আমরা তাকে মনে করিয়ে দিতাম যে, আমরা তার আশপাশেই আছি। কখনও কোনও উপদেশ বা সাহায্য দরকার হলেই সে আমাদের কাছে আসে পারবে। কিছুদিন আমরা দুপুরবেলায় ছোটদের ছাদে খেলতে পাঠাতাম, যাতে আবার কোনও ফিট হলে তারা আমাদের খবর দিতে পারে। কিন্তু প্রতি রাতে বিবি একলাই থাকত।

কয়েক মাস কেটে গেল। বিবি এক গভীর এবং লম্বা নীরবতায় ডুবে যাচ্ছিল। আমরা পালা করে তার জন্য ভাতের থালা আর চায়ের গেলাস রেখে যেতাম। সে চা পান কমই করত। খেত আরও কম। তার মুখে এমন একটা ভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল, যা তার বয়সের সঙ্গে খাপ খায় না।

AMARBOI.COM

গোধূলিবেলায় সে ছাদে কিছুক্ষণ পায়চারি করত, কিন্তু কখনও ছাদ ছেড়ে যেত না। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর সে টিনের দরজার ভেতরেই থাকত, কোনও কারণেই বেরোত না। আমরা তাকে বিরক্ত করতাম না। আমরা কেউ কেউ ভাবতে শুরু করলাম যে, সে মারা যেতে বসেছে কি না। কারও কারও ধারণা হল যে, বিবি পাগল হয়ে গিয়েছে।

এপ্রিলের এক সকালে, যখন মুসুর ডালের বড়ি শুকোনোর মতো গরম পড়ে গিয়েছে, তখন আমরা লক্ষ করলাম কে যেন আমাদের ট্যাঙ্কের কলের কাছে বমি করেছে। দ্বিতীয়বার একই ঘটনা ঘটার পর আমরা বিবির টিনের দরজায় টোকা মারলাম। কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আমরা নিজেরাই দরজা খুললাম। দরজা আটকানোর কোনও তালা ছিল না।

বিবি ক্যাম্পখাটে শুয়ে ছিল। সে তখন চার মাসের গর্ভবতী।

সে বলল যে, কী হয়েছিল তার কিছু মনে নেই। কে এই কাজ করেছে, তাও সে আমাদের বলল না। আমরা তাকে গরম দুধ আর কিশমিশ দিয়ে সুজির পায়েস তৈরি করে দিলাম। তবুও সে লোকটার পরিচয় জানাল না। খামোকাই আমরা হামলার, অনধিকার প্রবেশের চিহ্ন খুঁজলাম। ঘরটা পরিষ্কার করে গোছানো ছিল। বিছানার পাশে মেঝেতে, বিবির হিসেবের খাতা একটা নতুন পাতায় খোলা ছিল। সেখানে নামের একটা তালিকা লেখা ছিল।

AMARBOI.COM

পূর্ণ সময় পর্যন্ত বিবি তার বাচ্চাকে গর্ভে ধারণ করল। সেপ্টেম্বরের এক সন্ধেবেলায় আমরা তাকে একটি ছেলের জন্ম দিতে সাহায্য করলাম। তাকে শিখিয়ে দিলাম কী করে বাচ্চাটাকে খাওয়াবে, চান করাবে, ঘুম পাড়াবে। একটা অয়েলক্লথ কিনে দিলাম। সে যে কাপড়গুলো এত বছর বাঁচিয়ে রেখেছিল, সেগুলো থেকে জামা আর বালিশের ওয়াড় তৈরি করতে সাহায্য করলাম। একমাসের মধ্যেই বিবি সুস্থ হয়ে উঠল। হালদার তার জন্য যে টাকা রেখে গিয়েছিল, তাই দিয়ে সে ভাঁড়ারঘর চুনকাম করাল, দরজা-জানলায় ছিটকিনি বসাল। তারপর তাকগুলো ঝাড়পোঁছ করে, পড়ে থাকা জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখল। হালদারের পুরনো জিনিসগুলো অর্ধেক দামে বিক্রি করে দিল। আমাদের বিবি বলল বিক্রির খবর সবাইকে বলতে। আমরা তাই করলাম। বিবির দোকান থেকেই সাবান, কাজল, চিরুনি, পাউডার কিনলাম। সব জিনিস শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে ট্যাক্সি করে হোলসেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজারে গিয়ে লাভের টাকা দিয়ে আরও জিনিস কিনে তাক ভরতি করল। এইভাবেই সে ছেলেটাকে মানুষ করতে লাগল। ভাঁড়ারঘরে তার ব্যাবসা চালাল। আমরা যথাসম্ভব সাহায্য করলাম। তার বহু বছর পর পর্যন্ত আমরা ভেবে বার করার চেষ্টা করতাম কে বিবিকে লাঞ্ছিত করেছিল। কয়েকজন কাজের লোককে প্রশ্ন করা হয়েছিল। চায়ের দোকানে, বাসস্ট্যান্ডে, সম্ভাব্য কয়েকজন অপরাধীকে নিয়ে আলোচনা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে বিবি সুস্থ হয়ে গিয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় এবং অন্তিম মহাদেশ

আমি ভারত ছেড়েছিলাম ১৯৬৪ সালে। সঙ্গে ছিল একটা কমার্সের সার্টিফিকেট এবং কিছু টাকা, যার এখন মূল্য হবে দশ ডলার। তিন সপ্তাহ ধরে এস এস রোমা নামে একটা ইতালিয়ান মালবাহী জাহাজের ইঞ্জিনের পাশে একটা তৃতীয় শ্রেণির কেবিনে থেকে, আমি আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে ইংল্যান্ডে পাড়ি দিলাম। লন্ডনের উত্তর প্রান্তে, ফিন্সবারি পার্কে একটা বাড়িতে থাকতাম, যেখানে শুধু আমার মতো কপর্দকহীন, অবিবাহিত বাঙালিরাই থাকত। মাঝে মাঝে দশ-বারোজন, আবার কখনও আরও বেশি। আমরা সকলেই চেষ্টা করছিলাম বিদেশে নিজেদের শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে।

আমি এল এস ই-র লেকচারগুলো শুনতে যেতাম। খরচ চালানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে কাজ করতাম। এক-একটা ঘরে আমরা তিন-চারজন মিলে থাকতাম, আর একটাই বরফঠান্ডা বাথরুম ব্যবহার করতাম। পালা করে ডিমের ডালনা তৈরি করা হত এবং সেটা একটা খবরের কাগজ চাপা দেওয়া টেবিলের ওপর রেখে, হাত দিয়েই খাওয়া হত। চাকরি ছাড়া আমাদের কারও খুব বেশি কোনও দায়িত্ব ছিল না। শনি-রবিবারগুলো খালি পায়ে, দড়িবাঁধা পাজামা পরে, চা আর রথম্যান সিগারেট খেয়ে কাটত। বা লর্ডসে ক্রিকেট খেলা দেখতে যেতাম। কখনও সখনও বাড়িতে আরও বাঙালির ভিড় হত, যাদের সঙ্গে আমাদের সবজিওয়ালার কাছে বা টিউবে আলাপ হয়েছিল। সেইসব দিনগুলোয় আরও বেশি করে ডিমের ডালনা তৈরি করা হত। একটা গ্রুন্ডিগের রিল-টু-রিল-এ মুকেশের গান বাজত। নোংরা প্লেটডিশগুলো আমরা বাথটাবে ভেজাতাম।

মাঝে মাঝে কেউ বাড়ি ছেড়ে যেত, কলকাতায় তার বাড়ির লোক যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছে, সেই মহিলার সঙ্গে থাকতে বলে। ১৯৬৯ সালে

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

আমার যখন ছত্রিশ বছর বয়েস, তখন আমার নিজেরও বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। সেই সময়ে, আমি আমেরিকায় একটা ফুলটাইম কাজের সন্ধান পেয়েছিলাম। চাকরিটা এমআইটি-র এক লাইব্রেরির প্রসেসিং ডিপার্টমেন্টে। মাইনে যা ছিল, তাতে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া যেত। তা ছাড়া একটা বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সম্মানটাও ছিল। তাই একটা সিক্সথ-প্রেফারেন্স গ্রিন কার্ড জোগাড় করে, আরও দূরে পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

ততদিনে আমার প্লেনে চড়ার মতো পয়সা জমেছিল। প্রথমে বিয়ে করতে কলকাতা, সেখানে এক সপ্তাহ থেকে বস্টনে চলে গেলাম নতুন চাকরিতে যোগ দিতে। লন্ডন ছাড়ার আগে সাত শিলিং, ছয় পেন্স দিয়ে টটেনহ্যাম কোর্ট রোড থেকে একটা বই কিনেছিলাম 'দ্য স্টুডেন্ট গাইড টু নর্থ আমেরিকা'। যদিও আমি আর তখন ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু পয়সাকড়ির ব্যাপারটা তখনও ভেবে চলতে হত। বস্টনের প্লেনে বসে বইটা পড়ে জানতে পারলাম যে, আমেরিকায় রাস্তার ডানদিক দিয়ে গাড়ি চালাতে হয়, লিফটকে এলিভেটর বলে। আর ফোন ব্যস্ত থাকলে তাকে এনগেজড না বলে বিজি বলে। "তুমি শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে, নর্থ আমেরিকায় জীবনের গতি ব্রিটেনের চেয়ে আলাদা," গাইডবুকটা আমায় জানাল। "এখানে সকলেই চায় সবচেয়ে ওপরে উঠতে। এখানে ইংরেজদের মতো চা পাওয়ার আশা কোরো না।" প্লেনটা বস্টন হারবারের দিকে অবতরণ শুরু করতেই পাইলট ওখানকার আবহাওয়ার অবস্থা আর সময় ঘোষণা করলেন, তিনি এও বললেন যে, রাষ্ট্রপতি নিক্সন সেদিনটা ন্যাশনাল হলিডে ঘোষণা করেছেন, কারণ দু'জন আমেরিকান চাঁদে প্রথম পা রেখেছেন। যাত্রীদের অনেকেই উল্লাস প্রকাশ করল। একজন চেঁচিয়ে উঠলস, "গড ব্লেস আমেরিকা!" উলটোদিকের সিটে দেখলাম, একজন মহিলা প্রার্থনা করছেন।

আমার গাইডবুকে লেখা ছিল, কেমব্রিজের সেন্ট্রাল স্কোয়ারে, ওয়াই এম সি এ-তে সস্তায় থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। আমেরিকায় আমার প্রথম রাতটা সেখানেই কাটল।

সেখান থেকে এমআইটি, ডাকঘর আর পিয়োরিটি সুপ্রিম বলে একটা সুপারমার্কেটে হেঁটে যাওয়া যেত। আমার ঘরে আসবাব বলতে ছিল একটা

AMARBOI.COM

খাট, একটা ডেস্ক আর দেওয়ালে একটা ছোট কাঠের ক্রুশ। দরজায় টাঙানো একটা নোটিশে লেখা 'রান্না করা একদম বারণ। একটা পরদাবিহীন জানলা দিয়ে দেখা যেত ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ। বেশ বড় রাস্তা, সেটা দিয়ে দু'দিকেই যান চলাচল করত। রাস্তা দিয়ে একের পর এক গাড়ি জোরে হর্ন বাজিয়ে যেত, লাল আলো জ্বলা সাইরেন অন্তহীন এমার্জেন্সির কথা বলত। বাসের সারি দৌড়ে বেড়াত সারা রাত। সেগুলোর দরজা খুলত আর বন্ধ হত সাপের মতো আওয়াজ করে। ওই আওয়াজে কোনও কিছুতে মন দেওয়া সম্ভব ছিল না। মাঝে মাঝে আমার দমবন্ধ হয়ে আসত। এস এস রোমা-র ইঞ্জিনের ক্রুদ্ধ আওয়াজের মতো এই আওয়াজটাও আমি যেন আমার বুকের ভেতরে অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু এখানে পালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও জাহাজের ডেক ছিল না। সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝিলিক দেখে মন ভাল করার কোনও উপায় ছিল না। ঠান্ডা হাওয়া এসে মুখের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে যেত না। কেউ এসে দুটো কথাও বলত না। আমি এতই ক্লান্ত থাকতাম যে, দড়িবাঁধা পাজামাটা পরে ওয়াই এম সি এ-র অন্ধকার করিডোরে পায়চারি করারও ইচ্ছে হত না। তার বদলে বসে জানলা দিয়ে বাইরে কেমব্রিজের সিটি হল আর এক সারি ছোট দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সকালবেলায় আমি মেমোরিয়াল ড্রাইভের পাশে, ডিউয়ি লাইব্রেরির হলুদ-বাদামি রঙের, দুর্গের মতো বাড়িটাতে কাজ করতে যেতাম। ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট খুললাম, ডাকঘরে একটা বক্স ভাড়া করলাম। উলওয়ার্থ, যে দোকানটা আমার লন্ডনে চেনা ছিল, থেকে একটা প্লাস্টিকের বাটি আর চামচও কিনলাম। পিয়োরিটি সুপ্রিমে গিয়ে, মনে মনে কত আউন্সে কত গ্রাম হয় আর ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমেরিকার দামের তুলনা করতে করতে ঘুরে বেড়ালাম। শেষ পর্যন্ত অল্প দুধ আর একটা কর্নফ্লেক্সের বাক্স কিনলাম। আমেরিকায় আমার সেই প্রথম ভোজন। খেলাম আমার টেবিলে বসে। ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউয়ের কফিশপগুলো থেকে আর যা খাবার কেনার আমার সামর্থ্য ছিল, অর্থাৎ হ্যামবার্গার আর হট ডগস, তার চেয়ে এই খাবারই আমার পছন্দ ছিল। তা ছাড়া, আমি তখনও গোরুর মাংস খাওয়া শুরু করিনি। দুধ কেনার মতো সহজ কাজটাও আমার কাছে ছিল নতুন। লন্ডনে, প্রতিদিন সকালে আমাদের দোরগোড়ায় দুধের বোতল রেখে দিয়ে যেত।

AMARBOI.COM

সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমি মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছিলাম। সকালে এবং রাতে কর্নফ্লেক্স আর দুধ খেতাম। মাঝে মাঝে স্বাদ বদলানোর জন্য কলা কিনে চামচের ধার দিয়ে সেগুলো পাতলা করে কেটে খাবারে মেশাতাম। এ ছাড়া কিছু টি-ব্যাগ আর একটা ফ্লাস্কও (উলওয়ার্থের দোকানদারের ভাষায় থার্মস) কিনলাম। (দোকানদার আমায় বোঝাল যে, ফ্লাস্ক সেটাকে বলে যেটাতে হুইস্কি রাখা হয়। আরও একটা জিনিস, যেটা আমি কখনও খাইনি।) প্রতিদিন সকালে, কাজে যাওয়ার সময়, একটা কফিশপ থেকে এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে ফ্লাস্কটা ফুটন্ত গরম জল দিয়ে ভরতি করে নিতাম। সারাদিনে সেটা থেকে চার কাপ চা করে খাওয়া যেত। দুধের একটু বড় কার্টন কেনা শুরু করলাম। ওয়াই এম সি এ-র আর-এক বাসিন্দাকে দেখে শিখলাম যে, দুধটা জানলার যেদিকে ছায়া পড়ে, সেদিকে রাখতে হয়। সন্ধেবেলা সময় কাটানোর জন্য, নীচে, রঙকরা কাচের জানলাওয়ালা একটা বড়সড় ঘরে বসে, বস্টন গ্লোব পড়তাম। কোনও লেখা, কোনও বিজ্ঞাপন বাদ দিতাম না, যাতে সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঘুমিয়ে পড়তাম, কিন্তু ভাল ঘুম হত না। প্রতি রাতে জানলাটা খুলে রাখতেই হত। ওই বদ্ধ ঘরে ওটাই হাওয়া আসার একমাত্র রাস্তা ছিল। তবে হাওয়ার সঙ্গে জানলা দিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজও আসত। খাটে শুয়ে আঙুলগুলো কানের ওপর চেপে রাখতাম। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে হাত দুটো পাশে পড়ে যেত আর ট্রাফিকের আওয়াজে ঘুমটা আবার ভেঙে যেত। জানলা দিয়ে পায়রার পালক উড়ে আসত। একদিন কর্নফ্লেক্সে দুধ ঢালতে গিয়ে দেখি দুধটা কেটে গিয়েছে। এসব সত্ত্বেও ঠিক করেছিলাম ওয়াই এম সি এ-তে ছ'সপ্তাহ থাকব, যতদিন না আমার স্ত্রীর পাসপোর্ট আর গ্রিন কার্ড তৈরি হয়ে যাচ্ছে। একবার সে এসে পড়লে আমাকে একটা সুবিধেমতো থাকার জায়গার বন্দোবস্ত করতে হবে। তাই আমার বাজেটের মধ্যে কী পাওয়া যায় খোঁজ নিতে মাঝে মাঝে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো দেখতাম বা লাঞ্চব্রেকের সময় এম আই টি-র হাউসিং অফিসে গিয়ে ঢুঁ মারতাম। এইভাবেই খোঁজ পেলাম একটা ঘরের— একটা নির্জন রাস্তায় একটা বাড়িতে। তখনই ভাড়া নেওয়া যাবে। ভাড়া সপ্তাহে আট ডলার। নম্বরটা গাইডবুকে টুকে নিয়ে একটা পে ফোন থেকে কয়েন বাছতে বাছতে ডায়াল করলাম। আমি তখনও ঠিক, শিলিং এর চেয়ে ছোট আর হালকা কিন্তু পয়সার চেয়ে ভারী আর বেশি

AMARBOI.COM

চকচকে মুদ্রাগুলোর সঙ্গে সড়গড় হতে পারিনি। "কে বলছেন?" ও পাশ থেকে একজন মহিলা জানতে চাইলেন। তাঁর গলার স্বর স্পষ্ট এবং জোরালো।

"শুভসন্ধ্যা, ম্যাডাম। আমি ঘর ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে ফোন করছিলাম।"

"হার্ভার্ড না টেক?"

"আজ্ঞে?"

"আপনি কি হার্ভার্ডের লোক, না টেক-এর?"

টেক বলতে উনি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির কথা বলছেন ধরে নিয়ে আমি বললাম, "আমি ডিউয়ি লাইব্রেরিতে কাজ করি।" তারপর একটু ইতস্তত করে যোগ করলাম, "টেক-এ।"

"আমি শুধু হার্ভার্ড বা টেক-এর ছেলেদেরই ঘর ভাড়া দিই।"

"ঠিক আছে, ম্যাডাম।"

আমাকে ঠিকানা আর সেইদিন সন্ধে সাতটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল। নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে পড়লাম, আমার পকেটে গাইডবুক, নিশ্বাসে লিস্টেরিনের সুবাস। ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউয়ের সঙ্গে সমান্তরাল, গাছের ছায়ায় ঢাকা, একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। ফুটপাথের ফাঁকফোকরের মধ্যে থেকে জায়গায় জায়গায় ঘাস গজিয়ে উঠেছিল। বেশ গরম থাকা সত্ত্বেও আমি কোট আর টাই পরেছিলাম। আমার কাছে অন্য যে-কোনও ইন্টারভিউয়ের সঙ্গে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের কোনও তফাত ছিল না। আমি কখনও ভারতীয় ছাড়া কারও বাড়িতে থাকিনি। হলদেটে সাদা, গাঢ় বাদামি দিয়ে ট্রিম করা বাড়িটা একটা চেন-লিঙ্কের বেড়া দিয়ে ঘেরা। লন্ডনে যেমন প্লাস্টার করা সারিবদ্ধ বাড়িতে থাকতাম, তেমন নয়। এ বাড়িটা একেবারেই আলাদা, কাঠের টালি দিয়ে ঢাকা, সামনে আর পাশে ফরসিথিয়া ঝোপ জড়াজড়ি করে গা ঘেঁষে রয়েছে। আমি যখন কলিং বেলটা টিপলাম, মনে হল, যেন দরজার ঠিক ওপাশেই দাঁড়িয়ে, ফোনের ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, "এক মিনিট, প্লিজ!"

বেশ কয়েক মিনিট পর, একজন ছোটখাটো চেহারার অত্যন্ত বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন। তাঁর বরফসাদা চুল দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তাঁর মাথার ওপর একটা ছোট বস্তা চাপানো রয়েছে। আমি বাড়িতে ঢোকার পর তিনি একটা সরু, কার্পেট-বিছানো সিঁড়ির নীচে, একটা কাঠের বেঞ্চের ওপর

AMARBOI.COM

বসে পড়লেন। আলোর নীচে, বেঞ্চটায় বসে পড়ে আমার দিকে অখণ্ড মনোযোগে তাকিয়ে রইলেন। তিনি একটা কালো আড়ষ্ট তাঁবুর মতো মেঝে পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট পরে ছিলেন। তার সঙ্গে একটা গলায় আর হাতে কুঁচি দেওয়া, মাড় দেওয়া সাদা শার্ট। কোলের ওপর মুড়ে রাখা হাত দুটোয় আঙুলগুলো লম্বা আর ফ্যাকাশে। আঙুলের গোড়ার গাঁটগুলো ফোলা, শক্ত আর হলুদ নখ।

বয়স তাঁর চোখেমুখে এমন কঠিন ছাপ ফেলেছিল যে, তাঁর চেহারায় একটা পুরুষালি ভাব এসে গিয়েছিল— তীক্ষ্ণ, ছোট হয়ে যাওয়া চোখ, নাকের দু'পাশের চামড়ায় গভীর ভাঁজ। ফেটে যাওয়া, মলিন হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটো প্রায় অদৃশ্য। ভুরু বলে আর কিছু বাকি ছিল না। এসব সত্ত্বেও, তাঁকে দেখে বেশ বদমেজাজি লাগছিল।

"লক করে দাও!" তিনি আদেশ দিলেন। যদিও আমি মাত্র কয়েক ফিট দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাও তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "চেনটা আটকে, নবের ওপর ওই বোতামটা ভাল করে টিপে দাও। বাড়িতে ঢোকার পর ওটাই তোমার প্রথম কাজ বুঝেছ?" আমি নির্দেশ অনুযায়ী দরজাটা লক করে চারদিকে ভাল করে তাকালাম। যে বেঞ্চের ওপর ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তার পাশে একটা ছোট গোল টেবিল, যেটার পায়াগুলো, ভদ্রমহিলার পায়ের মতোই, লেসের স্কার্ট দিয়ে পুরোপুরি ঢাকা। টেবিলটার ওপর একটা ল্যাম্প, একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো, রুপোলি আংটা লাগানো একটা চামড়ার পার্স এবং একটা টেলিফোন। ধুলোয় মোড়া একটা মোটা কাঠের লাঠি একদিকে হেলান দিয়ে রাখা। আমার ডানদিকে সারি সারি বইয়ের তাক আর থাবার মতো পা-ওয়ালা জীর্ণ আসবাব ভরতি। একটা বৈঠকখানা ঘরের কোণে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানোর ওপর কাগজ ডাঁই করে রাখা। পিয়ানোর সামনের বেঞ্চটা ছিল না। সেটার ওপরেই বোধহয় ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। বাড়ির ভিতর কোথাও ঘড়িতে সাতবার ঘণ্টা বাজল। "তুমি ঠিক সময়মতো এসেছ!" তিনি বলে উঠলেন। "আশা করি ভাড়াটাও সময়েই দেবে!"

"আমার কাছে একটা চিঠি আছে, ম্যাডাম।" আমি যে সত্যিই টেক-এর ছেলে, তার প্রমাণ হিসেবে পকেটে এম আই টি-র চাকরির চিঠিটা এনেছিলাম। ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর সেটা এমনভাবে আমাকে ফেরত দিলেন, যেন সেটা একটা কাগজের টুকরো

AMARBOI.COM

নয়, খাবার ভরতি একটা ডিনারপ্লেট। তাঁর চোখে চশমা ছিল না। আমার সন্দেহ হল, তিনি বোধহয় চিঠিটার একটা অক্ষরও পড়েননি।

"এর আগে যে ছেলেটা থাকত, সে সবসময় দেরি করত! এখনও আমি ওর কাছ থেকে আট ডলার পাই! হার্ভার্ডের ছেলেগুলো আর আগের মতো নেই! শুধু হার্ভার্ড আর টেক-ই এই বাড়িতে থাকে। টেক-এর কী খবর?"

"আজ্ঞে, খুব ভাল।"

"লকটা চেক করেছ?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

তাঁর পাশে বেঞ্চে হাতটা চাপড়ে ভদ্রমহিলা আমাকে বসতে বললেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি চুপ করে রইলেন। তারপর তিনি জানালেন, এমনভাবে যেন তিনি একাই কথাটা জানেন, "চাঁদে আমেরিকার ফ্ল্যাগ পোঁতা হয়েছে!"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।" আমি তখনও চাঁদের ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি। বলাই বাহুল্য কাগজে খবরটা নিয়ে অনেক লেখালেখি হচ্ছিল। পড়েছিলাম যে, অ্যাস্ট্রোনটরা সি অফ ট্রাঙ্কুইলিটি-র পাড়ে নেমেছিলেন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে কেউ কখনও এতদূর পাড়ি দেয়নি। কয়েক ঘণ্টা তাঁরা চাঁদের মাটির ওপর ঘোরাফেরা করেছিলেন। পাথর সংগ্রহ করে পকেটে পুরে এনেছেন, পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা করেছেন, (তাঁদের মধ্যে একজনের ভাষায়, সে এক অপার্থিব নির্জনতা), ফোনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলেছেন এবং চাঁদের মাটিতে একটি পতাকা পুঁতে এসেছেন। এই অভিযানকে এখনও পর্যন্ত মানুষের সবচেয়ে বড় কীর্তি বলে মনে করা হচ্ছে। আমি গ্লোব-এ গোটা পাতা জুড়ে ফোলানো-ফাঁপানো কস্টিউম পরা অ্যাস্ট্রোনটদের ছবি দেখেছিলাম। রবিবার দুপুরবেলায় যখন তাঁরা চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু বিশেষ ব্যক্তি বস্টনে কী করছিলেন, তাও পড়েছিলাম। একটি লোক বলেছিল যে, সে কানে রেডিয়ো লাগিয়ে একটা সোয়ান বোট চালাচ্ছিল। এক মহিলা তাঁর নাতি-নাতনিদের জন্য রোল তৈরি করছিলেন।

"চাঁদে আমাদের পতাকা!" ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন। "আমি রেডিয়োতে শুনলাম! দারুণ খবর কি না?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

AMARBOI.COM

আমার উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। হুকুম করলেন, "বলো, দারুণ!"

আমি তাঁর অনুরোধে কিছুটা হতবুদ্ধি আর অপমানিত বোধ করলাম। এই সুরে ছেলেবেলায় আমাকে নামতা শেখানো হত। টালিগঞ্জে আমার এক ঘরের স্কুলের মেঝেতে বাবু হয়ে বসে, মাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে নামতা আওড়াতে হত। পেনসিল বা জুতো, কোনওটাই তখন আমার ছিল না। একই সঙ্গে আমার নিজের বিয়ের কথাও মনে পড়ে গেল। তখনও পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াতে হয়েছিল, যে মন্ত্রগুলোর কোনও মানে বুঝতে পারিনি। যে মন্ত্রগুলো আমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল।

"বলো দারুণ!" ভদ্রমহিলা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

"দারুণ", আমি কোনওমতে বললাম। তারপর কথাটা দ্বিতীয়বার গলা ফাটিয়ে বলতে হল, যাতে তিনি শুনতে পান। আমি স্বভাবতই আস্তে কথা বলি। বিশেষ করে, মাত্র কয়েক মিনিট আগে আলাপ হয়েছে, এমন একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলতে আমার অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হল না যে, তিনি কিছু মনে করেছেন। বরং আমার উত্তরে বোধহয় তিনি খুশিই হলেন। কারণ, তাঁর পরবর্তী হুকুম এল, "যাও গিয়ে ঘরটা দেখে এসো!"

AMARBOI.COM

আমি বেঞ্চ থেকে উঠে কার্পেট-বিছানো সরু সিঁড়িগুলো দিয়ে উঠে গেলাম। একটা সরু হলওয়ের বিপরীতে একটা আর দু'দিকে দুটো করে মোট পাঁচটা দরজা দেখতে পেলাম। একটা দরজাই একটু খোলা ছিল। সেই ঘরটার ভিতরে, ঢালু ছাদের নীচে দুটো জোড়া খাট, একটা বাদামি রঙের ডিমের আকারের কার্পেট, একটা খোলা পাইপওয়ালা বেসিন আর একটা দেরাজ ছিল। একটা সাদা রং করা দরজার পিছনে একটা দেওয়াল-আলমারি, আর একটা দরজার পিছনে টয়লেট আর একটা টাব। দেওয়ালে ধূসর আর হাতির দাঁতের মতো রঙের ডোরাকাটা ওয়ালপেপার। জানলাটা খোলা, জালের মতো পরদাগুলো হাওয়ায় নড়ছিল। আমি বাইরের দৃশ্য দেখব বলে পরদা সরালাম। পিছনে একটা ছোট উঠোন, কয়েকটা ফলের গাছ আর একটা কাপড় শুকোতে দেওয়ার ফাঁকা দড়ি। আমার দেখে পছন্দ হল। শুনলাম সিঁড়ির নীচ থেকে ভদ্রমহিলা চেঁচাচ্ছেন, "কী ঠিক করলে?"

নীচে নেমে তাঁকে আমার সিদ্ধান্ত জানাতে তিনি টেবিলের ওপর থেকে

চামড়ার পার্সটা তুলে, সেটা খুলে কিছুক্ষণ সেটার ভিতরে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন। তারপর একটা সরু তারে লাগানো একটা চাবি বের করলেন। আমাকে জানালেন যে, বাড়ির পিছনদিকে একটা রান্নাঘর আছে, ডানদিকের বৈঠকখানার ভিতর দিয়ে সেখানে যাওয়া যায়। আমি স্টোভটা ব্যবহার করতে পারি, এই শর্তে যে, সেটা যেমন অবস্থায় ছিল, তেমন অবস্থাতেই আবার রেখে দিতে হবে। চাদর আর বিছানা তিনি দেবেন, কিন্তু সেগুলো পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব আমার। ভাড়াটা প্রতি শুক্রবার সকালে, পিয়ানোর চাবির ঢাকার ওপরে রেখে দিতে হবে। আর কোনও মহিলা অতিথিকে বাড়িতে আনা চলবে না!

"আমি বিবাহিত, ম্যাডাম।" এই প্রথম আমি কথাটা কাউকে জানালাম।

কিন্তু তিনি শুনতে পাননি। "কোনও মহিলা অতিথি নয়!" তিনি আবার বললেন। তাঁর নাম ছিল মিসেস ক্রফ্‌ট।

আমার স্ত্রীর নাম মালা। আমাদের বিয়েটা আমার দাদা এবং বউদি ঠিক করেছিল। প্রস্তাবটাতে আমি আপত্তিও করিনি, আবার খুব উৎসাহও দেখাইনি। অন্য অনেক পুরুষের মতো আমারও এই কর্তব্যটা পালন করার কথা ছিল। মালা বেলেঘাটার এক স্কুলশিক্ষকের মেয়ে। আমাকে বলা হয়েছিল যে, সে রান্না করতে পারে, উল বুনতে পারে, সেলাই করতে পারে, ছবি আঁকতে পারে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু এতগুলো প্রতিভা দিয়েও তার কালো রং ঢাকা যায়নি। তাই পরপর বেশ কিছু ছেলে তাকে তার মুখের ওপর বাতিল করে দিয়েছিল। তার বয়েস হয়েছিল সাতাশ। এমন একটা বয়েস, যে তার মা-বাবা ভাবতে বসেছিলেন, মেয়ের বোধহয় আর বিয়ে হবে না। তাই তাঁরা একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিতে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পাঠাতেও রাজি ছিলেন।

পাঁচ রাত আমরা এক বিছানায় কাটালাম। প্রতি রাতে, মুখে কোল্ড ক্রিম লাগিয়ে আর একটা কালো দড়ি দিয়ে চুলে বিনুনি করার পর, সে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, মা-বাবার কথা মনে করে কাঁদত। যদিও কিছুদিনের মধ্যেই আমার বিদেশে চলে যাওয়ার কথা, সামাজিক রীতি অনুযায়ী মালা তখন আমার পরিবারের একজন। তাই পরের ছয় সপ্তাহ সে আমার দাদা-বউদির সঙ্গেই থাকবে, রান্না করবে, ঘরদোর পরিষ্কার রাখবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিথিদের চা-মিষ্টি দেবে। আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনও চেষ্টা করিনি। খাটের অন্য পাশে শুয়ে টর্চের আলোয় গাইডবইটা পড়তাম আর আমার আসন্ন সফরের কথা ভাবতাম। মাঝে মাঝে দেওয়ালের ওধারে যে ছোট্ট ঘরটায় আমার মা থাকতেন, সেটার কথাও ভাবতাম। এখন ঘরটা প্রায় ফাঁকা। যে কাঠের খাটে মা একসময় শুতেন, সেটার ওপর এখন ট্রাঙ্ক আর পুরনো বিছানা রাখা। প্রায় ছ'বছর আগে লন্ডন যাওয়ার আগে আমি মাকে ওই বিছানায় শুয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে দেখেছি। তাঁর শেষ দিনগুলোয় তাঁকে নিজের নোংরা নিয়ে খেলা করতে দেখেছি। মাকে দাহ করার আগে আমি তাঁর নখগুলো একটা হেয়ারপিন দিয়ে পরিষ্কার করেছিলাম। তারপর, দাদা বেশি ভেঙে পড়েছিল বলে, আমিই তাঁর মুখে আগুন দিয়ে, তাঁর কষ্ট-জর্জরিত আত্মাকে স্বর্গে পাঠিয়ে বড় ছেলের দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

পরদিন সকালে আমি মিসেস ক্রফ্‌টের বাড়ির সেই ঘরে গিয়ে উঠলাম। দরজা খোলার পর দেখলাম তিনি আগের দিনের মতোই, সেই পিয়ানো বেঞ্চের ধারেই বসে আছেন। পরনে সেই একই কালো স্কার্ট, সেই সাদা মাড় দেওয়া ব্লাউজ, হাতগুলো একইভাবে কোলের ওপর মুড়ে রাখা। মনে হচ্ছিল যেন, তিনি সারা রাত ওই বেঞ্চে বসেই কাটিয়েছেন। আমার সুটকেস ওপরে রেখে, রান্নাঘর থেকে ফ্লাস্কে ফুটন্ত গরম জল ভরে কাজে চলে গেলাম। সন্ধেবেলা যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরলাম, তিনি সেই একইভাবে বসে ছিলেন।

"বসো!" হাত দিয়ে পাশে বেঞ্চটা চাপড়ে তিনি বললেন।

তাঁর পাশে বেঞ্চের ওপর বসলাম। আমার হাতে মুদিখানার মালপত্র ভরতি একটা ব্যাগে আরও দুধ, আরও কর্নফ্লেক্স, আরও কলা। কারণ, আগের দিন রান্নাঘরে গিয়ে দেখেছিলাম, সেখানে কোনও বাড়তি কড়াই, তাওয়া বা অন্য বাসন নেই। ফ্রিজে শুধু দুটো সসপ্যান ছিল, দুটোতেই কমলা রঙের কোনও তরল পদার্থ রাখা। স্টোভের ওপর একটা তামার কেটলি বসানো।

"শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি লকটা ঠিক করে দেখে নিয়েছি কি না। বললাম দেখেছি। এক মিনিট তিনি চুপ করে রইলেন। তারপর আগের দিনের

AMARBOI.COM

মতোই অবিশ্বাস আর আনন্দ মেশানো গলায় হঠাৎ ঘোষণা করলেন, "চাঁদে আমেরিকার পতাকা লাগানো হয়েছে!"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

"চাঁদে পতাকা! দারুণ খবর, না?"

এরপর কী আসছে আশঙ্কা করে আমি মাথা নাড়লাম। "হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

"বলো, দারুণ!"

যদিও জানতাম যে, বাড়িতে আর কেউ নেই, তবুও আমি একটু থেমে, দু'দিকে দেখে নিলাম কেউ শুনতে পাবে কি না। নিজেকে ডাহা মূর্খ মনে হচ্ছিল। কিন্তু কারও জন্য এইটুকু করা যেতেই পারে। "দারুণ!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

কয়েকদিনের মধ্যে ওটাই আমাদের নিয়ম হয়ে গেল। সকালে যখন আমি লাইব্রেরি যেতাম, মিসেস ক্রফ্‌ট হয় আমার চোখের আড়ালে, সিঁড়ির অন্যদিকে তাঁর শোওয়ার ঘরে থাকতেন, নয়তো বেঞ্চে বসে, আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হয়ে, রেডিয়োতে খবর বা ক্লাসিকাল সংগীত শুনতেন। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধেবেলা আমি যখন ফিরতাম, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত। তিনি বেঞ্চে চাপড় মেরে আমায় বসতে হুকুম করতেন। ঘোষণা করতেন যে, চাঁদে আমেরিকার পতাকা লাগানো হয়েছে। আর তারপর জানাতেন যে, এটা একটা দারুণ খবর। আমিও বলতাম, 'দারুণ!' আর তারপর আমরা চুপ করে বসে থাকতাম। যদিও সেই সময়টুকু আমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর আর অন্তহীন মনে হত, রাতের সেই সাক্ষাৎকারগুলো আসলে মাত্র মিনিট দশেকই চলত। অনিবার্যভাবে মিসেস ক্রফ্‌ট ঘুমিয়ে পড়তেন। তাঁর মাথাটা হঠাৎ বুকের দিকে ঝুঁকে পড়ত। আমিও ছাড়া পেয়ে ঘরে চলে যেতাম। বলা বাহুল্য, ততদিনে চাঁদে কোনও পতাকাই ছিল না। কাগজে পড়েছিলাম যে, অ্যাস্ট্রোনটরা পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় সেটা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেই খবরটা আমি মিসেস ক্রফ্‌টকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

শুক্রবার সকালে, যখন প্রথম সপ্তাহের ভাড়া দেওয়ার কথা, আমি বৈঠকখানার পিয়ানোটার ওপর টাকাটা রাখতে গেলাম। পিয়ানোর চাবিগুলো রং উঠে মলিন হয়ে গিয়েছে, আমি একটা আঙুল দিয়ে টেপবার পরও কোনও

AMARBOI.COM

আওয়াজ বেরোল না। এক ডলারের আটটা নোট একটা খামে ভরে খামের ওপর মিসেস ক্রফ্‌টের নাম লিখে দিয়েছিলাম। কোনও চিহ্ন ছাড়া, যেখানে সেখানে টাকা ফেলে রাখা আমার স্বভাব ছিল না। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখান থেকে মিসেস ক্রফ্‌টের তাঁবুর মতো স্কার্টের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। তিনি বেঞ্চে বসে রেডিয়ো শুনছিলেন। তাঁকে উঠিয়ে, পিয়ানো অবধি হাঁটানোর কোনও প্রয়োজন দেখলাম না। আমি তাঁকে কখনও হাঁটতে দেখিনি। তাঁর পাশে গোল টেবিলটায় হেলান দিয়ে দাঁড় করানো লাঠিটা দেখে ধরে নিয়েছিলাম যে, তাঁর হাঁটতে অসুবিধে হত। আমি যখন বেঞ্চটার কাছে গেলাম, তিনি চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, "কী ব্যাপার?"

"ভাড়াটা, ম্যাডাম।"

"পিয়ানোর চাবির ওপর!"

"আমি আপনাকেই দিচ্ছি।" আমি খামটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তাঁর কোলের ওপর মুড়ে রাখা আঙুলগুলো একটুও নড়ল না। আমি একটু ঝুঁকে খামটা ঠিক তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিলাম। এক মুহূর্ত পর তিনি সেটা গ্রহণ করে মাথা নাড়লেন।

সে রাতে আমি যখন বাড়ি ফিরলাম, মিসেস ক্রফ্‌ট বেঞ্চ চাপড়ে আমাকে বসতে বললেন না। কিন্তু আমি অভ্যেসবশতই তাঁর পাশে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি লকটা চেক করেছি কি না, কিন্তু চাঁদে পতাকার কথা আর তুললেন না। তার বদলে বললেন, "ইট ওয়াজ় ভেরি কাইন্ড অফ ইউ!"

"আজ্ঞে?"

"ভেরি কাইন্ড অফ ইউ!"

দেখলাম, খামটা তিনি তখনও হাতে ধরে আছেন।

রবিবার আমার দরজায় কেউ টোকা মারল। এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা বললেন তিনি মিসেস ক্রফ্‌টের মেয়ে, হেলেন। তিনি ঘরে ঢুকে দেওয়ালগুলোর দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন সেগুলোর কী পরিবর্তন হয়েছে বোঝার চেষ্টা করছেন। দেওয়াল-আলমারিতে ঝোলানো আমার শার্ট, দরজার হাতলের ওপর ফেলে রাখা নেকটাই, দেরাজের ওপর রাখা কর্নফ্লেক্সের

AMARBOI.COM

বাক্সটা, বেসিনে রাখা নোংরা বাটি-চামচ, সবকিছুর ওপরই একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। ভদ্রমহিলার চেহারা ছোটখাটো এবং স্থূলকটি। রুপোলি চুল ছোট করে ছাঁটা। ঠোঁটে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের লিপস্টিক। পরনে একটা হাতকাটা গরমকালের উপযোগী জামা। গলায় একটা সাদা প্লাস্টিকের পুঁতির মালা আর চেন লাগানো একজোড়া চশমা, যেটা দোলনার মতো তাঁর বুকের ওপর ঝুলছিল। পায়ের পিছনে ম্যাপের রেখার মতো নীল শিরা দেখা যাচ্ছিল। হাতের চামড়া, সেদ্ধ করা বেগুন গাছের মতো ঝুলে পড়েছিল। তিনি আমাকে জানালেন যে, ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে গেলে আর্লিংটন বলে যে শহরটা পড়ে, তিনি সেখানে থাকেন। "সপ্তাহে একবার দরকারি জিনিসপত্র কিনে মা'র কাছে দিয়ে যাই। উনি তোমাকে বাড়ি ছাড়ানোর উপক্রম করেছেন কি?"

"সব একদম ঠিকই আছে, ম্যাডাম।"

"কয়েকটা ছেলে তো প্রায় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে পালিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় ওঁর তোমাকে ভাল লেগেছে। তুমিই প্রথম ভাড়াটে, যাকে উনি ভদ্রলোক বলেছেন।"

"আমার কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না, ম্যাডাম।"

ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকালেন, আমার খালি পা লক্ষ করলেন। (তখনও আমার বাড়ির ভিতর জুতো পরে থাকতে অস্বস্তি লাগত। ঘরে ঢোকার আগে সবসময়ই ওগুলো খুলে রাখতাম।) "তুমি কি বস্টনে নতুন?"

"আমেরিকাতেই নতুন, ম্যাডাম।"

"কোথা থেকে এসেছ?" তিনি ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি কলকাতা, ইন্ডিয়ার লোক।"

"তাই? বছরখানেক আগে এক ব্রাজিলিয়ান ছেলে থাকতে এসেছিল। কেমব্রিজ খুব আন্তর্জাতিক শহর, দেখবে।"

আমি মাথা নাড়লাম। মনে মনে ভাবছিলাম আর কতক্ষণ এই বার্তালাপ চলবে। কিন্তু ঠিক তখনই মিসেস ক্রফ্‌টের চিলচিৎকার সিঁড়ির নীচে থেকে শোনা গেল। আমরা হলওয়েতে বেরিয়ে শুনতে পেলাম উনি চেঁচাচ্ছেন, "এই মুহূর্তে তোমরা নীচে নেমে এসো!"

"কী হল কী?" হেলেন প্রত্যুত্তরে চেঁচালেন।

"এই মুহূর্তে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সঙ্গে সঙ্গে পায়ে জুতো গলালাম। হেলেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম। সিঁড়িটা পাশাপাশি হাঁটার মতো চওড়া ছিল না, তাই আমি হেলেনের পিছন পিছন নামছিলাম। হেলেনকে দেখে মনে হল না তিনি খুব একটা তাড়াহুড়ো করছেন। বললেন যে, তাঁর একটা হাঁটু বড় কষ্ট দিচ্ছে। "লাঠি ছাড়া হাঁটছিলে নাকি?" হেলেন বললেন। "জানো তো ওই লাঠি ছাড়া তোমার হাঁটা বারণ।" একটু থেমে, সিঁড়ির রেলিং-এর ওপর হাত রেখে হেলেন আমার দিকে ফিরে তাকালেন। "মা মাঝে মাঝে পড়ে যান।"

সেই প্রথমবার আমার মিসেস ক্রফ্‌টকে কেমন যেন অসহায় মনে হল। কল্পনা করলাম, তিনি বেঞ্চটার সামনে, ছাদের দিকে তাকিয়ে, মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছেন। পায়ের পাতা দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আমরা যখন নীচে নামলাম, তিনি আগের মতোই কোলের ওপর হাত দুটো জড়ো করে বসে ছিলেন। তাঁর পায়ের কাছে মুদিখানার জিনিস বোঝাই দুটো ব্যাগ রাখা ছিল। সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি আমাদের দিকে কটমট করে তাকালেন। বেঞ্চ চাপড়ালেন না বা আমাদের বসতেও বললেন না।

"কী হয়েছে, মা?"

"খুবই অশোভন কাণ্ড।"

"কী অশোভন হল?"

AMARBOI.COM

"কোনও অভিভাবিকা উপস্থিত না থাকলে, একজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলার একান্তে কথা বলা অশোভন! যদি না তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হন।"

হেলেন বললেন, তাঁর আটষট্টি বছর বয়েস, তিনি আমার মায়ের বয়সি। কিন্তু মিসেস ক্রফ্‌ট জোর দিয়ে বললেন যে, হেলেন এবং আমার নীচের বৈঠকখানায় বসে কথা বলা উচিত। তা ছাড়াও, হেলেনের মতো কোনও ভদ্রমহিলার পক্ষে তার বয়েস প্রকাশ করা আর গোড়ালির অত ওপরে স্কার্ট পরা, অত্যন্ত অনুচিত।

"তোমাকে জানিয়ে রাখি মা, সালটা ১৯৬৯। কোনওদিন যদি সত্যি সত্যি বাড়ির বাইরে বেরোও আর বাইরে কোনও মিনিস্কার্ট পরা মেয়েকে দেখো, তা হলে তুমি কী করবে?"

মিসেস ক্রফ্‌ট নাকে অবজ্ঞার আওয়াজ করলেন। "তাকে হাজতে পোরার ব্যবস্থা করব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেলেন মাথা ঝাঁকিয়ে একটা ব্যাগ তুলে নিলেন। আমি অন্যটা তুলে তাঁর পিছন পিছন বৈঠকখানার ভিতর দিয়ে রান্নাঘরে গেলাম। দুটো ব্যাগই সুপের ক্যানে ভরতি ছিল। হেলেন সেগুলো এক এক করে একটা ক্যানওপেনার দিয়ে খুলতে লাগলেন। সসপ্যানের পুরনো সুপটা সিঙ্কে ফেলে দিয়ে, কলের তলায় প্যানগুলো ধুয়ে, নতুন ক্যানের সুপ সেগুলোয় ঢেলে প্যানগুলো আবার ফ্রিজে ঢোকালেন।

"কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ক্যানগুলো মা নিজেই খুলতে পারতেন," হেলেন বললেন। "এখনও ওঁর খুব খারাপ লাগে যে কাজটা আমাকে করে দিতে হয়। পিয়ানো বাজিয়েই ওঁর হাতের এই অবস্থা।" হেলেন চোখে চশমা লাগিয়ে, কাবার্ডের দিকে তাকিয়ে আমার টি-ব্যাগগুলো দেখতে পেলেন। "এক কাপ চা খাওয়া যাক?"

আমি স্টোভের ওপর কেটলিটা বসালাম। "কী বলছিলেন ম্যাডাম? পিয়ানো?"

"চল্লিশ বছর ধরে মা পিয়ানো শেখাতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর ওইভাবেই মা আমাদের মানুষ করেছেন।" পিছনে হাত রেখে হেলেন খোলা রেফ্রিজারেটরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভিতরে হাত বাড়িয়ে, মুড়ে রাখা একটা মাখনের দলা বের করে এনে, ভুরু কুঁচকে সেটাকে জঞ্জালের বালতিতে ফেলে দিলেন। "মনে হয় ওতেই হয়ে যাবে," বলে যে ক্যানগুলো খোলা হয়নি সেগুলো কাবার্ডে রেখে দিলেন। আমি টেবিলে বসে বসে দেখলাম, হেলেন নোংরা ডিশগুলো ধুলেন, জঞ্জালের ব্যাগটা বেঁধে ফেললেন, সিঙ্কের ওপর একটা স্পাইডার প্ল্যান্টে জল দিলেন আর দুটো কাপে ফুটন্ত গরম জল ঢাললেন। দুধ ছাড়া একটা কাপে টি-ব্যাগ ডুবিয়ে কাপটা আমার হাতে দিয়ে হেলেন টেবিলে এসে বসলেন।

"কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, কিন্তু এটা কি যথেষ্ট?"

হেলেন চায়ে চুমুক দিলেন। ওঁর লিপস্টিক কাপের কানায় একটা হাসির গোলাপি ছাপ ফেলল। "কোনটা যথেষ্ট?"

"প্যানের সুপটা। ওইটুকু খাবার কি মিসেস ক্রফ্‌টের জন্য যথেষ্ট?"

"উনি আর কিছু খাবেন না। ওঁর একশো বছর বয়েস হওয়ার পর থেকে উনি সলিড খাবার খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। তা প্রায় বছর তিনেক হল।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি ধরে নিয়েছিলাম মিসেস ক্রফ্‌টের বয়েস

AMARBOI.COM

আশির ওপর হবে, এমনকী প্রায় নব্বইও হতে পারে। একশো বছরের বেশি বেঁচেছেন এমন আর কাউকে আমি চিনি না। আর এই বিধবা বৃদ্ধাকে একলা থাকতে হয়, ভেবে আমি আরও মর্মাহত হলাম। বৈধব্যই আমার মাকে অপ্রকৃতিস্থ করে তুলেছিল।

আমার বাবা কলকাতার জেনারেল পোস্ট অফিসে কেরানির চাকরি করতেন। আমার যখন ষোলো বছর বয়েস, তখন তিনি এনকেফালাইটিস রোগে মারা যান। স্বামীহীন জীবনের সঙ্গে মা কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেননি। যত দিন যেতে লাগল মা যেন একটা অন্ধকারের জগতের আরও গভীরে তলিয়ে যেতে থাকলেন। সেখান থেকে না আমি, না আমার দাদা, না কোনও উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজন আর না রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের কোনও সাইকিয়্যাট্রিক ক্লিনিক, কেউই তাঁকে উদ্ধার করে আনতে পারল না। মা ব্যবহারিক জীবনের সব শিষ্টতা, নিয়ম ক্রমে ভুলে যাচ্ছিলেন দেখেই আমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেতাম। তিনি লোকজনের সামনে আওয়াজ করে ঢেকুর তুলতেন বা বায়ু বের করতে একটুও অস্বস্তি বোধ করতেন না। বাবার মৃত্যুর পর দাদা পড়াশোনা ছেড়ে, সংসার চালানোর জন্য চটকলে কাজ করতে শুরু করল। পরে সে সেই মিলেরই ম্যানেজার হয়েছিল। তাই আমার ওপরেই মাকে দেখাশোনার দায়িত্ব পড়েছিল। মায়ের পায়ের কাছে বসে আমি পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করতাম। মা বসে বসে তাঁর হাতের চুড়িগুলো গুনতেন, যেমনভাবে কেউ অ্যাবাকাসের পুঁতি গোনে। আমরা সবসময়ই তাঁর ওপর নজর রাখার চেষ্টা করতাম। একবার তিনি অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় বেরিয়ে ট্রামডিপো পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। তারপর আমরা তাঁকে খুঁজে আনি।

"সন্ধেবেলায় আমি মিসেস ক্রফ্‌টের সুপ গরম করে দিতে পারি," টি-ব্যাগটা চায়ের কাপ থেকে বের করে সেটা নিঙড়ে নিতে নিতে আমি প্রস্তাব দিলাম। "আমার কোনও অসুবিধেই হবে না।"

হেলেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চায়ের তলানিটুকু সিঙ্কে ফেলে দিলেন। "না করাই ভাল। সেরকম কোনও সাহায্য ওঁকে একেবারে শেষ করে দেবে।"

সেদিন সন্ধেবেলা, যখন হেলেন আর্লিংটনে ফিরে গেলেন আর আমি এবং মিসেস ক্রফ্‌ট বাড়িতে আবার একা হয়ে গেলাম, তখন আমার দুশ্চিন্তা শুরু

AMARBOI.COM

হল। তিনি ঠিক কতটা বৃদ্ধ, সেটা জানার পর কেবলই আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে, মাঝরাত্তিরে বা দিনের বেলা আমি যখন থাকব না, তখন তাঁর কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। তাঁর গলা যতই বাজখাঁই হোক না কেন কিংবা তাঁর আচরণ যতই কড়া বা প্রভুসুলভ মনে হোক না কেন, আমি জানতাম যে, ওই বয়সের মানুষের জন্য অল্প কাটাছেঁড়া বা সর্দিকাশিও মারাত্মক। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি দিনই এখন একটা বিস্ময় বলা যেতে পারে। যদিও হেলেনকে যথেষ্ট অমায়িক বলেই মনে হয়েছিল, তবু আমার মনের কোণে একটা সংশয় ছিল যে, কিছু ঘটে গেলে সে আমাকেই দায়ী করবে। হেলেনকে দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়নি। একের পর এক রবিবার সে আসে-যায় আর মিসেস ক্রফ্‌টকে সুপ এনে দেয়।

এইভাবেই সেই গ্রীষ্মের ছ'সপ্তাহ কেটে গেল। প্রতিদিন সন্ধেবেলা, লাইব্রেরিতে কাজ করার পর, আমি বাড়ি ফিরে, কয়েক মিনিটের জন্য মিসেস ক্রফ্‌টের পাশে, পিয়ানোর বেঞ্চটার ওপর বসতাম। আমি ওইটুকু সময় তাঁর সঙ্গে কাটাতাম। আশ্বস্ত করতাম দরজার লকটা চেক করে নিয়েছি আর চাঁদে পতাকার খবরটা সত্যিই দারুণ। কোনও কোনও সন্ধেবেলা তিনি বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ার পরও অনেকক্ষণ আমি সেখানে বসে থাকতাম। অবাক হয়ে ভাবতাম কতগুলো বছর তিনি এই পৃথিবীতে কাটিয়েছেন। মাঝে মাঝে কল্পনা করার চেষ্টা করতাম তিনি যে সময়ে জন্মেছিলেন, সেই জগৎটা কেমন ছিল। ১৮৬৬ সালের সেই সময়ের পৃথিবীতে নিশ্চয়ই লম্বা, কালো স্কার্ট পরা অনেক মেয়ে বৈঠকখানায় বসে ভদ্র বাক্যালাপ করত। তাঁর কোলের ওপর মুড়ে রাখা হাতের ফুলে যাওয়া গাঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করতাম সেই আঙুলগুলোই, সরু আর মসৃণ অবস্থায় পিয়ানো বাজাচ্ছে। মাঝে মাঝে শুতে যাওয়ার আগে, নীচে গিয়ে দেখে আসতাম তিনি বেঞ্চের ওপর ঠিক সোজা হয়ে বসে আছেন না নিজের ঘরে শুতে গিয়েছেন। শুক্রবার হলেই তাঁর ভাড়া মিটিয়ে দিতে ভুল হত না। এই কয়েকটা সাধারণ কাজ করা ছাড়া আমার তাঁর জন্য আর কিছুই করার ছিল না। আমি তাঁর ছেলে নই। আমার কাছে ভাড়ার আট ডলারের বেশি তাঁর আর কিছু প্রাপ্য ছিল না।

আগস্টের শেষে মালার পাসপোর্ট আর গ্রিনকার্ড তৈরি হয়ে গেল। ওর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্লাইটের খোঁজখবর দিয়ে একটা টেলিগ্রাম এল। কলকাতায় আমার দাদার বাড়িতে কোনও টেলিফোন ছিল না। সেই সময় মালার লেখা একটা চিঠিও পেয়েছিলাম। আমি চলে আসার কিছুদিন পরেই সে চিঠিটা লিখেছিল। চিঠিতে কোনও সম্বোধন ছিল না। যে ঘনিষ্ঠতা আমাদের মধ্যে তখনও গড়ে ওঠেনি আমার নাম ধরে চিঠিটা লিখলে সেটাই ধরে নেওয়া হত। মাত্র কয়েক লাইনের চিঠি। 'আমি যাওয়ার আগে অভ্যাস করার জন্য ইংরেজিতে লিখছি। আমি এখানে খুবই একলা বোধ করি। ওখানে কি খুব ঠান্ডা? বরফ পড়ছে? তোমার, মালা।'

তার চিঠিটা যে আমার মনকে খুব একটা স্পর্শ করল, তা নয়। আমরা খুব অল্প দিনই পরস্পরের সঙ্গে কাটিয়েছি, তবুও আমরা একই বন্ধনে যুক্ত। ছ'সপ্তাহ ধরে সে হাতে লোহার চুড়ি পড়েছে, সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়েছে। পৃথিবীর কাছে নববধূ হিসেবে সেটাই হল তার পরিচয়। আমার কাছে সেই ছ'সপ্তাহ তার আসা আর পরবর্তী মাস বা পরবর্তী ঋতু আসার মতোই অনিবার্য, অর্থহীন ছিল। আমি মালাকে এতটাই কম চিনতাম যে, মাঝে মাঝে তার মুখের কোনও বৈশিষ্ট্য মনে পড়লেও, পুরো মুখটা মনে করতে পারতাম না।

চিঠিটা পাওয়ার কিছুদিন পর, এক সকালে কাজে যাওয়ার সময়, ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউয়ে এক ভারতীয় ভদ্রমহিলাকে চোখে পড়ল। তাঁর শাড়ির আঁচলটা প্রায় ফুটপাথে লুটোচ্ছিল। একটি বাচ্চাকে প্র্যামে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশ দিয়ে এক আমেরিকান ভদ্রমহিলা একটা ছোট, কালো কুকুরের গলায় চেন লাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কুকুরটা হঠাৎই ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করল। রাস্তার উলটোদিক থেকে আমি দেখলাম যে, ভারতীয় মহিলাটি চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কুকুরটা লাফিয়ে উঠে তাঁর আঁচলটা কামড়ে ধরল। আমেরিকান ভদ্রমহিলাটি কুকুরটাকে ধমক দিয়ে, ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করে, সেখান থেকে দ্রুত হেঁটে চলে গেলেন। ভারতীয় ভদ্রমহিলাকে ফুটপাথের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে, তাঁর শাড়ি ঠিক করতে আর শিশুটিকে শান্ত করতে হল। আমাকে তিনি দেখতে পাননি। কিছুক্ষণ পরে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। সেই সকালে আমি উপলব্ধি করলাম যে, খুব শিগগিরই আমাকেও ওরকম কোনও সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হতে পারে। মালার দেখাশোনা করা, তাকে স্বাগত জানানো আর তাকে নিরাপদে রাখার দায়িত্ব আমারই। আমাকেই তার প্রথম স্নো-বুট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোড়া, শীতকালের প্রথম কোট কিনে দিতে হবে। আমাকেই শেখাতে হবে কোন রাস্তাগুলো এড়িয়ে চলা উচিত, কোনদিক থেকে যান-চলাচল হয়, বলতে হবে যে শাড়িটা এমনভাবে পরো যাতে আঁচলটা মাটিতে না লুটোয়। কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে আমার মনে পড়ল যে, এই মেয়েটিই তার মা-বাবার থেকে পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে পড়ায় কান্নাকাটি করেছিল।

মালার সঙ্গে আমার পার্থক্য ছিল এই যে, ততদিনে আমি সে সবকিছুতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কর্নফ্লেক্স আর দুধ, হেলেনের দেখা করতে আসা, মিসেস ক্রফ্‌টের সঙ্গে বেঞ্চের ওপর বসা, এ সবকিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। শুধু মালার সঙ্গে থাকাটাই অভ্যেস হয়নি। যাই হোক, আমি আমার দায়িত্ব অনুযায়ী, এম আই টির হাউসিং অফিসে গিয়ে কয়েক ব্লক দূরে একটা আসবাবপত্রওলা অ্যাপার্টমেন্টের হদিশ বের করলাম। জোড়া খাট, ব্যক্তিগত রান্নাঘর আর বাথরুম। ভাড়া সপ্তাহে চল্লিশ ডলার। এক শুক্রবার, শেষবারের মতো আটটা এক ডলারের নোট খামে ভরে আমার সুটকেসটা নিয়ে নীচে এসে, মিসেক ক্রফ্‌টকে জানালাম যে, আমি সেখান থেকে চলে যাচ্ছি। তিনি আমার চাবিটা পার্সে রেখে দিলেন। শেষ তিনি আমাকে যা করতে বলেছিলেন তা হল, তাঁর হাতে টেবিলে হেলান দিয়ে রাখা লাঠিটা তুলে দিতে, যাতে তিনি দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আমার পিছনে সেটা বন্ধ করে দিতে পারেন। "তা হলে, গুডবাই," বলে তিনি বাড়ির ভিতর ফিরে গেলেন। তিনি যে কোনওরকম আবেগ প্রকাশ করবেন সেটা আশা করিনি। তবুও একটু হতাশ হলাম। আমি তো শুধুই একজন বোর্ডার। যে ছ'সপ্তাহ ধরে তাঁকে অল্প কিছু টাকা দিত আর তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। এক শতাব্দীর তুলনায় সেটা খুবই সামান্য সময়।

এয়ারপোর্টে মালাকে দেখেই চিনতে পারলাম। তার আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছিল না। মাথায় ঘোমটা দেওয়া ছিল, ঠিক যেমন করে বাবার মৃত্যুদিন পর্যন্ত মায়ের মাথায় দেওয়া থাকত। তার রোগা, শ্যামবর্ণ হাতগুলোয় গোছা গোছা চুড়ি, কপালে একটা ছোট লাল টিপ আঁকা আর পায়ে আলতা। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম না, চুমু খেলাম না এমনকী, তার হাতও ধরলাম না। বাংলায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম তার খিদে পেয়েছে কিনা। সেই আমার আমেরিকাতে আসার পর প্রথম বাংলা বলা।

AMARBOI.COM

একটু ইতস্তত করে সে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ পেয়েছে।

আমি বাড়িতে ডিমের ডালনা করেছি। "প্লেনে কী খেতে দিয়েছিল?"

"আমি খাইনি।"

"কলকাতা থেকে এখানে সারা রাস্তা কিছুই খাওনি?"

"মেনুতে লেখা ছিল অক্সটেল সুপ।"

"কিন্তু অন্য খাবারও ছিল নিশ্চয়ই?"

"ষাঁড়ের লেজ খাওয়ার কথা ভেবে আমার খিদে চলে গেল।"

বাড়ি পৌঁছোনোর পর মালা তার সুটকেস খুলে আমাকে দুটো পুলোভার সোয়েটার দিল। দুটোই সে উজ্জ্বল নীল রঙের উল দিয়ে যখন আমরা আলাদা ছিলাম, তখন বুনেছিল। একটার ভি-গলা, অন্যটায় ঘন কেব্‌ল করা। পরে দেখলাম, দুটোই বগলের কাছে টাইট হল। মালা আমার জন্য দু'টো নতুন দড়ি বাঁধা পাজামা, দাদার একটা চিঠি আর এক প্যাকেট দার্জিলিং চা-ও এনেছিল। কিন্তু আমার কাছে ওই ডিমের ডালনা ছাড়া তার জন্য আর কোনও উপহার ছিল না। আমরা একটা খালি টেবিলে বসে দু'জনেই নিজেদের প্লেটের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হাত দিয়ে ছুঁলাম। আমেরিকায় আসার পর সেটাও আর আমার করা হয়নি।

"বাড়িটা ভাল", মালা বলল। "ডিমের ডালনাটাও।" সে বাঁ হাত দিয়ে তার আঁচলের প্রান্তটা বুকের কাছে ধরে ছিল, যাতে মাথা থেকে ঘোমটা খসে না পড়ে।

"আমি বেশি রান্না জানি না।"

মালা খাওয়ার আগে আলুগুলোর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে মাথা নাড়ল। একবার তার ঘোমটা মাথা থেকে কাঁধে খসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মালা সেটাকে ঠিক করে নিল।

"এখানে তোমার মাথা ঢাকা দেওয়ার কোনও দরকার নেই," আমি বললাম। "আমি কিছু মনে করব না। এখানে ওসবের কোনও মানে নেই।"

সে অবশ্য মাথা ঢাকা দিয়েই রাখল।

আমি তার সাহচর্যে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করলাম। আমার পাশে, আমার টেবিলে, আমার বিছানায় তার উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হতে। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে অপরিচয়ের বাধা কাটল না। বাড়ি ফিরে ঘরে ধোঁয়া ওঠা ভাতের গন্ধ, বাথরুমের বেসিনটা তকতকে পরিষ্কার করে

AMARBOI.COM

মোছা, আমাদের দু'জনের দুটো টুথব্রাশ পাশাপাশি রাখা, সোপডিশে ভারত থেকে আনা পিয়ার্স সাবান, কোনওটাতেই আমি তখনও অভ্যস্ত হতে পারিনি। প্রতি রাতে মালা মাথায় যে নারকেল তেল লাগাত, তার সুগন্ধ, বা হাঁটাচলা করার সময়ে তার হাতের চুড়ির কমনীয় আওয়াজের প্রতিও আমি অভ্যস্ত হতে পারিনি। সকালে সে রোজ আমার আগে উঠে পড়ত। প্রথমদিন সকালবেলায় আমি যখন রান্নাঘরে ঢুকলাম, সে আগের দিনের খাবার গরম করে, একটা প্লেটে দিয়ে তার এক ধারে এক চিমটে নুন রেখে সেটা টেবিলে রেখে দিয়েছিল। সে ভেবেছিল বেশিরভাগ বাঙালি স্বামীর মতো আমিও সকালে ভাতই খাব। আমি তাকে জানালাম আমার সিরিয়াল হলেই চলবে। পরের দিন সকালে রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম সে আমার বাটিতে কর্নফ্লেক্স ঢেলে রেখে দিয়েছে। একদিন মালা আমার সঙ্গে ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ দিয়ে হেঁটে এমআইটি গেল। সেখানে ওকে ক্যাম্পাসটা ঘুরিয়ে দেখালাম। পথে একটা হার্ডওয়্যারের দোকানে থেমে আমি চাবির একটা ডুপ্লিকেট করিয়ে নিলাম যাতে মালা নিজে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে পারে। পরদিন সকালে কাজে বেরোনোর আগে মালা আমার কাছে কিছু টাকা চাইল। আমি অনিচ্ছাসহকারে টাকাটা তাকে দিলাম, যদিও জানতাম যে, তখন সেটাও স্বাভাবিক। বাড়ি ফিরে দেখলাম, রান্নাঘরের দেরাজে আলুর খোসা ছাড়ানোর একটা যন্ত্র, টেবিলের ওপর টেবিলক্লথ আর স্টোভের ওপর তাজা আদা-রসুন দিয়ে রাঁধা মুরগির মাংস। সে সময় আমাদের টেলিভিশন ছিল না। রাতে খাওয়ার পর আমি কাগজ পড়তাম আর মালা রান্নাঘরের টেবিলে বসে সেই উজ্জ্বল নীল রঙের উল দিয়ে নিজের জন্য কার্ডিগান বুনত কিংবা বাড়িতে চিঠি লিখত।

প্রথম সপ্তাহের শেষে, শুক্রবার, আমি বেড়ানোর প্রস্তাব দিলাম। মালা উলবোনা নামিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকল। যখন সে বেরিয়ে এল, তখন আমার প্রস্তাবটা দেওয়ার জন্য আপশোস হল। মালা একটা পরিষ্কার সিল্কের শাড়ি আর আরও কয়েকটা চুড়ি পরেছিল। খুব কায়দা করে, পাশে সিঁথি কেটে, মাথার ওপর একটা খোঁপাও করেছিল। তাকে দেখে মনে হল সে কোনও নেমন্তন্ন বা নিদেনপক্ষে কোনও সিনেমা দেখতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমার সেরকম কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। সন্ধের বাতাসটা খুব আরামদায়ক লাগছিল। আমরা রেস্তোরাঁ আর দোকানের জানলায় উঁকি

AMARBOI.COM

মারতে মারতে ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ ধরে অনেকদূর এগিয়ে গেলাম। তারপর, কিছু না ভেবেই, আমি মালাকে সেই শান্ত, নির্জন রাস্তাটায় নিয়ে গেলাম, যেখানে কত রাত আমি একা একা হেঁটেছি।

"তুমি আসার আগে আমি এখানেই থাকতাম," মিসেস ক্রফ্‌টের চেন-লিঙ্ক বেড়ার সামনে থেমে দাঁড়িয়ে আমি বললাম।

"এত বড় বাড়িতে থাকতে?"

"ওপরের একটা ছোট ঘরে থাকতাম। পিছনদিকে।"

"এখানে আর কে থাকে?"

"একজন খুব বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা।"

"পরিবারের সঙ্গে থাকেন?"

"না একলা।"

"কিন্তু ওঁর দেখাশোনা করে কে?"

আমি গেটটা খুললাম। "বেশিরভাগ সময় উনি নিজেই নিজের দেখাশোনা করেন।"

কী জানি মিসেস ক্রফ্‌টের আমাকে মনে আছে কি না। কে জানে কোনও নতুন ভাড়াটে প্রতিদিন সন্ধেবেলা, বেঞ্চের ওপর, তাঁর পাশে এসে বসে কি না। যখন বেল বাজালাম, সেই প্রথম দিনের কথা ভাবছিলাম, যখন আমার কাছে চাবি ছিল না, তখন যেমন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল, আজও তাই হবে। কিন্তু এবার, দরজা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল। দরজা খুলে দিলেন হেলেন। মিসেস ক্রফ্‌ট সেখানে ছিলেন না। বেঞ্চটাই আর ওখানে ছিল না।

"হ্যালো," তাঁর উজ্জ্বল গোলাপি ঠোঁটে মালার দিকে হেসে হেলেন বললেন। "মা বৈঠকখানায় আছেন। তোমরা কি কিছুক্ষণ থাকবে?"

"আপনি যা বলবেন, ম্যাডাম।"

"তা হলে যদি কিছু মনে না করো, আমি একটু দোকান থেকে ঘুরে আসি। মায়ের একটা ছোট্ট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা আজকাল ওঁকে এক মিনিটের জন্যেও একলা রাখতে পারি না।"

হেলেন চলে যাওয়ার পর আমি দরজাটা লক করে বৈঠকখানায় ঢুকলাম। মিসেস ক্রফ্‌ট চিত হয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর মাথায় একটা পিচ রঙের বালিশ আর গায়ে একটা পাতলা, সাদা চাদর ঢাকা দেওয়া। হাত দুটো বুকের ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঁজ করা। আমাকে দেখে তিনি সোফাটা দেখিয়ে বসতে বললেন। আমি তাঁর কথামতো বসলাম, কিন্তু মালা পিয়ানোর কাছে গিয়ে বেঞ্চের ওপর বসল। বেঞ্চটা এতদিনে সঠিক জায়গায় ফিরে এসেছিল।

"আমার কোমর ভেঙে গিয়েছে!" মিসেস ক্রফ্‌ট এমনভাবে বললেন, যেন আমাদের মধ্যে রোজই দেখা হচ্ছে।

"এহে, ম্যাডাম।"

"আমি বেঞ্চ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম!"

"আমি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত, ম্যাডাম।"

"একেবারে মাঝরাত্তিরে! জানো তখন আমি কী করলাম?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"আমি পুলিশ ডাকলাম!"

মিসেস ক্রফ্‌ট ছাদের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি হাসলেন। তাঁর একপাটি লম্বা, ধূসর রঙের দাঁত দেখা গেল। একটা দাঁতও পড়ে যায়নি। "এবার কী বলবে তুমি?"

একদম হতবাক হওয়া সত্ত্বেও আমি জানতাম কী বলতে হবে। একটুও ইতস্তত না করে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "দারুণ!"

মালা হেসে উঠল। ওর গলার স্বরে দয়া উপচে পড়ছিল, চোখ কৌতুকে জ্বলজ্বল করছিল। আমি কখনও তাকে হাসতে শুনিনি। সে যথেষ্ট জোরেই হাসছিল, তাই মিসেস ক্রফ্‌টও শুনতে পেলেন। তিনি মালার দিকে কটমট করে তাকালেন।

"এ কে?"

"ও আমার স্ত্রী, ম্যাডাম।"

ভাল করে দেখার জন্য মিসেস ক্রফ্‌ট বালিশের ওপর তাঁর মাথাটা বেঁকিয়ে নিলেন। "তুমি পিয়ানো বাজাতে পারো?"

"না, ম্যাডাম," মালা উত্তর দিল।

"তা হলে উঠে দাঁড়াও!"

মালা নিজের ঘোমটা ঠিক করতে করতে আঁচলের প্রান্তটা বুকের কাছে ধরে, উঠে দাঁড়াল। সে আমেরিকায় আসার পর সেই প্রথম আমি তার জন্য সহানুভূতি অনুভব করলাম। লন্ডনের সেই প্রথম দিনগুলোর কথা আমার মনে পড়ে গেল। যখন কী করে টিউবে চড়ে রাসেল স্কোয়্যার যেতে হয়

AMARBOI.COM

শিখেছিলাম, প্রথমবার এস্কালেটরে চড়েছিলাম। যে লোকটা 'পাইপার' বলে চেঁচাচ্ছিল সে যে আসলে পেপার-এর কথা বলছিল, তা বুঝতে পারিনি। কোনও স্টেশন থেকে ট্রেনটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় কনডাক্টর বলত, 'মাইন্ড দ্য গ্যাপ।' যার অর্থ বুঝতে আমার গোটা এক বছর লেগেছিল। আমার মতো মালাও নিজের ঘর ছেড়ে বহুদূর এসেছে। কোথায় যাবে জানে না, কী খুঁজে পাবে জানে না। এসেছে শুধু এই কারণে যে, সে আমার স্ত্রী। যদিও তখন সেটা ভাবতে অদ্ভুত লাগছিল, তবুও আমি মনে মনে জানতাম যে, একদিন তার মৃত্যু আমাকে প্রভাবিত করবে। আর তার চেয়েও অদ্ভুত লাগল ভেবে যে, একদিন আমার মৃত্যুও তাকে প্রভাবিত করবে। আমি কোনওভাবে মিসেস ক্রফ্‌টকে এই কথাটা বোঝাতে চাইছিলাম। তিনি তখনও মালাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখছিলেন। মুখের ভাব দেখে মনে হল তিনি মালাকে শান্তভাবে, বেশ অবজ্ঞার চোখে নিরীক্ষণ করছেন। মনে মনে ভাবলাম মিসেস ক্রফ্‌ট আগে কোনওদিন পরনে শাড়ি, কপালে টিপ, হাতে গোছা গোছা চুড়ি, এমন কোনও মেয়েকে দেখেছেন কি না! ভাবার চেষ্টা করলাম তিনি কীসে কীসে আপত্তি জানাতে পারেন। মালার পায়ের গাঢ় আলতা শাড়ির তলায় প্রায় লুকিয়ে পড়েছিল, মিসেস ক্রফ্‌ট কি সেটা দেখতে পেয়েছেন। অবশেষে মিসেস ক্রফ্‌ট তাঁর সেই অবিশ্বাস আর আনন্দ মিশ্রিত পরিচিত স্বরে ঘোষণা করলেন, "সি ইজ আ পারফেক্ট লেডি!"

এবার আমার হাসার পালা। আমি আস্তে আস্তেই হাসছিলাম, তাই মিসেস ক্রফ্‌ট শুনতে পেলেন না, কিন্তু মালা শুনতে পেয়েছিল। সেই প্রথমবার, আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

আমি মনে করি সেই দিন, সেই মুহূর্ত থেকেই মালা আর আমার মধ্যে ব্যবধান কমতে শুরু করেছিল। যদিও তখনও আমাদের মধ্যে ভালবাসা সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠেনি, তবুও তার পরের মাসগুলোকে আমার এক ধরনের মধুচন্দ্রিমা বলে ভাবতে ভাল লাগে। আমরা একসঙ্গে শহরটায় ঘুরে বেড়াতাম। অন্যান্য বাঙালিদের সঙ্গে পরিচয় হল। তাদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গে আজও আমাদের বন্ধুত্ব আছে। প্রস্পেক্ট স্ট্রিটে বিল নামে একটি লোককে আবিষ্কার করলাম, যে তাজা মাছ বিক্রি করত। হার্ভার্ড স্কোয়ারে 'কার্ডুলোস' বলে একটা দোকান খুঁজে বের করলাম, যেখানে তেজপাতা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লবঙ্গ পাওয়া যেত। সন্ধেবেলা আমরা হাঁটতে হাঁটতে চার্লস নদীর কাছে জলের ওপর নৌকোর ভেসে বেড়ানো দেখতে যেতাম। অথবা হার্ভার্ড ইয়ার্ডে গিয়ে আইসক্রিম খেতাম। আমাদের যৌথজীবনের ছবি তুলব বলে একটা ইনস্ট্যামাটিক ক্যামেরা কিনলাম। প্রুডেনশিয়াল বিল্ডিং-এর সামনে মালাকে দাঁড় করিয়ে তার ছবি তুললাম, যাতে সেগুলো তার মা-বাবাকে পাঠানো যায়। রাত্রে আমাদের লাজুক চুম্বন শীঘ্রই সাহসী হয়ে উঠল। পরস্পরের আলিঙ্গনে আমরা সুখ ও শান্তি খুঁজে পেলাম। আমি তাকে এস এস রোমায় চেপে আমার সমুদ্রসফর, ফিন্সবারি পার্ক, ওয়াই এম সি এ, মিসেস ক্রফ্‌টের সঙ্গে সন্ধেবেলা বেঞ্চে বসে থাকা, সব গল্প করলাম। আমার মায়ের গল্প শুনে মালা কেঁদে ফেলল। এক সন্ধেবেলা গ্লোব-এ যখন মিসেস ক্রফ্‌টের মৃত্যুসংবাদ পড়লাম, তখন মালাই আমাকে সান্ত্বনা দিল। অনেকদিন তাঁর কথা আমার মনে পড়েনি। ততদিনে গ্রীষ্মের সেই ছ'সপ্তাহ আমার কাছে সুদূর অতীতের এক অংশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর খবরে একটা চরম আঘাত পেয়েছিলাম। উলবোনা থেকে মুখ তুলে মালা দেখেছিল আমি বাকরুদ্ধ হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। খবরের কাগজটা আমার কোলের ওপর পড়ে গিয়েছে। আমেরিকায় থাকাকালীন মিসেস ক্রফ্‌টের মৃত্যুই ছিল সেই প্রথম মৃত্যু, যার জন্য আমি শোক করেছিলাম। কারণ তাঁকেই প্রথম আমি আমেরিকায় শ্রদ্ধা করেছিলাম। অবশেষে বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ মিসেস ক্রফ্‌ট এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। আর কোনওদিন তিনি ফিরবেন না।

আমি নিজে আর খুব বেশি দূরে কোথাও যাইনি। মালা আর আমি বস্টন থেকে কুড়ি মাইল দূরে একটা শহরে থাকি। আমাদের বাড়ির রাস্তাটা মিসেস ক্রফ্‌টের বাড়ির রাস্তার মতোই গাছের ছায়ায় ঢাকা। বাড়িটা আমাদের নিজেদেরই। একটা বাগানও আছে, যার দৌলতে আমাদের বাজারে গিয়ে টম্যাটো কিনতে হয় না। অতিথিদের থাকার ঘর আছে। আমরা এখন আমেরিকারই নাগরিক হয়ে গিয়েছি যাতে সময় হলে আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি পেতে পারি। যদিও কয়েক বছর অন্তর অন্তর কলকাতা যাই এবং আরও দড়ি-বাঁধা পাজামা আর দার্জিলিং চা কিনে আনি, আমরা ঠিক করেছি যে আমরা এই দেশে থেকেই বুড়ো হব। আমি একটা ছোট কলেজের লাইব্রেরিতে কাজ করি। আমাদের এক ছেলে, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। মালা এখন আর ঘোমটা দেয় না বা রাতে শুয়ে শুয়ে মা-বাবার কথা মনে করে কাঁদে না। তবে মাঝে মাঝে ছেলের কথা মনে করে কাঁদে। তাই আমরা কখনও সখনও কেমব্রিজে তার সঙ্গে দেখা করতে যাই, বা শনি-রবিবার তাকে বাড়ি নিয়ে আসি, যাতে সে আমাদের সঙ্গে বসে হাত দিয়ে ভাত খেতে পারে, বাংলায় কথা বলতে পারে। কিন্তু আমরা যখন থাকব না, তখন হয়তো এর কোনওটাই সে আর করবে না।

যখনই ছেলেকে আনতে যাই, যানজট উপেক্ষা করে আমি ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ ধরেই গাড়ি চালাই। বিল্ডিংগুলো এখন আর প্রায় চিনতে পারি না। কিন্তু যতবার সেখান দিয়ে যাই, সেই ছ'সপ্তাহের কথা মনে পড়ে যায়। যেন এই সেদিনের কথা। গাড়ির গতি কমিয়ে মিসেস ক্রফ্‌টের বাড়ির রাস্তার দিকে দেখাই। ছেলেকে বলি, আমেরিকায় এটাই ছিল আমার প্রথম বাসস্থান, যেখানে আমি একটি ১০৩ বছর বয়সের এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে থাকতাম। "মনে আছে?" মালা হেসে বলে। আমরা দু'জনেরই অবাক লাগে যে, একটা সময় ছিল, যখন আমরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিলাম। আমার ছেলেও বিস্ময় প্রকাশ করে। তবে মিসেস ক্রফ্‌টের বয়েস শুনে নয়, আমি কত অল্প ভাড়া দিতাম, সেটা শুনে। যিনি ১৮৬৬ সালে জন্মেছিলেন, তাঁর কাছে চাঁদে পতাকার খবরটা যেমন অভাবনীয় ছিল, ভাড়ার পরিমাণটাও ছেলের কাছে ততটাই অবিশ্বাস্য মনে হয়। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে ঘরের বাইরের পৃথিবীতে টেনে এনেছিল, আমার ছেলের চোখেও আমি সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখতে পাই। আর কয়েক বছরের মধ্যেই সে গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাবে। কোনও সঙ্গী বা নিরাপত্তা ছাড়াই নিজের রাস্তা খুঁজে বের করবে। কিন্তু আমি নিজেকে মনে করিয়ে দিই যে, তার বাবা এখনও জীবিত। তার মা সুস্থ, সুখী জীবন যাপন করে। ছেলে যখনই নিরাশ হয়ে পড়ে, তাকে বলি যে, আমি যদি তিনটি মহাদেশে টিকে থাকতে পারি, তা হলে এমন কোনও বাধা নেই, যেটা সে অতিক্রম করতে পারবে না। অ্যাস্ট্রোনটরা চাঁদে মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েই চিরকালের জন্য ইতিহাসের মহানায়ক হয়ে গিয়েছিলেন। আমি এই নতুন পৃথিবীতে প্রায় তিরিশ বছর কাটিয়েছি। জানি আমার এই কীর্তি খুবই সাধারণ। আমিই একমাত্র মানুষ নই, যে নিজের ভাগ্যের সন্ধানে ঘর

AMARBOI.COM

ছেড়ে বহুদূর এসেছে। এবং নিঃসন্দেহে আমিই প্রথম এই কাজ করিনি। তবুও, মাঝে মাঝে যে দূরত্ব আমি পার করে এসেছি, তার প্রতিটি মাইল, প্রতিটি আহার, প্রতিটি মানুষ যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, আর প্রতিটি ঘর, যেখানে আমি ঘুমিয়েছি, এসব কথা ভাবলে, কেমন যেন বিহ্বল বোধ করি। যতই সাধারণ হোক না কেন, মাঝে মাঝে এসব আমার কল্পনাতীত মনে হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরিচিত ভূমি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্টোভিও ও নুরের জন্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Human nature will not flourish, any more than a potato, if it be planted and replanted, for too long a series of generations, in the same worn-out soil. My children have had other birthplaces, and, so far as their fortunes may be within my control, shall strike their roots into unaccustomed earth.

—Nathaniel Hawthorne,
"The Custom-House"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরিচিত ভূমি

রুমার বাবা, স্ত্রীর মৃত্যুর পর যে ওষুধ কোম্পানিতে অনেক দশক ধরে কাজ করেছিলেন, সেখান থেকে অবসর নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ শুরু করলেন। ওই মহাদেশটি তিনি কখনও দেখেননি। গত বছর তিনি ফ্রান্স, হল্যান্ড এবং সম্প্রতি ইতালি গিয়েছিলেন। সবই প্যাকেজ ট্যুর, বাসে চড়ে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে অপরিচিত সঙ্গীদের সঙ্গে সফর করা, প্রতিবারের খাওয়া-দাওয়া, মিউজিয়াম, হোটেলের ব্যবস্থা আগে থেকে ঠিক করে রাখা। দু'সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, মাঝে মাঝে চার সপ্তাহের জন্য তিনি বেরিয়ে পড়েন। বাইরে থাকলে রুমা তাঁর কোনও খবর পায় না। প্রতিবার, সে তাঁর ফ্লাইটের খবর কম্পিউটার থেকে একটা কাগজে বার করে ফ্রিজের দরজায় এক টুকরো চুম্বকের পিছনে আটকে রাখে। যেদিন তাঁর প্লেন ওড়ার কথা থাকে, সেদিন টিভি-তে খবর দেখে, পৃথিবীতে কোথাও কোনও প্লেনক্র্যাশ হয়নি সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে।

কখনও সখনও সিয়্যাট্‌লে, যেখানে রুমা, অ্যাডাম আর তাদের ছেলে আকাশ থাকে, একটা পোস্টকার্ড এসে হাজির হয়। পোস্টকার্ডে দেখা যায় কোনও গির্জার সম্মুখভাগ, পাথরের ফোয়ারা, জনবহুল চত্বর অথবা বিকেলের রোদে নরম হয়ে যাওয়া টেরাকোটা ছাদ। রুমা একবারই ইউরোপ গিয়েছিল প্রায় পনেরো বছর আগে। কলেজের পর এক মাসের জন্য ইউরো-রেল করে ভ্রমণ। প্যারালিগাল হিসেবে সে যা মাইনে পেত, তা থেকে পয়সা জমিয়ে দু'জন বান্ধবীর সঙ্গে গিয়েছিল। লজঝরে সরাইখানায় থাকত। সে এমন এক মিতব্যয়িতা অভ্যেস করেছিল তখন, যা জীবনের এই পর্বে তার কাছে প্রায় অচেনা হয়ে গিয়েছে। তার বাবা এখন যে পোস্টকার্ডগুলো পাঠান, সেই ধরনের পোস্টকার্ড ছাড়া তখন আর কিছুই কিনত না। বাবা যা দেখেছেন বা করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখে পাঠান: 'গতকাল উফিজি গ্যালারি। আজ আর্নো ও অন্যদিকে হাঁটলাম। কাল সিয়েনা যাওয়ার কথা আছে।' মাঝে মাঝে আবহাওয়া সম্পর্কে দু'-একটা কথা লেখা থাকে। কিন্তু সেসব জায়গায় যে তিনি উপস্থিত ছিলেন তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যেত না। রুমার সেইসব টেলিগ্রামের কথা মনে পড়ত যেগুলো বহুদিন আগে, তার মা-বাবা কলকাতা থেকে পেনসিলভেনিয়ায় নিরাপদে ফিরে আসার পর আত্মীয়স্বজনদের পাঠাতেন।

পোস্টকার্ডগুলোই বাবার কাছ থেকে পাওয়া রুমার প্রথম চিঠিপত্র। তার আটত্রিশ বছরের জীবনে বাবার কখনও তাকে চিঠি লেখার দরকার পড়েনি। ডাকে যোগাযোগ একতরফাই হয়। বাবা এত কম সময়ের জন্য একটা জায়গায় থাকেন যে, রুমা তাঁর পোস্টকার্ডের উত্তর দেওয়ার সময় পায় না। তা ছাড়া বাবা চিঠি পাওয়ার অবস্থাতেও থাকেন না। তাঁর হাতের লেখা ছোট ছোট, সংক্ষিপ্ত, সামান্য মেয়েলি ছাঁদের। রুমার মায়ের লেখায় বড় এবং ছোট হাতের অক্ষর তালগোল পাকিয়ে থাকত। যেন তিনি প্রতিটি অক্ষর একটি ভাবেই লিখতে শিখেছেন। কার্ডগুলোয় রুমার নাম লেখা থাকে। তার বাবা কখনও অ্যাডামের নাম লেখেন না বা আকাশের কথা উল্লেখ করেন না। শুধু শেষের লাইনেই তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করেন। "ভাল থেকো। সস্নেহে, বাবা।" এই লিখে ইতি টানেন। যেন ভাল থাকা অতই সহজ।

আগস্টে বাবা আবার চলে যাচ্ছেন। এবার প্রাগ-এ। কিন্তু তার আগে তিনি এক সপ্তাহের জন্য রুমার কাছে থাকতে এবং সিয়্যাট্‌লের পুবদিকে রুমা এবং অ্যাডাম যে বাড়িটা কিনেছে, সেটা দেখতে আসছেন। অ্যাডামের চাকরির জন্য তারা বসন্তকালে ব্রুকলিন থেকে এখানে চলে এসেছে। রুমার বাবা নিজেই আসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যখন তাঁর ফোন এসেছিল, রুমা তার নতুন রান্নাঘরে খাবার তৈরি করছিল। ফোনটা পেয়ে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মায়ের মৃত্যুর পর রুমাই প্রতি সন্ধেয় বাবাকে ফোন করে তাঁর দিন কেমন কাটল জিজ্ঞেস করার দায়িত্ব নিয়েছিল। এখন অবশ্য ফোন করা কমে গিয়েছে। সাধারণত সপ্তাহে একবার, রবিবার দুপুরবেলায় ফোন করে। "তুমি যখন খুশি এখানে আসতে পারো, বাবা," রুমা বাবাকে ফোনে বলেছিল। "জানোই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না।" তার মা হলে জিজ্ঞেস করতেন না। "আমরা জুলাইতে তোদের দেখতে আসছি," প্লেনের টিকিট হাতে নিয়ে রুমাকে জানাতেন। রুমার জীবনে এমন একটা সময় ছিল,

AMARBOI.COM

যখন মায়ের এরকম ধরে নেওয়ায় তার রাগ হত। এখন সে তার অভাববোধ করে।

অ্যাডাম সে সপ্তাহ থাকবে না, কাজে বাইরে যাবে। সে একটা হেজ ফান্ডের জন্য কাজ করে। এ বাড়িতে আসার পর থেকে সে পরপর দু'সপ্তাহও বাড়িতে থাকতে পারেনি। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরার কোনও প্রশ্ন ছিল না। সে দর্শনীয় কোনও জায়গায় যেত না— সাধারণত উত্তর-পশ্চিমে কোনও শহরে বা কানাডায়, যেখানে রুমা এবং আকাশের বিশেষ কিছু করার থাকে না। অ্যাডাম তাকে আশ্বাস দিয়েছে যে, কয়েক মাসের মধ্যেই তার বাইরে যাওয়া কমে যাবে। সে বলে যে, রুমাকে আকাশের সঙ্গে একলা ফেলে রেখে যেতে তার খুব খারাপ লাগে। বিশেষত এখন, যেহেতু রুমা আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। সে রুমাকে বেবিসিটার ভাড়া করতে বলে। এমনকী দরকার পড়লে এমন কোনও লোক রাখতে বলে, যে বাড়িতেই থাকবে। কিন্তু রুমা সিয়্যাট্‌লে কাউকে চেনে না। এবং নিজের সন্তানের খেয়াল রাখার চেয়েও বেশি কঠিন, এক অচেনা জায়গায় বাচ্চার খেয়াল রাখার উপযুক্ত কাউকে খুঁজে বের করা। তা ছাড়া, রুমা এখন চাকরি করছে না, এবং যে কাজটা সে নিজে করে নিতে পারে, সেই কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করানোর জন্য পয়সা খরচ করাটা তার অনুচিত লাগে।

নিউ ইয়র্কে, আকাশ জন্মানোর পর রুমা তার ল ফার্মের সঙ্গে একটা পার্ট-টাইম রুটিনের চুক্তি করেছিল। যার ফলে বৃহস্পতি-শুক্রবার সে পার্ক স্লোপ-এর বাড়িতে থাকত। সেটাই সুবিধেজনক ব্যবস্থা মনে হয়েছিল। প্রথমদিকে ফার্মটা কোনও সমস্যা করেনি, কিন্তু ব্যাপারটা সহজ ছিল না। ঠিক যখন একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলার মোকদ্দমা শুরু হতে যাচ্ছিল, তখনই মা মারা গেলেন। তিনি অপারেশন টেবিলে হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছিলেন। সাধারণ গলস্টোন অস্ত্রোপচারের জন্য করা অ্যানাস্থেশিয়া থেকে তাঁর অ্যানাফাইল্যাকটিক শক তৈরি হয়েছিল।

শোকপালনের জন্য রুমা যে দু'সপ্তাহের ছুটি পেয়েছিল, তারপর সে অফিসে ফিরে যায়নি। মক্কেলদের ভবিষ্যৎ তত্ত্বাবধান করা, তাদের উইল প্রস্তুত করা, বন্ধকের জন্য পুনরায় অর্থের ব্যবস্থা করা হাস্যকর লাগছিল। সে শুধুই আকাশের সঙ্গে বাড়িতে থাকতে চাইত। শুধু বৃহস্পতি-শুক্রবারই নয়, প্রতিদিন। তারপর, কোনও এক আশ্চর্য উপায়ে, অ্যাডাম নতুন চাকরিটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে গেল। যা মাইনে ছিল তাতে রুমার চাকরি করার দরকার ছিল না। বাড়িটাই এখন রুমার কাজ— ডাকে আসা কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাটালগ ঘাঁটাঘাঁটি করা, সেগুলো 'পোস্ট-ইট' দিয়ে চিহ্নিত করা, আকাশের ঘরের জন্য ড্রাগনের ছাপসুদ্ধ চাদর অর্ডার দেওয়া ইত্যাদি।

রুমা অ্যাডামকে বাবার আসার কথা জানাতে অ্যাডাম বলল, "খুব ভাল। আমি যখন থাকব না, উনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।" কিন্তু রুমার তা মনে হয় না। তার মা থাকলে সাহায্য করতেন। রান্নাঘর দখল করতেন, আকাশকে গান গেয়ে শোনাতেন, তাকে বাংলা ছড়া শেখাতেন এবং মেশিনে কাচার জন্য জামাকাপড় ডাঁই করে ফেলতেন। রুমা কখনও বাবার সঙ্গে একলা এক সপ্তাহ কাটায়নি। আকাশ জন্মানোর পর মা-বাবা যখন তার ব্রুকলিনের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন তার বাবা লিভিং রুমে একটি আর্মচেয়ারে বসে চুপচাপ 'টাইমস'-এর পাতা উলটে সময় কাটাতেন। মাঝে মাঝে বাচ্চাটার চিবুকের তলায় একটা আঙুল দিয়ে টোকা মারতেন। কিন্তু সাধারণত এমনভাবে থাকতেন, যেন তিনি সময়টা কেটে যাওয়ার অপেক্ষা করছেন।

বাবা এখন একা থাকেন। নিজেই নিজের খাবার তৈরি করেন। ফোনে কথা বলার সময় রুমা তাঁর এখনকার পরিবেশ কল্পনা করতে পারে না। তিনি এখন একটি ওয়ান-বেডরুম কন্ডোমিনিয়ামে থাকেন। পেনসিলভেনিয়ার ওই অংশটি রুমা ভাল করে চেনে না। বাবা তাঁর বিষয়সম্পত্তির পরিমাণ কমানোর জন্য, যে বাড়িতে রুমা এবং তার ছোট ভাই রোমি তাদের ছেলেবেলা কাটিয়েছিল, সেই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন। খরিদ্দারের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার পরই ছেলেমেয়েকে জানিয়েছিলেন। এই খবরে রোমির কোনও হেলদোল হয়নি। সে গত দু'বছর ধরে নিউজ়িল্যান্ডে এক জার্মান ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র পরিচালকের সঙ্গে কাজ করে। রুমা জানত যে, সেই বাড়িটা, যার ঘরগুলো তার মা সাজিয়েছিলেন, যে খাটে বসে শব্দসন্ধান খেলতে ভালবাসতেন এবং যে স্টোভে তিনি রান্না করতেন, সেগুলো এখন বাবার কাছে বোঝা। তবুও, খবরটা তাকে আঘাত করেছিল। সার্জনের ঘোষণার মতোই নতুন করে তার মায়ের অস্তিত্ব মুছে দিয়েছিল।

রুমা জানত যে, বাবার দেখাশোনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেইজন্যই তার নিজেকে অপরাধী মনে হত। ভারতে থাকলে তাঁর রুমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে না থাকার কোনও প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু বাবা কখনও সেই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেননি। মায়ের মৃত্যুর পর তা সম্ভবও ছিল না। তাদের পুরনো অ্যাপার্টমেন্টটা বড্ড ছোট ছিল। কিন্তু সিয়্যাট্‌লে বাড়তি ঘর আছে। ঘরগুলো ফাঁকা, উদ্দেশ্যহীনভাবে পড়ে আছে।

রুমার ভয় হয় যে, হয়তো বাবার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে, তাঁর দাবিও তাকে মেটাতে হবে। তাঁর সঙ্গে থাকার অভ্যেস রুমার চলে গেছে। রুমা নিজে যে পরিবার গড়ে তুলেছে, তিনি এসে থাকলে সেই পরিবারের পাট চুকে যাবে। তার নিজস্ব পরিবার। সে অ্যাডাম এবং আকাশ এবং জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় যে সন্তান আসবে। যাকে সে সিয়্যাট্‌লে চলে আসার ঠিক আগে গর্ভে ধারণ করেছিল। মা যেভাবে বাবার খেয়াল রাখতেন, সেভাবে তাঁর খেয়াল রাখা, মা যে খাবারগুলো রান্না করতেন, সেগুলো তৈরি করার কথা সে কল্পনা করতে পারে না। তবুও তাঁকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ না করতে রুমার আরও খারাপ লাগছিল। এই টানাপোড়েনটা অ্যাডাম বুঝতে পারে না। রুমা কথাটা তুললেই অ্যাডাম সহজ কথাটাই আবার মনে করিয়ে দেয় যে, তাকে ইতিমধ্যেই একটি বাচ্চার দেখাশোনা করতে হয়। শীঘ্রই আর-একজন এসে যাবে। রুমাকে মনে করিয়ে দেয় যে, বয়সের তুলনায় তার বাবার স্বাস্থ্য ভাল। তিনি যেখানে আছেন, ভালই আছেন। কিন্তু রুমার বাবা তাদের কাছে থাকলেও অ্যাডামের কোনও আপত্তি নেই। সে সদয়, উদারভাবেই সম্মতি দিয়েছে। রুমা যেসব কারণে অ্যাডামকে ভালবাসে, এটি তার মধ্যে একটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রুমার দুশ্চিন্তা হয়। অ্যাডামের কি এ ব্যাপারে কিছু এসে যায় না? রুমা জানে যে, অ্যাডাম তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। কিন্তু একই সঙ্গে সে বুঝতে পারে যে, অ্যাডামের ধৈর্য কমে আসছে। সে রুমাকে চাকরি ছাড়তে দিয়েছিল, পয়সা খরচ করে একটা সুন্দর বাড়ি কিনেছিল, দ্বিতীয় সন্তান আনতে রাজি হয়েছিল। রুমাকে খুশি করার জন্য তার যা যা করণীয়, সে সবই করছিল। কিন্তু রুমা কিছুতেই খুশি হতে পারছিল না। এবং সম্প্রতি নানা কথার ফাঁকে, অ্যাডাম তার উল্লেখও করেছিল।

কী ভারমুক্ত লাগে আজকাল শুধু একটাই সুটকেস সঙ্গে নিয়ে একলা ঘুরে বেড়াতে। তিনি কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম দিকটায় আসেননি। কখনও তাঁর বাসভূমি হিসেবে গৃহীত এই দেশের বিস্তৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলব্ধি করেননি। এর আগে একবারই তিনি আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে সফর করেছিলেন, যখন তাঁর স্ত্রী রয়্যাল থাই এয়ারলাইনস-এ কলকাতার টিকিট কেটেছিলেন। সাধারণত পুবের যে-পথ দিয়ে তাঁরা কলকাতায় যেতেন, সে-পথে না গিয়ে সে বার লস এঞ্জেলেস হয়ে গিয়েছিলেন। যাত্রাটা অন্তহীন মনে হয়েছিল। তাঁর এখনও মনে আছে, তাঁদের চারটে সিট ছিল প্লেনের একদম পিছনদিকে, ধূমপানকারীদের মধ্যে। প্লেনটা যখন ব্যাংককে নেমেছিল, তখন তাঁদের কারও কোনও দর্শনীয় স্থান দেখতে যাওয়ার উৎসাহ ছিল না। তার বদলে তাঁরা এয়ারলাইনসের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হোটেলে ঘুমিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ফ্লোটিং মার্কেট দেখার জন্য ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ছিলেন, কিন্তু তিনি খাওয়ার সময়েও ঘুম থেকে ওঠেননি। কারণ, রুমার বাবার শুধু রোমি এবং রুমার সঙ্গেই হোটেলে বসে খাওয়ার কথা মনে পড়ে। একটি রোদ উপভোগ করার ঘরে বসে, যেখান থেকে একটা বাগান দেখা যাচ্ছিল। অত মশলাদার খাবার তিনি জীবনে আর কখনও খাননি। তাঁর ছেলেমেয়ের মাথার পিছনে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ে বেড়াচ্ছিল। যে-পথেই যাওয়া হোক না কেন, সেই ভারতসফরগুলো সবসময়ই খুব লম্বা হত। তাঁর এখনও মনে পড়ে সেইসব সফর তাঁকে কত উদ্বিগ্ন করে তুলত। অত মালপত্র গুছোনো, এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া, কাগজপত্র সামলে রাখা এবং নিজের পরিবারকে অত হাজার মাইল দূরে নিরাপদে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সেই সফরগুলোর জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। এবং তাঁর নিজের মা-বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি নিজেও দেশে ফেরার জন্য উৎসুক থাকতেন। তাই খরচ সত্ত্বেও, প্রতিবার কলকাতায় ফেরার পর তিনি যে দুঃখ এবং লজ্জা বোধ করতেন তা সত্ত্বেও এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ার অনিচ্ছা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কলকাতা যেতেন।

তিনি জানলার বাইরে তাকালেন। থরে থরে সাজানো মেঘগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন মাইলের পর মাইল জুড়ে ঠাসা বরফ, যার ওপর দিয়ে কেউ অনায়াসে হেঁটে যেতে পারে। দৃশ্যটা দেখে তাঁর মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। এটাই এখন তাঁর জীবন, যা খুশি তা করতে পারার ক্ষমতা। ঠিক যেমন, নিরবচ্ছিন্ন মেঘের জগতে আর সবকিছু অনুপস্থিত, তেমনই তাঁর জীবনেও পরিবারের দায়িত্ব অনুপস্থিত। ভারতে ফিরে যাওয়ার সেই সফরগুলো তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আমেরিকায় তাঁর সব ভারতীয় বন্ধুদের জন্যই জীবনের এক অনস্বীকার্য অংশ ছিল। মিসেস বাগচিই ব্যতিক্রম। তিনি যে ছেলেটিকে অল্পবয়স থেকে ভালবাসতেন, তাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের দু'বছর পর ছেলেটি একটি স্কুটার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। ছাব্বিশ বছর বয়সে মিসেস বাগচি আমেরিকায় চলে আসেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, না হলে তাঁর মা-বাবা আবার তাঁর বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তিনি এখন লং আইল্যান্ডে থাকেন, একা। একজন সম্পূর্ণ একা ভারতীয় মহিলা, স্ট্যাটিস্টিক্স-এ ডক্টরেট করে সাতের দশক থেকে স্টোনিব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। এই তিরিশ বছরের মধ্যে তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন শুধু মা-বাবার শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকতে। তাঁর নাম মীনাক্ষী। এবং যদিও রুমার বাবা এখন তাঁকে সেই নামেই সম্বোধন করেন, মনে মনে তিনি তাঁকে মিসেস বাগচি বলেই ভাবেন।

পর্যটকদের এই দলে শুধু তাঁরা দুজনেই বাঙালি থাকার দরুন স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা কথাবার্তা শুরু করেছিলেন। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শুরু করেছিলেন, বাসে পাশাপাশি বসতেন। তাঁদের একইরকম চেহারা এবং ভাষার জন্য লোকে তাঁদের স্বামী-স্ত্রী বলে ভুল করত। প্রথমদিকে রোমান্সের কোনও গন্ধ ছিল না; তাঁরা কেউই তেমন কোনও আগ্রহও বোধ করেননি। তাঁর মিসেস বাগচির সঙ্গ ভাল লাগত। জানতেন যে, কয়েক সপ্তাহ পর মিসেস বাগচি একটি অন্য প্লেনে উঠে চলে যাবেন। কিন্তু ইতালির পর তিনি মিসেস বাগচির কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। দিনে পাঁচ-ছ'বার কম্পিউটার চেক করতেন তাঁর ই-মেলের অপেক্ষায়। যদিও আপাতত তাঁরা ঠিক করেছেন যে, শুধু বাইরে বেড়াতে গেলেই পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবেন, তবুও রুমার বাবা ম্যাপকোয়েস্ট-এ মিসেস বাগচির শহর খুঁজে দেখেছিলেন, তাঁর বাড়িতে গাড়ি চালিয়ে যেতে কতক্ষণ লাগবে বোঝার জন্য। সেই পথের কিছুটা অংশ তাঁর পরিচিত। ওই পথেই তিনি এবং তাঁর স্ত্রী রুমার সঙ্গে দেখা করতে ব্রুকলিন যেতেন।

শিগগিরি আবার তাঁর সঙ্গে মিসেস বাগচির দেখা হবে, প্রাগে। তাঁরা ঠিক করেছেন যে, এবার তাঁরা একই ঘরে থাকবেন এবং শীতে গাল্ফ অফ মেক্সিকো-য় একটি প্রমোদভ্রমণে যাওয়ার কথাও ভাবছেন। বিয়ে না করা, আর কোনও পুরুষের সঙ্গে নিজের ঘর-সংসার ভাগ না করার ব্যাপারে মিসেস বাগচি দৃঢ়সংকল্প। এই শর্তগুলোই তাঁর সঙ্গকে আরও আকর্ষক করে

AMARBOI.COM

তোলে। রুমার বাবা চোখ বন্ধ করে মিসেস বাগচির মুখটা মনে করলেন। তাঁর মুখ ভরাট, যদিও রুমার বাবা আন্দাজ করেছিলেন যে, তাঁর বয়স প্রায় ষাট হবে, তাঁর স্ত্রীর চেয়ে মাত্র পাঁচ-ছ' বছরের ছোট। মিসেস বাগচি পশ্চিমি কায়দার জামাকাপড় পরেন, কার্ডিগান এবং কালো পুল-অন স্ল্যাকস। ঘন কালো চুলে খোঁপা করেন। তাঁর কণ্ঠস্বরই রুমার বাবাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। সুসমন্বিত, সংযতবাক, যেন যে-কোনও দিন তিনি কয়েকটি সীমিত কথা বলতেই আগ্রহী। হয়তো, তিনি এত কমের আশা করেন বলেই রুমার বাবা তাঁর সঙ্গে এত উদার আচরণ করেন। তাঁর প্রতি এমনভাবে মনোযোগ দেন, যা তিনি কখনও নিজের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর প্রতি দেননি। অ্যামস্টারডামে, আন ফ্র্যাঙ্কের বাড়ি ঘুরে দেখার পর, একটি খালের সামনে প্রথমবার মিসেস বাগচিকে ফোটোর জন্য দাঁড়াতে বলতে খুব কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন।

রুমা বাবাকে আনতে এয়ারপোর্ট যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তিনিই জোর দিয়ে বললেন, একটা গাড়ি ভাড়া করে ইন্টারনেট থেকে পথনির্দেশ দেখে ঠিক চলে আসবেন। নুড়ি-বিছানো ড্রাইভের ওপর গাড়ির চাকার শব্দ পেয়ে রুমা লিভিং রুমের মেঝেয় ছড়ানো খেলনাগুলো তুলতে শুরু করল। প্লাস্টিকের পশুপাখিগুলো সরিয়ে রাখল। আকাশ যে বইগুলোর পছন্দসই পাতা দেখে নিয়েই খুলে রেখে দেয়, সেগুলো গুছিয়ে রাখল। "টিভিটা বন্ধ করে দাও, সোনা," সে আকাশকে বলল। "টিভির অত কাছে বসে না। এসো, দাদু এসে গিয়েছেন।"

আকাশ মেঝেয় উপুড় হয়ে, হাতের ওপর চিবুক ভর দিয়ে, শান্ত হয়ে শুয়ে ছিল। তার চেহারা রুমা এবং অ্যাডামের নিখুঁত মিশ্রণ। তার কোঁকড়ানো চুল তারা কখনও কাটেনি। গায়ের রং গাঢ় সোনালি। পায়ের পাতলা রোমও সোনালি। দেখে রুমার সিংহশাবকের কথা মনে পড়ে যায়। আকাশের সবুজ চোখ দুটো তির্যক এবং সরু, মুখেও একটা ক্ষীণ সিংহসদৃশ ভাব আছে। তার বয়স মাত্র তিন, কিন্তু ইতিমধ্যেই, মাঝে মাঝে রুমা সেই বিরোধিতা, সেই চরম প্রতিবন্ধকতা টের পায়, যা বয়ঃসন্ধির সঙ্গে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে সে ধরে নিয়েছে। এ বাড়িতে আসার পর থেকে আকাশকে সামলানো কঠিন হয়ে উঠেছে। রুমা জানে, নতুন পরিবেশে তার নিজের উদ্যমের অভাব এবং

AMARBOI.COM

অ্যাডামের অনুপস্থিতিই এজন্য দায়ী। কখনও-সখনও আকাশ হঠাৎ হঠাৎ মাটিতে আছড়ে পড়ে। যে শরীরটা রুমা নিজের ভিতরে লালন করেছিল, সেই শরীরটাই সম্পূর্ণভাবে অচেনা, বৈরীভাবাপন্ন হয়ে যায়। আর নয়তো আকাশ তাকে আঁকড়ে ধরে। রুমা যখন রান্না করে, তখনও দাবি করে যে, তার সঙ্গে থাকতে হবে।

যদিও রুমা বাচ্চাটার কথা কিছুই বলেনি, তবু তার দৃঢ় ধারণা, আকাশ ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে। আকাশের মনে হয়েছে যে, তার জায়গায় নতুন কেউ এসে গিয়েছে। রুমা নিজেও বদলে গিয়েছে— তার ধৈর্য কমে গিয়েছে। কোনও ব্যাপারে আকাশকে বুঝিয়ে বলার বদলে চট করে 'না' বলে দেয়। এত কাজের জন্য, এত একাকিত্বের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। কোনও কোনও সকালে তার ইচ্ছে হয় সব ফেলেছেড়ে জামাকাপড় পরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, অ্যাডামের মতো। সে বুঝতে পারে না, কী করে মা এসব করেছিলেন। বড় হয়ে ওঠার সময়, সে তার মায়ের জীবন— যেমন, বিয়ের পর এক অচেনা জায়গায় থাকা, শুধুই ছেলেমেয়ে এবং সংসারের খেয়াল রাখা— দেখেই সে সতর্ক হয়েছিল যে, এই রাস্তা এড়িয়ে চলতে হবে। অথচ এটাই এখন রুমার জীবন।

রুমা লিভিং রুমের ওপ্রান্তে গিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিল। "কথা বললে কথার উত্তর দেবে, আকাশ। চলো, ওঠো।"

বাবার ভাড়া করা ছিমছাম মেরুন রঙের সিডান দেখে রুমা বিচলিত বোধ করল। নতুন করে তার মনে পড়ে গেল যে, সে যেখানে বড় হয়েছে, এখন ওই জায়গা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অন্য এক উপকূলে থাকে। এমন এক জায়গায়, যেখানে তার মা-বাবা কাউকে চেনেন না, যেখানে আজ পর্যন্ত মা-বাবা কেউই পা রাখেননি। আমেরিকায় তার মা-বাবার যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, পেনসিলভেনিয়া এবং নিউ জার্সিতে তাঁদের বাঙালি বন্ধুদের দল, তার বাবার কোম্পানি, যে স্কুলগুলোয় রুমা এবং রোমি পড়েছিল, কোনওটারই এখানে কোনও অস্তিত্ব নেই। সাত মাস পর সে বাবাকে দেখছে। পুরনো অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করে, সব গুছিয়ে নিয়ে আবার নতুন বাড়িতে এসে গোছগাছ করা এবং বাবার বিভিন্ন ভ্রমণের চক্করে, অর্ধেক বছরের বেশি সময় কেটে গিয়েছে।

আকাশ উঠে রুমার পিছন পিছন এল। তারা দু'জনে দাঁড়িয়ে দেখল, রুমার

AMARBOI.COM

বাবা গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে একটা ছোট, চাকা লাগানো কালো সুটকেস বার করলেন। তাঁর মাথায় 'POMPEII' লেখা একটা বেসবল টুপি। পরনে বাদামি সুতির প্যান্ট, আকাশি-নীল পোলো শার্ট এবং পায়ে একজোড়া সাদা চামড়ার স্নিকার্স। বার্ধক্যে তার বাবাকে কতখানি আমেরিকানদের মতো দেখতে হয়ে গিয়েছে, দেখে রুমার আশ্চর্য লাগল। তাঁর রুপোলি চুল এবং ফরসা গায়ের রঙের জন্য তাঁকে যে-কোনও জায়গার বাসিন্দা বলে চালানো যায়। বরং উত্তর আমেরিকার এই ভিজে প্রকৃতিতে, রুমার মাকে উজ্জ্বল রঙের শাড়ি, পয়সার মাপের মেরুন টিপ এবং গয়নাগাটি পরে বেমানান মনে হত।

বাবা ড্রাইভওয়ে দিয়ে সুটকেসটা টানতে শুরু করলেন, কিন্তু চাকার তলায় নুড়িগুলো অসুবিধে সৃষ্টি করছিল বলে তিনি সুটকেসের হাতল ধরে তুলে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে বাড়িতে ঢুকলেন। রুমা লক্ষ করল যে, ভারটা বইতে তাঁর সামান্য কষ্ট হল। অ্যাডাম থাকলে তাঁকে সাহায্য করতে পারত।

"এটা কে? আকাশ নাকি?" রুমার বাবা আশ্চর্য হওয়ার ভান করলেন। কথাগুলো ইংরেজিতে বললেন। "কত বড় হয়ে গিয়েছ।" আকাশ যখন ছোট্ট ছিল, তখন রুমা তাকে যেটুকু বাংলা শিখিয়েছিল, তা সে এতদিনে ভুলে গিয়েছে। পুরো বাক্য বলতে শুরু করার পর, ইংরেজিই তার মাতৃভাষার স্থান দখল করেছিল। তাকে বাংলা বলানোর মতো আগ্রহও রুমার ছিল না। তা ছাড়া, তাকে আদর করে বাংলায় দু'-একটা কথা বলা বা এটা ওটা দেখিয়ে তার বাংলা প্রতিশব্দ বলা এক ব্যাপার। শুধু বাংলাতেই কথা বলতে বাধ্য করা আর-এক ব্যাপার। বাংলা ভাষায় রুমা কখনও স্বচ্ছন্দ বোধ করেনি। সে নিজেই বাংলার ওপর দখল হারিয়ে ফেলছিল। তার মা এ ব্যাপারে বেশ কড়া ছিলেন। এতটাই কড়া যে, রুমা কখনও তাঁর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেনি। কিন্তু বাবা কিছু মনে করতেন না। কদাচিৎ কখনও বাংলায় কথা বললে, যেমন কোনও আত্মীয় কলকাতা থেকে ফোন করে 'শুভ বিজয়া' বা আকাশকে 'শুভ জন্মদিন' জানালে, রুমা কথা বলতে গিয়ে হোঁচট খায়, ক্রিয়ার কাল গুলিয়ে ফেলে। অথচ জীবনের প্রথম কয়েক বছর সে শুধু বাংলাতেই কথা বলেছিল।

"কত বয়স হল তোমার? তিন? নাকি তিনশো?" রুমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

আকাশ কোনও উত্তর দিল না। সে এমন ভাব করছিল যেন রুমার বাবা সেখানে নেই। "মা, জলতেষ্টা পেয়েছে," সে বলল।

AMARBOI.COM

"এক মিনিট, আকাশ।"

বাবাকে দেখে তার একইরকম লাগল। সত্তর বছর বয়সের তুলনায়, তাঁর হাত এবং মুখের চামড়া বেশ পরিষ্কার এবং টানটান আছে। তিনি রোগা হয়ে যাননি। মাথায় এখনও অনেক চুল। হয়তো রুমার চেয়েও বেশি। আকাশের জন্মের পর, রোজ রাতে রুমার বালিশে গোছা গোছা চুল পড়ত। সকালে সবচেয়ে আগে সেই পড়ে যাওয়া চুলের গোছাই তার চোখে পড়ত। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আবার চুল উঠবে, কিন্তু রুমার বাথটাব এখনও সেইসব শ্যাম্পুতে ভরতি, যেগুলো চুল গজানোর, চুল ঘন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। বাবাকে দেখে মনে হল, তিনি যথেষ্ট বিশ্রাম করে এসেছেন। এই জিনিসটাও আজকাল রুমার নেই। বাড়ি থেকে বেরোনোর কথা না থাকলেও সে চোখের তলায় কনসিলার লাগানো শুরু করেছে। তা ছাড়া সে মোটাও হয়ে গিয়েছে। আকাশ হওয়ার সময় সে প্রথম তিন মাসে রোগা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার, মাত্র বারো সপ্তাহের মাথায়, তার দশ পাউন্ড ওজন বেড়ে গিয়েছে। সবসময় আকাশের প্লেট থেকে তার ফেলে রাখা খাবার খাওয়া এবং সব জায়গায় হাঁটার বদলে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার ফলেই এটা হচ্ছে বলে রুমার ধারণা। ইতিমধ্যেই সে ক্যাটালগ দেখে ইলাস্টিক দেওয়া প্যান্ট এবং স্কার্ট অর্ডার দিয়েছে। তার মুখে একটা ভারীভাব এসেছে, যা আয়নায় দেখলেই তার খারাপ লাগে।

"আকাশ, দাদুকে হ্যালো বলো," রুমা আলতো করে আকাশের কাঁধের পিছনে ঠেলা দিল। বাবার গালে চুমু খেল। "কতক্ষণ লাগল এখানে পৌঁছোতে? খুব ট্র্যাফিক ছিল নাকি?"

"খুব একটা না। তোর বাড়িটা এয়ারপোর্ট থেকে বাইশ মাইল দূরে।" তার বাবা সবসময়, কাছে বা দূরে, যেখানেই যেতেন না কেন, সেই জায়গাটির দূরত্ব জেনে রাখতেন। ম্যাপকোয়েস্ট-এর যখন কোনও অস্তিত্ব ছিল না, তখনও তিনি বাড়ি থেকে তাঁর অফিসের, যে সুপারমার্কেটে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খাবার কিনতেন, সেই মার্কেটের এবং তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের বাড়ির সঠিক দূরত্ব জানতেন।

"এখানে গ্যাসোলিনের বেশ দাম," বাবা বললেন। তিনি কথাটা সাধারণভাবেই বললেন কিন্তু রুমা তাঁর কথাটায় খোঁচা অনুভব করল, যেমন সে সারাজীবন করেছে। পেনসিলভেনিয়ার চেয়ে সিয়্যাট্‌লে গ্যাসের দাম বেশি বলে তার নিজেকে দোষী মনে হল।

AMARBOI.COM

"অনেকক্ষণের ফ্লাইট ছিল। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছ।"

"আমার শুধু শোয়ার সময়ই ক্লান্ত লাগে। এখানে এসো," রুমার বাবা আকাশকে ডাকলেন। সুটকেসটা নামিয়ে, সামান্য ঝুঁকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু আকাশ রুমার পায়ে মাথা চেপে দাঁড়িয়ে রইল। নড়তে চাইল না।

তাঁরা ভিতরে ঢুকলেন। রুমার বাবা ঝুঁকে তাঁর স্নিকার্সের ফিতে খুলতে শুরু করলেন। এক পায়ে দাঁড়িয়ে জুতো খুলতে গিয়ে সামান্য টলে যাচ্ছিলেন।

"বাবা, লিভিং রুমে এসো, সোফাতে বসে ভাল করে জুতোটা খুলতে পারবে," রুমা বলল। কিন্তু তার বাবা সেভাবেই স্নিকার্স খুলে, ডাক-টেবিলের পাশের ঘরে জুতোগুলো রেখে, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন।

"দাদু জুতো খুলছে কেন?" আকাশ রুমাকে জিজ্ঞেস করল।

"ওভাবেই তাঁর বেশি আরাম লাগে।"

"আমিও জুতো খুলব," আকাশ তার চটিজোড়া মেঝের ওপর ঠুকল।

ছেলেবেলার অনেক অভ্যাসের মতো এটাও রুমা বড় হয়ে ছেড়ে দিয়েছে। কখন বা কেন, জানতে পারেনি। সে আকাশের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে বাবাকে বাড়িটা দেখাল। তার ছেলেবেলায় যে ঘরগুলোতে সে বড় হয়েছিল, এ বাড়ির ঘরগুলো তার চেয়ে অনেক বড় এবং বেশি সাজানো। আকাশ তাঁদের পিছন পিছন ঘুরছিল। মাঝে মাঝে নিজের মনেই কোথায় ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল। বাড়িটা ১৯৫৯ সালে তৈরি, একজন স্থপতি বাড়িটার নকশা করেছিলেন। তিনিই ছিলেন বাড়িটার প্রথম মালিক। রুমা এবং অ্যাডাম ধীরে ধীরে সেই সময়ের আসবাব দিয়ে বাড়িটা সাজিয়ে ছিল। অনুজ্জ্বল রঙের উলের ঢাকা দেওয়া সাদামাটা দামি সোফা, বাইরের দিকে একটু বের করা পায়াওলা লম্বা, নিচু বুককেস। একটা ঢালু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে কয়েকটা ব্লক পরেই লেক ওয়াশিংটন। লিভিং রুমের একটা বড় জানলায় যেন এই হ্রদের জল ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে আছে। খাবার ঘরের পর একটা ঢাকা দেওয়া বারান্দা। সেখান থেকে আরও অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। বাঁদিকে সিয়্যাট্‌লের দিগন্তরেখা, নাক বরাবর তাকালে অলিম্পিক পাহাড়। তার বরফঢাকা চুড়ো দেখে মনে হয় যেন, সেগুলো ভাসমান সাদা, উত্তাল

AMARBOI.COM

ঢেউয়ের মতো মেঘ থেকেই কেটে তৈরি করা হয়েছে। রুমা এবং অ্যাডামের শহরতলিতে থাকার পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু পাঁচ বছর অন্য বিল্ডিং-এর পিছনদিকই শুধু দেখতে পাওয়া যায় এমন অ্যাপার্টমেন্টে থাকার পর, হ্রদের এত কাছে একটা বাড়ি, যেখানে বসে তারা সূর্যাস্ত দেখতে পারে, ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

হ্রদের ওপরের দুটো ব্রিজের একটিকে দেখিয়ে রুমা বলল, জল খুবই গভীর বলে, সাঁকোগুলো মধ্যিখানে পন্টুনের ওপর ভেসে আছে। তার বাবা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। তার মা থাকলে আরও আগ্রহী হতেন। দৃশ্যটি নিয়ে মন্তব্য করতেন, ভাবতেন সবুজের চেয়ে আইভরি রঙের পরদা বেশি ভাল লাগত কিনা। লিভিং রুমের এক দিক থেকে আর-এক দিকে তার বাবাকে হাঁটতে দেখে মনে হল যেন, তিনি মনে মনে ঘরটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপছেন। রুমার মনে আছে, অতীতে তাকে ডর্ম-রুম এবং কলেজের পর প্রথম অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে যাওয়ার সময় সাহায্য করতে সঙ্গে গেলেও বাবা এমনই করতেন। সে কল্পনা করল, বাবা বেড়াতে গিয়ে, কোনও চত্বরের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে হেঁটে যাচ্ছেন, গির্জার মধ্যভাগে পায়চারি করছেন, কোনও লাইব্রেরি বা মিউজিয়ামে ঢুকতে হলে ক'টা সিঁড়ি উঠতে হয় গুনছেন।

সে বাবাকে নীচে নিয়ে গেল, যেখানে সে তাঁর থাকার জন্য গেস্টরুমটা প্রস্তুত করেছিল। ঘরটা একটা অ্যাকর্ডিয়ান-দরজা দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা। একদিকে খাট আর দেরাজ। অন্যদিকে একটা ডেস্ক আর সোফা, বুককেস এবং কফি-টেবিল। সে বাথরুমের দরজা খুলে যে বেতের ঝুড়িতে কাচার জন্য জামাকাপড় ফেলতে হবে, সেটা দেখিয়ে দিল। "তুমি চাইলে এটা বন্ধ করে দিতে পারো," সে অ্যাকর্ডিয়ান-দরজাটা টেনে দেখাল।

"দরকার হবে না," বাবা বললেন।

"পুরোটা, মা," আকাশ বলল। সে দরজার হাতলটা ধরে টান দিচ্ছিল বলে ভাঁজ করা ক্রিম রঙের দরজাটা সামনে-পিছনে দুলছিল। "পুরোটা বন্ধ করো।"

"না, আকাশ।"

"আমি বড় হলে এটা আমার ঘর হবে," আকাশ ঘোষণা করল।

"কোণের ওই টিভিটা চলে, কিন্তু কেব্‌ল লাগানো নেই," রুমা বাবাকে

AMARBOI.COM

জানাল। "নয়-এ পিবিএস স্টেশন," সে যোগ করল। সে জানে যে, সেগুলো বাবার প্রিয় অনুষ্ঠান।

"এই, জুতো পরে আমার খাটে উঠো না," বাবা হঠাৎ আকাশকে বলে উঠলেন। আকাশ খাটের ওপর উঠে বড় বড় সতর্ক পা ফেলে বেডকভারের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছিল।

"সোনা, খাট থেকে নেমে পড়ো।"

এক মুহূর্তের জন্য আকাশ তাঁদের অগ্রাহ্য করে ঠিক যা করছিল, তাই করতে থাকল। তারপর থেমে, দাদুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "কেন?"

রুমা কিছু বোঝানোর আগেই তার বাবা বললেন, "নয়তো আমি দুঃস্বপ্ন দেখব।"

আকাশ মাথা নিচু করল। অবাক হয়ে রুমা দেখল যে, সে বাচ্চাদের মতো হামাগুড়ি দিয়ে চট করে মেঝেয় নেমে পড়ল।

তাঁরা ওপরে ফিরে গেলেন, রান্নাঘরে। এই ঘরটা নিয়েই রুমা সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করে। ঘরটায় সোপস্টোনের কাউন্টার এবং চেরি কাবার্ড আছে। বাবাকে ঘরটা দেখাতে দেখাতে রুমার মনে হল অ্যাডাম ও তার সংসার কত সার্থক। আবার একইসঙ্গে সে বাবার নীরবতা থেকে বুঝতে পারল যে, সেসব কিছুই তাঁর প্রশংসা অর্জন করতে পারেনি।

"এসব অ্যাডাম লাগিয়েছে?" রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন। সেই প্রথম তিনি অ্যাডামের নাম উল্লেখ করলেন।

"না। ওগুলো সবই ছিল।"

"তোর ডেলফিনিয়ামগুলোয় জল দেওয়া দরকার।"

"কোনগুলো ডেলফিনিয়াম?" নিজের বাগানের গাছের নাম জানে না বলে রুমার লজ্জা লাগল।

বাবা দেখিয়ে দিলেন। "লম্বা বেগুনি যেগুলো।"

রুমার খেয়াল হল, বাবার এখন আর বাগান করা হয় না। তার যতদূর মনে পড়ে, বাবার বাগান করার নেশা ছিল। গরমকালে অফিস থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে যেতেন। অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত বাগানে কাজ করতেন পোকার কামড় এবং চুলকুনি অগ্রাহ্য করে। কাজটা তিনি একাই করতেন। রোমি বা রুমা কারও কখনও তাঁকে সাহায্য করার ইচ্ছে হয়নি, বাবাও কখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের ডাকেননি। মা রেগে যেতেন, রাত ন'টা পর্যন্ত খাবার রেখে দিতে হত বলে। "তুমি খেয়ে নাও না," রুমা বলত। কিন্তু তার মা সারাজীবন শিখেছিলেন যে, স্বামীকে আগে খেতে দিতে হয়। তার অন্যথা করার কথা ভাবতেনও না। ক্রমশ টম্যাটো, বেগুন এবং ধুঁধুল ছাড়াও, বাবা সেইসব গাছ বড় করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, যা দিয়ে রুমার মা রান্না করতে পছন্দ করতেন— করোলা, লঙ্কা এবং বিশেষ প্রজাতির পালং শাক। স্ত্রীর অন্যান্য প্রয়োজনের প্রতি নিস্পৃহ হলেও, তিনি প্রতিকূল মাটিতে মেহনত করে, যত্ন করে মাটি থেকে সেইসব ফসল ফলাতেন।

রুমার বাবা মোটা লাল নবযুক্ত চকচকে সিঙ্ক-বার্নার স্টোভের দিকে একবার তাকিয়ে, কিছু না জিজ্ঞেস করেই একটা কাবার্ড খুলতে শুরু করলেন।

"কী খুঁজছ?"

"কেটলি আছে?"

রুমা ভাঁড়ার রাখার জায়গাটা খুলল। "আমি চা করছি, বাবা।"

"ডেলফিনিয়ামগুলোয় জল দিয়ে দিই। হয়তো আর একদিনও বাঁচবে না।" তিনি রুমার হাত থেকে কেটলিটা নিয়ে সিঙ্ক থেকে জল ভরলেন। তারপর ধীরে ধীরে, সাবধানে সেটা বয়ে, অদ্ভুতভাবে ছোট ছোট পা ফেলে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাইরে গেলেন। তাঁর আসার পর প্রথমবার রুমার মনে হল যে, দৃষ্টি পরিষ্কার এবং চামড়া টানটান থাকা সত্ত্বেও বাবা বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাবাকে ভুরু উঠিয়ে মাথা নিচু করে ফুলগাছে জল দিতে দেখল। মাটির ওপর জোরে, অবিরত জল পড়ার শব্দ শুনল। আওয়াজটা তাকে সামান্য অস্বস্তি দিল, যেন বাবা তার উপস্থিতিতে প্রস্রাব করছেন। শব্দটা থেমে যাওয়ার পরও, বাবা মুহূর্তকালের জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কেটলিটা ঝুঁকিয়ে জলের শেষ ফোঁটাগুলো ঢেলে দিলেন। আকাশ তাঁর পিছন পিছন বাইরে গিয়েছিল। এখন সে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলে দাদুর দিকে তাকিয়ে ছিল।

রুমার মাকে আকাশের মনে নেই। তার যখন দু'বছর বয়স, তখন তিনি মারা যান। এখন, রুমা কোনও ফোটোয় তার মাকে দেখালে, আকাশ সবসময় বলে, "উনি মারা গিয়েছেন," যেন রুমার মা কোনও অসাধারণ এবং প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। আকাশের জন্মের পর রুমার মা এসে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে গিয়েছিলেন, তার সম্বন্ধে আকাশ কিছুই জানে না। বাচ্চা জন্মানোর পরের সকালগুলোতে ক্লান্ত রুমা যখন ঘুমোত, তখন তার মা আকাশকে নিজের কাছে রাখতেন। কিছুতেই তাকে দোলনায় শোয়াতে চাইতেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোলে নিয়ে থাকতেন। নতুন যে আসবে, সে রুমার মা'র সম্বন্ধে কিছুই জানবে না। শুধু আকাশের জন্য তিনি যে সোয়েটার বুনেছিলেন, যেগুলো এখন তার গায়ে ছোট হয়ে গিয়েছে, সেগুলো এবার নতুনজন পরবে। একটা অর্ধেক বোনা কার্ডিগান আছে, সাদা তারার নকশা কাটা, এখনও কাঁটায় জড়ানো। মায়ের যে কয়েকটি জিনিস রুমা রেখে দিয়েছে, তার মধ্যে এটিও আছে। মায়ের দুশো আঠেরোটা শাড়ির মধ্যে রুমা মাত্র তিনটি নিয়ে, তার দেয়াল-আলমারির পেছনে, একটা কাঁথার মতো সেলাই করা, চেন-আটকানো ব্যাগে রেখে দিয়েছিল। বাকিগুলো মায়ের বন্ধুদের ভাগ করে নিতে বলেছিল। তার মনে আছে, কতবার মা ঠিক এই দিনটিই মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। দুঃখ করেছিলেন যে, তাঁর মেয়ে তাঁর শাড়ির চেয়ে প্যান্ট এবং স্কার্ট বেশি পছন্দ করে। এবং তিনি না থাকলে তাঁর জিনিসগুলো দিয়ে যাওয়ার মতো কেউ থাকবে না।

রুমার বাবা জিনিসপত্র গোছাতে নীচে গেলেন। দেরাজের একটি টানায় তাঁর দু'জোড়া প্যান্ট রাখলেন, চারটে চেক-কাটা গরমকালের শার্ট দেওয়াল-আলমারিতে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখলেন। বাড়িতে পরার জন্য পায়ে একজোড়া হাওয়াই চপ্পল গলিয়ে ফাঁকা সুটকেসটা বন্ধ করে দেওয়াল-আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখলেন। কিটব্যাগটা বাথরুমে, সিঙ্কের পাশে রেখে দিলেন। এইসব ব্যবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রী খুশি হতেন। তাঁর স্ত্রীর সবসময়ই খারাপ লাগত ভেবে যে, রুমা এবং অ্যাডাম এমন একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকত, যেখানে তাঁদের থাকার জন্য কোনও আলাদা ঘর ছিল না। রুমার বাবা উঠোনের দিকে তাকালেন। দু'দিকেই অন্যান্য বাড়ি থাকা সত্ত্বেও, কিন্তু পিছনদিকটা নিরিবিলি মনে হচ্ছিল। এখান থেকে হ্রদের জল বা পাহাড় দেখা যায় না, শুধু প্রান্তরের ওপর চিরহরিৎ গাছেরা ঘন হয়ে আছে। যেগুলো হাইওয়ের দু'ধারেও দেখেছেন তিনি, যেগুলো সিয়্যাট্‌লের সর্বত্র দেখা যায়।

ওপরে, বারান্দায় রুমা চা সাজাচ্ছিল। একটা ট্রে-তে করে সবকিছু বের করে এনেছিল— এক পট দার্জিলিং চা, ছাঁকনি, দুধ, চিনি এবং এক প্লেট

AMARBOI.COM

নাইস বিস্কুট। রুমার বাবার মনে এই বিস্কুটগুলোর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর অস্তিত্ব গভীরভাবে জড়িয়ে আছে— চিনির বড় দানাওলা নারকেলের ক্ষীণ স্বাদযুক্ত, এক বাক্স এই বিস্কুট তাঁদের রান্নাঘরের কাবার্ডে সবসময় থাকত। কখনও এমন হয়নি যে, তিনি একটা বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে খেতে গিয়েছেন, এবং সেটা গলে চায়ের কাপের তলায় দলা পাকিয়ে পড়ে যায়নি।

তিনি বসে উপহার বিলি করতে শুরু করলেন। আকাশের জন্য লাল রঙের প্রোপেলারদেওয়া একটা ছোট কাঠের উড়োজাহাজ এবং একটা পুতুলনাচের পিনোচিও। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে খেলনাগুলো নিয়ে খেলতে শুরু করল। পিনোচিওর সুতোয় জট পাকিয়ে ফেলে রুমার কাছে বায়না ধরল জট ছাড়িয়ে দেওয়ার। রুমার জন্য হাতে রং-করা একটা নুন-গোলমরিচ রাখার শিশি। তার এক পাশে 'ওলিও' লেখা। অ্যাডামের জন্য একটা মার্বেলের মতো রং করা বাক্স, যাতে কাগজের ক্লিপ রাখা যায়। সবকিছুই মিসেস বাগচি পছন্দ করেছিলেন। একটা খেলনার দোকানে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন তাঁরা। যদিও তাঁর নিজের কোনও নাতি-নাতনি নেই। রুমা বা রোমিকে মিসেস বাগচির সম্পর্কে কিছুই বলেননি রুমার বাবা। কিছু বলার পরিকল্পনাও নেই তাঁর। তিনি তাদের বিচলিত করার কোনও কারণ দেখেন না। বিশেষ করে রুমাকে, এই অবস্থায়। তিনি ভাবতেন, অতীতে তাঁর ছেলেমেয়েও এমন ভাবত কিনা হয়তো তারাও এমন গোপন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ত, যা জানতে পারলে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বারণ করতেন, ভেঙে পড়তেন।

রুমার বাবার প্রথম ইউরোপ ভ্রমণে আসলে রুমা ও তার মায়ের যাওয়ার কথা ছিল। রুমার মা যে বছর মারা গিয়েছিলেন, তার আগের বছর তিনি হঠাৎ বলতে শুরু করেছিলেন যে, তিনি পেনসিলভেনিয়া থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে বহুবার ইউরোপের আকাশ দিয়ে যাত্রা করেছেন কিন্তু কখনও ভেনিসের খাল বা আইফেল টাওয়ার বা হল্যান্ডের উইন্ডমিল বা টিউলিপ দেখেননি। স্ত্রীর আগ্রহ দেখে রুমার বাবা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁদের বিবাহিত জীবনের বেশিরভাগ সময়েই, কলকাতায় যাওয়া ছাড়া আর কোনও কারণে প্লেনে ওঠার দরকার নেই বলেই মনে করা হত। "ট্র্যাভেল চ্যানেলে কত ভাল ভাল জায়গা দেখায়," মাঝে মাঝে কোনও সন্ধেবেলায় তাঁর স্ত্রী মন্তব্য করতেন। "আমরাও তো এখন যেতে পারি। তোমার ছুটিগুলো তো

AMARBOI.COM

সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।" কিন্তু সেইসময় তেমন বেড়ানোয় রুমার বাবার কোনও আগ্রহ ছিল না। স্ত্রীর আচমকা বেড়ানোর ইচ্ছের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। তা ছাড়া, অত বছরের বিবাহিত জীবনে, তাঁরা কখনও একসঙ্গে একলা কোথাও ছুটি কাটাতে যাননি।

মায়ের চৌষট্টিতম জন্মদিনের উপহার হিসেবে রুমা নিজের এবং মায়ের জন্য প্যারিসের একটি প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করেছিল। যাওয়ার কথা ছিল গ্রীষ্মে, যাতে অ্যাডাম আকাশকে নিয়ে মার্থাজ় ভিনিয়ার্ড-এ তার মা-বাবার কাছে যেতে পারে। রুমা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে টাকা জমা দিয়ে দিয়েছিল। কাজ চালানোর মতো ফরাসি শেখার জন্য ক্যাসেট এবং রঙিন ছবি ভরতি একটা গাইডবই পাঠিয়েছিল মাকে। বেশ কয়েকদিন, রুমার বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে শুনতে পেতেন, তাঁর স্ত্রী সেলাই-ঘরে বসে একটা ওয়াকম্যানে ক্যাসেটগুলো শুনছেন, ফরাসিতে সংখ্যা গুনছেন, সপ্তাহের দিনগুলো আওড়াচ্ছেন। সেই মতোই গলস্টোন অপারেশনের দিন ঠিক হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন যে, অস্ত্রোপচারের পর বেড়াতে যাওয়ার আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য ছ'সপ্তাহ যথেষ্ট। অপারেশনের দিন, যদিও বাবা বলেছিলেন যে, রুমার থাকার কোনও দরকার নেই, তবুও সে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আকাশের সঙ্গে এসেছিল। ওয়েটিং রুমে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলে রুমার বাবার কত বিরক্ত লাগছিল, তাও তাঁর মনে আছে। সেই বিরক্তি এখনও যত স্পষ্টভাবে তাঁর মনে আছে, সার্জেনের দেওয়া খবর তত স্পষ্টভাবে মনে নেই। সেই খবর এবং তার পরের ঘটনা তাঁর কাছে এখনও আবছা। ডাক্তার বলেছিলেন, তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁর পেশি শিথিল করার উদ্দেশ্যে যে রকুরোনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছিল, তার প্রতি তাঁর শরীরে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তাঁর মৃতদেহ দেখতে যাওয়ার জন্য রুমা এবং রুমার বাবা আকাশকে পালা করে দেখেছিলেন। একসময় সেই হাসপাতালেই রুমা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছিল। ফুটবল খেলতে গিয়ে রোমির হাত ভেঙে যাওয়ার পর সেই হাসপাতালেই রুমার বাবা ছেলেকে নিয়ে দৌড়ে গিয়েছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কয়েক সপ্তাহ পর রুমার বাবার এক সহকর্মী তাঁকে ছুটি নেওয়ার বুদ্ধি দিয়েছিলেন। তখনই, রুমা এবং তার মা যে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন, তার কথা মনে পড়েছিল তাঁর। তিনি রুমাকে জিজ্ঞেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন তার তখনও যাওয়ার ইচ্ছে আছে কি না। এবং সে 'না' বলে দেওয়ার পর জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ভ্রমণটা তাঁর নামে করা যায় কিনা।

"তোমার ইতালি ভাল লেগেছে?" রুমা এখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। সে পিনোচিওকে কোলে নিয়ে অপটু হাতে সুতোর জট ছাড়াচ্ছিল। বাবা বলতে চাইছিলেন যে, সে ভুলভাবে এগোচ্ছে, মাঝখানের একটা গিঁট আগে খোলা প্রয়োজন। তার বদলে, তিনি তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললেন যে, তাঁর ইতালি খুবই ভাল লেগেছে। মনোরম আবহাওয়া, অনেকগুলো পিয়াৎজ্জা এবং সেখানকার মানুষ যে বেশিরভাগ আমেরিকানের মতো মোটা নয়, এসব নিয়ে মন্তব্য করলেন। তর্জনী তুলে এদিক-ওদিক হেলালেন। "এবং সকলে এখনও ধূমপান করে। আমার নিজেরই একটা সিগারেট খাওয়ার লোভ হচ্ছিল," তিনি বললেন। রুমা যখন খুব ছোট, তখন তিনি ধূমপান করতেন। অভ্যেসটা ভারতে ধরেছিলেন, কিন্তু চল্লিশের কোঠায় আসার পর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে আছে, রুমাই তাঁকে সিগারেট ছাড়ার জন্য জোরাজুরি করত। রোমি বা তাঁর স্ত্রী তা কখনও করতেন না। রুমা তাঁর উইনস্টন-এর প্যাকেট লুকিয়ে রাখত অথবা তাঁর অজান্তে সিগারেট সরিয়ে তার জায়গায় টিস্যু পেপার মুড়ে রেখে দিত। একবার রুমা সারারাত কেঁদেছিল। স্কুলে শিক্ষিকার কাছ থেকে ধূমপানের বিপজ্জনক প্রভাব সম্পর্কে শোনার পর তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, বাবা কয়েক বছরের মধ্যেই মারা যাবেন। সেই সময় মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি কিছুই করেননি। তার আশঙ্কা সত্ত্বেও নেশা ছাড়েননি। বাড়ির একটা ছোট, পেতলের ছাইদানির প্রতি তাঁর বিশেষ টান ছিল। সেটা একটা নাগরাই জুতোর আদলে। আঙুলের কাছটা ছুঁচলো, বেঁকানো। সিগারেট ছাড়ার পর তিনি বাড়ির সবক'টা ছাইদানি ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি কেন, রুমা তাঁর সেই প্রিয় ছাইদানিটাই আলাদা করে, ধুয়ে-মুছে তার খেলনার সঙ্গে রেখে দিয়েছিল। তাঁর মনে আছে, রুমা এবং তার বন্ধুরা ভান করত যে, সেটা সিন্ডারেলার কাচের জুতো। রুমার অনেক পুতুলের শক্ত প্লাস্টিকের পায়ে পরানোর চেষ্টা করত।

"খেয়েছিলে নাকি?" রুমা তাঁকে জিজ্ঞেস করল।

"কী?"

"ইতালিতে সিগারেট খেয়েছিলে?"

AMARBOI.COM

"না না। ওসবের আর বয়স নেই," হ্রদের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন।

"ওখানে কী খেতে?" রুমা জিজ্ঞেস করল।

তাঁদের দলটা প্রথমদিকে একবার মেদিচি প্যালেস-এর কাছে একটা রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করেছিল। বিভিন্ন ব্যঞ্জনের বহর এবং খাবারের পরিমাণ দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। মেরিনেট করা সবজিই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারপর বেয়ারা রাভিয়োলি এবং ঝলসানো মাংসের প্লেট এনে রেখেছিল। সেই দুপুরে তিনি এবং দলের আরও অনেকেই বাকি দর্শনীয় স্থান দেখতে না গিয়ে সামলে ওঠার জন্য হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন। পরের দিন তাঁদের গাইড বলেছিল যে, রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ না খেলেও চলবে, শুধু পরবর্তী নির্ধারিত সময় এবং জায়গায় সকলকে পৌঁছে যেতে হবে। তাই তিনি এবং মিসেস বাগচি একসঙ্গে ঘুরতে শুরু করেছিলেন। সামান্য কিছু খাওয়ার জন্য নিয়ে নিতেন। বিস্মিত হতেন এই ভেবে যে, একসময় তাঁরাও ভারতীয় রীতি অনুযায়ী অত বিশদে ভোজন করতে পারতেন।

"দু'-একটা পাস্তা রান্না খেয়ে দেখেছিলাম," রুমার বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন। "কিন্তু প্রধানত পিৎজ্জাই খেতাম।"

"তিন সপ্তাহ ইতালিতে শুধু পিৎজ্জা খেয়ে কাটালে?"

"পিৎজ্জাগুলো বেশ সুস্বাদু ছিল।"

রুমা মাথা নাড়ল। "কিন্তু ওখানকার খাবার তো দারুণ।"

"আমার কাছে ভিডিও আছে," রুমার বাবা কথা ঘোরালেন। "তুই দেখতে চাইলে পরে দেখাতে পারি।"

তাড়াতাড়িই রাতের খাওয়া হল। রুমা বলল, সফরের পর বাবা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। বাবা বললেন যে, তাঁর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার ইচ্ছে। হাজার হোক, ইস্ট কোস্ট-এ সময়টা তিন ঘণ্টা দেরিতে চলে। রুমা গত দু'দিন ধরে রান্না করে খাবারগুলো এক-এক করে ফ্রিজের তাকে জড়ো করেছে। এত কাজ করে সে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। অ্যাডামের জন্য রান্না করতে হলে সে কুঁড়েমি করতে পারত। ডাল বাদ দিতে পারত অথবা চচ্চড়ির বদলে স্রেফ একটা স্যালাড দিয়ে কাজ চালাতে পারত। মাঝে মাঝে তার মা ফোন করে জিজ্ঞেস করতেন সে কী রান্না করেছে। উত্তর শুনে আশ্চর্য হয়ে বলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠতেন, "ব্যস, ওইটুকুই?" সেইসব মুহূর্তে রুমা বুঝতে পারত, তার স্ত্রী হওয়ার অভিজ্ঞতা কত আলাদা। তার মা কখনও গোঁজামিল দিয়ে কাজ চালাননি। পেনসিলভেনিয়াতেও তিনি এমনভাবে সংসার চালাতেন, যেন তাঁর ওপর শাশুড়ির কড়া নজর রয়েছে। রুমার মা অত্যন্ত ভাল রান্না করা সত্ত্বেও বাবা কখনও তাঁর রান্নার প্রশংসা করেননি। অন্য কারও বাড়ি গেলে, ফেরার পথে তিনি যখন খাবারের সম্পর্কে অভিযোগ করতেন, একমাত্র তখনই বোঝা যেত তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতিভার কত কদর করেন। রুমার রান্না মায়ের রান্নার ধারেকাছেও আসতে পারে না। সবজির ফালিগুলো বেশি মোটা, ভাত গলে গিয়েছে। কিন্তু তার রাঁধা খাবার খেতে খেতে বাবা বারবার বললেন খাবারগুলো কত সুস্বাদু।

বহু মাস পর, সিয়্যাট্‌লে নতুন বাড়িতে আসার পর প্রথমবার রুমাও বাবার মতো আঙুল দিয়েই খেল। আকাশ তাঁদের মাঝখানে তার বুস্টার সিটে বসেছিল। সেও আঙুল দিয়ে খেতে চাইল, কিন্তু রুমা তাকে হাত দিয়ে খেতে শেখায়নি। তাঁরা রুমার মা বা রোমিকে নিয়ে কোনও আলোচনা করলেন না। নামে অদ্ভুত মিল থাকা সত্ত্বেও, রুমা তার ভাইয়ের সঙ্গে নিজের খুব কমই মিল খুঁজে পেত। তাঁরা রুমার গর্ভাবস্থা নিয়েও কথা বললেন না। জিজ্ঞেস করলেন না, আগেরবারের তুলনায় রুমার শরীর কেমন লাগছে। রুমার মা থাকলে নিশ্চয়ই তা আলোচনা করতেন। কথাবার্তা খুব বেশি হল না। রুমার বাবা কখনওই খাওয়ার সময় বেশি কথা বলেন না। তাঁর স্বল্পভাষিতা নিয়েও রুমার মা অভিযোগ করতেন। এই ব্যাপারেও, রুমা মায়ের কাছে তার বাবার অপারগতা পূরণ করার চেষ্টা করেছিল।

"এখনও অনেক আলো আছে বাইরে," বাবা একসময় বললেন। খাওয়া শুরু করার পর থেকে তিনি একবারও প্লেট থেকে চোখ তোলেননি। রুমার অনেক সময়ই যেমন মনে হত, এখনও তেমন মনে হল যে, তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিকের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।

"এখানে গরমকালে ন'টার আগে সূর্য ডোবে না," রুমা বলল। "সরি বেগুনিগুলো ভেঙে গিয়েছে, তেল ঠিকমতো গরম হওয়ার আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম," সে যোগ করল।

"ও কিছু হবে না। খেয়ে দেখো," রুমার বাবা আকাশকে বললেন। সে গত চার মাস ধরে ডিনারে ম্যাকারোনি আর চিজ় ছাড়া কিছুই খেতে চায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশের প্লেটের দিকে দেখিয়ে তিনি রুমাকে বললেন, "এসব কিনে দাও কেন? কেমিক্যালে ভরতি।" আকাশ যখন আরও ছোট ছিল, রুমা মায়ের উপদেশ মেনে তাকে ভারতীয় খাবারে অভ্যস্ত করার জন্য মুরগি এবং দারচিনি-এলাচ-লবঙ্গ দিয়ে তরিতরকারি সেদ্ধ করে খাওয়ানোর চেষ্টা করত। এখন আকাশ বাক্স থেকে বের করা খাবার খায়।

"আমার যাচ্ছেতাই লাগে," আকাশ দাদুর প্লেটের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে উত্তর দিল।

"আকাশ, ওভাবে কথা বলে না।" রুমার চেষ্টা সত্ত্বেও আকাশ সেই ধরনেরই আমেরিকান শিশু হয়ে যাচ্ছিল, যেমন না হওয়ার জন্য রুমা সতর্ক থাকত। যেমন শিশু দেখলে তার মা আতঙ্কিত, ত্রস্ত বোধ করতেন। উদ্ধত শিশু, যে কোনও খাবার খেতে ভয় পায়। ছেলেবেলায় রুমা যা তৈরি করে দিত, আকাশ তাই খেত। "তুই দিদার রান্না খেতিস তো," রুমা বলল। "দিদা কতরকমের খাবার তৈরি করত।"

"দিদাকে আমার মনেই নেই," আকাশ বলল। সে এপাশ থেকে ওপাশ মাথা নাড়তে লাগল যেন দিদা কখনও জীবিত ছিলেন, সেই কথাটাই অস্বীকার করছে। "মনে নেই। উনি মারা গিয়েছেন।"

আকাশের ঘুমোতে যাওয়ার আগে রুমা তাকে গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল, এমন সময় বাবা আস্তে করে দরজায় টোকা মেরে তাকে কর্ডলেস ফোনের রিসিভারটা ধরিয়ে দিলেন। ডান হাতটা অদ্ভুতভাবে বুকের সামনে উঠিয়ে ছিলেন। রুমা দেখল, তাঁর হাতে প্লেট-ডিশ ধোয়ার সাবানজল লেগে আছে। "অ্যাডামের ফোন।"

"বাবা, আমি ওগুলো করে নিতাম। তুমি ঘুমোতে যাও।"

"কয়েকটাই তো জিনিস।" সকলের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর বাবাই সবসময় প্লেট-ডিশ ধুতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, খাওয়ার পর পনেরো মিনিট সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁর খাবার হজম করতে সুবিধে হয়। বাসনে সাবান মাখানোর সময় বাবা কখনও জলের কল খুলে রাখতেন না। কিন্তু রুমা, রুমার মা, বা রুমার পরিচিত কেউ এমন করত না। যতক্ষণ না সবক'টা বাসনে সাবান লাগানো হত ততক্ষণ অপেক্ষা করতেন। তারপর শুধু স্পঞ্জের শান্ত, একটানা শব্দ শোনা যেত।

AMARBOI.COM

রুমা ফোনটা নিল। "রুম," সে অ্যাডামের গলা শুনতে পেল। তাদের দেখা হওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই অ্যাডাম তাকে ওই নামে ডাকতে শুরু করেছিল। প্রথমবার যখন অ্যাডাম তাকে চিঠি লিখেছিল, তখন রুমার নামের বানান ভুল লিখেছিল। ইংরেজিতে 'প্রিয় রুম,' বলে শুরু করে 'Rum'- এর বদলে 'Room' লিখেছিল।

অ্যাডাম এবার ক্যালগারিতে গিয়েছে। রুমা কল্পনা করল, সে হোটেলের ঘরে জুতো খুলে, টাই আলগা করে, গোড়ালি আড়াআড়ি করে গা এলিয়ে দিয়েছে। উনচল্লিশ বছর বয়সেও অ্যাডাম বালকসুলভ সুপুরুষ। ঘন কোঁকড়ানো বাদামি-সোনালি চুল যা আকাশ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে, ম্যারাথনবীরের মতো চাঁচাছোলা শরীর, গালের হাড় এমন, যা রুমা গোপনে প্রবলভাবে কামনা করে। তার গম্ভীর গভীর কণ্ঠস্বর এবং আজকাল সে দূরের দৃষ্টির জন্য যে চশমা পরে, তা ছাড়া অ্যাডামকে এখনও সেইসব ফুরফুরে মেজাজের, সুঠাম দেহের ছেলেদের একজন বলে চালানো যায়, যারা রুমার সঙ্গে কলেজে পড়ত।

"বাবা এসেছেন।"

"কথা হল।"

"কী বললেন বাবা?"

"যা বলেন, 'কেমন আছ? মা-বাবা কেমন আছেন?' ", কথাটা সত্যি। রুমার বাবা অ্যাডামের সঙ্গে কখনও এ ছাড়া আর কোনও কথা বলেন না।

"খেয়েছ?"

উত্তর দেওয়ার আগে অ্যাডাম একটু চুপ করে থাকল। রুমা বুঝল, কথা বলতে বলতে সে নিশ্চয়ই টিভিতে কিছু দেখছে। "এক মক্কেলের সঙ্গে ডিনার খেতে যাব। আকাশ কেমন আছে?"

"এই তো এখানে।" রুমা রিসিভারটা আকাশের কানে লাগাল। "বাবাকে 'হাই' বলো।"

"হাই," নিরুৎসাহীভাবে আকাশ বলল। তারপর সব চুপচাপ। রুমা শুনতে পাচ্ছিল যে, অ্যাডাম বলছে, "কী খবর, ভায়া? দাদুর সঙ্গে খুব মজা করা হচ্ছে?" কিন্তু আকাশ আর কথা বলতে চাইল না। বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকল। শেষে রুমা ফোনটা নিজের কানে নিল।

"ক্লান্ত হয়ে পড়েছে," রুমা বলল। "ঘুমিয়ে পড়বে এবার।"

AMARBOI.COM

"আমিও যদি ঘুমোতে পারতাম," অ্যাডাম বলল। "কিন্তু নেই আর শরীরে।"

রুমা জানত, সাতসকাল থেকে অ্যাডাম ঘোরাঘুরি করছে, সারাদিন কাজ করেছে, ডিনারের সময়ও তাকে কাজ করতে হবে। অথচ তার মনে কোনও সহানুভূতি জাগল না। "আমি ভাবতে পারছি না যে বাবা এখানে থাকবেন," সে বলল।

"তা হলে থাকতে বোলো না।"

"আমার মনে হয় ওঁর দেখা করতে আসার মানে ওটাই। থাকা।"

"তা হলে জিজ্ঞেস করো।"

"আর যদি উনি থাকতে চান?"

"তা হলে উনি আমাদের কাছে থাকবেন।"

"আমার কি জিজ্ঞেস করা উচিত?"

রুমা শুনতে পেল অ্যাডাম ধৈর্যের সঙ্গে শ্বাস নিয়ে বলল, "আমরা এই নিয়ে একশোবার কথা বলেছি, রুম। এটা তোমার সিদ্ধান্ত। উনি তোমার বাবা।"

রুমা কিছু না বলে আকাশের বইয়ের একটা পাতা ওলটাল।

"আমাকে এবার উঠতে হবে," অ্যাডাম বলল। "মিস ইউ গাইজ।"

"আমরাও তোমাকে মিস করছি," রুমা বলল।

সে ফোনটা কেটে দিয়ে খাটের পাশের টেবিলের ওপর, ফ্রেমে বাঁধানো ফোটোটার পাশে রেখে দিল। ফোটোয় সে এবং অ্যাডাম তাদের বিয়ের দিন কয়েক থাকওলা সাদা কেকে ছুরি বসাচ্ছে। মায়ের মৃত্যু তার বিবাহিত জীবনে যে কীরকম প্রভাব ফেলেছিল, তা রুমা বোঝাতে পারে না। তার এবং অ্যাডামের প্রথম দেখা হয় বস্টনে, একটা ডিনার পার্টিতে। সে তখন আইনের ছাত্রী, অ্যাডাম এম বি এ করছে। সেই থেকে শুরু করে এই প্রথম রুমা তাদের মধ্যে একটা দেওয়াল তৈরি হয়। শুধু এইজন্য যে, তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা অ্যাডামের হয়নি। কারণ, অ্যাডামের মা-বাবা দু'জনেই জীবিত। ম্যাসাচুসেটসের লিঙ্কনে, যেখানে অ্যাডাম মানুষ হয়েছে, তাঁরা সেখানেই থাকেন। সে জানত যে, সে ভুল করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, রুমা সচেতনভাবে ভাবতে শুরু করেছিল যে, সে এবং অ্যাডাম দু'জন ভিন্ন মানুষ, দুটি ভিন্ন জীবনযাপন করছে। যদিও অ্যাডামের অনুপস্থিতিতে রুমা আরও বিষণ্ণ বোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত, তবুও মাঝে মাঝে অ্যাডাম বাড়ি থাকলে তার বেশি ভাল লাগার বদলে বেশি খারাপ লাগত। আকাশের দেখাশোনা করার দরকার থাকলেও, অ্যাডাম তার কাছে থাকবে, তার মন-মেজাজ নিয়ে ভাববে, এসবের চেয়ে রুমা একাকিত্বই বেশি পছন্দ করতে শুরু করেছিল।

দশ বছর আগে রুমার মা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন রুমাকে এই বিয়ে থেকে নিরস্ত করতে। বলেছিলেন যে, অ্যাডাম তাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে, শেষে সে একজন আমেরিকান মেয়েকেই চাইবে। তেমন কিছুই অবশ্য হয়নি, কিন্তু মাঝে মাঝে রুমা সেই সময়ের কথা ভাবে। মনে করে সে সময় তাকে কত শক্ত হতে হয়েছিল মায়ের সেই প্রচণ্ড ক্রোধের মুখে নিজের জায়গায় অনড় থাকতে। তার বাবা এ বিষয়ে কিছু বলতেই সম্মত হননি, যেটা আরও নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। "তুই নিজের ভারতীয় হওয়ার জন্য লজ্জিত, সেটাই হল আসল কথা," মা বারবার রুমাকে বলেছিলেন। রুমা জানত এটা কত বড় আঘাত। অ্যাডামের সঙ্গে তার বাগদানের কথা ঘোষণা করার আগে পর্যন্ত সে অন্যান্য আমেরিকান ছেলেদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা মা-বাবার কাছ থেকে গোপন রেখেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মা শুধু যে নিজের আপত্তি তুলে নিয়েছিলেন, তা-ই নয়, আপত্তি করার কথা প্রবলভাবে অস্বীকারও করতেন। তিনি অ্যাডামকে নিজের ছেলের মতো ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাঁর কাছে অ্যাডাম রোমির জায়গা নিয়েছিল। রোমি বিদেশে থাকতে গিয়ে, শুধু একটা ক্ষীণ সম্পর্ক বজায় রেখে মা-বাবার মন ভেঙে দিয়েছিল। রুমার মা অ্যাডামের সঙ্গে ফোনে গল্প করতেন, রুমা বাড়িতে না থাকলেও। মাঝে মাঝে অ্যাডামকে ই-মেল করতেন, ইন্টারনেটে তার সঙ্গে স্ক্র্যাবল খেলতেন। মা-বাবা তাদের বাড়ি আসলে, মা সবসময় একটা পিকনিক কুলার ভরতি করে বাড়িতে তৈরি মিষ্টি আনতেন। সযত্নে তৈরি, রসালো, ক্রিম-ভরতি মিষ্টি যা রুমা কখনও তৈরি করতে শেখেনি এবং যেগুলো অ্যাডাম খুব ভালবাসত।

রুমার সন্তান হওয়ার পরই তার এবং মায়ের সম্পর্ক আরও ভাল হয়েছিল। দিদিমা হওয়ার অভিজ্ঞতা তার মাকে আমূল বদলে দিয়েছিল। এমন খুশি এবং উদ্যমে ভরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে, যা রুমা আগে কখনও দেখেনি। জীবনে প্রথমবার, রুমার মনে হয়েছিল যেন, সে যে বহু প্রত্যাশা পূরণ করেনি বা এড়িয়ে গিয়েছে, তার জন্য তাকে ক্ষমা করা হল। সে মায়ের সঙ্গে প্রতি রাতে

AMARBOI.COM

কথা বলার অপেক্ষায় থাকত। সারাদিনের ঘটনা জানানো, আকাশ নতুন কী করতে শিখেছে তার বর্ণনা করা। এমনকী তার মা ভোর পাঁচটায় উঠে, রুমার কলেজের একটা পুরনো সোয়েটশার্ট পরে ব্যায়াম করাও শুরু করেছিলেন। বলতেন, তিনি নাতি-নাতনির বিয়ে দেখে যেতে চান। কখনও কখনও রুমার মনে হয় জীবনের চেয়ে মৃত্যুতেই যেন সে মার নৈকট্য বেশি অনুভব করতে পারে। হয়তো শুধু তাঁর কথা এত ভাবে বলেই, তাঁর এত অভাববোধ করে বলেই এই ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। কিন্তু সে জানে যে, এটা একটা ভ্রম। একটা মরীচিকা। আসলে তার এবং তার মায়ের মধ্যে এখন অসীম ব্যবধান, যা আর কখনও দূর হবে না।

ডিশ ধোয়ার পর রুমার বাবা সেগুলো মুছে সিঙ্কের ভিতরটা ঘষে শুকিয়ে নিলেন। ড্রেনার থেকে খাবারের টুকরো সরিয়ে দিলেন। বেঁচে থাকা খাবার ফ্রিজে ঢুকিয়ে জঞ্জালের ব্যাগটা বেঁধে ফেলে যে বড় পিপেটা ড্রাইভওয়েতে দেখেছিলেন, সেটায় ফেলে দিলেন। ভাল করে দেখে নিলেন সব দরজা তালাবন্ধ হয়েছে কি না। কিছুক্ষণ রান্নাঘরের টেবিলে বসে একটা সসপ্যান নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। ধোয়ার সময় লক্ষ করেছিলেন যে, সেটার হাতলটা নড়বড়ে। দেরাজগুলোয় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার খুঁজে না পেয়ে অগত্যা একটা ছুরির ডগা দিয়ে কাজ চালালেন। তারপর আকাশের ঘরে মাথা গলিয়ে দেখলেন, সে এবং রুমা দু'জনেই ঘুমোচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ তিনি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মেয়ের চেহারায় কী যেন বদলে গিয়েছে। এখন তার চেহারার সঙ্গে মায়ের চেহারার এত ভীষণ সাদৃশ্য যে, তিনি তার দিকে সরাসরি তাকাতে পারছিলেন না। সেদিন প্রথম যখন তিনি রুমাকে দেখলেন, যখন সে আকাশের সঙ্গে লনে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তাকে দেখে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। রুমার মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে, যেমন তাঁর স্ত্রীর মুখেও পড়েছিল। তাঁর স্ত্রীর মতোই, রুমারও রগের কাছে চুল রুপোলি হতে শুরু করেছিল। একটা ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে চুলে আলগা গিঁট বাঁধা। সেই চেহারা— সেই একইরকম চোখ, রং পর্যন্ত এক, হাসলে বাঁদিকে টোল পড়ে। এখন, তাঁর স্ত্রীর অবর্তমানে এগুলো তাঁকে কষ্ট দেয়।

জেটল্যাগ সত্ত্বেও তাঁর ঘুম আসতে দেরি হচ্ছিল, মাঝেমধ্যে হ্রদে মোটরবোটের আওয়াজেও ঘুম কেটে যাচ্ছিল। তিনি খাটে উঠে বসে

AMARBOI.COM

অন্যমনস্কভাবে প্লেনের সিট পকেট থেকে নেওয়া 'ইউ এস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট'-এর একটি সংখ্যার পাতা ওলটালেন। তারপর খাটের পাশের টেবিলটার ওপর রাখা সিয়্যাট্‌লের একটা গাইডবই খুললেন। রুমা বোধহয় সেটা তাঁর সুবিধের জন্য সেখানে রেখেছিল। নতুন লাইব্রেরি, কফিশপ এবং বরফের বিছানায় শোয়ানো গোটা স্যালমন মাছের ছবি দেখলেন। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় জানলেন। পড়লেন যে, খুব কম সময়েই এখানে বরফ পড়ে। একটা ম্যাপ দেখতে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কত দূরে এসে গিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর খেয়াল হয়নি যে, মাঝে পাহাড়পর্বতও আছে। এত দূর আসা সত্ত্বেও, পরিবেশটা ইউরোপের মতো অচেনা মনে হল না। ইউরোপে গিয়ে তাঁর আমেরিকায় কাটানো প্রথম দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যেত। আশপাশের মানুষের মাত্র দু'-একটা কথাই বুঝতে পারতেন। বিভিন্ন রকমের মুদ্রা ব্যবহার করতে হত। এখানে, পেনসিলভেনিয়ায় গ্রীষ্মের রাতের মতোই, জানলার স্ক্রিনের গায়ে মথ পাখা ঝাপটাচ্ছিল, মাঝে মাঝে কোনও পোকা এসে এত জোরে ঠোক্কর খাচ্ছিল যে তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন।

খাটে বসে বসে তিনি প্রশস্ত, অল্প আসবাবে সজ্জিত ঘরটা ভাল করে দেখলেন। তিনি যখন রুমার বয়সি ছিলেন, তখন স্ত্রী-ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিউ জার্সির গার্ডেন সিটিতে একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। প্রথমে রুমা এবং তারপর রোমি হওয়ার পর তাঁরা একটা হেঁটে ঢোকা যায় এরকম একটা দেওয়াল-আলমারিকে নার্সারিতে পরিণত করেছিলেন। সেই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে থাকার সময় তাঁর নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হত। লবির সার্ভেলান্স ক্যামেরাগুলো তাঁকে নিশ্চিন্ত করার বদলে আরও নার্ভাস করে দিত। কিন্তু সেই সময়, বায়োকেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করতে করতে, তার চেয়ে ভাল কোনও ব্যবস্থা করার সামর্থ্য ছিল না। মনে আছে, তাঁর স্ত্রী ছোট্ট রান্নাঘরটায় ইলেকট্রিক স্টোভে রান্না করতেন। রান্নার পরে প্রত্যেকটি ঘরে তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। তাঁরা পনেরো তলায় থাকতেন। তাঁর স্ত্রী সরু বারান্দাটার রেলিং-এর ওপর একটা একটা করে শাড়ি শুকোতে দিতেন। যে শোওয়ার ঘরে তাঁর স্ত্রী রুমা এবং রোমিকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, সেটা ছিল একটা বিষণ্ণ ঘর। ঘরের ভিতর সকালের আলো এসে পৌঁছোত না। তা সত্ত্বেও, তাঁর কাছে সেই ঘরটা এখন সবচেয়ে পবিত্র জায়গা বলে মনে হয়।

AMARBOI.COM

তাঁর মনে পড়ে যায়, ছেলেমেয়েরা ঘরগুলোর ভিতর ছোটাছুটি করছে। হইহুল্লোড় করছে। তাঁদের জীবনের সেই পর্বটা শুধু তাঁর এবং স্ত্রীর স্মৃতিতেই ছিল। তাঁর ছেলেমেয়েদের শুধু সেই বড় বাড়িটাই মনে থাকবে, যেটা তিনি শহরতলিতে কিনেছিলেন। সেই বাড়িটার পিছনের উঠোনে উইলো গাছ ছিল। প্রত্যেকের জন্য আলাদা ঘর ছিল। বেসমেন্ট ছিল ওদের খেলনায় ভরতি। এবং এখন রুমা যেখানে থাকে, তার তুলনায় সেই বাড়িটাও একটা পলকা কাঠামো ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর সবসময়ই ভয় হত যে, একটা দেশলাই কাঠির শিখা থেকেই বাড়িটা শেষ হয়ে যেতে পারে।

এখন তিনি একা হয়ে গিয়েছেন বলে, পরিচিত লোকজন মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করে, তিনি রুমার সঙ্গে থাকবেন কি না। মিসেস বাগচিও কথাটা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করিয়ে দেন যে, রুমাকে তাঁরা সেরকম কর্তব্যসচেতন করে মানুষ করেননি। সে তার নিজস্ব জীবনযাপন করে। সে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে, একজন আমেরিকান ছেলেকে বিয়ে করেছিল। তিনি আশা করেন না যে, রুমা তাঁকে নিজের বাড়িতে থাকতে বলবে। এবং সত্যি কথা বলতে কী, তিনি এর জন্য তাকে দোষও দিতে পারেন না। কারণ, তিনি নিজেই বা কী করেছিলেন, যখন তাঁর নিজের বাবা মারা যাচ্ছিলেন, এবং তাঁর মা একলা হয়ে গিয়েছিলেন? ততদিনে রুমা এবং রোমি কৈশোরে পদার্পণ করেছে। সপরিবারে ভারতে ফিরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। এবং তাঁর আশি বছর বয়সি বিধবা মায়েরও পেনসিলভেনিয়ায় থাকতে আসার কোনও প্রশ্ন ছিল না। যতদিন মা বেঁচে ছিলেন, তাঁর ভাইবোনেরাই মায়ের দেখাশোনা করেছিল।

তিনি যদি আগে চলে যেতেন, তা হলে তাঁর স্ত্রী রুমার সঙ্গে থাকার ব্যাপারে দ্বিতীয়বার ভাবতেন না। তাঁর স্ত্রী একা থাকার মানুষই নন। ঠিক যেমন মর্নিং গ্লোরি ফুল ছায়ায় বেড়ে ওঠার জন্য তৈরি হয়নি। সেদিক দিয়ে তাঁর স্ত্রী মিসেস বাগচির বিপরীত। আমেরিকার শহরতলিতে থাকার যে নিঃসঙ্গতা, যা নিয়ে তাঁর স্ত্রী অভিযোগ করতেন এবং যার জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করতেন, সেই একাকিত্ব তাঁর স্ত্রীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মিসেস বাগচির মতো রুমার বাবাও একাকিত্ব উপভোগ করেন। এখন, অবসর নেওয়ার পর, তিনি পেনসিলভেনিয়ায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। এই কাজটা তিনি বাড়িতে বসে কম্পিউটারেই

AMARBOI.COM

করতে পারেন। কাজেই এই কাজটা এবং ভ্রমণ তাঁকে যথেষ্ট ব্যস্ত রাখে। তিনি খুবই শান্তিতে ছিলেন কারণ, তাঁকে আর পুরনো বাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হচ্ছিল না, লনের ঘাস ছাঁটা, ঝরা পাতা পরিষ্কার করা, গ্রীষ্মে ঝড়ের জন্য বন্ধ জানলার জায়গায় জাল লাগানো এবং কয়েক মাস পরেই তার উলটোটা করা, এইসব করতে হচ্ছিল না। একই রাজ্যের অন্য এক অংশে থাকার মধ্যেও স্বস্তি ছিল। চেনা চেনা মনে হলেও পুরনো জায়গা থেকে অল্প দূরত্বের জন্য অন্যরকম লাগত। পুরনো বাড়িটায় তিনি তাঁর পুরনো জীবনেই আটকেছিলেন। যেসব পার্টিতে আগে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যেতেন, সেখানে একা-একাই যেতে হত। উদ্বিগ্ন বন্ধুরা সন্ধেবেলা ফোন করতেন, নিয়মিত এক পাত্র মুরগির ঝোল রেখে যেতেন, অথবা, তিনি একলা অনুভব করছেন ধরে নিয়ে, কোনও কথাবার্তা ছাড়াই রবিবার দুপুরে এসে পড়তেন।

হঠাৎ তাঁর ক্লান্ত লাগল, দৃষ্টি আবছা লাগল। যেন লেখাগুলো গাইডবইয়ের পাতা থেকে একটু উঠে আসল। বইয়ের ছোট গাদাটার পাশে একটা টেলিফোন ছিল। তিনি বইটা রেখে, রিসিভার তুলে ডায়ালটোন আছে কি না দেখলেন, তারপর আবার রেখে দিলেন। প্রিয়্যাট্‌লে আসার আগে তিনি মিসেস বাগচিকে ই-মেল করে মেয়ের ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন, কিন্তু ধরেই নিয়েছিলেন যে, মিসেস বাগচি তাঁকে ফোন করবেন না। রুমার বাবা নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রায় চল্লিশ বছরের সঙ্গীকে যত ভালবাসতেন, মিসেস বাগচি তাঁর দু'বছরের সঙ্গীকে তার চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। মিসেস বাগচি তাঁর মানিব্যাগে এখনও স্বামীর একটা ফোটো রেখে দিয়েছেন। একপাশে সিঁথি কাটা, দাড়ি-গোঁফ কামানো একজন বছর কুড়ির যুবক। রুমার বাবা এ নিয়ে কিছু মনে করেন না। একদিক দিয়ে তাঁর ভালই লাগে যে, এখনও অন্য এক পুরুষ মিসেস বাগচির হৃদয় জুড়ে আছে। যতই সতর্কভাবে বা অনিয়মিতভাবে হোক না কেন, সত্তর বছর বয়সে তিনি শুধুমাত্র আবেগের বশে একজন মহিলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন না। বরং এটা এত বছরের বিবাহিত জীবন কাটানোর, সাহচর্যের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পরিণতি।

স্ত্রীর অবর্তমানে, মৃত্যুচিন্তা তাঁকে কুরে কুরে খায়। জানেন যে, তাঁকেও, আচমকা মৃত্যু এসে গ্রাস করতে পারে। তাঁর কখনও এত কাছ থেকে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয়নি। তাঁর মা-বাবা এবং আত্মীয়স্বজন যখন মারা গিয়েছিলেন, তখন তিনি কয়েক মহাদেশ দূরে ছিলেন। কখনও মৃত্যুর কুৎসিত হিংস্রতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষী হতে হয়নি তাঁকে। অবশ্য দেখতে গেলে, তাঁর স্ত্রী যখন প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তখনও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি একটি পত্রিকা পড়ছিলেন, হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়া থেকে নেওয়া এক কাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন। কিন্তু সেইজন্য তাঁর নিজেকে অপরাধী মনে হয় না। তাঁর অপরাধবোধের কারণ এই যে, তাঁরা সকলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ধরে নিয়েছিলেন। ধরে নিয়েছিলেন যে, নির্ঝঞ্ঝাটে অস্ত্রোপচার হয়ে যাবে, ধরে নিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী এক রাত হাসপাতালে থাকার পর বাড়ি ফিরে যাবেন, ধরে নিয়েছিলেন যে, দু'সপ্তাহ পর আবার বন্ধুবান্ধবরা তাঁদের বাড়িতে ডিনার খেতে আসবেন এবং তার কয়েক সপ্তাহ পর তাঁর স্ত্রী ফ্রান্স বেড়াতে যাবেন। ধরে নিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রীর অস্ত্রোপচার একটি সামান্য কষ্টকর ব্যাপার মাত্র, জীবনের শেষ নয়। রুমার বাবার মনে আছে, রুমা তাঁকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে কেঁদেছিল, যেন সে খুব অল্পবয়সি। সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছে বা মৌমাছি তাকে হুল ফুটিয়েছে। এবং সেইসব সময়ের মতোই তখনও তিনি মেয়ের কাছে শক্ত হয়ে ছিলেন। এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেননি।

AMARBOI.COM

রাতে কোনও এক সময় রুমা আকাশের খাট থেকে উঠে নিজের খাটে চলে গিয়েছিল। সাধারণত, ভোরবেলা আকাশ তার খাটে আসে। কয়েক ঘণ্টা তার পাশে ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর তাকে উঠিয়ে সিরিয়াল খেতে চায়। আকাশ তার বিছানায় আসলে রুমা বারণ করে না। বিশেষ করে যখন অ্যাডাম শহরের বাইরে থাকে। কিন্তু আজ সকালে বিছানা ফাঁকাই ছিল। এখন আর তার সকালবেলায় শরীর খারাপ লাগে না বরং, আগে খাবারের কথা মনে আসে। তার একটা বারিতো চাই বা পার্ক স্লোপ-এ তাদের পুরনো অ্যাপার্টমেন্টের কাছে একটা বেগেল-এর দোকানে যে ডিম আর চিজের স্যান্ডউইচ পাওয়া যেত, তার একটা। খিদেটা তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, ঘুমন্ত অবস্থায়ও তার শরীর পরিশ্রম করছিল। রান্নাঘরে গিয়ে রুমা দেখল, ডিনারের ডিশগুলো ধুয়ে-মুছে কাউন্টারটপের একধারে রাখা আছে। জল ঝরতে দেওয়ার জায়গায় একটা পরিষ্কার বাটি, চামচ, ফলের রস খাওয়ার গ্লাস আর মাগ রাখা আছে। স্টোভের পাশে একটা পিরিচের ওপর দ্বিতীয়বার ব্যবহারের জন্য রাখা একটা টি-ব্যাগ শুকোচ্ছিল। সে বাইরে কোথাও

আকাশের গলা পেল, কিন্তু জানলা দিয়ে তাকে দেখতে পেল না। রুমা বারান্দায় গেল, এবার আকাশের গলা আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। "কিন্তু আমি তো কচ্ছপ দেখতে পেলাম না," আকাশ বলছিল। রুমা বুঝল, তার বাবা এবং ছেলে হ্রদের কাছে হাঁটতে গিয়েছিল।

রুমা প্রি-ন্যাটাল ভিটামিনটা খেল, চায়ের জল বসাল। যখন তার বাবা এবং আকাশ রান্নাঘরে ঢুকল, তখন রুমা টোস্ট তৈরি করছিল।

"আমরা লেকের কাছে গিয়েছিলাম আর দাদু আমাকে একটা মুভির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল," আকাশ উত্তেজিত গলায় বলতে বলতে দাদুর গলায় ঝোলানো ভিডিও ক্যামেরার দিকে দেখাল।

"তুমি তো ভিজে গিয়েছ," রুমা বলল। সে লক্ষ করেছিল যে, আকাশের চটির স্ট্র্যাপ আর শর্টসের সামনের দিকটা বেশ ভেজা। সে বাবার দিকে ফিরল। "কী হয়েছিল?"

"কিছু না, কিছু না। ভেবেছিলাম একটা কচ্ছপ দেখতে পেয়েছি। আকাশ সেটা ছুঁয়ে দেখতে চাইছিল," বাবা বললেন। "ও সিরিয়াল খেতে চাইছে।"

"চলো, আগে জামাকাপড় ছাড়তে হবে," রুমা আকাশকে বলল। রান্নাঘরে ফিরে এসে দেখল, বাবা কাবার্ড খুলেছেন। "ও কি এটা খায়?" চিয়ারিও-র একটা বাক্স তুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

রুমা ঘাড় নাড়ল। "তুমি কখন উঠেছ, বাবা?"

"আমি তো পাঁচটার আগেই উঠে পড়েছি। বারান্দায় বসে জলখাবার খেলাম। তারপর আকাশ এলে আমরা বাইরে গেলাম।"

"আমিই করছি," সিরিয়ালের বাটিতে বাবাকে দুধ ঢালতে দেখে রুমা বলল।

"ও ঠিক আছে। তুই খেয়ে নে।"

রুমা মাখন আর জ্যামের জন্য ফ্রিজ খুলল। চা তৈরি করল। তার হয়ে যাওয়ার পর বাবা কেটলিটা নিয়ে, যে কাপটা ডিশ-ড্রেনার-এ ছিল, সেটায় শুকিয়ে যাওয়া টি-ব্যাগটা রেখে বাকি গরম জলটুকু যোগ করলেন।

"দাদু, বাইরে?" আকাশ দাদুর প্যান্ট ধরে টান দিল।

"এক্ষুনি যাচ্ছি, বাবু। এটা শেষ করে নিই।"

প্রাতরাশ খেতে খেতে রুমা বলল বাবা যে ক'দিন আছেন, তার মধ্যে তারা কোন কোন জায়গায় বেড়াতে যেতে পারে। তিনি আসার আগেই সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিকিটের দাম দেখে রেখেছিল। সে ভেবেও রেখেছিল, প্রত্যেকটা দিন কাটানোর জন্য কী কী করা যেতে পারে। এখনও তার সিয়্যাট্‌লের ব্যবসা-কেন্দ্র ভাল করে দেখার সময় বা আগ্রহ হয়ে ওঠেনি। ভেবেছিল, বাবার সঙ্গে এই এক সপ্তাহে তা হয়ে যাবে। "স্পেস নিড্‌ল তো আছেই," সে শুরু করল। "আর পাইক প্লেস মার্কেট। জলের ধারে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম আছে। অনেকদিন ধরে ভাবছি আকাশকে নিয়ে যাব। পিউজেট সাউন্ডের ওপর দিয়ে ফেরি রাইড আছে। শুনেছি ভাল। একদিনের জন্য ভিক্টোরিয়াও যেতে পারি। তারপর বোয়িং ফ্যাক্টরি আছে, যদি যেতে চাও। ওরা ট্যুর করায়।"

"হ্যাঁ," বাবা বললেন। তাঁকে দেখে রুমার ক্লান্ত মনে হল। চশমার পিছনে তাঁর চোখ দুটো ছোট লাগল। "সত্যি কথা বলতে কী," তিনি বললেন, "একটু ছুটি নিলেও মন্দ হয় না।"

রুমা ঠিক বুঝতে পারল না। সে ধরে নিয়েছিল যে, বাবা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে সিয়্যাট্‌ল ঘুরে দেখতে চাইবেন। যেমন আজকাল তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। "তা হলে, আর তো বিশেষ কিছু করার নেই এখানে।"

"আমাকে তো আপ্যায়ন করার দরকার নেই।"

"আমি ঠিক তা বলছি না। তোমার যা ইচ্ছে, বাবা।" রুমা এবার চিন্তায় পড়ল। ভাবল, এমন কোনও কথা আছে কিনা, যা বাবা তাকে বলছেন না। ভাবল, কন্ডোমিনিয়ামে তিনি কীভাবে থাকেন। অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হয় কি না, কাছাকাছি কোনও পড়শি তাঁকে চেনে বা তাঁর খেয়াল রাখে কি না। তার মনে পড়ে গেল, সে একটা পরিসংখ্যানের কথা শুনেছিল যে, অনেকদিনের বিবাহিত দম্পতিদের একজন মারা গেলে, আর-একজনও দু'বছরের মধ্যেই মারা যান। মন ভেঙে যায় বলেই বোধহয় এরকম হয়। কিন্তু রুমা জানত যে, তার মা-বাবা কখনও পরস্পরকে সেভাবে ভালবাসেননি।

"তুমি ঠিক আছ তো?"

বাবা তার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। আকাশ তার সিরিয়াল শেষ করছিল। আর তিনি নাতির দিকে ঝুঁকে নানারকম মুখভঙ্গি করে তাকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিলেন। "মানে?"

"মানে, তুমি ভাল আছ তো?"

AMARBOI.COM

"আমি ঠিক আছি। শুধু ভাবছিলাম ছুটি থেকে ছুটি নেব," তিনি বললেন। "বেড়ানোটাও তো একরকমের কাজ।"

রুমা ঘাড় নাড়ল। "জানি।" সে সত্যিই বুঝতে পারল। কারণ, তার মন বলছে যে, বাবার কিছু হয়নি। যদিও কথাটা স্বীকার করতে খারাপ লাগে, তাঁকে এখন আগের চেয়ে বেশি খুশি লাগছিল; স্ত্রীর মৃত্যু তাঁকে নির্ভার করেছে। রুমার ওপর যা প্রভাব পড়েছিল, ঠিক তার বিপরীত।

রুমার বাবা পকেট থেকে একটা জীর্ণ, সাদা রুমাল বের করে আকাশের মুখ থেকে দুধের ফোঁটা আর সিরিয়ালের গুঁড়ো মুছে দিলেন। দেখে রুমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, কত ছোট ছোট অসুবিধে থেকে বাবা তাকে উদ্ধার করেছিলেন। সে জামার ওপর খাবার ফেললে বা তার নাক ঝাড়ার দরকার হলে অথবা তার হাঁটু ছড়ে গেলে বাবা রুমাল টেনে বের করতেন। "কয়েকদিন যেতে দাও। তারপর হয়তো আমরা একটা বোটরাইডে যেতে পারি।"

প্রাতরাশের পর আকাশের সাপ্তাহিক সাঁতার ক্লাস ছিল। রুমা ভেবেছিল বাবা বাড়িতেই থাকতে চাইবেন, কিন্তু তিনি সঙ্গে যেতে চাইলেন এবং ভিডিও ক্যামেরাটা নিয়ে গেলেন। তাঁর ভাড়া করা গাড়িতে তাদের পুল-এ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু গাড়ির সিট এসইউভি-তে ছিল বলে, রুমাই গাড়ি চালাল। হাই স্কুলে থাকতেই সে গাড়ি চালানো শিখেছিল, কিন্তু তারপর বেশ কয়েক বছর শহরে থাকা সত্ত্বেও তার কাছে গাড়ি ছিল না। তাই এখনও পর্যন্ত তার কাছে গাড়ি চালানো মানে মা-বাবার কাছে যাওয়া, গাড়ি নিয়ে ভিডিও ফেরত দিতে যাওয়া বা মাকে নিয়ে মল-এ যাওয়া। সিয়্যাট্‌লে তাকে শিখতে হয়েছিল— গাড়িতে গ্যাস ভর্তি করা, চাকায় হাওয়া আছে কিনা নিশ্চিত হওয়া। যদিও সে এখানকার রাস্তা, পাহাড় বা আলো, এসবের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল, তবুও সে এর কোনওটার সঙ্গেই বা কারও সঙ্গেই কোনও যোগাযোগ বোধ করত না। পড়শিদের সঙ্গে সে শুধু দু'-একটা বাক্য বিনিময় করেছিল। বাড়ির একদিকে থাকেন এক অবসরপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রী, আর-একদিকে থাকেন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন সমকামী অধ্যাপক। আকাশের সাঁতার কাটা দেখতে দেখতে সে কয়েকজন মহিলার সঙ্গে কথা বলত বটে, কিন্তু ক্লাসের শেষে কখনও তাদের সঙ্গে সময় কাটাত না। জীবনের এই পর্যায়ে

AMARBOI.COM

অপরিচিত কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তার ভাল লাগত না।

ব্রুকলিনে যে বন্ধুদের সে ফেলে এসেছিল, তাদের সঙ্গতে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রি-ন্যাটাল যোগাসনের ক্লাসে এবং আকাশ জন্মানোর পর সে যে 'মামি গ্রুপ'-এ যোগ দিয়েছিল, সেখানে সেই মহিলাদের সঙ্গে তার আলাপ হয়। তারা তার দৈনন্দিন জীবনের সব খুঁটিনাটি জানত। তার প্রসবের যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর তারা তাকে সঙ্গ দিয়েছিল, নিজেদের ছেলেমেয়ের ছোট হয়ে যাওয়া জামাকাপড় এবং কম্বলও দিয়েছিল। সেই বন্ধুরা তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাঁচ বা দশ মিনিটের হাঁটা পথে থাকত, কেউ কেউ তারই বিল্ডিং-এ। যখন রুমা পার্ট-টাইম কাজ করত, তখন চাইলে এক মিনিটের মধ্যেই তাদের সঙ্গে দেখা করা যেত। প্রস্পেক্ট পার্ক দিয়ে তারা স্ট্রোলার ঠেলে নিয়ে যেত। শনি-রবিবার রুমার মা এলে তাঁর সঙ্গে সেই বন্ধুদের আলাপ হয়েছিল। কেউ কেউ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করতে পেনসিলভেনিয়া গিয়েছিল। এখানে আসার পর, প্রথমদিকে তারা রুমাকে ই-মেল পাঠাত অথবা রুমাহীন খেলার মাঠ থেকে সেলফোনে তাকে ফোন করত। কিন্তু সময়ের ব্যবধান এবং বাচ্চারা সবসময় পাশেই থাকত বলে, ভালভাবে কথা হত না। সেই মহিলাদের সঙ্গে রুমা যত সময়ই কাটিয়ে থাকুক না কেন, বন্ধুত্বের শিকড় গভীরে পৌঁছোয়নি। আজকাল, তাদের ই-মেল পড়ার পর, খুব কম ক্ষেত্রেই রুমা উত্তর দিত।

AMARBOI.COM

রাস্তায় চাকার আওয়াজ এবং অন্য গাড়িদের 'হুশ' করে বিপরীত দিকে চলে যাওয়ার আওয়াজ ছাড়া গাড়িটা চুপই ছিল। আকাশ তার একটা খেলনা-ট্রেন নিয়ে খেলছিল। দরজার ওপর আর রুমার সিটের পিছন দিয়ে ট্রেনটা চালাচ্ছিল। রুমা বুঝতে পারছিল যে, বাবা চুপচাপ তার গাড়ি চালানোর দিকে নজর রাখছেন। মাঝেমধ্যে স্পিডোমিটারের দিকে তাকাচ্ছেন, রাস্তার অন্যদিকে যেতে হলে তার সঙ্গে তাকিয়ে দেখছেন। রুমা এখন যে মুদিখানায় কেনাকাটা করে, সেটা দেখাল। মাউন্ট রেনিয়ার কোনদিকে পড়ে দেখিয়ে দিল। আজ পাহাড়টা দেখা যাচ্ছিল না।

"অ্যাডাম ওইদিক দিয়ে কাজে যায়," রুমা বলল।

"কত দূরে ওর অফিস?"

বাবার ইংরেজিতে একটা ব্যাকরণগত ভুল হয়ে গেল। অল্পবয়সে রুমা তাঁকে শুধরে দিয়ে ঠিক বাক্যটা বলে দিত। বিরক্ত হত। যেন বাবার ভুল তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের কোনও ত্রুটির প্রকাশ। "জানি না। মনে হয় এক পিঠে চল্লিশ মিনিট মতো লেগে যায়।"

"তার মানে তো অনেকক্ষণ গাড়ি চালাতে হয়। তোরা কাছাকাছি কোনও বাড়ি দেখিসনি কেন?"

"আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। আর আমরা এই বাড়িটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।" রুমা ভাবল, মন্তব্যটা বাবার হালকা মনে হবে কি না।

"আর তুই? নতুন জায়গায় কোনও কাজ খুঁজে পেয়েছিস?"

"পার্ট-টাইম লিটিগেশনের কাজ তো সহজে পাওয়া যায় না," রুমা বলল। "প্রি-স্কুল তো শুধু বেলা বারোটা পর্যন্তই চলে। অ্যাডাম আর আমি আকাশকে ডে-কেয়ারে দিতে চাই না।"

"এখানে প্র্যাকটিস করতে গেলে কি তোকে ওকালতির আর-একটা পরীক্ষা দিতে হবে?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"না। নিউ ইয়র্কের সঙ্গে পারস্পরিক বিনিময় প্রথা আছে।"

"তা হলে নতুন কোনও কাজ খুঁজছিস না কেন?"

"আমি এখনও প্রস্তুত নই, বাবা।" রুমা প্রিয়্যাট্‌লে কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। তার পুরনো অফিসের একজন পার্টনার তাকে কয়েকটি ট্রাস্ট এবং এস্টেট অ্যাটর্নির নাম দিয়েছিল। বলেছিল, রুমা হয়তো এক-একটা মামলার ব্রিফ লিখতে পারে। রুমা তাদের একজনকেও ফোন করেনি। রুমার মনে হল যে, সে বাবাকে সেরকমভাবে কখনও বলেনি যে, সে পরবর্তী কয়েক বছর বাড়িতেই থাকতে চায়। "আমরা এখনও সব গুছিয়ে উঠতে পারিনি।"

"বুঝতে পারছি। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছি যে, তুই কোনও নির্দিষ্ট সময়ের কথা ভেবেছিস কি না।"

"হয়তো নতুন বাচ্চাটা কিন্ডারগার্টেন শুরু করার পর।"

"কিন্তু সে তো পাঁচ বছরেরও বেশি দেরি। এটাই তো তোর কাজ করার, কেরিয়ার গড়ার সময়।"

"আমি কাজ করছি, বাবা। শিগগিরই আমাকে দুটো বাচ্চার দেখাশোনা করতে হবে। ঠিক যেমন মা করতেন।"

"তাতে কি তুই খুশি থাকবি?"

রুমা কোনও উত্তর দিল না। মা থাকলে তার সিদ্ধান্তটা বুঝতে পারতেন।

AMARBOI.COM

তাকে সমর্থন করতেন, গর্ববোধ করতেন। বছরের পর বছর রুমা সপ্তাহে পঞ্চাশ ঘণ্টা করে পরিশ্রম করেছে। রোমি যখন কোনওমতে দিন চালাচ্ছে, সে তখন ছ' সংখ্যার পারিশ্রমিক উপার্জন করেছে। তার সবসময়ই মনে হয়েছে যে, বাবা-মা তাকে ঠিকভাবে বিচার করেননি। বাবার কাছে সে বড় ছেলে এবং মায়ের কাছে অপ্রধান স্বামী।

"ওরা তো চিরকাল ছোট থাকবে না, রুমা," বাবা বলতে থাকলেন। "তখন তুমি কী করবে?"

"তখন আমি কাজে ফিরে যাব।"

"তখন তোমার বয়স চল্লিশের বেশি হয়ে যাবে। ব্যাপারটা অত সহজ নাও হতে পারে।"

রুমা রাস্তার দিকে চোখ রেখে একটা বোতাম টিপে রেডিয়ো চালিয়ে দিল। এক সাংবাদিকের গলার দৃঢ়, একঘেয়ে আওয়াজে গাড়িটা ভরে গেল। সে কখনও খোলাখুলি বাবার সঙ্গে তর্ক করতে পারেনি, যেভাবে সে মায়ের সঙ্গে লড়াই করত। কোনও কারণে, তার ভয় হয় যে, বাবার সঙ্গে তার ইতিমধ্যেই দুর্বল বন্ধন যে-কোনও মতান্তরে আরও ক্ষীণ হয়ে পড়বে। সে জানে যে, বাবা নিরাশ হয়েছিলেন। যে ক'টা আইভি লিগ-এ আবেদন পেশ করেছিল, সব ক'টি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। রোমির ভবঘুরে, অনিশ্চিত জীবন সত্ত্বেও রুমা জানত যে, প্রিন্সটন থেকে স্নাতক হওয়া এবং ফুলব্রাইট পেয়ে বিদেশে যাওয়ার জন্য বাবা রোমিকেই বেশি গুরুত্ব দেন। বাবার সঙ্গে রুমার কতবার তর্ক হয়েছে তা সে এক হাতে গুনতে পারে। হাই স্কুলে, রুমা লাইসেন্স পাওয়ার পর, যাতে সে বাড়ির গাড়িটা নিজে চালাতে পারে, সেজন্য বিমা করাতে বাবা আপত্তি করেছিলেন। কলেজে, 'মেজর' জানানোর সময় বাবা তাকে ইতিহাসের বদলে জীববিদ্যা নিতে রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলেন। ল স্কুলের খরচ শুনে প্রথমে তিনি বেঁকে বসেছিলেন, কিন্তু রুমা নর্থইস্টার্ন-এ ভরতি হওয়ার পর টাকাটা ঠিকই দিয়েছিলেন। রুমা এবং অ্যাডাম যখন তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছিল, তখনও তাঁর সঙ্গে মতান্তর হয়েছিল। মার্থাজ় ভিনিয়ার্ড-এর যে কূলে সে এবং অ্যাডাম অনুষ্ঠানটি করতে চাইছিল, তার বদলে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাঙ্কোয়েট হলে অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল বাইরে খোলা জায়গায় অনুষ্ঠান করা উচিত হবে না। অনুষ্ঠানের দিন অবশ্য আবহাওয়া নিখুঁত ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন বিয়ের শপথ আদান প্রদান হচ্ছিল, তখন মহাসাগর সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছিল। অথচ আজও রুমা দুঃস্বপ্ন দেখে যে, সেই সাদা তাঁবু এবং ফোল্ডিং চেয়ার এবং শ'য়ে-শ'য়ে অতিথি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে।

রুমা সুইমিং পুলের পার্কিং লট-এ গাড়িটা ঢোকাল। বিল্ডিং-এর ভিতর সে বাবাকে বলল বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে। সেখান থেকে একটা জানলা দিয়ে তারা ক্লাসটা দেখতে পাবে। ততক্ষণে সে লকার রুমে গিয়ে আকাশকে সাঁতারের কস্টিউম পরিয়ে দিল। বাবার কাছে এসে দেখল, তিনি ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, নতুন টেপ ভরছেন, সেটিং ঠিকঠাক করছেন। "ওই যে আকাশ," রুমা আকাশকে দেখাল। সে গায়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে বসে ক্লাস শুরু হওয়ার অপেক্ষা করছিল। রুমা ভেবেছিল আকাশের এখনও একলা পুলে নামার বয়স হয়নি। তাদের হয়তো আগের ক্লাসটায় যেতে হবে, যেখানে মা-বাবারাও বাচ্চাদের সঙ্গে জলে নামেন। কিন্তু সেই ক্লাসে কোনও জায়গা ফাঁকা ছিল না। এবং প্রথম থেকেই, আকাশ নির্দ্বিধায় তার কাছ থেকে লাফিয়ে প্রশিক্ষকের কোলে উঠে পড়েছিল। প্রশিক্ষক একজন লালচে-বাদামি চুলওয়ালা কিশোরী।

পরবর্তী তিরিশ মিনিট রুমার বাবা অবিরাম আকাশকে ক্যামেরাবদ্ধ করলেন। ভেসে থাকার জন্য আকাশের পিঠে একটি জিনিস বেঁধে দেওয়া হল, সে পুলে ঝাঁপ দিল, বুদবুদ তৈরি করল, পা ছোড়া অভ্যেস করল। যে বেঞ্চে রুমা বসে ছিল, বাবা সেখান থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ভিডিও ক্যামেরার লেন্স প্রায় জানলায় ঠেকে যাচ্ছিল। রুমা এবং রোমি বড় হওয়ার সময় তিনি তাদের এত মনোযোগ দেননি। সেইসময় মা বসে তাদের সাঁতার শেখা দেখতেন। যখন তারা মই বেয়ে উঠে তাঁর দিকে হাত নাড়ত, তারপর উঁচু ডাইভিং বোর্ডটা থেকে ঝাঁপ দিত, তখন তিনিই আতঙ্কে দম বন্ধ করে থাকতেন। বাবা রোমিকে বেসবল ছুড়তে শেখাননি। তাদের বাড়ির পিছনে, বনের মধ্যে দিয়ে অল্প হাঁটা দূরত্বে একটা পুকুর ছিল, যেটা প্রতি শীতে জমে যেত। বাবা তাদের সেই পুকুরের ওপর স্কেট করতে শেখাননি।

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বসে বাবা আবার রুমার কেরিয়ারের কথা তুললেন। "কাজ করাটা জরুরি, রুমা। শুধু টাকাপয়সার দিক দিয়ে থিতু হওয়ার জন্য নয়, মানসিক নিশ্চিন্তির জন্য। আমি সারাজীবন, ষোলো বছর বয়স থেকে কাজ করছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি তো রিটায়ার করেছ।"

"কিন্তু আমি তো খালি হাতে বসে থাকতে পারি না। সেইজন্যই তো এত ঘুরে বেড়াচ্ছি। এটা এক ধরনের বিলাসিতা, কিন্তু যত টাকা জমিয়েছি, তত টাকার তো আমার দরকার নেই।"

"রুমা, স্বাবলম্বী হওয়াটা জরুরি," তিনি বলতে থাকলেন। "জীবন অনিশ্চয়তায় ভরা, আজ তুমি অ্যাডামের ওপর, অ্যাডামের চাকরির ওপর নির্ভর করতে পারো। কাল কী হবে কে জানে?"

এক মুহূর্তের জন্য রুমা রাস্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে বাবার দিকে তাকাল। "মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?"

"কিছুই না। শুধু এই যে, আমার বোধহয় নার্ভাস লাগছে ভেবে যে, তুমি কোনও কাজ করছ না। বুঝতে পারছ তো, এটা নিজের জন্য বলছি না। আমার চিন্তা তোমাকে নিয়ে। আমার নিজের প্রয়োজনের বেশি টাকা আছে। যতদিন না মরে যাচ্ছি, চলে যাবে।"

"আর কে মারা গিয়েছে?" পিছনের সিট থেকে আকাশ বলে উঠল।

"কেউ না। আমরা এমনি এমনি কথা বলছিলাম। ওমা, কী সুন্দর ট্রেন তোমার। ওটা কি স্টেশন থেকে বেরিয়ে গিয়েছে নাকি?" বাবা আকাশের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন।

AMARBOI.COM

সে রাতে ডিনারের পর রুমার বাবা তাঁর তোলা ভিডিওগুলো দেখালেন। প্রথমেই সাঁতার ক্লাসের ফুটেজ দেখে আকাশ দারুণ খুশি হল। তারপর ইউরোপের ভিডিও— গির্জায় ফ্রেস্কো, উড়ন্ত পায়রার দল, মানুষের মাথার পিছনদিক। বেশিরভাগ ছবিই ট্যুর বাসের জানলা থেকে তোলা। একজন গাইড যে ভাস্কর্যের পাশ দিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলছিলেন। রুমার বাবা সবসময়ই সতর্ক ছিলেন যাতে মিসেস বাগচির ছবি না দেখা যায়, কিন্তু মেয়ের টিভিতে ভিডিওটা বড় করে দেখতে দেখতে তিনি বুঝলেন যে, সর্বত্র কোনও না কোনও চিহ্ন থেকে গিয়েছে— বাসের খোলা জানলায় মিসেস বাগচির হাত রাখা, একটা বেঞ্চের ওপর তাঁর নীল চামড়ার হাতব্যাগ রাখা।

"ওর নাম লুইগি," অল্প সময়ের জন্য ক্যামেরা তাঁদের ইতালিয়ান গাইডের ওপর নিবদ্ধ হলে রুমার বাবা বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এইসব ট্যুরে তোমার সঙ্গে কে যায়?" রুমা জিজ্ঞেস করল।

"বেশিরভাগ আমারই মতো লোকজন। রিটায়ার করেছে বা এমনি কোনও কাজ নেই," বাবা বললেন। "অনেক জাপানি যায়। প্রতিটি দেশে আলাদা আলাদা দল।"

"তোমার কোনও বন্ধু হয়েছে?"

"সকলেই বন্ধুর মতো মেলামেশা করে।"

"কতজন থাকে?"

"এই ধরো আঠারো-কুড়ি জন।"

"আর তোমাকে কি সারাক্ষণ এদের সঙ্গেই থাকতে হয়, নাকি নিজের জন্য কোনও সময় পাও?"

"এখানে-ওখানে ঘণ্টাখানেক পাওয়া যায়।"

"ওটা কে?" রুমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

রুমার বাবা আতঙ্কিত হয়ে টিভির পরদার দিকে তাকালেন। কয়েক সেকেন্ডের জন্য মিসেস বাগচির এলোমেলো ছবি দেখা গেল। একটা ক্যাফেতে একটা ছোট টেবিলে বসে আছেন। একটা ছোট্ট চামচ দিয়ে একটা ছোট্ট কাপে চিনি গুলছেন। তখন রুমার বাবার মনে পড়ল, তিনি তাঁর এক জাপানি সঙ্গী মিস্টার ইয়ামাতাকে লেন্সে চোখ রাখতে দিয়েছিলেন। মিস্টার ইয়ামাতা নিশ্চয়ই না বুঝে রেকর্ড বোতামটা টিপে দিয়েছিলেন। মিসেস বাগচি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁকে আর দেখা গেল না। রুমার বাবা কৃতজ্ঞ বোধ করলেন যে, ঘরটা অন্ধকার হয়ে আছে। মেয়ে তাঁর মুখ দেখতে পারছে না। "কার কথা বলছিস?"

"চলে গেল। একজন ভদ্রমহিলা। দেখে মনে হল ভারতীয়।"

এখনই রুমাকে জানানোর সুযোগ। কিন্তু তিনি যা ভেবেছিলেন, মেয়ের বাড়িতে থাকা, সারাদিন তার কাছাকাছি থাকা তার চেয়ে বেশি কষ্টকর। মেয়ের কাছে লুকোতে তাঁর ভীষণ খারাপ লাগল। কিন্তু তিনি কীই বা বলতে পারেন? যে তাঁর একজন নতুন বন্ধু হয়েছে? একজন গার্লফ্রেন্ড হয়েছে? কথাটা তাঁর কাছে অচেনা, বোঝানো অসম্ভব। জীবনে কখনও তাঁর কোনও গার্লফ্রেন্ড ছিল না। রোমিকে বলা বেশি সহজ হত। সে নিরুদ্বেগে খবরটা শুনত। এমনকী হয়তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। রুমার ব্যাপারটা আলাদা। সারাজীবন তাঁর মনে হয়েছে, রুমা তাঁর স্ত্রীর জন্য তাঁকেই দোষী সাব্যস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। তাঁর স্ত্রী এবং রুমা এক দলে। এবং তিনি মেয়ের অসন্তোষ সহ্য করেছেন, কখনও নিজের স্বপক্ষে কিছু তাকে বলেননি। কখনও বলেননি যে, তাঁর স্ত্রীর অত্যধিক চাহিদা ছিল। তিনি যে জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করতেন, স্ত্রী তার মর্যাদা দিতে চাননি।

তাঁর স্ত্রীর মতো, রুমাও এখন এই নতুন জায়গায় একা হয়ে গিয়েছে। বিহ্বল হয়ে পড়েছে। বন্ধুবান্ধব নেই। একটা ছোট বাচ্চার দেখাশোনা করছে। এ সবকিছু তাঁকে প্রবলভাবে তাঁর নিজের বিবাহিত জীবনের প্রথম বছরগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। যে বছরগুলোর জন্য তাঁর স্ত্রী কখনও তাঁকে ক্ষমা করেননি। তিনি সবসময়ই ভাবতেন যে, রুমার জীবনটা অন্যরকম হবে। তাঁর যতদূর মনে পড়ে, রুমা সবসময় কাজ করেছে। তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও হাই স্কুলেও রুমা জোর করে গ্রীষ্মে একটা স্থানীয় রেস্তোরাঁয় বাসগার্লের (বেয়ারার সহকারী) কাজ করত। ভারতে তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা রুমার মতো শিক্ষিত এবং ভদ্র ঘরের মেয়ের পক্ষে এ ধরনের কাজ করা অসম্মানজনক মনে করতেন। কিন্তু অবশেষে তিনি সেই বয়সে পৌঁছে গিয়েছেন যখন মেয়ে আর তাঁর দায়িত্ব নয়।

"এসব জায়গায় বেড়াতে গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ করেছি," রুমার বাবা বললেন। পরদায় সিয়েনার ঢালু, গোলাপি পিয়াৎজা দেখা গেল। ভিড়ের মধ্যে মিসেস বাগচিও কোথাও ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। "আজকাল সব জায়গায় ভারতীয়দের দেখা যায়।"

পরের দিন সকালে আকাশ দৌড়ে রুমার ঘরে গিয়ে, তার হাত ধরে টেনে তাকে ঘুম থেকে ওঠাল। "দাদু চলে গিয়েছে।"

"কী বলছিস তুই?"

"দাদু এখানে নেই।"

রুমা উঠে পড়ল। পৌনে আটটা বাজে। "হয়তো উনি হাঁটতে গিয়েছেন, আকাশ।" কিন্তু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রুমা দেখল যে, ভাড়া গাড়িটা ড্রাইভওয়েতে নেই।

"ফিরে আসবে তো?"

"এক মিনিট, আকাশ, ভাবতে দে।" রুমার বুকে কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছিল। মাঝে মাঝে, খেলার মাঠে, কয়েক সেকেন্ডের জন্য আকাশকে দেখতে না

AMARBOI.COM

পেলে তার যেমন লাগে, তেমন লাগছিল। রান্নাঘরে গিয়ে সে দেখল, বাবা জলখাবার খাননি। ডিশ-ড্রেনার-এ কোনও বাটি-চামচ নেই। স্টোভের পাশে প্লেটের ওপর কোনও শুকিয়ে যাওয়া টি-ব্যাগ নেই। রুমা ভাবল, বাবার কি শরীর খারাপ লাগছিল? অ্যাস্পিরিন বা আল্কা-সেল্টজ়ার কিনবেন বলে ওষুধের দোকান খুঁজতে গিয়েছেন? এরকমই বাবার স্বভাবসিদ্ধ আচরণ তাকে না উঠিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়া, একবার তিনি কাউকে কিছু না বলে রুট-ক্যানাল অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। সন্ধেবেলা যখন বাড়ি এসেছিলেন, তখন মুখ ফুলে ঢোল এবং মুখে তুলো গোঁজা। তারপর সে ভাবল, হয়তো তিনি হ্রদের ধারে ফেরিঘাটে নোঙর করা নৌকোগুলো আবিষ্কার করে একটাতে চড়েছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনও উপায় নেই। বাবার সেলফোন নেই। পুলিশেও খবর দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে ভাড়া গাড়িটার লাইসেন্স প্লেটের নম্বর জানে না। তবুও সে ফোনটা তুলল। ঠিক করল অ্যাডামকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবে কী করা যায়। কিন্তু ঠিক তখনই চাকার নীচে নুড়িপাথরের কড়মড় শব্দ পাওয়া গেল।

"কোথায় গিয়েছিলে বলো তো?" রুমা জানতে চাইল। তার বাবাকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে, তিনি কোনও সমস্যায় পড়েছেন। তাঁর হাতে একটা চ্যাপটা, সুতো বাঁধা কেকের দোকানের মতো বাক্স।

"হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, গতকাল সাঁতারে যেতে যেতে একটা নার্সারি দেখেছিলাম। ভাবলাম আজ গিয়ে দেখে আসি কতক্ষণ খোলা থাকে।"

"কিন্তু আমরা তো ঠিক করেই ফেলেছি আকাশকে কোন নার্সারি স্কুলে ভরতি করব।"

"নার্সারি স্কুল না। যেখানে গাছ বিক্রি হয়। তোর বাড়ির পিছনে তো ভালই রোদ আসে, আর মাটিটাও তো বেশ সরস মনে হচ্ছে," রুমার বাবা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। "বৃষ্টিবাদলা বাগানের জন্য ভাল। আমি কিছু গুল্ম লাগিয়ে দিতে পারি। তুই চাইলে ঘাসটাসও লাগাতে পারি।"

"ও," রুমা বলল।

"তোর বাড়ি থেকে মাত্র ছ'মাইল দূরে। তার পাশের দোকানটাতেই পেস্ট্রি বিক্রি হয়। এই যে," তিনি বাক্সটা খুলে আকাশকে দেখালেন। "কোনটা খাবে?"

"তোমাকে বাগানের পিছনে খাটতে হবে না, বাবা। তুমি তো বললে, তুমি বিশ্রাম নিতে চাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওতেই আমার বিশ্রাম হয়।"

পিছনের বাগানে ফুলগাছের কথা এখনও পর্যন্ত রুমার মাথায় আসেনি। অথচ বাবার কথাটা তার মনে ধরল। সে যেখানে থাকে, সেই জায়গার প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখে, সেই জায়গাটা আরও সুন্দর করে তোলার তাঁর ইচ্ছে দেখে সে খুব খুশি হল।

"তুমি আমাকে জানিয়ে যেতে পারতে যে বেরোচ্ছ," রুমা বলল।

"জানিয়েছিলাম তো," বাবা উত্তর দিলেন। "গাড়িটা নিয়ে একটু ঘুরে আসছি এই বলে নীচে দেরাজের ওপর একটা নোট রেখে গিয়েছিলাম।"

রুমা আকাশের দিকে ফিরল। আকাশ একটা ক্রসঁ ছিঁড়ে পাজামার ওপর খাবারের টুকরোগুলো ছড়াচ্ছিল। বাবার ঘর ভাল করে খুঁজে না দেখার জন্য রুমা আকাশকে দোষ দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু আকাশ তো দেরাজের মাথাটা দেখতে পাওয়ার পক্ষে বড্ড ছোট। নোট পড়তে পারারও বয়স হয়নি তার।

নার্সারি খোলার পর রুমার বাবা আবার বেরিয়ে গেলেন। এবার গাড়ির সিটটা সিডানে বদলে আকাশকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তাঁরা চলে যাওয়ার পর রুমা মনে হল যে, প্রথম সে আকাশকে শুধু বাবার ভরসায় ছেড়েছে। বাড়িতে একা থাকতে তার অদ্ভুত লাগছিল। চিন্তা হল, হয়তো আকাশ হঠাৎ তার কাছে আসতে চাইবে। আকাশের শৈশবে রুমার এরকম লাগত। তখন দু'ঘণ্টা অন্তর তাকে দুধ খাওয়াতে হত। কিছুক্ষণের জন্য আকাশকে ছেড়ে থাকতেও রুমার অস্বাভাবিক লাগত। এক ঘণ্টা পর তার বাবা এবং ছেলে ফিরল। সঙ্গে ব্যাগ ভরতি মাটি, ফুলগাছ, কোদাল, আঁকশি আর-একটা হোসপাইপ। বাবা জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডামের কিছু পুরনো জামাকাপড় আছে কি না। রুমা তাঁকে একজোড়া খাকি আর একটা ছেঁড়া অক্সফোর্ডের শার্ট দিল। অ্যাডাম সেগুলো স্যালভেশন আর্মিকে দেওয়ার জন্য সরিয়ে রেখেছিল। অ্যাডামের একজোড়া দৌড়োনোর জুতোও দিল। জামাগুলো বাবার গায়ে বড় হল। শার্টের কাঁধ ঝুলে পড়ছিল, প্যান্ট গুটিয়ে পরতে হল। বাকি দিনটা, বাবা মাটিতে একটা মৃদু, ঠকঠক শব্দ করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ঘাস কাটলেন। রোদ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য বেসবল টুপিটা পরেছিলেন। আকাশ তাঁর পাশে জমে ওঠা মাটির ঢিবির ওপর খেলা করল। রুমার বাবা অবিরাম কাজ করে গেলেন। শুধু মধ্যাহ্নে কিছুক্ষণের জন্য কাজ বন্ধ করে

AMARBOI.COM

আকাশের সঙ্গে একটা পি-নাট বাটার এবং জেলি স্যান্ডউইচ খেলেন। সন্ধেবেলা মশার উপদ্রব শুরু হওয়ার পরই ভিতরে এলেন।

পরের দিন সকালে তিনি আবার নার্সারি গেলেন আরও জিনিস কিনতে। এক গাঁট পিট শ্যাওলা, কয়েক ব্যাগ বোদমাটি এবং মিশ্র সার। এবার, বাগান করার সাজসরঞ্জাম ছাড়াও, তিনি ফোলানো যায় এমন একটা বাচ্চাদের পুল কিনে আনলেন সেটা দেখতে মাথা থেকে জল বার করা একটা কুমিরের মতো। তিনি সেটা উঠোনে রেখে হোসপাইপটা দিয়ে জল ভরে দিলেন। আকাশ সারাদিন বাইরে কাটাল। পুলের মধ্যে জল ছিটিয়ে ছড়িয়ে বাগানে জল ফেলল অথবা দাদুর খোঁড়া মাটি থেকে যে পোকাগুলো বেরিয়ে এসেছিল, সেগুলো খুঁজে বেড়াল। আবার বাবা সন্ধেবেলা পর্যন্ত টানা কাজ করলেন। আকাশ সারাদিন বাইরে থাকায়, রুমা বাড়ির কয়েকটা কাজ করার সময় পেল। ছোট-বড় কাজ, যা সে এতদিন তুলে রেখেছিল। মাসের শেষের বিল মিটিয়ে দিল, তার আর অ্যাডামের সংসারে যে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ আছে, সেগুলো ফাইলে গুছিয়ে রাখল। তারপর আকাশের জামাকাপড় গোছাতে শুরু করল। দেরাজ ভরতি ছোট হয়ে যাওয়া জামাকাপড়গুলো বের করল। বেসমেন্টে জমানো প্লাস্টিকের গামলা থেকে আরও বড় সাইজের জামাকাপড় আনল। ছেলে হয় না মেয়ে, সেই দেখে ছোট হয়ে যাওয়া জামাগুলো রেখে বা দান করে দিতে হবে। অ্যামনিও হতে এখনও চার সপ্তাহ বাকি আছে। তখনই তারা জানতে পারবে দ্বিতীয় সন্তান ছেলে না মেয়ে। খুব একটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল না যে, সে গর্ভবতী। এখনও সে বাচ্চার হাত-পা ছোড়া অনুভব করেনি। কিন্তু আগেরবারের মতো এবার আর নিজের মধ্যে আর-এক জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে তার কোনও সংশয় ছিল না।

সে তার গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের জামাকাপড় খুঁজে বের করল। বড় পটিযুক্ত প্যান্ট এবং টিউনিক যা তার শীঘ্রই প্রয়োজন হবে। জামাকাপড় গুছোনো হলে সে আকাশের ঘরের অসম্পূর্ণ বুককেসটার দিকে মন দিল। সেটা সে দশ বছরেরও বেশি আগে বস্টনে কিনেছিল, ওকালতির বই রাখার জন্য। তখন থেকে ভেবে যাচ্ছে সেটা রং করবে, কিন্তু এখনও হয়ে ওঠেনি। রুমা সব খেলনা আর বই সরিয়ে এক কোণে জড়ো করল। বাবাকে বলবে বুককেসটা বাইরে বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে, যাতে উঠোনেই সেটা রং করতে পারে। একসময় আকাশ ঘরে এসে তাকে চমকে দিল। আকাশের

AMARBOI.COM

খালি পা, সোনালি পা দুটো ধুলোয় ঢাকা। রুমা ভাবল আকাশের জিনিসে হাত দিয়েছে বলে সে রাগ করবে কিনা, কিন্তু আকাশ এমনভাবে স্তূপাকৃত জিনিসগুলো দেখল, যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কোনও ব্যাপার। তারপর সেখান থেকে কয়েকটা জিনিস তুলতে শুরু করল।

"কী করছিস তুই?" রুমা জিজ্ঞেস করল।

"গাছ লাগাচ্ছি।"

"তাই? কী গাছ লাগাচ্ছিস?"

"এই সবকিছু," দু'হাত ভরতি জিনিস নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আকাশ বলল। রুমা তার পিছন পিছন বাইরে এসে দেখল, বাবা আকাশের জন্য একটা ছোট্ট বাগান তৈরি করেছেন। বাগানটা খোলা খবরের কাগজের চেয়ে বেশি বড় নয়। মাঝে মাঝে অগভীর গর্ত খোঁড়া। রুমা দেখল, আকাশ ঠিক দাদুর মতোই ঝুঁকে বসে মাটিতে জিনিসপত্র পুঁতে দিল। একটা গোলাপি রাবার বল, কয়েক টুকরো লেগো একসঙ্গে আটকানো, তারা খোদাই করা একটা কাঠের ব্লক, সব মাটিতে সমাধিস্থ হল।

"বেশি গভীরে নয়," রুমার বাবা বললেন। "এক আঙুলের বেশি না। এখনও ছুঁতে পারছ তো?"

আকাশ ঘাড় নাড়ল। একটা ছোট প্লাস্টিকের ডাইনোসর তুলে নিয়ে মাটিতে ঠুসে দিল।

AMARBOI.COM

"কী রং ওটার?" রুমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"রেড।"

"আর বাংলায়?"

"লাল।"

"বাহ।"

"আর নীল!" আকাশ আকাশের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

বাবা চান করতে গেলে রুমা চা করল। এই রীতিটা তার ভাল লাগে। সূর্য তখনও অস্তাচলে না গেলেও, দিন শেষ হয়ে যে সন্ধে নেমেছে, এটা তারই যেন আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি। একা থাকলে এই সময়গুলো যেমন তেমন করে কেটে যায়। বাবার সঙ্গে বারান্দায় বসার সুযোগ পেয়ে তার খুব ভাল লাগছিল। সামনে টি-পট, এক বাটি নুন মাখানো কাজুবাদাম আর এক প্লেট

নাইস বিস্কুট। হ্রদের দিকে তাকিয়ে, গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নিরন্তর মৃদু হাওয়ার শব্দ তাঁদের কানে আসছিল। আকাশ যখন কোলের শিশু, তখন ঘুমন্ত অবস্থায় পরিপূর্ণ শান্তিতে সে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলত, হাওয়ার শব্দটা তারই যেন বিশাল সংস্করণ। গাছের পাতাগুলো যেন কোনও অভ্যন্তরীণ আলোয় মিটমিট করে জ্বলছিল, ঠান্ডা না থাকলেও, ঝিরঝির করে কাঁপছিল। সারাদিন খোলা হাওয়ায় খেলাধুলো করে ক্লান্ত হয়ে আকাশ ঘুমিয়ে পড়ায়, বাড়িটা নৈঃশব্দে ভরে গিয়েছিল।

"এখানে থাকলে আমি গরমকালে এই বারান্দায় ঘুমোতাম," রুমার বাবা বললেন। "একটা ছোট চৌকি বের করে নিতাম।"

"এখনই তুমি চাইলেই পারো।"

"কী?"

"এখানে ঘুমোতে, আমাদের একটা এয়ার ম্যাট্রেস আছে।"

"আমি তো এমনি বলছি। আমি যেখানে আছি, ভালই আছি।

"তা হলেও," তিনি বলতে থাকলেন, "যদি পারতাম, তা হলে নিজের জন্য এইরকম একটা বারান্দা গড়তাম।"

"গড়তেই তো পারো।"

"কন্ডোয় হবে না। পুরনো বাড়িটায় হলে ভাল লাগত।"

বাবার মুখে পুরনো বাড়ির কথা শুনে রুমার চোখে জল এসে গেল। একদিক দিয়ে, মা কখনও দেখেননি, এমন এক জায়গায় থাকতে সুবিধেই হয়। এটাই মায়ের সঙ্গে তার শেষ কয়েকটি কথোপকথনের বিষয় ছিল। হাসপাতালে যাওয়ার পথে সে মাকে অ্যাডামের নতুন চাকরির কথা বলেছিল। তখন অবশ্য চাকরিটা একটা সুদূর সম্ভাবনা ছাড়া কিছুই নয়। "যাস না," সামনের সিট থেকে মা বলেছিলেন। "বড্ড দূরে। আমি আর কখনও তোকে দেখতেই পাব না।" এই কথা বলার ছ'ঘণ্টা পর, মা আর বেঁচে ছিলেন না। রুমার হঠাৎ ইচ্ছে হল বাবাকে জিজ্ঞেস করে, যা সে বহুবার জিজ্ঞেস করতে চেয়েছে, যে তিনি তাঁর স্ত্রীর অভাব বোধ করেন কিনা। কখনও তাঁর মৃত্যুর জন্য কেঁদেছেন কিনা। কিন্তু সে কখনও-ই জিজ্ঞেস করেনি। এবং তার বাবাও কোনওদিন স্বীকার করেননি, তিনি এমন অনুভব করেছেন কিনা।

"বারান্দা তৈরি করলে কোথায় করতে?"

AMARBOI.COM

রুমার বাবা একটু ভাবলেন। "ডাইনিং রুমটার বাইরে হলে ভাল হত না। বাড়ির ওই দিকটাই তো সবচেয়ে ঠান্ডা ছিল।"

রুমা কল্পনা করার চেষ্টা করল, মা-বাবার বাড়িটা এভাবে বদলে গিয়েছে। কল্পনা করল, ডাইনিং রুমের একটা দেওয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে, সে মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে, ছুতোর-মিস্ত্রিদের হাতুড়ি পেটানোর আর তুরপুনের আওয়াজের জন্য মা অভিযোগ করছেন। তারপর সে দেখল, মা-বাবা ছায়ায় বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন, যেমন এই মুহূর্তে বাবা এবং সে খাচ্ছে। কারণ, সেই বাড়িটার কথা মনে পড়লেই, মাকে সে জীবিত দেখতে পায়। তাঁকে না দেখা সম্ভব নয়। আকাশের জন্মের পর, তার আকস্মিক, নিখুঁত উপস্থিতিতে, জীবনে প্রথমবার রুমা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। আকাশ এখনও মাঝে মাঝে তাকে অভিভূত করে দেয়— সে যে নিশ্বাস নিচ্ছে, তার সব দেহযন্ত্র যে যথাযথ জায়গায় আছে, তার ছোট্ট, বলিষ্ঠ হাত-পা দিয়ে যে রক্ত নীরবে, কার্যকরভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, এই সহজ কথাটাই রুমার অসাধারণ মনে হয়। আকাশ তারই রক্ত-মাংস। যেদিন আকাশ জন্মেছিল, সেদিন হাসপাতালে রুমাকে মা তাই বলেছিলেন। শুধু তাঁর কথাগুলো আরও আক্ষরিক ছিল, পুরো কথাটাকে গভীর অর্থে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। "ও তোর হাড়-মাস থেকে তৈরি।" এই জন্যই রুমা দৈনন্দিন জীবনে অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু মৃত্যুও মানুষকে অভিভূত করে দিতে পারে, এখন রুমা তা জানে— একজন মানুষ বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে, ভাবতে পারে, নিশ্বাস নিতে পারে, খাবার খেতে পারে, অসংখ্য দুশ্চিন্তা, অনুভূতি এবং ভাবনায় তার মন ভরে থাকতে পারে, পৃথিবীতে নিজস্ব জায়গা দখল করে থাকতে পারে, আর তারপর মুহূর্তের মধ্যেই সে অবর্তমান, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

"সরি তোমার নতুন অ্যাপার্টমেন্টটা আমাদের দেখা হয়নি," রুমা বাবাকে বলল। "সামনে অ্যাডামের কোনও ছুটি নেই। কিন্তু বাচ্চাটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা আসব।"

"দেখার কিছু নেই। শুধু একটা টিভি, একটা সোফা আর আমার জিনিসপত্র। তোদের সকলের থাকার জায়গাই নেই। এখানকার মতো নয়।"

"যাই হোক, আমি দেখতে চাই," রুমা বলল। "আমরা কোনও হোটেলে থাকতে পারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কোনও দরকার নেই, রুমা। কোনও দরকার নেই, স্রেফ একটা অ্যাপার্টমেন্ট দেখার জন্য অতদূরে যাওয়ার," বাবা বললেন। "তুমি এখন মা হয়েছ," তিনি যোগ করলেন। "তোমার ছেলেমেয়েদের টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু তুমি আর মা তো তাই করতে। অতবার করে আমাদের ভারতে নিয়ে যেতে।"

"আমাদের কোনও উপায় ছিল না। আমাদের মা-বাবারা এখানে আসতে রাজি হতেন না। কিন্তু আমি আবার এখানে আসব তোদের সঙ্গে দেখা করতে," তিনি প্রসন্নমুখে দূরের দিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন। "এই জায়গাটা আমার ভাল লেগেছে।"

"বাবা পিছনের বাগানে ফুলগাছ পুঁতছেন," সে রাতে রুমা অ্যাডামকে ফোনে বলল।

"গাছগুলোর যত্ন নেওয়ার জন্য কি উনি থাকবেন?" অ্যাডামের ফাজলামিতে রুমা বিরক্ত হল। বাবার প্রতি সে রক্ষণাত্মক বোধ করল। সে বলল, "জানি না।"

"এটা বেস্পতিবার, রুমা। আর কতদিন নিজেকে এভাবে কষ্ট দেবে?"

রুমার এখন আর কোনও কষ্ট হচ্ছিল না। সে ভেবেছিল অ্যাডামকে তা বলবে, কিন্তু এখন সে মত পালটে বলল, "আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে চাই। নিশ্চিত হতে চাই যে সকলে ভালভাবে একসঙ্গে থাকতে পারবে।"

"হে ভগবান," অ্যাডাম বলল, "রুমা উনি তোমার বাবা। তুমি তো ওঁকে সারাজীবন ধরে চেনো।"

অথচ, এতদিন পর্যন্ত রুমা বাবার সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যাপার জানত না। সে জানত না তিনি এতটা স্বাবলম্বী, তাকে কতটা সাহায্য করতে পারেন। এতটাই যে, তিনি আসার পর থেকে রুমাকে একটা ডিশও ধুতে হয়নি। খাওয়ার ব্যাপারেও তাঁর কোনও বাছবিচার নেই। ভারতীয় খাবার ফুরিয়ে যাওয়ার পর রুমা যে সেঁকা মাছ এবং মুরগির ব্রেস্ট রাঁধতে শুরু করেছিল, তিনি খুশি হয়েই তা খান। লাঞ্চে দরকার হলে এক টিন সুপ খেয়েই কাটিয়ে দেন। কিন্তু আকাশের সংসর্গে তার বাবার চরিত্রের অন্য এক দিকের পরিচয় পেয়ে রুমা সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল। সন্ধেবেলা, রুমা যখন আকাশকে চান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করায়, তার হাঁটু এবং কনুইয়ে চেপে বসা ধুলো ময়লা ঘষে ওঠায়, তখন বাবা তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি আকাশকে পাজামা পরতে, দাঁত মাজতে এবং তার নরম, ভিজে চুল আঁচড়াতে সাহায্য করেন। একদিন দুপুরে যখন আকাশ লিভিং রুমের কার্পেটের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন বাবা তার মাথার তলায় বালিশ গুঁজে দিয়েছিলেন। গায়ে একটা সুতির কম্বল জড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন আকাশের আবদারে, রুমার বাবাই রাতে তাকে গল্প পড়ে শোনান। সে রাতে নীচে, দাদুর ঘরেই ঘুমোয়।

প্রথম যে রাতে আকাশ তার বাবার কাছে ঘুমিয়েছিল, রুমা নীচে গিয়েছিল আকাশ ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা দেখতে। বাবার ঘরের দরজার নীচে একফালি আলো দেখা যাচ্ছিল এবং তাঁর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। তিনি 'গ্রিন এগ্‌স অ্যান্ড হ্যাম' থেকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। রুমা মনশ্চক্ষে দেখতে পেল, তার বাবা এবং ছেলে দু'জনেই গায়ে চাপা দিয়ে, বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন। বইটা তাঁদের মাঝখানে রাখা। বাবা পড়ছেন এবং আকাশ পাতা উলটে দিচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছিল যে, তার যেমন বইটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, সে তুলনায় তার বাবা বইটা জীবনে প্রথমবার পড়ছেন। দ্বিধাগ্রস্তভাবে পড়ছিলেন। বাক্যের মাঝখানে থেমে থেমে যাচ্ছিলেন। পড়ার সময় তাঁর গলা অদ্ভুতভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। সাধারণত কথা বলার সময় তেমন হয় না। তবুও, তাঁর চেষ্টা রুমাকে স্পর্শ করল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রুমা উপলব্ধি করল যে, জীবনে প্রথমবার তার বাবা কাউকে ভালবেসে ফেলেছেন। সে দরজায় টোকা মেরে বাবাকে বলতে যাচ্ছিল যে, আকাশের ঘুমোনোর সময় পার হয়ে গিয়েছে, আলোটা নিভিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু কিছু না বলে সে ওপরে ফিরে গেল। অল্প সময়ের জন্য সে নিজের ছেলের প্রতিই ঈর্ষা অনুভব করল।

বাগানটা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছিল। তিনি ভালই জানতেন, এটা নিষ্ফল প্রয়াস। তাঁর মেয়ে বা জামাই বাগানটার সঠিক যত্ন নিচ্ছে, কী কী করতে হবে তার দিকে নজর রাখছে ভাবতে তাঁর অসুবিধে হল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিশ্চয়ই জায়গাটা আগাছায় ভরে যাবে, পাতাগুলো পোকায় খেয়ে নেবে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, তারা বাগানটা দেখাশোনা করার জন্য কোনও লোক রাখবে। তাঁর ইচ্ছে ছিল কয়েকটি সবজির গাছ লাগানোর, কিন্তু

AMARBOI.COM

ফুলগাছের চেয়ে সেগুলোর পেছনে বেশি খাটতে হয়। বাগানটা খুব বেশি বড় নয়। গাছের তলায় কয়েকটা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা মার্টল (বিলিতি মেহেদি) ও ফক্স, দুটো আজেলিয়ার ঝোপ, একসারি হোস্টা, বারান্দার একটা খুঁটি বেয়ে বেড়ে ওঠার জন্য একটা ক্লেমাটিস এবং তাঁর স্ত্রীর সম্মানে একটা ছোট হাইড্রেঞ্জা। রান্নাঘরের পিছনের ছোট জায়গাটায় লোভ সামলাতে না পেরে তিনি কয়েকটা টম্যাটো, গাঁদাফুলের গাছ আর দোপাটি লাগিয়েছেন। এক্ষুনি লাগালে হেমন্তের মধ্যে ফুল আসতে পারে। তিনি ডেলফিনিয়ামগুলো উঠিয়ে মাঝখানে, জায়গা রেখে লাগালেন, বৃন্তের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। মাটিতে কয়েকটা গ্ল্যাডিওলাসের কন্দ পুঁতে দিলেন। তিনি বাইরে কাজ করার আনন্দের অভাব বোধ করেন। হাঁটুর তলায় শক্ত মাটি যা তাঁর নখের ভিতর ঢুকে যায়, গা ঘষে চান করলেও ত্বকে তার গন্ধ থেকে যায়। পুরনো বাড়িটার এই একটা জিনিসেরই অভাব বোধ করেন তিনি। এবং বাগানের কথা ভাবলেই ভীষণভাবে স্ত্রীর কথা তার মনে পড়ে। এই জিনিসটা তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছেন। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর বছরের পর বছর, শুধু তাঁরা দু'জনই ছিলেন, কিন্তু কীভাবে যেন তাঁর স্ত্রী সব তরকারি ব্যবহার করে ফেলতেন। এমন সব রান্না করতেন সেগুলো দিয়ে, যা কুমার বাবা রাঁধতে পারতেন না। তা ছাড়াও, তাঁর স্ত্রী যখন বেঁচে ছিলেন, তখন তাঁরা নিয়মিত অতিথি আপ্যায়ন করতেন। আলুগুলো নিজেদের বাগানের শুনে তাঁরা চমৎকৃত হয়ে যেতেন। সন্ধের শেষে ব্যাগ ভরতি করে নিয়ে যেতেন।

তিনি আকাশের ছোট্ট বাগানটার দিকে তাকালেন। মাটিতে পোঁতা খেলনা, পেন, পেনসিলের ওপর সাবধানে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পেনিও ছিল। যতগুলো বাড়তি পেনি তাঁর পকেটে ছিল, সব।

"গাছ কবে বেরিয়ে আসবে?" সুইমিং পুল থেকে আকাশ প্রশ্ন করল। সে একটা ছোট্ট নৌকোর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল।

"শিগগিরই।"

"কাল?"

"অত তাড়াতাড়ি না। এসব ব্যাপারে সময় লাগে, আকাশ। তোমাকে আজ সকালে কী শিখিয়েছি মনে আছে?"

আকাশ এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বাংলায় বলল।

AMARBOI.COM

সেই রাতে আকাশ তাঁর পাশে ঘুমিয়ে পড়ার পর, রুমার বাবা মিসেস বাগচির উদ্দেশে একটা পিকচার পোস্টকার্ড লিখলেন। তিনি ঠিক করেছিলেন যে, রুমার কম্পিউটার থেকে ই-মেল করার চেয়ে এটাই বেশি নিরাপদ। কিন্তু যোগাযোগের ওই মাধ্যমটার ওপর তিনি পুরোপুরি ভরসা করে উঠতে পারেন না। আকাশের সুইমিং পুলটা যে হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে কিনেছিলেন, পোস্টকার্ডটাও সেই দোকানের থেকেই কেনা। এলিয়ট বে-র ফেরির ছবি, দৃশ্যটা যদিও তিনি দেখেননি। ইউরোপে থাকলে তিনি সবসময় এমন জায়গারই পোস্টকার্ড কেনেন, যেখানে তিনি গিয়েছেন। নয়তো তাঁর নিজেকে অসৎ মনে হয়। কিন্তু এখানে এই পোস্টকার্ডটা ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। তিনি বাংলায় লিখলেন। রুমা বাংলা পড়তে পারে না। "রুমার জন্য একটা বাগান করছি," তিনি শুরু করলেন। "আকাশ বড় হয়ে গিয়েছে, সাঁতার শিখছে। আবহাওয়া চমৎকার। এখানে গরমকালে বৃষ্টি হয় না। প্রাগের অপেক্ষায় আছি," তিনি শেষে নিজের নাম লিখলেন না। ওয়ালেটের ভিতর একফালি কাগজে তিনি মিসেস বাগচিকে চিঠি পাঠানোর ঠিকানা লিখে রেখেছিলেন। তাঁর কাছে মাত্র কয়েকটিই ঠিকানা থাকে— ছেলেমেয়ের এবং এখন মিসেস বাগচির। সব ক'টিই কাগজের ফালিতে লিখে তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং সোশাল সিকিউরিটি কার্ডের পিছনে থাকে। তিনি ঠিকানাটা ইংরেজিতে লিখলেন। তারপর ওপরে মিসেস বাগচির নাম লিখে দিলেন।

ভাবলেন, কাছাকাছি কোথায় পোস্ট অফিস আছে? রুমার কাছে স্ট্যাম্প চাইলে কি তার অদ্ভুত লাগবে? কিন্তু পোস্টকার্ডটা পেনসিলভেনিয়া নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ডাকে ফেলাটা বোকামি হয়ে যাবে। তার চেয়ে রুমাকে বলবেন যে, তাঁর একটা বিল ডাকে পাঠানো দরকার। দু'মাইল দূরে রাস্তার ওপর একটা পাবলিক ডাকবাক্স আছে। এখান থেকে যাওয়ার আগে কখনও একবার তিনি পোস্টকার্ডটা সেখানে ফেলে দিতে পারবেন। কিন্তু এখন সেটা কোথায় রাখবেন সেটাই ভেবে পাচ্ছিলেন না। ঘরটায় লুকিয়ে রাখার মতো কোনও জায়গা নেই। সব আসবাবের উপরিভাগ পরিষ্কার। সব কোণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাঁর কয়েকটি শার্ট ছাড়া দেওয়াল-আলমারিতে কিছুই নেই। দিনে একবার রুমা ঘরে আসে— তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না ঠিক কখন আসে— বিছানা ঠিক করতে, কাচার জামাকাপড় নিয়ে যেতে আর দাঁত

AMARBOI.COM

মাওতে আর দাড়ি কামাতে গিয়ে সিঙ্কের পাশে তিনি যে জল ছড়ান, তা পরিষ্কার করতে। তিনি ভাবলেন পোস্টকার্ডটা সুটকেসের একটা খাপে ঢুকিয়ে রাখবেন, কিন্তু এতই ক্লান্ত লাগছিল যে, খাট থেকে আর নামতে ইচ্ছে করল না। তার বদলে তিনি কার্ডটা পাশের টেবিলের ওপর সিয়্যাট্‌লের গাইড বইটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর, বাড়তি সাবধানতা হিসেবে বইটা টেবিলের টানায় রেখে দিলেন।

তারপর ঘুমন্ত নাতির দিকে ফিরলেন। তার লম্বা চোখের পলক এবং গোল গাল দুটো দেখে তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের কচি বয়স মনে পড়ে গেল। হঠাৎ মনে হল যে, আকাশ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তিনি হয়তো তখন বেঁচে থাকবেন না। নাতির মধ্যবয়স, বার্ধক্য, দেখতে পারবেন না। জীবনের এই সহজ সত্য তাঁকে দুঃখিত করল। কল্পনা করলেন, কয়েক বছর পর, আকাশ এই ঘরেরই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। যেমন রোমি এবং রুমা করত। এটাই তো জগতের নিয়ম। অথচ তিনি জানতেন যে, আমেরিকায় থাকতে এসে তিনিও তাঁর মা-বাবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সাফল্যের নামে, যা এখন মূল্যহীন, তিনি মা-বাবাকে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি আলতো করে আকাশের মাথার পাশে চুমু খেলেন। তার কোঁকড়ানো সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলেন। ঘরটা অন্ধকারে ভরে গেল।

AMARBOI.COM

শনিবার সকালে, যেদিন রুমার বাবার চলে যাওয়ার কথা, তার আগের দিন বাগানের কাজ শেষ হল। প্রাতরাশের পর তিনি রুমাকে বাগানটা দেখালেন। ঝোপগুলো তখনও ছোট, শিকড়ের কাছে বোদমাটি লেগে আছে। এবং পরস্পর থেকে আলাদা করার জন্য মাঝখানে যথেষ্ট জায়গাও আছে। কিন্তু সেগুলো আরও লম্বা হবে, বাড়তে বাড়তে আরও কাছাকাছি এসে যাবে, তিনি বললেন। হাত দিয়ে দেখালেন, পরের গ্রীষ্ম পর্যন্ত আন্দাজ কতটা লম্বা হতে পারে। রুমাকে বলে দিলেন কতবার জল দিতে হবে, কতক্ষণ ধরে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তিনি যে কৃত্রিম সারের বোতলটা কিনেছিলেন, সেটা দেখিয়ে বললেন, জল দেওয়ার সঙ্গে সারটা কখন দিতে হবে। আকাশ তার পুলে নামা-ওঠা করছিল। রুমা বাবার কথা ধৈর্য ধরে শুনল, কিন্তু খুবই অল্প বুঝতে পারল।

"এই পোকাগুলোর দিকে নজর রাখিস," একটা পাতা থেকে একটা পোকা তুলে টুসকি মেরে ফেলে দিয়ে বললেন, "হাইড্রেঞ্জাটায় এ বছর খুব বেশি ফুল হবে না। তোর মাটির অম্লতার ওপর নির্ভর করে ফুলগুলো গোলাপি বা নীল হবে। পরে তোকে ছেঁটে দিতে হবে।"

রুমা ঘাড় নাড়ল।

"ওগুলো তোর মায়ের খুব প্রিয় ছিল," বাবা বললেন। "মানে এই দেশে আর কী।"

রুমা গাছটার দিকে, খাঁজকাটা গাঢ় সবুজ রঙের পাতাগুলোর দিকে তাকাল। সে এ কথাটা জানত না।

"দেখিস যেন টম্যাটোগুলো মাটির কাছে না এসে যায়," বাবা ঝুঁকে একটা গাছ ঠিক করে দিলেন। "এই খুঁটিটা থেকে যথেষ্ট সাপোর্ট পাবে মনে হয়, তাও দরকার হলে এক টুকরো সুতো দিয়ে বেঁধে দিতে পারিস। দেখিস যেন শুকিয়ে না যায়। বেশ রোদ হলে দিনে দু'বার দেখিস। পেকে যাওয়ার আগেই যদি হিম পড়তে শুরু করে, তা হলে তুলে খবরের কাগজে মুড়ে রাখিস। আর হেমন্তে ডেলফিনিয়ামের বোঁটাগুলো কেটে দিস।"

"তুমি নিজেই তো এসব করতে পারো," রুমা প্রস্তাব দিল।

তার বাবা অপ্রতিভভাবে, হাত দিয়ে একটা উরু চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বেসবল টুপিটা খুলে হাত দিয়ে কপাল মুছলেন। "আমার একটা ট্রিপ ঠিক করা আছে। টিকিট কেটে ফেলেছি।"

"বাবা, আমি বলতে চাইছি ট্রিপ থেকে ফেরার পর।"

বাবা মাটি লাগা নখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু এবার তিনি মুখ তুলে চারদিকে দেখলেন। বাগানের দিকে, গাছগুলোর দিকে।

"এই জায়গাটা ভাল, রুমা। কিন্তু এটা তোমার বাড়ি, আমার নয়।"

রুমা জানত তিনি থাকতে চাইবেন না, তাই সে বলতে থাকল। "তুমি পুরো নীচের তলাটা নিয়ে থাকতে পারো। যখন খুশি যেখানে খুশি ঘুরে আসতে পারো। আমরা বাধা দেব না। কী বলিস, আকাশ," রুমা ডাক দিল। "দাদু আমাদের সঙ্গে এখানে থাকলে কীরকম হয়? তোর কেমন লাগবে তা হলে?"

আকাশ পুলের মধ্যে লাফাতে শুরু করল। একটা প্লাস্টিকের ডলফিন থেকে জল ছিটোতে ছিটোতে ওপর-নীচে ঘাড় নাড়তে থাকল।

AMARBOI.COM

"জানি এটা একটা বড় চেঞ্জ," রুমা বলল। "কিন্তু তোমার পক্ষে ভালই হবে। আমাদের সকলেরই ভাল হবে।" এতক্ষণে সে কাঁদতে শুরু করেছিল। বাবা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসলেন না। নীরবে মুহূর্তটা কেটে যাওয়ার অপেক্ষা করলেন।

"আমি তোমাদের বোঝা হতে চাই না," কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন।

"তুমি বোঝা হবে না। আমার খুব সাহায্য হবে। তোমাকে এখনই কিছু ঠিক করতে বলছি না। কিন্তু কথা দাও তুমি ভেবে দেখবে।"

বাবা মাথা তুলে তার দিকে তাকালেন। ক্ষণিকের দুঃখিত দৃষ্টিতে মনে হল যেন অবশেষে রুমাকে বুঝতে পারলেন। তারপর ঘাড় নাড়লেন।

"এখানে তোমার শেষ দিনে বিশেষ কিছু কি করতে চাও?" রুমা জিজ্ঞেস করল। "আমরা লাঞ্চ খেতে সিয়্যাট্‌লে যেতে পারি।"

মনে হল, এটা শুনে তার বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "সেই নৌকো চড়ার কী হল? সেটা কি এখনও করা সম্ভব?"

রুমা ভিতরে গেল। বলল, আকাশকে তৈরি করে শিডিউলটা দেখে আসবে। রুমার বাবা হঠাৎ এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বাকি চব্বিশ ঘণ্টা অসহ্য মনে হচ্ছিল। নিজেকে মনে করিয়ে দিলেন যে, কাল তিনি পেনসিলভেনিয়া যাওয়ার প্লেনে বসে থাকবেন। তার দু'সপ্তাহ পর তিনি মিসেস বাগচির সঙ্গে প্রাগে যাবেন। রাতে তাঁর পাশে শুয়ে ঘুমোবেন। তিনি জানতেন যে, মেয়ে যে তাঁকে এখানে থেকে যেতে বলছে, তা তাঁর কথা ভেবে নয়, নিজের কথা ভেবে। রুমার তাঁকে দরকার। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো জোগান দেওয়া ছাড়া, আগে কোনওদিন রুমার তাঁকে এমনভাবে দরকার হয়নি। এবং সেই কারণেই রুমার প্রস্তাব তাঁকে আরও বিচলিত করে তুলেছিল। তাঁর একটি অংশ, যে অংশটি চিরকাল বাবা হয়েই থাকবে, সম্মতি দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ অনুভব করছিল। কিন্তু তিনি থাকতে চান না। যত ভালভাবেই এই দিনগুলো কাটুক না কেন, এখানে এক সপ্তাহ থেকে তিনি এ ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তিনি আর একটি পরিবারের অংশ হতে চান না। আবার সেই জটিলতা, সেই দ্বন্দ্ব, সেই চাহিদা, সেই উদ্যমের অংশ হতে চান না। তিনি মেয়ের জীবনের এক প্রান্তে, তার বিবাহিত জীবনের ছায়ায় বাঁচতে চান না। আবার একটি বিশাল বড়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে থাকতে চান না, যেটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, বাচ্চাদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু জিনিসপত্রে ভরে উঠবে। যার থেকে তিনি সম্প্রতি অব্যাহতি পেয়েছেন। সেইসব বই, কাগজপত্র, জামাকাপড় এবং অন্যান্য জিনিস যা অধিগত করতে, সঞ্চয় করতে মানুষ বাধ্য হয়। জীবনটা একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বাড়তেই থাকে। তিনি এখন সেই সময়সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন।

শুধু নাতির সঙ্গে থাকার জন্য লোভ হয়। কিন্তু তিনি জানেন যে, ছেলেটা তাঁকে ভুলে যাবে। রুমাকেই তিনি নতুন করে মনে করিয়ে দেবেন যে, তাঁর স্ত্রীর অবর্তমানে তিনি বেঁচে থাকা সত্ত্বেও, রুমার দেখাশোনা করার আর কেউ নেই। এখন যখন তিনি রুমাকে আকাশের পিছনে ছোটাছুটি করতে, মেঝে থেকে তার প্রস্রাব মুছতে, তার সব প্রয়োজন মেটাতে দেখেন তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, তাঁর স্ত্রী কত অল্প বয়সে, বলতে গেলে প্রায় কৈশোরে এইসব কাজ করেছেন। এখন রুমার যা বয়স, তাঁর স্ত্রী যখন সেই বয়সে পৌঁছেছিলেন, ততদিনে তাঁদের ছেলেমেয়ে কৈশোরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ছেলেমেয়ে যতই বড় হচ্ছিল, মা অথবা বাবার সঙ্গে তাদের ততই কম মিল পাওয়া যেত— তারা অন্যরকমভাবে কথা বলত, অন্যরকম জামাকাপড় পরত, সবদিক দিয়ে তাদের বিদেশি মনে হত, চুলের ধরন থেকে শুরু করে হাত-পায়ের গড়ন পর্যন্ত। অদ্ভুতভাবে তাঁর নাতি, যে শুরু থেকেই মাত্র আধা-বাঙালি, যার পদবিও বাঙালি নয়, তার সঙ্গেই তিনি এক সরাসরি রক্তমাংসের সম্পর্ক অনুভব করেন। তাকে দেখে মনে হয়, যেন তাঁর নিজের এক সত্তা অন্য একজনের মধ্যে পুনর্গঠিত হয়েছে।

তাঁর মনে পড়ে যখন ছেলেমেয়েরা কলেজ থেকে বাড়ি আসত, মা-বাবার কাছে অধৈর্য হয়ে পড়ত। নতুন পাওয়া স্বাধীনতায় অভিভূত হয়ে থাকত। সবসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চাইত। তাদের ব্যবহার তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিত এবং অস্বীকার না করলেও, তাঁরও খুবই কষ্ট হত। সেইসব মুহূর্তে তিনি না ভেবে থাকতে পারতেন না যে, একসময় তারা কত ছোট ছিল। তিনি যখন অনভিজ্ঞ হাতে তাদের কোলে নিতেন, তখন কত অসহায় মনে হত তাদের। নিজেদের অস্তিত্বের জন্য ছেলেমেয়েদের তাঁকে প্রয়োজন ছিল কারণ আর কাউকে জানতই না। তিনি এবং তাঁর স্ত্রীই ছিলেন তাদের সম্পূর্ণ জগৎ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগাযোগ ক্ষীণ হতে হতে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থায় এসে ঠেকেছিল, যা মাঝে মাঝে ছিন্ন হয়ে যাবে বলে ভয় হত। রুমার ভাগ্যেও একই ক্ষয় লেখা আছে। তার ছেলেমেয়েও অচেনা হয়ে যাবে, তাকে এড়িয়ে চলবে। এবং তিনি রুমাকে এই দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইছিলেন, যেমনভাবে তিনি সারাজীবন তাকে অনেক কিছু থেকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছেন। বিবাহিত জীবনে যে অবক্ষয় অনিবার্য, তার থেকে তিনি রুমাকে আগলে রাখতে চান। তাঁর আশঙ্কাই বোধহয় সত্য যে, পরিবার গড়ার, এই পৃথিবীতে সন্তান আনার গোটা উদ্যোগটা, মাঝে মাঝে যতই চরিতার্থকর মনে হোক না কেন, তা গোড়া থেকেই ত্রুটিমিশ্রিত। কিন্তু এসব এক এমন বুড়ো মানুষের ধ্যানধারণা, যে নিজেই এখন ছেলেমানুষের মতো আচরণ করছে।

পরের দিন সকালে রুমার বাবা তাড়াতাড়ি রওনা দিলেন। আকাশ তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। রুমা এয়ারপোর্ট যেতে চেয়েছিল, কিন্তু এবার বাবা আরও দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানায়। বললেন, তিনি আকাশের প্রাত্যহিক কাজকর্ম ওলট পালট হয়ে যাক চান না। সিয়্যাট্‌লে সারাদিন কাটানোর পর তাঁরা সকলেই ক্লান্ত ছিলেন। ফেরি চড়ার পর তাঁরা স্পেস নিড্‌ল-এ গিয়েছিলেন। তারপর পাইক প্লেস মার্কেট-এ ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে রুমা দেখল যে, বাবার সিরিয়াল খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। বাটি-চামচ জল ঝরানোর জায়গায় চলে গিয়েছে। সাধারণত যে টি-ব্যাগটা পরে কখনও ব্যবহার করার জন্য বাঁচিয়ে রাখা থাকে, সেটা ফেলে দেওয়া হয়েছে।

"সব নিয়েছ তো?" দরজার কাছে বাবার সুটকেস দেখে রুমা জিজ্ঞেস করল। তিনি উপহার সমেত এসেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু কেনেননি। গত সপ্তাহে তিনি যা যা কিনেছিলেন, গুটিয়ে রাখা হোসপাইপটা, যন্ত্রপাতি, ব্যাগের ভিতর বাকি মাটিটুকু নার্সারি এবং হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে, সবই রুমার জন্য। সেগুলো এখন পিছনের বারান্দায় গুছোনো রয়েছে।

"বাড়ি পৌঁছে ফোন কোরো," রুমা বাবাকে বলল। ছেলেমেয়ে চলে যাওয়ার সময় তার মা এই কথাটা বলতেন। ফ্রিজের দরজায় যে কাগজে অ্যাডামের পথসংক্রান্ত বিষয় লেখা ছিল, তারই নীচে রুমা বাবার বিমানের খুঁটিনাটি লিখে নিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অ্যাডাম আজ রাতে এসে যাবে তো?"

রুমা ঘাড় নাড়ল।

"ভাল। সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে তা হলে।"

রুমা বলতে চাইছিল, বাবার উপস্থিতি তার কাছে কত স্বাভাবিক লেগেছে। কিন্তু সে মুখ ফুটে কথাগুলো বলতে পারল না। বাবা ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে, ঠান্ডা করার জন্য পিরিচে অল্প চা ঢেলে পিরিচটা ঠোঁটের কাছে তুলে চুমুক দিলেন।

"সপ্তাহটা দারুণ কাটল, রুমা। আমি প্রতিটা দিন খুব উপভোগ করেছি।"

"আমিও।"

"আকাশের সঙ্গে এই দিনগুলো সবচেয়ে বড় উপহার," রুমার বাবার গলা নরম হয়ে আসল। "তুই চাইলে, বাচ্চাটা হওয়ার পর আমি কিছুদিন এসে থাকতে পারি। যদিও তোর মা থাকলে যত সাহায্য করতেন, অতটা তো পারব না।"

"ব্যাপারটা তা নয়, বাবা।"

"কিন্তু প্লিজ বোঝার চেষ্টা কর, আমি একলাই থাকতে চাই। এরকম একটা পরিবর্তনের পক্ষে বড্ড বুড়ো হয়ে গিয়েছি এখন।"

তাঁর স্নিগ্ধ কথাগুলো চট করে রুমার মন ভারী করে তুলল। সে বুঝতে পারল যে, বাবাকে এই নিয়ে বেশি চিন্তাই করেননি। তিনি থাকার কথা কখনওই ভেবে দেখেননি।

"সময় করে এখানকার ল ফার্মগুলোয় খোঁজ নিস," বাবা বললেন। "অত পরিশ্রম জলে যেতে দিস না।"

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। রুমা বাধা দেওয়ার আগেই পেয়ালা-পিরিচ ধুয়ে সেগুলোও ড্রেনার-এ রেখে দিলেন। যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।

"নীচে গিয়ে আকাশকে একটু আদর করে আসি," রুমার বাবা বললেন। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও থেমে দাঁড়ালেন। "তোর কাছে কি একটা বাড়তি স্ট্যাম্প হবে? একটা বিল ডাকে ফেলতে হবে।"

"হল-এর ছোট টেবিলটার টানার মধ্যে," রুমা বলল। "একটা রোল আছে, দেখো।"

রুমা টানাটা খোলা, বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল। তারপর সিঁড়িতে বাবার হাওয়াই চটির আওয়াজ হল। ফিরে এসে বাবা জুতো পরতে প্রবেশদ্বারের

কাছে গেলেন, জুতোর ফিতে বাঁধলেন, হাওয়াই চটি দুটো সুটকেসের সামনের পকেটে রেখে দিলেন। রুমার গালে চুমু খেলেন। "সাবধানে থেকো। বাগানটা কেমন হয় জানিয়ো।" তারপর রুমার পেটের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি বললেন, "সুখবরের অপেক্ষায় রইলাম।" ঘুরে, বাইরে গাড়ির দিকে হেঁটে গেলেন। সুটকেসটা ট্রাঙ্কে তুললেন। ইঞ্জিন স্টার্ট করে গাড়িটা পিছোতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে রুমা ভাবল, আবার কবে তাদের দেখা হবে কে জানে। ডাকবাক্সের কাছে গিয়ে গাড়িটা থামল। মুহূর্তের জন্য রুমা ভাবল বাবা হয়তো জানলা খুলে বিলটা ভিতরে ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি বন্ধ জানলার মধ্যে দিয়েই রুমার দিকে ঝুঁকে হাত নাড়লেন। তাঁকে কেমন বিচলিত দেখাচ্ছিল। কয়েক সেকেন্ড পর তিনি চলে গেলেন।

"দাদু কোথায়?" আকাশ প্রশ্ন করল। রুমা চা শেষ করছিল।

"দাদু আজ বাড়ি চলে গিয়েছেন।"

"কেন?"

"কারণ, উনি ওখানেই থাকেন।"

"কেন?" ছেলের কচি মুখে রুমা নিজের হতাশার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল।

"বাবা আজ ফিরে আসছে," কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে রুমা বলল। "আমরা একটা কেক বানাব নাকি?"

আকাশ রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে গোলাকার হাতলটা ঘোরানোর চেষ্টা করল। কাচের মধ্যে দিয়ে পিছনের বাগানের দিকে তাকাল। "আমার দাদুকে চাই।"

রুমা তার জন্য দরজাটা খুলে দিয়ে পিছন পিছন বেরোল। দু'জনেরই খালি পা। রুমা সতর্কভাবে পা ফেলছিল। আকাশ পায়ের তলায় পাথর বা ডালপালার ভয় না পেয়েই এগোচ্ছিল। রুমা যা ভেবেছিল, বাইরে তার চেয়ে বেশি ঠান্ডা। তখনও দিনটা উষ্ণ হয়ে ওঠেনি। রুমা ভাবল সোয়েটারের জন্য ভিতরে যাবে কি না। "সোনা? ঠান্ডা লাগছে?" বুকের কাছে হাত দুটো ভাঁজ করে সে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু আকাশ উত্তর দিল না। রুমার বাবা বারান্দার নীচে যে জল দেওয়ার ঝাঁঝরিটা রেখে গিয়েছিলেন, আকাশ সেটা তুলে জল

AMARBOI.COM

দেওয়ার ভান করতে শুরু করল। রুমা মাটি থেকে উঁকি দেওয়া জিনিসগুলোর দিকে তাকাল— পেন, পেনসিল, একটা স্ট্র, একটা আইসক্রিমের কাঠি। কাগজও ছিল, ফালতু চিঠিপত্রের পুরনো খাম, গ্রাহকের খোঁজে পত্রিকা থেকে বেরিয়ে আসা কার্ড ছোট ছোট তাঁবুর মতো করে মাটির ওপর মুড়ে রাখা। আর এক টুকরো কাগজের ওপর তার চোখ পড়ল। অন্যগুলোর চেয়ে এটা বেশি শক্ত। সে দেখার জন্য ঝুঁকল। বাবার হাতের লেখা চিনতে পারল। ধরে নিল, সেটা তাকে পাঠানো বাবার কোনও পোস্টকার্ড হবে। হয়তো আকাশ ফ্রিজের সামনে থেকে অথবা হল টেবিলের ওপরের ঝুড়ি থেকে নিয়েছিল। কিন্তু এই পোস্টকার্ডটায় কোনও ডাকের ছাপ ছিল না। এটা কোথাও পাঠানো হয়নি। চিঠিটা বাংলায় লেখা, ঠিকানাটা ইংরেজিতে। লং আইল্যান্ডে কারও উদ্দেশে লেখা, কোনও এক মিসেস মীনাক্ষী বাগচি।

রুমা কার্ডটা তুলে নিল। "আকাশ, এটা কী?"

আকাশ হাত বাড়িয়ে কার্ডটা রুমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। "ওটা আমার।"

"কী এটা?" এবার আরও কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল রুমা।

"ওটা আমার বাগানের জন্য।"

"দাদু কি এটা তোমাকে দিয়েছিলেন?"

আকাশ রাগ করে মাথা নাড়ল। তারপর কাঁদতে শুরু করল।

রুমা কার্ডটার দিকে তাকাল এবং সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারল। ঠিক যেমন সে ডাক্তারের মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল অস্ত্রোপচারের টেবিলে মায়ের কী পরিণতি হয়েছে। ভিডিওর সেই মহিলাটি— বাবার ভ্রমণ, তাঁর প্রসন্ন মেজাজ, তাঁর সিয়্যাট্‌লে থাকতে না চাওয়ার কারণ। সেদিন সকালে তাঁর স্ট্যাম্প চাওয়ারও কারণ। তার বাবা যে শুধু আকাশকেই ভালবেসে ফেলেননি এখানে লেখা দুর্বোধ্য বাক্যগুলিই তার প্রমাণ।

রুমার বাবা এয়ারপোর্টে একটা বইয়ের দোকানে গেটে দাঁড়িয়ে পড়ার জন্য খবরের কাগজ কিনছিলেন। এমন সময় ধাতব-স্ট্যান্ডটার ওপর রেজিস্টারে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো সিয়্যাট্‌লের সেই গাইডবইটার একটা কপি দেখলেন, যেটা রুমার বাড়িতে, তাঁর খাটের পাশে ছিল। তিনি বইটা সর্বত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজেছেন, সব চাদর তুলে দেখেছেন। খুঁজতে গিয়ে আকাশকে প্রায় ঘুম থেকে উঠিয়ে ফেলেছেন। সেইসব টানা খুলে দেখেছেন, যেগুলো কোনওদিন ব্যবহার করেননি। দেওয়াল-আলমারির তাকে উঁকি দিয়ে দেখেছেন। তোশকের তলায় যতদূর হাত যায় চারদিকে হাত চালিয়ে দেখেছেন। আগেই সময় করে কার্ডটা ডাকে না ফেলার জন্য নিজেকে শাপশাপান্ত করেছেন। অবশেষে খাটের তলায়, মেঝেতে আকাশ যে ধারে ঘুমোয়, সেইদিকে বইটা পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতিটি পাতা উলটে দেখেছেন, বইটা ধরে ঝাঁকিয়েছেন কিন্তু পোস্টকার্ডটা খুঁজে পাননি। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হয়েছিল নাতিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন কার্ডটা দেখেছে কি না, কোথাও সরিয়ে রেখেছে কি না। বাথরুমে খুঁজেছেন, জামাকাপড়ের ঝুড়িতে খুঁজেছেন, যে টাবে সেই সকালেই তিনি চান করেছেন, সেখানেও দেখেছেন। শেষে, আর খোঁজার যৌক্তিকতা দেখাতে না পেরে, প্লেনের সময় পেরিয়ে যাওয়ার ভয়ে, তিনি চলে এসেছিলেন। রুমার দেওয়া অব্যবহৃত স্ট্যাম্পটা তখনও তাঁর শার্টের পকেটে। একটা পোস্টকার্ডের যা প্রয়োজন, তার চেয়ে স্ট্যাম্পটা বেশি দামের। একটা ভারহীন জিনিস যা তাঁর মনে আশঙ্কায় ভরে দিল।

রুমা আকাশকে ভিতরে নিয়ে গেল, তার চোখের জল মুছে তাকে কোলে নিল। তারপর আকাশ শান্ত হলে তার জলখাবার বানাতে শুরু করল। আকাশ যখন জিজ্ঞেস করল সে টিভি দেখতে পারে কিনা, রুমা বারণ করল না। আকাশকে তার সিরিয়ালের বাটি দিয়ে কফি টেবিলে বসিয়ে পোস্টকার্ডটা আবার দেখার জন্য রান্নাঘরে ফিরে গেল। প্রথমেই মনে হল কার্ডটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে কিন্তু সে তা না করে বাংলা অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল। ছেলেবেলায় মা একবার তাকে বাংলা অক্ষর শেখানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মা থাকলে এই বাক্যগুলোর অর্থ এক মুহূর্তেই উদ্ধার করতে পারতেন। এই বাক্যগুলোই মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা তার পরের দিনগুলোর চেয়েও দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে দিল যে, তার মায়ের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। কোথায় চলে গিয়েছেন মা, যখন তার জীবন দ্রুত এগিয়ে চলেছে, যখন রুমার তাঁকে দরকার এত কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

রুমা বাইরে ফিরে গেল, ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে বাবার লাগানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাইড্রেঞ্জাটার দিকে তাকাল। মাটির অম্লতার ওপর নির্ভর করে যার ফুল গোলাপি বা নীল হবে। তার বাবা যে স্ত্রীকে ভালবেসেছিলেন, এমনকী তিনি যে স্ত্রীর অভাব বোধ করেন, তাও প্রমাণ করতে পারে না গাছটা। তবুও তিনি গাছটা লাগিয়েছিলেন। আর-একজন মহিলার দিকে ফেরার আগে স্ত্রীকে সম্মান জানিয়েছেন। রুমা পোস্টকার্ডটা হাত বুলিয়ে সোজা করে দিল। পিনকোডের সামান্য অংশ মাটি লেগে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, নখ দিয়ে মাটিটা তুলে ফেলল। পোস্টকার্ডটা উলটে সামনের ছবিটা দেখল, গত কয়েকদিনের স্মারক হিসেবে তার বাবা কোন ছবিটিকে বেছে নিয়েছেন। তারপর সে বাড়ির ভিতর, হল-এর টেবিলটার কাছে ফিরে গেল। টানা থেকে স্ট্যাম্পের রোলটা বের করে একটা স্ট্যাম্প নিয়ে পোস্টকার্ডে আটকে দিল, যাতে সেদিনই, পরে পোস্টম্যান এসে পোস্টকার্ডটা নিয়ে যেতে পারে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাতাল-আকাশ

প্রণব চক্রবর্তী আসলে বাবার ছোট ভাই ছিলেন না। কলকাতার এই বাঙালি ভদ্রলোক সাতের দশকের গোড়ার দিকে আমার মা-বাবার বন্ধুবান্ধবহীন সামাজিক জীবনের তীরে ভেসে এসেছিলেন। মা-বাবা তখন সেন্ট্রাল স্কোয়্যার-এর এক ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। তাঁদের পরিচিতদের সংখ্যা হাতে-গোনা ছিল। আমেরিকায় আমার কোনও নিজের কাকা-জ্যাঠা ছিলেন না বলে, আমাকে শেখানো হয়েছিল তাঁকে 'প্রণবকাকু' বলে ডাকতে। তিনি বাবাকে 'শ্যামলদা' বলতেন। আপনি বলে সম্বোধন করতেন। মাকে 'অপর্ণা' না বলে 'বউদি' বলতেন। মা-বাবার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর, তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, যেদিন তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, সেদিন তিনি দুপুরের বেশিরভাগ সময়টা কেমব্রিজের রাস্তায় রাস্তায় মা এবং আমার পিছন পিছন হেঁটে কাটিয়েছিলেন। স্কুলের পর মা এবং আমি সাধারণত সেইসব রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। তিনি আমাদের পিছন পিছন ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ দিয়ে, হার্ভার্ড কুপ-এ ঢুকে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। হার্ভার্ড কুপ-এ মা বাড়ির জিনিসপত্র কত ছাড়ে দিচ্ছে তা দেখতে যেতেন। প্রণবকাকু আমাদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে হার্ভার্ড ইয়ার্ড-এ পৌঁছে গিয়েছিলেন। অনেক সময়, দিনটা ভাল থাকলে, মা সেখানে ঘাসের ওপর বসে ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের ব্যস্তভাবে হেঁটে যাওয়া দেখতেন। শেষে, আমরা যখন ওয়াইডনার লাইব্রেরির সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম, যাতে আমি সেখানকার বাথরুমে যেতে পারি, তখন তিনি মায়ের কাঁধে টোকা মেরে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন মা বাঙালি কি না। উত্তরটা ছিল স্পষ্ট কারণ, মায়ের হাতে বাঙালি বউদের প্রধান চিহ্ন শাঁখা-পলা, পরনে সাধারণ টাঙ্গাইল শাড়ি এবং সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর লাগানো। মায়ের ভরাট গোল মুখ এবং বড় বড় কালো চোখও বাঙালি মেয়েদের বৈশিষ্ট্য। তাঁর শাঁখা-পলার পিছনে

AMARBOI.COM

সরু সরু সোনার চুড়িতে দু' তিনটে সেফটিপিন আটকানো থাকত। ব্লাউজের কোনও হুক খুলে গেলে বা হঠাৎ করে সায়ার দড়ি পরানোর প্রয়োজনে যাতে ব্যবহার করতে পারেন। প্রণবকাকু সেফটিপিনগুলো লক্ষ করেছিলেন। অভ্যেসটা তিনি তাঁর কলকাতার মা-বোন-মাসি-পিসিদের সঙ্গেই মেলাতে পারছিলেন। এ ছাড়াও, তিনি কুপ-এ মাকে বাংলাতে, আমাকে আর্চি কমিক্স কিনতে বারণ করাও শুনতে পেয়েছিলেন। তবে প্রণবকাকু এও স্বীকার করেছিলেন যে, সেইসময়, তিনি আমেরিকায় এতই নতুন ছিলেন যে, কোনও কিছুই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিতেন না। কোনও সংশয়াতীত ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে পারতেন না।

ততদিনে সেন্ট্রাল স্কোয়্যার-এ আমাদের তিন বছর কেটে গিয়েছে। তার আগে আমরা বার্লিনে থাকতাম, সেখানেই আমার জন্ম। বাবা সেখানেই মাইক্রোবায়োলজিতে তাঁর ট্রেনিং শেষ করে মাস জেনারাল-এ গবেষকের চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। বার্লিনের আগে মা-বাবা ভারতে থাকতেন। তখন তাঁরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিলেন। সেখানেই তাঁদের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করা হয়। যেসব জায়গায় থেকেছি, তার মধ্যে প্রথমে সেন্ট্রাল স্কোয়্যার-এর কথাই আমার মনে পড়ে। আমার স্মৃতিতে, অ্যাশবার্টন প্লেসের গাঢ় বাদামি রঙের কাঠের টালি লাগানো অ্যাপার্টমেন্টে প্রণবকাকু সবসময় উপস্থিত। এই গল্পটা তিনি মাঝে মাঝেই বলতে ভালবাসতেন, সেইদিন দুপুরেই মা তাঁকে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে তাঁদের দু'জনের জন্য চা তৈরি করেছিলেন। এবং প্রণবকাকু তিনমাসের ওপর কোনও বাঙালি খাবার খাননি শুনে, আগের রাতের ভাত এবং ম্যাকারেলের ঝোলের যা বেঁচেছিল, তাঁকে তাই খেতে দিয়েছিলেন। প্রণবকাকু সন্ধেবেলা পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলেন। বাবা ফেরার পর আবার আমাদের সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন। এবং তারপর থেকে প্রায় প্রতি রাতেই আমাদের সঙ্গে খেতে আসতেন। তিনি আমাদের রান্নাঘরের চৌকো ফরমিকা টেবিলের চতুর্থ স্থানে বসতেন এবং শুধু নামেই নয়, বাস্তবেও আমাদের পরিবারের এক সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রণবকাকু কলকাতার এক সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। এমআইটি-তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আমেরিকা আসার আগে তাঁকে নিজের জন্য এক গ্লাস জল গড়িয়েও খেতে হয়নি। বস্টনের স্নাতক ছাত্রজীবন ছিল তাঁর কাছে এক

AMARBOI.COM

নিষ্ঠুর ধাক্কা, প্রথম মাসে তাঁর প্রায় কুড়ি পাউন্ড ওজন কমে গিয়েছিল। তিনি জানুয়ারি মাসে এক তুষারঝড়ের মধ্যে আমেরিকা পৌঁছেছিলেন। এবং সপ্তাহশেষে তিনি মালপত্র গুছিয়ে লোগান-এ চলে গিয়েছিলেন। সারাজীবন যে সুযোগ পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করেছেন, সেই সুযোগ ছেড়ে চলে যাবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত বদলান। প্রণবকাকু ট্রাওব্রিজ স্ট্রিটে এক ডিভোর্সি মহিলার বাড়িতে চিলেকোঠায় একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলার ছোট ছেলেমেয়ে দুটি সবসময় কান্নাকাটি এবং চেঁচামেচি করত। দিনের বিশেষ কয়েকটি সময়েই রান্নাঘর ব্যবহার করতে পারতেন এই শর্তে যে, স্টোভটা ব্যবহারের পর উইন্ডেক্স এবং স্পঞ্জ দিয়ে মুছে দিতে হবে। মা-বাবাও শুনে বললেন যে, তাঁর সত্যি খুবই দুরবস্থা এবং আমাদের বাড়িতে একটা বাড়তি শোওয়ার ঘর থাকলে তাঁরা প্রণবকাকুকে এসে থাকতে বলতেন। তা সম্ভব নয় বলে তাঁকে আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করার জন্য এবং যে-কোনও সময় আমাদের বাড়ি চলে আসার জন্য স্বাগত জানালেন। শীঘ্রই, ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, প্রণবকাকু দুটো ক্লাসের মাঝখানে বা ছুটি পেলেই আমাদের বাড়িতে এসে পড়তেন। চলে যাওয়ার পর সবসময় দেখা যেত তাঁর কোনও না কোনও চিহ্ন পড়ে আছে। যেমন, সিগারেটের একটা প্রায় খালি প্যাকেট, খবরের কাগজ, না-খোলা চিঠি অথবা যে সোয়েটারটা খুলে আবার পরতে ভুলে গিয়েছিলেন।

আমার এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে তাঁর প্রাণোচ্ছল হাসি, এবং আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের বিবর্ণ বেমানান আসবাবের ওপর তাঁর লম্বা, কৃশ দেহটা অলস ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বা বসে আছে, দৃশ্যটা। প্রণবকাকুর মুখটা আকর্ষণীয়, কপাল উঁচু, গোঁফ মোটা এবং অত্যধিক বেড়ে যাওয়া উসকো-খুসকো চুল। মা বলতেন, ওইরকম চুলের জন্য প্রণবকাকুকে সর্বত্র দেখতে পাওয়া আমেরিকান হিপিদের মতো দেখাত। তিনি কোথাও বসলেই, লম্বা পা দুটো নাচাতেন। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরলে তাঁর হাতগুলো কাঁপত। একটা চায়ের কাপে ছাই ফেলতেন, যেটা মা শুধু সেজন্যই আলাদা করে রাখতে শুরু করেছিলেন। বিজ্ঞানী হলেও, তিনি দৃঢ় সুশৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। তাঁকে দেখে মনে হত যেন কখনও খেতে পেতেন না। দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই ঘোষণা করতেন, তিনি লাঞ্চ খাননি। তারপর বুভুক্ষের মতো খেতে শুরু করতেন। মা কাটলেট ভেজে

AMARBOI.COM

প্লেটে লাল পেঁয়াজের স্যালাড দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করার আগেই মায়ের চোখের আড়ালে চুরি করে কাটলেট মুখে পুরতেন। মা-বাবা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন, প্রণবকাকু অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, যাদবপুরের নক্ষত্র। প্রশংসনীয় অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ নিয়ে এমআইটি-তে এসেছেন। কিন্তু প্রণবকাকু তাঁর ক্লাসের ব্যাপারে বেশ অবহেলা করতেন। মাঝে মাঝেই কামাই করতেন। "এই আমেরিকানগুলো যে সমীকরণ এখন শিখছে, তা আমি উষার বয়সেই জানতাম," অভিযোগ করতেন। যদিও আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি আমার শিক্ষিকা কোনও হোমটাস্ক দেন না এবং সাত বছর বয়সেও আমাকে স্কোয়্যার রুট বা 'পাই'-এর সম্পর্কে কিছু শেখানো হয়নি জানতে পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রণবকাকু না বলেই চলে আসতেন, কখনও ফোন করে জানাতেন না। দরজার কড়া নাড়িয়ে "বউদি!" বলে ডাক দিয়ে অপেক্ষা করতেন কখন মা দরজা খুলবেন, যেমন কলকাতায় লোকে করে। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে, আমি স্কুল থেকে ফিরে দেখতাম, মা গায়ে ট্রেঞ্চকোট চাপিয়ে পার্স কোলে নিয়ে বসে আছেন। সারাদিন একা কাটানোর পর বাড়ি থেকে বেরোনোর জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। কিন্তু এখন এসে দেখতাম, মা লুচি করবেন বলে ময়দা বেলছেন, যা তিনি সাধারণত শুধু রবিবার, বাবা এবং আমার জন্যই তৈরি করতেন। অথবা উলওয়ার্থ থেকে কেনা নতুন পরদা লাগাচ্ছেন। তখন আমি জানতাম না যে, মা সারাদিন প্রণবকাকুর আসার অপেক্ষায় থাকতেন। তিনি আসবেন ভেবে বাসি শাড়ি পালটে নতুন শাড়ি পরতেন, চুল বাঁধতেন। যে জলখাবারগুলো তিনি অত নিস্পৃহভাবে প্রণবকাকুকে খেতে দিতেন, সেগুলো তিনি অনেকদিন আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখতেন। জানতাম না যে, প্রণবকাকুর দরজার বাইরে থেকে 'বউদি' ডাকা মুহূর্তের অপেক্ষায়ই থাকতেন। যেদিন প্রণবকাকু আসতেন না, মায়ের মেজাজ খারাপ থাকত।

মা নিশ্চয়ই খুশি হতেন যে, আমিও প্রণবকাকুর আসার অপেক্ষায় থাকতাম। প্রণবকাকু আমাকে তাসের ম্যাজিক দেখাতেন। আর-একটা ভেলকি দেখাতেন, যাতে মনে হত যেন তিনি খুব কষ্ট করে নিজের বুড়ো আঙুলটা কেটে ফেলছেন। স্কুলে নামতা শেখার আগে তিনি আমাকে নামতা মুখস্থ করতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর ফোটোগ্রাফির শখ ছিল। একটা দামি

AMARBOI.COM

ক্যামেরা ছিল, যেটার শাটার টেপার আগে বেশ ভাবতে হত। শিগগিরি আমি তাঁর ফোটো তোলার প্রিয় বিষয় হয়ে উঠলাম, আমার গোলগাল মুখ, ফোকলা দাঁত, কপালে উপচে পড়া গোছা-গোছা চুল যা কাটার দরকার। এখনও, নিজের সেই ফোটোগুলোই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। কারণ, সেই ফোটোগুলোয় আমার অল্প বয়সের এমন এক আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে, যা এখন আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাই না। বিশেষ করে ক্যামেরার সামনে। মনে আছে, আমাকে হার্ভার্ড ইয়ার্ডে ছোটাছুটি করতে হয়েছিল, কারণ, তিনি আমার দৌড়োনোর ফোটো তুলতে চেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়িতে বা রাস্তায় বা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফোটো তুলতে হয়েছিল। মাত্র একটা ফোটোতেই মাকে দেখা যায়, আমাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। তাঁর মাথাটা আমার দিকে ঝোঁকানো, হাত দুটো আমার কানে চেপে রাখা। যেন আমাকে কিছু শুনতে দিচ্ছেন না। সেই ফোটোতে, ফ্রেমের এক কোণে প্রণবকাকুর ছায়া আছে, ক্যামেরাটা মুখের সামনে ধরার জন্য হাত দুটো উঠিয়ে আছেন। মায়ের দেহের এক পাশে তাঁর সেই অস্পষ্ট, নিরাকার ছায়া পড়েছে। আমরা তিনজনই সবসময় একসঙ্গে থাকতাম। তিনি যখনই আসতেন, আমি সেখানে থাকতাম। অ্যাপার্টমেন্টে মা একলা থাকলে প্রণবকাকুর আসাটা অশোভন দেখাত। এই নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না।

AMARBOI.COM

তাঁদের দু'জনের মধ্যে অনেক মিল ছিল, যা মা এবং বাবার মধ্যে ছিল না। যেমন সংগীত, চলচ্চিত্র, বামপন্থা এবং কবিতার প্রতি ভালবাসা। তাঁরা একসময় উত্তর কলকাতার একই পাড়ায় থাকতেন। প্রণবকাকুর বাড়ি থেকে হাঁটাপথেই মায়ের বাপের বাড়ি যাওয়া যেত। সঠিক ঠিকানা বুঝিয়ে বলার পর তাঁরা পরস্পরের বাড়ি চিনতেও পেরেছিলেন। একই দোকান, একই বাস এবং ট্রামের রুট চিনতেন। দু'জনেই জানতেন, রাস্তার কোন দোকানে সবচেয়ে ভাল জিলিপি এবং মোগলাই পরোটা পাওয়া যায়। অন্যদিকে বাবার বাড়ি ছিল কলকাতা থেকে কুড়ি মাইল দূরে এক শহরতলিতে। মায়ের কাছে জায়গাটা অজ পাড়াগাঁ মনে হত। বাড়ির জন্য মনখারাপ হওয়া সত্ত্বেও মা কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, বাবা তাঁকে সেই রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়িতে রাখেননি। সেখানে মাকে সবসময় ঘোমটা দিয়ে থাকতে হত। একটা খাটা পায়খানা, যেখানে একটা উঁচু করা প্ল্যাটফর্মে একটা গর্তের চেয়ে বেশি কোনও সুবিধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। দেওয়ালে একটিও পেন্টিং ছিল না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রণবকাকু তাঁর 'রিল-টু-রিল'টা আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। একের পর এক হিন্দি গান বাজিয়ে মাকে শোনাতেন, যা তাঁরা কম বয়সে শুনতেন। সেই উচ্ছল প্রেমের গানগুলো তাঁকে সেই জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেত, বাবাকে বিয়ে করার জন্য মা যে জগৎটা পিছনে ফেলে এসেছিলেন। তিনি এবং প্রণবকাকু মনে করার চেষ্টা করতেন, গানগুলো কোন ছবির, কোন দৃশ্যের। কোন অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন, তাঁরা কী পরেছিলেন। মা বর্ণনা করতেন, রাজ কপূর এবং নার্গিস বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় গান করছেন অথবা দেব আনন্দ গোয়ার সমুদ্রতটে গিটার বাজাচ্ছেন। এইসব ব্যাপারে তাঁর এবং প্রণবকাকুর তুমুল তর্ক বেধে যেত। গলা তুলে পরস্পরের সঙ্গে খেলাচ্ছলে এমন ঝগড়া করতেন, যেমন ঝগড়া মা-বাবার মধ্যে কখনও হত না।

প্রণবকাকু বাবার ছোট ভাই পরিচয়ে বাড়িতে আসতেন বলে, মা তাঁকে স্বচ্ছন্দে 'প্রণব' বলে ডাকতেন। যদিও তিনি কখনও বাবাকে নাম ধরে ডাকতেন না। বাবার তখন সাঁইত্রিশ বছর বয়স, মার চেয়ে ন'বছরের বড় ছিলেন। প্রণবকাকুর বয়স ছিল পঁচিশ। বাবা নির্জনতা এবং একাকিত্ব ভালবাসতেন। তিনি মা-বাবাকে আশ্বস্ত করার জন্য বিয়ে করেছিলেন। তিনি বিয়ে করবেন এই শর্তে মা-বাবা তাঁর চলে যাওয়া মেনে নিয়েছিলেন। বাবার আসল সঙ্গী ছিল তাঁর কাজ, তাঁর গবেষণা। তিনি নিজস্ব যে জগতে বাস করতেন, তা মা বা আমার কাছে দুর্ভেদ্য ছিল। কথোপকথন তাঁর কাছে কষ্টকর কাজ ছিল। তিনি তাঁর সমস্ত কষ্ট ল্যাবরেটরিতে করতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। কোনও কিছুতেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। দৈনন্দিন জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আর কোনও চাহিদা ছিল না। সকালে সিরিয়াল এবং চা, বাড়ি ফেরার পর এক কাপ চা এবং রাতে দুটো আলাদা তরকারি। বাবার প্রণবকাকুর মতো সর্বগ্রাসী খিদে ছিল না। বাবার মধ্যে একটা তীব্র বেঁচে থাকার মনোবৃত্তি ছিল। মাঝে মাঝে, বিভিন্ন মানুষের সামনে, তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবেই মন্তব্য করতে ভালবাসতেন যে, স্ট্যালিনের অধীনে বুভুক্ষু রুশ মানুষরা তাদের ওয়ালপেপারের পিছনের আঠা খেয়ে পর্যন্ত প্রাণধারণ করেছে। কেউ মনে করতে পারে যে, প্রণবকাকুর নিয়মিত আসা-যাওয়া, এবং মায়ের ব্যবহার এবং মেজাজের ওপর তার প্রভাব দেখে বাবার সামান্য ঈর্ষা বা অন্তত সামান্য সন্দেহও হয়ে থাকবে। কিন্তু আমার

AMARBOI.COM

মনে হয় যে, বাবা প্রণবকাকুর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করতেন। তিনি মাকে যে সঙ্গ দিতেন সে জন্য। মাকে ভারত ছেড়ে আসতে বাধ্য করার জন্য বাবা নিজের ওপর যে দায়িত্বভার অনুভব করেন, সেই ভারমুক্ত করার জন্য। এবং হয়তো এতদিন পর মাকে সুখী দেখে বাবা আশ্বস্তও হয়েছিলেন।

গ্রীষ্মে, প্রণবকাকু একটা নেভি ব্লু ভোক্সওয়্যাগন বিট্‌ল কিনলেন। তিনি মা আর আমাকে গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। প্রথমে বস্টন এবং কেমব্রিজের মধ্যেই। তারপর শহরের বাইরে, হাইওয়ের ওপর গাড়ি ছুটিয়ে দিতেন। আমাদের ওয়াটারটাউনে ইন্ডিয়া টি অ্যান্ড স্পাইসেস-এ নিয়ে যেতেন। একবার পাহাড় দেখানোর জন্য নিউ হ্যাম্পশায়ার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। গরম পড়তে শুরু করলে, আমরা সপ্তাহে এক-দু'বার করে ওয়াল্ডেন পন্ড-এ যাওয়া শুরু করলাম। মা সবসময় ডিমসেদ্ধ এবং শশার স্যান্ডউইচ দিয়ে একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করতেন। সস্নেহে তাঁর ছেলেবেলার এবং যৌবনের পিকনিকের গল্প করতেন, যখন জনা পঞ্চাশেক আত্মীয়স্বজন মিলে ট্রেনে করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অভিযানে যাওয়া হত। প্রণবকাকু বাবার মতো মায়ের স্মৃতিচারণের প্রতি নিরুৎসুক থাকতেন না বা আমার মতো না বুঝে শুনে যেতেন না। ওয়াল্ডেন পন্ড-এ তিনি মাকে অনুরোধ-উপরোধ করে বনের মধ্যে খাড়া ঢাল দিয়ে জলের ধারে নীচে নিয়ে যেতেন। মা পিকনিকের জিনিসপত্র বার করে বসে আমাদের সাঁতার কাটা দেখতেন। প্রণবকাকুর বুক থেকে কোমর পর্যন্ত ঘন কালো রোমে ঢাকা ছিল। তাঁকে সরু সরু পা এবং সামান্য ভুঁড়িতে অদ্ভুত দেখাত। যেন একজন তন্বী মেয়ের বাচ্চা হওয়ার পর সে তার স্ফীত পেট আর সমান রাখার কোনও চেষ্টা করেনি। "তুমি আমাকে মোটা করে দিচ্ছ বউদি," গপ গপ করে মায়ের রাঁধা খাবার খাওয়ার পর প্রণবকাকু অভিযোগ করতেন। সশব্দে, অপটুভাবে সাঁতার কাটতেন, মাথা সবসময় জলের ওপরে থাকত। বুদবুদ তৈরি করতে বা নিশ্বাস বন্ধ করে রাখতে জানতেন না, যেমন আমাকে সাঁতারের ক্লাসে শেখানো হয়েছিল। আমরা যেখানেই যেতাম, অপরিচিত লোকেরা ধরে নিত যে প্রণবকাকু আমার বাবা এবং মা তাঁর স্ত্রী।

আমি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, মা প্রণবকাকুকে ভালবাসতেন। প্রণবকাকু যেভাবে দেবরসুলভ সরল স্নেহ দিয়ে মায়ের মন জয় করে নিয়েছিলেন, তেমন আর কেউ করেনি। আমার কাছে তিনি ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারেরই এক সদস্য, কাকা এবং বয়সে অনেক বড় কোনও দাদার মাঝামাঝি কেউ। কারণ, একদিক দিয়ে, মা-বাবা তাঁকে তেমনভাবেই আশ্রয় দিতেন এবং যত্ন করতেন, যেমন তাঁরা আমার যত্ন করতেন। প্রণবকাকু বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন। পশ্চিমে জীবন গড়ে তোলা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, চাকরি পাওয়া এবং কিসিঙ্গার ও ওয়াটারগেট নিয়ে মতামত পোষণের ব্যাপারে বাবার উপদেশ নিতেন। কখনও সখনও, মা তাঁকে মেয়েদের নিয়ে খেপাতেন। এমআইটি-তে ভারতীয় ছাত্রীদের কথা জিজ্ঞেস করতেন বা ভারতে মায়ের বোনটোনদের ফোটো দেখাতেন। "একে কেমন লাগছে?" মা জিজ্ঞেস করতেন। "সুন্দর না?" মা জানতেন যে, তিনি কখনও প্রণবকাকুকে নিজের করে পাবেন না। হয়তো তিনি চাইতেন যে, প্রণবকাকু অন্তত তাঁর পরিবারের মধ্যেই থাকুন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল যে, প্রথমদিকে প্রণবকাকু সম্পূর্ণভাবে মায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সেইসব মাসগুলোয় তাঁর মাকে এমনভাবে প্রয়োজন ছিল, যেভাবে প্রয়োজন মা-বাবার গোটা বিবাহিত জীবনে বাবার কখনও হয়নি। তিনিই মাকে প্রথম আনন্দ, এবং আমার মনে হয় জীবনের একমাত্র নির্ভেজাল আনন্দ এনে দিয়েছিলেন। এমনকী আমার জন্মের সময়ও মা অত খুশি হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। আমি ছিলাম মা এবং বাবার বিবাহিত জীবনের প্রমাণ। যে জীবনটার জন্য মাকে মানুষ করা হয়েছিল, সেই জীবনের পূর্ব-নির্ধারিত পরিণতি। কিন্তু প্রণবকাকু ছিলেন মায়ের জীবনের একমাত্র, সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত খুশির উৎস।

১৯৭৪ সালের হেমন্তে, র‍্যাডক্লিফে প্রণবকাকুর ডেবোরা নামে এক আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি প্রণবকাকুর সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসা শুরু করলেন। মা-বাবার মতো আমিও ডেবোরাকে নাম ধরে ডাকতাম, কিন্তু প্রণবকাকু তাঁকে শিখিয়েছিলেন বাবাকে 'শ্যামলদা' এবং মাকে 'বউদি' বলে ডাকতে। ডেবোরা সানন্দে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমবার তাঁরা ডিনারে আসার আগে যখন মা লিভিং রুমটা গুছিয়ে রাখছিলেন, আমি মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁকে 'ডেবোরা কাকিমা' বলে ডাকব কি না। "দরকারটা কী?" মা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললেন। "কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব মজা শেষ হয়ে যাবে আর মেয়েটা প্রণবকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেড়ে চলে যাবে।" কিন্তু ডেবোরা প্রণবকাকুর সঙ্গেই রয়ে গেলেন, মা-বাবা এবং প্রণবকাকু যে উইকেন্ড-পার্টিগুলোতে যেতেন, সেখানে যেতেন। সেইসব পার্টিতে তিনি ছাড়া বাকি সকলেই ছিলেন খাঁটি বাঙালি। ডেবোরা খুব লম্বা ছিলেন, মা-বাবা দু'জনের চেয়েই বেশি, প্রণবকাকুর প্রায় মাথায় মাথায়। তাঁর লম্বা, তামাটে চুলে মধ্যিখানে সিঁথি কাটা, মার মতো। কিন্তু মা বিনুনি করতেন, আর ডেবোরা পনিটেল বাঁধতেন। কখনও তাঁর চুল এলোমেলোভাবে কাঁধ এবং পিঠের ওপর এমনভাবে ছড়িয়ে থাকত, যা মায়ের দৃষ্টিকটু মনে হত। ডেবোরা ছোট রুপোলি চশমা পরতেন আর একবিন্দুও মেকআপ ব্যবহার করতেন না। তিনি দর্শন পড়তেন। আমার ডেবোরাকে অত্যন্ত সুন্দরী মনে হত, কিন্তু মায়ের বক্তব্য অনুযায়ী ডেবোরার মুখে দাগ ছিল এবং নিতম্ব বড্ড সরু ছিল।

কিছুদিন প্রণবকাকু সপ্তাহে একবার একা ডিনার খেতে আসা চালিয়ে গেলেন। বেশিরভাগ সময় মাকে জিজ্ঞেস করতেন, মায়ের ডেবোরাকে কেমন লাগে। মায়ের সম্মতির আশায় বলতেন, ডেবোরার মা-বাবা বস্টন কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁর বাবার লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, মা-বাবা দু'জনেরই পিএইচডি আছে। প্রণবকাকু না থাকলে মা ডেবোরার আমাদের বাড়িতে আসা নিয়ে অনুযোগ করে বলতেন তাঁর জন্য খাবারে মশলা কম দিতে হয়। যদিও ডেবোরা বলেছিলেন, তাঁর মশলাদার খাবার ভাল লাগে। ডেবোরা থাকলে ডালে মাছের মুড়ো দিতে মায়ের অস্বস্তি হত। প্রণবকাকু ডেবোরাকে 'খুব ভাল' এবং 'আচ্ছা' বলতে শিখিয়েছিলেন। কয়েকটি বিশেষ খাবার কাঁটা-চামচের বদলে হাত দিয়ে খেতে শিখিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁরা পরস্পরকে খাইয়ে দিতেন। পরস্পরের মুখ থেকে আঙুল সরিয়ে নিতে বিলম্ব করতেন। সেইসব সময়ে মা-বাবা নিজেদের প্লেটের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তটা পেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করতেন। বেশি লোকজনের মাঝে থাকলে, তাঁরা সর্বসমক্ষেই হাত ধরাধরি করে চুমু খেতেন। তাঁরা আশপাশে না থাকলে মা অন্যান্য বাঙালি মহিলাদের বলতেন, "ছেলেটা একদম অন্যরকম ছিল। বুঝতে পারি না কী করে একটা মানুষ এত বদলে যায়। একদম পাতাল-আকাশ তফাত।" মা সবসময় উপমাটা ইংরেজিতে উলটো করে বলতেন।

মা যত ডেবোরার আসাতে অসন্তুষ্ট হতেন, আমি তত বেশিই তাঁর

AMARBOI.COM

অপেক্ষায় থাকতাম। আমি ডেবোরার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম, যেভাবে অনেক ছোট মেয়েই তাদের মা ছাড়া অন্য কোনও মহিলার প্রেমে পড়ে যায়। ডেবোরার শান্ত ধূসর চোখ, তাঁর পঞ্চো, ডেনিম র‍্যাপ স্কার্ট, চটি এবং তাঁর সোজা সোজা চুল, যা তিনি আমাকে ইচ্ছেমতো কায়দায় বাঁধতে দিতেন, সেসব ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমার খুব ইচ্ছে হত তাঁর মতো সহজ, সাদাসিধে পোশাক পরতে। কোথাও নিমন্ত্রণ থাকলেই মা আমাকে জোর করে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা, প্রায় ভিক্টোরিয়ান কায়দার জামা পরাতেন। তিনি সেগুলোকে ম্যাক্সি বলতেন। চুলটা পার্টির কায়দায় বাঁধতে হত, অর্থাৎ দু'দিক থেকে দু'গাছি চুল নিয়ে পিছনে একটা ব্যারেট-ক্লিপ দিয়ে বাঁধা। পার্টিতে ডেবোরা কোনও একসময় ভদ্র অজুহাত দেখিয়ে সরে আসতেন। বাকি বাঙালি মহিলারা, যাঁদের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে হত, তাঁরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। ডেবোরা তখন আমার সঙ্গে খেলতেন। মা-বাবার সব বন্ধুদের ছেলেমেয়েদের চেয়ে আমি বয়সে বড় ছিলাম কিন্তু ডেবোরা আমার বন্ধু ছিলেন। আমি যেসব বই পড়তাম, তিনি সেগুলো সম্পর্কে সবকিছু জানতেন, 'পিপি লংস্টকিং', 'অ্যান অফ গ্রিন গেবল্‌স'। তিনি আমাকে যত দামি উপহার দিতেন, সেসব আমার মা-বাবা কেনার কথা ভাবতেও পারতেন না, সামর্থ্যও ছিল না। গ্রিম্‌স ফেয়ারি টেলস-এর একটা বিশাল বড় বই যার মোটা, সিল্কের মতো পাতায় জলরঙে ছবি আঁকা ছিল। আর সুতোর তৈরি কেতাদুরস্ত চুলওয়ালা কাঠের পুতুল। তিনি আমাকে নিজের পরিবারের কথা বলতেন। তিনজন দিদি এবং দু'ভাই। আর তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট, তার বয়স ছিল আমার বয়সের কাছাকাছি। একবার, তাঁর মা-বাবার কাছ থেকে ঘুরে আসার পর, ডেবোরা তিনটে ন্যান্সি ড্রু-এর বই নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলোর প্রথম পাতায় মেয়েলি হাতে ডেবোরার নাম লেখা। একটি পুরনো খেলনাও এনেছিলেন। একটা ছোট কাগজের তৈরি থিয়েটার সেট যার প্রেক্ষাপট পালটানো যেত। সেইটা একটা প্রাসাদের বহির্ভাগ, একটা বলরুম এবং একটা খোলা মাঠ। ডেবোরা এবং আমি স্বচ্ছন্দে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতাম। ততদিনে আমি বাংলার চেয়ে ইংরেজিতেই বেশি ভাল করে মনের কথা বলতে পারতাম। যদিও বাড়িতে আমাকে বাংলায় কথা বলতে হত। মাঝে মাঝে ডেবোরা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন অমুক কথাটা বাংলায় কী বলে। একবার, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, 'অসভ্য' মানে কী। আমি ইতস্তত করে বলেছিলাম যে, খুব দুষ্টুমি করলে মা আমাকে অসভ্য বলেন। ডেবোরার মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে বাঁচাতে চাইতাম এসব থেকে। জানতাম যে, তিনি অবাঞ্ছিত। বাকিরা তাঁকে বিদ্বেষের চোখে দেখেন, তাঁকে নিয়ে কটু কথা বলেন।

তারপর থেকে, ভোক্সওয়াগনে চেপে আমরা চারজনেই বেড়াতে যেতাম। ডেবোরা সামনে বসতেন। প্রণবকাকু গিয়ারশিফটের ওপর হাত রাখলে, ডেবোরার হাত তাঁর হাতের ওপর রাখা থাকত। মা এবং আমি পিছনে বসতাম। কিছুদিনের মধ্যেই, মা নানা অজুহাতে বেরোতে আপত্তি করতে শুরু করলেন, মাথা ধরা, উপক্রমিক সর্দি-জ্বর ইত্যাদি। আর তাই আমি এক নতুন ত্রিভুজের অংশ হয়ে গেলাম। অবাক লাগত যে, মা আমাকে ওঁদের দু'জনের সঙ্গে বেড়ানোর অনুমতি দিতেন— মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস, পাবলিক গার্ডেন, অ্যাকোয়ারিয়াম। মা ওঁদের সম্পর্ক শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। কবে ডেবোরা প্রণবকাকুকে ত্যাগ করবেন এবং প্রণবকাকু মর্মাহত এবং অনুতপ্ত হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পর্ক ভাঙার কোনও পূর্বাভাসই পাইনি। তাঁরা তাঁদের ভালবাসা গোপন করতেন না, সহজেই নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করতেন। তাঁদের সম্পর্ক, তাঁদের আচরণ আমার কাছে নতুন এবং রোমান্টিক মনে হত। আমি পিছনের সিটে বসে থাকায় প্রণবকাকু এবং ডেবোরা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অভ্যস্ত হতে পারতেন। তাঁদের নিজস্ব পরিবার হলে কেমন লাগবে, কল্পনা করতে পারতেন। আমার ডেবোরার সঙ্গে অসংখ্য ফোটো তোলা হয়েছিল। আমি ডেবোরার কোলে বসে আছি, হাত ধরে আছি, গালে চুমু খাচ্ছি। ডেবোরা এবং আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলে আমার মনে হত যেন, সেই হাসিতে আমাদের কোনও গোপন কথা লুকিয়ে আছে। তখন মনে হত যেন পৃথিবীতে অন্য কারও চেয়ে ডেবোরাই আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাল বোঝেন। অন্য কেউ হলে বলতেন যে, ডেবোরা একদিন খুব ভাল মা হবেন। কিন্তু মা তা স্বীকার করতেন না। তখন আমি জানতাম না যে, মা আমাকে প্রণবকাকু এবং ডেবোরার সঙ্গে বেরোনোর অনুমতি দিতেন কারণ, আমি জন্মানোর পর থেকে শুরু করে পঞ্চমবার মা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন এবং তিনি এতই অসুস্থ ও বিধ্বস্ত ছিলেন যে আর-একটি সন্তান হারানোর ভয়ে ভয়ে থাকতেন। দিনের বেশিরভাগ সময়টাই ঘুমিয়ে কাটাতেন। দশ সপ্তাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর, মায়ের আবার গর্ভপাত হয়েছিল। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তাঁর আর গর্ভবতী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়।

গ্রীষ্মের মধ্যে ডেবোরার বাঁ হাতে একটি হিরের আংটি দেখা গেল। মাকে কখনও তেমন আংটি দেওয়া হয়নি। তাঁর নিজের পরিবার বহু দূরে থাকত বলে, প্রণবকাকু একদিন একা আমাদের বাড়িতে আসলেন, ডেবোরাকে আংটিটা দেওয়ার আগে আমার মা-বাবার আশীর্বাদ নিতে। বাক্সটা আমাদের দেখালেন, সেটা খুলে হিরেটা বের করে আনলেন। "আঙুলে পরলে কেমন লাগে দেখি," বলে তিনি মাকে আংটিটা পরার অনুরোধ করলেন। কিন্তু মা রাজি হলেন না। আমিই হাত বাড়িয়ে দিলাম। আঙুলে আংটিটার ভার অনুভব করলাম। এবার প্রণবকাকু তাঁর দ্বিতীয় ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। মা-বাবা যেন প্রণবকাকুর মা-বাবাকে চিঠি লিখে জানান যে, তাঁরা ডেবোরাকে দেখেছেন এবং তাঁদের খুব পছন্দও হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একজন আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করতে চান, এই খবরটা নিজের মা-বাবাকে জানাতে তাঁর নার্ভাস লাগছিল। তিনি মা-বাবাকে আমাদের ব্যাপারে সবকিছুই জানিয়েছিলেন। একবার আমার মা-বাবা তাঁদের কাছ থেকে একটা চিঠিও পেয়েছিলেন, ছেলের যত্ন নেওয়া এবং আমেরিকায় তাঁকে একটা যথাযথ আশ্রয় দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। "বেশি কিছু লিখতে হবে না," প্রণবকাকু বললেন, "মাত্র কয়েক লাইন। আপনারা লিখলে মা-বাবা একটু সহজে মেনে নিতে পারবেন।" বাবা ডেবোরাকে পছন্দও করতেন না, অপছন্দও করতেন না, তবে মায়ের মতো মন্তব্য বা সমালোচনা করতেন না। কিন্তু তিনি প্রণবকাকুকে আশ্বাস দিলেন যে, সেই সপ্তাহের মধ্যেই তাঁদের সম্মতিজ্ঞাপক চিঠি কলকাতার পথে পাড়ি দেবে। মা-ও ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। কিন্তু পরের দিন আমি দেখেছিলাম যে, এতদিন প্রণবকাকু যে চায়ের কাপটা অ্যাশট্রে হিসেবে ব্যবহার করতেন, সেটা টুকরো টুকরো হয়ে রান্নাঘরের ডাস্টবিনে পড়ে আছে আর মায়ের হাতে তিনটে ব্যান্ড-এড লাগানো।

একমাত্র ছেলে এক আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করবে ভেবে প্রণবকাকুর মা-বাবা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পর গভীর রাত্রে আমাদের ফোন বেজে উঠল। মি. চক্রবর্তী বাবাকে ফোন করে জানালেন যে, তাঁরা কোনওমতেই এ বিয়েতে তাঁদের মত বা আশীর্বাদ দিতে পারবেন না।

AMARBOI.COM

কোনও প্রশ্নই ওঠে না। প্রণবকাকু যদি ডেবোরাকে বিয়ে করার স্পর্ধা দেখান, তা হলে মি. চক্রবর্তী তাঁকে আর নিজের ছেলে বলে স্বীকার করবেন না। তারপর তাঁর স্ত্রী মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। মাকে এমনভাবে আক্রমণ করলেন যেন তাঁরা ঘনিষ্ঠ। সম্পর্কটা বেড়ে উঠতে দেওয়ার জন্য মা'র ওপর দোষারোপ করলেন। তাঁরা নাকি প্রণবকাকুর জন্য কলকাতায় মেয়ে দেখে রেখেছেন। প্রণবকাকু আমেরিকায় এসেছিলেন এই শর্তেই যে, পড়াশোনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি ফিরে গিয়ে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করবেন। তাঁদের বাড়ির পাশের ফ্ল্যাটটা প্রণবকাকু এবং তাঁর ভাবী বউয়ের জন্য কিনে রেখেছেন। সেই ফ্ল্যাট প্রণবকাকুর ফেরার অপেক্ষায় ফাঁকা পড়ে আছে। "আমরা ভেবেছিলাম যে, আপনাদের ওপর ভরসা করতে পারব। আপনারা এইভাবে আমাদের বিশ্বাসভঙ্গ করলেন?" প্রণবকাকুর মা নিজের ছেলের ওপর যে রাগ প্রকাশ করতে পারছিলেন না, তা এক অপরিচিত মহিলার ওপর উগরে দিলেন। "আমেরিকায় কি লোকজনের সঙ্গে এই হয়?" প্রণবকাকুর খাতিরে মা সম্পর্কটার পক্ষে কথা বললেন। বললেন যে, ডেবোরা এক ভাল ঘরের ভদ্রসভ্য মেয়ে। প্রণবকাকুর মা-বাবা আমার মা-বাবাকে মিনতি করলেন কাকুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সম্পর্কটায় ইতি টানার জন্য। কিন্তু বাবা রাজি হলেন না। তাঁর মনে হল যে, তাঁদের এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। "আমরা তো ওর মা-বাবা নই," বাবা মাকে বললেন। "আমরা প্রণবকে বলতে পারি যে, ওর মা-বাবা রাজি হচ্ছেন না। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারি না।" তাই মা-বাবা প্রণবকাকুকে শুধু এইটুকুই বললেন যে, তাঁর মা-বাবা তাঁদের আশীর্বাদ দিতে সম্মত হননি। তাঁর মা-বাবা কীভাবে তীব্র ভৎর্সনা করেছেন, দোষারোপ করেছেন, প্রণবকাকুকে ত্যাজ্যপুত্র করার হুমকি দিয়েছেন, সেসব কিছুই বললেন না। এই অসম্মতি শুনে প্রণবকাকু কাঁধ ঝাঁকালেন। "আমার কিছু এসে যায় না। সকলে তো আর আপনাদের মতো খোলা মনের নয়," তিনি মা-বাবাকে বললেন। "আপনাদের আশীর্বাদই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

এনগেজমেন্টের পর প্রণবকাকু এবং ডেবোরা আস্তে আস্তে আমাদের জীবন থেকে দূরে সরে গেলেন। তাঁরা বস্টনের সাউথ এন্ড-এ একটা অ্যাপার্টমেন্টে একসঙ্গে থাকতে শুরু করলেন। শহরের সেই অংশটা মা-বাবা নিরাপদ মনে

AMARBOI.COM

করতেন না। আমরাও ইতিমধ্যে ঠিকানা পালটে নাটিকের একটা বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। যদিও এই বাড়িটা মা-বাবা কিনেছিলেন, তবুও তাঁরা সেখানে ভাড়াটের মতোই থাকতেন। দেওয়ালের ছোপ ছোপ দাগ বেঁচে থাকা রং দিয়ে ঢাকতেন। দেওয়ালে কোনও ফুটো করতে চাইতেন না। রোজ দুপুরে লিভিং রুমের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়লে মা জানলা বন্ধ করে দিতেন যাতে আমাদের নতুন আসবাব বিবর্ণ না হয়ে যায়। বিয়ের কয়েক সপ্তাহ আগে মা-বাবা প্রণবকাকুকে একা আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর আইবুড়ো ভাত উপলক্ষে মা বিশেষ বিশেষ খাবার তৈরি করলেন। সেটাই ছিল সেই বিয়ের একমাত্র বাঙালি আচার অনুষ্ঠান। বাকি অনুষ্ঠানের গোটাটাই আমেরিকান। কেক, মিনিস্টার, ডেবোরার পরনের একটি লম্বা, সাদা পোশাক এবং অবগুণ্ঠন। বাবা সেই আইবুড়োভাতের একটা ফোটো তুলেছিলেন। আমার ধারণা, সেটাই একমাত্র ফোটো যেখানে মা এবং প্রণবকাকুকে একসঙ্গে দেখা যায়। ছবিটা সামান্য ঝাপসা। মনে আছে, প্রণবকাকু বাবাকে বোঝাচ্ছিলেন, কী করে ক্যামেরাটা ব্যবহার করতে হয়। তাই ফোটোতে তিনি রান্নাঘরের টেবিল এবং তাঁর জন্য মায়ের তৈরি করা ষোড়শ ব্যঞ্জন থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখ হাঁ করা, লম্বা হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করছেন। বাবাকে বলছেন কী করে লাইট মিটার পড়তে হয় বা সেরকম কিছু। মা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আশীর্বাদ দেওয়ার ভঙ্গিতে তাঁর মাথায় একটা হাত রেখে। জীবনে সেই প্রথম এবং শেষবার মা প্রণবকাকুকে স্পর্শ করেছিলেন। "মেয়েটা ওকে ছেড়ে দেবে," মা পরে নিজের বন্ধুদের বলেছিলেন। "ছেলেটা নিজের জীবনটা নষ্ট করছে।"

বিয়েটা হল ইন্সউইচের এক গির্জায়, রিসেপশন একটা কান্ট্রি ক্লাব-এ। কথা ছিল যে, অনুষ্ঠানটা খুব ছোট করে হবে। মা-বাবা ধরে নিয়েছিলেন যে, তার মানে তিন-চারশোর জায়গায় দু'-একশো নিমন্ত্রিত থাকবেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ত্রিশও নয় দেখে মা অত্যন্ত বিস্মিত এবং অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। ততদিনে যতজন বাঙালির সঙ্গে প্রণবকাকুর আলাপ হয়েছিল, তাদের মধ্যে শুধু আমাদেরই তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন দেখেও, মা সম্মানিত বোধ করার চেয়ে বেশি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। অন্যান্য অতিথিদের মতো আমরাও বিয়ের সময় গির্জার শক্ত, কাঠের বেঞ্চিতে এবং লাঞ্চের সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা লম্বা টেবিলে বসলাম। যদিও সেদিন প্রণবকাকুর পরিবার বলতে আমরাই উপস্থিত ছিলাম, তবুও কান্ট্রি ক্লাব-এ ডেবোরার মা-বাবা, দাদু-ঠাকুমা এবং অনেক ভাইবোনের সঙ্গে তোলা গ্রুপ ফোটোর একটাতেও আমরা নেই। মা-বাবা কেউই 'টোস্ট' দিতে ওঠেননি। মা-বাবা গোরুর মাংস খান না বলে ডেবোরা ফিলে মিনিয়নের বদলে তাঁদের জন্য মাছের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু মা এই যত্নের কদর করলেন না। তিনি ক্রমাগত বাংলায় কথা বলছিলেন, বাহ্যিক নিয়মকানুনের বাড়াবাড়ি নিয়ে অভিযোগ করছিলেন। প্রণবকাকু সেদিন একটা টাক্সিডো পরেছিলেন। তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাঁধে হেলান দিয়ে টেবিলের চক্কর কাটতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে আমাদের সঙ্গে প্রায় কোনও কথাই বলেননি। তাই নিয়েও মা অভিযোগ করছিলেন। স্বভাবতই, বাবা মায়ের মন্তব্যের কোনও উত্তর দিচ্ছিলেন না। নিয়মমতো নিজের খাবার শেষ করছিলেন। তাঁর কাঁটাচামচ মাঝে মাঝে চায়না প্লেটের ওপর আওয়াজ করছিল, কারণ, বাবা হাত দিয়ে খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। নিজের প্লেট শেষ করে তিনি মায়েরটাও শেষ করলেন, কারণ খাবারটা মায়ের অখাদ্য মনে হয়েছিল। তারপর বাবা বললেন বড্ড বেশি খেয়ে ফেলেছেন এবং তাঁর পেট ব্যথা করছে। একবারই মা চেষ্টা করে একটু হেসেছিলেন, যখন ডেবোরা মায়ের চেয়ারের পিছনে এসে তাঁর গালে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা ভাল করে সময় কাটাচ্ছি কি না।

নাচ শুরু হওয়ার পর মা-বাবা টেবিলেই বসে থাকলেন। চা খেলেন। আমি ঘরের অন্য প্রান্তে প্রণবকাকু এবং ডেবোরা এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নাচছিলাম। দু'-তিনটে গানের পর মা-বাবা বাড়ি ফিরতে চাইলেন। মা তেমনই ইঙ্গিত করে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি থাকতে চাইছিলাম। অনিচ্ছা সহকারে মা-বাবার কাছে আসার সময় ডেবোরাও আমার পিছন পিছন এলেন। "বউদি, ঊষাকে থাকতে দিন না। ও কত মজা করছে," তিনি মাকে বললেন। "অনেকেই আপনাদের ওদিকে ফিরবে। কিছুক্ষণ পরেই কেউ না হয় ওকে বাড়িতে নামিয়ে দেবে।" কিন্তু মা বললেন, না, অনেক মজা করা হয়েছে। এবং জোর করে আমার ফোলা-হাতা পার্টির জামার ওপর কোট পরিয়ে দিলেন। বাড়ি ফেরার পথে জীবনে প্রথমবার, যদিও শেষবার নয়, আমি মাকে বললাম যে, আমি তাঁকে ঘৃণা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের বছর আমরা চক্রবর্তীদের কাছ থেকে একটা সুখবর পেলাম। দু'জন যমজ মেয়ের একটি ফোটো। মা সেটা কোনও অ্যালবামে আটকালেন না বা ফ্রিজের দরজায় লাগিয়ে রাখলেন না। মেয়েদের নাম রাখা হয়েছিল শ্রাবণী এবং সাবিত্রী। কিন্তু তাদের বনি এবং সারা বলেই ডাকা হত। বিয়ের উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটা কার্ড ছাড়া সেটাই তাঁদের পাঠানো একমাত্র বার্তা। মার্বেলহেডে তাঁদের নতুন বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ করা হয়নি। বাড়িটা প্রণবকাকু স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার-এ একটা ভাল মাইনের চাকরি পাওয়ার পর কিনেছিলেন। কিছুদিন মা-বাবা এবং তাঁদের বন্ধুরা তাঁদের আসরে চক্রবর্তীদের নিমন্ত্রণ করা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা কখনওই আসতেন না বা আসলেও ঘণ্টাখানেক থেকেই চলে যেতেন, একসময় তাঁদের নিমন্ত্রণ করা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মা-বাবা এবং তাঁদের বন্ধুরা এই অনুপস্থিতির জন্য ডেবোরাকেই দায়ী করতেন। সকলেই একমত হয়েছিলেন যে, ডেবোরা প্রণবকাকুকে শুধু তাঁর শিকড় থেকেই নয়, তাঁর স্বাধীনতাও কেড়ে নিয়েছেন। ডেবোরাই ছিলেন শত্রুপক্ষ, প্রণবকাকু তাঁর শিকার। মিশ্র বিবাহের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি যে অনিবার্য, প্রমাণস্বরূপ তাঁদের উদাহরণ দেওয়া হত। কখনও সখনও প্রণবকাকু এবং ডেবোরা কোনও পুজোয় কয়েক ঘণ্টার জন্য উপস্থিত হয়ে সকলকে অবাক করে দিতেন। তাঁদের ছোট্ট যমজ মেয়েদের চেহারায় প্রায় কোনও বাঙালিত্ব ছিল না। তারা শুধু ইংরেজিতেই কথা বলত। আমার বা অন্যান্য পরিচিত ছেলেমেয়েদের চেয়ে অন্যরকমভাবে তাদের মানুষ করা হচ্ছিল। তাদের প্রতি গ্রীষ্মে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হত না। তাদের মা-বাবা অন্য এক দেশের জীবনযাত্রা আঁকড়ে ছিলেন না বা তাদেরও সেই জীবনযাপন করতে জোর করতেন না। ডেবোরার জন্যই, তারা সেসবের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। আর সেই কারণেই, তাদের দেখে আমার ঈর্ষা হত। "উষা, কত বড় হয়ে গিয়েছ। কত সুন্দর হয়ে গিয়েছ," আমার সঙ্গে ডেবোরার দেখা হলেই তিনি এই কথা বলতেন। এক মুহূর্তের জন্য হলেও, আমাদের পুরনো বন্ধুত্ব আবার জেগে উঠত। ততদিনে তিনি তাঁর সুন্দর লম্বা চুল কেটে ববকাট করে ফেলেছিলেন। "শিগগিরই তুমি বেবিসিট করার মতো বড় হয়ে যাবে," তিনি বলতেন। "তখন আমি তোমাকে আসতে বলব— মেয়েদের খুব ভাল লাগবে।" কিন্তু তিনি কখনও আমাকে ডাকেননি।

AMARBOI.COM

আমি শৈশব থেকে কৈশোরে পৌঁছলাম। মিডল স্কুলে ভর্তি হলাম এবং ক্লাসের আমেরিকান ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করলাম। সেইসব আকর্ষণের যদিও কোনও অর্থ ছিল না। ডেবোরা আমার প্রশংসা করলেও, সেই বয়সে আমি তেমন আকর্ষণীয় ছিলাম না। কিন্তু মায়ের নিশ্চয়ই কিছু খটকা লেগে থাকবে। কারণ, প্রতি মাসের শেষ শুক্রবার স্কুল ক্যাফেটেরিয়ায় যে নাচ হত, মা আমাকে সেখানে যেতে বারণ করে দিলেন। আমার ডেট-এ যাওয়ার অনুমতি ছিল না। এটা ছিল অব্যক্ত আইন। "ভাবিস না যে, তুই কোনও আমেরিকানকে বিয়ে করে পার পেয়ে যাবি, যেমন তোর প্রণবকাকু করেছে," মা মাঝে মাঝে বলতেন। তখন আমার বয়স মাত্র তেরো, বিয়ে ব্যাপারটাই আমার জীবনে অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তবুও, মায়ের কথা আমাকে বিচলিত করত। মনে হত মা আমাকে আরও শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরছেন। মা প্রচণ্ড রেগে যেতেন আমি যখন বললাম যে, আমি ব্রা পরা শুরু করতে চাই, অথবা কোনও বন্ধুর সঙ্গে হার্ভার্ড স্কোয়ারে যেতে চাই। তর্ক করতে করতে তিনি অনেক সময় নিজের সরাসরি বিপরীত হিসেবে ডেবোরার উদাহরণ টানতেন যেরকম মহিলা হতে মা রাজি নন। "ও যদি তোর মা হত, তা হলে তোকে যা খুশি তাই করতে দিত। কারণ ওর কিছু এসে যেত না। তুই কি তাই চাস, ঊষা? এমন মা, যার তোর কী হল তাতে কিছু এসে যায় না?" নবম শ্রেণির আগের গ্রীষ্মে, যখন আমার পিরিয়ডস শুরু হল, তখন মা আমাকে একটি লম্বা বক্তৃতা দিলেন। বললেন, আমি যেন কোনও ছেলেকে আমাকে স্পর্শ করতে না দিই। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী করে একজন মেয়ে গর্ভবতী হয় তা আমি জানি কি না। আমাদের বিজ্ঞান ক্লাসে যা শেখানো হয়েছে, মাকে বললাম। বললাম যে, শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষেক করে। তারপর মা জিজ্ঞেস করলেন যে, ঠিক কেমন করে সেটা হয়, তা-ও আমি জানি কি না। আমি মায়ের চোখে আতঙ্ক টের পেয়েছিলাম। তাই যদিও আমি প্রজননের সেই অংশটুকু সম্বন্ধেও জ্ঞাত ছিলাম, তবুও বললাম যে, সেটা আমাদের বোঝানো হয়নি।

আমি মায়ের কাছ থেকে অনেক কথা গোপন রাখতে শুরু করলাম। বন্ধুদের সাহায্যে তাঁকে কৌশলে এড়িয়ে যেতাম। কোনও বন্ধুর বাড়ি রাত কাটাতে যাচ্ছি বলে পার্টিতে যেতাম। সেখানে বিয়ার খেতাম। সোফায় বা গাড়ির পিছনের সিটে শুয়ে পরস্পরের শরীর হাতড়াতে হাতড়াতে কোনও

AMARBOI.COM

ছেলে আমাকে চুমু খেলে, বুকে হাত বোলালে বা তার ঋজু অঙ্গ আমার পিছনে চেপে ধরলে বাধা দিতাম না। আমি মাকে করুণার চোখে দেখতে শুরু করলাম। যত বড় হচ্ছিলাম, স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম যে, মা কত নির্বান্ধব জীবনযাপন করেন। তিনি কখনও কোনও চাকরি করেননি। দিনেরবেলা সময় কাটানোর জন্য টিভি সিরিয়াল দেখতেন। রোজ তাঁর একমাত্র কাজ ছিল বাবা এবং আমার জন্য ঘরদোর, জামাকাপড় পরিষ্কার করা এবং রান্না করা। আমরা কদাচিৎ রেস্তোরাঁয় যেতাম। কোনও সস্তা রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেও বাবা সবসময় হিসেব করে দেখাতেন যে, বাড়িতে খাওয়ার তুলনায় বাইরে খাওয়া কত খরচসাপেক্ষ। মা যদি কখনও তাঁর কাছে অভিযোগ করতেন যে, শহরতলিতে জীবন কাটাতে মায়ের কত খারাপ লাগে বা নিজেকে কত একলা মনে হয়, তা হলে বাবা তাঁকে আশ্বস্ত করার কোনও চেষ্টা করতেন, না। উলটে বলতেন, "অত খারাপ লাগলে কলকাতায় ফিরে যাও।" পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিতেন যে, মা চলে গেলেও, বাবার কিছু এসে যায় না। বাবার দেখাদেখি আমিও মায়ের সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করতে শুরু করলাম। এবং তার ফলে তিনি দ্বিগুণ একা হয়ে পড়লেন। বেশিক্ষণ ফোনে কথা বলা বা নিজের ঘরে থাকার জন্য মা আমাকে বকাবকি করলে আমিও উলটে ঝগড়া করা শুরু করলাম। বলতাম, তিনি দিন দিন অসহ্য হয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আমরা দু'জনেই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার কাছে মায়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। ঠিক যেমন নিশ্চিত এবং আকস্মিকভাবে প্রণবকাকুর কাছে মায়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

তারপর, যে বছর আমি কলেজে গেলাম, তার আগের বছর থ্যাঙ্কসগিভিং-এ মা-বাবা এবং আমাকে চক্রবর্তীদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হল। আমরা একাই মা-বাবার কেমব্রিজের পুরনো পরিচিতদের দল থেকে নিমন্ত্রিত ছিলাম না। দেখা গেল যে, পুরনো দিনে যাঁদের সঙ্গেই প্রণবকাকু এবং ডেবোরার আলাপ ছিল, তাঁদের সকলকেই এক ধরনের রিইউনিয়নের জন্য ডাকা হয়েছে। সাধারণত মা-বাবা থ্যাঙ্কসগিভিং পালন করতেন না। একসঙ্গে বড়সড় ডিনার খেতে বসা এবং কিছু বিশেষ খাবার খাওয়া তাঁদের কাছে অর্থহীন মনে হত। তাঁরা দিনটাকে মেমোরিয়াল ডে বা ভেটারানস ডে— আমেরিকান ক্যালেন্ডারের অন্য যে-কোনও ছুটির দিনের মতোই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটাতেন। তবুও আমরা গাড়ি করে মার্বেলহেডে গেলাম। বাড়িটা দারুণ দেখতে। সামনের দিকটা পাথরের। নুড়ি বিছানো অর্ধচন্দ্রাকার ড্রাইভওয়েতে সার দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটলেই মহাসাগর। পথে আমরা ঠান্ডা, ঝকঝকে অতলান্তিকের তীরে অবস্থিত বন্দরটার পাশ দিয়ে এসেছিলাম। গাড়ি থেকে নামার পর গালপাখি এবং ঢেউয়ের শব্দ আমাদের আমন্ত্রণ জানাল। লিভিং রুমের বেশিরভাগ আসবাবপত্রই বেসমেন্টে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রধান টেবিলের সঙ্গে বাড়তি টেবিল যোগ করে বিশাল ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের আকারে সাজানো। ঢাকা দেওয়া টেবিলটার ওপর সাদা প্লেট, রুপোর বাসন এবং লাউয়ের খোলস দিয়ে তৈরি সেন্টারপিস। আমি চারদিকে ছড়ানো খেলনা এবং পুতুল, যে কুকুরগুলো লম্বা হলুদ চুল সবকিছুর ওপর পড়েছিল তাদের, এবং দেওয়ালে টাঙানো ও ফ্রিজের গায়ে আটকানো ডেবোরা, বনি এবং সারার একগাদা ফোটো দেখে চমৎকৃত হলাম। আমরা যখন পৌঁছোলাম তখন খাবার তৈরি হচ্ছিল। মা সবসময় এই দেরি দেখলেই ভুরু কোঁচকাতেন। রান্নাঘর একগাদা লোকজন, রান্নার গন্ধ এবং বিশাল বড় বড় নোংরা বাটিতে ভরতি হয়ে ছিল।

ডেবোরার পরিবারের সদস্যদের কথা আমাদের ক্ষীণভাবে মনে ছিল। তাঁদের আমরা বিয়েতে দেখেছিলাম। তাঁর মা-বাবা, ভাইবোন, ভাইয়ের বউ, ভগ্নিপতি, প্রেমিক, বাচ্চাকাচ্চা ইত্যাদি। তাঁর দিদিদের বয়স তিরিশের ঘরে, কিন্তু ডেবোরার মতো তাঁদেরও কলেজের ছাত্রী বলে চালানো যেত। তাঁরা জিনস, ক্লগজুতো এবং ফিশারম্যান সোয়েটার পরেছিলেন। তাঁর ভাই ম্যাটি, যার সঙ্গে আমি ডেবোরার বিয়েতে নেচেছিলাম, এখন অ্যামহার্স্ট-এ ফ্রেশম্যান। তার সবুজ চোখ দুটো পরস্পরের থেকে একটু দূরে বসানো, পাতলা বাদামি চুল। মুখ চট করে লাল হয়ে যাচ্ছিল। যে মুহূর্তে আমি ডেবোরার ভাইবোনদের রান্নাঘরে হাসিঠাট্টা করতে করতে তরিতরকারি কুটতে এবং হাতা নাড়তে দেখলাম, আমার মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হল। কারণ, বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে মা রীতিমতো চেঁচামেচি করে আমাকে একটা শালোয়ার-কামিজ পরতে বাধ্য করেছিলেন। আমি জানতাম যে, আমার পোশাক দেখে ওরা ধরে নেবে ওদের চেয়ে অন্যান্য বাঙালিদের সঙ্গেই আমার বেশি মিল। কিন্তু ডেবোরাই জোর করে আমাকে তাঁদের দলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেনে নিলেন। ম্যাটির সঙ্গে আমাকেও আপেলের খোসা ছাড়াতে বসিয়ে দিলেন। এবং মা-বাবার চোখের আড়ালে আমাকে বিয়ার খেতেও দেওয়া হল। রান্না হয়ে যাওয়ার পর আমাদের বলা হল কে কোথায় বসবেন। পর্যায়ক্রমিকভাবে ছেলেমেয়েদের বসতে হবে দেখে বাঙালিরা খুব একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলেন না। টেবিলের ওপর এক সারি ওয়াইনের বোতল রাখা ছিল। দুটো টার্কি পরিবেশন করা হল, একটা সসেজ দিয়ে ঠাসা, আর-একটা স্টাফিংবিহীন। খাবারগুলো দেখে আমার জিভে জল এসে গেল। কিন্তু আমি জানতাম যে, পরে, বাড়ি ফেরার পথে, মা অভিযোগ করবেন যে, সবকিছুই বিস্বাদ এবং একইরকম খেতে লেগেছে। কেউ একজন মাকে সামান্য ওয়াইন ঢেলে দিতে গেলে মা গ্লাসের ওপর হাত নাড়িয়ে বললেন, "অসম্ভব।"

জিন, ডেবোরার বাবা, প্রার্থনা করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং টেবিলের সকলকে পরস্পরের হাত ধরতে অনুরোধ করলেন। মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করলেন। "ডিয়ার লর্ড, উই থ্যাঙ্ক ইউ টুডে ফর দ্য ফুড উই আর অ্যাবাউট টু রিসিভ," তিনি শুরু করলেন। মা-বাবা পাশাপাশি বসে ছিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, তাঁরা অনুরোধ মেনে নিয়েছেন। বাবার বাদামি হাত আলতো করে মায়ের ফ্যাকাশে আঙুলগুলো ধরে আছে। আমি লক্ষ করলাম, ম্যাটি ঘরের অন্যদিকে বসে আছে এবং তার বাবা যখন প্রার্থনা করছিলেন, তখন সে আড়চোখে আমার দিকে তাকাল। সমস্বরে 'আমেন' বলার পর জিন তাঁর গ্লাস তুলে ধরে বললেন, "মাপ করবেন, কিন্তু কখনও ভাবিনি এই কথা বলার সুযোগ পাব— ভারতীয়দের সঙ্গে থ্যাঙ্কসগিভিং পালন করার আনন্দে।" মাত্র কয়েকজনই এই কথায় হাসলেন।

তারপর প্রণবকাকু উঠে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রণরক্ষা করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানালেন। পানীয়র প্রভাবে তিনি কিছুটা হালকা বোধ করছিলেন। একসময়ের শক্ত, পাকানো শরীর মুটিয়ে যেতে শুরু করেছিল। তিনি আবেগপ্রবণভাবে কেমব্রিজে তাঁর প্রথমদিনের কথা বলতে শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ মা এবং আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হওয়ার কথা তুললেন। অতিথিদের বললেন, কেমন করে তিনি সেই দুপুরে আমাদের পিছন পিছন হেঁটেছিলেন। সেই অতিথিরা, যাঁরা আমাদের চিনতেন না, সেই সাক্ষাতের বর্ণনা এবং প্রণবকাকুর মরিয়াভাবের কথা শুনে হেসে উঠলেন। প্রণবকাকু

AMARBOI.COM

ঘরের অন্য প্রান্তে, যেখানে মা বসে ছিলেন, সেখানে গিয়ে লম্বা হাত দিয়ে মায়ের কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন। এক মুহূর্তের জন্য মা উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। "এই ভদ্রমহিলা," প্রণবকাকু মাকে নিজের কাছে টেনে ঘোষণা করলেন, "এই ভদ্রমহিলাই আমেরিকায় আমার প্রথম থ্যাঙ্কসগিভিং পালন করেছিলেন। হতে পারে সেটা মে মাসের এক দুপুর ছিল, কিন্তু বউদির টেবিলে সেই প্রথম খাওয়াই আমার থ্যাঙ্কসগিভিং ছিল। সেদিন সেই খাবার না পেলে আমি কলকাতায় ফিরে যেতাম।" মা অপ্রতিভ হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর বয়স তখন আটত্রিশ, চুলে পাক ধরেছে। প্রণবকাকুর চেয়ে বেশি তাঁকে বাবার সমবয়সি মনে হচ্ছিল। স্থূল কটিরেখা সত্ত্বেও প্রণবকাকুর সুদর্শন চেহারা, ফুরফুরে মেজাজ বজায় ছিল। প্রণবকাকু টেবিলের অপর প্রান্তে, ডেবোরার পাশে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে ইতি টানলেন। "আর তেমন হলে আমার তো তোমার সঙ্গে দেখাই হত না ডার্লিং," বলে তিনি সকলের সামনেই ডেবোরার মুখচুম্বন করলেন। সকলে তুমুল হাততালি দিলেন, যেন আবার প্রণবকাকুর বিয়ের দিন ফিরে এসেছে।

টার্কির পর সকলকে আর-একটু ছোট কাঁটাচামচ দেওয়া হল। ডেবোরার দিদিরা বেয়ারার কায়দায় ছোট ছোট নোট-প্যাড-এ তিনটে বিভিন্ন রকমের পাইয়ের অর্ডার লিখে নিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর কুকুরদের হাঁটতে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। প্রণবকাকু তাদের নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। "বিচ-এ গিয়ে একটু হেঁটে আসলে কেমন হয়?" ডেবোরার পরিবারের সকলেই বললেন, দারুণ প্রস্তাব। বাঙালিরা কেউই যেতে চাইলেন না। তাঁরা তাঁদের চায়ের কাপ নিয়ে একসঙ্গে বসে থাকতে চাইছিলেন যাতে খাওয়ার সময় আমেরিকানদের সঙ্গে ভদ্রতার খাতিরে কথা বলার পর অবশেষে মন খুলে গল্প করতে পারেন। আমার পাশের চেয়ারটা খালি হয়ে গিয়েছিল। ম্যাটি এসে সেখানে বসে আমাকে হাঁটতে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে লাগল। আমি ইতস্তত করছিলাম। আমার জামাকাপড় এবং জুতো হাঁটতে বেরোনোর পক্ষে অসুবিধেজনক ছিল। আমাদের একসঙ্গে দেখে মায়ের নীরব ক্রোধও টের পাচ্ছিলাম। ম্যাটি বলল, "ডেব নিশ্চয়ই তোমাকে কিছু ধার দিতে পারবে।" তাই আমি ওপরে গেলাম। ডেবোরা আমাকে নিজের একজোড়া জিনস, একটা মোটা সোয়েটার এবং স্নিকার্স দিলেন যাতে আমাকে তাঁদের মতোই দেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামাকাপড় বদলানোর সময় ডেবোরা খাটের একধারে বসে রইলেন, যেন আমরা বান্ধবী। তারপর জিজ্ঞেস করলেন আমার কোনও প্রেমিক আছে কি না। আমি 'না' বলায় তিনি বললেন, "ম্যাটির তোমাকে ভাল লেগেছে।"

"ও কি তোমাকে বলেছে?"

"না, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।"

সেই খবরে উৎসাহিত হয়ে আমি নীচে গেলাম। জিনসটা যদিও আমাকে গুটিয়ে পরতে হয়েছিল, সেগুলো পরে অবশেষে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম। লক্ষ করলাম, মা তাঁর চায়ের কাপ থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। আমি প্রণবকাকু, তাঁর কুকুর এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে বেরিয়ে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে কয়েকটা কাঠের খাড়া ধাপ নেমে জলের কাছে গেলাম। ডেবোরা এবং তাঁর এক দিদি থেকে গেলেন, পরিষ্কার করা শুরু করতে এবং যাঁরা থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের খেয়াল রাখতে। প্রথমে আমরা সকলে একসঙ্গেই হাঁটছিলাম, বালির ওপর একটি সারি বেঁধে। কিন্তু তারপর লক্ষ করলাম, ম্যাটি ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়েছে। তাই আমরা দু'জনে সকলের পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ অন্যদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বাড়তে থাকল। চটুল ঠাট্টা-ইয়ারকি করছিলাম। সেসব কথা এখন আর মনে নেই। শেষে আমরা ঘুরতে ঘুরতে একটা পাথুরে খাঁড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম, ম্যাটি পকেট থেকে একটা মারিজুয়ানার সিগারেট বের করল। আমরা হাওয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে সিগারেটটা ভাগ করে খেলাম। আমাদের ঠান্ডা আঙুলগুলো পরস্পরকে স্পর্শ করছিল। সিগারেটটার একই অংশে দু'জনের ঠোঁট চেপে রেখেছিলাম। প্রথমে আমি কোনও প্রভাব বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু তারপর, ম্যাটি যখন তার ব্যান্ডের কথা বলছিল, তখন বুঝতে পারলাম যে, তার গলাটা যেন অনেক মাইল দূর থেকে ভেসে আসছে। আর যদিও ম্যাটি এমন কিছু হাসির কথা বলছিল না, তাও আমার খুব হাসি পাচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন আমরা বাকিদের থেকে আলাদা হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যখন আমরা বালিতে ফিরে গেলাম, তখনও অন্যদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সূর্যাস্ত দেখার জন্য একটি অন্তরীপের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

যতক্ষণে আমরা সকলে বাড়ি ফিরলাম, সন্ধে নেমে এসেছিল। নেশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটার আগে আমি মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু ফেরার পর ডেবোরা বললেন যে, মা বাবা ক্লান্ত বোধ করছিলেন বলে বাড়ি চলে গিয়েছেন। পরে অন্য কেউ আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। আগুন জ্বালানো হয়েছিল। আমাকে বিশ্রাম নিতে এবং আরও পাই খেতে বলা হল। পড়ে থাকা খাবার-দাবার সরিয়ে, লিভিং রুমটা আস্তে আস্তে আগের মতো করে গুছিয়ে ফেলা হল। বলাই বাহুল্য, ম্যাটিই আমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিল। মা-বাবার ড্রাইভওয়েতে গাড়ির ভিতর বসে আমরা চুমু খেলাম। আমার একইসঙ্গে রোমাঞ্চ এবং আতঙ্ক হচ্ছিল যে, মা তাঁর নাইটগাউন পরে লনে বেরিয়ে এলে আমাদের দেখতে পেয়ে যাবেন। আমি ম্যাটিকে আমার ফোন নম্বর দিলাম। কয়েক সপ্তাহ আমি অবিরাম তার কথা ভাবতাম এবং বোকার মতো আশা করতাম যে, সে আমাকে ফোন করবে।

শেষে মায়ের কথাই সত্যি প্রমাণিত হল। সেই থ্যাঙ্কসগিভিং-এর চোদ্দো বছর পর এবং বিয়ের তেইশ বছর পর, প্রণবকাকু এবং ডেবোরার ডিভোর্স হয়ে গেল। প্রণবকাকুই পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন। একজন বিবাহিত বাঙালি মহিলার প্রেমে পড়ে একসঙ্গে দুটি পরিবার নষ্ট করে দিয়েছিলেন। সেই মহিলাকে মা-বাবা চিনতেন, যদিও খুব ভাল করে নয়। ডেবোরার তখন চল্লিশের ওপর বয়স। বনি এবং সারা কলেজে পড়ে। আঘাত এবং শোকে বিহ্বল হয়ে ডেবোরার আমার মাকেই মনে পড়েছিল। তিনি মাকে ফোন করে অনেক কান্নাকাটি করলেন। কোনওভাবে, এতগুলো বছর ধরে ডেবোরা আমাদেরই তাঁর দৃশ্যত শ্বশুরবাড়ি বলে ধরে নিয়েছিলেন। আমার দাদু-ঠাকুরমা মারা যাওয়ার পর ফুল পাঠিয়েছিলেন। আমার স্নাতক হওয়া উপলক্ষে ও.ই.ডি-এর একটা ছোট সংস্করণ উপহার দিয়েছিলেন। "আপনি তো ওকে এত ভাল করে চেনেন। কী করে ও এমন করতে পারল?" ডেবোরা মাকে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন, "আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু জানতেন?" মা সত্যি কথাই বললেন যে, তিনি কিছুই জানতেন না। একই মানুষের কাছে আঘাত পেয়ে তাঁদের দু'জনেরই মন ভেঙে গিয়েছিল। শুধু, মায়ের ভাঙা মন অনেকদিন আগেই জোড়া লেগে গিয়েছিল। এবং কোনও অদ্ভুত উপায়ে, বার্ধক্যের দিকে এগোতে এগোতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কিছু না হলেও, অন্তত অভ্যাসের বশেই মা এবং বাবা পরস্পরকে ভালবাসতেও শুরু করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, আমি কলেজে চলে যাওয়ার পর বাড়িতে আমার অনুপস্থিতিও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ, বছরের পর বছর, যখন আমি বাড়ি আসতাম, তখন মা-বাবার মধ্যে এমন একটা উষ্ণতা লক্ষ করতাম, যা আগে ছিল না। শান্ত হাস্য-পরিহাস, পারস্পরিক নির্ভরতা, একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্যজনের উদ্বেগ। মা এবং আমার সম্পর্কও শান্তিপূর্ণ হয়েছিল। মা মেনে নিয়েছিলেন যে, আমি শুধু তাঁর মেয়েই নই, আমেরিকারও সন্তান। আস্তে আস্তে তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে, আমি একজন আমেরিকানের সঙ্গে ডেট-এ যাই, তারপর আর-একজন, তারপর আরও একজন। মেনে নিয়েছিলেন যে, আমার তাদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কও আছে। আমি বিয়ে না করেও একজনের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকি। তিনি আমার প্রেমিকদের বাড়িতে স্বাগত জানাতেন। এবং আমার কোনও সম্পর্ক শেষ হলে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন যে, আমি আরও ভাল কাউকে খুঁজে পাব। এত বছর অলসভাবে কাটানোর পর, পঞ্চাশ বছর বয়সে মা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, কাছের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিগ্রি অর্জন করবেন।

ফোনে ডেবোরা এমন একটি কথা স্বীকার করেছিলেন, যা শুনে মা বিস্মিত হয়েছিলেন। অতগুলো বছরে ডেবোরা প্রণবকাকুর জীবনের একটি অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন বোধ করতেন। "তখন আমার আপনাকে ভীষণ হিংসে হত। আপনি ওকে চিনতেন, ওকে বুঝতেন বলে। সেভাবে আমি কখনও ওকে বুঝতে পারিনি। ও নিজের পরিবার, আপনাদের সকলের দিক থেকে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তাও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। আমি কখনও ওটা ভুলতে পারতাম না।" তিনি মাকে বলেছিলেন যে, অনেক বছর ধরে তিনি প্রণবকাকুকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে তিনি তাঁর মা-বাবার সঙ্গে মিটমাট করে নেন। অন্যান্য বাঙালিদের সঙ্গে আলাপ বজায় রাখার জন্যও উৎসাহ দিতেন। কিন্তু প্রণবকাকুই বাধা দিতেন। ডেবোরাই বলেছিলেন আমাদের থ্যাঙ্কসগিভিং-এ নিমন্ত্রণ করতে। সেই সমাবেশে সেই মহিলাও ছিলেন। "আশা করি ওকে আপনাদের জীবন থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা আমাকে দোষ দেন না বউদি। আমার সবসময়ই দুশ্চিন্তা হত যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনারা বোধহয় আমাকে দোষী মনে করেন।"

মা ডেবোরাকে আশ্বস্ত করলেন যে, তিনি ডেবোরাকে কিছুর জন্যই দোষী সাব্যস্ত করেননি। কয়েক দশক আগে তিনি নিজে যে ঈর্ষার শিকার হয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে কিছুই তিনি ডেবোরার কাছে স্বীকার করলেন না। শুধু বললেন যে, যা হয়েছে তার জন্য তিনি দুঃখিত। তাঁদের পরিবারের পক্ষে এটি একটি চরম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মা ডেবোরাকে বললেন না যে, প্রণবকাকুর বিয়ের কয়েক সপ্তাহ পরে যখন আমি একটা গার্ল স্কাউট মিটিং-এ ছিলাম এবং বাবা কাজে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে, দেরাজ এবং টিন থেকে যতগুলো সম্ভব সেফটিপিন বের করে সেগুলো তাঁর চুড়িতে আটকানো সেফটিপিনের সঙ্গে জড়ো করেছিলেন। যথেষ্ট সেফটিপিন জোগাড় হওয়ার পর তিনি সেগুলো এক এক করে তাঁর শাড়িতে আটকেছিলেন। কাপড়ের একটি স্তরকে নীচের স্তরের সঙ্গে আটকে দিয়েছিলেন, যাতে কেউ জামাটা তাঁর শরীর থেকে টেনে খুলতে না পারে। তারপর তিনি রান্নাঘর থেকে এক ক্যান দাহ্য তরল পদার্থ এবং একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে বাইরে আমাদের পিছনের উঠোনে গিয়েছিলেন। হিমশীতল উঠোনটা ঝরা পাতায় ভরতি হয়ে ছিল। শাড়ির ওপর মা একটা গোলাপি বেগুনি রঙের আজানুলম্বিত ট্রেঞ্চকোট পরেছিলেন। যে-কোনও পড়শি দেখলে ভাবত, তিনি শুধু তাজা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতেই বেরিয়েছেন। মা কোটটা খুলে, ক্যানের ঢাকনা সরিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর আবার কোটের বোতাম ও বেল্ট লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির পিছনের ডাস্টবিনে তরল পদার্থের বাকিটা ফেলে দিয়েছিলেন। তারপর কোটের পকেটে দেশলাইয়ের বাক্সটা নিয়ে উঠোনে ফিরে এসেছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা মা আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছিলেন। আমি বা আমার বাবা মাকে প্রাণে বাঁচাইনি। বাঁচিয়েছিলেন আমাদের পাশের বাড়ির বাসিন্দা মিসেস হলকোম্ব, যাঁর সঙ্গে মায়ের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। তিনি নিজের উঠোনের ঝরা পাতা পরিষ্কার করতে বেরিয়েছিলেন। মাকে দেখে তিনি বলেছিলেন যে, অস্তগামী সূর্যটা কত সুন্দর দেখাচ্ছে। "আমি দেখছিলাম যে, আপনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে সূর্যাস্ত দেখছেন।" মা একমত হয়ে বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতর ফিরে গিয়েছিলেন। সন্ধে নামার পর, বাবা এবং আমি যতক্ষণে বাড়ি ফিরেছিলাম, ততক্ষণে মা অন্য যে-কোনও দিনের মতোই রান্নাঘরে রাতের ভাত রাঁধছিলেন।

মা ডেবোরাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। যে মানুষটিকে আমি বিয়ে করব বলে আশা করেছিলাম, তার কাছে আঘাত পেয়ে আমার মন ভেঙে যাওয়ার পর, মা আমার কাছে তাঁর জীবনের এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের খোঁজে

বাইরে থেকে হোটেলটাকে দেখতে বেশ ভালই লাগে, যেন পাহাড়ের মধ্যে পুরনো একটা সুন্দর স্কি-লজ; চকোলেট ব্রাউন রঙের দেওয়াল, গাঢ় পিচ রঙের ছাদ আর জানলার পাশে উজ্জ্বল লাল রঙের বর্ডার। কিন্তু শ্যাডউইক ইন-এর লবিতে ঢুকে রীতিমতো হতাশ হল অমিত। পুরো জায়গাটা প্রায় বর্ণহীন, সদ্য রেনোভেট করা দেওয়ালে প্যাস্টেল শেডের রং, ওয়ালপেপারের কিছু কিছু অংশে সরু সরু ছাইরঙের লাইন দিয়ে ডিজাইন করা, ঠিক যেন কেউ বারবার পেনের কালি টেস্ট করেছে এবং শেষমেশ দেখা গিয়েছে, ওই পেন দিয়ে লেখা যাবে না। রিসেপশনের সামনের টেবিলের ঠিক পাশে একটা ঘোরানো পিতলের তাক রয়েছে, সেটি বার্কশায়ারের ট্যুরিস্ট ব্রশিয়োরে ভরা এবং অমিত চেকইন করার সময়ই মিগ্যান একগুচ্ছ ব্রশিয়োর তুলে নিয়েছিল। এখন সেই ব্রশিয়োরগুলোই ওদের এই বেডরুমের দুটো ডাবল বেডের একটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। মিগ্যান ম্যাপ বার করার জন্য একটা ব্রশিয়োর হাতে নিল।

"আমরা এখন ঠিক কোথায়?" মিগ্যান ম্যাপের উত্তরদিকে আঙুল রেখে প্রশ্ন করল।

"এখানে," শহরের দিকে নির্দেশ করে অমিত বলল, "এই যে লেক, দেখতে পাচ্ছ? অনেকটা ছোট্ট খরগোশের মতো দেখাচ্ছে, তাই না?"

মিগ্যান বলল, "আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"এই তো এইখানে," বলে অমিত মিগ্যানের আঙুলটা নিয়ে ওই জায়গাটার ওপর শক্ত করে রাখল।

"না, আমি আসলে বলতে চাইছি, কীভাবে লেকটাকে যে খরগোশের মতো লাগছে, সেটা বুঝতে পারছি না।"

নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে আসতে ওদের অনেকটা জার্নি করতে হয়েছে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

অমিত পানীয়র মুডে ছিল। কিন্তু ওখানে কোনও মিনিবার ছিল না, এমনকী, রুমসার্ভিসেরও ব্যবস্থা নেই। দুটো ডাবল বেড মেরুন ফুল ফুল ছাপওয়ালা কভারে ঢাকা, এবং তার ঠিক পাশেই একটা টেলিভিশন সেট। একটা ছোট কাগজের পিরামিড দুটো বিছানার মাঝখানের চৌকো টেবিলের ওপর রাখা, আসলে ওটা লোকাল কেবল চ্যানেলগুলোর লিস্ট! এই ঘরের একমাত্র সুন্দর বৈশিষ্ট্য হল এর কড়িবরগাওয়ালা গির্জার মতো ঢালু সিলিং! নয়তো ঘরটা বেশ অন্ধকার। এমনকী, দিনেরবেলা সবক'টা পরদা পুরোপুরি খোলা রাখলেও ভিতরের আলোগুলো সব জ্বালিয়ে রাখতে হয়।

ওরা এখানে এসেছে প্যাম বোর্ডেনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সন্ধেবেলা ল্যাংফোর্ড অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠানটি হবে। ল্যাংফোর্ড অ্যাকাডেমি আসলে একটি বোর্ডিং স্কুল, প্যামের বাবা এই স্কুলেরই হেডমাস্টার এবং এখান থেকেই আঠারো বছর আগে অমিত গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে। কুড়ি ডলারের বিনিময়ে ল্যাংফোর্ডের একটা ডর্মে থাকার ব্যবস্থা করা যেত, কারণ আগস্ট মাস বলে সেগুলো খালিই রয়েছে, কিন্তু অমিত শ্যাডইউক ইন-এ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কারণ, এটা ক্যাম্পাস থেকে বেশ খানিকটা দূরে এবং সুইমিংপুল, টেনিসকোর্ট আর একটা টু-স্টার রেস্তরাঁও রয়েছে! এমনকী, সেই ছায়াঘেরা লেকটায় যাওয়ার পথও রয়েছে, যেখানে টিনএজার থাকাকালীন অমিত নৌকো চালানোর বিভিন্ন কায়দা শিখেছিল। ও আর মিগ্যান দু'জনে আলোচনা করেই মেয়েদের লং আইল্যান্ডে মিগ্যানের বাবা-মায়ের কাছে রেখে এসেছে এবং শনিবার ও রবিবারের জন্য একটা রুম বুক করেছে, যাতে প্যামের বিয়েকে উপলক্ষ করে ওরা দু'জনে একটা ছোট্ট ট্রিপ সেরে নিতে পারে।

স্লাইডিং দরজার লকটা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল অমিত, সিমেন্টের মেঝেতে দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার রাখা আছে। উত্তরপূর্বে এখন যেন রীতিমতো তাপপ্রবাহ চলছে, এমনকী, পাহাড়ের ওপরে এসেও সেই ভ্যাপসা দমবন্ধকরা গরম টের পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পাইনের গন্ধভরা বাতাসে কোথাও যেন একটা নির্মলতা ছিল, যার ফলে পরিবেশটা ভাল লাগছিল তাদের। কিন্তু গোটা জায়গাটা এমন অদ্ভুত রকমের নিঃস্তব্ধ যে, অমিত ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ছিল। কোনও বাচ্চা মেয়ের একে অপরকে ডাকার শব্দ নেই, মিগ্যানের তাদের বকাঝকা করার বা আদর করার শব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। গাড়িতে আসার সময়ও গোটা জার্নিটা একইরকম ছিল। মিগ্যান ঘুমিয়েই ছিল। ব্যাকসিটটাও খালিই পড়ে ছিল, যদিও সে মাঝে মাঝেই রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে ফেলছিল যেন তাকালেই দেখতে পাবে তার মেয়েরা ঝগড়া বা খুনসুটিতে ব্যস্ত! এখন সে চেয়ারগুলোর একটাতে বসে দেখল, সেগুলো মোটেই আরামপ্রদ নয়! অমিতের মনে হল, ওকে যেন ঠকানো হয়েছে! সে বলল, "আমি তো ভাবতেই পারছি না, এরকম ব্যবস্থাপনায় একরাতের জন্য ওরা আড়াইশো ডলার চার্জ করল!"

"সত্যিই অদ্ভুত," ওর কথায় সায় দিয়ে মিগ্যান বলল, "তবে আমার মনে হয়, এরকম একটা জায়গায়, কাছাকাছি কিছু নেই বলেই হয়তো এরকম চার্জ রেখেছে।"

মিগ্যান ভুল বলেনি, সত্যিই ওরা একটা অদ্ভুত জায়গায় রয়েছে যার কাছাকাছি কিছু নেই। যদিও অমিতের তেমনটা মনে হয় না। ম্যাপ না দেখেই ও বলে দিতে পারবে হাইওয়ে থেকে বেরোনোর পর কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে এবং কোন দিকে গেলে শহরের মধ্যে ঢোকা যাবে। কিন্তু অমিত কোনওদিন এই হোটেলে থাকেনি। পেন্টেস উইকএন্ডের সময় তার বাবা-মা কখনও এখানে থাকেননি। অমিত যখন গ্র্যাজুয়েশন করছিল, তখন তাঁরা ভারতে থাকতেন, নিউ দিল্লিতে! অমিতের বাবা দিল্লির এক সেরা হাসপাতালে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন একজন সাংসদের চোখের ছানি অপারেশন করে ওরসেস্টারে তাদের বাঙালি আত্মীয়স্বজনদের কাছে রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। গ্র্যাজুয়েশনের পর অমিত আর তার ল্যাংফোর্ডের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি। স্কুলের প্রতি তার কোনও নস্ট্যালজিয়াও কাজ করে না। এরপর যখন অ্যালামনি হিসেবে কিছু দান করার জন্য বা রিইউনিয়নে যোগ দেওয়ার জন্য তার উদ্দেশে চিঠি পাঠানো হয়েছিল, সে খামটা না খুলেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। প্যামের সঙ্গে হালকা যোগাযোগ এবং স্কুলের নাম লেখা একটা ঘামেভেজা কোঁচকানো শার্ট ছাড়া তার কাছে এমন আর কিছুই ছিল না, যা তাকে জীবনের সেই বছরগুলো মনে করিয়ে দিতে পারে। তার মেয়েদের ল্যাংফোর্ড পাঠানোর কথা সে ভাবতেই পারে না। এমনকী ভাবতে পারে না, তাদের দূরে পাঠানোর কথাও, যেমন করে তার বাবা-মা তাকে একা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোটেলের চারপাশটাকে ভাল করে লক্ষ করতে লাগল অমিত। একটা পাইন গাছ বারান্দার ঠিক সামনে বেড়ে উঠেছে এবং সামনের দৃশ্যতে বাধা সৃষ্টি করছে। পুলটা বেশ ছোট এবং চারপাশে চেনের মতো একটা বেড়া দেওয়া আছে, দেখে সহজে নামতে ইচ্ছে করে না। সাঁতার কাটা বা রোদ পোহানোর মতোও কেউ নেই সুইমিং পুল চত্বরে। সে কিছু দেখতে না-পেলেও একটা টেনিস বলের ক্রমাগত সামনে-পিছনে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল এবং ওই শব্দটা তাকে রীতিমতো ক্লান্ত করে তুলছিল।

"এই গাছটার জন্য বিরক্ত লাগছে," বলে উঠল অমিত।

মিগ্যান তার কথায় সায় দিয়ে বলল, "সত্যি, গাছটা আর কয়েক ফিট দূরে থাকলে ভাল হত!"

"আমার মনে হচ্ছে, অন্য একটা ঘর পাওয়া যায় কি না, একটু দেখতে হবে। এরকম ঘটনা তো এই প্রথম ঘটল না।"

সত্যিই, ঘর বদলানোর ব্যাপারে মিগ্যান ও অমিতের একটা ট্র্যাডিশন রয়েছে। প্রথমবার যখন তারা একসঙ্গে পুয়ের্তোরিকোতে গিয়েছিল, হোটেলের ঘর পেয়েছিল একতলায় এবং বাথরুমে একটা মরা টিকটিকি পড়ে ছিল। মিগ্যান সঙ্গে সঙ্গে কমপ্লেন করেছিল এবং নীল-সবুজ সমুদ্র আর ঘন নীল আকাশের বৈপরীত্যে তৈরি হওয়া অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য সংবলিত একটা ডিলাক্স সুটে চলে গিয়েছিল। পরে গোটা ট্রিপটায় তারা ওই দৃশ্যই দেখার জন্য সারাক্ষণ পরদা সরিয়ে রাখত এবং ওদিকে মুখ করে ভোরবেলা ওঠা থেকে শুরু করে ও বিছানার একেবারে ধারে এসে এমনভাবে সেক্স করত, যেন তাদের পুরো ঘর, বিছানা এবং তারা নিজেরাও ওই সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় আছে। ঠিক একই জিনিস ঘটেছিল ভেনিসেও, যেখানে তারা তাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী সেলিব্রেট করতে নিয়েছিল। গোটা একটা রাত ধরে একটা পাথরের দেওয়াল সহ্য করার পর তারা খালের পাশে একটা ঘরে বদলে গিয়েছিল। সেই ঘরের সামনে আবার এমন একটা ডক ছিল, যেখানে প্রতিদিন সকালে ফল আর সবজি বিক্রি হত। সেক্ষেত্রে অমিত ভান করত যেন তারা হোটেলের সবচেয়ে ভাল দিকে থাকছে, সামনের পার্কিং লটটা বাদ দিলে ঘরটা তো একেবারে সামনের দিকে।

"শুধু দু'রাতের জন্য ঘরটা বদলানোর দরকার কী!"

মিগ্যান চেয়ার থেকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে রেলিং-এর ওপর দিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাড়টাকে লম্বা করে কী যেন একটা দেখার চেষ্টা করছে! বলল, "বিয়ের অনুষ্ঠানটা কি এখানেই হচ্ছে?"

"আমি তো তোমাকে বললাম, ওটা ল্যাংফোর্ডে হবে।"

"ও, তা হলে মনে হয়, এখানে অন্য একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে! আমি কনেযাত্রীদের দেখতে পাচ্ছি।"

অমিত পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল হোটেল-রেস্তরাঁর টেরাসের সামনের রাস্তাটা জুড়ে কিছু লোক ভিড় করে আছে। একগুচ্ছ ব্যাগ আর যন্ত্রপাতি নিয়ে একজন ফোটোগ্রাফার একটা ট্রাইপডের ওপর ঝুঁকে রয়েছে এবং ম্যাচিং ল্যাভেন্ডার ড্রেসে অল্পবয়সি মেয়েদের একটা গ্রুপ ক্যামেরার সামনে পোজ দিচ্ছে। সে বলল, "প্যামের বিয়ের অনুষ্ঠান অন্যরকম হবে।"

"মানে?"

"ওর কোনও কনেযাত্রী থাকবে না।"

"তুমি কী করে জানলে?"

"ও ঠিক ওই ধরনের মেয়ে নয়।"

"তুমি জানো না," মিগ্যান যোগ করল, "অনেক মেয়েই বিয়ের দিন এমন অনেক কিছু করে, যা তাদের চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, এমনকী প্যামের মতো মেয়েরাও।"

AMARBOI.COM

মিগ্যানের হালকা দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল অমিতকে, তবে সে দৃষ্টি অন্তর্ভেদী ছিল না। অমিত বুঝতে পেরেছিল যে, সে প্যামের বিয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাতে মিগ্যান যথেষ্ট অবাক হয়েছে। কারণ প্যামের সঙ্গে তার যোগাযোগ এমনকিছু বেশি ছিল না। তা ছাড়া মিগ্যান আপত্তি না করলেও অমিত কিন্তু একরকম জোর করেই ওকে টেনে এনেছে, এরকম একটা অপরিচিত জায়গায়, অপরিচিত লোকজনের মাঝখানে, যেখানে তার নিজের অতীতের কিছু অংশ ছড়িয়ে আছে, অথচ তাদের যৌথ জীবনে এখন যার কোনও ভূমিকা নেই। যদিও মিগ্যান স্বীকার করে না, কিন্তু অমিত জানে যে প্যাম সম্পর্কে ওর মনে কোথায় যেন একটা নিরাপত্তাহীনতার বোধ রয়ে গিয়েছে, কিছুটা হয়তো রক্ষণশীল মনোভাবও, যেন অমিত আর প্যাম একসময় পরস্পরকে ভালবাসত। অমিত ও মিগ্যান তাদের সম্পর্ক শুরু হওয়ার পর যখন নিজেদের অতীত নিয়ে আলোচনা করত, ভেবে দেখত, কীভাবে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠল, অমিত একবারও তখন প্যামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেনি মিগ্যানের কাছে। অমিত প্যামকে সত্যি সত্যিই ভালবাসত ঠিকই, কিন্তু প্যাম কোনওদিনই অমিতের গার্লফ্রেন্ড ছিল না। তাই মিগ্যানের কাছে গল্প করার সময় তার মনে হয়েছিল প্যামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার মতো সেরকম কিছু নয়। চেয়ারটা সামান্য টেনে নিয়ে পিছনে হেলে শক্ত প্লাস্টিকের কিনারায় মাথা রাখল অমিত। চোখ বন্ধ করে বলল, "আমার এখন একটা ড্রিঙ্ক নিতে ইচ্ছে করছে।"

ওরা এয়ারকন্ডিশনড ঘরে ফিরে এল এবং দু'জনের উইক-এন্ডের ব্যবহার্য জিনিসপত্রে ভরা সুটকেসটা খুলল অমিত। সেখান থেকে বের করল একটা মোটা খাম, তার মধ্যে রয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র, ল্যাংফোর্ড ক্যাম্পাসের পথনির্দেশ দেওয়া একটা ছোট ম্যাপ, সেখানে অনুষ্ঠান এবং রিসেপশনের অংশটি মার্কার দিয়ে হাইলাইট করা আছে। একটা নরম প্রায় ডুবে যাওয়া বালিশে ভর দিয়ে আধশোওয়া হয়ে বিছানায় বসল সে, তারপর বিছানার ঠিক পাশের টেবলের কাগজের পিরামিডের পাশে রাখা ডিজিট্যাল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "বিয়ে আর ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে শুরু হবে।"

"তা হলে তো আমাদের এখন থেকেই রেডি হওয়া উচিত," বলে রাউন্ডের সময় যেরকম পেশাদারিত্বের সঙ্গে সে পেশেন্টদের দিকে তাকায়, অনেকটা সেভাবেই অমিতের দিকে তাকাল মিগ্যান, যেন সে-ও একজন পেশেন্ট! বলল, "কী হয়েছে?"

"কিছু না! আসলে আমি ভাবছিলাম যে, আমাদের হাতে আর-একটু সময় থাকলে ভাল হত, অন্তত একটু হেঁটে আসা যেত কিংবা লেকে সাঁতার কেটে আসা যেত। ইন ফ্যাক্ট আমি ভাবছি যে, একটু সাঁতার কেটে আসব কি না! মনে হয় না, ট্রাফিক খুব খারাপ হবে।"

"ঠিক আছে, আমরা কাল সাঁতার কাটব," মিগ্যান বলল, "আমাদের হাতে তো গোটা একটা উইকএন্ড আছে!"

অমিত মাথা নাড়ল, "ঠিকই বলেছ," তারপর উঠে দাঁড়িয়ে শেভ করা এবং স্নান সেরে নেওয়ার জন্য পা বাড়াল বাথরুমের দিকে। এইসব উৎসব-অনুষ্ঠান অসহ্য লাগে অমিতের। সুট পরে সুসজ্জিত হয়ে সেই বয়ঃসন্ধির সময়কার লোকজনের সঙ্গে মিশতে একটুও ইচ্ছে করছিল না তার। পোশাক ছেড়ে মুখে শেভিং ক্রিম লাগিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে।

AMARBOI.COM

তিন বছর আগে মোনিকার জন্মের পর থেকে মেয়েদের ছাড়া এটাই তাদের স্বামী স্ত্রীর প্রথম ট্রিপ। এরকম একটা ট্রিপের জন্য মুখিয়ে ছিল তারা। সাধারণত প্রতিবারই গরমকালে অ্যাডিরনড্যাকে একটা কেবিন ভাড়া নেয়। কিন্তু গতবছর মিগ্যান মাউন্ট সিনাইতে তার ডাক্তারি প্রশিক্ষণের শেষ বছরে ছিল এবং ব্যস্ত শেডিউল থেকে কিছুতেই সময় বের করে উঠতে পারেনি। সে কার্ডিয়াক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে টানা ছত্রিশ ঘন্টার শিফট শেষ করে ভোরবেলা বাড়ি ফিরত এবং অমিত ও তার মেয়েরা যখন দিন শুরু করত তখন সে গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে থাকত। একটি মেডিক্যাল জার্নালের ম্যানেজিং এডিটর অমিতের শেডিউল কিন্তু এদিক থেকে বেশ ফ্লেক্সিবল ছিল। গরমকাল বরাবরই জার্নালের পক্ষে একটু ঢিলেঢালা সময়। তাই জুন থেকেই অমিত মেয়েদের ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে স্নান, খেলাধুলোর সময়, মায়াকে একটা ডে-ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে আবার ঠিক সময় বাড়ি নিয়ে আসা, সবকিছুরই দায়িত্ব নিত। সে আর মিগ্যান ঠিক করেছিল যে গরমের মাসগুলোতে মেয়েদের দেখাশোনার ক্ষেত্রে কম সময়ের গর্ভনেস রাখলে তাদের খরচ কিছুটা হলেও বাঁচাবে। ওয়েস্ট সেভেন্টি ফিফথ স্ট্রিটে তাদের খয়েরি পাথরের নতুন দ্বিতল অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ডাউনপেমেন্টে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে গিয়েছিল।

মায়া ও মোনিকা সঙ্গে না থাকায় মিগ্যানের স্বস্তিটুকু ফিল করতে পারছিল অমিত। এমনকী মিগ্যানের সঙ্গে এই স্বস্তিটুকু ভাগ করে নিতেও খুব ইচ্ছে করছিল তার। যেন একটা কাজ থেকে পালানোর অনুভূতি, যার জন্য প্রত্যেক গরমকালেই অপেক্ষা করত তারা। তাই প্যামের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র আসামাত্রই তারা প্ল্যান করে ফেলেছিল। কিন্তু এখন, যখন তারা সত্যিই একা, অমিতের কেবলই মনে হচ্ছিল মোনিকার খুব সর্দি হয়েছে, আর তার শাশুড়ির কি মনে আছে যে স্ট্রবেরি খেলেই মায়ার গায়ে র‍্যাশ বেরিয়ে যায়! কথাটা মিগ্যানকে প্রায় জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল সে, কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়িকে অবিশ্বাস করার দায়ে মিগ্যান তাকে অভিযুক্ত করতে পারে ভেবে চুপ করেই থাকল। অভিভাবক হিসেবে মিগ্যান তার চেয়ে অনেক কম উদ্বিগ্ন, অনেক কম সতর্ক। সে তার ছুটির দিনে বাচ্চাদের অনেক প্রশ্রয় দেয়, রান্নাঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে বেকিং করে। এমনকী বিস্কুট আর কেক খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলে যখন মেয়েরা শেষ পর্যন্ত ডিনার খায় না, তখনও সে কিছু বলে না।

AMARBOI.COM

অমিতের মনে হয়, ওদের সময় দিতে না-পারার চোরা অপরাধবোধ থেকে মিগ্যান হয়তো এরকম করে, কিন্তু এটাও ঠিক যে, ওর প্রকৃতিটাই এরকম, ঢিলেঢালা। খেলার মাঠে মায়া কোনও পড়ে থাকা চুয়িংগামের অবশেষ মুখে ঢুকিয়ে দিলে অথবা সেন্ট্রাল পার্কে পিকনিকে গিয়ে মোনিকা তার ছোট্ট ছোট্ট আঙুল দিয়ে কুকুরের নোংরা ঘাঁটলেও মিগ্যান ততটা আতঙ্কিত হয় না, যতটা অমিত হয়ে থাকে! সাধারণত মিগ্যান এসব অবস্থায় হাসে, যত্ন করে তাদের হাত-মুখ মুছিয়ে দেয়, যেন তার মেয়েরা যে-কোনও পরিস্থিতিতেই ঠিক থাকবে, এরকম একটা বিশ্বাস তার সবসময় থাকে। আসলে সে এমন লোকদের সঙ্গে তার সারাদিন কাটায়, যারা প্রতিনিয়ত জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে। তাই কেটে-ছড়ে যাওয়া কনুই বা একশো ডিগ্রি জ্বর দেখে সে বিশেষ বিচলিত হয় না।

অমিত নিজেও তো শরীরের অলিগলি, ভগ্নাংশ খুব ভালভাবে চেনে। শরীরের বিভিন্ন অংশের কাটাছেঁড়াও তো সে কিছু কম করেনি। কিন্তু তবুও মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যতিব্যস্ত না হয়ে সে পারে না। মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির একটা ঘটনার স্মৃতি এখনও অমিতকে তাড়া করে ফেরে। মোনিকার বয়স তখন বছরখানেক, একটা শুকনো অ্যাপ্রিকট তার গলায় আটকে গিয়েছিল। পাশের টেবিলের এক ভদ্রমহিলা, মনে হয় পেশায় নার্স, মোনিকার কাশির শব্দ শুনে এগিয়ে এসেছিলেন এবং নিপুণভাবে তাঁর আঙুলগুলো তার মুখে ঢুকিয়ে সেটা বের করে এনেছিলেন। দু'বছর মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে এই সামান্য কাজটা করার তৎপরতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করেছিল। মিউজিয়ামে তাদের সঙ্গে আনন্দ করতে গিয়ে বাকি দিনটা সে প্রায় তার মেয়েদের দিকে তাকাতেই পারেনি। কেবলই তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল মোনিকার শ্বাসনালিতে আটকে যাওয়া অ্যাপ্রিকটের টুকরোর ছবি, যেটা কি না তাকে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দিতে পারত। জোনস বিচে গরমকালে তার মেয়েদের নিয়ে এক সপ্তাহ অন্তরই যেত অমিত। একটা দৃশ্য প্রায়ই চোখের সামনে ভেসে উঠত তার। সে মেয়েদের থেকে একটু দূরে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে, আর ঠিক তখনই একটা ঢেউ এসে তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিংবা একগাদা বালি শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে তাদের। তার সঙ্গে থাকার সময় মেয়েদের কোনওরকম ক্ষতি হতে পারে, এটা ভেবেই গায়ে কাঁটা দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠত। কারণ সেরকম কিছু হলে তো মিগ্যান তাকে দোষ দেবে, তাদের ডিভোর্স হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে স্ত্রী ও মেয়েদের সঙ্গে কাটানো তার সুন্দর জীবন। অমিতের মনে হত, একটা ভুল পদক্ষেপ মুহূর্তের মধ্যে তার অস্তিত্ব বিলোপ করে দিতে পারে পৃথিবী থেকে।

রেজার নামিয়ে রেখে শাওয়ারটা খুলে দিল অমিত। ঠিক তখনই দরজায় নক করার শব্দ শুনতে পেল এবং তারপরই মিগ্যান দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল।

"আমি বিয়েতে যেতে পারব না," বলতে বলতে মাথা নাড়ল মিগ্যান, এত নিশ্চিত ভাবে যেন সে তার মেয়েদের টিভিতে কোনও প্রোগ্রাম দেখতে বা বাথটবে আরও পাঁচ মিনিট অতিরিক্ত সময় কাটাতে বারণ করছে।

"কী হয়েছে?"

"এই দেখো," বলে মিগ্যান তার পরনের স্কার্টের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। ওপরে সে শুধু একটা স্কিন কালারের ব্রা পরে আছে, স্ট্রাপটা বেশ ময়লা। স্বচ্ছ, স্মোকি গ্রে রঙের স্কার্টটার ঝুল একেবারে গোড়ালি পর্যন্ত! স্কার্টের ওপরের আস্তরণটা গ্রে রঙেরই একটু গাঢ় শেড এবং সিল্ক মেটিরিয়ালের। মিগ্যান স্কার্টের একটা অংশ তুলে ধরে একটা দাগ দেখাল। প্রথমে অমিত ভাবল কোনওরকম নোংরা লেগেছে, তারপরে লক্ষ করে দেখল জায়গাটা পুড়ে ফুটো হয়ে গেছে, ধারটা কালো। নীচের লাইনিংটা ফুটোটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ক্ষতের ওপরের শুকনো চামড়া উঠে গেলে যেরকম দেখায় সেরকম দেখাচ্ছে।

"এটা দেখতে বেশ খারাপ লাগছে," মিগ্যান চিন্তিতমুখে বলল, "কোনওভাবেই এটা ঢাকা যাচ্ছে না।"

"তুমি কি আর-একটা আউটফিট এনেছ, অপশন হিসেবে?"

মিগ্যান খুবই বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল এবং অমিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এনেছ নাকি?"

অমিত তোয়ালেতে হাত মুছে টয়লেটের বসার জায়গায় বসল। তারপর স্কার্টের ফ্যাব্রিকের দুই লেয়ারের মধ্যে হাত দিল এবং হাতের তালুতে ঘষে মেটিরিয়ালটা ফিল করার চেষ্টা করতে লাগল, ঠিক যেভাবে ডাক্তারি পড়ার সময় দেহের ছোট ছোট কোষগুলো পরীক্ষা করে দেখত! অদূর ভবিষ্যতে সে স্কার্টটা ঠিক করার কোনও সম্ভাবনা দেখতে পেল না। ফুটোটা এমন সূক্ষ্ম

AMARBOI.COM

ও স্বচ্ছ যে, সহজে ঠিক হবে না। অমিত দেখল, ফুটোটা দিয়ে ওর আঙুল দেখা যাচ্ছে।

"আমি তো ভাবতেই পারছি না, প্যাক করার সময় আমি কী করে এটা খেয়াল করলাম না?" মিগ্যান বলল, "শেষবার যখন এটা আমি পরেছিলাম, নিশ্চয়ই এটা তখন হয়েছে, কোনও সিগারেটের ছাই বা অন্য কোনও কিছু থেকে।"

যদিও অমিত জানত যে, এটা মিগ্যানের দোষ নয়, তবুও ব্যাপারটা খেয়াল না করার জন্য সে মনে মনে মিগ্যানকে একটু দোষারোপ না করে পারল না। ওর একবার মনে হল, প্যামের বিয়েতে যাওয়ার প্ল্যানটা ভন্ডুল করে দেওয়ার জন্য এটা মিগ্যানের একটা স্যাবোটাজও হতে পারে। অমিত ভাবল, এই অজুহাতে বিয়েতে যাওয়ার প্ল্যানটা কাটিয়ে দিলে মন্দ হয় না। অত লোকজনের ভিড়ে তো কেউ খেয়ালই করবে না, তারা উপস্থিত আছে কি না। এর চেয়ে হয়তো শ্যাডউইক ইন-এর এই ঘরে বসে দু'জনে মিলে টিভি দেখা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং! হোটেলটা আরেকটু ভাল হলে সে না যাওয়ার কথা ভাবত।

মিগ্যান জিজ্ঞেস করল, "কাছাকাছি কি অন্য কোনও দোকান আছে? যেখানে আমি গিয়ে একটু দেখেশুনে অন্য কিছু একটা কিনে আনতে পারি? ততক্ষণে তুমি একটু তৈরি হয়ে নাও!"

"একটা মল এখানে আছে বটে, তবে সেটাও এখান থেকে প্রায় এক ঘণ্টার জার্নি। এখানে তো আমি কোনও জামাকাপড়ের দোকান আছে বলে মনে করতে পারছি না, অন্তত তেমন ভাল কিছু তো নয়ই।"

মিগ্যান স্কার্টটাকে একদিক থেকে এমনভাবে টানল, যাতে পোড়া অংশটা সামনে না আসে! তারপর সে অমিতের পাশে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল, ওদের নগ্নবাহু পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে। সাধারণত মিগ্যান মেকআপ করে না, কিন্তু অনুষ্ঠান উপলক্ষে সে একটা লালচে শেডের লিপস্টিক লাগিয়েছে।

অমিতের মনটা একটু বিক্ষিপ্ত লাগছিল, মিগ্যানের পুরনো ধরনের সৌন্দর্যের ধাঁচ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাই আসলে অমিতের বেশি পছন্দ। আগেকার দিনে যখন সাজগোজের এত সরঞ্জাম ছিল না, তখনকার ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞ আমেরিকায়, যে ধরনের মুখ দেখা যেত, ওর মুখটা অনেকটা

AMARBOI.COM

যেন সেই ধরনেরই। গাঢ় খয়েরি চুল বরাবরের মতো টেনে পিছনদিকে বাঁধা, যাতে সেগুলো মুখ এবং ফরসা গলায় বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। ডিম্বাকৃতি লেন্সের ফ্রেমবিহীন চশমা যেন তার সংবেদনশীল দৃষ্টিকে আড়াল করার জন্য সত্যিই প্রয়োজন। তারা প্রায় একই উচ্চতার, পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট লম্বা, কিন্তু ছেলেদের পক্ষে একটু বেঁটেই। অমিতের চেয়ে সে প্রায় পাঁচ বছরের বড়, তার বয়স এখন বেয়াল্লিশ। কিন্তু দু'জনের মধ্যে অমিতকে দেখলেই বেশি বয়স্ক মনে হয়। মাত্র একুশ বছর বয়সেই তার মাথার সব চুল পেকে গিয়েছিল। ল্যাংফোর্ডে থাকাকালীনই সিক্সথ ফর্মে চুল পাকতে শুরু করেছিল। প্রথমে কয়েকটা চুল পাকল, কিন্তু সেগুলো তার কালো চুলের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। কিন্তু কলম্বিয়ায় জুনিয়র থাকার সময় তার মাথায় হাতে গোনা কয়েকটা কালো চুল ছিল। অনেক সময় কোনও ভয়ংকর ঘটনা বা আকস্মিক কোনও মৃত্যুর পর মানসিক আঘাত থেকে অনেকের এরকম হয়। কিন্তু অমিতের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটেনি। বাবা-মাকে ছেড়ে ল্যাংফোর্ডে থাকা ছাড়া তার জীবনে তেমন কোনও বড়সড় পরিবর্তন আসেনি।

"আমার মনে হয়, যদি তুমি সারারাত ধরে আমার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে থাকো, তা হলে কেউ দেখতে পাবে না," অমিতের বাহুতে একটু চাপ দিয়ে বলল মিগ্যান। অমিত অনুভব করল মিগ্যানের হাতের উষ্ণতা আর তাতে নিহিত গোপন ইচ্ছে, যা প্রকাশ করতে হয়তো মিগ্যানের মনে সামান্য হলেও দ্বিধা আছে।

অমিত মিগ্যানকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি নিশ্চিত যে, পুরো সন্ধেটা এভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়ে তুমি কাটাতে পারবে?"

"তুমি পারলে আমিও পারব," মিগ্যানের কণ্ঠস্বরে যেন একটা চ্যালেঞ্জের আভাস! হাসল অমিত, আইডিয়াটা মন্দ লাগল না তার। এতক্ষণে সে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য পেল যেন, ওখানে গিয়ে অন্তত একটা কাজ তো পাওয়া যাবে! সেই সঙ্গে তার আর মিগ্যানের প্রেমের প্রথম দিকের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল, যখন এরকম একটা কথা ভাববার মতো কোনও ব্যাপারই ছিল না। একটা গোটা সন্ধে পরস্পরের শরীর পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকা, তখন মনে হত সেটাই যেন স্বাভাবিক!

সে বলল, "ঠিক আছে, তাই হবে তা হলে।"

AMARBOI.COM

ওরা আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল। মিগ্যানের পরনে ফুটো হওয়া স্কার্ট এবং ময়লা বা, অমিত সম্পূর্ণ বিবস্ত্র এবং তার পুরো মুখটা উজ্জ্বল সাদা শেভিং ক্রিমে ভরতি। মিগ্যান মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের যা দেখতে লাগছে না!"

অমিত ভেবেছিল স্কুলে ওরা হেঁটেই চলে যাবে। কারণ স্কুলটা রাস্তার ঠিক ওপারে, একটা ঢালু জমির ওপর, কয়েকমিনিট হেঁটেই পৌঁছোনো যাবে। কিন্তু মিগ্যান আবার হিল পরেছে এবং জুতোটা নোংরা হয়ে যেতে পারে। তাই শেষমেশ গাড়িতেই উঠল তারা। গাড়ির সিটগুলো এখনও তাদের দুই মেয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। ছেঁড়া বই, ছোট ছোট পুতুল, সদ্য সংগ্রহ করতে শুরু করা মায়ার প্লাস্টিকের ঘোড়া! শুধু তাদের সিটগুলো নেই, সেগুলো এই উইকএন্ডের জন্য অমিতের শ্বশুর-শাশুড়ির গাড়িতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অমিত ভাবার চেষ্টা করল, তার মেয়েরা দাদু-দিদিমার বাড়িতে এখন কী করছে। নিশ্চয়ই নাতনিদের জন্য দাদুর বানানো সেই ট্রি-হাউসে খেলছে এবং তাদের দিদিমা টি-পার্টির জন্য পাউন্ড কেকের স্লাইস আর জুস বক্সের জোগান দিচ্ছেন। তার মেয়েরা কোনও দিক থেকেই অমিত বা তার পরিবারের কারও মতো দেখতে হয়নি। বাবা-মায়ের সঙ্গে তার দূরত্ব বজায় থাকলেও এই চিন্তাটা মাঝেমধ্যে তাকে একটু খোঁচা দেয় বই কী! মনে হয়, ওর বাবা-মা তার মেয়েদের কিছুই দিতে পারেননি। মায়া এবং মোনিকা দু'জনেই পেয়েছে মিগ্যানের গায়ের রং, অমিতের গাঢ় তামাটে রং এবং কালো চোখের কোনও বৈশিষ্ট্যই ওরা পায়নি, শুধু তাদের অস্পষ্ট ভারতীয় ঘেঁষা নাম ছাড়া। এটুকু বাদ দিলে তারা পুরোপুরি আমেরিকান। দোকানে, পার্কে বা খেলার মাঠে যখন সে একা তার মেয়েদের নিয়ে ঘোরে, অনেক সময় ওকে এই প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে হয়েছে যে, "ওরা কি আপনার মেয়ে?"

ঠিক দু'মিনিট পরেই তারা সামনের রাস্তা পেরিয়ে গেল এবং একটা বাঁক নিয়ে স্কুলের গেটে পৌঁছোনোর জন্য একটা বিস্তীর্ণ গাছে ঢাকা রাস্তায় পড়ল। গাছগুলো চকচকে পাতায় ভরতি। কিন্তু অমিতের স্মৃতিতে ভিড় করে আসছিল সেইসব দৃশ্য, হেমন্তের আগুন রঙা পাতায় ঢাকা গাছের ডাল বা বেগুনি আভার আলো পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছড়িয়ে পড়ে আলোছায়ার যে

AMARBOI.COM

বাতাবরণ সৃষ্টি করে কিংবা শীতকালে গেটের মাথায় ঘন হয়ে জমে থাকা বরফ! স্কুলের কথা কম বেশি মনে পড়ছিল তার— একটা বেখাপ্পারকমের বড়, কিন্তু গোছানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিল্ডিং, খোলা মাঠে ঘাসের ওপর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু বিমূর্ত ভাস্কর্য।

"আমি যে কলেজে যেতাম, তার চেয়ে এই জায়গাটা অনেক বেশি সুন্দর," ক্যাম্পাসে ঢুকতে ঢুকতে ভাস্কর্যগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল মিগ্যান।

অমিত বলল, "কিন্তু এই জায়গাটা একটু বেশি বেশি।"

যখন তারা প্রথমবার দেখা করেছিল, মিগ্যান অমিতের এই প্রেপস্কুল এডুকেশনে বেশ ইমপ্রেসড হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা নিয়ে হালকা ঠাট্টা করতে ছাড়েনি। যারা ছোট থেকেই অনেক সুযোগ-সুবিধে পেয়ে বড় হয়, তাদের প্রতি যে মিগ্যান বিরূপ ছিল, ঠিক তা নয়। তবে কখনও কখনও সে একটু সমালোচনা করে ফেলত। অমিতের মনে হয়, যদি ভারতীয় না হত, তা হলে হয়তো ওর মতো একজনকে মিগ্যান প্রত্যাখ্যানই করত। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে মিগ্যানই সবচেয়ে ছোট, বাবা ছিলেন পুলিশ এবং মা কিন্ডারগার্টেনের টিচার। হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পরই সে একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। দিনে একটি জেরক্সের দোকানে এবং সন্ধেবেলা টেলিমার্কেটার হিসেবে। কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত সে কলেজ শুরু করতে পারেনি, পার্টটাইম করতে হচ্ছিল, কারণ কাজ ছাড়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে অমিতের চেনাজানা যে- কারও চেয়ে মিগ্যান অনেক বেশি কাজ করেছে, এমনকী তার সফল বাবা-মা এবং তাঁদের একইরকম সফল বাঙালি বন্ধুদের ভিড়েও সে এরকম কাউকে খুঁজে পায়নি। মিগ্যানের সাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড তার বাবা-মাকে খুশি করতে পারেনি, কিংবা মিগ্যান যে তার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় তাঁরা এটাও মেনে নিতে পারেননি। তা ছাড়া মিগ্যানের প্রসাধনহীন সৌন্দর্য, কনট্যাক্ট লেন্সের বদলে চশমা পরা এবং অত্যধিক উচ্চতাও তাঁদের পছন্দ হয়নি! মিগ্যান যে ডাক্তার তাও তাঁদের হতাশা লাঘব করতে পারেনি বরং সব মিলিয়ে অমিতের ক্ষেত্রে তাঁরা আরও বেশি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

অমিত দেখল, আধুনিক স্টিল, কাচ আর ইট দিয়ে ক্যাম্পাসের কতগুলো বিল্ডিং-এর নতুন শাখা তৈরি হচ্ছে। ম্যাসাচুসেটস-এ বড় হয়েছে অমিত। কিন্তু উইনচেস্টার পাবলিক স্কুল থেকে প্রায় উপড়ে এনে বাবা-মা তাকে

AMARBOI.COM

এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ অমিত এইটথ গ্রেডে থাকতেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ভারতে ফিরে আসবেন। যেদিন তাঁরা সেই সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন অমিতকে, সেই রাতের কথা অমিতের এখনও মনে আছে। কটউইটের কেপ নামে এক জায়গায় একটি সি-ফুড রেস্তরাঁয় তারা বসে ছিল। বাবা একটার পর একটা শামুকের খোসা থেকে অনায়াসে সকলের জন্য মাংস ছাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন যে, হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ফ্যাকাল্টিতে তাঁর আর ভাল লাগছে না। দিল্লিতে একটা হাসপাতাল রয়েছে এবং তাঁর মনে হয়েছে, সেখানে তাঁকে প্রয়োজন। বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তে অমিত সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তার বাবা-মা মোটেই ম্যাসাচুসেটস-এর অন্য বাঙালিদের মতো ছিলেন না, বরং অনেক বেশি নাক উঁচু। অমিতের মায়ের চুল ছোট করে কাটা এবং বেশিরভাগ সময়ই তিনি ট্রাউজার পরতেন। বাবার একটি লিকার ক্যাবিনেট ছিল এবং খাওয়ার আগে একটু জিন টনিক হিসেবে খেতে পছন্দ করতেন তিনি। অমিতের বাবা-মা দু'জনেই বেশ সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের ছিলেন, দু'জনেই গরমকালে দেশের বিভিন্ন হিল স্টেশনে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং নিজেরা সেখানকার বোর্ডিংস্কুলগুলোতে কাটিয়ে এসেছিলেন। আমেরিকার উচ্চবিত্তের জীবন দ্বারা কখনও প্রভাবিত হননি তাঁরা। তাঁরা ভারতে অন্যান্য সচ্ছল পরিবারের মতোই জীবনযাপন করতেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেশটা ছেড়ে চলে এসেছিলেন, একবারও ফিরে তাকাননি।

রেস্তরাঁয় বসেই তার বাবা ল্যাংফোর্ডের অ্যাডমিশনের প্যাকেটগুলো বের করে, দেখাচ্ছিলেন ক্যাম্পাসের ফোটোগ্রাফ, হাসিমুখে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসরুমের টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে পড়াতে পড়াতে টিচার মাঝপথে ধরা পড়েছেন ক্যামেরার লেন্সে। বাবা ওকে বোঝাচ্ছিলেন যে সে এখনও পর্যন্ত যেসব জায়গায় পড়েছে, তার চেয়ে এটা কত ভাল, কত পার্সেন্ট ছাত্রছাত্রী এখান থেকে আইভি লিগ কলেজে পড়তে যায়, ইত্যাদি। বাবার কথা শুনতে শুনতে অমিত বুঝতে পারছিল যে, দিল্লির হাসপাতালের অফারটা বাবা ইতিমধ্যেই অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন, এমনকী উইনচেস্টারে তাদের বাড়িটাও বিক্রির কথা ভাবা শুরু হয়ে গিয়েছে। অমিতের দিল্লি চলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না, তার বাবার মনে হয়েছিল যে, অন্য দেশে গিয়ে আবার সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে

AMARBOI.COM

নেওয়া এত পরিশ্রমের কোনও মানেই হয় না। কারণ তাঁর মতে শেষ পর্যন্ত তো অমিতকে কোনও আমেরিকান কলেজেই পড়তে আসতে হবে!

ক্রিসমাসে অর্থাৎ প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের শেষে ল্যাংফোর্ড থেকে বাবা-মা'র কাছে দিল্লিতে যেত অমিত, গিয়ে থাকত চিত্তরঞ্জন পার্কে পরিচারক-পরিচারিকায় ভরতি একটি ফ্ল্যাটে। যেখানে একটি ঘর তার জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল। দিল্লি যাওয়ার ব্যাপারটা কোনওদিনই ভাল লাগত না অমিতের। তার ভাঙা ভাঙা বাংলা ওই শহরে কোনও কাজে আসত না। কলকাতাকে খুব মিস করত সে, কারণ সেখানেই তার বেশিরভাগ আত্মীয় থাকতেন, যাদের কাছে সে প্রায়ই যেত। ইন্দিরা গাঁধীকে যে বছর হত্যা করা হয়েছিল, সেই বছরেই অমিতের বাবা-মা দিল্লি চলে এসেছিলেন। ফলে রায়ট, কারফিউ, ক্রমাগত বেড়ে চলা অরাজকতা নিয়েই বাস করতে হচ্ছিল তাঁদের। তাই অমিতকেও সেখানে প্রায় বন্দি হয়েই থাকতে হত, একে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থা, তার ওপর অমিতের করার মতোও কিছু ছিল না। সেদিক থেকে তার কাছে নিজের এই শান্ত শহরে ফিরে আসাটা অনেক বেশি স্বস্তির ব্যাপার ছিল। চার বছর পরে তার বাবা-মা আবার আমেরিকায় ফিরে এসে থাকতে শুরু করলেন হিউস্টনে। দিল্লিতেই তার বাবা অ্যাস্টিগম্যাটিজম সারানোর জন্য একটা লেসার টেকনিক আবিষ্কার করেছিলেন, যে জন্য তিনি বিশ্বের প্রায় সব হাসপাতালেই শিক্ষকতার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। পাঁচ বছর হিউস্টনে থাকার পর তাঁদের আবার সুইৎজারল্যান্ডের লুসানে চলে যেতে হয়। এখন তাঁরা আছেন সৌদি আরবে!

ল্যাংফোর্ডে থাকাকালীন সে-ই একমাত্র ভারতীয় ছাত্র ছিল এবং সকলে ধরে নিত যে সে ভারতেই জন্মেছে এবং বড় হয়েছে, ম্যাসাচুসেটস-এ নয়। তারা অমিতের ইংরেজি বলার ধরন বা অ্যাকসেন্টের খুব প্রশংসা করত। পনেরো বছর বয়সে সে ল্যাংফোর্ডে এসেছিল এবং সে বছর ল্যাংফোর্ডের হিসেব অনুযায়ী তখন ফোর্থ ফর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনকী, অমিতের ক্লাসের অন্যান্যরা ততদিনে নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব করে নিয়েছে, নিজস্ব গ্রুপও তৈরি হয়ে গিয়েছে। উইনচেস্টার হাই স্কুলে সে ছাত্রদের মধ্যে রীতিমতো 'স্টার' ছিল। কিন্তু এখানে এসে হঠাৎ করে ও যেন অথই জলে পড়ে গেল। প্রতিদিন সকালে তাকে জ্যাকেট পরতে হত, ক্লাসটিচারদের

AMARBOI.COM

'মাস্টার্স' বলে সম্বোধন করতে হত এবং প্রতি রবিবার চ্যাপেলে প্রার্থনাসভায় যেতে হত! খুব শিগগিরই সে বুঝে গিয়েছিল অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় তার বাবা-মায়ের সম্পত্তি নেহাতই হাস্যকর। দিনের শেষে তার পালানোর মতো কোনও জায়গা ছিল না। যদিও এসব কথা সে কোনওদিন কাউকে বলেনি, এমনকী, প্রতি উইকএন্ডে বাবা-মা যখন দিল্লি থেকে ফোন করতেন, তাঁদেরও নয়! বাড়ির জন্য ভীষণ মন কেমন করত, বাবা-মা'র কথা ভেবে মাঝে মাঝে চোখে জলও এসে যেত। স্কুলের চারপাশের লোকজনদের মধ্যে সে তার বাবা-মা'র ছায়া খুঁজত, তাঁদের কণ্ঠস্বরের আভাস পেতে চাইত ওদের কারও মধ্যে, যে অন্তত ওর জন্য একটুও ভাবে! কিন্তু কোনওটাই পায়নি অমিত, এমন একজনও কেউ সেখানে ছিল না, যে তাকে তার বাবা-মা'র কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। প্রথম সেমেস্টারের পর থেকে অমিত যথাসাধ্য তার এই নতুন জগতে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতারের প্রতিযোগিতা দিত, অন্যদের মতো সে-ও সকলকে পদবি ধরে ডাকতে শিখল, জিনস পরা বারণ বলে খাকি পরা অভ্যেস করে ফেলল! বাবা-মায়ের ওপর তার দৈনন্দিন নির্ভরতা আড়াল করে সে-ও অন্য সকলের মতো বাবা-মাকে ছেড়ে থাকতে শিখে গেল। যদিও তার বয়স তখন অল্প ছিল এবং এসব কাজ সে বেশ এনজয় করত, কিন্তু তবুও সে তার একাকিত্বের জন্য মনে মনে বাবা-মাকে ক্ষমা করেনি।

AMARBOI.COM

প্রত্যেক থ্যাঙ্কসগিভিং-এর সময় তাকে ও অন্যান্য ছাত্রদের, যাদের অন্য কোথাও যাওয়ার থাকত না, প্যামের ফ্যামিলি থেকে নিয়ে যাওয়া হত। স্যান্টিয়াগো, তেহরান বা পৃথিবীর অন্যান্য সমস্যাসংকুল জায়গা থেকে আসা ছাত্ররা কিংবা ডিপ্লোম্যাট বা সাংবাদিকদের ছেলেরা, যাদের বাবা-মায়েরা অমিতের বাবা-মা'র চেয়েও ঘনঘন কোথাও না কোথাও চলে যান, তারা সকলে মিলে ক্যাম্পাসের শেষপ্রান্তে বোর্ডেনদের বাড়িতে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করত। সঙ্গে অবশ্য প্যাম এবং তার তিন ভাইও থাকত। ভাইবোনেরা কিন্তু প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা বোর্ডিংস্কুলে পড়াশোনা করত, তবে সবসময়ই ছুটিতে বাড়ি ফিরে আসত। অমিতের কাছে প্রত্যেক বছরই এই বিশেষ সময়টা খুব উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। সে এবং অন্যান্য ছাত্ররা সকলেই প্যামের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। প্যাম ছিল তাদের পরিবারের একমাত্র মেয়ে, ক্যাম্পাসের একমাত্র ছাত্রী এবং অমিত ও বাকি সকলের মনে হত, সে যেন

গোটা পৃথিবীরই একমাত্র মেয়ে। ওরা প্রাণপণে প্রার্থনা করত যেন খাওয়ার সময় ওদের সিট প্যামের একটু কাছাকাছি পড়ে এবং গোটা সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর ওরা প্যামের কথা বলাবলি করত। নর্থফিল্ড মাউন্ট হারমনে প্যামের জীবন, তার বুকের গঠন, হালকা বাদামি সোজা চুল সকালবেলা কীভাবে তার পিঠের ওপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে, এসব নিয়ে তারা কল্পনা করতে ভালবাসত! তারা ভাবতে থাকত, বাড়ি ফেরার পর প্যাম যে ঘরে ঘুমোয়, সে ঘরটাই বা কেমন! তারা লক্ষ করেছিল সে কী ধরনের মাংস খেতে ভালবাসে সাদা না লাল এবং দেখেছিল যে এক বছর সে টার্কি একেবারেই খায়নি।

প্যাম সম্ভবত তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা ওই মুগ্ধতা সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করেছিল। এটা যে সে পছন্দ করত না, তা নয়। তবে তার অভিব্যক্তি কখনওই মাত্রা ছাড়াত না। তবে সে এমন একজন ব্যতিক্রমী টিনএজার ছিল, যে পুরুষদের ওপর তার প্রভাব বা প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সচেতন, অথচ একই সঙ্গে তাদের প্রতি উদাসীন। ছেলেদের সঙ্গে কোনওরকম অস্বস্তি ছাড়াই সহজভাবে মিশতে পারত প্যাম, যা অনেক মেয়েই পারে না। সেটা এই কারণেও হতে পারে যে, সে এমন একটা বাড়িতে বড় হয়েছিল, যেখানে ছেলেদের সংখ্যাধিক্য। বোর্ডেনরা খুব নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁদের পরিবারের সকলকে, এমনকী একজন বাচ্চাকেও এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে তারা এই আমন্ত্রিত ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে পারে। খাওয়ার টেবিলে বসে প্যাম এমনভাবে অমিত এবং অন্যদের সঙ্গে পড়াশোনা কেমন চলছে গোছের প্রশ্ন করত, তাতে মনে হত, সে যেন মোটেই পনেরো বছরের কিশোরী নয়, ওদের মায়ের বয়সি কেউ। আবার তারাই পরের বছর পর্যন্ত তার এই সচেতন দৃষ্টি থেকে হারিয়েও যেত। খাওয়াদাওয়ার পর হেডমাস্টার বোর্ডেন তাদের একটা লনে নিয়ে যেতেন ফুটবল খেলার জন্য। তাদের সঙ্গী হত প্যামের ভাইরা। অথবা তারা বাড়িতেই থাকত আর মিসেস বোর্ডেন, যিনি স্কুলে ফ্রেঞ্চ পড়াতেন, তাঁর সঙ্গে বসে জটিল সব শব্দের খেলার নিয়মকানুন শিখত।

ল্যাংফোর্ডের শেষ বছরে অমিত ভরতি হয়েছিল কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে। তাদের ক্লাস থেকে আর কেউ সেখানে অ্যাডমিশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয়নি। কিন্তু তার পরই একদিন মি. বোডেন তাকে ডেকে বললেন যে, প্যামও কলম্বিয়া যাবে ঠিক করেছে, অমিত যেন প্যামের খেয়াল রাখে। কিন্তু প্যামই ওকে বলেছিল, ওসবের কোনও দরকার নেই। কারণ প্যাম যেমন নিউ ইয়র্কে কলেজে নতুন, অমিতও তো তাই। অনেকটা প্যামের ইচ্ছেতেই তারা দু'জনে খুব ভাল বন্ধু হয়ে গেল। প্রায়ই তারা সপ্তাহে দু'বার অন্তত রিলিজিয়ন ক্লাসের পর ডিনার করতে যেত। ক্যাফে পারতুতি-তে গিয়ে বসত, অর্ডার দিত ক্রিমি পাস্তা কিংবা লা রোসিতায় গিয়ে ক্যাফে কন লিচ, রাইস অ্যান্ড বিন্স! তার পরে বাটলার লাইব্রেরির একই ঘরে মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করত মিল্টন এবং মার্ক্স। প্যামের কতগুলো অদ্ভুত আচরণ দেখে অমিতের তার প্রতি ভালবাসা আরও বেড়ে যেত। প্যাম বইগুলো কখনওই ব্যাকপ্যাকে বা ব্যাগের মধ্যে রাখত না, বরং বুকের কাছে জড়ো করে আগলে রাখত। পোশাক-আশাক নিয়েও বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না তার। কলেজে সকলে যখন রংবেরঙের সোয়েটার পরে আসত, প্যাম সেই এক জ্যাকেট পরেই কাটিয়ে দিত। প্যামের নামের শেষ দুটো অক্ষর অমিতের নামের শুরুর অক্ষর দুটোর সঙ্গে মিলে যায়। এই সামান্য মিলের কথাটা কাউকে বললে হয়তো সে হাসবে। তাই অমিত কাউকে বলেনি ঠিকই, কিন্তু মনে মনে ভাবত যে, তারা যেন একসঙ্গে থাকার জন্যই জন্মেছে।

AMARBOI.COM

প্রথমদিকে অমিতের ব্যাপারটা বেশ রোম্যান্টিক লাগত। কিন্তু খুব শিগগিরই সে বুঝতে পারল প্যামের অন্য সম্পর্ক রয়েছে। অমিত শুধুই তার বন্ধু। প্যাম চায় এমন লোকজন ওকে ঘিরে থাকুক যে তাকে নিরাপদে রাখবে তার ভাইদের মতো, তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং কোনওরকম দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। অমিতের মনে হয়, কলেজে থাকাকালীন এই ধরনের একজনেরই ভূমিকা পালন করার জন্য প্যাম বন্ধুত্ব রেখেছিল। কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আগে প্যাম অমিতকে তার পছন্দের ছেলেদের ভাবমূর্তি সম্পর্কে, তাদের অতীত সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলত। তার বদলে সে অমিতকে পরামর্শ দিত, কীভাবে অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা উচিত। এইসব ব্যাপারে কলেজে অমিতের প্রথম প্রেম, এলেন ক্র্যাডকের সঙ্গে অ্যাফেয়ারের সময় তাকে প্যামই গাইড করেছিল। শুধু তাই নয়, নিজের স্বভাবের বাইরে গিয়ে এলেনের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুত্বও করেছিল প্যাম, শুধুমাত্র অমিত ও এলেনাকে একসঙ্গে কলেজে ঘোরাঘুরি করতে বাধ্য করার জন্য।

একবারই মাত্র প্যামের ক্ষেত্রে অমিত নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ারে একটা পার্টিতে ড্রিঙ্ক করার সময় অমিত সেদিন প্যামকে চুমু খেয়েছিল এবং তার বুকে হাত দিয়েছিল। প্যাম সেদিন একটা গাঢ় সবুজ টার্টলনেক সোয়েটার পরেছিল। চুমুর প্রত্যুত্তর চুমুতেই সেদিন দিয়েছিল প্যাম, এমনকী তাকে স্পর্শ করাতেও আপত্তি করেনি। কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল, যেন সে আগে থেকেই জানত এমন একটা কিছু হতে পারে। অমিতকে প্যাম বলেছিল, "এখন তো আমরা জেনে গেলাম কেমন লাগে!" অমিত তখনই বুঝে গিয়েছিল তাকে অন্য চোখে দেখা প্যামের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বছরে একবার সে যেমন পরিবারে প্রশ্রয় পেত, অনেকটা সেইভাবেই প্যাম প্রশ্রয় দিয়েছে তাকে। নিজের এক টুকরো সত্তা অমিতের কাছে এগিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

প্যাম এখনও নিউ ইয়র্কেই থাকে এবং একটি সাহিত্য সংস্থায় বিদেশি বইয়ের স্বত্ব বিক্রির কাজ করে, তবুও অমিতের সঙ্গে ওর দেখা হয় খুব বেশি হলে বছরে একবার কি দু'বার, তাও ঘটনাচক্রে! হয়তো কোনও সাবওয়েতে, রাস্তার ধারে, কিংবা শহরের ভিড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বরাবরই অমিতের ঠিকানা প্যাম রেখেছে এবং ক্রিসমাসে এমনকী জন্মদিনেও নিয়মিত প্যামের পাঠানো কার্ড পেত অমিত। প্যাম অনেকটা সেই ধরনের লোক, যারা সমস্ত তারিখ মনে রাখে। যখন অমিত আর মিগ্যানের বিয়ের খবর প্যাম শুনল, সে তাদের টিফনির ক্যান্ডেলস্টিক পাঠিয়েছিল। তাদের মেয়ে হওয়ার পরও মেয়েদের জন্য ইউরোপিয়ান পোশাক, কাশ্মীরি কম্বল ইত্যাদি পৌঁছেছিল অমিতের কাছে। কিন্তু নিজের বিয়ের খবর জানাতে কোনও ফোন করেনি অমিতকে, শুধু নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিল এবং এত বছর পরে অমিত সত্যিই মনে মনে খুশি হয়েছিল এই ভেবে যে, প্যাম ও বোর্ডেনদের সঙ্গে তার যোগাযোগটা অন্তত তাকে তার প্রাত্যহিকতার বাইরে নিয়ে যায়।

অতিথিরা এসে একটা সুন্দর গাছের নীচে দাঁড়াচ্ছে, যেখানে একটা বারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিয়ের অনুষ্ঠান শুরুর আগে আমন্ত্রিতদের ককটেল সার্ভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য। লনে সাদা ফোল্ডিং চেয়ারের সারি, পিছনে নীলচে সাদা পাহাড়, তার আড়ালে এখনই সূর্যাস্ত হবে। এই জায়গা থেকে অমিত একদিন গ্র্যাজুয়েট হয়েছিল। তখন তাকে অন্যরকম দেখতে ছিল, রোগা তার চুলও ছিল কিছুটা কালো। কলেজে প্যামই তাকে চুলে রং করতে বারণ করেছিল। তার বক্তব্য ছিল, চুলের জন্যই অমিতকে অন্যদের চেয়ে আলাদা দেখাবে আর মেয়েরা এতেই আকৃষ্ট হবে। অমিত তখন তার কথা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু পরে দেখেছিল প্যাম কথাটা খুব একটা ভুল বলেনি। আজ পর্যন্ত যতজন মেয়ের সঙ্গে অমিতের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও ভাবে স্বীকার করেছে যে, অমিতের চুলটা খুব সেক্সি।

"চলো অন্যদিকে যাই," বলে মিগ্যান তাকে নিয়ে অতিথিদের ভিড়ের দিকে চলল। অমিত ওর বাঁপাশে সরে গিয়ে একসঙ্গে এগোল। যথারীতি এক জায়গায় সার বেঁধে প্রচুর বোতল আর দুটো লেমোনেডের বড় বোল রাখা ছিল। তারা পাশাপাশি পানীয়র জন্য লাইনে দাঁড়াল। "স্পাইকড না আনস্পাইকড?" জিজ্ঞেস করল বারটেন্ডার। ওরা দুটো স্পাইকড ড্রিঙ্কে চুমুক দিতে দিতে লনের দিকে হাঁটা দিল। চারপাশে লোকজনদের লক্ষ করছিল অমিত। কিছু লোক কাঁধে সবে হাঁটতে শেখা বাচ্চাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মায়েরা ক্যারিয়ারে থাকা শিশুদের নিয়ে ব্যস্ত, আর-একটু বড় বাচ্চাদের পিছনে পিছনে ছুটছে তাদের ন্যানিরা। দেখলে মনে হয়, এই ন্যানিরা বড়জোর হাই স্কুলের ছাত্রী, হয়তো এই অনুষ্ঠানটার জন্যই বিশেষ করে তাদের ভাড়া করা হয়েছে। বাবারা কখনও গাছের দিকে আবার কখনও আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে গোটা উপত্যকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়া মেঘ দেখাচ্ছে। কাউকেই চেনা মনে হল না অমিতের এবং তার দুই মেয়ের জন্য মন কেমন করছিল। মিগ্যান বলল, "অনেক বাচ্চাদের দেখছি এখানে।"

"আমার মনে হয়, আমাদের মেয়েরাও এখানে এনজয় করত।"

"কিন্তু তখন আমরা আর নিজেরা এনজয় করতে পারতাম না, চিয়ার্স।"

"চিয়ার্স!"

তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে না তাকিয়েই গেলাস দুটো সামনে তুলল।

স্কুলে দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্ক করতে অমিতের অদ্ভুত লাগছিল। ওর মনে পড়ে গেল স্কুলের লুকিয়ে চুরিয়ে পার্টির কথা, বোতলগুলো এনে শুক্রবার এবং শনিবার

AMARBOI.COM

ডর্মে লুকিয়ে রাখা হত, সবসময় ভয় থাকত যদি প্রোক্টর চলে আসেন!

অমিত মিগ্যানকে বলল, "বুড়ো হয়ে গিয়েছি মনে হচ্ছে।" ঠিক তখনই দেখতে পেল একটা পরিচিত মুখ তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। লোকটির হালফ্যাশানের চশমাটা নতুন হতে পারে, কিন্তু তার নীল চোখ, ঢেউ খেলানো বাদামি চুল, চিবুকের ভাঁজ সবই ওর ভীষণ চেনা, তারা একসঙ্গে বহু ক্লাস করেছে। অমিতের হঠাৎই মনে পড়ল কেমিস্ট্রিতে ওরা ল্যাব পার্টনারও ছিল। ছেলেটির বাবা আর প্যামের বাবা একসঙ্গে বড় হয়েছিলেন, আর সেই কারণেই সে হেডমাস্টারকে সবসময় 'আঙ্কল বোর্ডেন' বলে সম্বোধন করত। লোকটির পদবি মনে পড়ল অমিতের, স্কালট্জ! কিন্তু নামটা কিছুতেই মনে করতে পারল না সে।

"সরকার," স্কালট্জ এগিয়ে এসে বলল, "অমিত সরকার, তাই না?"

অমিত হাত বাড়িয়ে দিল, স্কালট্জের নামটা ঠিক তখনই মনে এল ওর। হাসিমুখে বলল, "অনেকদিন পর তোমায় দেখে খুব ভাল লাগছে। আমার স্ত্রী মিগ্যান। মিগ্যান, এই হচ্ছে টিম।"

স্কালট্জের মুখ থেকে হাসিটা মুছে গেল। "টিম নয়, টেড।"

"ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, টেড! টেড আয়্যাম সরি। মিট মাই ওয়াইফ মিগ্যান।"

হঠাৎই তার নিজেকে খুব বোকা লাগল, এই ছোট্ট ভুলটা তাকে মনে করিয়ে দিল ল্যাংফোর্ডের প্রথম সেমেস্টারের কথা, যখন সে অন্যদের খুশি করার প্রাণপণ চেষ্টা করত। মনে মনে নিজেই নিজেকে ধমকাল অমিত, নামটা বলার কী দরকার ছিল! ওটা না বললেও তো কথোপকথন নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে পারত। একসময় নিজে থেকেই নামটা মনে আসত! মিগ্যান আর টেড তখন হ্যান্ডশেক করছিল। অমিত আবারও বলল, "আমি সত্যিই দুঃখিত! আসলে অনেক সকালে আজকে বেরিয়েছি আর গাড়িতেও অনেকক্ষণ লেগেছে।"

"ও নিয়ে ভেবো না," এমনভাবে টেড বলল যে অমিতের অস্বস্তিটা আরও বেড়ে গেল। টেড জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবা-মা কি এখনও ভারতেই আছেন?"

"ওঁরা এসেছিলেন, আবার চলে গিয়েছেন।"

"তুমি এখন কোথায় থাকো?"

কথায় কথায় জানা গেল যে, টেডও এখন ম্যানহাটানেই থাকে। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে এবং ও এখন একটা ল ফার্মে চাকরি করে।

"প্যাম শেষ পর্যন্ত যে লোকটাকে বিয়ে করছে, মানে আমাদের বাদ দিয়ে ফাইনালি যার সঙ্গে ঘর বাঁধছে, তাকে কি চেনো তোমরা?"

"আমি চিনি না রায়ানকে," বলেই অমিতের মনে হল কথাটা শুনে মিগ্যান আবার কী ভেবে বসবে কে জানে।

"আমি যতটুকু জানি ও টিভিতে স্ক্রিপ্ট লেখে," টেড বলল, "আইন-সংক্রান্ত বিভিন্ন শো-তেই। ওই শোগুলোই তো আমার পেশায় একটু-আধটু গ্ল্যামার যোগ করে। মনে হয়, এই কাজের জন্যই ওরা লস অ্যাঞ্জেলেস যাচ্ছে। শুনেছি, ওই শো-এর একজন অভিনেতা এখন এখানে আছেন।"

ওরা চারপাশ ভাল করে লক্ষ করল, কে সেই সেলেব্রিটি হতে পারেন। ভিড়টা বেশ আকর্ষক, কালো ককটেল ড্রেসে অনেক মহিলাকেই দেখা যাচ্ছে। মিগ্যানের স্কার্টের কথা তখনই মনে পড়ে গেল অমিতের। সে একটু এগিয়ে গিয়ে মিগ্যানের কোমরে হাত দিল।

"কোথায় তোমাদের দেখা হয়েছিল?" টেড জিজ্ঞেস করল।

"মেড স্কুলে," বলল মিগ্যান।

"ওহ, ড. সরকার, আমি ইমপ্রেসড।"

"এটা মিগ্যানের ক্রেডিট," অমিত বলল, "ও শেষ পর্যন্ত পড়েছে, আমি না।"

এরই মধ্যে একটা হালকা মিউজিক বেজে উঠল এবং অতিথিরা বসার জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। অমিত আর মিগ্যান পিছনের দিকের চেয়ারে গিয়ে বসল এবং মিগ্যানের হিল ঘাসে ডুবে যাচ্ছে বলে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল সে। খালি গেলাসগুলো চেয়ারের নীচে রেখে দিল। সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকাল যখন প্যামের ভাবী বর চেয়ারের সারির মধ্যে দিয়ে হেঁটে সেন্টার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। সেখানে একজন ধর্মযাজক দাঁড়িয়ে ছিলেন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হলেও রায়ানকে দেখতে বেশ ভালই, লম্বা, সামান্য তামাটে রং, গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি, সব মিলিয়ে হ্যান্ডসাম বলাই যায়। কিছুক্ষণ পর প্যাম বাবার হাত ধরে এল, পিছনে মা এবং ভাইয়েরা। মিসেস বোর্ডেন এখনও আগের মতোই আছেন, হলদেটে লাল চুলে একই হেয়ারস্টাইল, ফিগারও একই রকম স্লিম। উনি অতিথিদের দিকে

AMARBOI.COM

তাকিয়ে হেসে আশ্বস্ত করলেন। সারা জীবন ধরেই বোর্ডেনরা এরকম অনেক জমায়েতের মধ্যমণি হয়ে থেকেছেন। সাপ্তাহিক অ্যাসেম্বলি, হোমকামিং গেম্‌স অ্যান্ড গ্র্যাজুয়েশন, তো লেগেই থাকত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এটা তাঁদের কাছে তেমন কোনও নতুন অভিজ্ঞতা নয়। শুধু একজনকেই চিনতে পারল না অমিত। একটু লম্বাটে মুখের মিষ্টি একটা বছর বারোর মেয়ে গম্ভীর মুখে প্যামের পিছন পিছন ফুলের বোকে নিয়ে এগিয়ে আসছিল। অমিত আন্দাজ করল মেয়েটি হয়তো প্যামের ভাগনি বা কোনও তুতো বোন হবে। প্যাম একটা হাত-কাটা হাতির দাঁতের রঙের কুঁচকোনো কাপড়ের পোশাক পরেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল প্যাম যেন একটা লম্বা বেডশিট হালকা করে নিজের চারদিকে জড়িয়ে রেখেছে, যদিও বেশ সুন্দর লাগছে। হাসিমুখে হলুদ ফ্রিসিয়া হাতে প্যাম যেন একটা ঢেউয়ের মতো একদিক থেকে অন্যদিকে যাচ্ছিল লোকজনের দিকে হাত নাড়াতে নাড়াতে। এখনও পর্যন্ত অমিতের কাছে প্যামই সবচেয়ে সুন্দরী নারী।

বরকনে অতিথিদের দিকে পিছন করে এবং যাজকের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। পাহাড়ের ওপাশে সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। অমিত যেমনটা ভেবেছিল ঠিক সেরকমই কোনও কনেযাত্রী ছাড়াই একটা সংক্ষিপ্ত সহজ-সরল অনুষ্ঠান হল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে একটা কবিতা জাতীয় কিছু একটা পাঠ করল, মাইক্রোফোন না থাকায় সেটা শোনা গেল না। তবুও অনুষ্ঠানটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। আকাশজুড়ে তখন পাহাড়ের ওপর দিয়ে গাঢ় পিচ আর প্লাম রঙে মেশানো আভা ছড়িয়ে পড়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানের অংশটুকু ছাড়া স্কুলের বিস্তীর্ণ মাঠ রীতিমতো নির্জন। সে দেখল হাওয়ায় প্যামের কয়েকটা চুল আলগা হয়ে উড়ছে। রোজ এইসময় এখানে একটা শীতল পাহাড়ি হাওয়া এসে সারাদিনের উত্তাপ দূর করে দেয়। হাওয়াটা আসতে অনেক মহিলাই কাঁধে শাল জড়িয়ে নিলেন। প্যামের বয়স এখন সাঁইত্রিশ, কিন্তু পিছন থেকে দেখলে মনে হচ্ছে একজন উনিশ বছরের মেয়ে। বলতে গেলে একটু দেরিতেই বিয়ে করছে প্যাম, অমিতের বিয়ের বেশ অনেকদিন পরে।

বিয়ের অনুষ্ঠানটা দেখতে দেখতে অমিতের মনে হল, প্যামের সঙ্গে তার যে হালকা যোগাযোগটা বরাবরই ছিল, সেটা এখানে আসার পক্ষে যথেষ্ট। তার ভাবতে ভাল লাগছিল যে, প্যামের বিয়ে, তার জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনার সাক্ষী হয়ে রইল সে। নিজের জীবনে অমিত ঠিক

AMARBOI.COM

যা-যা আশা করেছিল সেরকমই ঘটেছে। মিগ্যান, কেরিয়ার, তার নিউ ইয়র্কের জীবন, মেয়েদের জন্ম, সবই। তার জীবনে মায়া ও মোনিকার আবির্ভাব, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে হয় অমিতের, সেটা ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। এসব কোনও কিছুরই পরিবর্তন সে চায় না। শুধু মাঝেমধ্যে তার মনের এক অংশে মিগ্যানের সঙ্গে প্রথম প্রেমের দিনগুলোতে ফিরে যেতে খুব ইচ্ছে করে, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির আনন্দের স্বাদ আবার একবার নতুন করে অনুভব করার জন্য।

প্যাম আর রায়ান যখন পরস্পরকে চুমু খেল, সকলে হাততালি দিয়ে উঠল। উত্তেজনায় তাদের চোখ খুলে গেল। ঠিক তখনই একটা মিউজিক শুরু হল এবং ঘাসের ওপর শুরু হল বিয়ের পার্টি। অমিত উঠে দাঁড়াল এবং কিছু বলার আগেই তার মনে পড়ে গেল এখন মিগ্যানের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে। তারা দু'জনে মিলে একসঙ্গে গিয়ে রিসিভিং লাইনে অন্যদের পিছনে এসে দাঁড়াল। প্যাম তখন মাথা ঝাঁকিয়ে লোকজনের কথায় হাসছিল, কখনও চুমু খাওয়ার জন্য তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। অমিতকে দেখামাত্রই সে বলে উঠল, "তোমার মেয়েরা কোথায়?" বলেই তার মুখটা এগিয়ে দিল যাতে অমিত তার দু'গালে চুমু খেতে পারে! অমিত অনুভব করল প্যামের ত্বক এখনও আগের মতোই নরম। সে দেখল মিসেস বোর্ডেন দ্রুত পায়ে তত্ত্বাবধান করছেন চারদিক।

অমিত প্যামকে বলল, "আমরা ওদের মিগ্যানের মা-বাবার কাছে রেখে এসেছি। একটু মুক্তির স্বাদ উপভোগ করতে চাই আমরা।"

"আমি তো ভোর পাঁচটা পর্যন্ত থাকতে চাই," মিগ্যান খুশি খুশি গলায় বলল, "সারারাত ধরে সেলিব্রেট করে আমাদের ব্যালকনি থেকে সূর্যোদয় দেখতে চাই।"

অমিত কিছুটা অবাক হয়ে মিগ্যানের দিকে তাকাল। তাকে তো মিগ্যান এসব কিছুই বলেনি। সে যতদূর জানত— উইকএন্ডে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিরুপদ্রবে ঘুমানো। সে জিজ্ঞেস করল, "সত্যিই তাই করবে নাকি?"

মিগ্যান অমিতের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। প্যামকে বলল, "তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে। ড্রেসটা সত্যিই খুব সুন্দর।"

মিগ্যান কিন্তু কথাটা খুব আন্তরিকভাবেই বলেছিল, আগে প্যাম সম্পর্কে যেমন একটা অস্বস্তি ছিল, তার কোনও আভাস ছিল না তাতে। অমিতের

AMARBOI.COM

মনে হল প্যাম এখন বিবাহিত, অন্য একজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, অমিতের তার প্রতি আর একটুও অধিকার নেই, একথা ভেবেই কি মিগ্যান এত সহজ ও স্বাভাবিক!

তারা রায়ানের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। রায়ান অমিতকে বলল, "প্যাম আমাকে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে।"

"কনগ্র্যাচুলেশন, অল দ্য বেস্ট," অমিত বলল রায়ানকে।

"দেখা যাক ওকে আমি একজন ক্যালিফোর্নিয়া গার্লে পরিণত করতে পারি কিনা!"

"রায়ানের ছেলেমেয়েরা হয়তো এখানেই কোথাও ঘোরাঘুরি করছে," প্যাম বলল অমিতকে। "যে ফুলের বোকে নিয়ে আসছিল, ওর নাম ক্লেয়ার।"

পরক্ষণেই নিজের ভুল শুধরে নিয়ে, রায়ানের গালে চুমু খেয়ে বলল, "সরি, সুইটি, আমাদের ছেলেমেয়েরা।"

প্যাম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল অমিতের দিকে, যেন বলতে চাইল, ভাবতে পারছ, আমি সৎমা? তার মানে এটা রায়ানের দ্বিতীয় বিয়ে, যেখানে তার অন্য স্ত্রীর ছেলেমেয়েরাও উপস্থিত। পলকমাত্রায় ওই লম্বাটে মুখের মেয়েটা এখন প্যামের সৎ মেয়ে। অমিত কিন্তু প্যামের ক্ষেত্রে সত্যিই এটা ভাবতে পারেনি যে, প্যাম এত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কারও সঙ্গে তার জীবন শুরু করবে।

"আমি কিন্তু সত্যিই আশা করছিলাম তোমার মেয়েদের দেখব।" প্যাম বলল, "ওদের কোনও ছবি আছে?"

মিগ্যান ওর ব্যাগ খুলে খোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু এখন সে একটা ছোট বিডসের কাজ করা ইভনিং পার্স নিয়ে এসেছে, ওয়ালেটটা ফেলে এসেছে হোটেলের ঘরে।

"আমার কাছে কয়েকটা আছে," বলে অমিত দুটো ছবি দেখাল।

মায়া ও মোনিকার দু'জনেরই সদ্যোজাত অবস্থায় তোলা ছবি, ওদের চোখ বোজা, ঠোঁট দুটো পাতলা আর সরু— ঠিক একটা সূক্ষ্ম সরলরেখার মতো, "ওদের এখনকার চেহারার সঙ্গে অবশ্য একটুও মিল পাওয়া যাবে না।"

"ওদের কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসে আসতেই হবে, ইনফ্যাক্ট তোমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলকেই এসে রায়ানের বিচ হাউজে থাকতে হবে," প্যাম হাসল, "মানে, আমাদের বিচ হাউজে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব," বলল মিগ্যান। কিন্তু অমিত জানে সেটা কোনওদিনই হবে না। এখানেই শেষ। এরপর আবার নতুন করে প্যামের জীবনে প্রবেশ করার কোনও মানেই হয় না।

"কাল এই ক্যাম্পাসে আরেকটা অনুষ্ঠান আছে, তোমরা আসছ তো?" প্যাম তার পুরনো চেনা সুরে কথাটা জিজ্ঞেস করল অমিতকে, যেন তার খুব জরুরি দরকার আছে অমিতের সঙ্গে, পরীক্ষার নোট নিতে হবে একসঙ্গে কিংবা ওর লেটেস্ট কলেজ অ্যাফেয়ার নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে, ঠিক যেমনটা আগে করত তারা।

"নিশ্চয়ই," অমিত আশ্বস্ত করল প্যামকে।

"তুমি আসাতে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি, তোমায় দেখে যে কী ভাল লাগছে," বলল প্যাম। ক্ষণিকের জন্য অমিতের মনে হল তার কথায় যেন তাদের একসময়কার বন্ধুত্বের একটা আভাস খেলা করে গেল। অমিত সবসময়ই প্যামের ব্যাপারে অনেক বেশি মনোযোগী ছিল, এমনকী তার ভাইদের চেয়েও বেশি। প্যাম সেকথা একবার স্বীকারও করেছিল। এখন তার চোখের দৃষ্টিতে সেই কথাটা আর-একবার স্বীকার করার ইঙ্গিত দেখতে পেল অমিত। সে বলল, "এই অনুষ্ঠানটা আমরা কখনওই মিস করতাম না।"

যে লাইনে তারা দাঁড়িয়ে ছিল, সেটাই শেষ পর্যন্ত তাদের নিয়ে এল পার্টির ভিড়ে। মিগ্যান একবার রেস্টরুমে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। অমিতকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি জানো, কোন দিকে আছে?"

অমিত চারপাশে তাকাল, লনের উলটো দিকে যেখানে লোকেরা সব ওর দ্য উভর খাওয়ার জন্য ভিড় করে আছে, সেখানে একটা বিল্ডিং আছে। ওটা আসলে অ্যাডমিশন বিল্ডিং। গাড়িবারান্দা দিয়ে ঘেরা ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের ওই বিশাল বড় বিল্ডিংটার পিছনের দিকের দুটো দরজা অবশ্য খোলা আছে, কিন্তু সেখানে ওয়েটাররা ব্যবহৃত ট্রে, নোংরা ডিশ ইত্যাদি জমা করছে। অমিতের মনে পড়ল ভরতি হওয়ার সময় বাবা মায়ের সঙ্গে ওখানেই গিয়েছিল সে। মি. প্লটকিন বলে একজন কড়া ভদ্রলোক ওর ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন অমিত কেন ল্যাংফোর্ডে পড়তে চায়। যেহেতু তার বাবা-মা বাইরে বসে ছিলেন, অমিত নির্ভয়ে সত্যি কথাই

AMARBOI.COM

বলেছিল মি. প্লটকিনকে। বলেছিল তার বাবা মা দিল্লি চলে যাচ্ছেন এবং তাঁরা চান না যে অমিত ওখানকার কোনও স্কুলে পড়ুক। কিন্তু তার রিপোর্টকার্ড আর রেকমেন্ডেশন রাখা টেবিলের উলটো দিকে বসা মি. প্লটকিন তাকে বলেছিলেন, "আমার বলতে খারাপ লাগছে যে এটা একজন ল্যাংফোর্ডের ছাত্রের উপযুক্ত উত্তর হল না।" তারপর তিনি বুকের কাছে হাত দুটো ভাঁজ করে অপেক্ষা করছিলেন অমিতের কাছ থেকে ঠিকঠাক উত্তর শোনার জন্য।

"হয়তো ওখানে বাথরুম খুঁজে পাওয়া যাবে।" মিগ্যানকে বলল অমিত। তারপর বিশ্বস্ত সঙ্গীর মতো মিগ্যানের ঠিক বাঁপাশে থেকে বিল্ডিং-এর দিকে হাঁটতে লাগল। কিন্তু ভিতরে ঢুকে ওরা দেখল যে, লেডিজ বাথরুমের সামনে খুব লম্বা একটা লাইন।

মিগ্যান ফিসফিস করে বলল, "এখন কী করি?"

"আমি তো তোমার সঙ্গে এখানে এই লাইনে অপেক্ষা করতে পারব না। এখানে তো সবাই মহিলা। তবে তুমি চিন্তা কোরো না, এখানে কেউ তোমার স্কার্টের দিকে খেয়াল করবে না।"

"তাই?" বলে মিগ্যান ওর পার্সটা নিয়ে হাতটা এমনভাবে রাখার চেষ্টা করতে লাগল যাতে স্কার্টের পুড়ে যাওয়া অংশটা দেখা না যায়। স্কার্টের ওপর একটা সাদা শার্ট যার সামনের খোলা অংশ দিয়ে ভিতরে গোলাপি ক্যামিসোল দেখা যাচ্ছে। গলায় কিছুই পরেনি মিগ্যান। তার মা মাঝে মাঝে ওকে গয়না-টয়না উপহার দেন। কিন্তু ও সেসব জুয়েলারি পরে না, কারণ ওর রুচির পক্ষে ওগুলো বড় জবরজং!

"তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে," অমিত বলল। কথাটা ওর অনেকক্ষণ ধরেই মনে হচ্ছিল, কিন্তু এতক্ষণ বলেনি, এই প্রথম বলল, "আমি দু'জনের জন্য ড্রিঙ্ক নিয়ে আসি, আর একটু লেমোনেড? তারপর এখানে এসে দেখা করছি তোমার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

মিগ্যান তখনও পার্সধরা হাতের পজিশন ঠিক করে চলেছে। অমিত দেখতে পেল বারের লাইনে ওর অনেক পুরনো টিচার দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁদের বেশিরভাগই এখন মধ্যবয়স্ক, কিছুদিন পরেই হয়তো রিটায়ার করবেন, এই যেমন মিসেস র‍্যান্ডাল, ওদের ফিজিক্স টিচার যাঁকে একসময়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর খুব ভাল লাগত, আবার মি. প্লটকিন যাঁর চোখ দুটো দেখলেই ভয় পেত সে। মি. ন্যাগলকেও দেখতে পেল। উনি ওদের ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন এবং স্কুল নিউজপেপার দ্য ল্যাংফোর্ড লেজেন্ডের উপদেষ্টাও ছিলেন। অমিত বেশ কয়েকবার এই পত্রিকায় লিখেছে, কয়েকবার এডিটও করেছে। মি. ন্যাগল ওদের স্কুল ফ্যাকাল্টিতে বয়সে সবচেয়ে ছোট ছিলেন। অমিত যখন ছাত্র, তখন তিনি জাস্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন। যুবক শিক্ষকের প্রাণচঞ্চল চেহারা, মাথার কালো চুল দেখে অমিতের মনে হত, রিঙ্গো স্টারের চেহারাটা আর একটু বেঁটে এবং রোগা হলে যেমন হত, ঠিক তেমন। মি. ন্যাগল আসলে উইনচেস্টারের লোক ছিলেন এবং ওখানকার হাইস্কুলেরই গ্র্যাজুয়েট। সেই কারণে অমিত সবসময় তাঁর প্রতি একটা আলাদা টান অনুভব করত।

"দাঁড়াও, আমাকে আন্দাজ করতে দাও। এখন তুমি দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে লেখালেখি করছ, তাই না?" মি. ন্যাগল বললেন অমিতকে।

"না, মানে, আমি এখন একটা মেডিক্যাল জার্নালে কাজ করি।"

"তাই নাকি? আমার তো মনে হত যে সায়েন্সে তুমি খুব একটা আগ্রহী ছিলে না।"

সত্যিই আগ্রহী ছিল না অমিত। ও যে সাংবাদিক হতে চাইত, এটা একেবারে সত্যি কথা। স্কুলের সেই আট পাতার কাগজটার জন্য খাটতে তার সত্যিই ভাল লাগত। অমিতের মনে পড়ে যাচ্ছিল লাইব্রেরিতে বসে স্টোরি আইডিয়া মাথা থেকে বের করা, ফ্যাকাল্টির সদস্যদের আর অ্যাসেমব্লিতে যেসব বিখ্যাত লোকেরা বক্তৃতা দিতেন তাদের ইন্টারভিউ করা... স্কুল লাইফে একজন রিপোর্টার হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে তার এতটাই ভাল লাগত যে সে স্কুলের অন্য সমস্ত অপছন্দের জিনিসগুলো সহ্য করে নিত। কিন্তু অমিত খুব ভালভাবেই বুঝে গিয়েছিল যে জার্নালিজমটা তার ক্ষেত্রে কখনওই একটা কেরিয়ার অপশন হতে পারে না, কারণ তার বাবা-মা এ-ধরনের ভাবনা চিন্তাকে কখনওই প্রশ্রয় দেবেন না। বাবা-মা'র সঙ্গে এই যুদ্ধটা করার মতো সাহস তার কোনওদিনই ছিল না। তাঁরা তাকে মেডিক্যাল স্কুলে পড়াতে বদ্ধপরিকর ছিলেন কারণ তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, সেও একদিন তার বাবার মতো একজন বড় ডাক্তার হবে।

সায়েন্সে তার দক্ষতা ছিল, তাই সায়েন্স নিয়েই পড়াশোনা চালিয়ে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে। কলম্বিয়ায় মেজর সাবজেক্ট হিসেবে বায়োলজি নিয়ে পড়ার পর সে সেখানেই মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলো। দু'বছর সেখানে ছিল। অবশ্য তার থাকার প্রধান কারণ ছিল মিগ্যানের প্রেমে পড়া। কিন্তু যত বেশি সে মিগ্যানের কাছাকাছি এল, ততই উপলব্ধি করতে পারল মিগ্যানের মতো ডেডিকেশন বা মোটিভেশন কোনওটাই তার নেই। একদিন রাতে ফার্মেসি পরীক্ষার জন্য পড়া তৈরি করার ফাঁকে একটু কফি খেতে বেরিয়েছিল অমিত। পায়ের আড়ষ্টতা কাটানোর জন্য প্রথমে কিছুটা হেঁটেছিল, কয়েকটা ব্লক পেরিয়ে গেল হাঁটতে হাঁটতে। তারপর বড় রাস্তা ধরে হাঁটতেই থাকল, দেখতে দেখতে সে পেরিয়ে এল একশোটা ব্লক। ওয়াশিংটন হাইটসের ডর্ম থেকে লিঙ্কন সেন্টার পর্যন্ত চলে গেল সে। তারপর চায়না টাউনের রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকল। তখন সেখানে ট্রাক থেকে মাছ আর সবজি নামানো হচ্ছে। রাস্তায় শুরু হচ্ছে দিনের ব্যস্ত জীবন। সে একটি বেকারিতে ঢুকে গরম চা আর কোকোনাট ব্রেড খেল আর পিছনের দিকে একটা টেবিল ঘিরে বসে একদল চাইনিজ মহিলা স্তূপীকৃত স্পিনাচের পাহাড় থেকে শাক বাছছে তাদের দেখতে লাগল। তারপর সে একটি ট্রেন ধরে শহরে ফিরে এল এবং পরীক্ষা হলে বসে বসে ঘুমোল। সে প্রথমে একটা ক্লাস ফাঁকি দিল, তারপর আর একটা, এই করতে করতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু এই নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও ওর যেন কোথাও মনে হচ্ছিল যে এখনই সে জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে। মেডিক্যাল স্কুল থেকে ড্রপ আউট করার কথা বাবা-মাকে বলার জন্য, প্রথম সেমেস্টার শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। অমিত ভেবেছিল মিগ্যানও হয়তো এরপর তার সঙ্গে সম্পর্কটা রাখবে না, কিন্তু মিগ্যান তা করেনি, বরং ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান দিয়েছিল এবং সবসময়ই ওর পাশে পাশে ছিল। মেডস্কুল থেকে ড্রপ আউট করার পর অমিত কলম্বিয়ার একটি জার্নালিজম স্কুলে আবেদন করেছিল কিন্তু তার আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। মিগ্যান ওকে বারবার চাপ দিয়েছিল, যেভাবেই হোক, লেখালেখি শুরু করে দিতে, দরকার হলে ফ্রিল্যান্সিং করতে এবং সেইসব লেখাগুলোর কাটিং একসঙ্গে রেখে দিতে। কিন্তু অমিতের কাছে মেডিক্যাল জার্নালের চাকরিটা অনেক বেশি আকর্ষক বলে মনে হয়েছিল। এতে পরিশ্রমও কম এবং কাজটা গতানুগতিক কিন্তু অমিত এখন আর এটা ছাড়া অন্য কিছু করার কথা ভাবতেই পারে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার মনে হয়েছিল, তুমি নিউজপেপারেই কাজ করবে," মি. ন্যাগল বললেন অমিতকে, "মনে আছে, তুমি যেবার গ্র্যাজুয়েট হলে সেবার আমরা একটা পুরস্কার জিতেছিলাম? তারপর আর কোনও বছর কিন্তু জিততে পারলাম না। লাইব্রেরিতে এখনও সেই প্ল্যাকটা লাগানো আছে।"

এরই মধ্যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি এসে অমিতের সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি আবার অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের নতুন ডিরেক্টর। অমিতের সঙ্গে খুব আগ্রহ সহকারে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি, জিজ্ঞেস করলেন আগামী রি-ইউনিয়নে অমিতের আসার কোনও প্ল্যান আছে কি না, জানালেন ল্যাংফোর্ডের নতুন জিমন্যাশিয়ামের ব্যাপারে কী কী প্ল্যান রয়েছে ইত্যাদি।

"এক্সকিউজ মি," অমিত বলল কথার মাঝখানের ফাঁকে। "আসলে আমার স্ত্রী কোথায় আছেন, সেটা একটু দেখতে হবে আমাকে।"

মি. ন্যাগলের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই নিজের ড্রিঙ্কটা শেষ করে ফেলেছিল অমিত, তার হাতে এখন শুধু মিগ্যানেরটা ধরা আছে। সুতরাং আবার সে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের জন্য একটা লেমোনেড নিয়ে নিল। তারপর অতিথিদের মধ্যে মিগ্যানকে খুঁজতে খুঁজতে সে হাঁটতে শুরু করল অ্যাডমিশন বিল্ডিং-এর দিকে। কিন্তু মিগ্যান সেখানে ছিল না। অমিতের মনে হল মিগ্যানও হয়তো তাকে খুঁজতেই বেরিয়েছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে। এখন এখানে সবচেয়ে আলোকিত অংশটি হল ওই টেন্টটা, যেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মিগ্যানকে যখন সে খুঁজে পেল দেখল মিগ্যান কথা বলছে টেড-এর সঙ্গে, তার বাঁ হাতটি তখনও কায়দা করে স্কার্টের ওপর রাখা। টেডের সামনে এসে আবার যেন অমিত একটু ঘাবড়ে গেল, ভুল নাম ধরে ডাকার ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল।

"তোমার জন্য আনতে গিয়েছিলাম," বলে অমিত মিগ্যানকে লেমোনেডের গ্লাসটা ধরিয়ে দিল।

"ও," মিগ্যান মাথা নেড়ে ড্রিঙ্কের দিকে তাকাল, তার অন্য হাতে একটি শ্যাম্পেনের গ্লাস।" বলল, "এটা অন্য একটা ট্রে থেকে নিয়েছি।"

"আমি মিগ্যানকে বলছিলাম যে, যখন আমরা ছাত্র ছিলাম, কেমন ছিল আমাদের দিনগুলো," টেড বলল, "অবশ্য তখন এই বিচ্ছিরি নতুন বিল্ডিংগুলো ছিল না। আচ্ছা, তুমি তখন কোথায় থাকতে?"

AMARBOI.COM

"ফার্স্ট ইয়ারে থাকতাম ইনগলসে, তারপর চার্লেস এ," ইতস্তত করে উত্তর দিল অমিত, কারণ নামগুলো ঠিক বলছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না।

"জানো তো," মিগ্যান বলতে শুরু করল, "আমাদের সেলফোন এখানে কাজ করছে না। মেয়েদের ফোন করতে কতবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনও সার্ভিসই পাওয়া যাচ্ছে না।"

"আমার মনে হয়, কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোথাও কোনও পে-ফোন আছে।" অমিত বলল, "চেষ্টা করে দেখি, যাতে ওরা শুয়ে পড়ার আগে অন্তত একবার ফোন করা যায়।" একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রীতিমতো ক্লান্ত লাগছিল অমিতের। অনেকক্ষণ ধরে সে একটা বসার জায়গা খুঁজছিল। সেইসঙ্গে মনে হল পেটে শক্ত কিছু খাবারও পড়া দরকার। বয়স্ক লোকেরা ইতিমধ্যেই টেন্ট-এ চলে গিয়েছেন। খাওয়ার সময় শিশুদের দেখভাল করার দায়িত্ব নিয়ে রয়েছেন তাদের মায়েরাও। এখনই ওখানে গিয়ে আসন দখল করাটা হয়তো ভাল দেখাবে না। অমিত অপেক্ষা করছিল কখন টেড আর মিগ্যানের কথাটা শেষ হবে এবং সেই সুযোগে সে টেবিলে গিয়ে বসার কথাটা তুলবে। ঠিক তখনই অমিতের পিঠে কেউ হাত রাখল, ঘুরে দেখল প্যামের বাবা-মা দাঁড়িয়ে আছেন। সে ওঁদের শুভেচ্ছা জানাল, আবার ওয়ালেট থেকে তার মেয়েদের ছবি বের করে দেখাল। মিসেস বোর্ডেন তাঁর সোজাসাপটা ভঙ্গিতে বললেন, ওরা ঠিক ওদের মায়ের মতো দেখতে হয়েছে।

মিগ্যানের কাছে এসে অমিত দেখল যে মিগ্যানের গ্লাস খালি হয়ে গিয়েছে। সে টেডের আরও কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে হিরের কানের দুলটা নাড়াচাড়া করছে। অমিত জানে, এটা মিগ্যানের নার্ভাসনেসের লক্ষণ। কিন্তু নার্ভাস কেন? ও কি টেডের সঙ্গে ফ্লার্ট করছে? ঈর্ষার বদলে অদ্ভুতভাবে যেন একটু স্বস্তি পেল অমিত, মিগ্যানের সময়টা ভাল কাটছে এবং মিগ্যানের প্রতি দায়িত্ব থেকে ছুটি পাওয়া যাচ্ছে বলে যেন এক ধরনের মুক্তির আনন্দ অনুভব করল সে। মাথাটা দপদপ করছে। অমিতের মনে হল এক গ্লাস জল খাওয়া দরকার শরীরে অ্যালকোহলের মাত্রা একটু কমানোর জন্য, তার মস্তিষ্ক এবার নেশার বশে চলে আসছে। সন্ধেটা সবে শুরু হয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেকক্ষণ ধরে ড্রিঙ্ক করছে। হঠাৎ সে খেয়াল করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে হাতটা দিয়ে এতক্ষণ স্কার্টের খুঁত ঢাকার চেষ্টা করছিল মিগ্যান, সেই হাতটাই এখন ওর কানের দুলে। কয়েকটা ড্রিঙ্ক নেওয়ার ফলে সে-ও হয়তো এখন ব্যাপারটা নিয়ে আর তেমন ব্যতিব্যস্ত নয়। অমিত বুঝল যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার কর্তব্য থেকে সে আপাতত মুক্ত।

ডিনারের সময় তারা অন্য তিনটি কাপলের সঙ্গে বসেছিল। তাদের মধ্যে দুটি কাপল ছিল রায়ানের পুরনো বন্ধু, ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। পরিচয়পর্বের পর তারা নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা বলছিল। ভদ্রমহিলাদের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। ওঁরা তিনজনেই সিল্কের জ্যাকেট আর জমকালো রুপোর জুয়েলারি পরেছিলেন। অমিতের ধারণা, ওরা টিভি দুনিয়ার সঙ্গেই যুক্ত। ভদ্রলোকেদের সকলেই বেশ ভারী চেহারায়, দেখে মনে হয় তাঁরা অনেকদিনের পুরনো বন্ধু। অন্য কাপলটির অবশ্য সদ্য এনগেজমেন্ট হয়েছে, খুব শিগগিরই বিয়ে হবে। মেয়েটির নাম ফেলিসিয়া, সে প্যামের বন্ধু। তার হবু বরের নাম জারেড। জারেড একজন আর্কিটেক্ট, সবকিছুতেই তার মুখে যেন একটা হালকা হাসির রেশ লেগে থাকে। অনেকক্ষণ পর অমিত বুঝতে পারল যে, হাসি নয়, আসলে ওর ঠোঁট দুটো একটু বেশিই গাল পর্যন্ত টানা, দেখলে হাসি বলে মনে হয়। জারেড সম্প্রতি একটি হাসপাতালের একটা নতুন উইং-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। ফলে মিগ্যান এবং তার আলাপ মুহূর্তে জমে গেল। মিগ্যান ওকে বোঝাচ্ছিল একটা ভাল হাসপাতালের ডিজাইন সম্পর্কে তার অভিমত কী, কীভাবে সেটা আরও ভাল করা যায় ইত্যাদি।

ওয়েটার এসে ওদের ড্রিঙ্কের গ্লাস, জলের গ্লাস ভরতি করে দিল, পরিবেশন করল স্যামন মাছের তৈরি পদ। ফেলিসিয়া তখন অমিতের সঙ্গে তার ও জারেডের বিয়ের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করছিল। ফেলিসিয়াকে বেশ মিষ্টি দেখতে, তার পরনে বেজ কালারের হাতকাটা হাইনেক ড্রেস। তবে দেখতে মিষ্টি হলেও ওর নাক-চোখ মুখের তুলনায় একটু ছোট, যেন ঠিক ভরাট নয়। কপাল থেকে নাকের নীচ পর্যন্ত দূরত্ব যেন অনেকটা বেশি। তা ছাড়া তার কথা বলার ধরনও বেশ একঘেয়ে, কথার শেষ অংশটা, পরিষ্কার করে শোনা যায় না। ফেলিসিয়া বলছিল ওদের বিয়ের অনুষ্ঠানটা কোথায় হবে তা ঠিক হয়নি এখনও এবং ওরা বুঝতে পারছে না নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা কত হতে পারে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই বিয়ে একটা বিরাট ব্যাপার, তাই না!" অমিতকে জিজ্ঞেস করল ফেলিসিয়া, "কত লোক হতে পারে বলো তো?"

অমিত আশপাশের টেবিলগুলো থেকে গুনতে শুরু করল, প্রতিটা টেবিলে আটজন করে লোক বসে আছে।

"ধরো, মোটামুটি দুশো জন মতো লোক হবে," বলে অমিত গ্লাসের জলটা শেষ করে মিগ্যানের দিকে তাকাল। ওর মুখে কোনও অস্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই।

"তোমাদের বিয়েতে কত লোক হয়েছিল?" জিজ্ঞেস করল ফেলিসিয়া।

"আমরা আট বছর আগে পালিয়ে বিয়ে করেছিলাম, সিটি হলে।" সেইসময় অমিতের এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছিল, ভেবেছিল বাবা-মাকে লুসান থেকে এখানে টেনে আনার কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া মিগ্যানের বাবা-মাকে বললেই তো আবার এক গাদা খরচের ধাক্কা, তাঁরা এসে আবার লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে তাদের খুশি করার চেষ্টা করবেন। অমিতের বয়স তখন উনত্রিশ, মিগ্যানের চৌত্রিশ। ব্যাপারটা ওদের কাছে তখন দারুণ এক্সাইটিং ছিল। বিয়ে করার একটা আলাদা আনন্দ তো ছিলই, তার ওপর সেটা আবার গোপনে, কোনও প্ল্যানিং কোনও তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়াই! অমিতের বাবা-মা তখনও মিগ্যানকে দেখেননি। অমিত বুঝতে পারত যে, ব্যাপারটা তাদের পক্ষে কতখানি অপমানকর। তাঁরা যতই উদার পাশ্চাত্যনীতির সমর্থক হোন না কেন, সে খুব ভাল করেই জানত যে তাঁরা চান অমিত এমন একজন বাঙালি মেয়েকেই বিয়ে করুক, যে ওর মতোই শিক্ষা এবং পরিবেশে বড় হয়েছে।

"তোমার কি সে নিয়ে কোনও দুঃখ আছে?" ফেলিসিয়া জিজ্ঞেস করল অমিতকে।

"আমার মেয়েদের হয়তো আছে।" আসলে ওরা এখন সেই বয়সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যখন বাবা-মায়ের বিয়ের কেকের গল্প শুনতে ইচ্ছে করে, তাদের বিয়ের ছবি দেখতে ইচ্ছে করে, মাকে বিয়ের পোশাকে কেমন লাগছিল দেখতে ইচ্ছে করে।

ফেলিসিয়া জিজ্ঞেস করল, ওদের বয়স কত এবং একটু ইতস্তত করে অমিত তার ওয়ালেট থেকে আবার ফোটোগুলো বার করে বলল, "মিগ্যানের কাছে যেগুলো আছে, সেগুলো আরও ভাল। ওদের আর একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় বয়সের ছবি। কিন্তু সেগুলো এখন হোটেলে রাখা আছে।"

"বাচ্চাদের জন্য তোমাদের কি অনেকদিন ধরে চেষ্টা করতে হয়েছে?" অমিতের মনে হল প্রশ্নটা যথেষ্ট দুঃসাহসী, বিশেষ করে একজন বাইরের লোকের পক্ষে। নেশার ঝোঁকে ওর চিন্তা ভাবনাগুলো যেন একটু ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। তবুও ফেলিসিয়াকে ও সত্যি কথাই বলল, "তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু প্রথমবারেই মায়ার জন্ম হয়েছে।"

কথাটা বলে অমিত যেন একটু গর্ববোধ করল, কথাটার মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন দর্প ছিল। জীবনের প্রথমবার যখন সে কনট্রাসেপটিভ ব্যবহার না করে সেক্স করল, একটা নতুন জীবন পৃথিবীর আলো দেখল।

"তোমরা কি আরও একটা বাচ্চা চাও?"

"সেটা বলা শক্ত।" ওর সামনে মেয়েদের ছবিগুলো ভেসে উঠছিল একের পর এক, যখন তার মেয়েরা নিতান্ত শিশু ছিল, ঘরের মধ্যে স্তূপীকৃত হয়ে থাকত প্লেয়িং সসার। আর দোলনা, উঁচু উঁচু চেয়ারগুলোর সঙ্গের ট্রে-গুলোর এমন অবস্থা করে রাখত যে ওগুলোকে রোজ রাতে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে ধুতে হত। এখন তার মেয়েরা একটু বড় হয়ে এমনিতেই একটু বদলে গিয়েছে, খানিকটা রহস্যময়ীও হয়ে উঠেছে। এখন ওরা নিজেদের ঘরে বসে গল্পের বই পড়ে কিংবা খেলে। নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলে, খাওয়ার টেবিলে বসে কোনও আপাতকারণ ছাড়াই হঠাৎ হঠাৎ হেসে ওঠে। ফ্যামিলি শুরু করার ব্যাপারে মিগ্যানের চেয়েও অমিতেরই বেশি আগ্রহ ছিল। এই জগৎটা খুব সুন্দর মনে হয়েছিল অমিতের। বিশেষ করে বাচ্চাদের অভিভাবকত্ব করা, এক হিসেবে তার জীবনকে যেন একটা আলাদা পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছিল, যেটা তার কাজ তাকে দিতে পারেনি। অমিতই দ্বিতীয় সন্তানের জন্য জোর করেছিল মিগ্যানকে। মিগ্যান একটা মেয়ে নিয়েই খুশি ছিল, অমিতকে বলেছিল বড় ফ্যামিলি হলে বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হবে। কিন্তু অমিত চায়নি মায়া তাদের একমাত্র সন্তান থাকুক, কারণ একমাত্র সন্তানের একাকিত্বের যন্ত্রণা নিজের জীবনে যথেষ্ট উপলব্ধি করেছিল সে। শেষপর্যন্ত মিগ্যান রাজি হয় অমিতের জোরাজুরিতে এবং মূলত তার ইচ্ছেতেই প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে আবার গর্ভবতী হয়। কিন্তু মোনিকার জন্মের পর থেকেই সে জন্মনিয়ন্ত্রক ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্লাসের গায়ে চামচের শব্দ হতেই তারা ফিরে তাকাল তাঁবুর দিকে। ততক্ষণে সবে তাদের প্রথম রাউন্ড টোস্ট করা শেষ হয়েছে। ওরা দেখল প্যামের প্রেপ স্কুলের বন্ধুরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। অমিত অস্পষ্টভাবে মনে করতে পারল এদের কয়েকজনকে সে বোধহয় মার্লিনে দেখেছে। তার পরেই প্যাম ও রায়ানের পরিবারের লোকজন টোস্ট করল, ও তারপরে প্যাম ও রায়ানের সহকর্মীরা যেদিকে গিয়েছে, সেদিকে যেতে লাগল। হঠাৎ অমিত খেয়াল করল একটা ছোট মাকড়সা টেবিল ক্লথ বেয়ে উঠে জারেডের শার্ট আর জ্যাকেটের মাঝখানে চলে বেড়াচ্ছে। অমিত তাকে সতর্ক করতে গেল, কিন্তু জারেড ব্যাপারটা লক্ষই করল না। সে হাসিমুখে সেদিকে তাকিয়েই বসে রইল, বোধহয় ভাবছিল নিজের বিয়েতেও এভাবেই টোস্ট সার্ভ করতে হবে লোকজনকে।

এর মধ্যে মেনকোর্স দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। অ্যাসপারাগাস আর আলু দেওয়া এক ধরনের রেডমিট পরিবেশন করা হয়েছিল তাদের।

"দুটি সন্তানের বাবা হওয়ার অনুভূতিটা কেমন?" কথাটা যেখানে শেষ হয়েছিল, তার জের টেনে অমিতকে জিজ্ঞেস করল ফেলিসিয়া, "আমায় এক বন্ধু বলেছিল খানিকটা যেন ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু থ্রি, তাই কি?"

অমিত একটু ভেবে শুরু করল, "সত্যি কথা বলতে কী, মোনিকার জন্মের পরই আমাদের বিয়েটা...," থেমে গেল অমিত। কারণ বলতে গিয়ে বুঝতে পারল কথাটা বোঝানোর উপযুক্ত শব্দ সে খুঁজে পাচ্ছে না। একটু সময় নিয়ে আবার বলল, "আমাদের বিয়েটা যেন হারিয়ে গেল," বলেই তার মনে হল, "বিয়েটা হারিয়ে গেল!" শব্দগুলো কী অদ্ভুতভাবে সে ব্যবহার করল, ঠিক যেন তার দু'আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা জিনিস গলে গিয়েছে, তবে একমাত্র এইভাবেই অনুভূতিটা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল।

"মানে? কী বলতে চাইছ বলো তো তুমি?" হাতের ফর্ক রেখে অমিতের দিকে চোখ ছোট করে তাকাল ফেলিসিয়া, গলার স্বরে আগের উষ্ণতাটুকু যেন হঠাৎ উবে গিয়েছে।

মিগ্যানের দিকে চোখ ফেরাল অমিত। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উজ্জ্বল। এই ঔজ্জ্বল্যই যেন আজকের সন্ধেয় তার সৌন্দর্যকে একটা আলাদা মাত্রা দিয়েছে। এখনও সে জারেডের সঙ্গেই কথা বলে চলেছে। হোটেলে থাকতেই তারা ঠিক করেছিল যে, একে অপরের কাছ ছাড়া হবে না। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন যেন সে অমিতের থেকে বহু দূরে। সেই দূরত্ব, যা তাকে একসময় তাড়া করে ফিরত সর্বক্ষণ। যখন সে রান্নাঘর পরিষ্কার করে মায়া আর মোনিকাকে স্নান করিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে একা-একা বসে টিভি দেখত আর ভাবত যে, সে তো তার মেয়েদের নিয়েই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, মিগ্যান কেন তার পাশে থাকে না! তারা একই বাড়িতে বাস করে, একই বিছানায় শোয়, মিগ্যানের হৃদয়ে অমিত ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের অস্তিত্বও নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভীষণ একা লাগত অমিতের, ঠিক যেমন প্রথম প্রথম ল্যাংফোর্ডে লাগত তার। এই একাকিত্বের কারণেই মিগ্যানের ওপর প্রচণ্ড রাগ হত অমিতের। অমিত যদি নেশাগ্রস্ত না হত, তখনই আর-একটু ভেবে দেখত, তা হলে এসব চিন্তা ওর মাথাতেই আসত না কিংবা এলেও সে এভাবে প্রকাশ করত না। ওর মনে পড়ে যেত মিগ্যান শুধুমাত্র তার জন্য, মেয়েদের জন্য, তাদের পরিবারের জন্যই এত পরিশ্রম করেছে। যাতে বছরখানেকের মধ্যে তাদের জীবনধারার পরিবর্তন সম্ভব হয়, আবার যাতে তারা সপরিবারে ছুটিছাটায় ঘুরতে যেতে পারে, মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ডিনার পার্টি দিতে পারে, এই সবকিছুর জন্যই মিগ্যান চেষ্টা করেছে যাতে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের কোনও কাজ জোগাড় করতে পারে। কিন্তু আজকের রাতে অমিত এই রূঢ়তাটুকু আটকাতে পারল না। সে ভেবে নিল, যা সত্যি সে তাই বলেছে।

"বিয়েটা হারিয়ে গেল," কথাগুলো আবারও বলল অমিত, এবার যেন আরও জোরের সঙ্গে, "আমার মনে হয় প্রত্যেকের জীবনেই তাই ঘটে, কারও আগে, কারও পরে।"

কিন্তু এই কথায় ফেলিসিয়ার মুখ শক্ত হয়ে গেল, বলল, "কী সব আজেবাজে কথা বলছ?" নিজের বিরক্তি লুকোতে পারল না সে, "অন্য কোথাও হলে তা-ও একটা কথা ছিল। শেষে কিনা একটা বিয়েবাড়িতে বসেই এসব কথা!"

ফেলিসিয়া যা-ই বলুক, অমিতের কিন্তু মনে হল সে ঠিকই বলেছে। মোনিকার জন্মের পর থেকেই কি মিগ্যানের যাবতীয় উৎসাহ একসঙ্গে কিছু করার বদলে ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে চলে যায়নি? অফ ডে-তে সে কি এইজন্যই বাচ্চাদের দায়িত্ব নিত যাতে অমিত একটু ঘুরে আসতে পারে বা পার্কে হেঁটে আসতে পারে কিংবা উলটোটা অর্থাৎ অমিত বাচ্চাদের দায়িত্ব নিলে সে একটু বইয়ের দোকানে ঘুরে আসতে পারে বা পার্লারে যেতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে? পাশাপাশি অমিত যে তার সঙ্গলাভের আশায় বসে থাকত এবং সেই আশাভঙ্গ হলে একা একা সাব ওয়েতে ঘুরে 'সারাদিনে সবচেয়ে ভাল সময় কাটল' বলে মনে করত, সেটাও কি অত্যন্ত দুঃখজনক নয়? যার সঙ্গে সে নিজের জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরিবার তৈরির স্বপ্ন দেখেছে, রাতের পর রাত যার অভাবে একাকিত্ব সহ্য করেছে, তা সত্ত্বেও অমিত যে নিজের একাকিত্বকে উপভোগ করতে চাইছে, এটা কি দুঃখজনক নয়? মনে হয় না, কি এই অবস্থায় এই একাকিত্বই তাকে ঠিক রেখেছে বা যখন মনে হয় পাগল পাগল লাগছে? চারপাশের সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলি?

অমিতের মনে হল এসব কথা ফেলিসিয়াকে বুঝিয়ে বলা দরকার, কিন্তু দেখা গেল ফেলিসিয়া তার সঙ্গে কথা বলতে আর আগ্রহী নয়। অমিতের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা না করেই সে এখন রুপোর গয়নাপরা ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত। ঘড়ির দিকে তাকাল অমিত, সাড়ে আটটা বাজে। মেয়েরা এতক্ষণে হয়তো শোওয়ার জন্য তৈরি, ঘুমোনোর আগে গল্পের বই পড়ছে। অমিত তার খাওয়া শেষ করতে পারেনি, আসলে সে খুবই অল্প খেয়েছে। কিন্তু তার প্লেট ইতিমধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তার সামনে এখন রাখা একটা ছোট স্ট্রবেরি কেক। অমিত লক্ষ করল তার আশপাশের অধিকাংশ টেবিলই খালি, নাচ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং জোড়ায় জোড়ায় একটি টেন্টে গিয়ে পরস্পরের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে নাচবে বলে। চারদিকে ঘন কালো অন্ধকার, ব্যান্ডটি একটা গারশউইন গান বাজাচ্ছে। জারেড ফেলিসিয়াকে নিয়ে চলে গেল সেখানে, যদিও অমিত জানত যে, ফেলিসিয়ার সঙ্গে তার আর দেখা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তবুও সে চলে যাওয়াতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যেন সে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ডিপ্রেশনের কিছু সাক্ষ্যও যেন ওর সঙ্গেই চলে গেল। অমিত দেখল ফেলিসিয়া জারেডকে কানে কানে কিছু একটা বলছে আর জারেড সামনে ঝুঁকে পড়ে শুনছে। ফেলিসিয়া কি ওকে এতক্ষণের কথোপকথনটা শোনাচ্ছে? হয়তো আলোচনা করছে যে, অমিত কতখানি অবিবেচক, যার এনগেজমেন্ট হয়ে গিয়েছে, দু'দিন বাদে বিয়ে হবে, তাকে এই ধরনের কথা বলছে। সেইসঙ্গে ওরা হয়তো পরস্পরকে কথা দিচ্ছে যে, তাদের মধ্যে কখনওই এরকমটা হবে না, এবং একটা কেন, একডজন বাচ্চা হওয়ার পরও তাদের মনে হবে না "বিয়েটা হারিয়ে গিয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমিত দেখল টেড উঠে এসে মিগ্যানকে জিজ্ঞেস করছে, ওর পাশের খালি চেয়ারটাতে বসবে কি না। তারপর মিগ্যানকে বলল, "ডিনারে প্রচুর জিনিস ছিল। আমি তো অর্ধেকও খেয়ে উঠতে পারিনি, আমার নিজের বিয়েতেও ঠিক তাই হয়েছিল।"

মিগ্যান অমিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়েদের একবার ফোন করা উচিত। আসার সময় আমরা বলে এসেছিলাম যে, ফোন করব।"

"ঠিক আছে আমি যাচ্ছি মেগ," অমিত আশ্বস্ত করল তাকে, "তুমি থাকো, এনজয় করো।"

"আমি ওকে নিয়ে পালাব না," পাশ থেকে চোখ টিপল টেড, "কথা দিচ্ছি।"

"তোমার শরীর ঠিক আছে তো?" মিগ্যান জিজ্ঞেস করল অমিতকে, তার গলার স্বর শুনেই অমিত বুঝতে পারল, তার নিজের কিছু বলার দরকার নেই। মিগ্যান ঠিকই বুঝতে পেরেছে যে, তার ড্রিঙ্কের মাত্রাটা আজ একটু বেশিই হয়ে গিয়েছে। তার মানে, অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও মিগ্যান ঠিকই তার দিকে খেয়াল রেখেছে।

"আমি ঠিক আছি। যাই, দেখি একটা পে-ফোন পাই কি না! ফোন করেই আমি চলে আসছি। একটু হাঁটলে মনে হয় শরীরটা ভাল লাগবে।"

"তুমি ফিরে এলে কিন্তু আমরা সারারাত ধরে নাচব আর একসঙ্গে সানরাইজ দেখব, কেমন?" মিগ্যান অমিতের দিকে তাকিয়ে হাসল। অমিত হঠাৎ উপলব্ধি করল তার প্রতি মিগ্যানের ভালবাসা, অটুট বিশ্বাস, সেইসঙ্গে তাদের বিয়ের প্রতিও। কারণ সে কখনও তাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি, কখনও সেই সম্পর্ককে ছোট করে দেখেনি, আজ অমিত যেটা করেছিল।

"নিশ্চয়ই," বলে অমিত ওর দিকে এগিয়ে এল এবং সামনে ঝুঁকে ওর গালে চুমু খেল। তারপর হাঁটা লাগাল সেই অ্যাডমিশন বিল্ডিং-এর দিকে যেখানে বাথরুম ছিল। বাচ্চাদের খেলাধুলোর জন্য দুটো বড় বড় ঘর খুলে দেওয়া হয়েছে সেখানে। কেউ সেখানে দৌড়াদৌড়ি করছে, কেউ চেঁচামেচি বা কান্নাকাটি করছে। আবার কাউকে চামড়ার ক্লাব চেয়ার কিংবা সোফায় দ্রুত ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অমিত সেখানে খোঁজাখুঁজি করল, যদি একটা পে ফোন পাওয়া যায়! কিন্তু ক্যাম্পাসে কাচের দরজার ভেতর দিয়ে অফিসের যে ফোনগুলো দেখা যাচ্ছিল, সেগুলোও বন্ধ ছিল।

AMARBOI.COM

বিল্ডিং এর বাইরে বেরিয়ে অমিত ভাবল বাইরে যদি কোনও একটা পে-ফোন খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেল না সে। তখন তার মাথার মধ্যে শুধু একটাই চিন্তা, মেয়েদের ফোন করতেই হবে, ওদের গলাটা একবার শুনতেই হবে তাকে। অন্ধকারের মধ্যেই ও মাঠটা পেরোতে শুরু করল, হাঁটা লাগাল হোটেলের দিকে, ভুলে গেল যে স্কুলে তার গাড়ি পার্ক করা আছে। পথে কয়েকবার হোঁচট খেল সে। চারদিকে গভীর নৈঃশব্দ্য, শুধু বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ক্ষীণ গানের রেশ ভেসে আসছে। নিজের নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পেল সে। অমিত একটু দাঁড়িয়ে আকাশভরা তারার দিকে তাকাল। মিগ্যানের কথা মনে হল তার। ফিরে গিয়ে তাকে বলে আসা উচিত যে সে হোটেলে যাচ্ছে। কিন্তু সে হাঁটতেই থাকল, তার পা দুটোই যেন তাকে নিয়ে যেতে থাকল মাঠের ওপারে।

আকাশের তারা ছাড়া আর কোনওদিকে আলো ছিল না। ফলে অন্ধকারে অমিত বুঝতে পারল না যে, সে কোনদিকে যাচ্ছে। আবার একবার থামল সে, লেকের জলের ব্যাংগুলোর ডাক শোনার জন্য। শব্দটা যেন অনেকটা অর্কেস্ট্রার কোনও এক আনপ্লাগড বাদ্যযন্ত্রের মতো, ক্রমাগত এলোপাথাড়িভাবে টিউনিং হয়েই চলেছে। শব্দটা যেন সে ভুলেই গিয়েছিল অথচ এই শব্দটাই ল্যাংফোর্ড ডর্মেটরির প্রথম রাতে তাকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল। অমিতের এখনও মনে আছে, সেদিন আগস্ট মাসের শেষ দিন ছিল এবং তখন তার বয়স ছিল পনেরো। বাইরে থেকে আসা সমস্ত ছাত্রই সেদিন সেই শব্দটা শুনেছিল আর তাদের নতুন ঘরে অপরিচিত বিছানায় শুয়ে মিস করছিল বাবা-মাকে, তাদের বাড়ি। প্রথম অ্যাসেম্বলিতে তাদের বলা হয়েছিল যে, ব্যাঙেরা প্রজননের সময় এভাবে ডাকে এবং জল থেকে বেরিয়ে চলে যায় কাদার ভিতর। সেদিনের মতো আজও এই একটানা শব্দ যেন অমিতকে বলতে লাগল, সময়ই পৃথিবীতে একমাত্র সত্য। যা একবার দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, ধরে নিতে হবে, সেটা বেরিয়ে গেল হাতের মুঠো থেকে।

হোটেলটা দেখতে পেল অমিত। সত্যি কথা বলতে কী এখানে পৌঁছোতে তার তেমন সময় লাগল না। মিগ্যান বোধহয় খেয়ালও করেনি যে সে চলে এসেছে। ঘরে ঢুকে খালি বিছানাটায় বসে সে দেখল, তাদের ছেড়ে যাওয়া পোশাকআশাক, মালপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। ফোনটা তুলে নিয়ে

AMARBOI.COM

খবরটা একবার ভালভাবে দেখে নিল সে, আগে খবরটা দেখে বেশ হতাশ হয়েছিল, এখন কিন্তু বেশ আরামদায়কই লাগল। অমিত তার শ্বশুর-শাশুড়ির বাড়ির এরিয়া কোড ডায়াল করল, কিন্তু কিছুতেই বাকি নম্বরটা মনে করতে পারল না।

ফোনটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ এভাবে বসে থাকল অমিত, প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল নম্বরটা মনে করার। কিন্তু তার নম্বরটা মনে পড়ল না, কারণ মিগ্যানই সবসময় ফোন করে। কাগজের পিরামিডটা হাতে নিয়ে মন দিয়ে সেটা দেখতে লাগল অমিত, যেন ফোন নম্বরটা ওর গায়েই লেখা আছে। কিন্তু না, সেখানে শুধু টিভি চ্যানেলের নম্বর। অমিত ঠিক করল যে সে বিয়ের অনুষ্ঠানে ফিরে গিয়ে মিগ্যানকে নম্বরটা জিজ্ঞেস করে আবার হোটেলে ফিরে আসবে। যাওয়ার জন্য পা বাড়াল অমিত, কিন্তু দরজার কাছে গিয়েই তার মনে পড়ল ডিরেক্টরি অ্যাসিস্ট্যান্সের জন্য একবার ফোন করে দেখলে হত। সে আবার ফোনের কাছে ফিরে গিয়ে ডায়াল করতে যাবে, এমন সময় মাথাটা খুব ভারী মনে হতে লাগল তার, চারপাশটা যেন ঘুরতে শুরু করেছে হঠাৎ। কাগজের পিরামিডটা যেটা একটু আগেও সে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, আর দেখতে পেল না, তার বদলে একটা দুর্বার শক্তি তাকে নিয়ে বিছানায় বালিশের ওপর ফেলে দিল।

AMARBOI.COM

অমিত জেগে উঠে দেখল সে সুট পরে আছে, পায়ে পালিশ করা কালো জুতো। অন্ধকার ঘরে ততক্ষণে আলো এসেছে, ব্যালকনির দিকের পরদাগুলোও সরানো। প্রথমে অমিত ভাবল যে সে যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে উঠল, তাকে আবার বিয়েবাড়িতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তখনই বেডসাইড টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে দেখল যে বেলা এগারোটা বেজে গিয়েছে।

"মিগ্যান?" ডাকল অমিত। সে আর কোনও কথা খুঁজে পেল না, গলা দিয়ে যেন স্বরও বেরোতে চাইছে না। অমিত অনুভব করল অনেকক্ষণ ধরে, এমনকী, ঘুমের মধ্যেও তার প্রবল জল তেষ্টা পেয়েছে। অমিত সামান্য একটু উঠে বসতে মাথায় প্রবল চাপ অনুভব করল এবং তাকিয়ে দেখল পাশের বিছানাতে কেউ শোয়নি খোলা সুটকেস আর জামাকাপড়গুলোও তেমনই পড়ে আছে। অমিত এবার পুরোপুরি উঠে বসল, তারপর দাঁড়িয়ে রীতিমতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোর গলায় ডাকল, "মিগ্যান!" তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা খুলে সে বাথরুমে গেল, বেসিন খুলে খানিকটা জল খেয়ে নিল, চোখে লাগবে বলে আলোটা জ্বালল না। গতরাতের স্মৃতিটুকু এবার টুকরো টুকরো সামনে আসতে লাগল অমিতের। মনে হল, এই তো কিছুক্ষণ আগে টয়লেটে বসে মিগ্যানের স্কার্টটা খুঁটিয়ে দেখছিল সে। তারপর মনে পড়ল প্যাম বোর্ডেনের বিয়ের অনুষ্ঠানে তাকে অনেকক্ষণ একটা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল ড্রিঙ্কের জন্য। এমনকী, এটাও মনে পড়ল যে, ডিনারের সময় একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার এবং সেই বাগদত্তা মেয়েটির সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও হয়েছে। আস্তে আস্তে তার মনে পড়তে লাগল অন্য একজন লোকের সঙ্গে মিগ্যানকে রেখে আসা। এবার একটা আলো জ্বালিয়ে দেখল যে বেসিনের পাশে কোনও চশমা নেই, রাত্রিবেলা যেটা মিগ্যানের ওখানে রেখে দেওয়া অভ্যেস। তার মানে, মিগ্যান হোটেলে ফেরেনি।

অমিত আবার বিছানাটা তোলপাড় করে খুঁজে দেখল যে আর কারও শোওয়ার চিহ্ন আছে কি না। কিন্তু বেডকভারটা পর্যন্ত তোলা হয়নি। একমাত্র সে যেখানে শুয়ে ছিল, সেই অংশে কিছুটা ভাঁজ পড়ে আছে। ঘরের দেওয়াল-আলমারিটা খুলল, শুধু কয়েকটা খালি হ্যাঙার টাঙানো আছে সেখানে। অমিত ঠিক করল যে সে রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে মিগ্যান এসেছিল কি না। ওর খুব শীত করে উঠল হঠাৎ এবং জ্যাকেটটা পরে নিল। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল ব্যালকনির দরজাটা অল্প খোলা।

মিগ্যান বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে। তার পরনে রয়েছে জিনস আর একটা পশমের পুলওভার। পাহাড়ি জায়গায় ঠান্ডা হতে পারে ভেবে এটা সে বুদ্ধি করে নিয়ে এসেছিল। মায়া হওয়ার পর যে হিরের দুলটা অমিত তাকে উপহার দিয়েছিল, সেটাই এখন ওর কানে জ্বলজ্বল করছে। আস্তে আস্তে কফিতে চুমুক দিচ্ছে সে এবং সামনের দৃশ্য আটকে-দাঁড়িয়ে-থাকা পাইন গাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

"আমি বলে ছিলাম তো আজ সানরাইজ দেখব," অমিতকে বলল মিগ্যান, "কিন্তু আজই সানরাইজটা দেখা গেল না।" অমিত আকাশের দিকে তাকাল, দিনের আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়লেও সেটা অনুজ্জ্বল, ধূসর। বাতাসেও একটা আর্দ্র, শীতল ভাব, মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই বৃষ্টি হবে।

মিগ্যানের পাশে পড়ে থাকা খালি চেয়ারটাকে একবার দেখে নিল অমিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে মিগ্যানের পাশে বসাটা এখন অসন্তুষ্টি বাড়াবে। সে একবারও মুখ ঘোরায়নি, অমিতের দিকে তাকায়ওনি। ঠান্ডায় অল্প কাঁপতে কাঁপতে হাত দুটো বুকের সামনে ক্রস করে অমিত তাকে জিজ্ঞেস করল, "কখন ফিরলে তুমি?"

"ওই, তিনটে নাগাদ হবে। তখনই তো ফাইন্যালি পার্টি শেষ হল। পা দুটোয় ভীষণ ব্যথা করছে। অনেকদিন নাচানাচি করিনি তো!"

মিগ্যানের কথা শুনে অমিতের মনে হল সেই দুঃস্বপ্ন আবার যেন ফিরে আসছে। আবার জিজ্ঞেস করল সে, "আমরা কি কাল রাতে বিয়েতে নেচেছি?"

"প্রায় এক ঘন্টা ধরে আমি প্রবল দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আমরা সব জায়গায় তোমাকে খুঁজেছি, বাথরুম-টাথরুম কিছুই বাদ রাখিনি। এমনকী আমি পুলিশে খবর দেওয়ার কথাও ভেবেছি। কিন্তু আমার কেমন মনে হল তুমি বোধহয় এখানেই এসেছ। তারপর হোটেলে ফোন করে জানতে পারলাম।"

মিগ্যান যদিও কথাগুলো খুব শান্তভাবে সামনের গাছের দিকে তাকিয়ে বলছিল, তবুও তার প্রত্যেকটি কথাতেই অন্তর্নিহিত উত্তাপ টের পাওয়া যাচ্ছিল।

"আমি কোনও পে-ফোন খুঁজে পাইনি," বলে চুপ করে গেল অমিত। মিগ্যান চেয়ারটা ঘুরিয়ে তাকাল অমিতের দিকে, তার চোখ দুটো জলে ভেজা। বলল, "আমিও খুঁজে পাইনি। কিন্তু প্যামের বাবাকে জিজ্ঞেস করতেই উনি একটা এক্সচেঞ্জ খুলে দিয়েছিলেন।"

অমিত চোখ নিচু করল, আঙুলের ডগা মেঝেতে ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করল, "আমি তো গাড়িটা ওখানেই রেখে এসেছিলাম। তুমি কি ওটা ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছ?"

"চাবি যদি তোমার পকেটে থাকে তা হলে আমি কী করে ড্রাইভ করব?"

"তবে তুমি ফিরলে কীভাবে?" প্রশ্নটা করেই অমিতের মনে হল সে বোধহয় এবার অসুস্থ হয়ে পড়বে। তা হলে কি টেড মাঝরাতে ওকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছে?

"জারেড আর ফেলিসিয়াই আমাকে হোটেলে ড্রপ করে দিল, সত্যিই ওরা খুব ভাল।"

অমিত জানত মিগ্যান মিথ্যে বলার মেয়ে নয়। কিন্তু অস্বস্তিটা গেল না

AMARBOI.COM

অমিতের। ফেলিসিয়া যদি মিগ্যানকে সব কথা বলে দিয়ে থাকে! সে জিজ্ঞেস করল, "মেয়েরা ঠিক আছে তো?"

"ওরা খুব ভাল আছে, ভীষণ মজা করছে। আমি বাবা-মাকে বলে দিয়েছি আজ বিকেলের মধ্যেই আমরা ফিরে আসছি।"

"কিন্তু আমাদের তো কাল পর্যন্ত থাকার কথা, সেরকমই প্ল্যান ছিল।"

"সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। ওয়েদারটা দেখছ না? লোকজন বলছে এটা যে কোনও সময় আরও খারাপ হতে পারে।"

বছর দশেক আগে এগুলো তাদের কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। তারা হাসিমুখে বৃষ্টিতে ভিজত, হাঁটতে হাঁটতে দারুণ মজা করত, তারপর ঘরে ফিরে এসে শারীরিক সম্পর্কে মেতে উঠত ।

"সরি মেগ, কালকের ড্রিঙ্কটা সোজা আমার মাথায় চড়ে গেছো। ঠিকমতো মনেও করতে পারছি না, কাল কী কী ঘটেছিল। ইচ্ছে করে তোমাকে ওখানে ফেলে আসিনি।"

অমিতের ক্ষমা প্রার্থনা যেন গ্রাহ্যই করল না মিগ্যান, বরং সে বলল, "আমি ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি। তুমি ততক্ষণে প্যাকআপ করে নাও, হোটেলের রেস্তোরাঁটা খারাপ নয়, তুমি ওখানেই খেয়ে নিতে পারো। আমি খুব টায়ার্ড, ফেরার সময় তুমিই ড্রাইভ করতে পারলে ভাল হয়।"

"তুমি সবসময়ই টায়ার্ড," অমিত বলতে চাইল মিগ্যানকে, "এতদিন বাদে একমাত্র কাল রাতেই তুমি টায়ার্ড ছিলে না।"

কিন্তু এসব কথা সে বলল না, কারণ সে জানত যে মিগ্যানকে কোনওভাবেই দোষারোপ করা যায় না। "কী, ঠিক আছে তো?" জিজ্ঞেস করল মিগ্যান।

"ব্রাঞ্চেও যাওয়া যায়," হঠাৎই অমিতের মনে পড়ল কথাটা এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের এই পর্ব যে বাকি আছে ভেবে একটু আশার সঞ্চার হল তার। সেখানে গেলে কালকের ভুলটা শোধরানোর হয়তো কিছুটা সুযোগ পাওয়া গেলেও যেতে পারে, এই ভেবে সে বলল, "ওখানেও খাওয়াদাওয়া সেরে নেওয়া যেতে পারে। ভাবছি, গিয়ে একবার প্যাম আর রায়ানকে 'গুড বাই' বলে আসি। চলো না, একসঙ্গে যাই, প্লিজ!"

মিগ্যান কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল অমিতের দিকে তাকিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমিতের তখনও মাথা ব্যথা করছিল, কথা বলতে গিয়ে গলা ভেঙে আসছিল। মিগ্যানের চোখে সহানুভূতির চাহনি দেখে সে মুহূর্তে বুঝে গেল যে, তাকে দেখে এতটাই বিধ্বস্ত লাগছে যে, মিগ্যান স্রেফ দয়াপরবশ হয়ে রেগে গিয়ে তাকে কিছু বলতে পারছে না। একটু চুপ করে থেকে মিগ্যান বলল, "ঠিক আছে, তুমি যদি তাই করতে চাও!"

"তুমি তা হলে আমার সঙ্গে যাবে?"

"এই বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে এমনিতেই আমি একা অনেক সময় কাটিয়েছি।"

বারান্দায় বসে স্থানীয় খবরের কাগজ পড়তে লাগল মিগ্যান। সেই ফাঁকে অমিত তার পোশাক বদলাতে গেল, সুট ছেড়ে পরে নিল সাদামাটা পোশাক। জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিল আর টুরিস্ট ব্রশিয়োরগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দিল। তারপর দু'জনে বেরিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে হাঁটতে লাগল ল্যাংফোর্ডের দিকে। কিন্তু অর্ধেক রাস্তা যেতে না যেতেই শুরু হয়ে গেল ঝিরঝির করে বৃষ্টি। বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে হাওয়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজ যেন তাদের এই যাত্রার ছন্দপতন ঘটাল। যখন তারা ক্যাম্পাসের কাছে গিয়ে পৌঁছোল, ততক্ষণে তাদের মাথা ভিজে ভিজে লাগছে এবং পা রীতিমতো ঠান্ডা। তার মধ্যেই লেকটাকে ভাল করে দেখার জন্য একটু থামল তারা, বৃষ্টির মধ্যেও দূরে একটি লোক লেকের গাঢ় ধূসর জলে সাঁতার কেটে চলেছে।

স্কুলের ভেতরের ছোট্ট একটা কবরখানাকে পাশ কাটিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল তারা। একটু এগিয়েই 'ব্রাঞ্চ' লেখা একটা তিরচিহ্ন দেখা গেল এবং সেই পথনির্দেশ অনুযায়ী চলতে থাকল তারা, যতক্ষণ না পর্যন্ত আর-একটা চিহ্ন দেখা যায়। কাল যে তাঁবুগুলো লোকজনের খাওয়াদাওয়া এবং নাচে সরগরম ছিল, সেগুলো এখন ফাঁকা পড়ে আছে এবং টেবিলগুলো ভাঁজ করে একটা জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছে। চেয়ারগুলো তখনও লনের ওপর এদিক ওদিক হয়ে আছে চূড়ান্ত অগোছালভাবে। অ্যালামনি বিল্ডিং-এর সামনে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে এবং মাত্র দু'জন লোক হাত লাগিয়েছে পরিষ্কারের কাজে। অমিত তাদেরই জিজ্ঞেস করল, "ব্রাঞ্চটা কি এখানেই হচ্ছে?"

"ব্রাঞ্চ নিয়ে তো কিছু জানি না আমরা," তাদের একজন বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারপাশটা ভাল করে দেখতে দেখতে এবার চ্যাপেলের দিকে হাঁটা শুরু করল তারা। পার্কিং এর জায়গাটা পাশ কাটাতে গিয়ে দেখতে পেল, কিছু গাড়ি সেখানে তখনও দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে তাদের গাড়িটাও রয়েছে। স্কুলের গেটে পৌঁছে পিছন ঘুরে তাকাল মিগ্যান, "আমি তো আর কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না। প্যাম কি বলেছিল কোন বিল্ডিং-এ হবে?"

অমিত মাথা নেড়ে 'না' বলল, তারপর আবার ওরা চলতে শুরু করল স্কুলের ভিতর দিয়ে। অমিত সময় দিচ্ছিল মিগ্যানকে, যাতে ওর রাগটা একটু কমে। তারা কিন্তু পাশাপাশি হাঁটছিল না। মিগ্যান অমিতের আগে আগে অনেকটা পথ দেখানোর ভঙ্গিতে হাঁটছিল, যদিও কোনও রাস্তাই জানা ছিল না তার। সামনে একটা দরজা খুলে উদ্দেশ্যহীনভাবে সেখানেই ঢুকে পড়ল তারা। হলঘরজুড়ে পাতা কার্পেটটা ধুলোয় ভরতি, ফাঁকা ক্লাসরুমে পরিষ্কার ব্ল্যাকবোর্ড, গোল গোল কাঠের টেবিল রাখা, যাকে ঘিরে বসে ছাত্ররা। একমাস শেষ হওয়ার আগেই ছাত্ররা আবার ওই টেবিলগুলোতে ফিরে আসবে। অমিত এখন স্বাধীন, তার জীবনের কোনওকিছুর সঙ্গেই এখন এই স্কুলের আর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই চিন্তাটা স্বস্তি দেওয়ার বদলে যেন তার স্কুলজীবনের স্মৃতিকেই আরও জীবন্ত করে তুলছিল— সেইসব দ্বিধাগ্রস্ত দিন, নিজেকে প্রতি পদে পদে আবিষ্কার করা, এইসব গোলটেবিল ঘিরে বসে থাকা, লেকচার, পরীক্ষা, কত কিছু! কত বিষয় সম্পর্কে আরও ভাল করে জানার ইচ্ছে ছিল তার, রাশিয়ান ইতিহাস, রোমান সাম্রাজ্য, গ্রিক ফিলোজফি। প্রতিদিন সন্ধেবেলা তাকে যা পড়তে বলা হত, যেভাবে কোনও কাজ করতে বলা হত, ঠিক তাই করার ইচ্ছে হত! কত ভাল ভাল লেখকদের লেখা তার পড়া হয়ে ওঠেনি, আর হবেও না কোনওদিন। তার মেয়েরাই আর ক'দিন পরে এই জীবনে প্রবেশ করবে। অমিত চায় এই জগৎটা তার সবটুকু সৌন্দর্য নিয়ে তাদের সামনে প্রকাশিত হোক। কিন্তু তার নিজের হাতে সময়ের বড় অভাব, এমনকী, রবিবারগুলোয় তো সে খবরের কাগজটাই পুরো পড়ে উঠতে পারে না!

সংগীত বিভাগে গিয়ে তারা একটা ঘর দেখতে পেল, যেখানে বেশ কিছু কাউচ আর প্র্যাকটিস স্ট্যান্ড রয়েছে। ঘরের এক কোণে একটা ছোট্ট গ্র্যান্ডপিয়ানো রাখা আর তার সামনে রয়েছে কফিকাপ আর দোমড়ানো বেকারির বাক্সে ভরতি দুটো বিন। পাশের একটা লম্বা ফোল্ডিং টেবিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে একটা কফি পারকোলেটর আর কিছু অব্যবহৃত কাপ!

"পেয়েছি," যেন জয় করার ভঙ্গিতে বলে উঠল অমিত। কিন্তু পরক্ষণেই উৎসাহ নিভে গেল। দেখল, টেবিলের ওপর একটা খোলা বাক্সে কয়েকটা এক্লেয়ার্স পড়ে রয়েছে। অমিত টের পেল, তার প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটা এক্লেয়ার্স নিয়ে একসঙ্গে মুখে পুরে দিল সে।

মিগ্যান বলল, "মনে হচ্ছে ব্রাঞ্চটা আমরা মিস করেছি," কিছুক্ষণ থেমে সে মন্তব্য করল, "তোমার মুখে চকোলেট লেগে রয়েছে।"

মেয়েরা সঙ্গে থাকলে অমিত সবসময়ই রুমাল সঙ্গে রাখে। কিন্তু এখন রুমালের অভাবে হাতের উলটো দিক দিয়েই ঠোঁটটা মুছে নিল ও। ঠিক সেই মুহূর্তে গির্জায় ঘণ্টাটা যেন শুধু ওদের জন্যই বাজল। অমিতের মনে হল প্যাম আর রায়ান হয়তো এতক্ষণে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গিয়েছে, ওরা হানিমুনে স্কটল্যান্ডে যাচ্ছে। হয়তো এতক্ষণে অন্য অতিথিরাও একটা মধুর হ্যাং-ওভার কাটানোর পর বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে। এবং বোর্ডেনরা এখন নিজেদের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন গতকালের সন্ধেটা নিয়ে। আর সমস্ত কাজ ভালভাবে মিটে গিয়েছে বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন, নিজেদের বাহবা দিচ্ছেন।

ওরা আবার পার্কিং লটের দিকে গেল গাড়িটা নেওয়ার জন্য। বৃষ্টি এখন খুবই জোরে পড়ছে, গাছের পাতায় বৃষ্টির জল পড়ে একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। অমিত ভাবল, বিয়ের অনুষ্ঠানটা যদি কালকের বদলে আজ হত, তা হলে সবকিছুই অন্যরকম হত। তারা গির্জায় জড়ো হত, আর সকলে মন্তব্য করত অনুষ্ঠানটির বিশৃঙ্খলা নিয়ে। বেশ লজ্জাকর ব্যাপার হত কিন্তু সেটা। বৃষ্টি ক্রমশ জোরে পড়তে লাগল এবং ওরাও অনেকটা জগিং-এর মতো করে আরও দ্রুত চলতে লাগল, মিগ্যান একটা হাত দিয়ে মাথা ঢাকার চেষ্টা করতে লাগল। তারা পৌঁছোল স্ট্যান্ডিশ হলে, যে ডর্মে তারা থাকার ব্যবস্থা করতে পারত। সামনের দরজাটা খোলা, পাল্লাটা আটকানো রয়েছে একটা ভারী পাথর দিয়ে।

"চলো, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যাই," অমিত বড় করে শ্বাস নিল। "আমাকে একবার বাথরুমে যেতে হবে।"

প্রবেশপথে একটা বুলেটিন বোর্ডে বিয়েতে আসা অতিথিদের জন্য ঘর বণ্টনের একটা লিস্ট রয়েছে। মিগ্যান ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিস্টটা পড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগল আর ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাথরুমে গেল অমিত। গোটা হলঘর জুড়েই সব দরজা খোলা, বিছানা থেকে চাদরগুলো তুলে একদিকে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। বাথরুমে শাওয়ার ছাইরঙা মার্বেল স্ল্যাব দিয়ে আলাদা করা, সেখানে এখনও জলকণা লেগে রয়েছে সকালে ব্যবহারের চিহ্ন হিসেবে। অমিত ফিরে এসে দেখল, মিগ্যান সেখানে নেই। হলঘরের অন্য অংশে তাকে খোঁজাখুঁজি করতে করতে হলঘরের পাশের একটা ঘরেই পেয়ে গেল তাকে। ঘরে ঢুকে দেখল মিগ্যান একটা জেরক্স করা কাগজ মন দিয়ে দেখছে। জেরক্স-করা কাগজটার ওপর জুতোর সোলের দাগ পড়েছে। তার পায়ের শব্দেই মিগ্যান মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "ব্রাঞ্চ এগারোটার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।"

ঘরের সাজসজ্জা অমিতের পরিচিত। কিন্তু সে যখন ছিল তার চেয়ে অনেক নতুনভাবে ঘরটাকে সাজানো হয়েছে। ম্যাট্রেসটা এখন অনেক শক্তপোক্ত এবং আগের মতো সেটাতে সাদা-কালো দাগও নেই। মেঝেতে একটা তামাটে খয়েরি রঙের কার্পেটও পাতা। আধখোলা জানলা দিয়ে আলো ঢুকে একটা আরামদায়ক ছায়াও সৃষ্টি হয়েছিল। অমিত দেওয়াল-আলমারিটা খুলে দেখল সেটা কোনওরকমে একটা হ্যাঙার টাঙানোর মতো চওড়া।

"আমার মনে হয় আমরা এখানে থাকলেই ভাল করতাম," বলল মিগ্যান। "দুশো ডলার বেঁচে যেত। তুমিও উধাও হয়ে যেতে না আর আমাকেও অর্ধেক রাত জুড়ে দুশ্চিন্তা করে কাটাতে হত না।"

দেওয়াল-আলমারিটা বন্ধ করল অমিত, বন্ধ করে দিল ঘরের দরজাও, ভিতর থেকে দরজাটা লক করার মতো কিছু ছিল না। হতাশ গলায় অমিত বলল, "আমারই ভুল হয়েছিল, ভেবেছিলাম ওই হোটেলে আরও বেশি রোম্যান্টিক পরিবেশ পাব।"

"কিন্তু এটা আরও অনেক বেশি রোম্যান্টিক," যদিও নিস্পৃহ স্বরে কথা বলছিল মিগ্যান, তবু অমিতের মনে হল ওর গলার স্বরে রয়েছে অনুতাপের ছোঁয়া। অমিত যখন তার দিকে তাকাল, তখন সে পুলওভার খুলে ফেলেছে, টি-শার্ট দিয়ে চশমার কাচ দুটো মুছছে। তার চুলগুলো পিছন দিকে টেনে বাঁধা। গাল দৌড়োনোর ফলে লাল। চশমাটা পরার আগে পরিষ্কার করা কাচ দুটো এবার চোখের সামনে ধরে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমিতকে জিজ্ঞেস করল, "এই ঘরেই কি তুমি প্রথমবার সেক্স করেছিলে?"

এটা এমন একটা বিষয়, যা এত বছর পরেও মিগ্যান অমিত সম্পর্কে জানে না। একটু আগে অমিতের ওপর তার রাগ হলেও প্রশ্নটা করতে খুব দ্বিধা করল না সে। এই সময়টাতে সে অমিতের সঙ্গে ছিল না বলে তার কৌতূহলটা যে স্বাভাবিক, এটা বুঝল অমিত। সে উত্তর দিল, "ল্যাংফোর্ডে আমার কোনও সেক্স-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা হয়নি। তা ছাড়া এটা তো বয়েজ হস্টেল ছিল!"

"বয়েজ হস্টেলে কোনও মেয়ে ঢোকে না, এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?"

"নিশ্চয়ই ঢোকে। কিন্তু আমার সঙ্গে কারও কোনওদিনও শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। আমি তো তোমাকে হাজারবার বলেছি, এখানে থাকতে আমার কী ভীষণ খারাপ লাগত!"

"আর প্যাম?" হাত দুটোকে বুকের কাছে ক্রস করে বিছানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মিগ্যান, "ওর সঙ্গে কখনও তোমার কোনও শারীরিক সম্পর্ক হয়নি?"

"না।"

মিগ্যান অমিতের দিকে একটু এগিয়ে এল। ওর ভেজা, ঠান্ডা, শরীরের সঙ্গে লেপটে থাকা শার্টটার দিকে চোখ বুলিয়ে সরাসরি অমিতের চোখের দিকে তাকাল সে, বলল, "সেটা কী করে সম্ভব? এতদিন তোমরা একসঙ্গে কাটিয়েছ, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কিছু হয়েছে, হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।"

"সত্যিই কিছু হয়নি মেগ। আমরা ভাল বন্ধু ছিলাম, একসময় ওর প্রতি একটা ক্রাশও ছিল। কিন্তু কিচ্ছু হয়নি! এই ছোট ব্যাপারটাকে এত বড় করে কি ভাবার দরকার আছে?"

অমিতের কথাগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল ওদের দু'জনের মধ্যিখানে। ভীষণ দামি ভেবে এই ছোট্ট কথাটা, মিগ্যানের কাছ থেকে এতদিন সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল অমিত, অথচ বলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল কত তুচ্ছ! জানলা দিয়ে সে দেখতে পেল, পরিষ্কার করার লোকেরা এই বৃষ্টিতেও চেয়ার ভাঁজ করে একটা গাড়িতে তুলছে। অমিত একটু এগিয়ে গিয়ে জানলাগুলো পুরোপুরি বন্ধ করে দিল, ফলে ঘরের অন্ধকারটা আর-একটু গাঢ় হল! অমিত মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত দিয়ে মিগ্যানের পা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো জড়িয়ে ধরে ওর জিনসে মুখ ঘষতে লাগল। ভয় পাচ্ছিল মিগ্যান হয়তো হেঁটে চলে যাবে বা ওর এই অস্বস্তিকর ব্যবহার থেকে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে, কিন্তু মিগ্যান সেসব কিছুই করল না। একটু পরেই অমিত তার মাথায় মিগ্যানের হাতের স্পর্শ অনুভব করল। মিগ্যান তার লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে তার পাকাচুলে বিলি কাটতে লাগল, সেক্সের একটা অদম্য ইচ্ছে অনুভব করল অমিত। সে মিগ্যানের পায়ে চুমু খেতে শুরু করল এবং তার বেল্টের লুপগুলো শক্ত করে ধরে তাকে নীচের দিকে টানতে লাগল, যাতে সে-ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তারপর জিনসের ভিতর দিয়ে তার শরীর স্পর্শ করল অমিত, যেন আগে থেকেই জানত, কোথায় কীভাবে স্পর্শ করলে তার কী অনুভূতি হবে। মিগ্যানের দিকে তাকাল সে, মুখ ঘুরিয়ে রাখলেও সে এখন কিছুটা রিল্যাক্সড, উপভোগ করছে তার হাতের স্পর্শ।

"এখানে... এভাবে... এটা ঠিক হচ্ছে না অমিত," ফিসফিস করে বলল সে। কিন্তু ততক্ষণে সে তার মাথা এলিয়ে দিয়েছে, তার পুলওভার টেনে খোলাতেও বাধা দেয়নি অমিতকে।

অমিত তার গলায়-ঘাড়ে চুমু খেতে খেতে বলল, "কেন?" এবং মিগ্যানকে উত্তর দেওয়ার কোনও সুযোগ না দিয়েই সে তার ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল, মিগ্যানও চুমু খেল তাকে। তারপর সে মিগ্যানের হাত টেনে নিয়ে নিজের বেল্টের নীচে রাখল।

মিগ্যান এবার তার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, "এটা তো একটা ডর্ম, বাচ্চারা সব থাকে এখানে!"

কিন্তু অমিত থামল না, তার হাত নিয়ে সে বেল্টের ওপর রাখল এবং মিগ্যানের টি-শার্ট খুলে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল, টেনে খুলে ফেলল তার চুল। তারপর তার জিনস টেনে নামাল সে। দেখল মিগ্যানের উরু ঠান্ডা এবং তাতে রোদে পোড়ার মতো লালচে ভাব। জুতো-মোজা খুলে ফেলতেই লেগে থাকা ভেজা ঘাসগুলো ছড়িয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর এবং সঙ্গে সঙ্গে খাটের ম্যাট্রেসের ওপরই শুয়ে পড়ল তারা। অমিত মনে করতে পারল না শেষবার কবে তারা এভাবে তাদের বেডরুমের বাইরে, অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় লিপ্ত হয়েছে। সেখানে তারা সবসময় নার্ভাস থাকে, এই বুঝি মেয়েরা ঢুকে পড়ল! এখনও তারা নার্ভাস, কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ার চাপা উত্তেজনায় একটা চোরা আনন্দও অনুভব করছে। মিগ্যানের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরে প্রবেশ করতেই অমিত বুঝতে পারল মিগ্যানের উষ্ণ হাত তাকে জড়িয়ে ধরেছে, তার গোড়ালির স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে তার পায়ের পিছনদিকে। আর তার কানের মধ্যে মিগ্যানের জিভের স্পর্শ। মিগ্যান ঘুরে শুতে চাইল কিন্তু অমিত তার দিকে দেখতে চাইছিল। অমিত মিগ্যানের পেটে যে দাগগুলো সাদা ঝিনুকের ভেতরের দাগের মতো জ্বলজ্বল করছিল সেখানে হাত রাখল। এই শারীরিক ক্ষয়ের লক্ষণের দাগগুলো আর কখনই যাবে না। অমিত তার বুকের ওপর মুখ রাখল। বাচ্চাদের পরিচর্যা করতে করতে মিগ্যানের বুক এখন প্রায় সমান এবং নিঃশেষিত।

মিগ্যানের নিশ্বাস ঘন হয়ে এল এবং সে শীৎকার করে উঠল, পাশের ঘরগুলিতে তার আওয়াজ পৌঁছোনো অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু কেউ তাদের খুঁজতে এল না, কোনও কাজের লোক পরিষ্কার করতে এল না, অন্য অতিথিদের কেউ তাদের ঘরে উঁকি মারতে এল না, কোনও ছোট্ট মেয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে পড়ল না। অমিত আস্তে আস্তে উঠে বসল, মনে পড়ল যে তারা আর এ ঘরে বেশিক্ষণ থাকবে না। মিগ্যানের চোখ অমিতের মুখের ওপর স্থির। হাত দুটো অমিতের বুকের দিকে বাড়ানো, তাকে দ্বিতীয়বার কিছু করা থেকে নিরস্ত করার জন্য। অমিত মনে মনে আশা করল যে, মিগ্যান হয়তো এবার তাকে ক্ষমা করেছে। তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল, হৃৎপিণ্ড অনুভব করতে লাগল মিগ্যানের ফরসা নরম হাতের স্পর্শ। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও তো তারা কিছুটা সময় একসঙ্গে কাটাতে পেরেছে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধুই ভাল

সুধাই সুরার সঙ্গে রাহুলের পরিচয় করিয়েছিল। একবার সপ্তাহশেষে রাহুল পেন-এ এসেছিল সুধার সঙ্গে দেখা করতে। তখন সুধা রাহুলকে একটা পিপে থেকে তার প্রথম পানীয় এবং পরের দিন সকালে ডাইনিং হল-এ প্রথম কফি খাইয়েছিল। রাহুল বলেছিল, দুটোই বাজে খেতে। বিয়ারের চেয়ে 'শ্ল্যাক্স' তার বেশি ভাল লাগত। কফির কাপে প্রায় ডজনখানেক চিনির প্যাকেট সে ঢেলে দিয়েছিল। সেটা ছিল রাহুলের হাই স্কুলের জুনিয়র বছর। পরের গ্রীষ্মে সুধা যখন বাড়ি এসেছিল, তখন রাহুল তাকে কয়েকটা সিক্স-প্যাকস কিনে দিতে বলল। তাদের মা-বাবা এক রাতের জন্য যখন কানেকটিকাট যাচ্ছিলেন, সেই সুযোগে রাহুল একটা পার্টির পরিকল্পনা করেছিল। সে তখন ছ'ফিট লম্বা হয়ে গিয়েছে। দাঁতে আর তার লাগানো নেই, মুখের চারপাশে গোঁফদাড়ির রেখা দেখা দিয়েছে, গালে কয়েকটা ব্রণ। শুধু নামেই সুধার ছোট ভাই। সুধা একটা স্থানীয় মদের দোকানে গিয়েছিল। আর মা-বাবা যাতে টের না পান, সে জন্য ক্যানগুলো তার ঘর এবং রাহুলের ঘরে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল।

মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়ার পর সুধা কয়েকটা ক্যান নিয়ে রাহুলের ঘরে গিয়েছিল। রাহুল নীচে গিয়ে উষ্ণ 'বাডওয়াইজার' শীতল করার জন্য এক কাপ বরফের টুকরো নিয়ে এসেছিল। রাহুলের রেকর্ড প্লেয়ারে 'স্টোন্স অ্যান্ড ডোর্স'-এর রেকর্ড চালিয়ে শুনতে শুনতে, তারা একের পর এক কাপ ভাগ করে খেল। খোলা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। মনে হচ্ছিল যেন, সুধা আবার হাই স্কুলে ফিরে গিয়েছে। একসময় যে কাজগুলো করার বুদ্ধি বা সাহস তার ছিল না, সেগুলো এখন করতে পারছে। ভাইয়ের প্রতি সে এক নতুন টান অনুভব করল। মনে হল যেন, এত বছর রাহুলকে শুধুই একটা বাচ্চা ছেলে মনে করার পর, অবশেষে সে তার বন্ধু হয়ে উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

মা-বাবার অবাধ্য হওয়ার জন্য সুধা কলেজ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। তার আগে, সে তাঁদের প্রত্যাশা অনুযায়ীই জীবনযাপন করত। শুধুই পড়াশোনা করা, বন্ধুবান্ধব বলতে শুধুই ক্লাসের অন্যান্য শান্ত, গম্ভীর কয়েকজন মেয়ে। কারণ সে জানত একদিন সে স্বাধীন জীবনযাপনের সুযোগ পাবে। মা-বাবার নাগালের বাইরে ফিলাডেলফিয়ায় গিয়েও সে অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশোনা করত। একসঙ্গে অর্থনীতি এবং অঙ্কে মেজর করেছিল। কিন্তু সপ্তাহশেষে সে বাঁধন শিথিল করে দিয়ে পার্টিতে যেত, নিজের বিছানায় ছেলেদের সঙ্গে শুত। পান করা শুরু করল, যা তার মা-বাবা করতেন না। পান করার ব্যাপারে তাঁরা পিউরিটানসুলভ গোঁড়া ছিলেন। তাঁদের বাঙালি পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা অর্থাৎ যে পুরুষমানুষরা— কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে হুইস্কিতে চুমুক দেওয়া পছন্দ করতেন, তাঁদের প্রতি বিরক্ত হতেন। যে বছর সে ফ্রেশম্যান ছিল, তখন কোনও-কোনও রাতে সুধা এমনই মাতাল হয়ে যেত যে, ক্যাম্পাসের ভিতরের ফুটপাথের ওপর বমি করে, বন্ধুদের সঙ্গে টলতে টলতে ডর্মিটরিতে ফিরত। কিন্তু সে জানত তার সীমারেখা কোথায়। বাড়াবাড়ি করা, অসংযমী হওয়ার মধ্যে সুধা কোনও আকর্ষণ খুঁজে পেত না। যোগ্যতা। সামর্থ্য। মূলত এগুলোই সুধার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

রাহুল হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর, তাদের মা-বাবা, আমেরিকায় দু'সন্তানকে সফলভাবে মানুষ করতে পেরেছেন মনে করে উপলক্ষটি বিশেষভাবে পালন করলেন। রাহুল কর্নেল-এ যাচ্ছিল। সুধা তখনও ফিলাডেলফিয়ায়, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এ স্নাতকোত্তর হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছিল। মা-বাবা একটি পার্টির আয়োজন করলেন। প্রায় দুশো জন নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ইথাকায় থাকার সময় রাহুলের প্রয়োজন হবে বলে তাকে একটি গাড়ি কিনে দিলেন এবং রাহুলের স্কুল নিয়ে বড়াই করলেন। পেনসিলভেনিয়ার চেয়ে রাহুলের স্কুল তাঁদের বেশি মর্যাদাসম্পন্ন মনে হয়েছিল। পার্টির শেষে, সুধা এবং রাহুলকে নিজের দু'পাশে নিয়ে তাদের বাবা ফোটোর জন্য দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "আমাদের কাজ শেষ।" বছরের পর বছর তাদের অন্যান্য বাঙালি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তুলনা শুনতে হয়েছিল। বিজ্ঞানমেলা থেকে আনা সোনার পদক, কোন কলেজে সম্পূর্ণ বৃত্তি পাওয়া যায়। কাগজে কোনও অসাধারণ মেধার ছেলেমেয়ের কথা ছাপা হলে মাঝে মাঝে সুধার বাবা সেই লেখাটি কেটে রাখতেন— যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি কুড়ি বছর বয়সে পিএইচডি শেষ করেছে বা যে মেয়েটি বারো বছর বয়সে স্ট্যানফোর্ড-এ ভরতি হয়েছে— এবং কাগজটি ফ্রিজে আটকে রাখতেন। সুধার যখন চোদ্দো বছর, তার বাবা হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এনে তার ডেস্কে রেখেছিলেন।

সুধার উদাহরণ তার মা-বাবাকে শিখিয়েছিল যে, সন্তানকে কলেজে পাঠানোতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রাহুলও ব্যাপারটা সহজভাবেই নিল। কলেজে যাওয়ার আগের গ্রীষ্মে সুধা যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, সে তেমন হল না। আসন্ন পরিবর্তনের প্রতি সে ছিল নিস্পৃহ। তার হাবভাব দেখে সুধার মনে পড়ে গেল যে, তাদের দু'জনের মধ্যে রাহুল সবসময়ই বেশি চালাকচতুর। অনার রোল-এ নিজের স্থান বজায় রাখার জন্য, হাই স্কুলে ক্লাসের স্যালুটেটোরিয়ান হওয়ার জন্য সুধাকে রীতিমতো খাটতে হয়েছিল। কিন্তু রাহুল ইচ্ছে না হলে কখনও একটা আঙুলও তুলত না বা একটা বইও খুলে দেখত না। তা সত্ত্বেও সে তৃতীয় শ্রেণি টপকে সরাসরি চতুর্থ শ্রেণিতে উঠে গিয়েছিল।

গ্রীষ্মের শেষে রাহুলকে গোছগাছে সাহায্য করার জন্য সুধা ওয়েল্যান্ডে গিয়ে দেখল যে, তার করার মতো কিছু বাকি নেই। রাহুল ইতিমধ্যেই তার ব্যাগে জিনিসপত্র ঠেসে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। কয়েকটা দুধের ঝুড়িতে রেকর্ড ভরতি করেছিল, চাদরের আলমারি থেকে চাদর এবং তোয়ালে বের করে নিয়েছিল এবং নিজের ইলেকট্রিক টাইপরাইটারের তারটা টাইপরাইটারের গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। সে সুধাকে বলল, সুধার ইথাকা পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সুধাই জোর করে রাহুলের নতুন গাড়িতে উঠে বসল। রাহুলের গাড়ির পেছনে মা-বাবা গাড়ি চালিয়ে এলেন। ক্যাম্পাসটা একটা ছোট পাহাড়ের ওপর, চারিদিকে খেতখামার, লেক, জলপ্রপাত দিয়ে ঘেরা। পেন-এর সঙ্গে কোনও মিল নেই। সুধা রাহুলের জিনিসপত্র নামাতে সাহায্য করল। অন্যান্য নতুন ছাত্রদের পরিবারের সদস্যদের মতো চারকোনা চত্বরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বাক্স বয়ে নিয়ে গেল। বিদায় জানানোর সময় এলে, মা কান্নাকাটি করলেন। ছোট ভাইকে, যার আঠারোও হয়নি, অত দূরে ওই বিশাল জায়গায় ফেলে রেখে যেতে হবে ভেবে সুধাও সামান্য কাঁদল। কিন্তু রাহুল এত নির্বিকার, দেখে মনে হচ্ছিল না যে তাকে ফেলে যাওয়া হচ্ছে অথবা মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। চলে যাওয়ার সময় বাবা যে টাকাটা গুনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার হাতে দিলেন, সেটা সে পকেটে পুরে নিল এবং সুধা ও মা বাবার গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার আগেই মুখ ফিরিয়ে ডর্মিটরির দিকে চলে গেল।

এরপর বড়দিনে সুধার সঙ্গে রাহুলের দেখা হল। খাওয়ার সময় ক্লাস, অধ্যাপক অথবা নতুন বন্ধুদের নিয়ে রাহুলের কিছুই বলার ছিল না। তার চুল বেড়ে গিয়ে ঘাড় ঢেকে ফেলেছিল, কানের পিছনে গোঁজা যাচ্ছিল। গায়ে একটা চেক-কাটা ফ্ল্যানেলের শার্ট, আর কবজিতে একটা বোনা, গিঁট বাঁধা বালা। বাড়িতে এলে সুধা তখনও প্রচুর খাবার খেত, রাহুল কিন্তু তা খেল না। সুধা এবং মা মিলে গাছটা সেই সব সরঞ্জাম দিয়ে সাজালেন, যেগুলো সুধা এবং রাহুল তাদের ছেলেবেলায় তৈরি করেছিল। রাহুল তাঁদের সাজানো দেখল, কিন্তু সাহায্য করল না। দেখে মনে হচ্ছিল যে, সে একঘেয়ে বোধ করছে। সুধার মনে পড়ল, বড়দিনের ছুটিতে সে নিজে যেন সবসময়ই ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে পড়ত। পরীক্ষার চাপ কেটে যাওয়ার পর তার শরীর ভেঙে পড়ত। সে ভাবল, রাহুলেরও হয়তো তাই হবে। কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলা, সুধা যখন নিজের ঘরে উপহারগুলো কাগজে মুড়ছিল তখন রাহুল তার ঘরে এল, রাহুলকে দেখে বেশ চনমনে লাগছিল। "এই, কোথায় লুকিয়েছিস?" সে জিজ্ঞেস করল।

"কী লুকিয়েছি?"

"প্লিজ বলিস না যে তুই কিছু নিয়ে আসিসনি?"

"ও," সুধা বুঝতে পারল। "আমার মাথায় আসেনি। আমি ভেবেছিলাম, তুই যেহেতু কলেজে আছিস—" কথাটা সত্যি। এবার আর ব্যাগে সিক্স-প্যাক ঢোকানোর কথা সুধার মাথায় আসেনি। তার এখন ওয়াইন বেশি পছন্দ। ফিলাডেলফিয়ায় বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বেরোলে খাবারের সঙ্গে এক গ্লাস ওয়াইন খেতে তার ভাল লাগে। কিন্তু ওয়েল্যান্ডের বাড়িতে সে ওয়াইনের আশাই রাখে না।

"এখানে কিছু কেনার মতো বয়স আমার এখনও হয়নি।" রাহুল ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। যেন সে যা খুঁজছে, তা সেখানে পাওয়া যেতে পারে। সুধার দেওয়াল-আলমারি, দেরাজ, র‍্যাপিং পেপারে ঢেকে যাওয়া খাট এবং 'ফিলিন্স'-এর একটা বাক্সের ভিতর মায়ের জন্য কেনা একটা নাইটগাউনের দিকে তাকাল।

AMARBOI.COM

"লিকার স্টোর এ যাবি?" খাটের ওপর বসে রাহুল প্রস্তাব দিল। বিছানায় ছড়িয়ে থাকা র‍্যাপিং কাগজ তার ভারে দুমড়ে গেল। রাহুল গিফটট্যাগ এবং সেলোটেপ নিয়ে নাড়াচাড়া করল, এক একটা জিনিস তুলে আবার রেখে দিল।

"এখন?" সুধা জিজ্ঞেস করল।

"তোর কি এখন অন্য কিছু করার আছে?"

"না, তবে মা-বাবার খুবই অদ্ভুত লাগবে যদি আমরা হঠাৎ বেরিয়ে যাই।"

রাহুল চোখ কপালে তুলে বলল, "হায় ভগবান, দিদি! তোর প্রায় চব্বিশ বছর বয়স হল! তুই এখনও মা-বাবা কী ভাববেন তাই নিয়ে মাথা ঘামাস?"

"আমি জামাকাপড় ছাড়তে যাচ্ছিলাম।"

রাহুল কাঁচিটা তুলে নিল। কাঁচিটা ধীরে ধীরে খুলতে-বন্ধ করতে করতে এমনভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকল যেন, প্রথমবার কাঁচির ব্যবহার শিখছে। "তুই কবে থেকে এত বোরিং হয়ে গেলি?"

সুধা যদিও জানত যে, রাহুল ইয়ারকি করছে, তবুও তার খারাপ লাগল। "কাল, কথা দিচ্ছি।"

রাহুল উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন, সে খাবার সময়ের মতো আবার অনেক দূরে সরে গিয়েছে। সুধা ইতস্তত করল। "মনে হয় এখনও খোলাই থাকবে," সে নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। দোকানে যাওয়ার সময় মা-বাবাকে মিথ্যে কথা বলল: তার মল থেকে কিছু কেনার দরকার আছে। রাহুল বলল সে সুধাকে গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে।

"তোর মতো মেয়ে হয় না," শহরের দিকে যেতে যেতে রাহুল বলল। নিজের দিকের জানলাটা নামিয়ে দিতে গাড়িটা হিমশীতল বাতাসে ভরে গেল। রাহুল সিগারেটের প্যাকেটের জন্য কোটের পকেট হাতড়াল। ড্যাশবোর্ডের লাইটারে সিগারেট জ্বালিয়ে সুধাকে একটা অফার করল, কিন্তু সুধা মাথা নেড়ে, গাড়ির ভিতরের গরমটা বাড়িয়ে দিল। রাহুলকে বলল, সে পরের বছর 'লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স'-এ পড়ার আবেদন করেছে, দ্বিতীয়বার স্নাতকোত্তর করার জন্য।

"তুই একটা গোটা বছরের জন্য লন্ডন যাবি?"

"তুই ওখানে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারিস।"

"আর একটা মাস্টার্স ডিগ্রি করে কী হবে?" রাহুলকে বিচলিত এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রসন্ন শোনাল। সুধা তার মা-বাবার কাছে এরকম প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল কারণ তার মা-বাবা তাকে অক্সফোর্ডে একটা জুনিয়র বছর কাটাতে দেননি। সে সময় তাঁরা বলেছিলেন যে, তার তখনও বিদেশে একলা থাকার বয়স হয়নি। কিন্তু এবার তাঁরা সুধার লন্ডন যাওয়ার কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। বিয়ের পর প্রথম তাঁরা লন্ডনেই থেকেছিলেন, সুধার জন্মও সেখানেই হয়েছিল। তাঁরা পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার, তাদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করার কথা আলোচনা করছিলেন।

সুধা বোঝাল যে, এলএসই-তে ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্স সবচেয়ে ভাল পড়ানো হয়। এবং সে পরে কোনও বেসরকারি সংস্থায় সামাজিক কাজ করার কথা ভাবছে। কিন্তু রাহুলকে দেখে মনে হল সে সুধার কথা শুনছে না। সুধার রাহুলের ওপর রাগ হল। সত্যি বলতে কী, নিজের ওপরই রাগ হল, অত রাতে বেরোতে রাজি হওয়ার জন্য। "তোর কি সিক্স-প্যাক চাই?" দোকানে পৌঁছে সে জিজ্ঞেস করল।

"একটা কেস হলে বেশি ভাল হয়।"

আগে সুধা জিনিসের দাম মেটানোর আগে দ্বিতীয়বার ভাবত না। কিন্তু এখন সে লক্ষ করল রাহুল নিজের মানিব্যাগের দিকে হাতও বাড়াল না।

"আর একটা ভদকার বোতল।"

"ভদকা?"

রাহুল প্যাকেট থেকে আর-একটা সিগারেট বের করল। "ছুটিটা লম্বা।"

তারা যতক্ষণে ফিরল, মা-বাবা শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সুধা বলল যে, তারা আগের মতোই জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখবে। যে কয়েক সপ্তাহ রাহুল বাড়ি আছে, সে ক'দিন মা তার ঘর পরিষ্কার করতে অথবা কাচার জন্য তার জামাকাপড় নিতে ঘরে ঢুকতে পারেন ভেবে, সুধা বোতলগুলো নিজের ঘরেই রাখল। কয়েকটা রাখল বইয়ের তাকের পিছনের ফাঁকে। 'স্মার্নফ'-এর বোতলটার গায়ে একটা পুরনো সোয়েটার জড়িয়ে দেরাজের ভিতর ঢুকিয়ে রাহুলকে বলল, সেটাই নিরাপদ। কিন্তু রাহুলকে দেখে মনে হল না, তার কিছু এসে যায়। সেই রাতের জন্য দুটো ক্যান নিয়ে, সুধার গালে হালকা চুমু খেয়ে চলে গেল। সুধা যখন বলল যে, বড্ড ক্লান্ত বলে রাহুলের সঙ্গে বসতে পারবে না, তখন সে পীড়াপীড়ি করল না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুধার যখন ছ'বছর বয়স, তখন রাশুলের জন্ম। যে রাতে মায়ের প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়েছিল, সেই রাতটা সুধার পুরোটাই মনে আছে। তার মনে আছে, পিবডি-তে মা-বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে পার্টিতে মা-বাবার সঙ্গে সে গিয়েছিল। রাতটাও তাকে সেখানেই কাটাতে হয়েছিল কারণ, তার বাবা মাকে নিয়ে সোজা বস্টনে চলে গিয়েছিলেন। হাসপাতালে মায়ের ব্যবহারের জন্য টুথব্রাশ, কোল্ড ক্রিম এবং রোব যে সুটকেসটায় গুছিয়ে রাখতে মাকে সুধা সাহায্য করেছিল, সেই সুটকেসটা নিয়ে যাওয়ারও সুযোগ হয়নি। সুধা বুঝেছিল যে, একটি শিশুর জন্ম হতে চলেছে। মাঝে মাঝে যখন মনে হত যে, বাচ্চাটা তার মায়ের পেট ঠেলেই বেরিয়ে আসবে, তখন সে হাত দিয়ে তাকে অনুভবও করেছিল। তবুও, মাকে দেওয়ালে কপাল চেপে যন্ত্রণায় গোঙাতে দেখে সে আতঙ্কিত হয়ে ভেবেছিল যে, তার মা আর বাঁচবেন না। মায়ের হাতে হাত বুলিয়ে দিতে গেলে মা এমনভাবে বলেছিলেন, "চলে যা" যা সুধাকে আঘাত করেছিল। "আমি চাই না তুই আমাকে এই অবস্থায় দেখিস।" তার মা-বাবা বেরিয়ে যাওয়ার পর পার্টি আগের মতোই চলতে থাকল। সকলে ধরে নিয়েছিল যে, বড়দের খেতে দেওয়া হচ্ছে, সুধা তখন বেসমেন্টে, ওয়াশার এবং ড্রায়ারের মাঝে, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলছে। যাদের বাড়িতে পার্টি ছিল, তাদের কোনও সন্তান ছিল না। সুধা একটা অন্য ঘরে একটা ছোট খাটে ঘুমোল। সে-ঘরটায় একটা ইস্তিরি করার বোর্ড এবং পরিষ্কার করার মালপত্র ভরতি একটা দেওয়াল-আলমারি ছাড়া আর কোনও আসবাব ছিল না। সকালে প্রাতরাশে সে 'ফ্রস্টেড ফ্লেকস' পেল না শুধু মার্জারিন মাখানো টোস্ট খেতে হল। তখনই, বয়স্কদের মতন সেই সংক্ষিপ্ত হতাশাজনক প্রাতরাশ খাওয়ার সময়ই, তার ভাইয়ের আগমনের খবর দিতে ফোনটা বাজল।

সুধা বোন চেয়েছিল তবুও, তাকে আর একা থাকতে হবে না; বাড়িটা তার যেমন ফাঁকা লাগে, একজন সঙ্গী এসে সেই ফাঁকাভাব দূর করবে ভেবে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বাড়িতে তাদের যে ক'টা জিনিস ছিল, সেগুলো সবসময়ই একই জায়গায় রাখা থাকত। 'টাইম'-এর দুটো সাম্প্রতিকতম সংখ্যা সবসময় কফিটেবিলের ওপর ঠিক একই জায়গায় রাখা থাকত। তার আমেরিকান বন্ধুদের বাড়িগুলো কিন্তু সুধার বেশি ভাল লাগত। জিনিসপত্রে বোঝাই, সিঙ্কে টুথপেস্ট মাখানো, নরম বিছানা এলোমেলো। অবশেষে,

AMARBOI.COM

রাহুল আসার পর তাদের বাড়িটাও একই রকম জিনিসপত্র উপচে ওঠা অগোছালো হয়ে গেল। ড্রেসারের ওপর রাহুলের লোশন এবং ডায়পার পড়ে থাকত। স্টোভের ওপর স্টকপটে ফুটন্ত বোতল ভিড় করে থাকত। শিশুর গায়ের গাঢ়, দুধের গন্ধ সব ঘরে ছড়িয়ে থাকত। সুধার মনে আছে সে কত উত্তেজিত ছিল। তার শোওয়ার ঘরে রাহুলের দোলনা, চেঞ্জিং টেবিল এবং মৌমাছি ভরতি খেলনা মোবাইল রাখার জন্য নিজের জিনিসপত্র একদিকে সরিয়ে দিয়েছিল। পরে, রাহুল যে ছোট্ট ঘের দেওয়া খাটে শোবে, সেখানে খেলনা এবং অন্যান্য উপহার জড়ো হতে লাগল। সুধার সবচেয়ে প্রিয় খেলনা ছিল একটা নরম সাদা খরগোশ। সেটার গলার কাছে একটা চাবি ঘোরালে সুর বেজে উঠত। মাঝরাতে মা রাহুলকে শান্ত করার জন্য ঘরে আসলেও সুধা কিছু মনে করত না। মা একটা রকিং চেয়ারে বসে বাংলা গান গাইতেন, একটা ছোট্ট ছেলের পায়ে মাছের কাঁটা বিঁধে যাওয়ার গান। তাঁর গান শুনে সুধাও ঘুমিয়ে পড়ত। দোকানে গিয়ে শিশুর জন্ম-সংবাদ জানানোর জন্য কার্ড কেনা হল। সুধার পছন্দ করা কার্ড। সে কার্ডগুলো খামে ভরতে সাহায্য করল আর, বাবার সঙ্গে একটা ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে স্ট্যাম্প আটকাল। অসংখ্য ফোটো তোলা হয়েছিল— রাহুল তার দোলনায় ঘুমোচ্ছে, প্লাস্টিকের টাবে চান করছে— সুধা নিজে ভার নিয়ে ফোটোগুলো একটা বিশেষ অ্যালবামে সাজিয়েছিল। রাহুল ছেলে বলে অ্যালবামটায় একটা নীল ডেনিমের ঢাকা দেওয়া হয়েছিল।

সুধার শৈশবের ইতিহাস সেইভাবে ধরে রাখা হয়নি। লন্ডনে, সুধা জন্মানোর পর, তার মা-বাবা বালহামে মি. পাল নামে এক বাঙালি বাড়িওয়ালার কাছে দুটো ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। সুধার শিশু অবস্থায় যে কয়েকটি ফোটো আছে, সেগুলো মি. পালই তুলেছিলেন। ফোটোতে সুধা একটা সাদা লেসের জামা পরে আছে। সেরকম জামা সাধারণত খ্রিশ্চানরা বাচ্চাদের নাম রাখার সময় পরায়। কিন্তু সুধার মা জামাটি পছন্দ হয়েছিল বলেই কিনেছিলেন। সুধা যখন তার মায়ের গর্ভে, তখন মি. পাল তার মা-বাবার জন্য নিজের বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তাঁদের আগের বাড়িওয়ালি ছিলেন এক বয়স্কা ব্রিটিশ মহিলা, যিনি নিজের বাড়িতে বাচ্চাদের থাকার অনুমতি দিতেন না। তার মা-বাবাকে তখন মি. পাল আশ্রয় দিয়েছিলেন। মা-বাবা পরে সুধাকে বলেছিলেন যে, ছয়ের দশকে লন্ডনের

AMARBOI.COM

অর্ধেক ভাড়াবাড়িতে 'হোয়াইট ওনলি' লেখা থাকত। তার ওপর ভারতীয় এবং গর্ভবতী হওয়ার ফলে তার মা বাবার সুযোগ সুবিধে এতটাই কমে গিয়েছিল যে, মি. পালের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তার বাবা মাকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার কথাও বিবেচনা করেছিলেন। সুধার কাছে গল্পটা গ্রিক পুরাণ বা বাইবেলের কোনও পর্বের মতো শোনাত। অশুভলক্ষণ এবং আশীর্বাদে ভরা গল্প, যেখানে তার পরিবার যেন এক অচেনা, দুর্বিষহ সাগরের অভিযাত্রী।

চার বছর পর তাঁরা ম্যাসাচুসেটসে চলে আসেন। সুধার বাবা ব্যাজার থেকে রেথিয়ন-এ বদলি হয়ে যান। লন্ডনে কাটানো বছরগুলোর কোনও চিহ্ন তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেননি। শুধু সুধার মা রোজ সকালে চায়ের সঙ্গে যে 'ম্যাকভিটি'-র বিস্কুট খেতেন, সেই বিস্কুটগুলোর প্রতি তাঁর দুর্বলতা এবং ব্রিটিশ ব্রেসিয়ারের ওপর তাঁর আজীবনের আস্থা থেকে গিয়েছিল। মাঝেমধ্যেই তিনি ইউকে-র বন্ধুদের অন্তর্বাস কিনে ডাকে পাঠিয়ে দিতে বলতেন। সুধার কোনও খেলনাই অতলান্তিকের এপারে আসতে পারেনি। তার শৈশবের কোনও জামা বা কোনও ধরনের চিহ্নই ছিল না। গ্রেড স্কুলে সুধাকে যখন ক্লাসে তার আত্মকথার উপস্থাপনা করতে হয়েছিল এবং তার সহপাঠীরা ছেলেবেলার কম্বল, ঘষটে যাওয়া জুতো এবং কালো হয়ে যাওয়া চামচ দেখাতে এনেছিল, তখন সে শুধু একটা খামে ভরে মি. পালের তোলা ফোটোগুলো এনেছিল। সহপাঠীদের খুব একঘেয়ে লেগেছিল।

রাহুল আসার পর সেসবে আর কিছু এসে যেত না। সুধা নিজে কখনও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি, কিন্তু সে ঠিক করেছিল যে, তার ছোট ভাই আমেরিকার একজন বিশিষ্ট শিশু হয়ে উঠবে। সে রাহুলের জন্য বেছে বেছে খেলনা কিনত। ইয়ার্ড-সেল থেকে খুঁজে খুঁজে 'ফিশার প্রাইস' গোলাঘর, টোঙ্কা ট্রাক, পশুপাখির শব্দ করা 'স্পিক অ্যান্ড সে' এবং বন্ধুদের খেলাঘরে আবিষ্কার করা অন্যান্য খেলনা, সবই ভাইয়ের জন্য জোগাড় করেছিল। তাকে তার প্রথম শিক্ষিকারা যে গল্পের বইগুলো পড়ে শুনিয়েছিলেন, সে মা-বাবাকে বলত রাহুলকে সেই বইগুলো কিনে দিতে। 'পিটার র‍্যাবিট,' 'ফ্রগ অ্যান্ড টোড' ইত্যাদি। "যে পড়তে পারে না তার জন্য বই কিনে কী হবে?" মা-বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন। কথাটা খুব একটা ভুল ছিল না। তাই সুধা নিজেই তার স্কুল লাইব্রেরি থেকে বইগুলো খুঁজে বের করে ভাইকে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনাত। মা-বাবাকে বলেছিল লনে জলের ঝারি বসাতে যাতে গরমকালে রাহুল সেই জলে ছোটাছুটি করতে পারে। উঠোনে একটা দোলনা বসানোর জন্য বাবাকে রাজি করিয়েছিল। তার নিজের হ্যালোউইনের জন্য সবসময় বাক্সের কেনা পোশাক, কোনও পাতলা অ্যাপ্রন বা মুখোশ আনা হত। কিন্তু রাহুলের হ্যালোউইন পোশাকের জন্য সে বেশ চিন্তাভাবনা করে ভাইকে হাতি বা ফ্রিজে পরিণত করত। মাঝে মাঝে, রাহুলের জিনিসগুলো রাহুলের চেয়ে সেই বেশি ব্যবহার করত। ততদিনে দোলনার পক্ষে বেশি ভারী হয়ে গেলেও সে-ই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে উঠোনের দোলনায় দোল খেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে 'লিঙ্কন লগ' ব্যবহার করে শহর গড়ে তুলত যা রাহুল এক ঝটকায় ভেঙে দিত।

যদিও সুধা ভাইকে ভীষণ ভালবাসত, তবুও ছোট ছোট ব্যাপারে তার ভাইকে হিংসে হত। ভাইয়ের রোগা হাত-পা দেখে হিংসে হত। পিরিয়ডস শুরু হওয়ার পর সুধা একটু মোটাসোটা গোছের হয়ে গিয়েছিল। ভাইকে লোকে 'রাউল' বলে ডাকত বলে, যে-কোনও জায়গায় রাহুল নিজের পরিচয় দিলে কেউ প্রশ্ন করত না বলে, সুধার হিংসে হত। ভাইয়ের রূপ দেখেও তার হিংসে হত। রাহুল যখন ছোট ছিল, তখনও তাকে দেখে বোঝা যেত যে, সে বড় হয়ে সুপুরুষ হবে। তাকে পরিবারের কারও মতোই দেখতে ছিল না। সুধার বাবার মতো গোল চিবুক এবং মায়ের মতো নিচু কপাল দেখে নিঃসন্দেহে বোঝা যেত সে তাদের সন্তান। কিন্তু মা বা বাবা কারও সঙ্গেই রাহুলের মুখের খুব একটা মিল ছিল না। তার জিন ওপর থেকে নয়, কোনও গভীর, বিস্মৃত উৎস থেকে টেনে বের করা হয়েছিল। তার গায়ের রং আরও চাপা, বিনা দ্বিধায় তামাটে বলা চলে। মুখের সুস্পষ্ট রেখায় সুধা বা তার মা-বাবার মতো কোনও অনির্দিষ্ট ভাব ছিল না। তাকে গরমকালে শর্টস পরতে দেওয়া হত, স্কুলে খেলাধুলো করতে দেওয়া হত। তাদের মা মনে করতেন এসব মেয়েদের পক্ষে অনুপযুক্ত। সুধার মনে হত, রাহুল ছেলে এবং বয়সে ছোট বলে, এবং ততদিনে তাদের মা-বাবা আমেরিকান আদবকায়দায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন বলেই এটা হয়েছিল। নিজের শৈশবের প্রতি তার কোনও টান ছিল না। তাকে কেমন দেখতে ছিল বা সে কী কী করেছিল, তাই নিয়ে সে আবেগপ্রবণ ছিল না। শুধু ভীষণ আপশোস হত তার কিন্তু ঠিক কীসের জন্য, তা বুঝতে পারত না। তাকে অবশ্য একদমই সাধারণ দেখতে

AMARBOI.COM

ছিল। ঝুঁটি বাঁধা বা বিনুনি করা কালো চুল কোনও বছর তার কোমর পর্যন্ত লম্বা হয়ে যেত তো পরের বছর ডরাথি হ্যামিলের কায়দায় ছেঁটে ফেলা হত। এবং তার দিনগুলো খুব সাধারণভাবেই কাটত। স্লাম্বার পার্টিতে যেত, স্কুল ব্যান্ডে ক্ল্যারিনেট বাজাত এবং দরজায় দরজায় গিয়ে চকোলেট বার বিক্রি করত। কিন্তু তাও সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারত না। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও সে শুধু ছেলেবেলায় ফিরে গিয়ে জীবনটা বদলে ফেলতে চাইত; যে বেঢপ জামাগুলো পরেছিল, যে অনিশ্চয়তায় ভুগেছিল, যে সাধারণ ভুলগুলো করেছিল, সেগুলো সংশোধন করতে চাইত।

রাহুল থাকার ফলে তার মা-বাবার বিবাহিত জীবনের জটিলতার আর একজন সাক্ষীও পাওয়া গিয়েছিল। তাঁরা সুখীও ছিলেন না, অসুখীও ছিলেন না। এই আবেগের অভাবই সুধাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করত। তার মনে হত যেন, মা-বাবা যদি ঝগড়া করতেন, তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হলেও সে ব্যাপারটা বুঝতে পারত। তার সবসময় আশা ছিল যে, মা-বাবার মধ্যে ভালবাসার কোনও চিহ্ন কখনও দেখতে পাওয়া যাবে। তার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল লন্ডনে থাকাকালীন তোলা কয়েকটি ফোটো। তার মা তখন এত রোগা ছিলেন যে, তাঁকে প্রায় চেনাই যাচ্ছিল না। চুল সেলুনে কায়দা করে ছাঁটা, কর্নুকোপিয়ার আকারে বোনা একটি ব্যাগ কনুই থেকে ঝুলছে। সেই সময় তিনি জমকালো শাড়ি পরতেন। দেহের সুঠাম গড়ন দেখানোর জন্য বাদামি বাটিকের শাড়িটা আঁটসাঁটভাবে পরা। সুধার বাবার চেহারাতেও একটা আবছা আধুনিক ভাব ছিল। সুট, সরু গাঢ় রঙের টাই এবং সানগ্লাস পরেছিলেন। সুধার মনে হত, তখন বোধহয় বিদেশবাসী হওয়া একরকম অ্যাডভেঞ্চার ছিল। প্যারাফিন হিটারের ভরসায় থাকা, প্রথমবার বরফ দেখা।

ওয়েল্যান্ডে এসেই তাঁরা একটা ধাক্কা খেলেন। হঠাৎ সুধার মা-বাবা আটকে পড়লেন। বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের আজীবন বিদেশি হয়ে থাকার দণ্ড দেওয়া হয়েছে। লন্ডনে তার মা মন্টেসরি এডুকেশনে একটা সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করছিলেন। কিন্তু আমেরিকায় তিনি কাজ করতেন না বা গাড়ি চালাতেন না। রাহুল জন্মানোর পর তাঁর কুড়ি পাউন্ড ওজন বেড়ে গিয়েছিল। সুধার বাবা তাঁর আধুনিক সুটগুলো তুলে রেখে 'সিয়ার্স' থেকে জামাকাপড় কিনতেন। ওয়েল্যান্ডে তাঁরা নির্বিরোধী, সতর্ক স্বভাবের হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিলেন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুটি শহরের জীবনযাত্রার চেয়েও, নিউ ইংল্যান্ডের এই ছোট শহরের আচার-ব্যবহার তাঁদের বেশি বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। তাঁরা ছেলেমেয়ের ওপর, বিশেষ করে সুধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। সুধাই বাবাকে বুঝিয়েছিল যে, ঝরা পাতাগুলো শুধু আঁকশি দিয়ে ঠেলে বাড়ির পিছনের বনে নিয়ে গিয়ে ফেললেই হবে না, সেগুলো জড়ো করে একটা ব্যাগে ভরতে হবে। সে-ই, নিখুঁত ইংরেজি বলতে পারে বলে, লেকমিয়ার-এর মেরামতি বিভাগে ফোন করে তাদের যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং করে দিতে বলেছিল। রাহুল কখনও এ ধরনের কাজে মা-বাবাকে সাহায্য করা তার কর্তব্য মনে করত না। সুধার মনে হত, স্বদেশ থেকে তার মা-বাবার বিচ্ছেদ ক্যান্সারের মতো এক পীড়া ছিল। কখনও হ্রাস পেত, আবার কখনও কখনও বেড়ে যেত। তাঁদের জীবনের সেই ব্যথার প্রতিও রাহুল নিস্পৃহ ছিল। "ওঁদের তো কেউ জোর করে এখানে টেনে আনেনি," সে বলত। "বাবা বড়লোক হবেন বলে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন। আর মা তাঁকে বিয়ে করেছিলেন কারণ, তাঁর আর কিছু করার ছিল না।" রাহুল ওইরকমই ছিল। সবসময় নিজের পরিবারের দুর্বলতার প্রতি সচেতন। সুধা যে সত্যগুলোর মুখোমুখি হতে চাইত না, সেগুলোর থেকে রাহুল কখনও তাকে রেহাই দিত না।

AMARBOI.COM

সুধার সঙ্গে রাহুলের আবার দেখা হওয়ার আগে আরও একটা সেমেস্টার কেটে গেল। সুধা এলএসই-তে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। জুন মাসে সে এক সপ্তাহের জন্য ওয়েল্যান্ডে থাকতে এল। বাড়িতে থাকার সময় সুধা তার সময় এবং মনোযোগ মা-বাবার প্রতিই পুরোটা ব্যয় করত। বাবার সঙ্গে বসে টিভিতে উইম্বলডন দেখত। মাকে রান্না করতে, শোওয়ার ঘরগুলোর জন্য নতুন পরদা অর্ডার দিতে সাহায্য করত। সুধা সবসময় বাড়িতেই থাকত কিন্তু রাহুল কিছু না বলেই বেরিয়ে যেত, ফিরে আসত। সে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে সিটচুইট-এ একটা সিফুড রেস্তোরাঁয় বেয়ারার পার্টটাইম কাজ করছিল। বেশিরভাগ দিনই ঘুমিয়ে কাটাত। ডিনার শিফটে কাজ করত, তারপর বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে যেত। এই ছেলেগুলো হাইস্কুলের বন্ধু নয়, যাদের সুধা রাহুলের কিন্ডারগার্টেনের সময় থেকে চিনত। এদের সঙ্গে রাহুলের রেস্তোরাঁয় কাজ করার সময় বন্ধুত্ব হয়েছিল। এদের সে কখনও বাড়িতে ডাকত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহুলের উদাসীনতা দেখে সুধার অস্বস্তি হত, কিন্তু তার মা বাবা কিছু বলতেন না। রাহুলকে দেখে সবসময়ই মনে হত যেন তার মেজাজটা সামান্য খারাপ হয়ে আছে এবং তার অবিলম্বে কোথাও পৌঁছোনো দরকার— জিমে ওজন তুলতে অথবা সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর সে যে বিদেশি ফিল্ম দেখতে বসত, সেটা ভিডিও দোকানে ফেরত দিতে যেতে। সুধা এবং রাহুল কখনও তর্ক করত না, কিন্তু কোনও কোনও মুহূর্তে, হলওয়েতে দু'জনে মুখোমুখি হয়ে পড়লে বা রাহুলকে রিমোট কন্ট্রোলটা দিতে বললে, সুধা বোধ করত যে, রাহুল তাকে অবজ্ঞা করে। রাহুলের কোনও কথা বা কাজে তা প্রকাশ পেত না— রাহুল ঠান্ডা, ভদ্রভাবে তাকে এড়িয়ে যেত— কিন্তু সুধা বুঝতে পেরেছিল যে, রাহুল তার সম্পর্কে নিজের মত পালটে ফেলেছে। যে রাহুল একসময় তাকে প্রশংসার চোখে দেখত, নিজের গোপন কথা তাকে বলত, সেই রাহুলের জায়গায় এমন এক ব্যক্তিকে সে দেখল, যাকে সুধা শুধুই অসন্তুষ্ট করছিল। সুধা ভাবল, রাহুল কবে আবার লিকার স্টোর-এ যাওয়ার প্রস্তাব দেবে? কিন্তু রাহুল আর কখনও সে কথা বলত না। সুধা আন্দাজ করল, রাহুলের পানীয়ের নিজস্ব সরবরাহ কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে। একদিন, গভীর রাত পর্যন্ত একটা পত্রিকা পড়তে পড়তে, সুধা ফ্রিজের ভিতর বরফের মেশিনের শব্দ এবং গ্লাসে বরফের কুচি পড়ার শব্দ পেয়েছিল।

AMARBOI.COM

সুধা মায়ের কাছে শুনল, রাহুলের দ্বিতীয় সেমেস্টারের ফলাফল খারাপ হয়েছে। প্রথম সেমেস্টারে তার নিম্নতম গ্রেড ছিল 'বি,' কিন্তু এবার সে বেশিরভাগ বিষয়ে 'সি' পেয়েছিল। বায়োলজি এবং অর্গানিক কেমিস্ট্রি ছেড়ে ফিল্ম এবং ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়া শুরু করেছিল। "তুই কি একবার ওর সঙ্গে কথা বলতে পারবি?" মা সুধাকে জিজ্ঞেস করলেন। "কী হয়েছে কিছু জানতে পারবি?" সুধা রাহুলকে বাঁচানোর জন্য বলল, হাইস্কুল থেকে কলেজে যাওয়া একটা বিশাল পরিবর্তন। অনেক কিছু মানিয়ে নিতে হয়। অনেক ছাত্রেরই এ সময়টা কঠিন মনে হয়। বাবা নিজের অসন্তোষ গোপন করলেন না। রাহুলকে মুখের ওপর কিছু না বললেও, একদিন তিনি সুধাকে বললেন, "ছেলেটা হোঁচট খাচ্ছে।" রাহুল যাতে ক্লাসরুমে বসে ফরাসি ফিল্ম দেখতে পারে, সেজন্য তিনি একটি মোটা অঙ্কের ফি দিতে সম্মত হচ্ছিলেন না। ব্যর্থতা বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। কখনও ছেলেমেয়েদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলতে দিতেন না যে, তিনি যেভাবে তাদের সাহায্য করেছেন, তেমনভাবে তাঁকে কেউ সাহায্য করেনি। তাই সুধা পড়াশোনায় যতই ভাল ফল করুক না কেন, তার মনে হত যে, এই সাফল্য সে অর্জন করেনি, তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার মা-বাবা দু'জনেই খুবই সাধারণ অবস্থায় বড় হয়েছেন। তার দিদিমা, ঠাকুরমা দু'জনেই পরিবারের মাথার ওপর ছাদ গড়ার জন্য এবং থালায় ভাত দেওয়ার জন্য নিজেদের হাতের সোনা বেচে দিয়েছিলেন। এই মানসিকতা মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর মনে হলেও, সুধাকে আশ্বস্ত করত। কারণ, তার মা-বাবা পরস্পরের এই মনোভাব বুঝতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। সুধার ধারণা ছিল, এই মানসিকতাই তাঁদের দু'জনকে এক সূত্রে বেঁধে রাখত।

একদিন রাতে সুধা রাহুলের দরজায় টোকা মারল। রাহুল খাটে শুয়ে হেডফোনে গান শুনছিল এবং বেকেটের নাটকের একটি ছিন্নভিন্ন বইয়ের পাতা উলটোচ্ছিল। সে সুধাকে দেখে বইটা বুকের ওপর উপুড় করে রাখল, কিন্তু কান থেকে হেডফোন সরাল না। সুধা খাটের পাশে একটা মাগ দেখতে পেল। তার ভিতর বরফের কুচি এবং কোনও স্বচ্ছ পানীয়। রাহুল তাকে সেটা খেতে বলল না, তাদের পুরনো খেলা সে সুধাকে ছাড়াই খেলছিল।

"তারপর, স্কুলের কী খবর?" সুধা জিজ্ঞেস করল।

রাহুল সুধার দিকে তাকাল, তার চোখ লালচে, "আমার ছুটি চলছে।"

"তোর গ্রেডস ভাল হয়নি, রাহুল। তোকে আরও বেশি খাটতে হবে।"

"খেটেছিলাম।"

"আমি জানি ফার্স্ট ইয়ারটা কঠিন লাগতে পারে।"

"খেটেছিলাম," রাহুল আবার বলল। "প্রফেসররা আমাকে দেখতে পারে না। সেটা কি আমার দোষ?"

"তাঁরা তোকে দেখতে পারেন না, এমন হতে পারে না," সুধা বলল। সে একবার ভাবল ঘরের ওদিকে গিয়ে খাটে বসবে কি না, কিন্তু নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকল।

"তুমি কী করে জানবে?" সুধাকে চমকে দিয়ে রাহুল একটা খিস্তি করে বলল।

"দেখ, আমি শুধু তোকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি।"

"আমি তো তোকে সাহায্য করতে বলছি না। তোকে কিছু ঠিক করতে

AMARBOI.COM

হবে না। তোর কখনও মনে হয়েছে কি, যে আমার জীবনটা যেমন আছে, তেমনই ভাল আছে?"

রাহুলের কথাগুলোর গভীর আঘাত সুধাকে চুপ করিয়ে দিল। এ কথা সত্যি যে অতীতে রাহুলের জীবনে সুধার একটা বড় ভূমিকা ছিল। সে রাহুলের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত না। বরং যেন তা উন্নত করার চেষ্টা করত। এটা সে সবসময়ই নিজের দায়িত্ব মনে করেছে। অন্য আর কীভাবে একজন বড় বোনের ভূমিকা পালন করতে হয়, তা সুধা জানত না।

"তুই তো এখানে থাকিসও না," রাহুল বলতে থাকল। "তোর কি মনে হয় তুই লন্ডনে নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে যে-কোনও দিন বাড়িতে এসে সবকিছু ঠিকঠাক করে দিতে পারবি? তুই কি তাই চাস?"

সুধা রাহুলের দিকে তাকাল। তারপর খাটের পাশে রাখা মাগটার দিকে তাকাল। ভাবল, রাহুল সারা সন্ধেয় কতটা পান করেছে? বোতলটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে? মা-বাবার কথা ভাবল। তাঁরা হলের অন্যদিকে নিজেদের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। রাহুল কী করছিল, সে সম্বন্ধে পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলেন। তাঁদের হয়ে সুধা ক্ষুব্ধ বোধ করল। "তুই তো বুদ্ধিমান, রাহুল। তুই তো আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

রাহুল ঝুঁকে পড়ে কাপটা মেঝে থেকে তুলে নিল। একটা চুমুক দিয়ে ঢোঁক গিলল। তারপর কাপটা খাটের তলায়, চোখের আড়ালে সরিয়ে দিল। "তোকে বুঝতে হবে না দিদি। তোকে সবসময় সবকিছু বুঝতে হবে না।"

সুধা ফিলাডেলফিয়া ফিরে যাওয়ার আগে বাড়িতে তার শেষ রাতে রাহুল সকলকে অবাক করে দিয়ে সুধার আসন্ন ইংল্যান্ড যাত্রা পালন করার জন্য রেস্তোরাঁয় যেতে রাজি হয়ে গেল। মা-বাবার মেজাজ ভাল ছিল। তাঁরা লন্ডনের স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন। পিকাডিলি লাইনে কোন স্টপের পর কোন স্টপ আসে মনে করার চেষ্টা করছিলেন। রাহুলও আমুদে মেজাজে ছিল। লন্ডনে কোন লেখকদের বাড়ি বা সমাধি দেখতে যাওয়া উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ দিল। এমন জোর দিয়ে বিশেষজ্ঞের সুরে কথা বলল, যেন সে নিজে মার্ক্সের সমাধি দেখেছে। সেই প্রথমবার সুধার খেয়াল হল যে, হয়তো মা-বাবা এবং সে ইংল্যান্ডে যে-বছরগুলো কাটিয়েছে, রাহুল সেই সময়টার জন্য তাদের হিংসে করে। তখন রাহুলের কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহুল একটা 'সিঙ্গাপুর স্লিং' অর্ডার করে খাবারের সঙ্গে সেটি ধীরে ধীরে পান করল। খাওয়ার পর তার পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলল না, কিন্তু চেক আসার আগেই নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল। কোথাও একটা যাওয়ার জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে নিজের গাড়িতে করে বেরিয়ে গেল।

সুধা মা-বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরল। যখন ফোনটা বাজল, তখন সে ভিসিআর-এ 'স্পেলবাউন্ড' দেখছিল। রাহুল স্থানীয় থানা থেকে ফোন করছিল। মিল পন্ড-এর কাছে বেসামালভাবে গাড়ি চালানোর জন্য তাকে ধরা হয়েছিল। তার রক্তে মাদকের মাত্রা খুব বেশি ছিল না, কিন্তু বয়স একুশ হয়নি বলে, সেটুকুর জন্যই তাকে গ্রেপ্তার করা চলে। সে সুধাকে তিনশো ডলার নিয়ে থানায় একলা আসতে বলল। কিন্তু তখন মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, তাঁদের গাড়ির চাবি শোওয়ার ঘরে, বাবার প্যান্টের পকেটে ছিল। সুধা বাবাকে ঘুম থেকে তুলে প্রস্তুত হতে বলল। দু'জনে রাহুলের জামানত দিয়ে তাকে জেল থেকে ছাড়াতে গেলেন। বাবাই গাড়ি চালালেন। তাঁর চোখে-মুখে ঘুমজড়ানো। মনে হচ্ছিল যেন, যে শহরে তিনি এত বছর কাটিয়েছেন, তার রাস্তাঘাট চিনতে পারছেন না। একটা এটিএম-এ থেমে টাকা তুললেন। "তুই যা," থানায় পৌঁছোনোর পর বাবা বললেন। "আমি গাড়িতেই অপেক্ষা করছি।" কথা বলার সময় তাঁর গলা কেঁপে গেল। যেদিন তিনি সুধাকে কলেজে ফোন করে নিজের বাবার মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন, সেদিনও তাঁর গলা এমনভাবেই কেঁপে গিয়েছিল। তাই সুধা বাবাকে সেই অপমান, সেই কষ্টের হাত থেকে রেহাই দিল। যে জায়গায় হাতে হাতকড়া লাগানো অপরাধীদের নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাঁকে যেতে না দিয়ে সে নিজেই ভিতরে ঢুকল। যখন রাহুলের সঙ্গে দেখা হল, তখন রাহুলের নেশা কেটে গিয়েছে। হাতে পেনের কালি লেগে কালো হয়ে আছে। সেটা রবিবারের রাত, পরের দিন আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা। "তুই যাবি আমার সঙ্গে?" গাড়িতে ফিরে যাওয়ার পথে রাহুল জিজ্ঞেস করল। ঘটনাটা রাহুলকে এতটাই নাড়া দিয়েছিল যে, সুধা তাকে আশ্বস্ত করার জন্য তার সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল।

"কোনও মানে হয়?" পরদিন সকালে মা বললেন। রাহুল তখন ঘুমোচ্ছে। মা বাড়াবাড়ি করার জন্য পুলিশেরই দোষ দিলেন। "এমন তো নয় যে, ও

AMARBOI.COM

কোনও অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছে। মাত্র পনেরো চল্লিশ মাইল বেগেই তো গাড়ি চালাচ্ছিল। ওরা বোধহয় শুধু ভারতীয় বলেই ওকে ধরেছিল।" বাবা কিছুই বললেন না। তিনি চায়ে চুমুক দিতে দিতে 'সানডে হেরাল্ড' পড়ছিলেন। আগের রাতে বাড়ি ফেরার পথেও তিনি কিছু বলেননি।

"সমস্যাটা তা নয়," সুধা টোস্টের ওপর চেপে চেপে ঠান্ডা মাখন মাখাতে মাখাতে আস্তে বলল।

"তা হলে তুই কী বলতে চাইছিস সুধা?" মা বিচলিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। বাবা কাগজটা নামিয়ে রাখলেন না, কিন্তু সুধা আন্দাজ করল যে, তিনি পড়া থামিয়ে দিয়েছেন। সুধা জানত, সে যা বলতে যাচ্ছে, তা মা-বাবা ভেতরে ভেতরে জানেন, কিন্তু স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছিলেন। অবাধ্য বাচ্চারা চড় খেতে যাচ্ছে বুঝলে যেমন অনুভব করে। সে জানত যে, তাকেই মা-বাবাকে এই চরম আঘাত করতে হবে।

"আমার মনে হয় রাহুলের ড্রিঙ্কিং প্রবলেম আছে।"

"সুধা, প্লিজ," মা বললেন। একটু থেমে যোগ করলেন, "আমার মনে হয়, আমেরিকান কলেজে সকলেই মদ্যপান করে।" এমনভাবে কথাটা বললেন, যেন মদ খাওয়াটা স্নাতক শ্রেণির ছাত্রদের কোনও শখ। যা আর-একটু বড় হলে কেটে যায়।

"সেরকম নয়।"

"তুই কলেজে ড্রিঙ্ক করতিস না?"

"সেরকম নয়," সুধা আবার বলল। মনে হল এও বলে যে, "গ্রেপ্তার হওয়ার মতো নয়।"

"এটাই এদেশের সমস্যা," মা বললেন। "বড্ড বেশি স্বাধীনতা। বড্ড বেশি মজা করা। আমরা যখন তোদের বয়সি ছিলাম, তখন জীবনটা শুধুই মজা করার জন্য ছিল না।"

মায়ের জন্য সুধার করুণা হল। এত অপ্রীতিকর এবং অপরিচিত একটি তথ্য মেনে নিতে তাঁর অস্বীকৃতি দেখে, ছেলেকে দোষ দিতে পারছেন না বলে আমেরিকা এবং আমেরিকার আইন-কানুনকে দোষারোপ করার তাঁর প্রয়োজন দেখে সুধার করুণা হল। সে আন্দাজ করেছিল যে, বাবা সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু সেই কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হচ্ছেন না। পরে অনুতপ্ত রাহুল যখন স্নান করে, নীচে নেমে আসল, যখন প্রতিশ্রুতি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিল এমন কাজ আর কখনও করবে না, তখনও তিনি রাগুলের মুখোমুখি হলেন না। ছেলেমেয়েদের সমস্যার প্রতি সুধার মা-বাবা সবসময়ই অন্ধ হয়ে থাকতেন। তাদের গায়ের রঙের জন্য খেপানো হত। মা মাঝে মাঝে টিফিনবাক্সে যেসব অদ্ভুত জিনিসপত্র পুরে দিতেন, যেমন আলুর তরকারির স্যান্ডউইচ, যার ঝোলে ওয়ান্ডারব্রেডটা সবুজ হয়ে যেত, তার জন্যও স্কুলে তাদের খেপানো হত। মা-বাবা বুঝতেই পারতেন না অখুশি হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? 'ডিপ্রেশন' কথাটা তাঁদের কাছে একটি বিদেশি শব্দ ছিল। একটি সম্পূর্ণ আমেরিকান সমস্যা। তাঁদের মতে, তাঁরা ভারতে যে দুঃখ-কষ্ট-অন্যায় ফেলে এসেছিলেন, তা থেকে তাঁদের ছেলেমেয়েরা নিরাপদ ছিল। যেন সুধা এবং রাহুলের শৈশবে ডাক্তার তাদের যে টিকা দিয়েছিলেন, সেই টিকা এক দুঃখ-কষ্টহীন অস্তিত্বের অঙ্গীকার ছিল।

লন্ডনে এসে সুধার উত্তেজিত লাগছিল, নিজের জন্মস্থান চেনার জন্য সে কৌতূহলী বোধ করছিল। আসার আগে সে ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিল। তার জন্মের সময় মা-বাবা সেটি প্রস্তুত করাননি। হিথরোয় পাসপোর্টটি দেখানোর পর ইমিগ্রেশন অফিসার তাকে স্বদেশে স্বাগত জানালেন। মা-বাবা তার সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে দশ দিন থাকলেন। টটেনহাম কোর্ট রোড-এ যে হল অফ রেসিডেন্স-এ সুধা থাকবে, সেখানে তাকে সব গুছিয়ে নিতে সাহায্য করলেন। সুধাকে মনে করিয়ে দিলেন, রাস্তা পার হওয়ার আগে ডান দিকে দেখতে হবে। শীতকালের জন্য তাকে 'মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার্স' থেকে কার্ডিগান কিনে দিলেন। টিউবে চড়ে তাকে বালহামের সেই বাড়িটা দেখাতে নিয়ে গেলেন, যেখানে সে শিশুবয়স কাটিয়েছে। তিনজন একসঙ্গে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে তিন ঘণ্টা যাত্রা করে শেফিল্ডে গেলেন, যেখানে তাঁদের পুরনো বাড়িওয়ালা মি. পাল এখন সপরিবারে থাকেন। তাঁরা রাহুলের কথা তুললেন না। নেহাত বন্ধুরা তার কথা জিজ্ঞেস করলে তাঁরা শুধু সেই খবরগুলোই দিলেন, যা শুধুই তারিফ করার মতো, যাতে আপত্তিকর কিছুই নেই— রাহুল এখন কর্নেল-এ পড়ে, সে এখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। এই কথাগুলো বলতে মা-বাবার মনেও ক্ষীণ আশা জাগত। যেন, কলেজে, যেখানে রাহুলের জীবনের অধঃপতন শুরু হয়েছিল, সেই কলেজই আবার কোনও জাদুতে তার জীবনটা সঠিক রাস্তায় এনে দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বাবা চলে যাওয়ার পর সুধা ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নতুন বন্ধুদের সঙ্গে পড়াশোনা করতে, ঘুরে বেড়াতে, পাব-এ যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জন্মস্থান বলেই হয়তো, লন্ডনের প্রতি সে এক সহজাত সংযোগ অনুভব করল। রাস্তাঘাট প্রায় কিছুই চিনত না। তাও মনে হল, লন্ডন তার নিজের শহর। তার এবং মা বাবার মাঝে এখন এক মহাসাগর বয়ে যাচ্ছিল কিন্তু মনে হল, সে মা-বাবার আরও কাছে এসে গিয়েছে। একই সঙ্গে, জীবনে প্রথমবার, নিজেকে পরিবারের ভার থেকে মুক্ত মনে হল। তাও, সে পান করার সময় রাহুলের কথা না ভেবে পারত না। সবসময় মনে হত যে, রাতে বেড়ানোর পর যে দ্বিতীয় পাইট শেষ করে সে তৃপ্ত হত, তা রাহুলের জন্য যথেষ্ট হবে না। ভিড় কোর্টরুমে সে রাহুলের পাশে বসে তার নাম ডাকার অপেক্ষা করে ছিল। রাহুলের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ পড়া হয় সুধা রাহুলের পাশে ছিল, তাকে সমর্থন করার জন্য। কিন্তু বিচারের কাঠগড়ায় সে রাহুলের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। ছ'মাসের জন্য রাহুলের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং ইথাকায় কয়েকটি অ্যালকোহল এডুকেশন ক্লাসে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শেষে জরিমানা এবং পারিশ্রমিকের খাতে বাবাকে প্রায় দু'হাজার ডলার খরচ করতে হয়েছিল। গ্রেপ্তারের খবর 'দ্য ওয়েল্যান্ড টাউন ক্রায়ার'-এ উল্লেখ করা হয়েছিল। মা-বাবা কাগজটি নেন।

নভেম্বর মাসে, 'ন্যাশনাল গ্যালারি'তে ঘুরতে ঘুরতে সুধার সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের দেখা হল। সুধা ভ্যান আইকের আঁকা 'দ্য আর্নলফিনি ম্যারেজ'-এর তারিফ করছিল। বহু লোক দেখে চলে যাওয়ার পরও, সে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। অয়েল পেন্টিং-এ এক দম্পতি শোওয়ার ঘরে পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পায়ের কাছে একটি ছোট কুকুর। লোকটির গায়ে লোম দিয়ে ঘেরা বেগুনি রঙের কেপ, মাথায় একটি খুব বড় কালো ঘাসের টুপি। মহিলাটির গায়ে পান্না-সবুজ রঙের গাউন, যেটা ভারী পরদার মতো মেঝেতে মহিলাটির পিছনে লুটিয়ে পড়েছিল। কিছুটা কাপড় মহিলাটির হাতে ধরা ছিল। মাথায় একটি সাদা অবগুণ্ঠন। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি সম্ভবত অন্তঃসত্ত্বা। সুধা নিশ্চিত হতে পারছিল না। লোকটির পিছনে একটি জানলা। জানলার চৌকাঠের ওপর এক টুকরো ফল, অ্যাপ্রিকট বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্যাঞ্জারিন। দেওয়ালে একটা উওল আয়না যাতে পেন্টিং এর সবকিছু প্রতিফলিত হচ্ছিল।

"আরও কাছে আসুন," সুধার পাশের লোকটি বলল। সে সুধাকে আরও কয়েক পা এগিয়ে নিয়ে গেল, যাতে কেউ তার সামনে না আসতে পারে। "নয়তো ঠিক করে দেখতে পাবেন না।" লোকটি আয়নাটি নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। আয়নাটিই ছবিটির কেন্দ্রবিন্দু। মেঝে, ছাদ, ঘর, ঘরের বাইরের পৃথিবী সব আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছিল। তারপর সুধা দেখল, আয়নায় শুধু সেই দম্পতিকেই নয়, দরজায় দাঁড়ানো আরও দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে, যারা তার মতোই ঘরের ভিতর উঁকি দিচ্ছে। "ওদের একজন ভ্যান আইক," লোকটি বলল। "আয়নার ওপরের লেখাটা তাই বলছে। লাতিনে লেখা 'ভ্যান আইক এখানে এসেছিল।' " লোকটি নিচু স্বরে কথা বলছিল, যেন শুধু সুধার সঙ্গেই কথা বলছে। তার কথায় ব্রিটিশ সুরের সেই উত্থানপতন টের পাওয়া যাচ্ছিল, যা ইতিমধ্যেই সুধার কথাকেও প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল। লম্বাটে কালো চুল ক্রমাগত আঙুল দিয়ে মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। সুধা তার গায়ের সুগন্ধী সাবানের গন্ধ পাচ্ছিল। লোকটির গায়ে টুইডের ব্লেজার এবং কর্ডুরয় প্যান্ট। এক হাতে একটা রেনকোট ঝোলানো। সে সুধাকে বলল যে, দরজায় দাঁড়ানো লোক দুটি দম্পতিটির বিয়ের সাক্ষী। এবং পেন্টিংটি বিয়ের সার্টিফিকেট হিসেবে আঁকা হয়েছিল। "অবশ্য সেটা শুধু একটা ব্যাখ্যা," লোকটি বলল। "কেউ কেউ বলেন এটা বিবাহার্থে বাগদানের দৃশ্য।"

সুধা লোকটির বলা খুঁটিনাটিগুলো ভাল করে লক্ষ করল, রঙের ঔজ্জ্বল্য দেখল। অনুভব করল তারা দু'জনেই একসঙ্গে ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছে। "আর জুতোগুলো? ওগুলোরও কি কোনও মানে আছে?" সুধা নিজেকে জিজ্ঞেস করতে শুনল। ছবিটির সামনের দিকে একজোড়া ছেড়ে রাখা কাঠের খড়ম এবং কার্পেটের পাশে কয়েকটি চটির দিকে নির্দেশ করল।

লোকটি সুধার দিকে ফিরে তাকাল। সুধা যা ভেবেছিল, লোকটির বয়স তার চেয়ে বেশি। চোখ দেখে মনে হচ্ছিল চল্লিশের কাছাকাছি হবে। পরিষ্কার নীল চোখ। তার দৃষ্টি শান্তভাবে সুধার মুখের বিভিন্ন অংশের ওপর গিয়ে স্থির হচ্ছিল। মুখের ভাব শান্ত, গম্ভীর, কিন্তু এখন তার ঠোঁটের দু'কোণ হাসির ভঙ্গিতে ওপরের দিকে উঠে এল। "মনে হয় তার মানে ওঁরা কোনও পবিত্র

AMARBOI.COM

স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। অথবা মহিলাটি সবে কেনাকাটা করে ফিরেছেন।"

সেদিন সুধা জানত না যে, পেন্টিংটি কত বিখ্যাত। কিন্তু লোকটি কখনও তাকে তার অজ্ঞানতা টের পেতে দেয়নি। তারা অন্যান্য পেন্টিং-এর দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি সুধার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ছবিগুলোর সম্বন্ধে বলল। শেষে সুধাকে জিজ্ঞেস করল একসঙ্গে চা খেতে যাবে কি না। তার নাম রজার ফেদারস্টোন। সে আর্ট হিস্ট্রিতে পিএইচডি করেছে। একটি শিল্প-পত্রিকার সম্পাদক। রেনেসাঁস প্রতিকৃতি-অঙ্কন নিয়ে একটি বইও লিখেছে। রজার সুধাকে এক নাগাড়ে, রোমান্টিকভাবে প্রেম নিবেদন করল। যখনই সুধার দরজায় কড়া নাড়ত, তখনই ফুল নিয়ে আসত। দস্তানা, কানের দুল, পারফিউম উপহার দিত। সে মা-বাবার একমাত্র সন্তান। ইংরেজ বোর্ডিং স্কুলে মানুষ হয়েছে। তার বাবা বিদেশে 'সিঙ্গার' সেলাইয়ের মেশিনের জন্য কাজ করতেন। মা-বাবা দু'জনেই মারা গিয়েছেন। রজারের জন্ম ভারতে। তার জীবনের প্রথম তিন বছর মুম্বইতে কেটেছিল, যদিও তার সে সময়ের কিছুই মনে নেই। তার যখন বিশের কোঠায় বয়স, তখন কেমব্রিজে পরিচিত একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। দু'বছর পর মেয়েটি তাকে ছেড়ে, নিজের সব বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করে তিব্বতের একটি বৌদ্ধ মঠে যোগ দিয়েছিল।

রজার সব জিনিসের দায়িত্ব নিত। থিয়েটারের টিকিট কাটত, রেস্তোরাঁয় টেবিল সংরক্ষণ করত, পিকনিকের বন্দোবস্ত করে সুধাকে টেনে হ্যাম্পস্টেড হিথ-এ নিয়ে যেত। সে-ই সুধার প্রথম সঙ্গী, যে কখনও দেরি করত না, কখনও ফোন করব বলে ফোন করতে ভুলে যেত না। সুধা শীঘ্রই রজারের মধ্যে নিজের চরিত্রের যোগ্যতা এবং সামর্থ্য খুঁজে পেল। রজার খাবারদাবার, রান্নাবান্না করা পছন্দ করত। প্রথম যে রাত সুধা শেপার্ড বুশ-এ রজারের অ্যাপার্টমেন্টে কাটিয়েছিল, তার পরের দিন সকালে রজার তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তার প্রিয় কেকের দোকান থেকে পেস্ট্রি কিনে এনেছিল। সুধা ঘুম থেকে উঠেই ট্রে-তে সাজানো প্রাতরাশ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। যদিও রজার অনেক বছর একলা কাটিয়েছিল, কিন্তু সে কিছুদিনের মধ্যেই নিজের জীবনটা সুধার কাছে উন্মুক্ত করে দিল। সুধাকে অ্যাপার্টমেন্টের একটা চাবি, নিজের দেরাজের কয়েকটি টানা এবং ওষুধের ক্যাবিনেটে একটা কাচের তাক ব্যবহার করতে দিল। ছেলেবেলায় সে শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। 'চেলসি আর্ট স্কুল'-এ ভর্তিও হয়েছিল। কিন্তু তারপর যখন এক শিক্ষক

AMARBOI.COM

তাকে বলেন যে, সে বেশি দূর এগোতে পারবে না, সে আর কখনও ক্যানভাস স্পর্শ করেনি। ঘটনার এই মোড় কিন্তু তাকে তিক্ত করে দেয়নি। সুধার মতোই, রজার নিজের ক্ষমতার সীমা কোথায়, তা জানত। একই সঙ্গে সে কঠোরও হতে পারত। নিজের পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা লিখত, রেস্তোরাঁয় সবচেয়ে ভাল টেবিলে বসার ওপর জোর দিত, পছন্দ না হলে ওয়াইন ফেরত পাঠাত। সুধার মতোই, সে পরিমিত পান করত। সবসময়ই একটা বোতল অর্ডার দিত বটে, কিন্তু প্রায় কখনওই দু'-এক গ্লাসের বেশি পান করত না।

বড়দিন আসার আগে সুধা মা-বাবাকে জানাল তার অনেক কাজ আছে। বাড়ি না-গিয়ে সে রজারের সঙ্গে স্যাভিল এবং তারপর কস্টা ডেল সোল-এ বেড়াতে গেল। স্পেন থেকে ফিরে সুধা দেখল, তার ডর্মিটরির সুইচবোর্ডে মা-বাবার একটি বার্তা রয়েছে তাকে ফোন করতে বলেছেন। ডর্ম-এর একটি পে-ফোন থেকে তাঁদের ফোন করার পর মা-বাবা বললেন যে, রাহুলের পড়াশোনায় কোনও উন্নতি হয়নি। তার অ্যাডভাইসারের কাছ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে একটা চিঠি এসেছিল। রাহুল তখন বড়দিনের ছুটিতে ওয়েল্যান্ডে এসেছে। মা-বাবার সঙ্গে একবার তুমুল ঝগড়াঝাঁটি করার পর, সে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। সুধা আশ্বস্ত বোধ করল যে, রজার তাকে ট্যাক্সিতেই বিদায়চুম্বন দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছে। ফোনের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে না। রজারের কাছে সে নিজের পরিবারের এক অস্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছিল। রজার সে কথা বইয়ের শেষে লেখা ফুটনোট পড়ার মতো শুনেছিল। সুধার সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু দৃষ্টির নিরাপদ আড়ালে সরানো। "ওঁদের সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় রইলাম," রজার সুধাকে বলেছিল। সুধার আশা ছিল, রজারের এই কথা থেকেই তার উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়া যেতে পারে। প্রাথমিক খুঁটিনাটির বেশি কিছু রজার জানতে চায়নি। তাই সুধা রজারকে রাহুলের মদ্যপান বা গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়ে কিছু বলেনি। বলেনি যে, ভাইয়ের সঙ্গে তার বহু মাস কথা হয়নি।

মা-বাবা তাকে রাহুলের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। বললেন, রাহুল হাঁটতে বেরিয়েছে, সুধা যেন একটু পরে ফোন করে। সুধা কয়েকদিন পর ফোন করল। এত মাস পর রাহুলের কথা শুনে সে কত বিচলিত হয়ে পড়েছে, দেখে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল। এখনও রাহুলের ব্যাপারে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্যের ওপর নির্ভর করার জন্য মা বাবার ওপরও তার রাগ হল। রজার কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর সে কার্ড ব্যবহার করে রজারের ফ্ল্যাট থেকেই ফোন করল। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাহুলের কুড়ি বছর পূর্ণ হয়েছিল। সুধা সে উপলক্ষে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। এখন রাহুল ফোনটা ধরার পর সুধা তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাল। এখন ম্যাসাচুসেটস-এ মধ্যাহ্ন। লন্ডনে সন্ধে নেমেছে। রজারের রান্নাঘরের জানলা দিয়ে আধা-অন্ধকার আকাশটা দেখা যাচ্ছিল। কাউন্টারে সুধা চিজ, ক্র্যাকার্স এবং অলিভ বের করে রাখছিল। রজার বাড়ি ফেরার পর তারা একসঙ্গে খাবে।

"সব ঠিক আছে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"সব ঠিক আছে। মা-বাবা শুধু শুধু একদম হিস্টিরিকাল হয়ে যাচ্ছেন।" রাহুল এমনভাবে কথা বলল যেন, তাদের মধ্যে কোনও সমস্যাই হয়নি। সুধাকে জিজ্ঞেস করল লন্ডনের কী খবর।

"মা-বাবা বললেন তুই নাকি দুটো ক্লাসে ফেল করেছিস?"

"ওগুলো ঢপের ক্লাস।"

"তুই আদৌ ক্লাসে যাচ্ছিস কি?"

"বাদ দে, দিদি," রাহুলের পুরনো মেজাজ ফিরে আসছিল।

"যাচ্ছিস কি?" সুধা ছাড়ল না।

কিছুক্ষণ কোনও কথা নেই। সুধা শুনতে পেল, ও প্রান্তে একটা লাইটার জ্বলে উঠল। সিগারেটের প্রথম টানের পর লম্বা ধোঁয়া ছাড়া হল। "আমি এসব করতে চাই না।"

"তা হলে কী করতে চাস?" সুধা নিজের বিরক্তি লুকোনোর চেষ্টা করল না।

"আমি একটা নাটক লিখছি।"

সুধা বিস্মিত হল, রাহুল কিছু একটা করছে জেনে তার মনে আশা জাগল। রাহুল সবসময়ই ভাল লিখত। একবার, পেনসিলভেনিয়ায়, সুধার দর্শনের পরীক্ষায় কয়েকটি রচনা-প্রশ্নের উত্তর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লিখতে হত। রাহুল তখন হাই স্কুলে। প্লেটোর 'ইউথিফ্রো' সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরটা রাহুল লিখে দিয়েছিল। সুধার অধ্যাপক বিশদ মন্তব্যের সঙ্গে উত্তরটির প্রশংসা করেছিলেন।

সুধা একটা অলিভ মুখে পুরে, সরু বেগুনি বিচিটা বের করে একটা রং

AMARBOI.COM

করা ডিশের ওপর রাখল। ডিশটা সে এবং রজার সেভিলে কিনেছিল। "বাহ, সে তো খুব ভাল কথা, রাহুল। কিন্তু তোকে তো পড়াশোনাও করতে হবে।"

"আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিতে চাই।"

"মা-বাবা সেসব শুনবেন না। তুই কলেজটা শেষ কর, তারপর যা খুশি করতে পারবি।"

"আমার আর এভাবে সময় নষ্ট করা সহ্য হচ্ছে না। আর আমার গাড়িটা ফেরত চাই। গাড়ি না চালালে আমার ভীষণ বাজে লাগে। মনে হয় যেন আটকে পড়েছি।"

সুধা নিজেকে সামলে নিল। রাহুলকে বলল না যে, মা-বাবা আবার তাকে গাড়ি নিয়ে বেরোতে দেবেন, এমন আশা করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। "আর তো মাত্র দুটো বছর, রাহুল। কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর না। নয়তো পরে তোর নিজের ওপরই ঘেন্না ধরে যাবে।"

"ভগবান, তুই একদম মা-বাবার মতো কথা বলছিস," বলে রাহুল ফোনটা রেখে দিল।

এপ্রিল মাসে, লেন্ট টার্ম-এর পরের ছুটিতে, সুধা বস্টনে ফিরল। রজারের দেওয়া একটা হিরের আংটি একটা চেনে গলিয়ে সোয়েটারের নীচে তার গলায় ঝুলছিল, লুকোনো। সুধার মনে হচ্ছিল যেন, একটি নিরাপত্তামূলক আস্তরণ তাকে তার পরিবারের কাছ থেকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। জানুয়ারির পর মা-বাবা আর তাকে রাহুলকে নিয়ে কিছু বলেননি। সুধা নিজে একবার জিজ্ঞেস করার পর তাঁরা বলেছিলেন, রাহুল কলেজে ফিরে গিয়েছে। নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সুধা অপরাধবোধে ভুগত, কিন্তু এত বেশি নয় যে, সে মা-বাবাকে পরামর্শ দেবে বা রাহুলের সঙ্গে কথা বলবে। ডিগ্রির জন্য তাকে ডিরেগুলেশন-এর ওপর একটা দশ হাজার শব্দের নিবন্ধ লিখতে হত। তা ছাড়া সে রজারের সঙ্গে ছিল। ততদিনে তারা একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছে। এয়ারপোর্টে মা-বাবার সঙ্গে রাহুলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুধা বিস্মিত হয়ে গেল। তাঁদের তিনজনকেই দুঃখিত, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। ব্যাগ-বোঝাই ট্রলির পিছনে তাকে দেখতে পেয়ে তবেই মা-বাবা উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন।

"আরে," সুধা রাহুলের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। যদিও

AMARBOI.COM

তার মুখে হাসি নেই।

"তোর সেমেস্টার শেষ হয়ে গিয়েছে?"

রাহুল মাথা নাড়ল। সে তখনও সুধার চোখের দিকে তাকাচ্ছিল না। তারপর তার গলা থেকে এক অদ্ভুত হাসির সামান্য আওয়াজ বেরিয়ে এল। "আমি এখন এখানেই থাকি।"

সুধা বাড়ি এসেছিল তার পরিবারকে রজারের কথা বলবে বলে। রজারকে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে লন্ডনে বসবাস করার পরিকল্পনা জানাবে বলে। কিন্তু আগে রাহুলের কথাই হল। এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে সুধা এক-এক করে সব কথা শুনল। মা-ই কথা বলছিলেন। বাবা গাড়ি চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে নিজের মনেই যানজট নিয়ে মন্তব্য করছিলেন। রাহুল বেশিরভাগ সময় জানলার বাইরে তাকিয়ে কাটিয়ে দিল। যেন সে ট্যাক্সির পিছনে বসে আছে। বড়দিনের ছুটির পর ইথাকায় ফিরে গেলেও, সে ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং দু'সপ্তাহ আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে পাকাপাকিভাবে বরখাস্ত করার পর সে ওয়েল্যান্ডে ফিরে এসেছিল।

সুধার দেখে মনে হল, রাহুল এমনভাবে বাড়িতে থাকছে, যেন কোনও ছুটি কাটাচ্ছে। দিনের বেলা নিজের ঘরেই থাকত বা টিভি দেখত। মা-বাবা তার গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন, তাই সে কখনওই কোথাও বেরোত না। এর আগে যখন সে তাঁদের এড়িয়ে যেত, তখনও তার মধ্যে একটা রাগ জমে উঠছিল। মনে হত যেন, যে-কোনও সময় একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। সেই উদ্দামটাও এখন আর তার মধ্যে ছিল না। তাকে দেখে আর মনে হচ্ছিল না যে, সে তাঁদের ওপর রেগে আছে বা বাড়িতে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছে। কিছুদিন, মা-বাবা তাঁদের বন্ধুদের বললেন যে, রাহুল ছুটি নিয়েছে। তারপর বললেন যে, সে বিইউ-তে স্থানান্তরিত হচ্ছে। "আসলে শহরে না থাকলে রাহুলের ঠিক মন বসে না," তাঁরা বলতেন। কিন্তু রাহুল আর কোনও স্কুলে ভরতি হওয়ার চেষ্টা করত না। মা-বাবা তখন সকলকে কৈফিয়ত দিলেন, সে চাকরি খুঁজছে। তারপর মিথ্যেটা আরও বিস্তারিত হতে থাকল। রাহুল একটা চাকরি করে, বাড়ি বসে কনসাল্টিং-এর চাকরি। সত্যি কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে কী, রাহুল সারাদিন বাড়িতে বসে কিছুই করত না। তাদের মা চিরকাল আশা করেছিলেন ছেলেমেয়েরা বাড়িতেই থাকবে কিন্তু এখন ছেলে বাড়িতেই থাকছিল বলে তিনি লজ্জিত বোধ করছিলেন।

অবশেষে রাহুল একটা কাজ পেল। সপ্তাহে তিনদিন ওয়েল্যান্ডের এক লন্ড্রোম্যাট-এর দেখাশোনা করতে হবে। মা-বাবা একটা সস্তা, পুরনো গাড়ি কিনে দিলেন যাতে সে সেটা চালিয়ে কাজে যেতে পারে। সুধা জানত যে, কাজটা মা-বাবাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। আগে যখন রাহুল প্লেট-ডিশ ধুত, তখন তাঁরা কিছু মনে করেননি, কিন্তু এখন তাঁদের ভয় ছিল, কোনদিন তাঁদের পরিচিত কেউ দেখতে পেয়ে যাবে যে, তাঁদের ছেলে একটা ওজন-যন্ত্রে বস্তা বস্তা নোংরা জামাকাপড় ওজন করছে। অন্যান্য বাঙালিরা রাহুলকে নিয়ে নিন্দেমন্দ করতেন, প্রার্থনা করতেন যেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা একইভাবে তাদের জীবন নষ্ট না করে। আর সেভাবেই, রাহুল সব মা-বাবার আশঙ্কা এই বাস্তবে পরিণত করে তুলল। একটা কলঙ্ক, একটা ব্যর্থ জীবন। ডাক্তার-উকিল-বিজ্ঞানী হয়ে অথবা 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর প্রথম পাতায় লেখা ছাপিয়ে বাঙালি ছেলেমেয়েরা আমেরিকা জুড়ে সাফল্য এবং কৃতিত্বের যে বিশাল বৃত্ত রচনা করেছিল, রাহুলের তাতে কোনও অবদান ছিল না।

সুধা এখন সেই সব সফল ছেলেমেয়েদের একজন। তার উচ্চশিক্ষার ডিগ্রির সংগ্রহ ফ্রেম-বাঁধাই হয়ে মা-বাবার ওপরতলার হল ভরতি করে ফেলেছিল। সে লন্ডনের এমন একটি সংস্থায় প্রজেক্ট ম্যানেজারের কাজ করছিল যে সংস্থাটি দরিদ্র দেশে ক্ষুদ্র ঋণ দিতে সাহায্য করে। এবং তার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে ছিল। গ্রীষ্মে সে এবং রজার ম্যাসাচুসেটস গেল যাতে রজার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে বিয়ের জন্য তাঁদের সম্মতি চাইতে পারে। রজারের অনুরোধে তারা ওয়েল্যান্ডে না থেকে বস্টনের এক হোটেলে থাকল। ততদিনে সুধা রজারকে এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে চিনে গিয়েছিল যে, সে মেনে নিয়েছিল রজার তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কে দূরত্ব বজায় রাখবে। যেমন সে সমুদ্রতটে গেলেও সূর্যের রশ্মির থেকে নিজের শরীর বাঁচিয়ে রাখে। "এসব ব্যাপার প্রথম থেকেই পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল," রজার তার সদয় অথচ দৃঢ় ভঙ্গিতে বলেছিল। সুধা এটা রজারের দায়িত্বশীল চরিত্র এবং তাদের যৌথ জীবনের প্রতি রজারের সতর্কতার আর-একটি চিহ্ন

AMARBOI.COM

হিসেবেই নিয়েছিল। তার মা বাবা তাদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলেন। রাহুল তাঁদের লড়াই করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। সুধা এবং রজার লন্ডনে রেজিস্ট্রি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা ম্যাসাচুসেটস-এ শুধু একটি রিসেপশনের আয়োজনই করতে পারবে, রজারের আগে বিয়ে হয়েছিল এবং তার এবং সুধার বয়সে চোদ্দো বছরের পার্থক্য, এ সবই তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। রজারের শিক্ষাগত যোগ্যতা, এবং নিজের উত্তরাধিকার বিচক্ষণভাবে বিনিয়োগ করার ফলে সে যে নিজের এবং সুধার জন্য কিলবার্নে একটি বাড়ি কিনতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে তাঁরা প্রসন্ন হয়েছিলেন। তার ওপরে রজারের জন্ম ভারতে, সে আমেরিকান নয়, ইংরেজ, কফি খায় না, চা খায় এবং 'জি' না বলে 'জেড' বলে বলেও অনেকটা সুবিধে হয়েছিল। এই ছোটখাটো জিনিসগুলোর জন্য সুধার মা-বাবা রজারের সঙ্গে নিজেদের ক্ষীণ যোগসূত্র তৈরি করতে পারতেন। সুধার মনে হত যেন, তাঁরা যত না রজারের জন্য নিজেদের পরিবারে জায়গা করে দিচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি রজারকে অনুমতি দিচ্ছেন সুধাকে পরিবার থেকে দূরে নিয়ে চলে যাওয়ার। কিন্তু রাহুলের তেজ পুরোপুরি কমেনি। সে রজারকে নানা প্রশ্ন করল। রজারের শিল্প-পত্রিকার যে সাম্প্রতিক সংখ্যাটা তার মা-বাবা প্রশংসা করে রেখে দিয়েছিলেন, রাহুল সেটা খুঁটিয়ে দেখল। বোনের ভাবী স্বামীর মধ্যে কোনও খুঁত আছে কি না তা পরীক্ষা করে নিজের দায়িত্ব পালন করল।

"রজার লোকটা ভাল," রাহুল সুধাকে বলল। ভাইবোন মিলে ফাঁকা রান্নাঘরে প্লেট গুছিয়ে রাখছিল। "কংগ্র্যাচুলেশনস।"

"থ্যাঙ্কস। এখানে থাকার জন্য থ্যাঙ্কস," সুধা আন্তরিক ভাবেই ধন্যবাদ জানাল। সে আগে কখনও কোনও পুরুষকে বাড়িতে আনেনি। বুঝতে পারেনি যে, তার কতটা নার্ভাস লাগবে।

"আর তো কোথাও যাওয়ার নেই।"

"তারপর, সব কেমন চলছে?" সুধা জিজ্ঞেস করল। "তোর পাগল পাগল লাগছে না? এভাবে বাড়িতে থাকতে?"

"সেরকম খারাপ লাগে না।"

রাহুল তার সঙ্গে কথা বলছে বলেই সুধার কৃতজ্ঞ লাগছিল, তাকে জোর করতে ভয় করছিল। তাদের দু'জনের মধ্যে সে একটা ভয়ংকর বৈষম্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভব করছিল যেন রাহুলের মতো তার জীবনটাও নষ্ট হয়ে যায়নি বলে তাকে দোষারোপ করা হচ্ছে।

"লন্ড্রোম্যাটটা কেমন?"

রাহুল কাঁধ ঝাঁকাল।

"তোর সেই নাটকটা এখনও লিখছিস?"

"ওটা ফালতু ছিল।"

আর কী করতে পারে ভেবে না পেয়ে সুধা রাহুলকে জড়িয়ে ধরার জন্য এগিয়ে গেল। আর তখনই সে মদের মিষ্টি, কড়া, অভ্রান্ত গন্ধটা পেল। দুপুরে খাওয়ার সময় রাহুল একবার টেবিল থেকে উঠে গিয়েছিল। এখন সুধা বুঝতে পারল যে, সে বোতলটা যেখানেই লুকিয়ে রাখুক না কেন, সেখানেই গিয়েছিল। রাহুল মাতাল হয়ে যায়নি। তার আচরণে এমন কিছুই ছিল না, যাতে মনে হবে, সে এক পেগের বেশি পান করেছে। কিন্তু সে যে লুকিয়ে-চুরিয়েও পান করেছে, মদ্যপান না করে যে সে তার পরিবারের সঙ্গ সহ্য করতে পারছে না, তা থেকেই সুধা উপলব্ধি করল যে, রাহুল শুধু মদ্যপান পছন্দই করে না, বা তাকে শুধু একজন 'সোশাল ড্রিঙ্কার' বা 'বিন্‌জ ড্রিঙ্কার' বলা চলে না। এখনও পর্যন্ত সুধা এইসব ভেবেই রাহুলের সমস্যার পিছনে যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করছিল।

"তুই যখন খুশি লন্ডনে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিস," সে প্রস্তাব দিল। সে যে মন থেকে কথাটা বলল না, ভেবে নিজেরই দুঃখ হল।

"আমার কোনও টাকা নেই।"

"বাবা নিশ্চয়ই তোর টিকিট কেটে দেবেন।"

"আমার বাবার টাকার দরকার নেই," রাহুল বলল।

সুধার মনে হল রাহুলকে মনে করিয়ে দেয় যে, 'তুই তাঁরই বাড়িতে থাকিস। মা টেবিলে যে খাবারটা রাখে, সেটাই খাস। তোর গাড়িতে গ্যাস ভরে দেন তাঁরাই।' কিন্তু এর কোনওটাই সে রাহুলকে বলল না। কারণ, সে জানত, যদি সে কিছু বলে, তা হলে রাহুল তার জন্য যে দরজাটা খুলে ধরেছিল, সেটা সে আবার সুধার মুখের ওপর বন্ধ করে দেবে।

সুধার রিসেপশন হল হেমন্তে। তার ক'মাস আগে, রাহুল এলেনা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে ডেটিং করতে শুরু করল। এলেনা ওয়াল্টহামের একটি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাইনারে বেয়ারার কাজ করে এবং অভিনেত্রী হওয়ার চেষ্টা করছিল। রজার শুধু রিসেপশনের জন্যই আসছিল। সুধা তার দশ দিন আগে যখন ওয়েল্যান্ডে এসে পৌঁছোল, রাহুল তাকে এলেনার কথা জানাল। "আগে কখনও আমার এমন লাগেনি দিদি," সে সুধাকে বলল। রিসেপশনের কয়েকদিন আগে সে এলেনাকে বাড়িতে নিয়ে এল। সুধা এখন একজন বিবাহিত মহিলা, কিন্তু রজারের থেকে দূরে থাকলে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। রজার যে নিরাপত্তায় মুড়ে রাখে তাকে, সেই সুরক্ষার আস্তরণ পাতলা হয়ে যায়। এলেনার বয়স ত্রিশ সে রাহুলের চেয়ে আট বছরের বড় কিন্তু তাকে হাই স্কুলের ছাত্রী বলে চালানো যায়। তার পরনে আঁটো জিনস এবং ট্যাঙ্ক টপ। লম্বা বাদামি চুল একদিকে একটা ব্যারেট-ক্লিপ দিয়ে বাঁধা। চোখে গাঢ় লাইনার। এলেনা চুপচাপ প্রকৃতির, তার সঙ্গে কথা বললে তবেই সে কথা বলে। রজার যেমন সুধার মা-বাবার মন জয় করার চেষ্টা করেছিল, এলেনা তেমন কোনও চেষ্টা করল না। তাঁদের বলল, সে মাটাপয়সেটে মানুষ হয়েছে, তারপর ইমার্সনে গিয়েছিল। দুপুরে খাওয়ার সময় সে ভাত খেল না। বলল, ভাতে তার পেট ফুলে যায়। রাহুল এলেনার সরু কাঁধ জড়িয়ে ধরে বসে রইল। সকলের সামনে স্বপ্নালুভাবে তাকে চুমু খেতে থাকল। এলেনার হয়ে কথা বলল। জানাল যে, এলেনা একবার একটি অ্যালার্জির ওষুধের বিজ্ঞাপনে কাজ করেছিল। সে ক্রমাগত ক্রিস্টাল বলে কারও কথা বলছিল। জানা গেল যে, ক্রিস্টাল এলেনা এবং তার এক প্রাক্তন প্রেমিকের কন্যা।

সুধার মা-বাবা এসব খবর শুনে কোনও মন্তব্য করলেন না। তাঁরা এলেনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, রজারের মতো তার সম্মানেও টেবিলে খাবার সাজিয়েছিলেন, বিগ ডিগ এবং সুধার রিসেপশনের মেনু সম্বন্ধে গল্প করছিলেন। কিন্তু তারপর, সুধা এবং তার মা যখন চা এবং রসে ভাসমান পান্তুয়ার বাটি নিয়ে আসছিলেন, তখন রাহুল ঘোষণা করল যে, এলেনা তার বাগদত্তা।

সুধা একটা চেয়ারের পিছনে পাথর হয়ে গেল। যে চামচগুলো বিতরণ করছিল, সেগুলো শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। ঘরটা যেন ঘুরে গেল, সে টেবিলক্লথটা চেপে ধরল চোখের সামনে, যেন কোনও দমকা হাওয়া এসে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সুধা নিজের আঙুলের হিরেটার দিকে তাকিয়ে এলেনার আঙুলেও তেমন আংটি কল্পনা করল। ভাবল, কোথা থেকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে তার ভাই একটা আংটি কেনার পয়সা পাবে? বিশেষ উপলক্ষের জন্য পরিবেশিত দার্জিলিং চা পটের ভিতর বেশি কড়া হয়ে গেল। লালচে-বাদামি পান্তুয়াগুলো বাটিতেই পড়ে রইল।

"তা সম্ভব নয়," অবশেষে বাবা বললেন। সুধার মনে হল, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি যে নীরবতা বজায় রেখেছিলেন, তা এতদিনে ভাঙলেন।

"সম্ভব না হওয়ার কী আছে?" রাহুল জিজ্ঞেস করল। সে তখনও এলেনার কাঁধ জড়িয়ে ধরেছিল। এলেনার গলার একপাশে তর্জনী বুলিয়ে দিচ্ছিল।

"তোমার বয়স এখনও অনেক কম। তোমার কোনও জীবিকা নেই, কোনও লক্ষ্য নেই, জীবনে কোনও রাস্তা নেই। তোমার বিয়ে করার কোনও উপায়ই হয়নি। এবং এই মহিলাটি," তার বাবা বললেন। মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্য এলেনার উপস্থিতি স্বীকার করলেন, "প্রায় তোমার মায়ের বয়সি।"

মনে হল যেন, ঘরটায় একটা ভারসাম্য ফিরে এল। কিন্তু সুধা জানত যে, সত্যিটা ঠিক তার উলটো। আসলে ঘরে একটা যুদ্ধ হচ্ছিল।

"তুমি একটা স্নব," রাহুল বলল। "একটা অসহ্য বুড়ো স্নব ছাড়া আর কিছুই না।" তার গলায় কোনও ক্রোধ ছিল না। সুধা যে হিংস্রতার আশঙ্কা করছিল, তার কিছুই ছিল না। সে একটি তরল গতিতে উঠে দাঁড়াল। মনে হল যেন, সে এলেনাকেও দাঁড় করাল। যেন তার হাতে চুম্বকশক্তি আছে। তারপর দু'জনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভওয়ে থেকে এলেনার গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা পর্যন্ত সুধা এবং তার মা-বাবা অপেক্ষা করলেন। তারপর সুধার মা চা ঢালতে শুরু করলেন।

"আমি ভাবছিলাম," দ্বিতীয়বার নীরবতা ভেঙে বাবা সুধার দিকে ফিরে বললেন। "যে রেস্তোরাঁয় আমরা রিসেপশনটা করছি, সেখানে কি বার আছে?"

"সব রেস্তোরাঁতেই বার থাকে বাবা।"

"আমি রাহুলকে নিয়ে চিন্তিত। ওর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই—" ব্যবহারযোগ্য একটা কথার খোঁজে তিনি থামলেন। "এসব ব্যাপারে।"

সুধা কেঁদে ফেলবে ভেবে চোখ বন্ধ করল। এতদিন সে অপেক্ষা করছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে মা বাবা রাহুলের সমস্যা স্বীকার করে নেবেন। কিন্তু এখন, বাবাকে সে কথা উল্লেখ করতে শুনে সে যেন সহ্য করতে পারছিল না।

"হয়তো আমাদের অন্য কোথাও রিসেপশনের ব্যবস্থা করা উচিত," মা প্রস্তাব দিলেন। "এমন কোথাও যেখানে মদ থাকবে না।"

"তার জন্য বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। আর সেটা উচিতও হবে না," সুধা বলল। তার এখনও মনে হয় যে, নিজেদের বিয়ের রিসেপশনে তার এবং রজারের মদ্যপান করার সুযোগ থাকা উচিত। রাহুলের জন্য সকলে শাস্তিভোগ করবে কেন?

"তুই ওকে বলতে পারবি না, যেন সেদিন বেশি না খায়?" মা জিজ্ঞেস করলেন।

"না," সুধা তার চেয়ারটা পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল। যে চা-চামচটা নিয়ে সে এতক্ষণ নাড়াচাড়া করছিল, সেটা এবার নিষ্ফলভাবে ডাইনিং রুমের কার্পেটের ওপর ছুড়ে ফেলে দিল। কোনও আওয়াজ হল না। "আমি আর ওর সঙ্গে কথা বলতে পারব না। আর ওকে ঠিক করতে পারব না। এই পরিবারে যা-যা ঠিক নেই, সেই সবকিছু আমি আর ঠিক করতে পারব না," এবং যেমনভাবে কিছুক্ষণ আগেই তার ভাই বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনই ক্রুদ্ধভাবে সে-ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রিসেপশনে রাহুল তার গ্লাস উঠিয়ে সুধা এবং রজারের জন্য শুভকামনা প্রকাশ করল। কিন্তু সুধা তার কথা বলার সময় দমবন্ধ করে ছিল। শুধু চাইছিল রাহুল বসে পড়ুক। রাহুল এলেনাকে আনেনি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরের দিন রাহুল একলা, বিমর্ষ অবস্থায় ফিরে এসেছিল। সুধা ভাবছিল তার সঙ্গে এলেনার ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে কি না, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করেনি। মনে হয়েছিল হয়তো রাহুল রিসেপশনে আসবে না। কিন্তু রাহুল সময়ের এক ঘণ্টা আগেই রেস্তোরাঁয় এসে গিয়েছিল। পরিবারে নিজের যথাযথ জায়গা বজায় রেখেছিল। অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছিল, তাঁদের সাইন-ইন বইয়ের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল। অতিথিরা প্রায় সকলেই সুধার মা-বাবার বন্ধু। প্রায় সকলেই বাঙালি। রজারের দিক থেকে কেউ আসেনি।

রাহুল বলেই চলল, তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। রিসেপশনের আগে বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহুলের পানীয়র মাত্রার ওপর নজর রাখতে বারটেন্ডারকে বাড়তি টাকা দিয়েছিলেন। সুধা প্রাণে ধরে বাবাকে বলতে পারেনি যে, রাহুল সেসব সাবধানতার ঊর্ধ্বে। বেশিরভাগ পুরুষমানুষ যে পকেটে মানিব্যাগ রাখে, সেখানে সে মদের বোতল নিয়ে ঘোরে, যে দু'গ্লাস শ্যাম্পেন সে ইতিমধ্যেই খেয়েছিল, তা কেবল লোক দেখানোর জন্য। রাহুল সুধার ছেলেবেলার এক গল্প বলতে শুরু করল। অনেকদিন আগে একবার তারা সকলে ছুটি কাটাতে বার হার্বার-এ গিয়েছিল। সুধার বাথরুম যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কয়েক মাইলের মধ্যে কোথাও কোনও গ্যাস স্টেশন ছিল না। বাবা উঠে রাহুলের পাশে গিয়ে তার কানে ফিসফিস করে কিছু বললেন, তাকে বসে পড়তে নির্দেশ দিলেন।

"এক্সকিউজ মি, আমার কথা শেষ হয়নি।" সকলে হেসে উঠলেন। বুঝতে পারলেন না যে, রাহুল মজা করছে না। কোনও হাসির কথা হচ্ছে না। মাইক্রোফোনে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হল।

বাবা রাহুলের কনুই ধরলেন। রাহুল পিছিয়ে গিয়ে বাবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। "তুমি— আমার— গায়ে হাত দেবে না," রাহুল হিসহিস করে বলে উঠল। কথাগুলো মাইক্রোফোনের মধ্যে দিয়ে জোরে বেজে উঠল।

সুধার মা-বাবার এক বন্ধু শুভকামনা করবেন বলে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু সুধা তাঁর কথা শুনল না। সে বুঝতে পারছিল অতিথিরা তাঁদের গোলাপি তন্দুরির প্লেটের সামনে বসে আলোচনা করছেন এবং তার ভাই বার-এর দিকে এগোচ্ছে। রাহুলকে খোঁজার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে সুধা কিন্তু তাকে দেখতে পেল না। পার্কিং লট-এ রাহুলের গাড়িটাও ছিল না। সে মা-বাবাকে সতর্ক করে দিল। আবার থানা থেকে ফোন পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু রিসেপশনের মাঝে রাহুলকে খুঁজতে বেরোনোর অবস্থায় কেউ ছিল না। রাহুলের অনুপস্থিতির উলটো ফল হল। অদ্ভুতভাবে মা-বাবা যেন আশ্বস্ত বোধ করতে শুরু করলেন। শুধু সুধাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারল না। রজার নিজেই একটু বেশি শ্যাম্পেন খেয়ে ফেলেছিল। সে সুধাকে বলল দুশ্চিন্তা না করতে। "রাহুল একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে," সুধাকে ডান্স ফ্লোরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে সে নিরুদ্বিগ্ন গলায় বলল। "ওর বয়সটা তো কম।"

সুধা তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল। তার ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে

AMARBOI.COM

ওঠে, কারণ রজার রাহুলের প্রতি এমন এক আস্থা প্রকাশ করছিল, যা সুধা নিজে হারিয়ে ফেলেছে। সে রজারকে কখনও তার এবং রাহুলের বিয়ার ক্যান লুকোনোর পুরনো খেলার কথা বলেনি। সে কথা ভাবলে বিবেক দংশন হত কিন্তু এই আশঙ্কায় আবার সে ঠিক করল রজারকে কিছু বলবে না। রজার তাকে দোষ দেবে। রাহুলের সমালোচনা করবে। লন্ডনে তারা একসঙ্গে প্রথম যে ছবিটি দেখেছিল, তার কথা মনে পড়ে গেল। ছবিতে, প্রথম নজরে ঘরটার ভিতর যা চোখে পড়ছিল, পিছনের ছোট আয়নাটা তার চেয়ে বেশি প্রকাশ করছিল। সুধা যা দেখতে বাধ্য হয়েছিল, রজারকে জোর করে আরও কাছে টেনে এনে তা দেখতে বলার কী দরকার?

পরে জানা গেল রাহুল বেশি দূরে যায়নি, বাড়িতেই ফিরে গিয়েছিল। রাতের শেষে তারা তাকে নিজের ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় খুঁজে পেল। সকালে রজার এবং সুধা তাদের মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে চলে গেল। প্লেনে বসে সুধার নিজেকে সবকিছুর থেকে দূরে মনে হল। কেবিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে বসে মনে হল যেন সেই অস্বাভাবিক কড়া রোদে আগের রাতের ঘটনাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেন্ট টমাসে নামার সঙ্গে সঙ্গে তার আবার নিজেকে কলঙ্কিত মনে হল। আবার শুনতে পেল রাহুল হিসহিস করে মাইক্রোফোনে কথা বলছে। দেখতে পেল, রাহুল সব বন্ধুদের সামনে বাবাকে অপমান করে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। জীবন বয়ে চলল নিজস্ব ধারায়। সুধা এবং রজার লন্ডনে ফিরে গিয়ে নতুন বাড়িতে গুছিয়ে বসল। সেই দিনটিকে বিশেষ করে তোলার জন্য অতিথিদের কার্ড পাঠিয়ে ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু যা হয়েছিল, তার জন্য সুধা রাহুলকে ক্ষমা করতে পারছিল না। রিসেপশনের ফোটোগুলো দেখলে তার শুধু সেই সাংঘাতিক কয়েকটি মিনিটের কথাই মনে পড়ত, যখন রাহুল মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘাসের ওপর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে সকলের ফোটো যেন সেই কয়েক মিনিটেরই আভাস দেয়।

তারপর রাহুল সত্যিই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কোনও চিঠি, কোনও কৈফিয়ত ছাড়াই। মা-বাবা বললেন যে, সে এক রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে, আর ফেরেনি। ততদিনে বাড়িতে তার আসা-যাওয়া এতটাই অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল যে, কয়েকদিন কেটে যাওয়ার আগে মা-বাবা

AMARBOI.COM

টেরই পাননি সে চলে গিয়েছে। তারপর তাঁরা আবিষ্কার করেন যে, বাথরুমে রাহুলের টুথব্রাশ নেই। এবং ভারতে লম্বা ছুটি কাটাতে যাওয়ার জন্য সাধারণত যে বড় সুটকেসগুলো ব্যবহার করা হত, তার মধ্যে একটা বেসমেন্টে নেই। নিশ্চয়ই কোনও বন্ধুর কাছে গিয়েছে, মা-বাবা বললেন। কিন্তু তাঁরা রাহুলের কোনও নতুন বন্ধুকে চিনতেন না, তাই কাউকে ফোন করতে পারলেন না। তাঁরা গাড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে রিপোর্ট করেছিলেন। পরের দিন সেটার খোঁজ পাওয়া গেল, ফ্রেমিংহ্যামের বাস স্টেশনে ফেলে রাখা ছিল। রজার সাহায্য করার জন্য পরামর্শ দিল, এলেনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হোক। কিন্তু তাঁরা এলেনার পদবি জানতেন না।

এক সপ্তাহ পর একটা চিঠি এল, তাতে কলম্বাস, ওহায়োর স্ট্যাম্প। চিঠিটা কাউকে উদ্দেশ করে লেখা হয়নি। এমনকী খামের ওপর তাদের পরিবারের পদবিও ছিল না। "আমাকে এখানে খুঁজতে যেয়ো না," রাহুল লিখেছিল। "আমি শুধু রাতটা এখানে কাটাচ্ছি। আমি তোমাদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই না। প্লিজ আমাকে একলা থাকতে দাও।" তাঁরা ভাবতে চেষ্টা করলেন, রাহুল কী করে ওহায়ো পৌঁছোতে পারে? কারণ তার কাছে কোনও টাকা ছিল না। ভাবলেন, সে হয়তো গাড়িতে লিফট নিতে নিতে এগিয়েছে। এক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর মা লক্ষ করলেন যে, তাঁর দেরাজের পিছনদিকে, তালগোল পাকানো ব্রিটিশ ব্রেসিয়ারের পিছনে, তিনি যে ছোট ছোট থলি লুকিয়ে রাখতেন, যাতে তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত সোনার গয়না ছিল, যার প্রতিটি টুকরো আমেরিকায় তাঁর স্বামীর সাফল্যের প্রতীক এবং যার বেশিরভাগটাই তাঁর পুত্রবধূর নাম করে রাখা ছিল, সেগুলো একটাও নেই।

রাহুল চলে যাওয়ার দু'মাস পর সুধা আবিষ্কার করল যে, সে অন্তঃসত্ত্বা। তার দুর্বিষহ মধুচন্দ্রিমার এক রাতে তার শরীরের ভিতর নতুন এক জীবন জন্মেছে। হঠাৎ করে, সেই ভয়ংকর ঘটনার পাশাপাশি এই সুখবরটা পেয়ে তার মা-বাবা যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। গর্ভবতী অবস্থায় সুধা অনেক সময় রাহুলের কথা ভাবত। তাদের ছেলেবেলার স্মৃতি এবং স্বপ্ন এসে তার মনে ভিড় করত। সেই অস্তিত্বের কথা মনে পড়ত, যা থেকে তারা দু'জনেই সৃষ্টি হয়েছে। যে অভিজ্ঞতা তার ভেতরে আছে, তার অতীতেও আছে এবং যা

AMARBOI.COM

রজার কোনওদিন বুঝতে পারবে না। প্রথম তিন মাস সে আবেগের দোলাচলে আলোড়িত হতে থাকল। ভাল দিনগুলোয় তার বিশ্বাস হত যে, নিজের জীবনটা আবার সামলে নেওয়ার জন্য রাহুলের চলে যাওয়া দরকার ছিল। খারাপ দিনগুলোয় তার আশঙ্কা হত পুলিশ তার মা-বাবাকে কোনদিন ফোন করে জানাবে যে, কোনও ডোবার মধ্যে রাহুলের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। পরের বড়দিনে রাহুল ছিল না যখন সুধা এবং রজার ওয়েল্যান্ডে কাটাল। লন্ডনের এক হাসপাতালে যে রাতে সুধা নীলকে জন্ম দিল, তখনও রাহুল অনুপস্থিত ছিল। আর সেভাবেই সুধার অভ্যেস হয়ে গেল। তার একজন ভাই আছে যার সঙ্গে তার কখনও দেখা হয় না, এমনটা ধরে নিতে তার অভ্যেস হয়ে গেল।

নীলকে নিয়ে মেতে উঠে সুধার মা-বাবাও ছেলের অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। সুযোগ পেলেই তাঁরা লন্ডনে চলে আসতেন। রাহুল যে বিশাল ফাঁক রেখে গিয়েছিল, তাঁদের ছোট্ট নাতি সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে শুরু করেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা দোলনাটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন। তার ভিতরের কোমল প্রাণীটির গায়ের রং রজারের মতো ফ্যাকাশে, মাথার চুল সুধার মতো কালো। কিন্তু ভাগ্য তার নিজস্ব। কয়েক মাস পর সুধা আবার কাজ করা শুরু করল, প্রথমে সপ্তাহে তিন দিন, তারপর পাঁচ দিন। সাড়ে আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, সন্ধে ছ'টায় ফিরত। নীলকে আয়ার কাছ থেকে নিয়ে তার সঙ্গে মাত্র দু'ঘণ্টা কাটাত। প্রথমে তাকে চান করাত, তারপর তাকে দোলনায় ঘুম পাড়িয়ে দিত। তার সবসময় ভীষণ খারাপ লাগত ভেবে যে, দিনের মাত্র ওইটুকু সময়ই সে নিজে নীলের যত্ন করে। কিন্তু সে নিজেকে বোঝাল, নীল এতই ছোট যে, এর জন্য তার মনে সুধার প্রতি কোনও অভিযোগ বা বিদ্বেষ জন্মাতে পারে না। সুধাকে দেখলেই নীল উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, লাফিয়ে সুধার কোলে উঠে পড়ে। যেন সুধা পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার মানুষ।

সেই সময়, যখন সুধার জীবনে চাহিদা এবং সন্তুষ্টি দুইই সবচেয়ে বেশি, তখন এক শীতল শনিবারে মুদির দোকানে কেনাকাটা করে ফিরে সে দরজার পিছনে একটা খাম দেখতে পেল। আমেরিকার খাম, রাহুলের হাতে ঠিকানা লেখা।

বাড়ির প্রবেশকক্ষের বাদামি সোনালি ওয়ালপেপারটা সে এবং রজার

AMARBOI.COM

বেশ কিছুদিন ধরে ছিঁড়ে ফেলার কথা ভাবছিল। সুধা সেখানে দাঁড়িয়ে রাহুলের অস্তিত্বের সেই সহজ অথচ নিশ্চিত প্রমাণের দিকে তাকিয়ে থাকল। প্রথমে ভাবল, রাহুল কোথা থেকে তার ঠিকানা পেল? কিন্তু তারপর তার মনে পড়ল, বিয়ের রিসেপশনের জন্য বাড়ি গিয়ে সে একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে মা-বাবার ফ্রিজের ওপর আটকে রেখে এসেছিল। নীল তার স্ট্রোলারে ঘুমোচ্ছিল। জানত না, তার একজন মামা আছে। জানত না, আচমকা এই ধাক্কায় তার মায়ের চোখ জলে ভরে গিয়েছে। খামটায় নিউ ইয়র্কের একটা আবছা হয়ে যাওয়া পোস্টমার্ক এবং খামের পিছনে রাজ্যের উত্তরদিকের একটা পোস্ট অফিসের নম্বর। খামটা খোলার আগে সুধা একটা অ্যাটলাস টেনে বের করল। শহরটা ইথাকার উত্তরে। সুধা হতভম্ব হয়ে গেল— সে ধরেই নিয়েছিল যে, রাহুল যথাসম্ভব দূরে চলে গিয়েছে। হয়তো ওরেগন বা ক্যালিফর্নিয়ায়। সে কখনও ভাবেনি যে, যে জায়গায় রাহুল চরম ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে, সেই জায়গারই কাছাকাছি কোথাও ফিরতে চাইবে। খামের ভিতর টাইপ করা এক পাতার একটা চিঠি ছিল।

প্রিয় দিদি,

আশা করি তুই-ই চিঠিটা পড়ছিস। প্রথমেই, আমি ক্ষমা চাইছি। সবকিছুর জন্য। জানি আমি সবকিছু ঘেঁটে ফেলেছিলাম। কিন্তু এখন অনেক কিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। আমি এখন একটা রেস্তোরাঁয় লাইন কুক-এর কাজ করছি। আবিষ্কার করেছি যে, আমার রান্না করতে সত্যিই ভাল লাগে। অসাধারণ কিছু না, কিন্তু আমি এখন সত্যিই ভাল ওমলেট রাঁধতে পারি। তা ছাড়াও, আমি এখন আর-একটা নাটক লিখছি। এখানে একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। সিরাকুজে কয়েকটা নাটক পরিচালনা করেছে। তাকে নাটকটা পড়িয়েছি। সে বলেছে যে, এখনও ওটার ওপর কাজ করতে হবে, কিন্তু আমার নাটকটা নিয়ে লেগে থাকা উচিত। আমি এলেনার সঙ্গে থাকছি— ওকে মনে আছে? আমরা আবার একসঙ্গেই আছি। আমি ওকে বুঝিয়ে এখানে এনেছি। ক্রিস্টাল ফিফথ গ্রেড-এ পড়ছে। এলেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউমান রিসোর্সেজ পড়ে একটা চাকরি পেয়েছে। তোরা এলেনার সম্বন্ধে যা-ই মনে করিস না কেন, ও আমাকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিহ্যাব এ যেতে রাজি করিয়েছিল। তাই যা বললাম, সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, আমি সবকিছুর জন্যই দুঃখিত। এবং আশা করি যে, তুই (এবং রজার) আমাকে ক্ষমা করতে পারবি তোদের বিয়েতে ওরকম আচরণ করার জন্য। আমি সত্যিই তোদের জন্য খুব খুশি হয়েছি। আর তোদের যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তা হলে আমি লন্ডনে গিয়ে তোদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি কিছু টাকা জমিয়েছি। গরমকালে রেস্তোরাঁ থেকে কয়েকদিনের ছুটি পাব। ধরে নিচ্ছি তুই এর কোনও কথাই মা-বাবাকে জানাবি না।

রাহুল

সুধা সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটার উত্তর দিল। চিঠিটা দ্বিতীয়বার পড়ল না বা রজারকে জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা করল না যে, রাহুল তাদের সঙ্গে থাকলে রজারের কোনও আপত্তি আছে কি না। ফোনের পাশে মেসেজ লেখার জন্য যে নোটবইটা রাখা থাকে, সেটা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সে লিখল:

প্রিয় রাহুল,

আমিই তোর চিঠিটা পড়লাম। আমার একটা ছেলে হয়েছে। তার নাম নীল। তার দশ মাস বয়স। এবং আমি চাই যে, তোর ওর সঙ্গে দেখা হোক।

AMARBOI.COM

সুধা থামল, তারপর চিঠিটা সই করল। তার আর কিছু বলার ছিল না।

তার বিয়ের রাতের পর থেকে তার সঙ্গে রাহুলের আর দেখা হয়নি ভেবে সুধার অবিশ্বাস্য মনে হল। "কী রে দিদি," সুধা দরজা খোলার পর রাহুল বলল। সে তখনও মা-বাবার শেখানো সম্বোধনই ব্যবহার করছিল। সুধার একটুও অস্বস্তি বোধ হল না। দেড় বছরের পর রাহুলকে বাড়ির পোর্টিকোর তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে হল যেন, তার নিজের এক অংশ, যা এতদিন হারিয়ে গিয়েছিল, তা আবার ফিরে এসে তাকে সম্পূর্ণ করেছে। ঠিক তার গর্ভাবস্থার ওজন কমে যাওয়ার পর যেমন সে আবার এখন আগের জামাকাপড়গুলো পরতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই যে," সে নীলকে কোলে নিয়ে রাহুলকে দেখাল। নীল একটা হাত বাড়িয়ে দিল। হাতে একটা ডাইজেস্টিভ বিস্কুট ধরা। সামনের নতুন মানুষটিকে নিরীক্ষণ করতে করতে মৃদু স্বরে আবোলতাবোল বকল।

"হ্যাঁ," রাহুল তার তর্জনীর পিছনদিকটা নীলের গালে বোলাল। "এই যে তোর বুদ্ধু মামা। অবশেষে তোকে দেখতে এসেছে।" রাহুল অবিশ্বাসসহকারে মাথা নাড়ল। নীলের মুখ, নাক, কান, ঠোঁট, চুলের গোছা, যা সুধার মনে হত যেন তার আজীবনের পরিচিত, তার সঙ্গে রাহুলের পরিচয় হল। পরিবর্তন এসেছে রাহুলের মধ্যেই। তার ওজন বেড়ে গিয়েছে। এতটাই যে, তার একসময়ের মার্জিত চেহারা নিতান্ত সাধারণ দেখাচ্ছিল। ঘাড় এবং কোমর মোটা হয়ে গিয়েছিল। বয়স্ক, অনিশ্চিত লোকের মতো কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিল। চুল উলটো করে আঁচড়ানো, রগের ওপর উঠে গিয়েছিল। ঝুলপি লম্বা। জিনসের আড়ষ্টভাব আর নেই, নীচে সুতো বেরিয়ে গিয়েছে। ডোরাকাটা ব্লেজারটা দেখে মনে হল, সেটা কোনও সস্তার দোকান থেকে কেনা হয়েছে। হাতাগুলো একটু খাটো।

"আমি ভাবতে পারছি না যে, তুই জন্মেছিস আর আমি জানতামও না। তুই তো দারুণ দেখতে হয়েছিস," রাহুল নীলকে বলল। সে সুধার দিকে তাকাল। তারপর নীলের দিকে, তারপর আবার সুধার দিকে। "ও পুরো তোর মুখ পেয়েছে।"

"তাই? আমি তো রজারের মুখ দেখতে পাই।"

রাহুল মাথা নাড়ল। "কোনও মতেই না, দিদি। এই ছেলেটা একেবারে পাক্কা মুখার্জি।"

সুধা রাহুলকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাল: রান্নাঘর, বেসমেন্টে একটা ছোট টয়লেট, ওপরের বৈঠকখানা, দুটো শোওয়ার ঘর এবং তার ওপরে একটা বাথরুম, ছাদের নীচে রজারের স্টাডি। একাধিক তলা থাকা সত্ত্বেও বাড়িটা খুবই ছোট। তাদের ক্রমাগত সিঁড়ি দিয়ে ওপর-নীচ করতে হচ্ছিল। নীলও আজকাল সিঁড়ি দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। সিঁড়িগুলো সুধার বাবার পক্ষে কষ্টকর। তাঁর সম্প্রতি হাঁটুতে বার্সাইটিস হয়েছে। শেষ যখন মা-বাবা লন্ডনে এসেছিলেন, তখন তাঁরা বন্ধুদের সঙ্গে শহরতলিতে থেকেছিলেন। কিন্তু স্টাডিতে যে ডে-বেডটা সাধারণত কাগজে ঢাকা পড়ে থাকে, রজার রাহুলকে সেখানে ঘুমোতে দিতে রাজি হয়েছিল।

AMARBOI.COM

"তুই চাইলে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারিস," সুধা রাহুলকে বলল। কিন্তু রাহুল রাজি হল না। সে নীলকে ভুলিয়েভালিয়ে কোলে নিল। সুধা যতক্ষণ আলুর খোসা ছাড়াল, একটা মুরগি ঝলসানোর প্রস্তুতি নিল, রাহুল তখনও নীলকে কোলে নিয়ে থাকল। নিচু ছাদের ঘরগুলো, কালো-সাদা চেকারবোর্ড মেঝে, সর্বদা অগোছাল হয়ে থাকা খাবার টেবিল, স্পোড প্লেট এবং হলুদ দেওয়ালে টাঙানো তামার ছাঁচ, সব ভাল করে দেখল। রজার নিজের হাতে দেওয়ালগুলো রং করেছিল। শেষ পোঁচটা স্পঞ্জ দিয়ে করা হয়েছিল। রাহুল কয়েকটা তাকের সামনে দাঁড়াল, যেখানে কতগুলো রান্নার বই এবং ফ্রেমে বাঁধানো ফোটো রাখা ছিল। বেশিরভাগ ফোটোই নীলের: তার জন্মের পরের কয়েক ঘণ্টায় তোলা, সুধার মা-বাবার কোলে, বাড়ির বাইরে স্ট্রোলারে বসে। রাহুলের কোনও ছবি ছিল না। "এটা কবে তোলা?" রাহুল জিজ্ঞেস করল।

"কোনটা?"

"দেখে মনে হচ্ছে অন্নপ্রাশন।"

"ও ওটা," সুধা একটা পাতিলেবুতে একটা কাঁটাচামচ বেঁধাল। কয়েক মাস আগের সেই দিনটার কথা ভাবল, যেদিন নীলকে তার প্রথম ভাত খাওয়ানো হয়েছিল। তার মা-বাবা সেই উপলক্ষে লন্ডনে এসেছিলেন। "বাড়িতে ছোট করে করা হয়েছিল," সুধা বলল। যেন তাতে রাহুলের অনুপস্থিতির অজুহাত পাওয়া যাবে। ঐতিহ্য অনুযায়ী, বাচ্চাকে তার মামাই প্রথম ভাত খাওয়ায়। নীলের ক্ষেত্রে সুধার বাবা কাজটি করেছিলেন।

সুধা বুচার ব্লক-এর কাছে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, রাহুল সেখানে গিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। এক হাতে সেটা ঝাঁকাল যাতে ব্যাগটা খুলে একটা ফোটো দেখা যায়। একটা ছোট মেয়ের স্কুল পোর্ট্রেট। হাসিমুখ, মুখে ফুটকি-ফুটকি দাগ, মাথায় দুটো লম্বা ঝুঁটি। "এটা ক্রিস্টাল," রাহুল গর্বিতস্বরে বলল। জানাল যে, রোজ, ক্রিস্টাল যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে, তখন সে বাড়িতেই থাকে। তাকে জলখাবার করে দেয়। তারপর রেস্তোরাঁয় কাজ করতে যাওয়ার আগে এবং এলেনা ফেরার আগে ক্রিস্টালের রাতের খাবার রাঁধে। সে এলেনার কোনও ছবি বের করল না। কিন্তু সুধার এলেনাকে স্পষ্ট মনে ছিল। সেই যেবার সে তাদের বাড়িতে খেতে এসেছিল, তখন থেকে। সুধা রাহুলকে জিজ্ঞেস করল না যে, সে এবং এলেনা বিয়ে করেছে কি না। তাদের নিজেদের কোনও সন্তান হতে চলেছে কি না। সুধা নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হয়েছিল এলেনাই। "বাচ্চাটা খুব ভাল," ক্রিস্টালের ফোটো সরিয়ে রাখার আগে রাহুল বলল। "আমি ভাবছিলাম ওর জন্য একটা ছোট্ট টি-সেট কিনে নিয়ে যাব। একদম ইংরেজ কিছু একটা, বুঝলি তো? ওর খুব পছন্দ হবে।"

সে নীলকে হাওয়ায় উঠিয়ে দিল। খেলাচ্ছলে তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নীলের পেটে মুখ ঘষে দিল। নীল উন্মত্তভাবে হেসে উঠল।

"সাবধানে," সুধা সতর্ক করল।

রাহুল তার কথা মেনে খেলা থামিয়ে নীলকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তারপর তাকে কাতুকুতু দিতে শুরু করল। নীলের হাসি আবার শুরু হয়ে গেল। "চিন্তা করিস না দিদি। আমি নিজেও এখন একজন বাবা।"

সুধা এবং রজার খাবারের সঙ্গে হোয়াইট ওয়াইন খেল, কিন্তু রাহুল শুধুই ক্লাব সোডা এবং কমলালেবুর রস মিশিয়ে খেতে চাইল। তারা বাইরে, বাগানের সংলগ্ন উঠোনে একটা ছোট টেবিলে বসে খেল। পাশে কয়েকটা গোলাপগাছের ঝোপ সুধা এবং রজারের অবহেলা সত্ত্বেও বেড়ে উঠেছিল। ওয়াইন নিয়ে সুধা একটু ধন্দে পড়ে গিয়েছিল। রাহুলের সামনে খাওয়া উচিত হবে কি না ভাবছিল। সে এবং রজার একটা হাউসওয়ার্মিং পার্টি দিয়েছিল। সেদিনের বেঁচে যাওয়া কয়েকটা স্কচ এবং ভদকার বোতল তাদের রান্নাঘরের ক্যাবিনেটে পড়ে ছিল। সুধা বোতলগুলো তার দেওয়াল-আলমারির পিছনদিকে এবং তাদের খাটের পায়ের কাছে সোয়েটারের দেরাজে ঢুকিয়ে রেখেছিল। নিজেকে বুঝিয়েছিল যে, রজার কখনও সেগুলো লক্ষ করবে না। নীল রাহুলের কোলে বসে ছিল। রজার আঙুল বাড়িয়ে দিচ্ছিল এবং নীল তার আঙুলের ডগা থেকে চটকানো আলুর ছোট ছোট দলা খাচ্ছিল।

"তোমার বোধহয় এই প্রথম লন্ডনে আসা, না?" রজার রাহুলকে জিজ্ঞেস করল।

"কলকাতা যাওয়ার পথে কয়েক ডজন বার হিথরোয় বসে থাকা বাদ দিলে," রাহুল বলল। সুধার সেই সব সফরের কথা মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় যখন তারা একসঙ্গে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে যেত। আর কোনওদিন তারা সেরকম সফরে যাবে না। তখন তারা পাশাপাশি একই

AMARBOI.COM

খাটে শুয়ে ঘুমিয়েছিল। অনেক সময় একসঙ্গে চান করেছিল। সবকিছু এক জোড়া চোখ দিয়েই দেখেছিল।

রাহুল ছুটির এক সপ্তাহের মধ্যে কী কী দেখতে চায় তা জানাল— ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ফ্রয়েডের বাড়ি, ভি অ্যান্ড এ জিজ্ঞেস করল সারাদিনের জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-অ্যাভনে যাওয়া সম্ভব কি না। এত বছর নিজের ঘরে বসে কাটানোর পর, মনে হচ্ছিল যেন, সে বাকি পৃথিবীর সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। রজার তাকে বলল মিউজিয়ামগুলো কখন খোলা থাকে, সম্প্রতি কীসের প্রদর্শনী হচ্ছে। সুধার মনে হল তার ভাই এবং স্বামী পরস্পরকে কতটুকু চেনে, পরস্পরের কাছে তারা প্রায় অপরিচিত। "প্রধানত আমি নীলের সঙ্গেই সময় কাটাতে চাই," রাহুল বলল। "আমি ওকে কোনও পার্ক বা চিড়িয়াখানায় বা যাই হোক, সেখানে নিয়ে যেতে পারি।"

সুধা রাহুলকে বলল নিজের খুশিমতো সময় কাটাতে। দিনের বেলা নীল আয়ার সঙ্গে থাকে, কিন্তু সন্ধেবেলা তার ভাগনে শুধুই তার।

"তারপর, পরেরটি কখন আসবে?" রাহুল নীলকে নিজের পায়ের ওপর বসিয়ে ওপর-নীচে পা নাচাতে লাগল।

"পরের কী?" রজার জিজ্ঞেস করল।

"পরের সন্তান।"

"তুই কি মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিস নাকি?" সুধা হাসতে শুরু করে আচমকা থেমে গেল।

নীল মাথা উঁচু করে রাহুলের দিকে তাকিয়ে ছিল। রাহুল মুখ নিচু করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর কী চাই ভায়া? আমার মতো একটা ছোট্ট ভাই? নাকি একটা বোন?"

মা-বাবার কথা যখন উঠেইছিল, তখন সুধা ঠিক করল রাহুলকে তাঁদের খবর দেবে। সে বছরের শেষে বাবা রিটায়ার করছেন আর তাঁরা কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট খুঁজছেন। "ওঁরা এখন সেখানেই আছেন।"

"ওঁরা ওয়েল্যান্ডে নেই?"

"না।" সেইজন্যই সুধার পক্ষে রাহুলের অনুরোধ মেনে মা-বাবাকে তার আসার কথা না জানানো সহজ হয়ে গিয়েছিল।

"ওঁরা কি একেবারে ফিরেই যাচ্ছেন?"

"হয়তো।" সুধা রাহুলকে বাবার হাঁটুর সমস্যার কথা বলল। তরল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদার্থটা বের করে দেওয়ার জন্য তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করতে হবে। সুধা জানত যে, একদিন আরও গুরুতর সমস্যা হবে এবং যখন সে দিন আসবে, তখন রাহুল যদি দূরেই থাকে, তা হলে আবার সুধাকেই একমাত্র সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

খাওয়ার পর রজার বেঁচে যাওয়া খাবারগুলো সরিয়ে রাখতে গেল। সুধা ওপরে গেল নীলের চানের জল ভরতে। রাহুল তার সঙ্গে এসে টয়লেটের ওপর বসল। সে নীলের জন্য চানের বুদবুদ এনেছিল। সুধা যখন মাটিতে বসে নীলকে সাবান মাখিয়ে চান করাচ্ছিল, রাহুল তখন বুদবুদগুলো জলে মিশিয়ে দিল। বুদবুদগুলো দেখে নীল উল্লসিত হয়ে পড়ল। চোখ বড় বড় করে ছোট্ট প্লাস্টিকের কাঠিটার থেকে প্রতিটি বুদবুদ বেরোনোর অপেক্ষা করছিল। স্বচ্ছ গোলকগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে, সেগুলো ফাটিয়ে দিয়ে, আরও বুদবুদ চাইছিল।

"আচ্ছা সোনা, এবার শুতে যাওয়ার সময় হয়েছে," কয়েক মিনিট পর সুধা বলল। রাবার প্লাগটা তুলে টাব থেকে জল বেরিয়ে যেতে দিল। হাত বাড়িয়ে নীলের তোয়ালেটা নিয়ে নীলকে টাব থেকে উঠিয়ে নিল। তোয়ালেটা নীলের গায়ে জড়িয়ে তার মাথা মুছে দিল। "মামুকে গুডনাইট বলে দাও।"

"ও ওঁদের কী বলে ডাকে?"

"কাদের?"

"আমাদের মা-বাবাকে?"

উত্তরটা সুধাকে খুঁজতে না হলেও, সে ইতস্তত করল। "দাদু আর দাদি।"

"ঠিক যেমন আমরা বলতাম," রাহুলের গলার স্বর নরম হয়ে গেল। "তোকে নিশ্চয়ই ওঁরা রাজার আদরে রাখেন?" সে নীলকে বলল।

"বলতে পারিস। ওর বড়দিনের কয়েকটা উপহার এখনও খোলাই হয়নি।"

"পরের বড়দিনের কী খবর? তোদের কী প্ল্যান?"

"মা-বাবার লন্ডনে আসার কথা," রাহুলের প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর রেখে সুধা শুরু করল। "অবশ্য, তুইও আসলে ভাল হয়," সে বলতে থাকল। যদিও কথাটা নিজের কাছেই অসম্ভব শোনাচ্ছিল। "তোরা সকলে। এলেনা আর ক্রিস্টালও। তোরা কোনও হোটেলে থাকতে পারিস।"

সুধা চুপ করে গেল। বুঝতে পারল যে, সে দমবন্ধ করে আছে। অপেক্ষা

AMARBOI.COM

করছে কখন আবার রাহুল তার জীবন থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু রাহুল শুধু "ভেবে দেখব," বলে সুধাকে আরও রুদ্ধশ্বাস করে দিল। কারণ, সুধা উপলব্ধি করল যে, কোনও চুক্তি ছাড়াই, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। রাহুল তাদের জীবনে ফিরে আসতে চায়।

পরের দিন সকালে সুধা যখন নীচে নামল, রাহুল ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। রজারের সঙ্গে টেবিলে বসে ছিল, তার হৃষ্টপুষ্ট শরীরে টি-শার্টটা সেঁটে রয়েছে। ঘামে ভেজা চুল মুখে লেপটানো। শর্টস পরেছিল। তার শ্যামবর্ণ পায়ের রোমগুলো সুধার যা মনে ছিল, তার চেয়ে বেশি কুঁকড়ে গিয়েছে। রজার চা খেতে খেতে রাহুলকে টিউবের একটা ম্যাপ দেখাচ্ছিল। বলে দিচ্ছিল কোন ট্রেন কোথায় যায়, কোন পার্কে গিয়ে রাহুল দৌড়ে আসতে পারে।

"কোথায় গিয়েছিলি?" সুধা রাহুলকে জিজ্ঞেস করল। এক পট কফি তৈরি করল। তারপর, নীল শীঘ্রই উঠে পড়বে বলে তার 'উইটাবিক্স'-এর জন্য দুধ গরম করল।

"বলতে পারব না," রাহুল বলল। "এক ঘণ্টার জন্য বেরোই। দৌড়োনো আমার নতুন নেশা।" আসার পর সেই প্রথম সে কোনও প্রসঙ্গে নিজের মদের প্রতি আসক্তির কথা উল্লেখ করল। "দৌড়োনো আর কফি।"

কফি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সুধা রাহুলকে এক কাপ ঢেলে দিল। রাহুল তাতে তিন চামচ চিনি মেশাল। সুধার সেবারের কথা মনে পড়ে গেল, যেবার রাহুল সুধার কলেজে গিয়েছিল এবং সুধা তার হাতে তার প্রথম বিয়ার ধরিয়েছিল। "আজ কী করবি?"

রাহুল কাঁধ ঝাঁকাল। "হয়তো মিউজিয়ামে যাব। এমনি একটু ঘুরে দেখতে চাই।"

"কুড়ি মিনিটে রেডি হয়ে যাও। আমি তোমাকে টিউবে নামিয়ে দিচ্ছি," রজার বলল।

অফিসে বসে সুধা ভাবল, রাহুল কী করছে কে জানে? ভাবল লন্ডনের শয়ে শয়ে পাব-এর মধ্যে কোনওটা রাহুলকে প্রলুব্ধ করবে কি না। মনের এক কোণে তার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল যে, কোনও কারণে রাহুলের মন আবার ফিরে যাবে এবং সে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। কিন্তু সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখল, রাহুল ক্ষুধার্ত সিংহের ভূমিকায় নীলের পিছন পিছন হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়িতে উঠছে। সে রাতে তারা ঝোল জাতীয় কিছু খাবে বলে বাইরে গেল। রাহুল তখনও মদ্যপান করল না। টেবিলের ওপর পেতে রাখা কাগজটা ছবি এঁকে ভরিয়ে দিল। আবার, সুধা যখন নীলকে চান করাল, তখন সে বাথরুমে বসে থাকল। পরের দিন সকালে আবার দৌড়ে আসল। কী কী করবে তার যে তালিকা তৈরি করেছিল, বাকি সপ্তাহটা সেই তালিকা অনুযায়ী কাটাল। সবসময়ই বাইরে থেকে নীলের জন্য কোনও ছোট উপহার নিয়ে ফিরত। রাহুল বেড়াতে আসার সময় অতক্ষণ অফিসে কাটাতে সুধার অদ্ভুত লাগত, কিন্তু তবুও তার মনে হল যে, সেটাই ভাল। সেটাই বেশি নিরাপদ যে, শুধু সকাল এবং সন্ধেবেলাই তারা দু'জনে একসঙ্গে থাকতে পারে, যখন রজার এবং নীলও কাছাকাছি থাকে।

শনিবার সকালে রাহুল ওমলেট তৈরি করল। টিভিতে বাবুর্চিরা যেমন কাটে, তেমন সুনিপুণভাবে মাশরুম এবং পেঁয়াজ কেটে ফেলল। তারপর রাহুলের ইচ্ছেয় তারা লন্ডন জু দেখতে গেল। রাহুল নিজেই নীলকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু যদিও সারা সপ্তাহ সুধা এবং রজার দু'জনেই রাহুলের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নীলকে পাঁচ বা দশ মিনিটের জন্য তার কাছে রেখে কোণের দোকান থেকে ডিম বা পাঁউরুটি কিনতে গিয়েছিল, তবুও, রাহুলের সঙ্গে নীলকে একলা ছেড়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু চিড়িয়াখানায় পৌঁছে, রজার এবং সুধা দু'জনেরই নিজেদের অনাবশ্যক মনে হল। গোটা সময়টাই রাহুল নীলকে নিজের কাঁধে বসিয়ে রাখল। সুধা যে স্ট্রোলারটা নিয়ে গিয়েছিল সেখানে তার পার্স ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নীলও রাহুলকে সমান ভালবেসে ফেলেছিল। রাহুল রেস্টরুমে গেলে সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। রাহুল জোর করে সবকিছুর দাম নিজেই দিল— রজার এবং সুধাকে টিকিট, স্যান্ডউইচ, সোডা কিনে দিল। নীলকে আইসক্রিম এবং একটা পাতিলেবুর মতো সবুজ বেলুন কিনে দিল। সারা দুপুর বেলুনটা তাদের মাথার ওপর হাওয়ায় ভাসতে থাকল।

"ভেবেছিলাম পরে কোনও সিনেমা দেখতে যাব," বাড়ি ফেরার পর রাহুল বলল। সে তখনও নীলকে কোলে নিয়ে ছিল। "কিন্তু এখন ভাবছি, এই ছেলেটার সঙ্গে বাড়িতেই থাকব।"

AMARBOI.COM

"বোকামি করিস না," সুধা বলল। "সারাদিনই তো ওকে সামলেছিস। একটু বিশ্রাম নে।"

রাহুল মাথা নাড়ল। "আমি কাল চলে যাচ্ছি। আমাদের এখনও অনেক গল্প বাকি।" তারপর সে বলল, "তোদের দু'জনের বিশ্রাম নেওয়া দরকার। শেষ কবে একসঙ্গে কোনও সিনেমা দেখেছিলি?"

বুদ্ধিটা আপনাআপনিই এসে গেল। একটা নিখুঁত পরিকল্পনা যা সম্পূর্ণভাবে ভুল মনে হচ্ছিল। সুধা রজারের দিকে তাকাল। রাহুল তা দেখতে পেয়ে বলল, "তোরা কি আমাকে বিশ্বাস করিস না?"

'অবশ্যই করি," রজার বলল। সে সুধার দিকে ফিরল। "যাবে নাকি, সু?"

সুধা মনে করাল নিজেকে যে, তাদের একটা সেলফোন আছে এবং সিনেমা হলটা বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে মাত্র দশ মিনিটের পথ। আগের দিকের কোনও শো দেখতে গেলে তারা নীলের চানের সময় ফিরে আসতে পারবে। "ফোন করে দেখছি কী সিনেমা দেখাচ্ছে," সে বলল।

"আমরা এখানেই থাকব," মুখ তুলে তাকিয়ে রাহুল কথা দিল। সে এবং নীল বসার ঘরের মেঝেতে বসে ব্লক জড়ো করছিল। সুধা নিজেকে বাধ্য করল রাহুলের কথা বিশ্বাস করতে। তারা রাহুলের কাছে কোনও চাবি রেখে যাচ্ছিল না সুতরাং সে কোথাও যেতে পারবে না। সুধা নীলের জন্য খাবার রেখে যাচ্ছিল। একটা কাপে দুধ এবং প্রায় গলে যাওয়া ম্যাকারোনি যা কিছুতেই নীলের গলায় আটকে যেতে পারে না। সে রাহুলকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, সিঁড়িতে নীলের সঙ্গে সাবধান হতে হবে। ফিল্ম চলাকালীন সে সেলফোনের আওয়াজ বাড়িয়েই রাখল। জিনসের পকেটে শুধু ভাইব্রেশনের ভরসায় রাখতে পারল না। এক ঘণ্টা হয়ে যাওয়ার পর উঠে লবি থেকে ফোন করল।

"সব ঠিক আছে?"

"সব দারুণ চলছে," রাহুল বলল। "মনে হচ্ছিল ওর খিদে পেয়েছে, তাই ওকে খেতে দিলাম।" সুধা শুনতে পাচ্ছিল, পিছনে নীল কোনও কাপ বা চামচ দিয়ে তার উঁচু চেয়ারের ট্রে-টা ঠুকছে।

"বাহ। থ্যাঙ্কস। আমরা তাড়াতাড়িই ফিরছি," সে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই," রাহুল বলল। তাই ফেরার পথে, রজারের প্রস্তাবে তারা একটা বাজারে নেমে চিজ, জ্যাম এবং আরও কয়েকটা দরকারি জিনিস কিনল। রাতে খাওয়ার জন্য তিনটে ভাল দেখে মাংসের ফালি কিনল। রজার বলল, সে টার্ট তৈরি করবে।

সুধা ভেবেছিল রাহুল এবং নীল বসার ঘরে থাকবে। কিন্তু তারা সেখানে ছিল না, কার্পেটের ওপর ছড়ানো খেলনা নিয়ে খেলছিল না। টিভিতে বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠান চালানো ছিল, কিন্তু কেউ সেটা দেখছিল না। নীচে, রান্নাঘরে, উঁচু চেয়ারটা মোছা হয়নি। ট্রে-র ওপর জলের মধ্যে কয়েক টুকরো আঠালো পাস্তা ভাসছিল। চিড়িয়াখানায় কেনা বেলুনটা একপাশে বাঁধা ছিল। সেটা প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। ওপরের সব কাবার্ড খোলা ছিল, কিন্তু সেখান থেকে কিছু সরানো হয়েছে বলে মনে হল না। সুধা চট করে সেগুলো বন্ধ করে দিল। তার ঠোঁটের উপর ঠান্ডা ঘাম জমছিল।

"ওরা বেরোয়নি। পুশ-চেয়ারটা তো এখানেই আছে," রজার বলল।

দৌড়ে ওপরে উঠতে-উঠতে সুধা জলের আওয়াজ শুনতে পেল। আতঙ্কিত হয়ে পড়ার জন্য নিজেকে মনে মনে বকল। "সব ঠিক আছে," সে ডেকে বলল। "ও নীলকে চান করাচ্ছে।"

ওপরে পৌঁছে সুধা দেখল, নীল টাবের ভিতর। নিজের কাপে জল ভরছে, আবার ফেলে দিচ্ছে। যাতে উল্টে না যায়, সে জন্য তারা তাকে সাধারণত একটা প্লাস্টিকের রিং-এর মধ্যে বসিয়ে রাখে। এখন নীল সেটা ছাড়াই জলের মধ্যে বসে ছিল। যদিও কাঁপছিল, কিন্তু এমনিতে ভালই ছিল, মন দিয়ে নিজের কাজ করছিল। জলটা তার বুক পর্যন্ত উঠে এসেছিল। তাকে একলা, কারও তত্ত্বাবধান ছাড়া বসে থাকতে দেখেই সুধার গলা থেকে একের পর এক চিৎকার বেরিয়ে এল। এক দমকে আতঙ্ক এসে তার তলপেট আঁকড়ে ধরল। জলটা আর উষ্ণ ছিল না। একবার পিছলে গেলেই নীল উপুড় হয়ে পড়ে যেত। তার নরম কালো চুল মাথার চারপাশে সূর্যের রশ্মির মতো ছড়িয়ে পড়ত। চুলের গোছাগুলো জলে ওঠানামা করত, কিন্তু তার দেহটা নিথর হয়ে যেত।

"তোর মামা কোথায়?" রজার জানতে চাইল। যদিও তখনও নীল উত্তর দেওয়ার মতো কথা শেখেনি। রজার এক ঝটকায় নীলকে টাব থেকে তুলে নিল। নীল কাঁদতে শুরু করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহুল রজারের স্টাডিতে ঘুমোচ্ছিল। ডেস্কটার নীচে একটা গ্লাস ঢুকিয়ে রাখা। তাদের শোওয়ার ঘরে সোয়েটারের দেরাজ খোলা। উলের ভেতর থেকে বোতলগুলো গলা বাড়িয়ে ছিল। তারা রজারের স্টাডিতে ফিরে গেল। সুধা নীলকে কোলে নিয়েই রাহুলের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগল, কিন্তু তাকে জাগাতে পারল না। রজার রাহুলের ডাফেলব্যাগের ওপর ঝুঁকে তার ভিতর জামাকাপড় ঠেসে ঢোকাতে লাগল।

"কী করছ তুমি?" সুধা জিজ্ঞেস করল।

"কী করছি বলে মনে হচ্ছে, সুধা?"

"ও ওঠার পর কাজটা নিজেই করে নেবে।"

রজার উঠে দাঁড়াল। তার মুখে দয়ার কোনও চিহ্ন ছিল না। "আমি ওর জন্য কাজটা সহজ করে দিচ্ছি। আমি চাই না তোমার ভাই আর কোনওদিন এ বাড়িতে পা রাখুক বা আমাদের ছেলের ধারেকাছেও আসুক।"

রাহুলের ওপর চিৎকার করতে পারছিল না বলে, তারা পরস্পরের ওপর চিৎকার করতে শুরু করল। নীলকে বাথটাবের ভিতর খুঁজে পাওয়ার পর যে অদ্ভুত শান্ততা নেমে এসেছিল, তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

"তুমিই তো বলেছিলে যে আমরা ওকে বিশ্বাস করি," সুধা বলল। "তুমি তো বাইরে যেতে রাজি হয়ে গেলে।"

"আমাকে দোষ দিয়ো না," রজার বলল। "দেখতে গেলে আমি ওকে চিনিই না। ভুলেও যেন তুমি এর একটুও দোষ আমাকে দিতে যেয়ো না।"

"তোমাকে দোষ দিচ্ছি না," সুধা কাঁদতে শুরু করল। "আয়্যাম সরি। আমার তোমাকে বলা উচিত ছিল।"

"কী বলা উচিত ছিল?"

সুধা এত জোরে কাঁদছিল যে, কথা বলতে পারছিল না। তাকে দেখে নীলও কাঁদতে শুরু করল। রজার তার কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে সুধার কাঁধ দুটো ধরল। "কী বলা উচিত ছিল?"

কোনওমতে, যদিও সে তখনও প্রবলভাবে কাঁদছিল, তা সত্ত্বেও সুধা রজারকে সব বলল। সেই প্রথমবার পেন-এ রাহুলের তার সঙ্গে দেখা করতে আসার কথা। রাহুলের তখন বিয়ার খেতে ভালও লাগেনি। তারপর বছরের পর বছর তারা ক্যানগুলো লুকিয়ে রেখেছে। কীভাবে যেন সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহুলের জন্য আর শুধুমাত্র খেলা ছিল না, তার জীবনযাপনের ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন এক জীবনযাপন, যা তাকে নিজের পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছিল।

রজার স্টাডির চারপাশে, সারিবাঁধা বই রাখা দেওয়ালের ওপর, ফাইল ভরতি ক্যাবিনেটের ওপর, ডেস্কের ওপর পিন দিয়ে আঁটা মহৎ মানুষদের পোর্টেটের পোস্টকার্ডের ওপর চোখ বোলাল। তার মুখে ঘৃণা এবং বিরক্তি ফুটে উঠল। তারপর সে সুধার দিকে তাকাল, সুধার প্রতি বিরাগও দৃষ্টিতে স্পষ্ট। "তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছ। আমি কখনও তোমাকে কোনও মিথ্যে বলিনি, সুধা। আমি কখনও এরকম একটা কথা তোমার কাছ থেকে লুকোতাম না।"

সুধা ঘাড় নাড়ল। সে তখনও নীলকে শক্ত করে ধরে কাঁদছিল। রজার তাদের ছেলেকে সুধার কোল থেকে নিয়ে সুধাকে রাহুলের সঙ্গে ফেলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাহুল চিত হয়ে শুয়ে ছিল। একটা পা ডে-বেডের ধার থেকে ঝুলছিল, শিথিল হয়ে যাওয়া মুখটা দেওয়ালের দিকে ফেরানো।

AMARBOI.COM

সারারাত সুধা ঘুমোল না। রজার বোর্ডের মতো শক্ত হয়ে নিজের দিকে পড়ে রইল। তারা কিছু খায়নি। মাংসের ফালিগুলো ফ্রিজারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাহুল ঘুম থেকে ওঠেইনি। সুধা জানত রজার অন্যায় কিছু বলেনি। রাহুলের জায়গায় রজারের ভাই বা বোন হলে তার নিজেরও একই প্রতিক্রিয়া হত। সে মা-বাবার কথা ভাবল। তাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের ছেলেমেয়ের ভাগ্যে সাফল্য লেখা আছে। তাদের মধ্যে একজন ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। রাহুলের জন্য তাঁদের যা কিছু সহ্য করতে হয়েছিল, তার পরেও তাঁরা কখনও রাহুলকে ত্যাগ করেননি, নির্বাসিত করেননি। রাহুলকে তাঁদের জীবন থেকে দূর করে দিতে পারেননি। কিন্তু রজার তা করতেই পারে। এবং সেই বিনিদ্র রাত বয়ে যেতে যেতে সুধা উপলব্ধি করল যে, সে-ও রাহুলকে ত্যাগ করতে পারবে।

ভোরের আলো ফোটার সময় সুধা ঘুমিয়ে পড়ল। এক ঘণ্টা পর শাওয়ারের শব্দে আবার উঠে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ার চালানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। সুধা নার্ভাস হয়ে ভাবল দরজায় টোকা মারবে, কিন্তু তারপর সে দরজা খোলার আওয়াজ পেল। এবং কয়েক মিনিট পর শুনতে পেল, পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

"আমি উঁচু চেয়ারটা পরিষ্কার করে দিতাম," সুধা রান্নাঘরে ঢুকতে রাহুল বলল। সে রজারের একটা বাথরোব পরেছিল। তার চোখ এমন কুঁচকোনো যেন ভূগর্ভস্থ জায়গাটা আলোয় ভেসে গিয়েছে। গলার স্বর রুক্ষ, অনিশ্চিত অথচ সাবধানী পদক্ষেপে মদের প্রভাব স্পষ্ট। কেটলিতে জল ভরে, গ্যাস জ্বালিয়ে, কাচের পট-এ মেপে কফি দিয়েছিল। "ওই ব্যাপারে আমি সরি।"

"আমি ভেবেছিলাম তুই ভাল হয়ে গিয়েছিস।"

এক সেকেন্ডের জন্য রাহুল সুধার দিকে তাকাল। তখন তাকে দেখে তাহা মূর্খ মনে হচ্ছিল। নির্বোধ, স্থূলবুদ্ধি।

"কী হয়েছিলটা কী, রাহুল?"

রাহুল উত্তর দিল না।

"কারণটা কি আমি?" সুধা জিজ্ঞেস করল। দীর্ঘ যে প্রহরগুলো সে জেগে কাটিয়েছে, তখন সে এই কথাই ভেবেছে; ভেবেছে, তাকে দেখেই রাহুলের পুরনো কথা মনে পড়ে গিয়েছিল কি না, সেই সব রাত যখন তারা একসঙ্গে মা-বাবার অবাধ্য হয়েছিল, বরফভরতি কাপে উষ্ণ বিয়ার ঢেলে তাদের এক নিজস্ব যোগসূত্র তৈরি করেছিল।

জল ফুটতে শুরু করল। কেটলিতে একটা পাতলা শিস বেজে উঠল। সুধা গ্যাস নিভিয়ে জলটা কফিপটে ঢেলে দিল। "তোকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে," সে বলল।

"আমার প্লেন সন্ধেবেলায়।"

"এক্ষুনি, রাহুল। তোকে জামাকাপড় পরে নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে। তুই নীলকে বাথটাবে ফেলে রেখেছিলি।" সুধার গলা কাঁপছিল, কিন্তু একই সঙ্গে তার গলার স্বর ক্রমশ উঁচু হচ্ছিল। আগের সন্ধেয় যে দৃশ্য দেখে সে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তা আবার তার চেতনা আচ্ছন্ন করল।

"তাই?"

"হ্যাঁ, রাহুল," নতুন করে সুধার চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করল। "তুই জ্ঞান হারিয়েছিলি এবং আমাদের বাচ্চাটাকে একলা টাবে ফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখে দিয়েছিলি। তোর জন্য ও মরে যেতে পারত। বুঝতে পারছিস কি তুই?"

রাহুল সুধার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। একটা কাবার্ডে মাথাটা চেপে এদিক-ওদিক সামান্য বেঁকিয়ে বিড়বিড় করে নিজেকে গালমন্দ করতে শুরু করল। তারপর, সুধার দিকে না ফিরেই, সে বলল, "কিন্তু ও ঠিক আছে, তাই তো, দিদি? আমি আজ সকালে ওর ঘরে উঁকি মেরে দেখেছি ও দিব্যি নিজের জায়গায় ঘুমোচ্ছে।"

"তোকে এবার যেতে হবে।" সুধা প্রায় ফিসফিস করে কথাগুলো বলল। সে টের পাচ্ছিল যে, তার গলাটা ভাঙা রেকর্ডের মতো শোনাচ্ছে। সারা রাত, সে ক্রোধে তোলপাড় হয়েছে। সেই ঝড়ের মেঘ বৃষ্টির জল হয়ে বয়ে গিয়েছে। এখন তার শুধু অবসন্ন লাগছিল।

"আমি মাসের পর মাস জিনিসটার থেকে দূরে ছিলাম," রাহুল বলল। "জানি না কী হয়েছিল। আমি স্রেফ এক চুমুক—"

"থাম," সুধা বলল। রাহুল থেমে গেল। "আমি তোর কৈফিয়ত শুনতে চাই না। বুঝতে পেরেছিস? আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না।"

রাহুল আর কিছু বলার চেষ্টা করল না। সে জামাকাপড় পরা এবং ব্যাগ নিয়ে আসার জন্য ওপরে গেল। তারপর সুধা যখন হিথরোর জন্য একটা মিনিক্যাব ডেকে পাঠাল, তখন সে বসার ঘরে দাঁড়িয়ে রইল। সুধা ভাড়ার জন্য পঞ্চাশ পাউন্ড এগিয়ে দিতে রাহুল সেটা নিয়ে নিল। তারপর সে চলে গেল। ক্যাব আসার আগেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ক্যাব আসার পর সুধা জানলায় গিয়ে লেসের পরদা সরিয়ে রাহুলকে পিছনের সিটে উঠে বসতে দেখল। তারপর সুধাকে ফেলে রেখে ক্যাবটা চলে গেল। সুধা সকালের ধূসর আলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তার কান্না কখন থেমে গিয়েছে সে বুঝতে পারেনি। হঠাৎ সে সজাগ বোধ করল। শুনতে পেল, ওপরে নীল নিজের বিছানায় নড়াচড়া করতে শুরু করেছে। আর এক মিনিটের মধ্যেই সে কেঁদে উঠবে। সুধাকে চাইবে, জলখাবার চাইবে। তার বয়স এতই কম যে, সুধা তার কাছে শুধুই ভাল, আর কিছুই নয়। সুধা রান্নাঘরে ফিরে গেল। একটা কাবার্ড খুলে এক প্যাকেট উইটাবিক্স বের করল। একটা সসপ্যানে দুধ গরম করল। তার গোড়ালির কাছে কী একটা এসে ঠেকল। সে ফিরে দেখল, নীলের উঁচু চেয়ারে বাঁধা বেলুনটা আর ফিতে বাঁধা

AMARBOI.COM

নেই। সেটা মেঝেতে নেমে এসেছে। ছোট হয়ে গিয়েছে, আর ফেটে যাওয়ার অবস্থায় নেই। সুধা কাঁচি দিয়ে ফিতেটা কেটে গোটা জিনিসটা ডাস্টবিনে ঠেসে ঢুকিয়ে দিল। কত সহজে জিনিসটা এঁটে গেল দেখে সে অবাক হয়ে গেল। সে তার স্বামীর কথা ভাবল, যে আর তাকে বিশ্বাস করে না। ছেলের কথা ভাবল, যার কান্না এখন তাকে ডাকছিল। সেই সদ্য অঙ্কুরিত পরিবারের কথা ভাবল, যা আজ সকালেই আঘাত পেয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। অন্য যে-কোনও পরিবারের মতোই নিজস্ব ধাঁচের এবং ভয়ংকর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনধিকার চর্চা

স্যাং-কে বিয়ে করতে চেয়ে মাঝেমধ্যেই ছেলেরা তাকে ফোন করে। সাধারণত এরা অধিকাংশই স্যাং-এর অপরিচিত। কয়েকজনের নামও তো সে কস্মিনকালে শোনেনি। কিন্তু তারা শুনেছে সে সুন্দরী, স্মার্ট, তিরিশ বছর বয়সি, বাঙালি এবং এখনও অবিবাহিত। অতএব এই পুরুষের দল, যাদের অধিকাংশই বাঙালি, এমন লোকজনের কাছ থেকে ফোন নম্বর জোগাড় করত যারা স্যাং-এর মা-বাবা কিংবা তাঁদের বন্ধুবান্ধবের চেনা। এবং স্যাং-এর মতে মা-বাবা তার বিয়ের জন্য অধীর। স্যাং-এর বক্তব্য অনুযায়ী লোকগুলো তার সঙ্গে কথা বলার সময় খুঁটিনাটি তথ্যগুলো গুলিয়ে ফেলত। যেমন, তারা বলত সে ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে, আদতে বিষয়টা ছিল ফিলজফি, কিংবা সে নাকি কলম্বিয়া থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে, ঠিক জায়গাটা যদিও নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি। তাকে সংগীতা বলে সম্বোধন করত, কিন্তু স্যাং নামেই সে পরিচিত। সে হার্ভার্ড থেকে ডক্টরেট করছে শুনে তারা অবাক ও খুশি হত, তবে আসল কথাটা হল, সে একটা সেমেস্টারের পরই হার্ভার্ড ছেড়ে দেয় এবং একটা বইয়ের দোকানে পার্টটাইম কাজ করতে শুরু করে।

স্যাং-এর বন্ধু পল আর হিথার ফোনে সম্ভাব্য বরের গলা শুনেই ঠিক ধরে ফেলত। এরা দু'জন স্যাং-এর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকত। 'হাই', স্যাং রান্নাঘরের সস্তা কাঠের টেবিলের ওপর বসে, পয়সার মতো রঙের চোখ ঘোরাতে-ঘোরাতে কথা বলত। কখনও চেয়ারে গা এলিয়ে দিত, দেখে বোঝা যেত সে রীতিমতো বিরক্ত কিন্তু নিরুপায়, যেন পাতাল রেলে দুটো স্টেশনের মাঝে আটকে পড়েছে। স্যাং যে এই ছেলেগুলোর সঙ্গে কখনওই খারাপ ব্যবহার করে না, এতে আবার পলের মৃদু আপত্তি ছিল। লোকগুলো যখন স্যাং-এর সঙ্গে তাদের জটিল, লতায়-পাতায় জড়ানো সম্পর্কের ব্যাখ্যা করত, স্যাং মন দিয়েই তাদের কথা শুনত এবং পলের এসব শুনেটুনে একটু হিংসেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত, যদিও স্যাং এর সঙ্গে সে এক বাড়িতেই থাকে, একই রান্নাঘর শেয়ার করে এবং তারা দু'জনেই গ্লোব এর গ্রাহক। তবু পাত্রেরা কখনও সুদূর লস অ্যাঞ্জেলেস আবার কখনও হাতের কাছের ওয়াটারটাউন থেকে ফোন করত। পল এবং হিথারকে স্যাং বলে ছিল সে একবার একজনের সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত রাজি হয়েছিল। ছেলেটি তাকে আই-৯৩-এর উত্তরে গাড়ি করে নিয়ে হাইওয়ে থেকে তার অফিস দেখিয়েছিল। তারপর ডাঙ্কিন ডোনাটস দোকানে নিয়ে গিয়ে কেক আর কফি খেতে খেতে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে কথাবার্তা চালাতে চালাতে স্যাং ফোনের পাশে রাখা নোটপ্যাডটা তুলে নিয়ে লেখালিখি করত। লোকটার নাম কিংবা 'কার্নেগি মেলন' অথবা 'রহস্য উপন্যাস ভালবাসে' থেকে কলমটা চলে যেত হিজিবিজি আঁকিবুকি আর কাটাকুটি খেলার দিকে। ভদ্রতার খাতিরে সে-ও প্রশ্ন করত, এই যেমন অর্থনীতিবিদ বা দাঁতের ডাক্তার বা মেটালারজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তারা কাজ কতটা উপভোগ করছে। অবশ্য এদের সঙ্গে মদ বা ডিনার খাওয়ার আমন্ত্রণ সে প্রতিবারই এড়িয়ে যেত নির্দোষ মিথ্যে এক অজুহাতে। এই মুহূর্তে সে ভীষণ ব্যস্ত, মানে হার্ভার্ডের পড়াশোনা, ক্লাস করা ইত্যাদি। যদি কখনও পল তার পাশে টেবিলে বসে থাকত, কথা বলার ফাঁকেই তাকে উদ্দেশ করে নোট লিখে দিত স্যাং, 'গলা শুনে মনে হচ্ছে বছর বারো বয়স', 'একেবারে গর্দভ' কিংবা 'এই লোকটাই একবার বাবা-মা'র সুইমিং পুলে বমি করে দিয়েছিল'। নিজে ফোনটা ঠিকভাবে ধরে থেকে পড়ার সুবিধের জন্য প্যাডের কাগজটা পলের চোখের সামনে দোলাত।

কিন্তু ফোনটা রেখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে রাগারাগি আরম্ভ করে দিত। কোন সাহসে এই লোকগুলো তাকে ফোন করে? এরকম শিকারির মতো তারা তাকে খুঁজে বেড়ানোর স্পর্ধা দেখায় কী করে? তার ব্যক্তিগত জীবনকে উপেক্ষা করা হয় এতে, তার সাবালকত্বের প্রতি অপমান। অসহ্য! শুধু পল আর হিথার যদি এই লোকগুলো কীভাবে নিজেদের গুণাবলি সাতকাহন করে বলে, একটু শুনত! কখনও সখনও অবশ্য হিথার বলে উঠত, "স্যাং, তুই গজগজ করছিস, এটা বিশ্বাসই হচ্ছে না। এই সব সফল, হয়তো সুপুরুষও, তোকে না-দেখেই বিয়ে করার জন্য পাগল। আর তুই চাস যে, আমরা তোর জন্য দুঃখপ্রকাশ করি?"

বস্টন কলেজের আইনের ছাত্রী হিথার দুর্বিষহভাবে পাঁচ বছর ধরে একা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যাং-কে সে বলেছে প্রেম নিবেদনের ব্যাপারটা বেশ রোম্যান্টিক, কিন্তু স্যাং মাথা নেড়েছে, "এগুলো মোটেই প্রেম নয়!" স্যাং-এর মতে এসব আসলে সম্বন্ধ করে বিয়ে করার মতো। এই পুরুষরা আদতে তার প্রতি আগ্রহী নয়। তারা বহুবিস্তৃত, জটিল আড্ডাতে আলোচিত এক কল্পিত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, যে প্রবাসী ভারতীয়দের দলের ভিতরে এক বুড়িয়ে যাওয়া, অযত্ন লঙ্ঘিত ভরতনাট্যম ক্লাসের এক নিখুঁত পোস্টার কন্যা। যতই পরীক্ষার নম্বরের কথা বলুক, আদতে তো তাকে টাকা-পয়সার হিসেব রাখতে হয় আর পেপারব্যাক বই পিরামিডের আকারে সাজিয়ে রাখতে হয়। সে আসলে কে এবং কীভাবে তার দিন কাটায়, সেটা যদি তারা সত্যি সত্যি জানত, তা হলে কোনওরকম উৎসাহ দেখাত কি? পাশাপাশি স্যাং সবসময় পল আর হিথারকে মনে করিয়ে দিত, "তা ছাড়া আমার একজন বয়ফ্রেন্ড আছে।"

এক সন্ধেবেলা পল বলে বসল, "তুই পেনেলোপির মতো," আগামী পরীক্ষায় ইংরেজি সাহিত্যে মৌখিক প্রশ্নের প্রস্তুতির জন্য সে তখন ল্যাটিমোরের হোমার পড়ছিল।

"পেনেলোপি?" মাইক্রোওয়েভে ভাত গরম করছিল স্যাং। পল লক্ষ করল সে প্লেটটা সরিয়ে রেফ্রিজারেটরের দরজার ভিতরে পিনাট বাটারের পাশে রাখা থাকে যে লেবুর আচারটা সেটাই গরম ভাতের সঙ্গে মেখে নিল।

"ওডিসির," পল স্যাং-এর প্রশ্নের উত্তরে মৃদুস্বরে বলল। পল বেশ লম্বা কিন্তু রোগাপটকা নয়, বেশ মোটা আঙুল আর পায়ের গোছ, সুন্দর খড়-রঙা চুল। তার চেহারার সবচেয়ে আকর্ষক বস্তুটি একটি মূল্যবান ডিজাইনার গোল মেরুন ফ্রেমওলা চশমা, বিকন স্ট্রিটের এক সুন্দরী সেলসগার্ল তাকে প্রলুব্ধ করেছিল একটি দোকান থেকে এটি কেনার জন্য। পলের চশমাটা বিশেষ পছন্দ হয়নি, যদিও সেটা দিব্যি খাপ খেয়ে গিয়েছিল তার মুখে। এখনও সেটার প্রতি তার কোনও মায়া নেই।

"ঠিক, ঠিক, ওডিসি-র পেনেলোপি," স্যাং টেবিলে বসতে বসতে বলে, "আমি শুধু উলটাই যা বুনতে পারি না।"

"তাঁত বোনা," পল শুধরে দেয়, "একটা চাদর পেনেলোপি কেবলই বুনত আর খুলে ফেলত, তার পাণিপ্রার্থীদের ঠেকানোর জন্য।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যাং একচামচ ভাত ঠোঁটের সামনে এনে ঠান্ডা করার জন্য ফুঁ দিতে দিতে বলল, "তা হলে কোন মহিলা জানি সেলাই করত?" সে পলের দিকে তাকায়, "তোর তো জানা উচিত।"

পল থেমে গেল। স্যাং-কে ইমপ্রেস করার জন্য সে অধীর হয়ে উঠল, কিন্তু কেমন যেন মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেল হঠাৎ। ডিকেন্সের কোনও একটা চরিত্র নির্ঘাত, কিন্তু বইগুলো রাখা আছে তার ওপরের ঘরে। "দাঁড়া এখনই আসছি," বলে যেতে গিয়েও নিশ্চিন্ত হয়ে থেমে গেল, "এ টেল অফ টু সিটিজের মাদাম ডিফার্জ।"

জুলাই মাসের এক শনিবার ফিনিক্সে পল এবং হিথারের হাউজমেট চাওয়ার বিজ্ঞাপন দেখে সকাল ন'টার সময় স্যাং যখন প্রথম ফোন করে, পলই তার উওর দিয়েছিল। ফোনের আওয়াজে তার ঘুম ভেঙেছিল এবং স্নানের রোবটা পরে জবুথবু ভাবে সে ভাবছিল, স্যাং আবার কেমনতরো নাম। তার প্রথমে মনে হয়েছিল মেয়েটি জাপানি। তারপর এখানে আসার পর সিকিওরিটি ডিপোজিটের চেকে সই করার সময় জানা গেল তার পুরো নাম সংগীতা বিশ্বাস। তার মেলে, প্রতিমাসে পেটমোটা ভোগ ম্যাগাজিনের খামে আর ইলেকট্রিক বিলে এই নামটা পল দেখতে পেত। প্রথমে, স্যাং দরজার বেল বাজানোর সময় হিথার স্নানে গিয়েছিল বলে পল একাই অভ্যর্থনা জানায়। স্যাং-এর লম্বা চুল ছিল খোলা, পল জানতে পারল, সে ন'মাসে ছ'মাসে সেটা খুলে রাখে। স্যাং-এর পিছনে যেতে যেতে তার গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা, পিঠ ছাপানো চুল বেশ ভাল লেগেছিল তার। অন্য সকলের মতোই, স্যাং-এর বিশেষভাবে ভাল লেগেছিল বাড়ির মাঝখানে বসানো অসাধারণ সিঁড়িটা যার রেলিং-এ সে হাত বোলাচ্ছিল। সিঁড়িটা ছ'বার ছ'টা ছ'টা ধাপের পর নব্বই ডিগ্রি করে ঘুরে গেছে, কাঠের সিঁড়িটা কনিয়াকের মতো ঝকঝক করছিল। গোটা বাড়িটায় এই একটিমাত্রই দর্শনীয় জিনিস ছিল। ওপরতলার জিনিসপত্র দেখার আগের এক মিথ্যে প্রতিশ্রুতি মাত্র, রান্নাঘরে কুৎসিত বাদামি ক্যাবিনেট, টাইল খসা পুরনো স্যাঁতসেঁতে বাথরুম, নীচের তলায় বসবাসকারী বাড়িওলার কান বাঁচানোর জন্য সর্বত্র ওটমিলের মতো ময়লা সাদা কার্পেট দিয়ে মোড়া।

ফাঁকা ঘরটাতে পলের সঙ্গে ঢোকার আগে সে ল্যান্ডিং এ হাঁটতে হাঁটতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির প্রশস্ত জায়গা নিয়ে মন্তব্য করছিল। ঘরের এক কোণে একটা ডোরিক ধাঁচের স্তম্ভ বসানো দেওয়াল-আলমারির মতো ছিল, তার কাচের শার্সি বসানো দরজাটা স্যাং বারে বারে খোলা-বন্ধ করছিল। পল বলেছিল ঘরটা আসলে খাবার ঘর হিসেবে গোড়ায় ভাবা হয়েছিল এবং আলমারিটা তৈরি করা হয় চিনেমাটির বাসনপত্র রাখার জন্য। ল্যান্ডিং-এর উলটোদিকে একটা বাথরুম, ওপরের বড় স্নানঘরটা ব্যবহার করে পল আর হিথার। "আমার মনে হচ্ছে একটা ফাঁকা রেফ্রিজারেটরের ভিতর আমি দাঁড়িয়ে আছি," স্যাং বলেছিল কারণ একসময় নীল রং করা দেওয়ালগুলোর ওপর সাদা রং চাপানো হয়েছে। সিলিং-এর উজ্জ্বল আলোতে কেমন একটা ঠান্ডা, কঠিন ভাব তৈরি হয়েছিল। স্যাং দেওয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে আটকে থাকা একটুকরো টেপ সাবধানে তুলে ফেলল। কোনও একসময় ঘর আর রান্নাঘরের সংযোগে একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি দরজা ছিল, এখন সেটা বুজিয়ে দেওয়া হলেও স্যাং লক্ষ করল, প্লাস্টারের ভিতরে একটা ক্ষতচিহ্নের মতো খিলানটা তখনও দেখা যাচ্ছে।

সে থাকতে থাকতেই আর একজন বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করে, কিন্তু ততক্ষণে সে আগাম দিয়ে দিয়েছে। হিথারের সঙ্গে আলাপের পর তিনজন রংচটা জানলা, নরম নোংরা সোফা আর হলদে চেয়ার রাখা বসবার ঘরে বসে গল্পগুজব করছিল। নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম কীভাবে তারা ভাগাভাগি করে নেবে, বাড়িওলারা কেমন, আর দু'জনেই ব্রিগহ্যামে কাজ করে আর মেয়েদের ডাক্তার। পল ও হিথার জানায়, গোটা বাড়িতে একটিমাত্র ফোনের জ্যাক আছে এবং সেটা রান্নাঘরে। তবে ফোনের সঙ্গে লাগানো তারটা এতই লম্বা যে, নিজের ঘরে সেটা টেনে নিয়ে যাওয়া যায় যদিও এই টানা-হ্যাঁচড়ার কুফল হিসেবে সারাক্ষণ একটা কড়কড়ে আওয়াজ সহ্য করতে হয়।

"আর একটা লাইন নেওয়ার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু তাতে বড্ড খরচ," হিথার জানায়।

"আমার এতে কোনও অসুবিধে হবে না," স্যাং বলল।

আর পল, যে ফোনে কারও সঙ্গেই বিশেষ কথা বলত না, একদম চুপচাপ বসে রইল।

বাড়িতে সে নতুন কোনও জিনিসপত্র নিয়ে আসেনি, রান্নাঘরের জন্য কোনও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসনপত্রও নয়। শুধু একটা অসুস্থ লতানে গাছ, যেটা শুধু হলদে হরতনের মতো পাতা খসাত। এক রবিবার একটি বন্ধুর সাহায্য নিয়ে এখানে এসে ওঠে স্যাং। পলের ধারণা, ছেলেটি তার বয়ফ্রেন্ড নয় (কারণ স্যাং প্রথমবার এসে একজনের উল্লেখ করেছিল, যে গরমের ছুটিতে তার মা-বাবাকে দেখতে কায়রোয় গিয়েছে এবং এ-ও বলেছিল সে মিশরীয় এবং হার্ভার্ডে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস পড়ায়)। এই বন্ধুটির নাম চার্লস। সে একটা মুখ-উঁচু স্নিকার্স আর ক্যাটকেটে কমলা বোলিং শার্ট পরেছিল, চুলটা আবার বিনুনি করা। একটা ট্রাকের পিছন থেকে দুটো ছেঁড়াফাটা সুটকেস, একগাদা শপিং ব্যাগ, গোটাকয়েক বাক্স-পাঁটরা ইত্যাদি নামাতে নামাতে ছেলেটি স্যাং-কে গতরাতের ডেটিং-এর কথা বলছিল। ডেকের চেয়ারে বসে পল ক্যান্টারবেরি টেলস পড়ার চেষ্টা করছিল, সেখান থেকে দেখতে পেয়ে সে সাহায্য করতে চাইল কিন্তু স্যাং কোনও প্রয়োজন নেই বলে বারণ করে দেয়। তাদের কথাবার্তা পলকে অমনোযোগী করে তুললেও, রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে সে স্যাং-কে দেখছিল! চার্লস ঠাট্টা করে তাকে বেশি জিনিসপত্তর কিনতে বারণ করছিল, যাতে এখান থেকে উঠে যাওয়া সহজ হয়। স্যাং-ও এতক্ষণ হাসছিল, কিন্তু এবার সে চুপ করে গেল, তাকে কেমন যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। হাতে একটা মাফলার গোল করে পাকিয়ে ধরে সে বাড়িটার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "আমি জানি না চার্লস। আমি সত্যিই জানি না কদ্দিন এখানে থাকব।"

"ও কি এখনও, তোর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গে থাকতে চাইছে না?"

স্যাং মাথা নাড়ে।

"কী বলছে ও?"

"এই যে, সব কিছু নষ্ট করে দিতে চায় না।"

চার্লস ধরে থাকা ভারী বাক্সটা অন্য হাতে নিতে নিতে বলে, "কিন্তু এটা তো ও মানে যে তোর বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য একটা চাপ আছে।"

স্যাং ট্রাকের দিকে ঘুরে যায়, "ও মাঝে মাঝে বলে, যখন আমাদের বাচ্চা হবে, আমরা লেক্সিংটনে একটা বড় বাড়ি কিনব।"

"তোরা তো তিন বছর একসঙ্গে আছিস," চার্লস বলল ওকে, "একটু পুরনোপন্থীই বলতে হবে ওকে, আর সেই ব্যাপারটাই তোর ভাল লাগে, তাই তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তী কয়েকরাত স্যাং বসবার ঘরের কৌচেই কাটাল। তার থাকার ঘর রং করা হবে বলে জিনিসপত্র সাময়িকভাবে সব এখানেই ডাঁই করে এক কোণে রাখা ছিল। পল এবং হিথার দু'জনেই এতে বেশ আশ্চর্য হয়েছিল। এখানে মাথা গোঁজার সময় কেউই তাদের ঘর নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। দেওয়ালের জন্য স্যাং চোখে আরামদায়ক সেজ পাতার মতো হালকা সবুজ রঙের কথা ভেবেছে; তার ধারে লাগাবে ফিকে ল্যাভেন্ডার, যে রংটাকে বিক্রেতারা বলে 'মোল'। তবে অতিকল্পনাতেও আঁচিলের ওরকম রং হয় না, রান্নাঘরের একটা পাত্র জোরে নাড়াতে নাড়াতে স্যাং পলকে বলে। "আচ্ছা, তুই হলে কী নাম দিতিস ওটার?" সে হঠাৎই পলকে জিজ্ঞেস করে।

পলের মাথায় অবশ্য কিছুই এল না। কেবল ওপরতলায় পেল্লায় প্লাইউড ডেস্ক ঠাসা পাতলা ফিনফিনে কাগজের মোটা মোটা বইয়ের মধ্যে একা বসে সে ভাবল, আইসক্রিমের কথা, যেটা তার মা রবিবার রাতে হ্যামবার্গার খেতে যাওয়ার সময় নিউপোর্ট ক্রিমারি থেকে অর্ডার করতেন। বেশ কয়েক বছর আগে তার মা মারা গিয়েছেন, বাবাও কিছুদিন পরেই। পলকে তাঁরা বেশি বয়সে, প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছে এসে দত্তক নিয়েছিলেন, তাই অনেকেই তাঁদের তার দাদু-ঠাকুরমা বলে ভুল করত। সেদিন সন্ধেবেলা স্যাং এসে ঘরে ঢুকতেই পল বলে উঠল, "ব্ল্যাক র‍্যাসপবেরি।"

"কী?"

"রংটা।"

স্যাং-এর মুখে একটা বিষণ্ণতা মাখা ফিকে হাসি ফুটে উঠল, ধাঁধা লাগা কোনও বাচ্চার দিকে তাকিয়ে যেমন অনেকে হাসে।

"বেশ মজার।"

"কী, নামটা?"

"না। মজা এই যে, প্রায় ঘণ্টাছয়েক আগে হয়ে যাওয়া একটা কথার জের টেনে তুই এখন কথা বলছিস আর আশা করছিস যে, আমার সেটা মনেও থাকবে!"

পরদিন সকালে পল তার ঘরের দরজাটা খুলতেই নতুন এবং কড়া রঙের গন্ধ পেল, আর দেওয়ালের ওপর রোলার চলার আওয়াজও। হিথার বেরিয়ে যাওয়ার পর স্যাং গান শুনতে আরম্ভ করে, একটার পর একটা বিলি হলিডের সিডি। ভ্যাপসা গুমোট গরমের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল তারা, যদিও

AMARBOI.COM

স্যাং এর ল্যাণ্ডিং এর চেয়ে বসার ধরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। পল সেখানে বসেই কাজ করছিল।

"হে ভগবান," স্যাং বাথরুমে যাওয়ার পথে পলকে দেখে বলে উঠল, "গানের ঠেলায় নিশ্চয় পাগল হয়ে যাচ্ছিস তুই।"

স্যাং একটা নীচটা-কাটা জিন্‌স আর ব্রা-এর মতো স্ট্র্যাপওয়ালা কালো ট্যাঙ্ক টপ পরে ছিল। খালি পা এবং পায়ের জায়গায় জায়গায় রঙের ছোপ লেগে ছিল।

পল তাকে মিথ্যে বলেছিল যে সংগীত শুনতে শুনতেই সে প্রায়ই পড়াশোনা করে। কারণ সে লক্ষ করেছিল, স্যাং প্রায়ই রান্নাঘরে যায় ব্রাশ পরিষ্কার করতে কিংবা বড় বাটি থেকে ইয়োগার্ট খেতে। দ্বিতীয় দিনে পল নিজেই চা করার জন্য সেখানে গিয়ে ছিল এবং স্যাং এটা লক্ষ করে প্রায় চমকে গিয়েছিল যে, পল তার হাতঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছে কখন চায়ের পাতা তুলে নিতে হবে। বিকেলে স্যাং-এর দিদি লন্ডন থেকে ফোন করেছিল, তার গলাটাও অনেকটা স্যাং-এর মতোই। মুহূর্তের জন্য পলের মনে হয়েছিল গলাটা বুঝি স্যাং-এরই, নিজের ঘর থেকেই কোনও অজ্ঞাত কারণে ফোন করছে।

"এখন কথা বলতে পারছি না রে। ঘরে সবুজ-গোলাপি রং করছি," দিদিকে খুশি খুশি গলায় জানাল সে। গাঢ় বাদামি রঙের রিসিভারটা রেখে সে লক্ষ করল ওটার গায়ে গোলাপি রঙের আঙুলের ছাপ পড়ে গিয়েছে।

পল স্যাং-এর তাৎক্ষণিক সান্নিধ্যে পড়াশোনা করতেই পছন্দ করত। তার পিএইচডি-র পড়াশোনা কতদূর এগিয়েছে শুনে বেশ ইমপ্রেসড হত স্যাং। স্যাং জানিয়েছিল এক বছর আগে সে যখন হার্ভার্ড থেকে তার নাম কাটিয়ে নেয়, তার মা একসপ্তাহ শোওয়ার ঘর থেকে বেরোননি। তার বাবা তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শিক্ষাজগৎ তার ঢের দেখা আছে। এই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়া সে ঘৃণা করে। সে মনে করে, গতে বাঁধা পড়াশোনা শুধু ঘরকুনো করে দেয়।

ঠিক এই কাজটাই তার বয়ফ্রেন্ড করত, দিনের অধিকাংশ সময় নিজেকে গৃহবন্দি করে আর ফোনের তার খুলে রেখে পরবর্তী কনফারেন্সের জন্য পেপার লিখত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুই এই কাজটা ভালই পারবি," পলকে সে আশ্বাস দেয়, "আমি জানি তুই যথেষ্ট মনোযোগী।" পরীক্ষায় কী কী থাকবে জিজ্ঞেস করায় পল জানায়, সেটা চলবে তিন ঘণ্টা ধরে, তিনটে প্রশ্ন আসবে তিনশো বছরের ইংরেজি ও ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে।

"যা ইচ্ছে তাই জিজ্ঞেস করতে পারে?" স্যাং জানতে চাইল।

"পাঠক্রমের বাইরে কিছু নয়।"

"বটে।"

পল তাকে সত্যি কথা বলেনি! এক বছর আগেই সে পরীক্ষায় বসেছিল এবং ফেল করেছিল। তার কমিটি এবং আর অল্প কয়েকজন ছাত্র ছাড়া ব্যাপারটা কেউ জানত না এবং এখন তাদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই পল ঘরে বসে থাকে। সে ঠিকঠাক প্রস্তুতি নেয়নি বলে ফেল করেছে, ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়! আসলে সেই ঝকঝকে মে মাসের সকালে, মনটাই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল! একগুঁয়ে পেশিগুলো যেমন ঘুমের মধ্যে তার পা-টা বেঁকিয়ে দেয়, তেমনই মনেও অদ্ভুতরকম খিঁচ ধরে ছিল। অসহনীয় সেই পাঁচ মিনিট, যখন প্রোফেসররা পাতা ভরতি গুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে, কমনওয়েলথ অ্যাভেনিউ দিয়ে যখন একটার পর একটা ট্রেন আসছে-যাচ্ছে, পল তখনও তার প্রথম প্রশ্নটারও জবাব বলতে পারেনি। 'রিচার্ড (থ্রি) থার্ড'-এ কমিক ভিলেনি-র ওপর ছিল প্রশ্নটা। সে এতবার পড়েছে নাটকটা যে, প্রতিটি দৃশ্য তার চোখের সামনে ভাসে, মঞ্চের দৃশ্যায়ন নয়, বরং পেলিক্যান শেক্সপিয়রের ফ্যাকাশে ছাপা পৃষ্ঠা হয়ে। লাল হয়ে গিয়েছিল তার সর্বাঙ্গ; পরীক্ষার বহুদিন আগে থেকে এই দুঃস্বপ্নটাই ফিরে ফিরে আসত। প্রশ্নকর্তারা ধৈর্য ধরে ছিলেন, অন্য প্রশ্ন করলেন, তাতেও যাচ্ছেতাই রকম তোতলাতে-তোতলাতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিল পল। কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ ভাবনা হোঁচট খেয়ে বাক্যের মধ্যে থেমে গেল। শেষমেশ সাদা চুলের বেড় দেওয়া এক প্রায়-টাকমাথা অধ্যাপক ট্র্যাফিক পুলিশের মতো হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "এ এখনও তৈরিই হয়নি।"

পল হেঁটে বাড়ি ফিরেছিল সেদিন। এই উপলক্ষে যে টাইটা সে কিনেছিল, সেটা পকেটেই গোঁজা ছিল এবং এক সপ্তাহ সে বাড়ি থেকে বেরোয়নি। আবার যখন ক্যাম্পাসে ফিরে এল, দশ পাউন্ড ওজন কমে সে শীর্ণ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে এবং ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সে প্রেমে টেমে পড়েছে কি না।

এদের সঙ্গে এক সপ্তাহ থাকার পর স্যাং-এর প্রথম পাণিপ্রার্থীর ফোনটা আসে। ততদিনে রং করা শেষ, নিরানন্দ ঘরটায় শ্রী ফিরে এসেছে। স্যাং যখন জানলার শিক থেকে টেপ তুলছিল, পল এসে জানাল অসীম ভট্টাচার্য নামে কেউ একজন জেনিভা থেকে ফোন করছে। একটুও দ্বিধা না করে সে উত্তর দিল, "বলে দে আমি বাড়িতে নেই।"

পল শুনে বানান করে বলা নামটা কোনওমতে লিখে নেয়, ও প্রান্ত থেকে ছাড়ার আগে জানায়, "শুধু বলবেন, পিঙ্কু ফোন করেছিল।"

ছেলেদের ফোন বাড়তে থাকে। একজন তো নিরাশ হয়ে পলকেই জিজ্ঞেস করে বসল যে, সে স্যাং-এর বয়ফ্রেন্ড কি না। বাইরের লোকের মুখে শুধু এই সম্ভাবনাটুকুর কথা শুনেই সে চমকে উঠল। এই বাড়িতে এরকম ঘটনা আগেও একবার ঘটেছে, পলের এখানে আসার এক বছরের মধ্যেই দু'জন হাউজমেট প্রেমে পড়ে বিয়ে করার জন্য বাড়িটা ছেড়ে দেয়।

"না," স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল সে, "আমি শুধু ওর হাউজমেট।"

অবশ্য, এরপর বাকি দিনটা প্রশ্নটা তাকে ভারাক্রান্ত করে রইল। কেবলই মনে হচ্ছিল, ফোনে উত্তরটা দিয়েই যেন সে তার সীমা লঙ্ঘন করেছে। দিনকয়েক পর স্যাং-কে সে খবরটা দিয়েছিল। স্যাং হেসে বলেছিল, "আমি যে একটা ছেলের সঙ্গে থাকি, এটা জেনে ওই লোকটা সম্ভবত বেজায় ভয় পেয়েছে," উপদেশ দিল, "এরপর ফোন করলে হ্যাঁ বলে দিস।"

এক সপ্তাহ পর তিনজনই ছিল রান্নাঘরে! হিথার ফ্লাস্কে একিনাসিয়া চা ঢালছিল কারণ সর্দি বাধিয়ে বসেছে এবং সারাটা দিন ক্লাসেই কাটাতে হয়েছে তাকে। স্যাং ঝুঁকে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে কফি খাচ্ছিল। আগের রাতে সে অনেকক্ষণ বাথরুমে ছিল এবং এখন তার চুলের কোনও কোনও অংশে লাল আভা লক্ষ করা যাচ্ছিল। ফোনটা বেজে ওঠার পর পলের ধরেই মনে হল এ-ও আর-এক পাণিপ্রার্থী, কারণ অন্যান্যদের মতো এরও একটু বিদেশি অ্যাকসেন্ট আছে যদিও এর ক্ষেত্রে সেটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে না। শুধু একটাই যা তফাত হল, সংগীতাকে না চেয়ে সে স্যাং এর সঙ্গেই কথা বলতে

AMARBOI.COM

চাইল। কে বলছে, জানতে চাওয়ায় ওপাশ থেকে একটু অধৈর্য কণ্ঠে জবাব এল, "আমি ওর বয়ফ্রেন্ড।"

ডাক্তারি যন্ত্রের মতো শব্দগুলো যেন পলের বুকে ধাক্কা মারল। সে লক্ষ করল, স্যাং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, টেবিল থেকে চেয়ারটা একটু ঠেলে দিয়েছে।

"আমার?"

পল মাথা নাড়ল, স্যাং ফোনটা নিয়ে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

"বয়ফ্রেন্ড," পল হিথারকে জানিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

"নাম কী?"

পল কাঁধ ঝাঁকাল, "বলেনি।"

"ও তো তা হলে এখন দারুণ খুশি," হিথার ফ্লাস্কের ঢাকনা আটকাতে-আটকাতে একটু কাঠখোট্টাভাবেই জবাব দিল।

মোটাসোটা, লাল, চ্যাপটা নাকের হিথারের জন্য পলের একটু খারাপই লাগল, তবে তার চেয়েও বেশি ভাবল স্যাং-এর নিরাপত্তার কথা।

"কী বলতে চাইছিস?" সে জিজ্ঞেস করে হিথারকে।

"ওর বয়ফ্রেন্ড ফিরে এসেছে, সুতরাং অন্য ছেলেদের ও এখন পাত্তাই দেবে না।"

AMARBOI.COM

বয়ফ্রেন্ডটি স্যাং-এর সঙ্গে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল। পল বাইকে করে লাইব্রেরিতে ফোটোকপি করার কাজ সেরে ফিরে দেখতে পেল ওদের। বটল-গ্রিন রঙের একটা বিএমডব্লিউ দাঁড় করানো ছিল সামনে। বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই দু'জন দাঁড়িয়ে ছিল, কালো মাথা দুটি পরস্পরের দিকে হেলানো।

"পোশাক বদলানোর সময় জানলার কাছ থেকে সরে যেয়ো," পল ছেলেটির গলা শুনতে পেল, "পরদার ভিতর দিয়ে সব দেখতে পাওয়া যায়। পিছনদিকের কোনও ঘর নিতে পারোনি?"

পল ওদের থেকে একটু দূরে বাইক থেকে নেমে জামাকাপড় ঠিক করে নিল। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল তার, কারণ সে বুঝতে পারছিল তার পোশাকের কোনও ছিরিছাঁদ নেই— শর্টস, বার্কেনস্টকস আর একটা পুরনো ডার্টমাউথ টি-শার্ট, ফ্যাকাশে পা দুটো সাদাটে লোমে ঢাকা। অন্যদিকে বয়ফ্রেন্ডটির

পরনে নিখুঁত মাপের ফেডেড জিনস, সাদা শার্ট, নেভি ব্লু ব্লেজার আর ব্রাউন লেদার শু, তার কাটা কাটা চোখ মুখ প্রশংসার যোগ্য। তার লম্বা চুল মুখের চারপাশে অপ্রত্যাশিতভাবে সুন্দর ফ্রেমের মতো ছড়িয়ে আছে। পলের ছেলেটিকে স্যাং-এর চেয়ে বয়সে বড় বলে মনে হলেও বেশ কিছু ব্যাপারে তাদের মিলও লক্ষ করল সে। যেমন, দু'জনেরই সমান হাইট, সোনার মতো গায়ের রং, ঠোঁটের ওপর-নীচে একইভাবে ছড়ানো তিল। পল তাদের দিকে এগোনোর সময়ও স্যাং-এর বয়ফ্রেন্ড বাড়িটা খুঁটিয়ে দেখছিল, ইয়েলো ওকর রঙের ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যের খুঁত ধরতেই যেন! তারপর একটা কুকুরের ডাকে হঠাৎই চমকে উঠে মুখ ফেরাল সে।

"তোমার রুমমেট কুকুর পোষে নাকি?" বয়ফ্রেন্ডটি প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েই দুম করে নাচের ভঙ্গিতে বাঁ দিকে সরে খানিকটা স্যাং-এর পিছনে চলে গেল।

"না, হাঁদারাম," স্যাং একটু খোঁচা দিয়েই কথাটা বলে নিজের হাতটা ছেলেটার মাথার পিছন দিকে বুলিয়ে দিল, "কুকুর নেই, স্মোকার নেই। শুধু তোমার জন্যই আমিও এগুলো মেনে নিয়েছি।"

ঘেউ ঘেউ থেমে গিয়ে নেমে আসা নৈঃশব্দ্য যেন তার শব্দগুলো ভেদ করে চলে গেল। স্যাং-এর গলায় একটা নেকলেস, ল্যাপিসের পুঁতিগুলো সে এমনভাবে আঙুলে জড়াচ্ছে যে, পলের মনে হল এটা নির্ঘাত উপহার পেয়েছে। "পল, ও হল ফারুক। ফারুক কুকুর ভয় পায়," বলে সে ফারুকের গালে চুমু খেল।

"ফ্রিডি," ফারুক হাত বাড়ানোর বদলে মাথা নাড়ল, তবে পল বুঝতে পারল কথাটা পলের চেয়েও বেশি স্যাং-কে উদ্দেশ করে বলা হল।

স্যাং মাথা নাড়ল, "এই নিয়ে লক্ষবার বলেছি, আমি তোমায় ফ্রিডি বলে ডাকব না।"

ফারুক তার দিকে কটমট করে তাকাল, "কেন নয়? আর তুমি যে চাও, তোমায় সকলে স্যাং বলে ডাকুক?"

স্যাং বিচলিত হল না, "সেটা আলাদা। ওটা স্বাভাবিকভাবেই আমার নামের একটা অংশ।"

"আমি পল, আমায় কিন্তু এই একটা নামেই ডাকা যেতে পারে," পল বলে উঠল, কেউ অবশ্য হাসল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎই স্যাং-কে বাড়িতে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। যদিও বা থাকে, নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে, মাঝেমধ্যেই ফোন করে। ডিনারের সময়ও তার পাত্তা পাওয়া যায় না। রেফ্রিজারেটরের তাকে রাখা তার খাবারদাবার, ইয়োগার্টের বড় বাটি, বিস্কুট, টাবুলি সবই পড়ে থাকে যে-কে-সেই অবস্থায়। শেষে একদিন স্যাং ফ্রিজের দরজা খুলেই বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল কারণ ততদিনে ইয়োগার্টের ওপর একটা সবুজ রঙের স্তর পড়ে গিয়েছে। পল নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, পরস্পরের সঙ্গে একা থাকার ইচ্ছেটাই তো ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। একদিন পাড়ারই একটি মুদিদোকানে স্যাং-কে দেখে সে অবাক হয়ে গেল, কারণ তার বাস্কেট ভরতি গন্ধপেঁয়াজের থলি, পনির, চিজ়, কাগজে জড়ানো মাংস— এসব তো সে কখনও বাড়িতে নিয়ে যায় না। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল বলে পলের গাড়িতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল স্যাং-কে। কিন্তু স্যাং রাজি হল না। হার্ভার্ড বেসবলের একটা ক্যাপ পরেছিল সে এবং গ্রোসারি ব্যাগটাকে বুকের কাছে জাপটে ধরে ছিল। পলের কোনও ধারণাই ছিল না যে, ফারুক কোথায় থাকে। সে কল্পনা করেছিল, ফারুক হয়তো ব্র্যাটল স্ট্রিটের কোথাও একটা খুব সুন্দর বাড়িতে থাকে।

ফারুককে তাদের বাড়িতে দেখতে পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার এবং তার সঙ্গে দেখা হওয়া ও তার চলে যাওয়াও ঘটে যেত মুহূর্তের মধ্যে, কেউ প্রায় টেরই পেত না।

কিন্তু ফারুক বাড়িতে আছে কি না বলা অসম্ভব, কারণ সে হ্যালো বা গুডবাই জাতীয় কিছুই বলত না। মাঝে মাঝে পল জানলা দিয়ে বিএমডব্লিউ গাড়িটা ঠিক বার্চ গাছের নীচে রাখা দেখে বুঝত ফারুক বাড়িতে এসেছে। সে এমন ভাব করত, যেন স্যাং-ই এ বাড়ির একমাত্র অধিবাসী। ওরা কখনও বসার ঘরে বা কিচেনে বসত না। একবারই শুধু ওদের বাড়িতে দেখেছিল পল! সে তখন বাইকে করে এক চক্কর মেরে সদ্য ফিরেছে। বাইরে থেকে দেখল যে, ওরা বারান্দায় পায়ের ওপর পা তুলে বসে একসঙ্গে লাঞ্চ করছে। স্যাং ফর্কটা এগিয়ে দিচ্ছে ফারুকের মুখের কাছে, আর অন্য হাতে ফর্কের তলাটা আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু পল বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে, ওরা স্যাং-এর ঘরে ঢুকে গিয়েছে।

স্যাং যখন ফারুকের সঙ্গে থাকত না, তখনও ফারুকেরই কাজ করত সে। কখনও ছাপতে যাওয়ার আগে ফারুকের আর্টিকেলগুলোর প্রুফ দেখতে

AMARBOI.COM

ব্যস্ত থাকত, নয়তো ফারুকের জন্য ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করত। একবার তো সারা সকাল ধরে ইয়েলো পেজেস খুলে বসে থাকল, টাইলসের দাম দেখার জন্য! কেন? না, ফারুক তার কিচেনটা নতুন করে সাজানোর কথা ভাবছে।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে পল আবার তার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সাধারণত সোমবারগুলোতে, যেদিন স্যাং-এর বইয়ের দোকানের কাজ থেকে অফ থাকত, ফারুক লাঞ্চ করতে আসত। স্যাং-এর ঘরে বসেই খাওয়াদাওয়া করত তারা! পলের কানে আসত ওদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা, সুপবোলে চামচের শব্দ! অন্যদের তুলনায় তারা যে বেশ শান্ত, এটা বুঝতে পারত পল। বছরের পর বছর এই বাড়ির ওপরতলায় বসে অনেক কাপলকেই তো দেখেছে সে। কিন্তু তাদের দু'জনের উপস্থিতি খুব শিগগিরই তাকে সোমবারগুলোয় লাইব্রেরিতে যেতে বাধ্য করল। কারণ একদিন স্যাং-এর ঘরের আধখোলা দরজা দিয়ে সে দেখে ফেলেছিল, ফারুক নিজের জিপ আটকাচ্ছে। দৃশ্যটি দেখে যারপরনাই বিব্রত হয়েছিল পল। টেরেসা, এতদিন পর্যন্ত পলের একমাত্র গার্লফ্রেন্ড, তার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ভেঙে গিয়েছে, প্রায় বছরতিনেক হয়ে গেল। তারপর থেকে কারও সঙ্গে ডেটিং-এ যায়নি পল। বেশ কয়েকমাস সে সেন্ট বোটোল্ফ স্ট্রিটে টেরেসার অ্যাপার্টমেন্টে থেকেছিল। থ্যাঙ্কসগিভিং-এর সময় সে টেরেসার সঙ্গে ডিয়ারফিল্ডে তার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে যায় এবং সেখানেই তাদের সম্পর্কটা শেষ হয়ে যায়।

"সরি পল, আমার কিচ্ছু করার নেই। তোমার চুমু খাওয়ার ধরনটা আমার মোটেই পছন্দ নয়," পলের সঙ্গে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার সময় সোজাসুজি তাকে বলেছিল টেরেসা। পলের এখনও মনে আছে, একটা ম্যাট্রেসে নগ্ন অবস্থায় বসে ছিল সে, কোনও তর্ক করেনি। চরম লজ্জাকর সেই মুহূর্তের পর থেকেই সম্পর্কের ব্যাপারে বেশ উদাসীন হয়ে উঠেছিল সে, শুধু টেরেসা নয়, অন্য যে-কোনও মেয়ের সঙ্গেও!

একদিন বেশ রাত করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ার সময় পল গাড়ির আওয়াজ পেল। ওর ডেস্কের ঘড়িটায় তখন দুটো বেজে কুড়ি মিনিট। ল্যাম্পটা বন্ধ করে জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করল সে। নভেম্বরের রাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে বিস্তৃত নির্জন রাস্তা, ইতিউতি কিছু আবর্জনা ছড়িয়ে আছে সেখানে। বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল, যদিও তার ইঞ্জিনটা তখনও চলছে। স্যাং একাই নামল ট্যাক্সি থেকে, নেমে প্রায় এক মিনিট মতো সাইডে দাঁড়িয়ে থাকল সে। যতক্ষণ না স্যাং পর্চ বেয়ে উঠল এবং তারপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল, ততক্ষণ পর্যন্ত জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল পল। ফারুক বিকেলে ওকে তুলে নিয়েছিল, পল দেখেছিল যে, স্যাং গাড়িতে উঠেছে। পলের মনে হয়েছিল যে, ওদের মধ্যে হয়তো ঝগড়া হয়েছে। যদিও পরদিন স্যাং-এর হাবভাব দেখে সেরকমটা মোটেই মনে হল না তার। তাকে সে যথারীতি ফারুকের সঙ্গে বেশ ভাল মুডেই ফোনে কথা বলতে শুনল, আলোচনা করছিল একটা ভিডিও ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু সেই রাতেও প্রায় একই সময় একই ঘটনা ঘটল। তৃতীয় দিন রাতেও পল জেগে রইল স্যাং না ফেরা পর্যন্ত।

পরদিন ছিল রবিবার। সকালে পল, হিথার আর স্যাং তিনজনে মিলে কিচেনে প্যানকেক বানাচ্ছিল। পল যখন লোহার কড়াইয়ে প্যানকেকগুলো ফ্রাই করছিল, স্যাং ঘরে গিয়ে তার সিডিপ্লেয়ারে লুই আর্মস্ট্রং চালাল।

"কেভিন আজ রাতে এখানে থাকবে," হিথার বলল, "মনে হয় কোনও অসুবিধে হবে না।"

কেভিনের সঙ্গে সদ্য পরিচয় হয়েছে হিথারের, সে এম আইটি-র একজন ফিজিসিস্ট।

"না, অসুবিধের কী আছে," পল আশ্বস্ত করল তাকে। কেভিনকে তার বেশ পছন্দ। সে বেশ কিছুদিন ধরেই এখানে ডিনারে আসছে। আসার সময় বিয়ার-টিয়ার নিয়ে আসে, খাবারদাবারের ব্যাপারেও খুব সাহায্য করে। এমনকী, পলের সঙ্গেও প্রায় ততক্ষণই কথা বলে, যতক্ষণ সে বলে হিথারের সঙ্গে।

"ইস আমার খুব খারাপ লাগছে, কেভিনের সঙ্গে আমার দেখাই হচ্ছে না। মনে হয়, ও সত্যিই খুব ভাল," বলল স্যাং।

"দেখা যাক," হিথার বলল, "সামনের সপ্তাহে আমাদের রিলেশনের একমাস হবে।"

স্যাং হাসল, একটা অর্থপূর্ণ হাসি। তারপর যথাসম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, "কনগ্র্যাচুলেশনস।"

AMARBOI.COM

ফিঙ্গার ক্রস করে হিথার বলল, "তোর সময় হলেই যেন আমরা একসঙ্গে একটা উইক এন্ড কাটাতে পারি।"

পল একঝলক দেখল স্যাং কে। কিন্তু না বলেই উঠে পড়ল স্যাং আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এল একঝুড়ি কাচার জামাকাপড় নিয়ে।

"জিকিগুলো ভাল দেখতে," পোশাকের স্তূপের ওপর কয়েকটা ভাঁজ করা অবস্থায় দেখে মন্তব্য করল হিথার।

"ওগুলো ফারুকের," স্যাং বলল।

"ওর কি ওয়াশিং মেশিন নেই?" জানতে চাইল হিথার।

"আছে," হিথারের আপত্তিসূচক প্রশ্নের উত্তরে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বলল সে, "কিন্তু খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

থ্যাঙ্কসগিভিং-এর সময় থেকেই ওদের ঝগড়া শুরু হল। পল শুনতে পেল স্যাং ফোনটা তার ঘরে নিয়ে গিয়ে কান্নাকাটি করছে। ছাইরঙা ফোনের তারটা ল্যান্ডিং পেরিয়ে স্যাং-এর ঘরে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। একবার ঝগড়া হল পার্টিতে যাওয়া নিয়ে, যেখানে স্যাং-এর যাওয়ার কথা ছিল, অথচ ফারুক যেতে চায়নি। ফারুকের জন্মদিনেও ঝগড়া হল আর-একবার। স্যাং সেদিন সারাটা দিন ধরে কেক তৈরি করছিল এবং সারা বাড়ি ভরে গিয়েছিল কমলালেবু আর আমন্ডের গন্ধে। অনেক রাত পর্যন্ত কিচেনে ইলেকট্রিক বিটার চলার শব্দ শুনতে পেয়েছিল পল। কিন্তু পরদিন বিকেলেই সে দেখল, কেকটা ট্র্যাশ বিনে পড়ে রয়েছে।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে সে দেখল, ফারুকের বিএমডব্লিউ পার্ক করা আছে বাইরে। সেদিন ডিসেম্বরের কনকনে ঠান্ডায় বেশ কষ্ট হচ্ছে, সিজনের প্রথম বরফ পড়েছে। স্যাং-এর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সে শুনতে পেল, স্যাং দোষারোপ করেই চলেছে, কেন ফারুক তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে চায় না! কেন সে থ্যাঙ্কস গিভিং-এর সময় তার কাজিনের বাড়িতে স্যাং-কে নিমন্ত্রণ করেনি। কেনই বা তারা সারারাত একসঙ্গে কাটাল না, অন্তত ফারুক তো তাকে বাড়িতে গাড়ি করে পৌঁছে দিতে পারত।

"আমি তো গাড়িভাড়া দিয়ে দিয়েছি।" ফারুক বলল, "তোমার কী তফাত হয় তাতে?

"আমার খারাপ লেগেছে ফারুক, এটা অস্বাভাবিক!"

AMARBOI.COM

"তুমি তো জানো যে, তুমি ওখানে থাকলে রাতে আমার ঘুম হয় না।"

"আমরা কি কোনওদিন বিয়ে করব না?" প্রশ্ন করল স্যাং, "চিরটাকাল কি আমরা আলাদা বাড়িতেই থাকব?"

"স্যাং প্লিজ," ফারুক বলল, "আস্তে কথা বলো। তোমার রুমমেটেরা শুনতে পাবে।"

"তুমি কি আমার রুমমেটদের নিয়ে কথা বলা বন্ধ করবে?" চেঁচিয়ে উঠল স্যাং।

"তুমি হিস্টিরিক্যাল," ফারুক বলল।

কাঁদতে শুরু করল স্যাং।

অনমনীয় ভঙ্গিতে ফারুক তাকে বলল, "দেখো, আমি তোমায় আবারও বলছি স্যাং, কথায় কথায় যারা সিন ক্রিয়েট করে, সেসব মেয়ের সঙ্গে আমি আমার জীবন কাটাতে পারব না।"

"চুলোয় যাও।"

একটা প্লেট বা গ্লাস দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যাওয়ার শব্দ হল। তারপর হঠাৎই শান্ত হয়ে গেল পুরো ঘরটা। অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে দরজায় আস্তে করে টোকা দিল পল, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে পল যখন তড়িঘড়ি স্যাং-এর ঘরের দিকে এগোল, দেখল যে, স্যাং বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোচ্ছে, গায়ে একটা লম্বা গোলাপি তোয়ালে জড়ানো, এলোমেলো না আঁচড়ানো চুলগুলো কোনওরকমে বাঁধা, মাথার ওপর যেন একটা ছোট্ট পাখির বাসা। কতদিন পল এরকমভাবে স্যাং-কে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার খোলা হাত-পা, সিক্ত মুখ-কাঁধ দেখে বেশ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেল সে, এখনই এমন একটা দৃশ্যের জন্য একেবারেই তৈরি ছিল না।

"হাই," বলে স্যাং-কে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল সে।

"পল," স্যাং তাকে ডাকল। পল ফিরে তাকাল তার দিকে। তখন প্রায় চারটে বেজে গিয়েছে। অস্তগামী সূর্যের সোনালি আভা বসার ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকে স্যাং-এর মুখের এক পাশ আলোকিত করেছে।

পল জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

সে হাতদুটো সামনে আড়াআড়ি করে রেখে কাঁধটা ঢাকার চেষ্টা করল।

AMARBOI.COM

তার কপালের ওপর কীসের যেন একটা দাগ, বোধহয় টুথপেস্টেরই হবে। বলল, "একটু আগের ঘটনাটার জন্য সরি।"

"ঠিক আছে।"

"না ঠিক নেই, তোর পরীক্ষার পড়া আছে না!"

স্যাং এর চোখদুটো চিকচিক করছিল, মুখে একটা অদ্ভুত হাসি যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। ঠোঁটদুটো অল্প ফাঁক করল সে। প্রত্যুত্তরে পল সামান্য হাসিমুখ করতেই স্যাং কান্নার উপক্রম করল। মাথা নেড়ে পল বলল, "আরে, সত্যিই কিছু হয়নি রে, ঠিক আছে!"

প্রায় এক সপ্তাহ ফারুক কোনও ফোন করল না। যদিও প্রতিবার ফোন বাজার শব্দ শোনামাত্রই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফোন ধরছিল স্যাং। সে লন্ডনে তার দিদির সঙ্গে প্রায়ই ফোনে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলত। পল কিচেন থেকে শুনতেও পেত, কিছু কিছু কথা। যেমন, সে শুনত স্যাং বলছে, "আচ্ছা, তুই বল তো, এ ধরনের কথা কেউ বলে! একবার আমি আর ফারুক একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম, ও আমাকে বলল, আমার গা দিয়ে নাকি ঘামের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আমার আন্ডারআর্ম পরিষ্কার করা দরকার। অবশ্য বারবার এটাও বলছিল যে, এটা মোটেও সমালোচনা নয়। দু'জনের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক থাকলে এমন কথা নাকি বলাই যায়।"

এর মধ্যে চার্লস একদিন সন্ধেবেলা স্যাং-কে নিয়ে বেরোল। কিটারি থেকে একগাদা শপিং করে ফিরল সে। আর-একদিন স্যাং রাজি হল পল, কেভিন ও হিথারের সঙ্গে কুলিজে গিয়ে একটা মুভি দেখার জন্য। কিন্তু হলে পৌঁছেই সে বলল যে তার ভীষণ মাথা ধরেছে, বাড়ি ফিরতে চায়। সিটে গুছিয়ে বসতে বসতে হিথার বলল, "আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে, ওদের ব্রেকআপ হয়ে গিয়েছে।"

কিন্তু তার পরের সপ্তাহেই ফোন করল ফারুক। স্যাং তখন কাজে বেরিয়েছিল। যদিও ফারুক নিজের নামটাই বলার প্রয়োজন মনে করেনি, পল কিন্তু বইয়ের দোকানে ফোন করে স্যাং-কে খবরটা জানিয়ে দিল।

সম্পর্কটা আবার শুরু হয়ে গেল নিজস্ব গতিতে। ফারুক এই বাড়িতে আর ঢোকে না, এমনকী, বেলটা পর্যন্ত বাজায় না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ির ইঞ্জিন

AMARBOI.COM

চালু রেখে বারতিনেক হর্ন বাজায়, সে যে বাইরে অপেক্ষা করছে, এটা তার সিগন্যাল। আর তারপরই অদৃশ্য হয়ে যায় স্যাং।

শীতের ছুটিতে লন্ডন চলে গেল স্যাং। তার দিদির সদ্য ছেলে হয়েছে। সে পলকে দেখিয়েছিল বাচ্চাটার জন্য সে কতকিছু কিনেছে, কয়েকটা প্লে সুট, একটা স্টাফড অক্টোপাস, ফরাসি ডিজাইনারের শার্ট এবং অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে ওঠা, গ্রহ-তারা ভরা একটা চলমান খেলনা।

"আমি এখন স্যাং মাসি হয়েছি," পলকে খুব উৎসাহভরে বলল সে। বুঝিয়ে দিল যে, Aunt-কে বাংলায় মাসি বলে। শব্দটা স্যাং-এর মুখে শুনতে বেশ অদ্ভুত লেগেছিল পলের। স্যাং বাংলায় কথা প্রায় বলে না বললেই চলে। তার দিদির সঙ্গে নয়, তার পিছনে লেগে থাকা ছেলেদের সঙ্গে তো নয়ই। শুধু উইক-এন্ডে মিশিগানে বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলার সময়ই তার মুখে একটু-আধটু বাংলা শব্দ শোনা যায়।

পল জিজ্ঞেস করল, "হ্যাপি জার্নিকে বাংলায় কী বলে?"

স্যাং বলল যে, সে ঠিক জানে না।

স্যাং না থাকলে পলের পড়াশোনার কাজটা একটু সহজ হয়ে যায়, কারণ ওর মনটা অনেক ফাঁকা আর নিশ্চিন্ত থাকে সেসময়। পরীক্ষার আর ছ'মাসও বাকি নেই, সময় এবং তারিখও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মে মাসের প্রথম মঙ্গলবার, বেলা দশটার সময়। ডেস্কের ক্যালেন্ডারে ক্রস চিহ্ন দিয়ে দাগিয়েও রেখেছে। সামার পর্যন্ত নিজের মতো করে পড়াশোনা করল সে। কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, নাটকের সারাংশ এক এক করে লিখে রাখতে লাগল তার কম্পিউটারে। তারপর প্রিন্টআউটগুলো নিয়ে একসঙ্গে পাঞ্চ করে সেগুলো বাঁধাল। সারাংশগুলো আরও সংক্ষিপ্ত করে ইন্ডেক্স কার্ডে লিখে সেগুলো একটা জুতোর বাক্সে সাজিয়ে রেখে দিল, যাতে রোজ শুতে যাওয়ার আগে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিতে পারে। প্রতি বছরের মতো এবারও বাফেলোতে পিসির বাড়িতে তার বড়দিনের নেমন্তন্ন ছিল। কিন্তু পরীক্ষার অজুহাতে সেটা নাকচ করে গিফ্‌ট পাঠিয়ে দিল পল। হিথারও ছিল না সেসময়। কেভিনের সঙ্গে সে ভারমোন্টে গিয়েছিল স্কিয়িং করতে!

নতুন বছরের শুরুতেই পল একটা নতুন নিয়মে সারাবাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়াশোনা করল। সকালে কিচেন টেবিলে বসে কবিতা রিভিউ পড়া,

AMARBOI.COM

লাঞ্চের পর লিভিংরুমে সমালোচনা পড়া, ঘুমোতে যাওয়ার আগে শেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে বসা। সে তার জিনিসপত্র ফেলে ছড়িয়ে রাখতে শুরু করল সারা বাড়ি জুড়ে, জুতোর বাক্স এবং বইপত্র কিচেন টেবিলে বা সিঁড়ির ধাপে, কিছু বা লিভিং রুমের কফি টেবিলে। শীতের বরফঢাকা বিকেলগুলোতে সে একটা পুরনো আমলের চেয়ারে বসে পড়ত অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সের নোট। ঠিক সেই সময়ই একদিন ডোরবেল বাজল।

একজন কুরিয়ার সার্ভিসের লোক এসেছিল স্যাং-এর জন্য একটি প্যাকেজ নিয়ে। J. Crew বলে একজন কিছু পাঠিয়েছিলেন। পল সই করে ওটা নিয়ে ওপরে চলে গেল। স্যাং-এর ঘরের দরজা ঘেঁষে প্যাকেটটা দাঁড় করিয়ে রাখল পল। যার ফলে দরজাটা অল্প একটু খুলে গেল। সে দরজাটাকে শক্ত করে বন্ধ করল। মুহূর্তের জন্য সে দাঁড়িয়ে রইল, তার হাত দরজার নবে। যদিও স্যাং এখন লন্ডনে রয়েছে, ঘরে ঢোকার আগে অভ্যেসবশত পল একবার নক করল। ঘরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে একটা গদি পাতা, সেটা লাল একটা বাটিকের চাদর দিয়ে ঢাকা। সবুজ দেওয়ালে দুটো ফ্রেমে বাঁধানো ভারতীয় মিনিয়েচার ছাড়া দেওয়াল প্রায় ফাঁকাই বলা চলে। ছবি দুটোতে প্রাসাদ-দৃশ্য রয়েছে। একটাতে কিছু লোক অলসভাবে শুয়ে হুঁকা দিয়ে ধূমপান করছে এবং খেলছে, অন্যটিতে কয়েকজন মেয়ে বৃত্তাকারে নাচছে। ঘরটা সে যেমন অগোছালো হবে ভেবেছিল সেরকম মোটেই নয়। ওকে বাধা দেওয়ার মতো তখন কেউ ছিল না। জানলা দিয়ে বাইরে ঝড়ের পূর্বাভাস টের পাওয়া যাচ্ছিল। এলোমেলোভাবে বরফ পড়তে লাগল, নীচে খয়েরি পর্চের রেলিঙের ওপর যেন কেউ সুন্দর পরিষ্কার করে রেখা এঁকে দিচ্ছে। সাদা পাতলা পরদা একটা পিচ রঙের সিল্কের স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা, যেটা স্যাং প্রায়ই গলায় পরে, দেখতে অনেকটা আওয়ারগ্লাসের মতো লাগত। পল স্কার্ফটাকে সরিয়ে পরদা দিয়ে জানলাটা ঢেকে দিল। কাছে নিয়ে গন্ধ না শুঁকলেও স্কার্ফের পারফিউমের গন্ধ লাগল তার নাকে এসে লাগল। সে ওটমিল রঙের কার্পেটের ওপর পা ছড়িয়ে বিছানায় বসে পড়ল। জুতো মোজা খুলে ফেলল। গদির ঠিক পাশেই একটা ওয়াইন ক্রেটের ওপর, ফেনাওয়ালা জলের গ্লাস আর একটা ছোট্ট ভেসলিন পট। সে ক্রেটের বাকলটা আলগা করল কিন্তু ঠিক তখনই তার মনে পড়ে

AMARBOI.COM

গেল স্যাং-এর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে এতটা সময় কাটানো মোটেও ঠিক হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে বেল্টটা ঠিক করে নিল সে, আস্তে আস্তে উঠে পড়ল সেখান থেকে। আর তখনই খেয়াল করল বিছানার ওপর পাতা বেডকভারটা তুলে দেখল ফ্লানেলের বেডশিটটা নীল এবং সাদার কম্বিনেশনে, অনেকটা ফ্লর দ্য লি-এর প্যাটার্নে তৈরি।

পল ঘুম থেকে চমকে উঠল ফোন বাজার শব্দে। সে খালি পায়েই স্যাং-এর ঘর থেকে বেরিয়ে কিচেনের কাছে এসে ফোন ধরে বলল, "হ্যালো।"

অন্যদিক থেকে কোনও উত্তর এল না। ঠিক যখন ফোনটা রাখতে যাবে, তখনই কুকুরের ডাক শুনতে পেল সে।

"হ্যালো?" আবারও বলল পল। তার মনে হল ফোনটা স্যাং-এর হতে পারে। হয়তো লন্ডন থেকে ফোন করার ফলে শুনতে কোনও সমস্যা হচ্ছে। সে বলল, "স্যাং বলছিস?"

সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা রেখে দিল অপর প্রান্তের ব্যক্তি।

সেদিন সন্ধেতেই রাতের খাওয়ার সময় আবার বেজে উঠল ফোন। পল ফোন ধরেই সেই একই কুকুরের ডাক শুনতে পেল। "বালথাজার, চুপ!" একটি মেয়ে বলল। পল হ্যালো বলতেই ও প্রান্ত থেকে মেয়েটি দ্বিধান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করল স্যাং আছে কি না। "স্যাং এখানে নেই। ওকে কি কিছু বলতে হবে?"

মেয়েটি তার নাম ও ফোন নম্বর বলল পলকে। তার নাম ডেইড্র ফ্রেন। পল লিখে রাখল মেসেজ প্যাডে। তার ঠিক ওপরেই ছিল পার্থ মজুমদারের নাম। সে-ও স্যাং-এর একজন অনুরাগী। সকালবেলা ফোন করেছিল ক্লিভল্যান্ড থেকে।

পরদিন আবার ডেইড্র ফোন করল এবং পল আবার বলল যে স্যাং এই মুহূর্তে এখানে নেই। উইকএন্ডের আগে সে ফিরবে না। ডেইড্র জিজ্ঞেস করল, "স্যাং কোথায়?"

"ও এখন দেশের বাইরে।"

"কায়রোতে?"

পল খুব অবাক হয়ে বলল, "না লন্ডনে।"

"ও লন্ডনে", মেয়েটি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর আবার বলল, "লন্ডনে না? আচ্ছা, ঠিক আছে।"

AMARBOI.COM

চার নম্বর ফোনটা এল বেশ রাত করে। পল ততক্ষণে শুতে চলে গিয়েছে। সে অন্ধকারে ফোনের শব্দ শুনে নীচে নামল।

"ডেইজ্ব বলছি", ওর গলা শুনে মনে হল হাঁপাচ্ছে। যেন পল নয়, ও-ই ছুটে এসে ফোনটা রিসিভ করেছে। চশমা খুলে চোখ-টোখ মুছে নিয়ে কোনওরকমে লাইট জ্বালানোর জন্য সুইচ টিপল পল। বলল, "আমি তো বললাম, স্যাং এখনও ফেরেনি।"

"আমি স্যাং-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই না," তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল এবং স্যাং এর নামটা একটু জোর দিয়ে বাঁকাভাবে উচ্চারণ করল সে।

পল শুনতে পেল হালকা একটা ট্রাম্পেটের সুরের রেশ। সে বলল, "কথা বলতে চাও না?"

"না", মেয়েটি উত্তর দিল, "আসলে আমার একটা প্রশ্ন আছে?"

"প্রশ্ন?"

"হ্যাঁ," কিছুক্ষণ নীরবতার পর গ্লাসে একটা আইসকিউব ফেলার শব্দ পেল পল। মেয়েটি তরল গলায় বলল, "তা, তোমার নাম কী?"

পল চশমাটা চোখ থেকে খুলতে ঘরটা একটু ঝাপসা হয়ে গেল। সে মনেই করতে পারল না শেষ কবে কোনও মেয়ে তার সঙ্গে এইভাবে কথা বলেছে। উত্তর দিল, "পল।"

"পল, তোমায় একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"কী?"

"প্রশ্নটা স্যাং সম্পর্কে।"

হঠাৎই শরীরটা যেন শক্ত হয়ে গেল পলের। স্যাং-এর নামটা আবারও কেমন যেন নিষ্ঠুরভাবে উচ্চারণ করল মেয়েটি। পল বলল, "কী ব্যাপারে?"

ডেইজ্ব একটু সময় নিল। তারপর বলল, "ও তো তোমার হাউজমেট। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা মানে, আমি জানতে চাইছিলাম, তুমি যদি আমায় বলো... ওরা কি কাজিন?"

"কারা?"

"স্যাং আর ফ্রিডি।"

চশমাটা এবার পরল পল। এবার চারপাশটাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে

AMARBOI.COM

সে। এই মেয়েটার কৌতূহলের চোটে সে আশ্চর্য হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে ওর মাথা ঘামানোর তো কোনও দরকার নেই। পল বেশ কড়াভাবে কথাটা বলতে চাইল ডেইড্রকে। কিন্তু বলার আগেই বুঝতে পারল ও প্রান্তে ড্রেইড্র কাঁদতে শুরু করেছে।

পল স্টোভের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে তাকাল, প্রায় তিনটে বাজে। এটা তার নিজেরই দোষ। কোনও দরকার ছিল না এত রাতে ফোনটা ধরার। ইস, মেয়েটাকে নামটা না বললেই ভাল হত!

"ডেইড্র", ওর ফোঁপানো শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি লাইনে আছ?"

কান্না বন্ধ করল ডেইড্র। তার অসংলগ্ন নিশ্বাস যেন পলের কানে ধাক্কা দিচ্ছিল। পল বলল, "আমি জানি না তুমি কে? আর আমি এও বুঝতে পারছি না, তুমি আমাকে ফোন করছ কেন?"

"আমি ফারুককে ভালবাসি।"

তক্ষুনি ফোনটা রেখে দিল পল। তার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পেটানোর মতো শব্দ হচ্ছে। মনে হল, এখনই একবার স্নান করলে ভাল হয়। একবার ভাবল, নামটা প্যাড থেকে মুছে দেবে কি না! স্যাং-এর সেই সবুজ গোলাপি আঙুলের ছাপ এখনও এখানে ওখানে লেগে আছে। শীতের ছুটি শুরু হওয়ায় এই প্রথম সারা বাড়িতে ভীষণ একা মনে হতে লাগল পলের। নিশ্চয়ই এই ফোনটা কাকতালীয় ছিল। ডেইড্র হয়তো অন্য কোনও স্যাং-এর কথা বলছিল। তা ছাড়া স্যাং-এর কাছ থেকে ফারুককে সরানোর জন্য এটা তার অন্যান্য ভারতীয় প্রেমিকদের একটা চালও তো হতে পারে! স্যাং আর ফারুকের মধ্যে ঝগড়া হলেও পলের ধারণা, তাদের সম্পর্কটা ঠিকঠাকই আছে। সেদিনই তো বসার ঘরে স্যাং একটা বাদামি চামড়ার ব্যাগ আর একজোড়া ড্রাইভিং গ্লাভস প্যাক করছিল। লন্ডন যাওয়ার আগের রাতে স্যাং তার আর ফারুকের জন্য 'বিবা'-য় ডিনারের রিজার্ভেশন করেছিল। ফারুকই তাকে ড্রাইভ করে এয়ারপোর্টে নিয়ে যায়।

ফোনের রিং-এর শব্দেই পরদিন ঘুম থেকে উঠল পল। কিন্তু সে শব্দটা শুনতে শুনতে বিছানাতেই শুয়ে থাকল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, বাইরের ন্যাড়া গাছের ডালগুলো। সে গুনে দেখল ঠিক বারোটা রিং করেই

AMARBOI.COM

ফোনটা থেমে গেল। আবার আধঘণ্টা পরে ফোনটা বেজে উঠল এবং যথারীতি সেটা উপেক্ষা করল পল। তৃতীয়বার বাজার সময় সে কিচেনে ছিল এবং শব্দ থামতেই সে ফোনের প্লাগ খুলে রেখে দিল।

যদিও সে বাকি দিনটা নির্বিঘ্নেই পড়াশোনা করল, কিন্তু মনে একটা অস্বস্তি রয়েই গেল। সন্ধেবেলা কিচেনে থানইটের মতো স্পেনসারের বই নিয়ে সে বসেছিল বটে, কিন্তু একেবারেই মন দিতে পারছিল না। ফুটনোটগুলো দেখে বিরক্ত লাগল তার। এখনও কত পড়া বাকি! সে ভাবছিল, এর মধ্যে ডেইড্র কতবার তাকে ফোন করার চেষ্টা করেছে? না পেয়ে পেয়ে শেষপর্যন্ত কি হাল ছেড়ে দিয়েছে? ফোনটা যেন একটা অবসেশনের মতো হয়ে গিয়েছে তার কাছে। ও ভাবল, ডেইড্র আবার আত্মহত্যা টাত্যহত্যা করে বসবে না তো। ও কি ওই ধরনের মেয়ে?

রাতে খাওয়ার পর ফোনের প্লাগটা আবার গুঁজে দিল সে। যদিও আর কোনও ফোন আসেনি তারপর থেকে, কিন্তু পলের মনের মধ্যে ওই কথাটাই ঘুরতে লাগল। ওর ইনটিউশন বলছিল যে, ডেইড্র আবার ফোন করবে। কেন জানি না ওর মনে হচ্ছিল, ডেইড্র ওকে কিছু বলতে চায় এবং স্যাং ফিরে আসবে, এটা বলে দিয়ে সে একটা ভুল করে ফেলেছে। এরপর হয়তো ডেইড্র কথাটা সরাসরি স্যাং-কেই বলতে চাইবে! সম্ভবত স্যাংকেও ডেইড্র ওই একই কথা বলবে, যা সে পলকে বলছে। হয়তো জানাবে যে, ফারুককে সে ভালবাসে। শুতে যাওয়ার আগে একটা ড্রিঙ্ক নিল পল, এই ওয়াইনটা বাফেলো থেকে ওর এক পিসি পাঠিয়েছেন ওকে। তারপর সে ডেইড্রর দেওয়া নম্বরে ডায়াল করল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোনটা ধরল সে।

"ডেইড্র, পল বলছি।"

"পল!" আস্তে করে বলল ডেইড্র।

"তুমি কাল আমায় ফোন করেছিলে, আমি স্যাং-এর হাউজমেট।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, পল। তুমি আমার ফোনটা কেটে দিয়েছিলে," পলের মনে হল সে এখনও ড্রিঙ্ক করছে। কিন্তু তার মুড কালকের চেয়ে অনেক ভাল।

"কালকের ব্যাপারটার জন্য সরি। আমি চাইছিলাম তুমি একটু সুস্থ হলে তারপর কথা হবে।"

ডেইড্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "ভালই করেছ।"

AMARBOI.COM

"আমি তোমাকে আমায় আর ফোন করতে বারণ করেছিলাম," একটু থেমে বলল পল।

"কেন?" ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল ডেইড্র।

"কারণ আমি তোমাকে চিনি না, জানিও না।"

"তুমি কি আমাকে চিনতে চাও?" ডেইড্র বলল, "আমি কিন্তু সত্যিই পছন্দ করার মতোই মেয়ে।"

"আমার হাতে বেশি সময় নেই", আবেগহীন স্বরে বলল পল। "কিন্তু আমার মনে হয় হয়তো কেউ আছে হয়তো যার সঙ্গে কথা বললে তোমার ভাল লাগে, অন্য কোনও বন্ধু!"

"ফ্রিডি, আমার বন্ধু।"

ফারুকের উল্লেখ, ডেইড্রর মুখে ওর ডাকনাম, পলকে অস্বস্তিতে ফেলল, ঠিক কাল যেমন হচ্ছিল। গতকাল ও ভেবে নিয়েছিল যে ডেইড্র হয়তো হার্ভার্ডে ফারুকের একজন ছাত্রী, টিনএজার মেয়ে, তার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় প্রোফেসরের প্রতি আকৃষ্ট। চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল কয়েকটি ছবি। যেমন, লেকচার হলে পিছনের দিকে চুপটি করে বসে আছে ডেইড্র, অফিসরুমে গিয়ে ফারুকের সঙ্গে দেখা করছে এবং নিজের মনে অনেক কিছু কল্পনা করে নিচ্ছে। কিন্তু এখন পলের মাথায় একটা যুক্তিসংগত অথচ বিপজ্জনক প্রশ্ন এল, "কী করে তুমি ফারুককে চিনলে?" পল হালকাভাবে জিজ্ঞেস করল ডেইড্রকে, যেন কোনও একটা পার্টিতে আড্ডা মারছে তারা।

পল ভাবতে পারেনি ডেইড্র ওকে বলবে। ভেবেছিল, সে হয়তো ফোন রেখে দেবে, যেমন পল কাল করেছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু ডেইড্র সেরকম কিছুই করল না। বরং খুব আগ্রহ নিয়েই মন খুলে কথা বলছিল। সে পলকে বলছিল, আসলে সে ভ্যাঙ্কুভারের মেয়ে। বছর কুড়ি বয়সে ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং নিয়ে পড়াশোনা করতে বস্টনে চলে আসে। এক রবিবারের বিকেলে ফারুকের সঙ্গে তার দেখা হয়, প্রায় বছরখানেক কি বছর দেড়েক আগে। সে তখন সাউথ এন্ড ক্যাফেতে যাচ্ছিল, ফারুক তাকে অনুসরণ করছিল। অর্ধেক পথ পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ ওর কাঁধে হাত রেখেছিল ফারুক। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার মনের ইচ্ছে গোপন থাকেনি। কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ডেইড্র বারবার বলছিল যে, "তুমি ভাবতে পারবে না, কী অসম্ভব ভাল লেগেছিল আমার!" ফারুক ওর সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার

AMARBOI.COM

করেছিল। এবং তাদের ফার্স্ট ডেটে তারা ওয়ালডেন পন্ডে গিয়েছিল। পরে তারা কর্ন আর টম্যাটো এবং গ্রিলড স্যালমন কিনে ডেইজির বাড়ির পেছনের উঠোনে ঝলসেছিল। তার বাড়িটা খুবই পছন্দ ছিল ফারুকের, পাঁচ-একর জমির ওপর একটা পুরনো ফার্মহাউজ। ফারুক তাকে বলেছিল তার কিচেনটা নতুন করে সাজানোর জন্য একটা প্ল্যান বানাতে। লেবার ডে-তে তারা একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল মাউন্ট সুনাপিতে। সে আরও অনেক কথা বলেছিল পলকে। পল চুপচাপ শুনছিল আর ভাবছিল, এর কতটা বিশ্বাস করা উচিত। ফারুক আর ডেইজ্র সত্যিই জমিয়ে প্রেম করছে নাকি এগুলো সবই তার আকাশকুসুম কল্পনা। অনেকদিন একা থেকে থেকে গল্প বানানোটা হয়তো ওর অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, মাতাল লোকেরা ঠিক যেমনটা করে থাকে। ভাবতে ভাবতে ফোন কানে নিয়ে হাঁটতে লাগল পল এবং স্যাং-এর ঘরটা খুলে নিশ্চিত হয়ে গেল যে, পরদাগুলো সত্যিই আটকানো রয়েছে যেমন সে মনে করছিল।

"তুমি কী ভাবছ?" হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করল ডেইজ্র।

"আমি কী ভাবছি মানে?"

"মানে, আমি তো একাই কথা বলে যাচ্ছি। তুমি তো কোনও কথাই বলছ না। আচ্ছা পল, তুমি কি সুখী?"

পলের মনে হল, তার মূল্যবান সময়ের ঝাড়া একটি ঘণ্টা সে এই মহিলার পিছনে ব্যয় করেছে। এতক্ষণ ধরে কানের কাছে ফোন চেপে ধরে রাখায় তার কান রীতিমতো ব্যথা করছে। সে বলল, "আমার কথা হচ্ছে না।" স্যাং এর ঘরের দরজা বন্ধ করে তারপর ঢোক গিলে বলল, "শুধু স্যাং-এর কথা ভাবছি।"

"ওরা তো কাজিন, তাই না?" ডেইজ্রর গলাটা শুকনো লাগল পলের। যেভাবে সরাসরি প্রশ্নটা তাকেই করল ডেইজ্র, তাতে পলে মনে হল, অপ্রিয় সত্যি কথাটা জানাতেই হবে তাকে। পল বুঝতে পারছিল ডেইজ্র তাকে সব সত্যি কথাই বলেছে। ওর মনে হল, কোথাও যেন একটা বিশাল ভুল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমন পরীক্ষার সময় হয়, যেমন টেরেসার বেলাতেও হয়েছিল।

"স্যাং আর ফারুক মোটেও কাজিন নয়," ডেইজ্র ভীষণ ভেঙে পড়বে জেনেও ভিতর থেকে কে যেন পলকে দিয়ে কথাটা বলিয়ে নিল।

একেবারে চুপ হয়ে গেল ডেইজ্র।

AMARBOI.COM

পল আবারও বলল, "ওদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে, ওরা সিরিয়াস।"

"তাই নাকি?" বাঁকাভাবে বলল ডেইড্র। "তা কতটা সিরিয়াস?"

একটু ভেবে নিয়ে পল বলল, "সপ্তাহে চার-পাঁচদিন ওরা দেখা করে।"

"সত্যিই তাই?" এবারে রীতিমতো বিধ্বস্তভাবে বলল ডেইড্র, পল যেন ঠিক এটাই আশা করেছিল।

"হ্যাঁ", পল বলল, "ওদের সম্পর্কটা তিন বছরেরও বেশি।"

"তিন বছর?" ডেইড্রর গলা শুনে পলের মনে হল ও বুঝি এখনই কেঁদে ফেলবে। কিন্তু পরের কথাটা বলার সময় পল টের পেল তার গলা যথেষ্ট পরিষ্কার, "আমরাও কিন্তু সিরিয়াসলি প্রেম করছি। কাল কায়রো থেকে ফেরার পর আমিই ওকে তুলে নিয়েছিলাম। আজ রাতেও এই একঘণ্টা আগেও আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার বাড়িতে একসঙ্গে ডিনার করেছি। সিঁড়িতে আমাদের শারীরিক ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। পল, এখনও আমি আমার উরুতে ওর স্পর্শ অনুভব করতে পারছি।"

স্যাং লন্ডন থেকে ফিরল একগাদা উপহার নিয়ে। লাল মোড়কের কিটক্যাট, হ্যারডের চা, মারমালেড, চকোলেট ক্রিমের বিস্কুট, আরও কত কী! বোনপোর ছোট্ট হাসিমুখের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে স্যাং-এর তোলা একটা ছবি সে সাজিয়ে রাখল রেফ্রিজারেটরের ওপরে। নিজের ঘরের জানলা থেকে পল দেখল, ফারুক এসে নামিয়ে দিয়ে গেল স্যাং-কে। তাদের ওই অসাধারণ সিঁড়িটা দিয়ে নামার সময় আজকাল অনেক চেষ্টা করেও সে মন থেকে একটা আবছা ছবি ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তার মনে হয়, সেখানে ফারুকের নগ্ন শরীর আর-একটি মেয়ের শরীরের ওপর শুয়ে আছে এবং সেই মেয়েটা স্যাং নয়। নীচে এসে কাবার্ড খুলে ড্রিঙ্কটা নিল পল।

"সত্যিই এখানে কত কিছু বদলে গিয়েছে," হাসিমুখে ভুরুদুটো সামান্য উঠিয়ে অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল স্যাং। পল তখন নিজের ড্রিঙ্ক তৈরি করছিল। বলল, "কী বদলে গিয়েছে?"

"এই যে তুই স্কচ খাচ্ছিস! আগে জানলে তোর জন্য কিটক্যাটের বদলে ডিউটি ফ্রি দোকান থেকে মল্ট নিয়ে আসতাম।"

স্যাং-এর তাকে উপহার দেওয়ার ব্যাপারটা একটু হলেও হতাশ করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলকে। তাদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও তারা ঠিক বন্ধু নয়। সে ওকে ড্রিঙ্ক অফার করল এবং স্যাং-ও সেটা নিল। তারা দু'জনে একসঙ্গে টেবিলে বসে পরস্পরের গ্লাসে গ্লাস ঠেকাল।

পল তার জন্য যেসব চিঠিপত্র জমা করে রেখেছিল বা মেসেজ রেখেছিল, সেগুলো এবার মন দিয়ে দেখতে শুরু করল স্যাং।

"আমি তো ডেইড্র বলে কাউকে চিনি না," প্যাডের পাতায় লেখা মেসেজ দেখতে দেখতে বলল স্যাং, "ও কি বলেছে কেন ফোন করেছিল?"

পল এর মধ্যেই তার ড্রিঙ্ক শেষ করে একটু ভাল বোধ করছিল। মাথা নেড়ে 'না' বলল সে।

"আমি বুঝতে পারছি না কী করব।"

"কী করবি মানে?"

"মানে, ওকে কি আমি কলব্যাক করব?"

পল উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রিজ থেকে আইসকিউব বের করছিল সেকেন্ড ড্রিঙ্কের জন্য, ঠিক তখনই একটা পেনসিল দিয়ে ওর নামটা কেটে দিল স্যাং। "কেটে দিই। আমার মনে হয় ও টেলিমার্কেটার জাতীয় কিছু একটা হবে।"

স্যাং কে এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে সহজ ছিল। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি, যার সিমেন্টের মেঝে এবং অজানা-অচেনা লেখকদের লেখা দর্শনের বইয়ে ঠাসা ছাইরঙের ধাতব র‍্যাকগুলো পলের নিতান্তই অপছন্দ, দিনের শুরুতেই সেখানে চলে যেত সে আর বাড়িতে সে দেখেছিল একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে ওপরে চলে যাওয়াই সবচেয়ে ভাল উপায়। শীতের শেষে তখন শুরু হয়েছে অলস বসন্ত, ঝোড়ো হাওয়া আর তির্যক বৃষ্টি প্রায়ই পলের বিছানার পাশের জানালায় ঘা দেয়। ফোন বেজে গেলেও ধরে না পল। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ও ফোন বাজলেই নিশ্চিত থাকত যে, প্রতিটা ফোনই ডেইড্র করছে এবং স্যাং এর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু ডেইড্র আর ফোন করেনি। পল মনে মনে যেন ফোনটারই অপেক্ষা করছিল। ওর সঙ্গে সেদিনের কথোপকথন যতই সে তার স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল, ততই কবিতা প্রবন্ধের পাশাপাশি সেটাও মনের মধ্যে আরও বেশি করে গেঁথে যাচ্ছিল। পল দেখতে পেল দু'জন সাঁতার কাটছে ওয়ালডেন পন্ডে, জলের ওপরে তাদের মাথা ভেসে যাচ্ছে। ওদিকে স্যাং দিনের পর দিন ফারুকের

AMARBOI.COM

সঙ্গেই ডিনার সেরে বাড়ি ফিরত। কিন্তু সেদিন বাড়িতে ছিল এবং কিচেন টেবিলে বসে বসে গ্রীষ্মে ফারুকের কায়রো যাওয়ার টিকিট বুক করেছিল। ফারুকের ক্রেডিট কার্ড নম্বরটা লেখা ছিল একটা কাগজে। দু'মাস পরেও যখন ডেইড্রর কোনও ফোন শেষ পর্যন্ত এল না, পল নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবল বোধহয় আর সে ফোন করবে না।

পল বসন্তের পড়াশোনার থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিল। তার প্রোফেসর উপদেশ দিয়েছিলেন, "সারাক্ষণ বই মুখে করে বসে থেকো না, প্রথমবার বলে হয়তো ওরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল।" পরামর্শও দিয়েছিলেন, "যাও ক্যারিবিয়ান থেকে ঘুরে এসো।" কিন্তু কোথাও যাওয়ার বদলে পল বাড়িতেই রইল। এবং নিজেকে বোঝাল, সে আসলে ছুটি কাটাচ্ছে। কখনও সে ব্র্যাটলে মুভি দেখতে গেল আবার কখনও ক্যাসুলেট বানাতে গিয়ে দু'দিন কাটিয়ে দিল। একদিন সে নিজেই ড্রাইভ করে ওয়েলফ্লিটে গেল, সঙ্গে কোনও বই নিল না। তারপর ঠিক করল বাইকে করে কনকর্ডে ইমার্সনের বাড়িতে যাবে। শনিবার সকালে দেখল, বাইকের চেনটা ঠিক করতে হবে। বাইকটাকে যখন সে বের করে ডেকে আনল, মুখ তুলে দেখল স্যাং দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ফোন এবং তার তারটা যতদূর সম্ভব বাড়ানো যায়, ততটাই প্রসারিত। স্যাং বলল, "এখনই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।"

"কী?"

"সেই ডেইড্র বলে মেয়েটি ফোন করেছিল, আরে, যার মেসেজ তুই লিখে রেখেছিলি আমি না থাকার সময়।"

পল নিচু হয়ে এমন ভান করতে লাগল যেন তার টুলবক্স থেকে সত্যিই কিছু হারিয়েছে। স্যাং বলেই চলল, "মেয়েটা ফারুকের কথা জিজ্ঞেস করছিল। বলল যে, ও ফারুকের বন্ধু, বাইরে থেকে এসেছে এই শহরে।"

"ও, তা হলে তো বোঝাই গেল, কেন ও ফোন করেছিল," ডেইড্র কী বলেছে শুনে পল যেন কিছুটা স্বস্তি পেল।

"কিন্তু ফারুক ডেইড্র বলে কারও কথা আমাকে বলেনি।"

"তাই নাকি?"

স্যাং সামনের দিকে ঝুঁকে ফোনটা কোলে নিয়ে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। তারপর সোজা হয়ে বসে রিসিভার না তুলেই এলোপাথাড়ি নাম্বার টিপতে লাগল।

AMARBOI.COM

স্যাং বলল, "ফারুকের কোনও বন্ধু নেই, যখন থেকেই আমি ওকে চিনি, ও আমাকে ওর কোনও বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করায়নি। আমিই ওর একমাত্র বন্ধু।" স্যাং গভীর দৃষ্টিতে তাকাল পলের দিকে এবং মুহূর্তের জন্য পলের মনে হল, এখনই হয়তো ও তুলনা টেনে বলবে পলেরও তো কোনও বন্ধু নেই। কিন্তু তার বদলে স্যাং বলল, "আচ্ছা, ও আমার নম্বরটা পেল কী করে?"

ডেইড্র পলের কাছে স্বীকার করেছিল যে, সে ফারুকের অ্যাড্রেস বুক ঘেঁটে নম্বরটা পেয়েছে। স্যাং-এর নামে শুধু 'S' দিয়ে নম্বরটা লিখে ফারুক কাজটা আরও সহজ করে দিয়েছে। তা ছাড়া এমনিতেও স্যাং-কে কাজিন বলে পরিচয় দেওয়ায় তার মনে সন্দেহ আগেই হয়েছিল। পল উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল। তারপর বাইসাইকেলের হ্যান্ডব্রেক চেপে বলল, "জানি না, আমি হলে তো ফারুককে জিজ্ঞেস করতাম।"

"ঠিক, ফারুককেই জিজ্ঞেস করতে হবে," উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল সে। সেদিন সন্ধেতে কনকর্ড থেকে ফেরার পর পল স্যাং-কে কিচেন টেবিলে দেখতে পেল। তাকে রেফ্রিজারেটর খুলে ক্যাসুলেটের বাকি অংশ বের করে আনতে দেখেও স্যাং কিছু বলল না।

"ফারুক আজ ছিল না", স্যাং এমনভাবে বলল যেন ও পলের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, "সারাদিনটাই ছিল না।"

বেকিং ডিশের ঢাকাটা সরিয়ে ক্যাসুলেটের ওপরে কয়েক ফোঁটা জল ফেলল পল, স্যাং-কে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি একটু খাবি?"

"না, থ্যাঙ্কস," মনে হল স্যাং বেশ রেগে রয়েছে।

পল ক্যাসুলেটটা আভেনে দিয়ে স্কচ ঢালতে লাগল। তার হাতের পেশি, উরু রীতিমতো ব্যথা করছে। ভাবল, খাওয়ার আগে স্নানটা সেরে নেবে।

"ডেইড্র কখন ফোন করেছিল তোর মনে আছে?" পল কিচেন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই প্রশ্নটা করল স্যাং।

গোড়ালিতে ভর দিয়ে শরীরটা ঘুরিয়ে স্যাং-এর দিকে তাকাল পল। বলল, "না মনে নেই, তুই তখন ছিলি না। তখনই একদিন করেছিল।"

"তোকে কি কিছু বলেছিল?"

"কী বলতে চাইছিস তুই?"

"তোকে ও ঠিক কী বলেছিল বল তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছুই না। আমি তো আর ওর সঙ্গে কথা বলিনি," বলতে বলতে পল বুঝতে পারল তার পালস রেট বেড়ে গিয়েছে এবং ভাগ্যস সে আগেই ঘর্মাক্ত ছিল, "ও শুধু বলেছিল তোকে কলব্যাক করার জন্য।"

"আমি কী করে কলব্যাক করব? আমার কাছে কি ওর নম্বর আছে? ভারী অদ্ভুত তো! তোর কি কথা বলে মনে হয়েছিল যে ও এইরকম অদ্ভুত টাইপের মেয়ে?"

ডেইড্রর কান্নার কথা মনে পড়ল পলের, "আমি ওকে ভালবাসি।" এই কথাটাও সে বলেছিল পলকে, যে ওর কাছে নিতান্তই একজন বাইরের লোক, অচেনা লোক। স্যাং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর নিজের মনোভাব লুকোবার চেষ্টা করতে করতে সে বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুই কী বলতে চাইছিস?"

"আমাকে ওটা একটু দিতে পারবি?" অধৈর্য হয়ে মেসেজ প্যাডটার দিকে আঙুল দেখাল স্যাং।

পল দেখল স্যাং দ্রুত প্যাডের পাতা উলটে চলেছে, আর মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে কোনও কোনও পাতার শেষ পর্যন্ত পড়ে নিচ্ছে। একটু পরে সে জিজ্ঞেস করল, "কী খুঁজছিস তুই?"

"মেয়েটার নম্বর।"

"কেন?"

"আমি ওকে কলব্যাক করতে চাই।"

"কেন?"

পলের দিকে তাকিয়ে রীতিমতো বিরক্ত হয়ে সে বলল, "আমার ইচ্ছে করছে বলে। তোর কি তাতে কোনও আপত্তি আছে?"

পল আর কোনও কথা না বলে ওপরে উঠে গেল স্নান করতে। গায়ে গরমজল ঢালতে ঢালতে ও নিজেকে বোঝাল, এটা ওর ব্যাপার নয়, এসবের মধ্যে ঢোকার কোনও দরকার নেই। তারপর ভাল করে গা মুছে, ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকিয়ে আঁচড়ে আবার যখন নীচে নামল, দেখল যে হাঁটুর ওপর হাত রেখে মন দিয়ে রিসাইকেল বিন দেখছে স্যাং, চারদিকে স্তূপীকৃত হয়ে আছে খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। পলকে নামতে দেখেই সে বলল, "দুর ছাই!"

"এখন আবার কী খুঁজছিস তুই?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ফোন নম্বর। আমার মনে আছে, আমি ওই পেজটা কোথাও রেখেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, ছুড়ে ফেলে দিয়েছি।"

"দ্যাত্তেরি" বলে এবার সে ম্যাগাজিনগুলো বিনের মধ্যে আবার তুলে রাখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হালকা করে বিনটায় একটা লাথি মেরে বলল, "ওর পদবিটাও মনে পড়ছে না আমার। তোর মনে আছে?"

পল বড় করে শ্বাস নিল, যেন তথ্যটুকু গোপন করে সে তার শরীরের ভিতরে ঢুকিয়ে নিল। কিন্তু আশ্বস্ত বোধ করল যে, তার সামনে স্যাং-এর কাছে সৎ হওয়ার সত্যিই একটা সুযোগ এসেছে। কারণ ডেইড্রর পদবি সে-ও ভুলে গিয়েছে। সে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে মাথা নেড়ে 'না' বলল। ওর এটুকু মনে আছে যে, একটা ছোট্ট শব্দ ছিল, কিন্তু সেটা যে কী, তা তার মাথা থেকে একেবারেই উবে গিয়েছে।

"অ্যাই পল," একটু পরে স্যাং ডাকল তাকে, "সরি, তোর সঙ্গে তখন আমি খুব বাজেভাবে কথা বলেছি।"

কিচেনে ঢুকে আভেনের পাল্লা খুলতে খুলতে পল বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না।"

স্যাং-এর পেট থেকে হঠাৎ গা ঘুলিয়ে ওঠার মতো একটা শব্দ হল, এত জোরে যে পলও শুনতে পেল সেটা। স্যাং বলে উঠল, "হে ভগবান, আমি খেয়ালই করিনি যে, আজ সারাদিন আমার কিছু খাওয়াই হয়নি। মনে হচ্ছে, কিছুটা ক্যাসুলেটই খেতে হবে শেষ পর্যন্ত। আমি স্যালাড তৈরি করি?"

হিথারকে ছাড়া ওদের দু'জনের এটাই প্রথম ডিনার। পল প্রায়ই আন্তরিকভাবে চাইত, এরকম কোনও মুহূর্ত আসুক তাদের মধ্যে। কিন্তু স্যাং ঘরে থাকলেই ওর কীরকম যেন অদ্ভুত লাগত, জিভটা আড়ষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল, এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি না হলেই ভাল ছিল।

"আমার মনে হয়, মেয়েটা সত্যিই একটু অদ্ভুত," আস্তে করে কথাটা বলল পল, দেখল স্যাং-এর মাথাও সামনে সিঙ্কের ওপর ঝোঁকা, কারণ সে লেটুস পাতা কাটছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল স্যাং।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল স্যাং, "মানে? তুই কী করে জানলি যে ও অদ্ভুত টাইপের?"

পল হঠাৎ করে এতটাই নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে, মুহূর্তের জন্য ওর মনে হল, ও বোধহয় খুব জোরে হেসে উঠবে। স্যাং খুব মনোযোগ সহকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখছিল পলকে। কল থেকে জল পড়ছিল রান্নাঘরে, স্যাং বন্ধ করে দিল পুরো ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল তখন।

"মেয়েটা কাঁদছিল," পল বলল।

"কাঁদছিল?"

"হ্যাঁ, মানে..."

"কাঁদছিল মানে? কেন? কীভাবে?"

"এমনিই... কাঁদছিল আর কী! মনে হয়, কোনও একটা বিষয় নিয়ে আপসেট ছিল।"

স্যাং কিছু বলবার জন্য ঠোঁট ফাঁক করল, কিন্তু তখনই কিছু বলল না। হাঁ করে কিছুক্ষণ পলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তা হলে ব্যাপারটা সোজাসুজি আমায় বল। এই ডেইড্র নামের মেয়েটি ফোন করেছিল এবং আমাকে চেয়েছিল, তাই তো?"

পল মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"আর তুই বললি আমি বাড়িতে নেই।"

"ঠিক তাই।"

"এবং তখনই ও তোকে বলল আমাকে কলব্যাক করতে বলার জন্য।"

"ঠিক।"

"তারপরই ও কাঁদতে শুরু করল।"

"হ্যাঁ।"

"তারপর কী হল?"

"এটুকুই। তারপর ও ফোন রেখে দিয়েছিল।"

কিছুক্ষণের জন্য পলের মনে হল তথ্যগুলো স্যাং-কে বেশ সন্তুষ্ট করেছে, হালকাভাবে মাথাও নাড়ছিল সে। তারপর হঠাৎ সে এমনভাবে জোরে জোরে মাথা নাড়তে শুরু করল যেন কিছু একটা তার মাথায় ঢুকছে না। পলকে জিজ্ঞেস করল, "তুই আমাকে এসব কথা আগে বলিসনি কেন?"

পলের এবার অনুতাপ হতে লাগল স্যাং-কে ক্যাসুলেট অফার করা থেকে শুরু করে সেদিন ওই ফোনটা ধরা পর্যন্ত সব কিছুর জন্যই। সে ভাবল, কেন স্যাং-ই, কেন অন্য কেউ তার ঘরে, বাড়িতে, তার জীবনে এল না! কিন্তু মনের মধ্যে এইসব উলটোপালটা ভাবনায় দাঁড়ি টেনে সে মুখে বলল, "হ্যাঁ বলেছিলাম তো, ও তোকে ফোন করেছিল!"

AMARBOI.COM

"কিন্তু তুই তো আমাকে এসব কিছুই বলিসনি।"

"না।"

স্যাং চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল, ব্যাপারটা যেন ওর বিশ্বাস হচ্ছে না, তারপর বলল, "একবার মনেও হল না যে, আমি তোর কাছে জানতে চাইতে পারি ব্যাপারটা নিয়ে?"

পল ঠোঁট কামড়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল।

"কী রে?" স্যাং প্রায় চেঁচিয়ে কৈফিয়ত চাওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, "মনে হয়নি তোর?"

এর পরও যখন পল কোনও উত্তর দিল না, স্যাং এগিয়ে এল তার দিকে। হাতদুটো শক্ত করে মুঠো করল এবং একদিকে মুখ বেঁকিয়ে এমনভাবে হাত বাড়াল যেন এখনই পলকে একটা ঘুষি মারবে। কিন্তু সেটা করার বদলে সে একটু ধাতস্থ হওয়ার জন্যই বোধহয়, তার মাথার একদিকটা চেপে ধরে বলল, "শেষে, পল তুই," প্রায় না শুনতে পাওয়ার মতো নিচু তীক্ষ্ণ গলায় সে বলল, "কী হয়েছে বল তো তোর?"

এবার স্যাং এড়িয়ে যেতে শুরু করল পলকে। প্রথমে কিছুদিন সে বাড়িতে থাকল না। তারপর একদিন পল দেখল যে সে একটা উইকএন্ড ব্যাগ নিয়ে চার্লসের গাড়িতে উঠে কোথাও যাচ্ছে। হিথার ততদিনে কেভিনের সঙ্গে অফিশিয়ালি থাকতে শুরু করে দিয়েছে। খালি বাড়িতে পল আবার একা হয়ে পড়ল। স্যাং-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার মাঝখানে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। একা থাকে বলে সবসময় দরজা বন্ধ করারও প্রয়োজন অনুভব করে না সে। তাই স্যাং এসে সরাসরি তার ঘরে ঢুকে পড়ল। সে একটা সাদা সুতির শর্টস্লিভ ড্রেস পরেছিল, কোমরের অংশটা চাপা। স্কোয়ারনেক গলার ভিতর দিয়ে তার কণ্ঠার হাড় দেখা যাচ্ছে। ড্রেসটা খুব সুন্দর, পল এটা আগে কখনও দেখেনি।

"হাই", স্যাং বলল।

"হাই", পল এমনভাবে বলল যেন সে একটুও মিস করেনি স্যাং-কে।

"দেখ, আমি তোকে বলতে চাইছি যে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে খুব গোলমাল রয়েছে আমাদের মধ্যে। ডেইজ ফারুকের অনেকদিনের পুরনো বন্ধু, কলেজের সময়কার।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাকে সেসব কথা বলার কোনও দরকার নেই।"

"ও কানাডায় থাকে," স্যাং বলেই চলল, "ভ্যাঙ্কুভারে।"

"ও আচ্ছা।"

"ওরা হয়তো বছরে একবার কথা বলে। প্রায় বছর কয়েক আগে ফারুক ওকে আমার নাম বলেছিল তখন সদ্য সদ্য আমাদের পরিচয় হয়েছে। ফারুক তখন অন্য একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকত। ফারুকের নতুন নম্বর বা ঠিকানা ওর কাছে ছিল না। আসলে ওর সামনে বিয়ে তাই ফারুককে নেমন্তন্ন করতে চায়। তাই পুরনো অ্যাপার্টমেন্টে না পেয়ে এখানে ট্রাই করেছিল।"

বলতে বলতে কোনও এক অজ্ঞাত কারণেই স্যাং একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, তার গালে লালচে আভা দেখা দিল।

"আরও একটা কথা আছে পল।"

পল মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "কী?"

"ফারুক ডেইড্রকে ফোন করেছিল, তোর কথাগুলো সম্পর্কে জানতে।"

"আমি আবার কী বললাম?"

"ওই যে সেই কান্নাকাটির ব্যাপারটা', স্যাং কাঁধ ঝাঁকাল, "ফারুক বলল ডেইড্র পুরো আকাশ থেকে পড়েছে।" স্যাং-এর গলাটা ঠান্ডা শোনাল, কথাগুলো যেন খুব দ্রুত বলে গেল ও।

"তুই কি বলতে চাইছিস, আমি এগুলো বানিয়ে বলেছি?"

স্যাং চুপ করে রইল।

স্যাং-এর কথা ভেবেই পল ওই কান্নাকাটির ব্যাপারটা তাকে বলেছিল। সেদিন রাতে কিচেনে ওকে স্যালাড কাটতে দেখে মনে হচ্ছিল চারপাশের জগৎটা যেন ভেঙে পড়েছে ওর সামনে। পল ওকে কোনওভাবে সতর্ক করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন তার মনে হল স্যাং যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দরজার বাইরে ওকে ধরে ছুড়ে ফেলে দেয়।

"ওরকম একটা গল্প কেন বানাতে যাব আমি?" পল এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, ওর মাথার একদিকের শিরা দপদপ করতে লাগল।

পলের সঙ্গে তর্ক করার বদলে স্যাং সহানুভূতির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। তারপর হাতদুটো দিয়ে দরজার ফ্রেম ধরে বলল, "আমি জানি না পল।" যেন সে এই প্রথমবার পলের ঘরে এসেছে! মুহূর্তের জন্য মনে হল পলের ঘরে বসার জায়গা খুঁজছে। তারপর সে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলকে জিজ্ঞাসা করল, "তোর কি সত্যিই মনে হয়, এই কথাগুলো শুনে আমি ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না?"

"আমার তো মনে হয়, কথাগুলো তোকে কোনওভাবেই সাহায্য করবে না," দাঁতে দাঁত চেপে বলল পল। স্যাং-এর এই দোষারোপ শুনে দেহটা ভারী ভারী অবশ লাগছে তার, "আমি বানিয়ে বলিনি কথাগুলো।"

"আমার মনে হয়, এটা হতে পারে যে, তুই আমায় পছন্দ করিস, পল", স্যাং বলে চলল। "তোর এই ক্রাশটা একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু তা বলে এরকম একটা গল্প বানানো..." হঠাৎ করে থেমে গেল সে, এমন একটা মুখভঙ্গি করল, যাকে কোনওমতেই হাসি বলা যায় না। তারপর বলল, "ইটস প্যাথেটিক, রিয়েলি প্যাথেটিক।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আবার যখন তাদের দেখা হল স্যাং সেদিনের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইল না। সে যে খুব রেগে ছিল তা নয়, বরং উদাসীন হয়ে গেল। পল দেখল মাইক্রোওয়েভের ওপর সে ফিনিক্সের একটা ইস্যু ফেলে গিয়েছে, যার সম্পত্তি অংশটা ভাঁজ করা এবং সেখানে লিস্টে বেশ কয়েকটা জায়গা সার্কল করা। ফারুকের সঙ্গে তার মেলামেশা অব্যাহত। পলের মুখোমুখি পড়ে গেলে সে বাধ্য হয়ে তাকায়, একটা যান্ত্রিক হাসি হাসে এবং তারপর এমন করে অন্যদিকে তাকায় যেন পল তার ত্রিসীমানায় কোথাও নেই।

স্যাং বইয়ের দোকানে কাজে বেরোনোর সময়, পল তার নিজের ঘরে বসে থাকে, যতক্ষণ না সে স্যাং-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ পায়। একদিন সে স্যাং বেরিয়ে যাওয়ার পর কিচেনে ঢুকে রিসাইকেল বিন উপুড় করল এবং সমস্ত খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন খুলে খুলে খুঁজতে লাগল ডেইড্রর নম্বর। ওর মনে হল এভাবে নম্বর খোঁজা ও না-পাওয়া স্যাং-এর স্বভাবসুলভ কাজ। পল কিন্তু নম্বরটা পেল না। সমস্ত সাদা কাগজগুলো বের করে খুলে খুলে সে নম্বরটা খুঁজে চলল, একবারও ভাবল না যে ব্যাপারটা কতখানি হাস্যকর। হঠাৎ করেই পদবিটা অনায়াসে ওর ভেসে উঠল, কয়েকমাস আগে ডেইড্রর সঙ্গে টেলিফোনে তার কথা বলা ও পরিচয়পর্বটা মনে পড়ে গেল পলের। এবার সে 'F' খুঁজতে লাগল এবং D. Frain বলে বেলমন্টের একটা ঠিকানা লেখা আছে দেখতে পেল। আঙুলটা সূচিপত্রের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক সেখানে রেখে হালকা করে আন্ডারলাইন করে রাখল সে।

পরদিনই সে ফোন করল ডেইড্রকে। ওকে না পেয়ে কলব্যাক করার অনুরোধ করে মেসেজ রাখল সে। এটা করতে গিয়ে একটু অস্বস্তি যে হচ্ছিল না, তা নয়। তা ছাড়া ওর মন বলছিল ডেইড্র হয়তো আর ওকে ফোন ব্যাক করবে না। সেও এখন দূরত্ব বজায় রাখতে চাইবে। কিন্তু পল নাছোড়বান্দা হয়ে ফোন করেই চলল। এবং প্রত্যেকবারই সে মেসেজ রাখল, "ডেইড্র। দিস ইজ় পল। প্লিজ় কল মি।"

শেষমেশ একদিন ডেইড্র ফোনটা ধরল।

পল বলল, "তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

সে চিনতে পারল পলের গলা। বলল, "বুঝতে পারছি পল, শোনো..."

পল ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এটা তুমি ঠিক করোনি," পল তার লাইব্রেরির লবির একটি বুথে বসে ছিল। দেখছিল, ছাত্ররা সিকিয়োরিটিকে তাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখাচ্ছে। পল নিজের পকেটে হাত দিয়ে একবার দেখে নিল টাকাপয়সা ঠিকমতো আছে কি না।

সে আবার বলল, "আমি দয়া করে তোমার কথা শুনেছি, নয়তো আমার কথা বলার কোনও দরকার ছিল না।"

"সরি, আমি জানি, এটা আমারই ভুল," ওকে এখন ড্রাঙ্ক বা ফ্লার্টিং করবার মুডে আছে বলে মনে হল না পলের।

"তুমি আরও যা যা আমাকে বলেছিলে সেগুলো তো আমি বলিইনি," পল দেখল বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে একজন ছাত্র অপেক্ষা করছে, তার ফোন কখন শেষ হবে। রাগটা আস্তে আস্তে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল, সে নিচু গলায় বলল, "মনে আছে সেই কথাগুলো?"

"প্লিজ়, আমি তো বললাম সরি, তুমি ফোনটা একটু ধরবে?" একটা ডোরবেল বাজার শব্দ শুনল পল। একমিনিট পরেই সে এসে ফোন ধরে বলল, "আমাকে একটু বেরোতে হবে। আমি তোমায় কলব্যাক করব।"

"কখন?" পল সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল, ওর মনে পড়ল জানুয়ারিতে ডেইড্র যখন ফোন করেছিল, সে রেখে দিতে চেয়েছিল ফোনটা। কিন্তু ডেইড্র তাকে বারবার অনুরোধ করছিল লাইনে থাকার জন্য।

ডেইড্র বলল, "পরে, আজই করব।"

AMARBOI.COM

"পরে? আমি জানতে চাই কখন?"

সে বলল দশটার সময় ফোন করবে।

ফোনটা রাখার পরই তার মাথায় একটা আইডিয়া এল, রিসিভারটা তখনও তার হাতে ধরা। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা রেডিয়োর দোকানে গেল সে, দোকানদারকে বলল, "আমায় একটা রিসিভার দাও এবং দুটো জ্যাকওয়ালা একটা অ্যাডাপ্টরও দিয়ো সঙ্গে।"

বইয়ের দোকানের কাজ সেরে স্যাং যথারীতি ন'টার মধ্যেই বাড়ি ফিরে এল। চিঠিপত্র দেখতে যখন কিচেনে ঢুকল, পলকে সেখানে দেখেও একটা কথা বলল না সে।

পল বলল, "ডেইড্রকে ফোন করেছিলাম।"

"এইভাবে আমাদের ব্যাপারে বারবার নাক গলানোর কোনও দরকার আছে কি?" ক্যাটালগের পাতা না উলটেই বলল স্যাং।

"ও আমাকে দশটায় ফোন করবে বলেছে," পল বলল, "তুই যদি চাস তো ওর অজান্তে পুরো কথোপকথনটা শুনতে পারিস। আমি আর একটা ফোন এনে লাইনটা কানেক্ট করে দিয়েছি।"

ক্যাটালগটা রেখে অন্য ফোনটা এবার লক্ষ করল স্যাং। ফিসফিস করে বলল, "পল, আমি তোকে একটুও বিশ্বাস করি না।"

নিজের ঘরে চলে গেল স্যাং। দশটা বাজতে পাঁচে ঘর থেকে বেরিয়ে পলের পাশে এসে বসল। ফোনগুলো একসঙ্গেই টেবিলের ওপর রাখা ছিল। ঠিক দশটা বেজে এক মিনিটে দুটো ফোন বেজে উঠল একসঙ্গে। পল একটা ধরে বলল, "হ্যালো।"

"আমি বলছি", বলল ডেইড্র।

পল মাথা নেড়ে স্যাং-কে ইশারা করতে স্যাং আস্তে আস্তে খুব সাবধানে অন্য ফোনটা তুলল এবং এমন করে ধরল যাতে সেটা তার কান স্পর্শ না করে। ফলে রিসিভারের নীচের অংশটা তার মুখ থেকে বেশ কিছুটা দূরে, অনেকটা তার কাঁধের দিকে মুখ করা ছিল।

ডেইড্র বলল, "হ্যাঁ যেটা বলছিলাম। পল, আমি সত্যিই তোমায় ফোন করার জন্য সরি। আমার উচিত হয়নি।"

গলা শুনে পলের মনে হল, ডেইড্র যেন একটু সহজ, কোনও তাড়াহুড়ো

AMARBOI.COM

করেছিলে তো।"

"হ্যাঁ।"

"ফারুকের জন্য কান্নাকাটিও করেছিলে।"

"হ্যাঁ।"

"এবং তারপর তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করলে?"

ডেইড্র চুপ করে থাকল। পল আবার বলল, "পুরো ব্যাপারটা তুমি অস্বীকার করেছ, তাই না?"

"এটা ফ্রিডিই বলেছিল।"

"আর তুমিও ওর প্ল্যানমাফিক কাজ করলে," বলে একটু থামল পল। স্যাং-এর মুখের দিকে তাকাল। ওপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা সে এমনভাবে কামড়ে ধরে আছে যে দেখে কষ্ট হল পলের।

"আমি আর কী-ইবা করতাম বলো, পল?" ডেইড্র বলতে লাগল, "ও প্রচণ্ড রেগে গেল যখন শুনল আমি ফোনটা করেছি। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইত না। ফোনের লাইনটা খুলে রাখত। দেখা করতে গেলে দরজা পর্যন্ত খুলত না।"

স্যাং টেবিলের কোনায় হাতের পাতা এমনভাবে রাখল যেন এখনই ওটাকে ঠেলে ফেলে দেবে, কিন্তু সেটা না করে নিজে সরে গেল চেয়ারের পিছনদিকে লিনোলিয়াসের ওপর শব্দ করে। পল ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে ওকে ইশারা করল, কিন্তু তারপরই বুঝতে পারল, শব্দটা ডেইড্রর মনে হবে পলই করেছে। সে তখনও বলে চলেছে, "পল, আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগছে এটা ভেবে যে, তুমি এই সবকিছুর মধ্যে পড়ে গিয়েছ। আমি তো এখনও বলছি ওই ফোনটা আমার করা উচিত হয়নি। আসলে ফ্রিডি আমাকে ক্রমাগত বলে যাচ্ছিল যে, স্যাং ওর কাজিন। কিন্তু যতবার আমি ওকে বলেছি, স্যাং-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে, ততবারই ও রিফিউজ করেছে। প্রথম প্রথম ব্যাপারটাকে আমি তেমন পাত্তা দিইনি। কিন্তু আস্তে আস্তে মনে হল আমিই ওর জীবনের একমাত্র মহিলা নই। কিন্তু ততদিনে আমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছি।"

ডেইড্র বলল যে সে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল ফারুককে। তার বয়স পঁয়ত্রিশ। এর মধ্যেই ওর একবার বিয়ে হয়ে ডিভোর্স হয়েও গিয়েছে। সত্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে কী এত ঝামেলা পোহানোর মতো সময়ও ছিল না ওর হাতে।

"কিন্তু আমি সম্পর্কটা শেষ করে দিয়েছি," সে এমনভাবে কথাটা বলল যেন এটাই হওয়ার ছিল, "আসলে আমার মনে হত, ও হয়তো সত্যিই আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। আর এই কথাটাই ও সব মেয়েদের বোঝানোর চেষ্টা করে। প্রথমে সে তাদের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। প্রত্যেকটা বিষয়ে তাদের সাহায্য চায়, যেন ওদের ছাড়া ওর জীবনই চলবে না। সেদিন বিকেলে যখন তুমি ফোন করেছিলে, তখনও ওই ফারুকই আমাকে দেখতে চাইছিল। চাইছিল যে, আমি ওর পাশে থাকি। খেয়াল করে দেখবে, ওর কিন্তু কোনও বন্ধু নেই, সবাই প্রেমিকা। আমার মনে হয়, অন্যদের যেমন বন্ধু প্রয়োজন হয় জীবনে, সেভাবেই হয়তো ওর প্রেমিকাদের দরকার হয়।" ডেইড্র এমন যুক্তিসহকারে চিন্তাশীলভাবে কথাগুলো বলছিল, যেন সে তার অনেকদিন আগেকার কোনও সম্পর্কের ব্যাপারে বলছে। স্যাং-এর চোখ বন্ধ এবং সে আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা নাড়ছে। হঠাৎ একটা কুকুর ডাকতে শুরু করল।

"আমার কুকুর", বলল ডেইড্র, "ও ফ্রিডিকে কখনওই পছন্দ করত না। সামান্য ফুটবলের সাইজের একটা কুকুর। কিন্তু ফ্রিডি এলেই ও সিঁড়িতে চলে আসত আমায় গার্ড দিতে।"

স্যাং খুব সতর্কভাবে শ্বাস নিল। আস্তে করে সে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল, আবার তুলে নিল।

"এবার আমাকে রাখতে হবে", পল বলল।

"আমাকেও", ডেইড্র বলল, "আমার মনে হয় তোমার স্যাং-কে বলে দেওয়া উচিত," পল ভিতরে ভিতরে একটু চমকে গেল। ভাবল, ডেইড্র কি তার কায়দাটা মানে স্যাং-কে পুরো কথোপকথনটা শোনানোর কৌশলটা ধরে ফেলেছে? সে জিজ্ঞেস করল, "কী বলা উচিত ওকে?"

"ওকে বোলো আমার আর ফারুকের সম্পর্কের কথা, ওর তো কথাগুলো জানা উচিত। তোমার সঙ্গে কথা বলে তো মনে হয়, তুমি ওর একজন ভাল বন্ধু।"

ডেইড্র ফোনটা রেখে দিল এবং তারপরও অনেকক্ষণ ধরে পল আর স্যাং সেখানে নীরবে বসে রইল। পল ভাবছিল সে নিজেকে প্রমাণ করে দিতে পেরেছে স্যাং এর কাছে। কিন্তু তাও তার কোনও আনন্দ হচ্ছে না, কোনও

AMARBOI.COM

প্রতিশোধস্পৃহাও জাগছে না। স্যাং ফোনটা রেখে খুব ধীরে উঠে দাঁড়াল যেন চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। খুব কষ্ট করে সংযত থাকার চেষ্টা করছিল সে। মনে হচ্ছিল একটু শব্দ হলেই বা ধাক্কা লাগলেই পড়ে যাবে।

"আমি দুঃখিত," পল শেষ পর্যন্ত বলল।

স্যাং মাথা নেড়ে ঘরে চলে গেল এবং দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ পর পল স্যাং-এর ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "স্যাং? তোর কি কিছু দরকার এখন?"

পল ওখানে দাঁড়িয়েই উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। সে ভেতরে চলাফেরার শব্দ শুনতে পেল। দরজাটা খোলার পর দেখল স্যাং একটা লম্বা টাইট ফিট কালো টপ পরেছে আর তার গোলাপি রেনকোটটা হাতের ওপর ফেলা। কাঁধ থেকে একটা ছোট ব্যাগে ঝুলছে। সে বলল, "আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবি?"

গাড়ির মধ্যে বসে সে পলকে শেষ মুহূর্তে পথনির্দেশ দিতে লাগল। তারা সহজেই অ্যালাস্টন পেরিয়ে স্টোরো ড্রাইভে ঢুকে পড়ল।

"ওখানে", বলে আঙুল দিয়ে দেখাল স্যাং। একটা হাইরাইজ বিল্ডিং, খুব সুন্দর না হলেও এক্সক্লুসিভ, জায়গাটা নদীর যেদিকে কেমব্রিজ, সেদিকে। গাড়ি থেকে নেমে সে হাঁটতে শুরু করল। পল তার পিছন-পিছন হাঁটতে হাঁটতে বলল, "কী করছিস তুই?"

সে তার হাঁটার গতি বাড়িয়ে, একঘেয়ে স্বরে বলল, "ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না স্যাং।"

আরও জোরে হাঁটতে লাগল সে। তার জুতোয় ফুটপাতের ওপর রীতিমতো শব্দ হতে লাগল।

লবিটা বেজ রঙের সোফা আর ফুলগাছের টবে ভরতি। ডেস্কে বসা একজন আফ্রিকান দারোয়ান স্যাং-কে চিনতে পেরে হাসল। সে রেডিয়োতে ফ্রেঞ্চ নিউজ শুনছিল। বলল, "গুড ইভনিং, মিস।"

"হ্যালো রেমন্ড।"

"আবার ঠান্ডা পড়েছে, মনে হয় রাতে বৃষ্টি হবে।"

"হতে পারে।"

AMARBOI.COM

স্যাং লিফটের বোতাম টিপল এবং তারপর লিফটটা আসার অপেক্ষা করতে করতে সামনের আয়নায় নিজের চুলটা ঠিকঠাক করে নিল। দশতলায় এসে থামল ওরা এবং নেমে হলওয়ের একবারে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গেল। খয়েরি রঙের এবং পুরু করে ভার্নিশ করা। স্যাং বেল টিপল। বেলটা দেখতে একটা পিতলের ফ্রেমের মতো, সেটা দরজায় ঝোলানো ছিল। ভিতর থেকে যে টিভির শব্দ আসছিল, সেটা এবার থেমে গেল।

"আমি এসেছি", জোরে জোরে বলল স্যাং।

সে আবার বেল টিপল। পাঁচবার-দশবার বেল টেপার পরও দরজা খুলল না কেউ। স্যাং দরজার গায়ে ওর কপালটা ঠেকিয়ে বলল, "আমি ডেইড্রর কথা শুনেছি। ফারুক, ওর কথা শুনেছি আমি। পলকে ফোন করেছিল ডেইড্র আর তখন সব কথাই শুনেছি আমি", স্যাং-এর গলা কাঁপছিল।

"প্লিজ় দরজা খোলো", এবার নবটা ধরে খোলার চেষ্টা করতে লাগল সে। কিন্তু শক্ত ধাতব লকটা বিশেষ নাড়াতে পারল না।

এবারে পায়ের শব্দ শোনা গেল, একটা চেন খোলারও শব্দ পাওয়া গেল। ফারুক দরজা খুলল, দাড়ি না কামানো মুখে সে পরে ছিল একটা ফ্লেকড ফিশারম্যান সোয়েটার, কর্ডোরয় প্যান্ট এবং খালি পায়ে কালো চপ্পল। ওকে মোটেই দুশ্চরিত্র বলে মনে হচ্ছিল না। শুধু একটু ছোটখাটো চেহারার শিক্ষিত ব্যক্তি!

পলের দিকে চোখ পড়তেই সে বলে উঠল, "তোমাকে তো ডাকিনি ভাই।"

পল সবকিছু জানা সত্ত্বেও ফারুকের কথায় হতবাক হয়ে গেল, একটা কথাও বলতে পারল না।

"প্লিজ় তুমি যাও," ফারুক বলল, "প্লিজ়, অন্তত একবার তো আমাদের প্রিভেসিকে একটু সম্মান দাও!"

পল কোনওরকমে বলল, "স্যাং আমাকে আসতে বলেছে," ফারুক এবার সামনে এগিয়ে এসে শক্ত করে দু'হাত সামনে বাড়াল এবং পলকে এমন ধাক্কা দিল যেন পল একটা বড়সড় আসবাব। নিজেকে কোনওরকমে সামলেই পল চেপে ধরল ফারুকের কবজিদুটো। দু'জন মানুষ হলঘরের প্যাসেজে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। পলের চশমা ছিটকে এসে পড়ল কার্পেটের ওপর। ফারুককে মাটিতে ফেলে তাকে ধরাটা পলের পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। মোটা সোয়েটার পরে থাকা সত্ত্বেও পল যখন তার হাতদুটোকে মুচড়ে দিচ্ছিল, তখন সত্যিই প্রতিরোধের শক্তি ছিল না ফারুকের। পরক্ষণেই পল তার শরীরের ওপর উঠে বসে এমনভাবে ওকে আঘাত করতে লাগল যেন সে ওর প্রেমিকা। তারপর পল হঠাৎ চারপাশে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল স্যাং-কে। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না তাকে।

পল তার নীচে শুয়ে থাকা ফারুকের দিকে তাকাল। লোকটাকে সে খুব কমদিনই চেনে এবং ঘেন্না করে। সে বলল, "স্যাং চায় তুমি ওর কাছে সবকিছু স্বীকার করো, আমার মনে হয়, সেটুকু ওর প্রাপ্য।

পলের মুখ লক্ষ্য করে থুথু ছুড়ল ফারুক। পলের সমস্ত শরীর বেয়ে যেন ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল এবং সে বেশ গুটিয়ে গেল। তখন ফারুক ওকে ধাক্কা মেরে ফ্ল্যাটের বাইরে ফেলে দিয়ে ঢুকে গেল নিজের ঘরে এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। তার বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটের দরজা তখন একটু একটু করে ফাঁক হতে শুরু করেছে। পল শুনল ফারুক চেনটা টেনে আটকে দিচ্ছে। চশমা চোখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর দরজার ভার্নিশ করা কাঠে কান লাগিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল ভিতরে ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটছে। কান্নার শব্দ পেল, তারপর একের পর এক জিনিস মাটিতে ছুড়ে ফেলার শব্দ। একটা সময়ে সে শুনতে পেল ফারুক বলছে, "প্লিজ় এসব বন্ধ করো। তুমি যতটা ভাবছ, ব্যাপারটা ততখানি খারাপ নয়।"

ঠিক তারপরই শুনল স্যাং বলছে, "কতবার? কতবার শুয়েছ ওর সঙ্গে? এইখানে এই বিছানায় তুমি ওকে নিয়ে শুয়েছিলে?"

একটু পরেই লিফটের দরজা খুলে গেল এবং মাথায় পাকা চুলওলা একটা রোগা লোক হাতে একগোছা চাবি নিয়ে এগিয়ে এল ফারুকের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। পলকে জিজ্ঞেস করল, "আমি এই বিল্ডিং-এর সুপার। আপনি কে?"

"ভিতরে যে মহিলা আছেন, আমি তার সঙ্গে থাকি।" পল ফারুকের দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

"ওর স্বামী?"

"না।"

সুপার দরজায় টোকা মারলেন এবং বলতে লাগলেন অন্যান্য ফ্ল্যাটের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকজন অভিযোগ করেছে। তিনি নক করতেই থাকলেন যতক্ষণ না দরজাটা খোলে।

ভিতরে একটা ট্রাকলাইটে আলোকিত হলঘরের মতো রয়েছে, পল এককলক তাকিয়ে একটা উজ্জ্বল সাদা রঙের জানলাবিহীন কিচেন দেখতে পেল। একগুচ্ছ রান্নার বই রাখা কাউন্টারে। ডানদিকে ডাইনিং রুম। দেওয়ালে স্যাং-এর ঘরের মতোই একই শেডের সবুজ রং। সুপারের পিছন পিছন বসার ঘরে ঢুকল পল। সেখানে একটা অফ হোয়াইট সোফা, একটা কফিটেবিল রাখা, বারান্দার সামনেটায় একটা স্লাইডিং কাচের দরজা। দেওয়াল জোড়া একটা বুককেস আছে। সেটা আপাতত মেঝেতে পড়ে এবং বইগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ফোনের রিসিভারটা সাইড টেবিলের নীচে ঝুলছে এবং সেখান থেকে একটানা হালকা একটা বিপ বিপ শব্দ হয়েই চলেছে! এসব সত্ত্বেও, ঘরটাকে পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল, কেউ যেন এই ঘরটাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার আয়োজন করছে।

স্যাং একটা ওরিয়েন্টাল কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে ছিল। তার হাতভরতি একগাদা কাচের টুকরো। সম্ভবত সেটা কোনও স্বচ্ছ কাচের ফুলদানিরই হবে। সে রীতিমতো কাঁপছিল। অবিন্যস্ত চুল তার মুখের বেশ কিছু অংশ ঢেকে দিয়েছে। সারা ঘরে জল এবং নষ্ট হওয়া ফুলের বোকে ছড়িয়ে আছে। ইরিসেস, টাইগার লিলি, আর ড্যাফোডিল। স্যাং খুব সাবধানে সেগুলো পরিষ্কার করছিল এবং কফিটেবিলের ওপর জমা করে রাখছিল। তার চুলে এবং গলায়ও, মুখে, গালেও লেপটে ছিল ফুলের পাপড়ি, শুকনো পাতার টুকরো। স্কুপনেক টপের ভিতর দিয়ে তার গলায় কাছে একটা সদ্য ছড়ে যাওয়ার দাগ দেখা যাচ্ছিল।

সকলেই তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কেউ অবশ্য কোনও কথা বলছিল না। কালো বুটপরা একজন পুলিশ ঢুকল বন্দুক নিয়ে। তার রেডিয়ো ঘরের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে চলতে থাকল। পুলিশটি বলল, এই বিল্ডিং থেকে পুলিশ স্টেশনে কমপ্লেন করা হয়েছে। স্যাং-কে জিজ্ঞেস করল ফারুক তাকে মারধর করেছে কি না। স্যাং তখনও মেঝেতেই বসে ছিল এবং ওই অবস্থাতেই মাথা নেড়ে "না" বলল।

পুলিশটি আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এখানেই থাকেন?"

স্যাং অজ্ঞাতে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "আমি দেওয়ালে রং করছিলাম,"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সঙ্গে পলের মনে পড়ে গেল, বিলি হলিডে শুনতে শুনতে স্যাং-এর নিজের ঘর রং করার দৃশ্য।

পুলিশের লোকটি ঝুঁকে পড়ে কার্পেটে পড়ে থাকা ভাঙা কাচ, ফুলের ধ্বংসাবশেষ সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। স্যাং-এর গলার ছড়ে যাওয়া অংশও চোখ এড়াল না তার। "কী হয়েছে এখানে?"

"আমি এগুলো কিনেছিলাম", বলার সঙ্গে সঙ্গেই দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে এল ওর গালে। ভারী গলায় লজ্জিত স্বরে সে বলল, "আমিই নিজেই করেছি এসব।"

এরপর সবকিছু নিয়মমাফিক চলতে লাগল। লোকজন কোনও প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে চলে গেল। পুলিশের লোকটি তার কাজ সেরে হাত ধরে স্যাং-কে বাথরুমে নিয়ে গেল। সুপার ফারুককে ফাইন-সংক্রান্ত কিছু একটা বলে চলে গেলেন। ফারুক কিচেনে গিয়ে একগাদা রোল করা কাগজ, গারবেজ ব্যাগ নিয়ে এল এবং সেগুলো কার্পেটে রেখে একটু আগে স্যাং-এর তৈরি করা আবর্জনা পরিষ্কার করতে লাগল। হঠাৎ পুলিশটি পলের দিকে তাকাল, যেন এই প্রথম দেখল তাকে। জিজ্ঞেস করল পলও এদের সঙ্গে যুক্ত কি না।

"আমি স্যাং-এর হাউজমেট। আমি শুধু ওকে এখানে ড্রপ করতে এসেছিলাম।"

AMARBOI.COM

পরদিন সকালে গাড়ির আওয়াজে ঘুম ভাঙল পলের। সে জানলার কাছে গিয়ে দেখল ট্যাক্সির ট্রাঙ্কটা চেপে বন্ধ করছে ড্রাইভার। স্যাং কিচেন টেবিলে একটা নোট রেখে গিয়েছে যে, সে লন্ডনে তার দিদির কাছে যাচ্ছে। আরও লেখা, "পল, কালকের দিনটার জন্য থ্যাঙ্কস!" তার সঙ্গে বাড়িভাড়ায় তার অংশটুকুর একটা চেক কেটে দিয়ে গিয়েছে।

এরপর কিছুদিন শান্তভাবেই কেটে গেল। পল স্যাং-এর চিঠিপত্রগুলো সংগ্রহ করে রেখে দিল। যে বইয়ের দোকানে স্যাং কাজ করত, তারা ফোন করে জানতে চেয়েছিল, স্যাং কোথায়। পল বলেছিল তার জ্বর হয়েছে। দু'সপ্তাহ পরে তারা আবার ফোন করে জানায় যে, স্যাং-কে তারা ছাড়িয়ে দিয়েছে। তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ফোন করতে শুরু করল ফারুক, কথা বলতে চাইছিল স্যাং-এর সঙ্গে। ফারুক নিজের পরিচয় দেয়নি, আবার পল যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের পর রাত তাকে বলে গিয়েছে স্যাং নেই, তখনও সে জোর করে কিছু জানতে চায়নি। পলের সঙ্গে সে যথেষ্ট শান্তভাবে কথা বলেছে, যেন কিছুই হয়নি। 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে পরে ফোন করবে বলেও জানিয়েছে। ফারুকের ফোনগুলো ধরতে বেশ মজা পাচ্ছিল। স্যাং কোথায় আছে, এই তথ্য থেকে ফারুককে বঞ্চিত করে বেশ ভাল লাগছিল তার। এরই মধ্যে পরীক্ষার পড়াশোনা করার জন্য হিথার এসে থাকতে শুরু করল। সেই সপ্তাহেই যখন ফারুক ফোন করে, হিথার সরাসরি বলে দেয়, "স্যাং দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে।" ফারুকের ফোনপর্বের সেখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যায়।

মাসের শেষে দেখা গেল, কিছু বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। পল আর হিথার দু'জনে মিলে সবটা পূরণ করতে পারল না। বাধ্য হয়েই তারা স্যাং-এর বাবা-মাকে ফোন না করে একটা পুরনো টেলিফোন বিল থেকে দেখে লন্ডনে স্যাং-এর দিদির বাড়িতে ফোন করল। যিনি ফোন ধরলেন, তাঁর গলাটা একেবারে স্যাং-এর মতো।

"স্যাং?"

সঙ্গে সঙ্গে রিসিভারটা হাতবদল হয়ে গেল, একটি পুরুষকণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি?"

"আমি ওর হাউজমেট, আমেরিকা মানে ব্রুকলিনে। আমার নাম পল, একটা বিশেষ কারণে ওকে দরকার।"

এরপর বেশ কিছুক্ষণের একটা বিরতি। কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর পলের মনে হয়েছিল এবার লাইনটা কেটে দিয়ে আবার একবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ঠিক তখনই সেই লোকটি আবার ফোন ধরল এবং এতক্ষণ ধরে তাকে অপেক্ষা করানোর জন্য একটুও ক্ষমা না চেয়ে বলল, "স্যাং এই মুহূর্তে এখানে নেই, এলে নিশ্চয়ই ওকে তোমার কথা বলব।"

উইকএন্ডে স্যাং-এর জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে নিতে এল চার্লস। জামাকাপড় বেছে বেছে কিছু নিল আর কিছু গারবেজ ব্যাগে ফেলল সে, পরিষ্কার করতে লাগল অন্যান্য আবর্জনা এবং পলকে বলল বিছানাটা বাড়ির বাইরে নেওয়াতে তাকে একটু সাহায্য করার জন্য। ভারতীয় মিনিয়েচারগুলোকে কিচেন টেবিলে রেখে খবরের কাগজ দিয়ে মুড়তে-মুড়তে সে পলকে বলছিল, স্যাং-এর সঙ্গে তার ফোনে কথা হয়েছে। সে এখন সামার পর্যন্ত লন্ডনে তার দিদির কাছেই থাকবে। "আমি স্যাং-কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতবার বলেছি, ওই ছেলেটাকে কাটিয়ে দে! তুই জানিস ও আমার সঙ্গে ফারুক ছেলেটার দেখা পর্যন্ত করায়নি!"

চার্লস ওর ট্রাকের পিছনটা মালপত্রে পুরো ভরতি করে নিল। কিন্তু সবকিছু খালি হয়ে যাওয়ার পরও স্যাং-এর চিহ্ন রয়ে গেল দেওয়ালের গোলাপি-সবুজ রঙে আর ডিশ-ড্রেনারের ওপর রাখা ঝুলন্ত চারাগাছে।

"আমার মনে হয়, মোটামুটি সব কিছু নেওয়া হয়ে গিয়েছে," বলল চার্লস।

ট্রাকটা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল পল, রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোকে দেখতে লাগল অন্যমনস্ক হয়ে। চার্লস স্যাং-এর বন্ধু, অথচ স্যাং ওকে কিছুই বলেনি! চার্লসকে স্যাং এ-ও বলেনি যে, পল মাসের পর মাস ধরে ডেইড্রর কথা জানত। সেদিন রাতে ফারুকের অ্যাপার্টমেন্টে বাথরুম থেকে একটু মুখে চোখে জল দিয়ে আসার পর স্যাং ফারুকের দেওয়াল-আলমারিতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ে পাগলের মতো কাঁদছিল। একটা সময় তো সে জুতো দিয়ে নিজের গালে মারতে শুরু করে দিয়েছিল। দেওয়াল-আলমারি থেকে সে বেরোতেই চাইছিল না, যতক্ষণ না পুলিশটি তাকে হাত ধরে জোর করে টেনে বের করল এবং পলকে বলল বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার দেখাশোনা করতে। ছোট ছোট ফুলের পাপড়ি আর পাতা তখনও তার চুলে লেগে ছিল। লিফটে পলের হাত ধরল সে এবং বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত সারাটা রাস্তা ধরেই রইল। গাড়ির মধ্যে নিজের দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ক্রমাগত কেঁদেই চলল, পলের হাত এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়ছিল না, এমনকী পল যখন গিয়ার চেঞ্জ করছিল, তখনও স্যাং তার হাত ধরে ছিল। পল ওকে সিটবেল্ট পরিয়ে দিয়েছিল, কাঠ হয়ে বসেছিল স্যাং, কোনও নড়াচড়া করেনি। যদিও গাড়িটা যখন বাঁক নিল তখন সে দেখেনি, তবুও স্যাং বুঝতে পারল বাড়ি এসে গিয়েছে। ততক্ষণে তার কান্না বন্ধ হয়েছে, নাক টানছিল, তারপর হাতের পিছন দিয়ে চোখ মুছে নিল সে। ঠিক তখনই শুরু হল হালকা বৃষ্টি এবং মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির সামনের কাচ বৃষ্টির জলের দাগে ভরে যেতে লাগল। ছোট ছোট কোনাকুনি ভাবে নেমে আসা বৃষ্টির ফোঁটাগুলো দেখে পলের মনে হয়েছিল সেগুলো স্যাং-এর নিজের শরীরের আঘাতের মতন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল যেদিন পরীক্ষায় পাশ করল, দু'জন প্রোফেসর তাকে ফোর সিজনস বারে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই বিকেলেই অনেকগুলো ড্রিঙ্ক নিল সে, বিশেষ করে আইস কোল্ড মার্টিনিজ, বসন্তের গরমে যা নেওয়া একেবারেই ঠিক হয়নি। একে সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, তার ওপর আগের দিন রাতেও ভাল ঘুম হয়নি। ফলে খুব অল্প সময়েই মাতাল হয়ে গেল সে। আজ ও সব ক'টা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এবং ফাইনালি তিন বছর পর অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। আগেরবারের ঘটনাটা মাথায় রেখে প্রোফেসররা তাকে পরামর্শ দিলেন, "ভাবো যে ওসব কিছু ঘটেইনি।"

হ্যান্ডশেক করে এবং ভালভাবে পাশ করার জন্য পলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে তাঁরা চলে যাওয়ার পর পল টয়লেটে গেল এবং মুখে ভাল করে জলের ঝাপটা দিল। তারপর একটা সাদা তোয়ালে দিয়ে মুখটা ভাল করে মুছে নিয়ে সিঙ্কে রাখা একটা চামড়ার মোড়া খাপে ভরা বোতল থেকে হালকা কোলন স্প্রে করে নিল শরীরে। হোটেলের লবিতে ফিরে এসে ওর মনে হল রিসেপশন ডেস্ক থেকে শুরু করে বড় বড় ফুলের বোকে, সুসজ্জিত লোকজন, দামি দামি লাগেজে ভরতি পিতলের গাড়িগুলো যেন ভেসে ভেসে একটা নাগরদোলার মতো তার চারদিকে ঘুরছে। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই তারাবাজির মতো প্রতিবিম্বগুলো উপভোগ করার চেষ্টা করতে লাগল, যতক্ষণ না তারা ঝাপসা হয়ে আসে। সে চাইছিল না এই ঘোরটা কেটে যাক! একেবারে হঠাৎ করেই মনে হল সঙ্গে টাকা আছে কি না, যাতে এখনই রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে একটা শান্ত, বড় সাদা বিছানাওয়ালা ঘরের জন্য অনুরোধ করতে পারে।

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা বাঁক নিয়ে রাস্তাটা পার হল সে এবং তারপর কমনওয়েলথ অ্যাভেনিউর দিকে হাঁটতে লাগল। রাস্তার এই অংশটা ইউনিভার্সিটির পাশের অংশটা থেকে অনেকটা অন্যরকম। এখানে রয়েছে গাছে ঘেরা আভিজাত্যে ভরা বুলেভার্ড, সার বেঁধে থাকা দৃষ্টিনন্দন বাড়ি এবং বাড়ির সামনে রাখা বেঞ্চ, যেখানে বসে খুঁটিয়ে লক্ষ করা যায় বাড়ির স্থাপত্যশিল্প! অলিগলির নামও অক্ষরক্রম মেনে দেওয়া হয়েছে যেমন, বার্কলে, ক্ল্যারেনডন, ডার্টমাউথ ইত্যাদি। পল খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল, পানীয়ের প্রভাব তখনও রয়ে গিয়েছে। সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, বাড়ি যাওয়ার জন্য যদি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়! এক্সটার স্ট্রিটে এসে তার চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ল, বেঞ্চে একটি কাপ্‌ল বসে রয়েছে। লক্ষ করে দেখল ফারুক বসে রয়েছে একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি ছিপছিপে সুন্দরী কিন্তু শুকনো চেহারার। নাকটা যেন তার মুখের তুলনায় একটু বেশিই খাড়া, পা দুটো নির্মেদ এবং পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে সে। চোখের মণির রং হালকা টারকোয়াজ় ব্লু এবং চোখে মাসকারা লাগানো ঘন পল্লব। এত ঘনঘন চোখের পাতা ফেলছিল সে, যেন তার চোখে বালির কণা বা ওই জাতীয় কিছু একটা পড়েছে।

ওদের ঠিক উলটোদিকেই একটা খালি বেঞ্চ ছিল। পল হেঁটে গিয়ে সেখানে বসল। গলায় টাইয়ের ফাঁসটা একটু আলগা করে সে সরাসরি তাকাল ফারুকের দিকে। এই লোকটার জন্য ডেইড্র এমন একজনকে ফোন করে মনের কথা বলেছিল, যাকে সে চেনে পর্যন্ত না এবং শেষ পর্যন্ত বোকা বনে গেল। এই লোকটার জন্যই স্যাং দেশ ছেড়েই চলে গেল, রিফিউজ় করেছিল তার একগুচ্ছ প্রণয়প্রার্থীকে। এইসব প্রার্থীরা স্যাং-কে চিনত না, তাই কোনও সুযোগও পেল না।

"এগুলো প্রেম নয়," প্রায়ই বলত স্যাং।

তারা এখনও উৎসাহভরে ফোন করে বাড়িতে, পরিষ্কার করে দেয় তাদের উদ্দেশ্য, "আপনি কি স্যাং-এর লন্ডনের নম্বরটা জানেন?"

কিন্তু এসব ভাবনাচিন্তা পল আপাতত ঝেড়ে ফেলল। তার মাথা এখনও বেশ ঘুরছে। আর-একবার ফারুককে খুঁটিয়ে দেখল সে। এই লোকটার বুকের ওপর সে চড়ে বসেছিল। এই মুহূর্তেও যেন পল তার শরীরের নীচে ফারুকের সেই পা, বুকের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিল, গন্ধ পাচ্ছিল তার শরীরের, চুলের এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের। স্যাং এবং ডেইড্রর সঙ্গে মিশে সে জীবনে একটা শিক্ষা পেয়েছিল, ওরাও হয়তো পেয়েছিল নিজের মতো করে! পল দেখল ফারুক আর মেয়েটি পলকে দেখে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। 'দেখুক গে' পল ভাবল, ওর সামনে দিয়ে একবার হেসে ঘুরে এলে হয় না! ফারুক তো এখন ওকে কিছু বলতেও পারবে না, বিশেষ করে পাশে যেখানে একজন অন্য মেয়ে বসে আছে। পিছনদিকে মাথা হেলিয়ে কাঠের বেঞ্চের গায়ে হেলান দিল পল, শেষ বেলার রোদে নিজের শরীর মুখ উত্তপ্ত হতে দিল। পা ছড়ানোর মতো একটা ভঙ্গি করে চোখ বন্ধ করল সে।

AMARBOI.COM

হঠাৎই হাতে কে যেন ধাক্কা দিল তাকে। চোখ খুলে দেখল ফারুক দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

"তোমাকে সেদিন খুন করিনি বলে তোমার আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত," ফারুকের কণ্ঠস্বরে কোনও উত্তেজনা নেই, এমনই নির্বিকারভাবে কথাগুলো সে বলল পলকে।

পল চশমা খুলে তড়িঘড়ি চোখ মুছে বলল, "মানে?"

"তুমি আমার কাঁধে এত বাজেভাবে মেরেছ যে, আমাকে এমআরআই করাতে হয়েছে। হয়তো সার্জারিও করাতে হতে পারে।"

ফারুকের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি ফিসফিস করে কী যেন বলল তাকে, পল ঠিক শুনতে পেল না। মেয়েটির দিকে ফিরে সে বলতে লাগল, "কিন্তু ওর জানা উচিত, একথা," ফারুকের কঠিন স্বর ক্রমশ চড়তে লাগল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে একসঙ্গে চলে গেল দু'জনে। পল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ওদের চলে যাওয়ার দিকে, ওর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল যে, ওরা একসঙ্গে গেলেও ওদের মাঝে একটা ফাঁক রয়েই গিয়েছে। ঠিক তখনই পল লক্ষ করল, মেয়েটির হাতে ধরা লম্বা চামড়ার দড়িতে একটা ছোট্ট হলদেটে ধরনের কুকুর তাকে সারা রাস্তা ধরে ক্রমাগত টেনে টেনে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

হেমা এবং কৌশিক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে একবার

আমি তোমাকে আগে দেখেছিলাম। অসংখ্যবার। কিন্তু আমার জীবনে তোমার উপস্থিতির প্রথম স্মৃতি সেইদিনের, যেদিন আমার পরিবার তোমার পরিবারের জন্য আমাদের ইনম্যান স্কোয়ার-এর বাড়িতে একটি বিদায়-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তোমার মা-বাবা ঠিক করেছিলেন যে, কেমব্রিজ ছেড়ে চলে যাবেন। অন্যান্য বাঙালির মতো অ্যাটলান্টা বা অ্যারিজোনা যাওয়া নয়, একেবারে ভারতে ফিরে যাওয়ার জন্য। আমার মা-বাবা এবং তাঁদের বন্ধুরা বিদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার যে লড়াই শুরু করেছিলেন, তা ত্যাগ করে। সেটা ছিল ১৯৯৪ সাল। আমার তখন ছ'বছর বয়স, আর তোমার ন'বছর। সেই পার্টির আগের কয়েক ঘণ্টা আমার পরিষ্কার মনে আছে। মা তখন সকলের আসার জন্য আয়োজনে ব্যস্ত। আসবাবপত্র পালিশ করা হল, টেবিলের ওপর কাগজের প্লেট এবং ন্যাপকিন রাখা হল। ঘরগুলো পাঁঠার মাংসের ঝোলের আর পোলাওয়ের গন্ধে ভরে গেল। তার সঙ্গে মিশে ছিল লেয়ার দু তম্প (L'Air du Temps)-এর সুগন্ধ, যে পারফিউমটা মা বিশেষ উপলক্ষেই ব্যবহার করতেন। ভালভাবে প্রথমে নিজের গায়ে স্প্রে করে, তারপর আমার পোশাকে আর আমি যা-ই পরে থাকতাম, জামার সেই জায়গাটার রং সাময়িকভাবে আরও গাঢ় দেখাত। সেদিন আমি যে পোশাকটা পরেছিলাম, সেটা কলকাতা থেকে আমার ঠাকুমা পাঠিয়েছিলেন। সাদা সালওয়ারের কোমরটা এতই চওড়া ছিল যে, আমার মতো দু'জন তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারত। সঙ্গে ফিরোজা রঙের কুর্তা এবং প্লাস্টিকের মুক্তো বসানো কালো মখমলের হাতকাটা জ্যাকেট। যখন চান করতে গিয়েছিলাম, তখন জামার তিনটে অংশই মা-বাবার খাটের ওপর বার করে রাখা ছিল। আর মা যখন একটা মোটা দড়ি সেফটিপিন দিয়ে সালওয়ারের বিশাল চওড়া কোমরে পরাচ্ছিলেন, আড়ষ্ট কাপড়টা একটু একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে টেনে এনে শেষে আমার পেটের কাছে শক্ত করে দড়িটা গিঁট বেঁধে দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে কাঁপছিলাম। হাতের আঙুলগুলো শীতে সাদা হয়ে মুঠি পাকিয়ে ছিল। পাজামার মোড়ার জায়গার ভেতর দিকে এক জায়গায় একটা গোলের মধ্যে বেগুনি রঙের অক্ষর ছাপা ছিল। কাপড়ের কোম্পানির সিল। মনে আছে আমি সেটা নিয়ে খুঁতখুঁত করেছিলাম এবং অন্য কিছু পরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কাচলে ছাপটা উঠে যাবে। আর এমনিতেও, কুর্তার ঝুলের জন্য ওটা দেখা যাবে না।

মা আরও অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। খাবারের মান এবং পরিমাণ ছাড়াও, আবহাওয়া তাঁকে চিন্তায় ফেলেছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সন্ধেবেলা বরফ পড়তে পারে। আর সেই সময় আমার মা-বাবা এবং তাঁদের বন্ধুদের গাড়ি ছিল না। তোমরা এবং বেশিরভাগ অতিথিই এত কাছে থাকতেন যে, হেঁটে আসতে পনেরো মিনিটও লাগত না। হয় হার্ভার্ড বা এমআইটি-র পেছনের পাড়ায় নয়তো মাস অ্যাভিনিউ ব্রিজটা পেরিয়েই। আবার কেউ কেউ আরও দূরে থাকতেন। তাঁদের বাস বা টি-তে চেপে মাল্ডেন বা মেডফোর্ড বা ওয়াল্টহ্যাম থেকে আসার কথা। "মনে হয় ড. চৌধুরী সকলকে তাঁর গাড়ি করে পৌঁছে দিতে পারবেন," আমার চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে মা তোমার বাবার কথা বললেন। আমার মা-বাবার চেয়ে তোমার মা-বাবা বয়সে একটু বড় ছিলেন— এবং বহুদিন এদেশে বসবাস করছিলেন। তোমার মা-বাবা ১৯৬২ সালে ভারত ছেড়েছিলেন, বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানানোর আইন পালটে যাওয়ার আগে। আমার বাবা এবং অন্যান্য ছাত্ররা যখন পরীক্ষা দিচ্ছেন, তত দিনে তোমার বাবার পিএইচডি করা হয়ে গিয়েছিল। তিনি একটা গাড়ি চালিয়ে— বাকেট-সিটওয়ালা একটা রুপোলি সাব— অ্যান্ডোভারের এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে কাজ করতে যেতেন। ওই গাড়িতে চেপে আমি অনেকবার বাড়ি ফিরেছি, যখন কোনও পার্টি অনেক রাত পর্যন্ত চলত এবং আমি কোনও অচেনা খাটে ঘুমিয়ে পড়তাম।

যখন আমাদের মায়েদের আলাপ হয়েছিল, তখন মা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। যদিও তিনি তখনও তা জানতেন না। মাথা ঘুরছিল বলে একটা ছোট পার্কের বেঞ্চে বসে পড়েছিলেন। তোমার মা দোলনায় বসে আস্তে আস্তে দুলছিলেন,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তুমি সেই সিটে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিলে। তাঁর চোখে পড়ল, একজন অল্পবয়স্ক বাঙালি মহিলা, পরনে শাড়ি, মাথায় সিঁদুর। "শরীর খারাপ লাগছে নাকি?" তোমার মা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তোমাকে দোলনা থেকে নামিয়ে মা'কে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। তখন হাঁটার সময়ই তোমার মা বলেছিলেন যে, হয়তো মা অন্তঃসত্ত্বা। তাঁরা সেই মুহূর্তে বন্ধু হয়ে যান। আমাদের বাবারা কাজে বেরিয়ে গেলে মায়েরা একসঙ্গে সারাদিন কাটাতেন। কলকাতায় যে জীবনটা ফেলে এসেছিলেন, তার কথা বলতেন। যোধপুর পার্কে তোমার মায়ের সুন্দর বাড়ি, ছাদে জবাফুল আর গোলাপের টব; মানিকতলায় একটা নোংরা পঞ্জাবি রেস্তোরাঁর ওপর আমার মায়ের সাধারণ ফ্ল্যাট, যেখানে তিনটে ঘরে সাতজন মানুষ থাকতেন। কলকাতায় থাকলে হয়তো তাঁদের কখনও দেখা হত না। তোমার মা কনভেন্ট স্কুলে পড়েছিলেন, তাঁর বাবা ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট উকিলদের একজন। পাইপ খেতেন, ইংরেজদের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন এবং স্যাটারডে ক্লাবের সদস্য। আমার মায়ের বাবা জেনারেল পোস্ট অফিসের কেরানি ছিলেন। আমেরিকায় আসার আগে মা কখনও টেবিলে বসে খাননি বা কমোডে বসেননি। কেমব্রিজে এই তফাতগুলো অপ্রাসঙ্গিক ছিল কারণ এখানে তাঁরা দু'জনেই সমান একাকিত্ব অনুভব করতেন। একসঙ্গে বাজার করতেন, স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করতেন, আমাদের বা তোমাদের স্টোভে রান্না করতেন এবং রান্না হয়ে গেলে খাবারটা ভাগ করে নিতেন। একসঙ্গে উল বুনতেন। একঘেয়ে লাগলে এঁর হাতের কাজ উনি করতেন। আমি জন্মানোর পর, তোমার মা-বাবাই একমাত্র বন্ধু ছিলেন, যাঁরা হাসপাতালে মাকে দেখতে এসেছিলেন। তোমার পুরনো উঁচু চেয়ারে বসে আমাকে খাওয়ানো হয়েছিল, তোমার পুরনো প্রামে বসিয়ে আমাকে রাস্তায় বার করা হয়েছিল।

পার্টি চলাকালীন, আশঙ্কা অনুযায়ী বরফ পড়তে শুরু করল। যাঁরা দেরি করে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা ভিজে, সাদা হয়ে যাওয়া কোট পরে এসে পৌঁছোলেন। কোটগুলো শাওয়ারের পরদার রড থেকে ঝুলিয়ে রাখতে হল। অনেক বছর পর্যন্ত মা গল্প করতেন কেমন করে পার্টি শেষ হওয়ার পর তোমার বাবা বারবার গাড়ি চালিয়ে অতিথিদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। এক দম্পতিকে তো এলিফ্যান্ট পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন তাঁর কোনও অসুবিধেই হবে না, গাড়িটা চালানোর ওটাই তাঁর শেষ সুযোগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা দেশে ফেরার আগে তোমার মা বাবা আবার এসেছিলেন। হাঁড়ি-কড়া, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি, চাদর-কম্বল, ময়দা চিনির অর্ধেক ব্যবহৃত ব্যাগ, শ্যাম্পুর বোতল এসব নিয়ে। সেই জিনিসগুলো আমরা তোমার মায়ের জিনিস বলেই উল্লেখ করতাম। "পারুলের ফ্রায়িং প্যানটা দাও তো," মা বলতেন। বা, "আমার মনে হয় পারুলের টোস্টারের সেটিংটা নীচের দিকে করে দিতে হবে।" তোমার মা শপিং ব্যাগ ভরতি করে তোমার কিছু জামাকাপড় এনেছিলেন, যেগুলো তাঁর মনে হয়েছিল যে, আমার কাজে লাগতে পারে। মা ব্যাগগুলো তুলে রেখে দিয়েছিলেন। কয়েক বছর পর আমরা যখন ইনম্যান স্কোয়ার থেকে শ্যারনের বাড়িতে চলে গেলাম, তখন সেগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, জামাকাপড়গুলো ব্যবহার করা শুরু হল। প্রধানত শীতের জামাকাপড়ই ছিল, যা ভারতে দরকার পড়ত না। মোটা মোটা টি-শার্ট, নীল এবং বাদামি রঙের টার্টলনেক। আমার জামাগুলো বিশ্রী লাগত, পরতে চাইতাম না। কিন্তু মা কিছুতেই সেগুলোকে বাতিল করতেন না। তাই আমি বাধ্য হতাম তোমার সোয়েটার পরতে। বৃষ্টিতে তোমার রাবারের বুটজুতো পরতে হত। এক শীতে আমাকে জোর করে তোমার কোট পরানো হয়েছিল। কোটটা আমার এতই খারাপ লাগত যে, শেষে আমার তোমার ওপর খুব রাগ হত। কোটটা ছিল কালচে নীল, কমলা রঙের লাইনিং দেওয়া আর হুডের চারপাশে এবড়োখেবড়ো ধূসর-বাদামি ট্রিম। ক্লাসের অন্য মেয়েরা ফোলা ফোলা গোলাপি বা বেগুনি রঙের জ্যাকেট পরত। তাদের মতো করে সাজতে, অথবা ডান দিকে চেন লাগাতে আমি কখনও অভ্যস্ত হতে পারিনি। যখন মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একটা নতুন কোট পেতে পারি কি না, তখন তাঁরা রাজি হননি। বলেছিলেন, কোট তো কোটই। আমি ওটা পরার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম, চাইতাম ওটা হারিয়ে যাক। চাইতাম যে, আমার ক্লাসের যে ছেলেগুলোর অবিকল একইরকমের কোট ছিল, তারা কেউ একজন আমাদের কোট-রাখার সরু ঘরটা থেকে ভুল করে আমার কোটটা নিয়ে যাক। কিন্তু মা কোটের ভিতর আমার নাম লেখা একটা লেবেলও লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধিটা তিনি 'গুড হাউসকিপিং' পড়ে পেয়েছিলেন।

একবার আমি কোটটা স্কুলবাসে ফেলে এসেছিলাম। সেটা শীতের শেষে

AMARBOI.COM

একটা কোমল দিন। বাসের জানলা খোলা ছিল। সকলে কোট-জ্যাকেট খুলে সিটের ওপর রেখে দিয়েছিল। আমি যে বাসে আসতাম, সেটায় না এসে অন্য একটা বাসে আসছিলাম, যেটা আমাকে আমার পিয়ানো শিক্ষিকা মিসেস হেনেসির পাড়ায় নামিয়ে দিত। আমার স্টপের কাছে আসার সময় আমি উঠে দাঁড়ালাম। বাসের দরজার কাছে পৌঁছোনোর পর ড্রাইভার হাতল টেনে দরজা খুলে দিল, বলল সাবধানে রাস্তা পার হতে, এক ঝলক সুবাসিত হাওয়া ঢুকে পড়ল বাসের ভেতর। আমি কোটটা ফেলে বাস থেকে নেমে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "এই হেমা, এটা ভুলে গিয়েছিস!" বাসে কেউ আমার নাম জানে দেখে চমকে গিয়েছিলাম। আসলে কোটের ভিতর লাগানো লেবেলটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

পরের বছর কোটটা ছোট হয়ে গিয়েছিল। খুব খুশি হয়েছিলাম কোটটা দান করে দেওয়া হল দেখে। আস্তে আস্তে তোমার মা-বাবার দেওয়া অন্যান্য জিনিস টোস্টার, চিনামাটির বাসনকোসন, টেফলনের কড়া, তাওয়া ইত্যাদির জায়গায়ও নতুন জিনিস এল। শেষে বাড়িতে তোমাদের আর কোনও চিহ্ন থাকল না। বহু বছর আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল না। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার যে তাগিদ মা-বাবা অনুভব করতেন, তা তাঁদের বন্ধুদের ক্ষেত্রে ছিল না। আত্মীয়দের জন্য মা-বাবা পোস্ট অফিস থেকে একতাড়া এয়ারোগ্রাম কিনে প্রতি সপ্তাহে সেগুলো নিয়মিতভাবে ডাকে পাঠাতেন। দাদু-দিদিমা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, সকলকে উদ্দেশ করে আমাকে তাঁদের চিঠির শেষে তিন লাইন করে লিখতে হত। মা-বাবা তোমাদের কথা খুবই কম বলতেন। মনে হয়, তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, আমাদের বোধহয় আর কোনওদিন দেখা হবে না। তোমরা মুম্বইতে চলে গিয়েছিলে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে। সেখানে আমরা কখনও যেতাম না। তাই ১৯৮১ সালের প্রথম দিন পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি, কথাও হয়নি। সেদিন ভোরবেলা ফোন করে তোমার বাবা আমাদের শুভ নববর্ষ জানালেন এবং বললেন যে, তোমাদের পরিবার ম্যাসচুসেটসে ফিরে আসছে। সেখানে তিনি নতুন চাকরি পেয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, একটা বাড়ি খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত তোমরা আমাদের বাড়িতে থাকতে পারো কি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনের পর দিন ধরে মা বাবা শুধু এই নিয়েই আলোচনা করলেন। ভাবলেন কী গন্ডগোল হয়েছে কে জানে। লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো-তে তোমার বাবা যে চাকরি করতেন, যা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ছিল না, সেই চাকরিটা কি তিনি খুইয়েছেন? তোমার মা কি আর ভারতের বিশৃঙ্খলা এবং গরম সহ্য করতে পারছিলেন না? তাঁদের কি মনে হয়েছিল যে, ভারতের স্কুলগুলো তোমার পক্ষে যথেষ্ট ভাল নয়? সেই যুগে আন্তর্জাতিক ফোনালাপ খুব সংক্ষেপে সারা হত। অবশ্যই তাঁরা এসে থাকতে পারেন, মা-বাবা জানালেন। রান্নাঘরের ক্যালেন্ডারে তোমাদের আসার তারিখে দাগ দিয়ে রাখলেন। তোমাদের আসার কারণ যা-ই হোক না কেন, মা-বাবার কথা থেকে আমি বুঝেছিলাম যে, তোমাদের ফিরে আসাকে মানসিক দোলাচল ও দুর্বলতার চিহ্নস্বরূপ ধরা হচ্ছিল। "ওদের বোঝা উচিত ছিল যে, ফিরে যাওয়া সম্ভবই নয়," মা-বাবা বন্ধুদের বলেছিলেন। দু'দেশেই ব্যর্থ হওয়ার জন্য তোমার মা-বাবার সমালোচনা করেছিলেন। আমরা অভিবাসী হিসেবে টিকে গিয়েছিলাম। তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে। মা-বাবা যেন বলতে চাইছিলেন যে, তোমাদের জায়গায় যদি আমরা ভারতে ফিরে যেতাম, তা হলে আমরা সেখানেও টিকে যেতাম।

তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি তোমাকে আট-ন' বছরের ছেলে হিসেবেই ভাবতাম। যেন তুমি সেই সময়ে স্থির হয়ে আছ, তোমার যে জামাকাপড়গুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি, সেই জামাকাপড়ের মাপে। কিন্তু তোমার বয়স তখন তার দ্বিগুণ— ষোলো, এবং মা-বাবার মনে হয়েছিল যে, সবচেয়ে ভাল হয় যদি তুমি আমার ঘরে থাকো এবং আমি মা-বাবার ঘরে একটা ফোল্ডিং খাট পেতে শুই। তোমার মা-বাবা হলের নীচের গেস্টরুমে থাকবেন। মা-বাবা মাঝে মাঝেই বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতেন। তাঁরা নিউ জার্সি বা নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে সপ্তাহশেষে এসে থাকতেন। জমকালো ডিনার খেতেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। এই অতিথিরা সবসময়ই রবিবার দুপুরের মধ্যে চলে যেতেন। আমার খাটের পাশের মেঝেতে স্লিপিং ব্যাগে অন্য বাচ্চারা ঘুমোত। এসব আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র সন্তান বলে মাঝেমধ্যে এই সঙ্গ আমার ভালই লাগত। কিন্তু আমাকে কখনও নিজের ঘর একেবারে ছেড়ে দিতে বলা হয়নি। মাকে জিজ্ঞেস

AMARBOI.COM

করলাম আমার বদলে তোমাকে কেন ফোল্ডিং খাটে শুতে বলা হচ্ছে না।

"ও শুলে খাটটা কোথায় রাখা হবে?" মা জিজ্ঞেস করলেন। "আমাদের তো মোটে তিনটে শোওয়ার ঘর।"

"নীচে," আমি প্রস্তাব দিলাম। "লিভিং রুমে।"

"সেটা ভাল দেখায় না," মা বললেন। "কৌশিক নিশ্চয়ই এতদিনে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। ওর নিজস্ব জায়গার দরকার।"

"তা হলে বেসমেন্ট?" আমি বললাম। সেখানে একটা ছোট্ট স্টাডিতে বাবার বই রাখার ধাতব তাক রাখা ছিল।

"অতিথিদের ওইভাবে থাকতে দিতে নেই, হেমা। বিশেষ করে এঁদের তো নয়ই। তুমি যখন জন্মেছিলে তখন ড. চৌধুরী এবং পারুলদি যে কী সাহায্য করেছিলেন বলার নয়। গাড়ি করে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কত সপ্তাহ ধরে খাবার দিয়ে গিয়েছিলেন। এবার আমাদের সাহায্য করার পালা।"

"উনি কীসের ডাক্তার?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। যদিও আমার শরীর সবসময় বেশ ভালই থাকত, তবু ডাক্তারদের কেন জানি ভয় করত। বাড়িতে একজন ডাক্তার এসে থাকবেন শুনে আমার নার্ভাস লাগছিল। যেন তাঁর উপস্থিতিই আমাদের কাউকে অসুস্থ করে দেবে।

"উনি তেমন ডাক্তার নন। উনি পিএইচডি করেছেন।"

"বাবারও তো পিএইচডি আছে। বাবাকে তো কেউ ডাক্তার বলে না," আমি প্রশ্ন করলাম।

"যখন আমাদের আলাপ হয়েছিল, তখন একমাত্র ড. চৌধুরীরই পিএইচডি ছিল। 'ডাক্তার' বলে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতাম।"

জিজ্ঞেস করলাম যে, তোমরা কতদিন থাকবে। এক সপ্তাহ? দুই সপ্তাহ? মা ঠিক বলতে পারলেন না। সেটা নির্ভর করছিল তোমাদের সব গোছগাছ করে নতুন বাড়ি খুঁজে পেতে কতদিন লাগবে তার ওপর। ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে ভেবে আমার খুব রাগ হচ্ছিল। ব্যাপার আরও জটিল হয়ে গিয়েছিল এই জন্য যে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি নিয়মিত মা-বাবার ঘরেই খাট পেতে শুতাম। যে ঘরে আমার জামাকাপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র থাকত সেখানে নয়। এটা আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার ছিল। মায়ের মনে হত যে, কোনও বাচ্চাকে একা ঘরে শুতে দেওয়া আমেরিকানদের একটা নিষ্ঠুর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রীতি। বাড়িতে জায়গা থাকলেও তিনি আমাকে একা শুতে দিতে চাইতেন না। মা আমাকে বলেছিলেন যে, বিয়ের আগে পর্যন্ত তিনি তাঁর মা-বাবার খাটেই ঘুমিয়েছেন এবং সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আমি জানতাম, সেটা স্বাভাবিক নয়, আমার স্কুলের বন্ধুরা সেভাবে ঘুমোয় না এবং জানতে পারলে তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। মিডল স্কুল শুরু করার আগের গ্রীষ্মে আমি জোর করে একা শোওয়া শুরু করেছিলাম। প্রথমদিকে মা রাত্রে বারবার এসে আমাকে দেখে যেতেন। যেন আমি একটা শিশু যার নিশ্বাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। জিজ্ঞেস করতেন আমি ভয় পাইনি তো? মনে করিয়ে দিতেন যে, তিনি দেওয়ালের অন্য পাশেই আছেন। প্রথম রাতে আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম। ঘরের নৈঃশব্দ্য আমাকে আতঙ্কিত করেছিল। কিন্তু আমি তা স্বীকার করিনি। কারণ, আমার ভয় ছিল যে, যে জিনিসটা আমার তিন-চার বছর বয়সেই শেখা উচিত ছিল, তাতে আমি ব্যর্থ না হয়ে যাই। পরে অবশ্য কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। ঘুম আসবে না, এই উদ্বেগেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালে একলা ঘুম থেকে জেগে উঠতাম। পুবদিকের যে আলো মা-বাবার ঘরে আসত না, সেই আলোয় আমার ঘুম-জড়ানো চোখ কুঁচকে যেত।

AMARBOI.COM

তোমাদের আসার জন্য বাড়িটা প্রস্তুত করা হল। লিভিং রুমের সোফার জন্য নতুন তাকিয়া কেনা হল। বাদামি টুইডের আচ্ছাদনের পাশাপাশি উজ্জ্বল কমলা রঙের তাকিয়া। গাছ এবং কিউরিয়োগুলো নতুন করে সাজানো হল। আমার স্কুলের পোর্ট্রেট ফ্রেমে বাঁধিয়ে ফায়ারপ্লেসের ওপর টাঙানো হল। ডাকে যে ক্রিসমাস কার্ডগুলো এসেছিল, সেগুলো মা আর আমি এক-এক করে সামনের দরজার চারপাশে টেপ দিয়ে আটকেছিলাম। সেগুলো এবার খুলে ফেলা হল। তোমার বাবার শৌখিন জামাকাপড়ের কথা মনে করে মা-বাবা নিজেদের জন্য সকালে পরার রোব কিনলেন। মায়েরটা মখমলের, বাবারটা স্মোকিং জ্যাকেটের কায়দায় তৈরি। একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখলাম, আমার খাটের গোলাপি-সাদা চাদরটা পালটে সেখানে তামাটে বর্ণের কম্বল রাখা হয়েছে। তোমার এবং তোমার মা-বাবার জন্য বাথরুমে নতুন তোয়ালে রাখা হয়েছিল। আমরা যা ব্যবহার করতাম, তার চেয়ে বেশি মোলায়েম। নীল রংটা আমাদের তোয়ালের নীলের চেয়ে একটু বেশি সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দেওয়াল আলমারি ফাঁকা করা হয়েছিল, রঙে খালি হ্যাঙারগুলো ঝুলছিল। আমাকে দু' একটা দেরাজ খালি করে দিতে বলা হল। আমি কিছু জিনিস সরিয়ে নিলাম যাতে তুমি থাকাকালীন আমাকে ঘরে ঢুকতে না হয়। আমার পাজামা, স্কুলে পরার কয়েকটা পোশাকআশাক এবং জিমে যাওয়ার স্নিকার্সগুলো নিলাম। খাটের পাশের টেবিলে রাখা বইগুলো এবং লাইব্রেরির যে বইটা পড়ছিলাম, সেগুলো নিয়ে এলাম। তোমার চোখের সামনে থেকে আমার জিনিসপত্র যথাসম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করছিলাম। তাই সস্তা, জট-পাকানো চেনে ভরতি আমার গয়নার বাক্সটা এবং অ্যাভন-এর পারফিউমের বোতলগুলো নিয়ে এলাম। ডেস্কের দেরাজ থেকে তালা দেওয়া ডায়রিটা সরালাম। যদিও ক্রিসমাসে ডায়রিটা পাওয়ার পর থেকে আমি মাত্র দু'বারই ওতে কিছু লিখেছিলাম। সপ্তম শ্রেণির ইয়ারবুকটা সরালাম, যেটায় আমার ছবি বেরিয়েছিল আর শেষ পাতায় আমার ক্লাসমেটেরা নানা বোকা বোকা মেসেজ লিখে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন ভারতে লম্বা ছুটি কাটাতে যাওয়ার সময় বেছে নিচ্ছিলাম কোন জিনিসগুলো সঙ্গে নিয়ে যাব। শুধু এবার আমি কোথাওই যাচ্ছিলাম না। তাও আমি জিনিসগুলো একটা সুটকেসে পুরলাম। পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত বারবার সফর করে সুটকেসটার গায়ে ছেঁড়াখোড়া লেবেল আর স্টিকার ভরতি হয়ে গিয়েছিল। সেটাকে টেনে মা-বাবার ঘরে নিয়ে গেলাম।

তোমার মা-বাবার ফোটো খুঁটিয়ে দেখলাম। সেই ফেয়ারওয়েল পার্টির রাতে তোলা কয়েকটা ফোটো একটা অ্যালবামে লাগানো ছিল। তার মধ্যে আমার বাবা রয়েছেন, তাঁর তখনকার আড়ষ্ট, কুচকুচে কালো চুল দেখে ততদিনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি একটা সোয়েটার ভেস্ট পরেছিলেন। শার্টের হাতা গোটানো। ফ্রেমের বাইরের কিছুর দিকে ব্যস্তভাবে আঙুল দেখাচ্ছিলেন। তোমার বাবা সবসময় যে সুট-টাই পরে থাকতেন, সেটাই পরে ছিলেন। তাঁর চশমা পরা, সুদর্শন মুখ কারও দিকে কথা বলার জন্য ঝুঁকে ছিল। তাঁর সবুজাভ চোখ আর কারও চোখের মতো ছিল না। তোমার মায়ের চুলের মধ্যিখানের সিঁথি তাঁর মুখের সরুভাবকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছিল। তাঁর র' সিল্কের শাড়ির আঁচল শালের মতো কাঁধে জড়ানো ছিল। মা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তোমার মায়ের চেয়ে এক মাথা বেঁটে, একটু অবিন্যস্ত বেশবাস, কানের পাশে অগোছালো চুলের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোছা ঝুলছিল। দু'জনেরই মুখ আরক্তিম। যেন পান করেছেন। যদিও সেই সময় তাঁরা কখনও কলের জল বা চা ছাড়া কিছুই খেতেন না। তাঁদের দু'জনের বন্ধুত্ব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে কিন্তু তোমার কোনও চিহ্ন ছিল না। তোমাকে নিয়েই আমার কৌতূহল সবচেয়ে বেশি ছিল। কে জানে সেই ভিড়ে তুমি কোথায় লুকিয়ে ছিলে? আমি কল্পনা করলাম যে, তুমি মা-বাবার শোওয়ার ঘরের কোণের ডেস্কে বসে ছিলে। পার্টি শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে করতে সঙ্গে নিয়ে আসা কোনও বই পড়ছিলে।

এক সন্ধেবেলা তোমাদের নিয়ে আসার জন্য বাবা এয়ারপোর্টে গেলেন। পরের দিন আমার স্কুল ছিল। খাবার টেবিলটা দুপুর থেকে সাজিয়ে রাখা ছিল। কোনও পার্টি হওয়ার কথা থাকলে মা তাই করতেন। যদিও এর আগে কখনও তিনি সপ্তাহের মাঝখানে খাবারের এত আয়োজন করেননি। তোমাদের পৌঁছনোর এক ঘণ্টা আগে তিনি আভেন চালিয়ে, একটা কড়ায় তেল গরম করে ডালের সঙ্গে দেওয়ার জন্য মোটা-মোটা করে কাটা বেগুনের টুকরো ভাজতে শুরু করলেন। ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেল। তারপর বাবা ফোন করে জানালেন যে, তোমাদের প্লেন এসে গিয়েছে, কিন্তু একটা সুটকেস এসে পৌঁছোয়নি। আমার ততক্ষণে খিদে পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শুধু আমার জন্য মাকে আভেনের দরজা খুলে খাবারদাবার বের করতে বলাটা অন্যায় মনে হল। মা বেগুনি ভাজা বন্ধ করে দিলেন। আমরা সোফায় বসে টিভিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে তৈরি একটা ফিল্ম দেখতে শুরু করলাম পরদায় একদল ক্লান্ত লোক একটা আধা-অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। একটি বিশেষ যুগের সিনেমা ছিল পশ্চিমের একমাত্র জিনিস, যা মা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি নিজে কখনও স্কার্ট পরতেন না— পোশাকটা তাঁর অশালীন লাগত— কিন্তু যে-কোনও ফিল্মে অড্রে হেপবার্ন কোন দৃশ্যে কী পোশাক পরেছিলেন, তা মা হুবহু বলে দিতে পারতেন।

আমি মায়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে দেখলাম যে, আমি সোফায় একা। টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির অন্য প্রান্ত থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ালাম। আমার মুখ গরম হয়ে গিয়েছিল, হাত-পা ভারী এবং আড়ষ্ট লাগছিল। তোমরা সকলে খাবার ঘরে বসে খাচ্ছিলে। টেবিলে খাবারের বিভিন্ন পাত্র রাখা ছিল। জলের জাগ ছাড়াও জনি ওয়াকার-এর একটা বোতল তোমার মা-বাবার প্লেটের মাঝখানে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখা ছিল, যেটা থেকে শুধু তাঁরাই পান করছিলেন। তোমার মা তাঁর মসৃণ কালো চুল কাঁধ অবধি ছেঁটে ফেলেছিলেন। তাঁর পরনে স্ল্যাক্স এবং একটা টিউনিক, গলায় একটা সিল্কের স্কার্ফ জড়ানো। ফোটোয় আমি যে ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলাম, তাঁর সঙ্গে তোমার মায়ের শুধু আবছা মিল। ঠোঁটে উজ্জ্বল লিপস্টিক এবং চোখের পাতায় চিকচিকে রঙের জন্য তাঁকে আমার মায়ের চেয়ে কম ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি তখনও রোগা, কণ্ঠার হাড় স্পষ্ট হওয়ায় আরও চটকদার লাগছিল। মধ্যবয়সের যে ভার আমার মায়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর চেপে বসেছিল, তিনি তখনও সেই ভারমুক্ত ছিলেন। তোমার বাবাকে প্রায় আগের মতোই লাগছিল, সেইরকমই সুদর্শন। তখনও জ্যাকেট এবং টাই পরেছিলেন। শুধু তাঁর চোখের চশমা নতুন দশকের নতুন কায়দা অনুযায়ী বদলে গিয়েছিল। তুমি তোমার বাবার মতোই ফরসা লম্বা, সামনে চৌকো করে ছাঁটা চুল একপাশে আঁচড়ানো। চোখ দুটো অন্যমনস্ক হলেও কিছুই তোমার দৃষ্টি এড়াচ্ছিল না। আমি আশা করিনি যে, তোমাকে এত সুদর্শন দেখতে। আশা করিনি যে, তোমাকে আমার এত আকর্ষণীয় মনে হবে।

"আরে, হেমা, এর মধ্যেই এত বড় হয়ে গিয়েছ। তোমার নিশ্চয়ই আমাদের মনে নেই, আছে কি?" তোমার মা বললেন। তিনি আমার সঙ্গে ধীর, প্রসন্ন গলায়, ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস পাওয়া গেল। "এসো। বেচারা, আমাদের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। তোমার মা বললেন তুমি আমাদের জন্য খাওনি।"

আমি বসে পড়লাম। তুমি আমাকে সোফাতে ঘুমোতে দেখেছ ভেবে অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম। যদিও তোমরা পৃথিবীর আর-এক প্রান্ত থেকে সফর করে এসেছিলে, তাও আমারই ক্লান্ত লাগছিল। ঘুমোনোর পরও। মা আমাকে এক প্লেট খাবার দিলেন। কিন্তু তাঁর মনোযোগ ছিল তোমার ওপর এবং তুমি যে দ্বিতীয়বার কিছু নিতে চাইছিলে না সেদিকে।

"প্লেন নামার আগে আমরা খেয়ে নিয়েছিলাম," তুমি উত্তর দিলে। তোমার ইংরেজিতে একটা ক্ষীণ টান ছিল, আমার মা-বাবার মতো গভীর টান নয়। তোমার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে গিয়েছিল, আর ছোট ছেলের মতো শোনাচ্ছিল না।

"ফার্স্ট ক্লাসে যে কত খাবার দেয় তার ঠিক নেই," তোমার মা বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শ্যাম্পেন, চকোলেট, এমনকী ক্যাভিয়ার। কিন্তু আমি সব খাইনি। তোমার রান্না আমার মনে ছিল শিবানী," তিনি যোগ করলেন।

"ফার্স্ট ক্লাস!" মা শ্বাস টানলেন। "সেখানে গিয়ে পড়লে কেমন করে?"

"ওটা আমার চল্লিশতম জন্মদিনের উপহার," তোমার মা বললেন। তোমার বাবার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "জীবনে একবারই, তাই তো?"

"কে জানে?" তোমার বাবা বললেন। স্পষ্টতই তিনি এই বিলাসিতায় গর্ববোধ করছিলেন। "এটা একটা বাজে অভ্যেসও হয়ে যেতে পারে।"

আমাদের মা-বাবারা কেমব্রিজের পুরনো বন্ধুবান্ধবদের আলোচনা করলেন। কে কোথায় চলে গিয়েছে, কোন কাজটা সম্পন্ন করেছে, কে বিয়ে করেছে, কার বাচ্চা হয়েছে, আমার মা-বাবা তোমার মা-বাবাকে সেসব গল্প করলেন। রিগানের নির্বাচন জেতার কথা, বিভিন্নভাবে কার্টারের অযোগ্যতার গল্পও হল। তোমার মা-বাবা রোমের গল্প করলেন। তোমরা পথে দু'দিন সেখানে থেকেছিলে শহরটা ঘুরে দেখার জন্য। তোমার মা ফোয়ারাগুলোর বর্ণনা দিলেন। সিস্টিন চ্যাপেল দেখার জন্য তোমরা তিন ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলে, তার বর্ণনাও দিলেন। "এত সুন্দর গির্জাগুলো," তিনি বললেন। "এক একটা মিউজিয়ামের মতো। আমার তো ক্যাথলিক হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। শুধু যাতে ওগুলোর ভিতর প্রার্থনা করতে পারি।"

"বেঁচে থাকতে একবার প্যান্থিয়ন দেখে নিয়ো," তোমার বাবা বললেন। মা-বাবা মাথা নাড়লেন। প্যান্থিয়ন কী তাঁরা জানতেন না, কিন্তু আমি জানতাম। আমি সেই সময় লাতিন ক্লাসে প্রাচীন রোমের সম্পর্কে পড়ছিলাম। এবং রোমের শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে একটা লম্বা রিপোর্ট লিখছিলাম। সবই এনসাইক্লোপিডিয়া এবং স্কুল লাইব্রেরির বই দেখে। তোমার মা-বাবা মুম্বই এবং সেখানে তোমাদের বাড়ির কথা বললেন। ন' তলার ওপর একটা ফ্ল্যাট, বারান্দা থেকে তালগাছ এবং আরব সাগর দেখা যায়। "তোমরা সেখানে একবার এলে ভাল হত," তোমার মা বললেন। পরে, শোওয়ার ঘরে নিভৃতে, মা বাবাকে বলেছিলেন যে, আমাদের কখনও সেখানে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করা হয়নি।

খাওয়ার পর আমাকে বাড়িটা, এবং তুমি যেখানে ঘুমোবে সেই ঘরটা দেখিয়ে দিতে বলা হল। সাধারণত এই কাজটা করতে আমার খুব ভাল লাগত। এটা ঝাঁটা রাখার আলমারি, এটা নীচের বাথরুম, দেখিয়ে দিতে বেশ

AMARBOI.COM

কর্তৃত্বের আনন্দ পেতাম। কিন্তু সেদিন আমি তেমন কিছুই করলাম না। বুঝতে পারছিলাম যে, তোমার একঘেয়ে লাগছে। তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আমার নার্ভাসও লাগছিল। তোমার প্রতি যে তাৎক্ষণিক, ছেলেমানুষি ভাললাগা তৈরি হয়েছিল তা আমাকে মনে মনে অস্থির করছিল। ততদিনে আমি ছেলেদের প্রশংসার চোখে দেখতে শুরু করেছি। আমার ক্লাসের ছেলেদের, যারা কোনওদিন আমার অস্তিত্ব টের পায়নি এবং জানবেও না। কিন্তু তোমার বয়সি কারও প্রতি, আমার মা-বাবার জগতের কারও প্রতি কখনও আকৃষ্ট হইনি। তুমিই আমাকে নিয়ে গেলে, দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে, একের পর এক দরজা খুলে ঘরের ভিতর মাথা গলিয়ে দেখলে। কিছুই তোমার মনে দাগ কাটল না।

"এটা আমার ঘর। তোমার ঘর," আমি সংশোধন করে বললাম।

এতদিন ধরে আশঙ্কার পর আমি মনে মনে রোমাঞ্চিত বোধ করছিলাম যে তুমি এখানে ঘুমোবে। ভাবলাম যে, তুমি আমার উপস্থিতি অনুভব করতে পারবে। আমাকে কিছুই করতে হবে না, অথচ তুমি আমাকে জানতে পারবে, আমাকে পছন্দ করবে। তুমি হেঁটে গিয়ে জানালাটা খুলে অন্ধকারে বাইরে ঝুঁকে পড়লে। ঘরের ভিতর এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে ঢুকল।

"কখনও ছাদে যাও?" তুমি জিজ্ঞেস করলে। আমি উত্তর দেওয়ার আগেই স্ক্রিনটা উঠিয়ে তুমি বাইরে চলে গেলে। আমি ছুটে জানলায় গিয়ে বাইরে ঝুঁকেও তোমাকে দেখতে পেলাম না। কল্পনা করলাম, তুমি টালি থেকে পিছলে নীচে বাগানে পড়ে যাচ্ছ। আমাকে অ্যাক্সিডেন্টটার জন্য দোষ দেওয়া হচ্ছে। তুমি এমন সাংঘাতিক কাজ করার সময় বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখার জন্য বকাবকি করা হচ্ছে। "তুমি কি ঠিক আছ?" আমি ডেকে উঠলাম। নাম ধরে ডাকা উচিত ছিল, কিন্তু তোমার নাম ধরে ডাকতে আমার বাধো বাধো ঠেকল। অবশেষে তুমি ফিরে এলে। লনের দিকে তাকিয়ে গ্যারেজের ওপরের ঢালু ছাদে বসে থাকলে।

"বাড়ির পিছনে কী আছে?"

"বন। কিন্তু তুমি সেখানে যেতে পারবে না।"

"কে বলেছে?"

"সকলে। মা-বাবা, স্কুলের টিচাররা।"

"কেন নয়?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আগের বছর একটা ছেলে বনে হারিয়ে গিয়েছিল। তাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।" ছেলেটার নাম ছিল কেভিন ম্যাকগ্রাথ। আমার চেয়ে দু'ক্লাস নীচে পড়ত। এক সপ্তাহ ধরে আমরা ছেলেটার খোঁজে আসা হেলিকপ্টারের আওয়াজ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া কিছুই শুনিনি।

খবরটা শুনে তোমার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তার বদলে তুমি জিজ্ঞেস করলে, "সকলের ডাকবাক্সে হলদে ফিতে বাঁধা কেন?"

"ওগুলো ইরানের হোস্টেজদের জন্য।"

"বাজি রেখে বলতে পারি আমেরিকানরা এর আগে ইরানের নামও শোনেনি," তুমি বললে। আমার পড়শিদের দেশপ্রেম এবং অজ্ঞানতা, দুটোর জন্যই নিজেকে দোষী মনে হল।

"ডান দিকে ওটা কী?"

"দোলনা।"

কথাটা শুনে নিশ্চয়ই তুমি মজা পেয়েছিলে। তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে। একটু বিদ্রুপাত্মক মনে হল, যেন কথাটা আমিই আবিষ্কার করেছি।

"ঠান্ডাটা মিস করতাম," তুমি বললে। "এই ঠান্ডাটা।" কথাটা শুনে আমার মনে পড়ে গেল যে, এসব কোনওটাই তোমার কাছে নতুন নয়। "আর বরফ? আবার কবে বরফ পড়বে?"

"জানি না। এ বছর ক্রিসমাসে তো খুব একটা বরফ পড়েনি।"

তুমি ঘরের ভিতরে উঠে এলে। আমার ভয় হল যে, আমার কাছে মনোমতো খবর না শুনতে পেয়ে তুমি হতাশ হয়েছ। আমার সাদা ফ্রেমওয়ালা আয়নায় নিজের দিকে তাকালে। তোমার মাথাটা আয়নায় বাদ পড়ে গিয়েছিল। "বাথরুমটা কোথায়?" প্রশ্ন করে উত্তর দেওয়ার আগেই তুমি দরজার বাইরে চলে গেলে।

সে রাতে, মা-বাবার ঘরে শুয়ে, আমি মাঝরাতের পরও জেগে ছিলাম। অন্ধকারে মা-বাবার কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। ভয় হচ্ছিল যে, তুমিও হয়তো তাঁদের কথা শুনতে পাবে। যে খাটে তুমি শুয়ে ছিলে সেটা দেওয়ালের ঠিক ওইপাশেই ছিল। দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে হাত ঢোকাতে পারলে আমি তোমাকে ছুঁতে পারতাম। মা-বাবা একই সঙ্গে তোমার মা-বাবার সমালোচনাও করছিলেন, আবার তাঁদের দেখে সম্ভ্রমও বোধ করছিলেন। তাঁরা কীভাবে বদলে গিয়েছেন দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। মা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন যে, কেমব্রিজে বাস করে তাঁরা যত না আমেরিকান ছিলেন, মুম্বইতে থেকে তাঁরা তার চেয়ে বেশি আমেরিকান হয়ে গিয়েছেন। মা এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তোমার মায়ের ছোট করে ছাঁটা চুল, তাঁর স্ল্যাক্স, যে জিন ওয়াকারটা তিনি এবং তোমার বাবা খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও পান করছিলেন এবং খাবার ঘর থেকে লিভিং রুমে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে মন্তব্য করছিলেন। প্রধানত মা-ই কথা বলছিলেন, বাবা ক্লান্তভাবে 'হুঁ হাঁ' করে সায় দিচ্ছিলেন। মা-বাবা কখনও মদের দোকানে পা রাখেননি। তাঁরা ভাবছিলেন, তাঁদের আর-একটা বোতল কেনা উচিত কি না। তোমার মা-বাবা যেভাবে চলছিলেন, তাতে বোতলটা পরের দিনই শেষ হয়ে যাবে, মা বললেন যে, তোমার মা 'স্টাইলিশ' হয়ে গিয়েছেন। মায়ের কাছে ওটা একটা নিন্দার বিষভাষা, যার অর্থ নিজেকে এমন প্রশ্রয় দেওয়া, যা থেকে মা নিজেকে নিবৃত্ত করতেন। "একটা ফার্স্ট ক্লাস টিকিটের পয়সায় বারোজন লোক আসতে পারে।" আমার মায়ের জন্মদিন আসত-যেত, কিন্তু বাবা কোনওরকম উপহারের ধার ধারতেন না। আমিই প্রতি জুন মাসের প্রথম দিনে একটা কার্ড তৈরি করে বাবাকে দিয়ে সই করাতাম। মা হঠাৎ উঠে বসে বাতাসে গন্ধ শুঁকলেন, "ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি" বললেন। বাবা জিজ্ঞেস করলেন মা আভেনটা বন্ধ করেছেন কি না। মা বললেন, তিনি নিশ্চিত যে বন্ধ করেছেন, তাও বাবা যেন গিয়ে একবার দেখে আসেন।

"ওটা সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছিলে," বাবা ফিরে এসে বললেন। "বাথরুমে কেউ সিগারেট খেয়েছে।"

"ড. চৌধুরী সিগারেট খান তা তো জানতাম না," মা বললেন। "একটা অ্যাশট্রে রেখে দেওয়া কি উচিত ছিল?"

সকালে তোমরা সকলে জেট ল্যাগের কারণে দেরি করে উঠলে। আমাদের মনে পড়ে গেল যে, যদিও তোমরা বাড়িতে উপস্থিত, হলওয়েতে তোমাদের ব্যাগ রয়েছে, তোমাদের টুথব্রাশ সিঙ্কের ধারে অগোছালো হয়ে পড়ে, তা সত্ত্বেও তোমরা অন্য জায়গার মানুষ। দুপুরবেলা স্কুল থেকে ফেরার পরও আমি দেখলাম, তোমরা ঘুমোচ্ছ। ডিনারে— তোমাদের প্রাতরাশে— আমরা যে তরকারিটা খাচ্ছিলাম, সেটার বদলে তোমরা টোস্ট আর চা খেতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইলে। প্রথম কয়েকদিন সেইভাবেই কাটল। আমরা যখন ঘুমোতাম, তোমরা তখন জেগে থাকতে আর আমরা জেগে থাকাকালীন ঘুমোতে। একই ছাদের তলায় আমরা দুই ভিন্ন মেরুর জীবনযাপন করছিলাম। সুতরাং আমার অন্য ঘরে শোওয়া ছাড়া বিশেষ কিছু পরিবর্তন টের পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি আগের মতোই কমলালেবুর রস আর এক বাটি সিরিয়াল খেয়ে বাসস্টপে চলে যেতাম। তোমার আসার কথা আমি কাউকে বলিনি। প্রায় কখনওই আমি আমার বাড়ির কথা আমার আমেরিকান বন্ধুদের কাছে গল্প করতাম না। ছেলেবেলায় জন্মদিন এলেই আমার ভয় হত যে, বাড়িতে যে ডজনখানেক মেয়েরা আসবে, তারা কিছুক্ষণের জন্য আমাদের জীবনযাত্রার পরিচয় পাবে। জানতাম না যে, কী বলে তোমার পরিচয় দেব। "ফ্যামিলি ফ্রেন্ড," বলতে হত বোধহয়।

তারপর একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখলাম যে, তোমার মা-বাবা জেগে আছেন। কফিটেবিলের ওপর পা উঠিয়ে গোড়ালি আড়াআড়ি করে, যে সোফায় বসে আমি সাধারণত 'দ্য ব্রেড্রি বাঞ্চ' এবং 'জিলিগান্স আইল্যান্ড' দেখতাম, সেটা জুড়ে বসে আছেন। তাঁরা মায়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন। মা রিক্লাইনারে বসে কোলের ওপর বাটি রেখে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। তোমার মা আমার মায়ের একটা নাইলনের শাড়ি পরেছিলেন। বেগুনির ওপর নানা মাপের লাল বৃত্ত আঁকা ছিল শাড়িটাতে। তোমার মায়ের যে সুটকেসটা পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটার সম্বন্ধে একটা খারাপ খবর এসেছিল। সুটকেসটা রোমে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সেটাকে ইয়োহানসবার্গের এক প্লেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে আছে শাড়িটা মায়ের চেয়ে তোমার মায়ের গায়েই আমার বেশি ভাল লেগেছিল। গাঢ় বেগুনি রংটা তাঁকেই বেশি মানিয়েছিল। আমাকে বলা হল তুমি বাইরে উঠোনে আছ। আমি তোমাকে খুঁজতে বাইরে না গিয়ে, পিয়ানো অভ্যেস করলাম। তুমি যখন ফিরে এলে ততক্ষণে বাইরে প্রায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমাকে তখনও চা খেতে দেওয়া হত না। তোমাকে দেওয়া হল। তুমি সেটা নিলে। তোমার মা-বাবাও চা খাচ্ছিলেন, কিন্তু ছ'টার মধ্যে কফিটেবিলে জনি ওয়াকার-এর বোতলটা এসে গিয়েছিল। তোমরা যতদিন আমাদের সঙ্গে ছিলে, ততদিন রোজই বোতলটা বার করা হত। তুমি শুধু একটা পুলোভার পরে বেরিয়েছিলে। তোমার বাবার দামি ক্যামেরা গলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝোলানো ছিল। তোমার মুখে ঠান্ডার প্রভাব দেখা যাচ্ছিল। চোখ জ্বলজ্বল করছিল, কানের ধারগুলো লাল হয়ে গিয়েছিল। ত্বক ভিতর থেকে রক্তিম হয়ে উঠেছিল।

তুমি বললে, "ওদিকে একটা নদী আছে, ওই বনের ভিতর।"

আমার মা নার্ভাস হয়ে পড়লেন। তোমাকে সাবধান করলেন সেদিকে না যেতে, যেমন আমাকেও অনেকবার সাবধান করেছিলেন। যেমন আমি তোমাকে সাবধান করেছিলাম। কিন্তু তোমার মা-বাবা দুশ্চিন্তা করলেন না। তুমি কি ছবি তুলেছ? তাঁরা উলটে জিজ্ঞেস করলেন।

"কিছুই না," তুমি উত্তর দিলে। আমার খারাপ লাগল যে, তোমার কিছুই ভাল লাগেনি। শহরতলিটা তোমার কাছে, তোমার মা-বাবার কাছে নতুন ছিল। তোমার মনে আমেরিকার যা স্মৃতি ছিল সবই কেমব্রিজের, যে জায়গাটা আমার শুধু আবছাভাবে মনে পড়ত।

তুমি চা নিয়ে এমনভাবে আমার ঘরে গেলে যেন সেটা তোমারই ঘর। ডিনারের ডাক পড়ার পরই বেরোলে। কোনও কথা না বলে, চটপট খাওয়া শেষ করে ওপরে ফিরে গেলে। তোমার মা-বাবাই বরং আমার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছিলেন। আমাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমার আচরণের, পিয়ানো বাজানোর, মাকে বাড়ির কাজে সাহায্য করার জন্য প্রশংসা করলেন। "দেখ কৌশিক, হেমা কীভাবে নিজের লাঞ্চ তৈরি করে নেয়," তোমার মা বলতেন, যখন আমি ডিনারের পর, পরের দিন স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য হ্যাম বা টার্কি স্যান্ডউইচ তৈরি করে একটা কাগজের ব্যাগে পুরতাম। আমি তখনও বাচ্চাই ছিলাম। আর তুমি আমার চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড় হয়েও তোমার মা-বাবার নাগালের বাইরে ছিলে। তুমি তাঁদের সঙ্গে তর্ক করতে না, আবার তাঁদের সঙ্গে খুব একটা কথাও বলতে বলে মনে হত না। তুমি যখন বাড়ির বাইরে ছিলে, তখন তোমার মা-বাবা আমার মাকে বলছিলেন যে, ফিরে আসতে হয়েছে বলে তুমি কতটা অখুশি হয়েছ। "যখন চলে গিয়েছিলাম, তখনও ও ভীষণ রেগে গিয়েছিল। এখন আবার ফিরে এসেছি বলেও প্রচণ্ড রেগে গিয়েছে," তোমার বাবা বললেন। "মুম্বইতে থেকেও আমরা একজন পাক্কা আমেরিকান টিনেজারই বড় করেছি।"

আমি নিজের ঘরের ডেস্কটা ব্যবহার করতে পারছিলাম না বলে খাবার টেবিলে বসেই হোমওয়ার্ক করলাম। প্রাচীন রোমের রিপোর্টটা লিখলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা আসা পর্যন্ত ওই বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল কিন্তু এখন রিপোর্টটা বোকাবোকা লাগছিল কারণ তোমরা সে জায়গাগুলো সব ঘুরে এসেছ। আমি মনেপ্রাণে চাইছিলাম ওটার ওপর নিজে, একা একা কাজ করতে। কিন্তু তোমার বাবা কলোসিয়ামের কাঠামোর বিশেষত্ব নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যায় সমৃদ্ধ ব্যাখ্যা আমার মাথার ওপর দিয়ে গেল। অত কথা আমার রিপোর্টের জন্য অপ্রাসঙ্গিক ছিল, কিন্তু আমি ভদ্রতার খাতিরে শুনলাম। ভয় ছিল যে, তিনি দেখতে চাইবেন তাঁর বলা তথ্যগুলো আমি রিপোর্টে রেখেছি কি না। কিন্তু তিনি ওই নিয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। তাঁর ব্যাগ হাতড়ে যে পোস্টকার্ডগুলো কিনেছিলেন, সেগুলো বার করে দেখালেন। এবং যদিও আমার রিপোর্টের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাও আমাকে দু'লিরার মুদ্রা দিলেন।

তোমাদের জেট ল্যাগ একটু কমার পর আমরা একদিন মা-বাবার স্টেশন ওয়াগনে চেপে মল-এ গেলাম। তোমার মায়ের ব্রা কেনার দরকার ছিল। ওই একটি জিনিস তিনি আমার স্বাস্থ্যবতী মায়ের কাছ থেকে ধার করতে পারছিলেন না। মল-এ গিয়ে আমাদের বাবারা একসঙ্গে বেঞ্চ এবং টবের গাছ রাখা একটু নিচু একটি জায়গায় বসে অপেক্ষা করলেন। তোমাকে কিছু টাকা দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে আসার অনুমতি দেওয়া হল। আমি মায়েদের সঙ্গে জর্দান মার্শ-এর অন্তর্বাস বিক্রির বিভাগে গেলাম। তোমার বাবা তাঁকে যে ক্রেডিট কার্ডটি দিয়েছিলেন, সেটি নিয়ে তোমার মা-ই সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। আমরা সাধারণত সিয়ার্স-এ যেতাম। অন্তর্বাস বিভাগের দিকে এগোতে এগোতে তিনি কালো চামড়ার দস্তানা এবং হাঁটু পর্যন্ত চেন লাগানো একজোড়া বুটজুতো কিনলেন। তাক থেকে কিছু পাড়ার আগে তিনি কখনও দামের দিকে দেখছিলেন না। লঁজারি বিভাগে সেলসউওম্যানটি আমার দিকেই এগিয়ে আসলেন। "আমাদের কিছু খুব সুন্দর ট্রেনিং মডেল আছে, সবে এসেছে," তিনি তোমার মাকে বললেন। মহিলাটি ভেবেছিলেন যে, আমি তোমার মায়ের মেয়ে।

"না না, ও এখনও বড্ড ছোট," আমার মা আপত্তি করলেন।

"কিন্তু দেখো, কী সুন্দর', মহিলাটি হ্যাঙারে ঝোলানো যে অন্তর্বাসটি দেখাচ্ছিলেন, সেটিতে আঙুল বুলিয়ে তোমার মা বললেন। জিনিসটা লেস

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসানো, সাদা, মাঝখানে একটা গোলাপের কুঁড়ি। তখনও আমার পিরিয়ডস শুরু হয়নি। স্কুলের অন্যান্য মেয়েরা যা পরত তা না পরে আমি তখনও ফুলের ছাপওয়ালা আন্ডারশার্ট পরতাম। আমাকে ফিটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হল। কোট এবং সোয়েটার খুলে অন্তর্বাসটি পরার চেষ্টা করলাম। তোমার মা প্রসন্নমুখে আমার স্ট্র্যাপগুলো ঠিক করে দিলেন। পিছনে হুকটা লাগিয়ে দিলেন। তিনি নিজেও লজ্জা না পেয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে নগ্ন উর্ধ্বাঙ্গে একের পর এক অন্তর্বাস পরে দেখছিলেন। কিন্তু তাঁর স্তনের বড় কিশমিশ রঙের বোঁটা, তাঁর বুকের বিস্ময়কর আনতি দেখে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছিল। তাঁর বগলের গাঢ় রোমের ক্ষীণ ঝাঁজালো গন্ধ খারাপ লাগছিল না। "নিখুঁত," ইলাস্টিকের তলায় আমার ত্বকে একটা আঙুল বুলিয়ে তোমার মা বললেন। "আশা করি তুমি জানো যে, তুমি একদিন খুব সুন্দর হয়ে উঠবে।" মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি আমাকে আমার প্রথম তিনটি ব্রা কিনে দিলেন। বললেন যে, ওগুলো আমাকে তাঁর উপহার। বেরোনোর পথে মেকআপ কাউন্টারে তিনি একটা লিপস্টিক, এক বোতল পারফিউম, এবং একগুচ্ছ বিভিন্ন ক্রিম কিনলেন— যার কোনওটা তাঁর গলার চামড়া মসৃণ করার, কোনওটা তাঁর চোখ উজ্জ্বল করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল। মা অ্যাভন-এর যে জিনিসগুলো ব্যবহার করতেন, তাতে তোমার মায়ের আগ্রহ ছিল না। মেকআপ কাউন্টারে কেনাকাটা করার পুরস্কার হিসেবে তিনি একটি লাল টোট ব্যাগ পেলেন। আমার বই রাখার কাজে লাগবে ভেবে তিনি ব্যাগটা আমাকে দিয়ে দিলেন এবং পরের দিন আমি সেটা স্কুলে নিয়ে গেলাম।

এক সপ্তাহ পর তোমার বাবা চল্লিশ মাইল দূরে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে তাঁর নতুন চাকরিতে যোগ দিলেন। প্রথমদিকে বাবা সকাল সকাল উঠে তাঁকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে তারপর নর্থইস্টার্নে ফিরে আসতেন অর্থনীতির ক্লাস নেবেন বলে। তারপর তোমার বাবা একটা স্টিক শিফটওলা অডি কিনলেন। তুমি মায়েদের সঙ্গে বাড়িতেই থাকতে। তোমার মা-বাবা যেখানে নতুন বাড়ি কিনবেন, সেই অনুযায়ী তোমাকে নতুন স্কুলে ভরতি করবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, হিংসেও হচ্ছিল— অনেক বছর স্কুলে যাওয়া নেই! আরও হতাশ হলাম দেখে যে, তোমার কাছ থেকে বাড়ির কোনও কাজ আশা করা হত না। কখনও তোমাকে প্লেট বা গ্লাস

AMARBOI.COM

সিঙ্কে রেখে আসতে হত না, কখনও বিছানা করতে হত না। মাঝে মাঝে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেতাম, ঘরটা ভীষণ অগোছাল হয়ে আছে। কম্বলটা মাটিতে, তোমার জামাকাপড় আমার সাদা ডেস্কের ওপর স্তূপ করে ফেলা। তুমি প্রচুর ফল খেতে। গোছা গোছা আঙুর, আপেল। তোমার ফল খাওয়ার বহর দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। আমি তখন তাজা ফল খেতাম না। ফলের স্বাদ এবং গন্ধে জন্য আমার ওয়াক উঠে আসত। তুমি স্বাদ বা স্বাদের অভাব নিয়ে অভিযোগ করতে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, মা-বাবা স্টার মার্কেট থেকে যা-ই কিনে আনতেন তা-ই নিঃশেষ করে ফেলতে। দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে আমি সবসময়ই দেখতাম, তুমি সোফার একই প্রান্তে বসে আছ। তোমার সরু, খালি পায়ের আঙুলগুলো কফিটেবিলের একধার আঁকড়ে আছে। বেসমেন্টে বাবার বইয়ের তাক থেকে তুলে আনা আইজ্যাক অ্যাসিমোভের কোনও বই পড়ছ। 'ডক্টর হু' বলে টিভির একমাত্র যে অনুষ্ঠানটা তুমি দেখতে, যেটা আমার খুব খারাপ লাগত।

আমি তোমাকে বুঝে উঠতে পারতাম না। তুমি ভারতে থাকতে বলে আমি নিজের মা-বাবার সঙ্গেই তোমার মিল খোঁজার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তুমি আমার কলকাতার ভাইবোনদের মতো ছিলে না। তাদের কত সরল এবং বাধ্য মনে হত। তারা আমার আমেরিকার জীবন সম্পর্কে এমন সব প্রশ্ন করত, যেন আমি চাঁদে থাকি। যে-কোনও খুঁটিনাটি অবাক বিস্ময়ে শুনত। আমার সম্পর্কে তোমার একটুও কৌতূহল ছিল না। একদিন স্কুলের এক বন্ধু আমাকে এক শনিবার দুপুরে 'দ্য এম্পায়ার স্ট্রাইক্স ব্যাক' দেখার আমন্ত্রণ জানাল। মা বললেন আমি যেতে পারি, শুধু যদি তোমাকেও আমন্ত্রণ করা হয়, তা হলেই। আমি প্রতিবাদ করে বললাম যে, আমার বন্ধু তোমাকে চেনে না। তোমার প্রেমে পড়া সত্ত্বেও আমি বন্ধুকে জানাতে চাইছিলাম না তুমি কে এবং কেন আমাদের বাড়িতে থাকছ।

"তুই তো ওকে চিনিস," মা বললেন।

"কিন্তু ও তো আমাকে পছন্দ করে না," আমি নালিশ করলাম।

"অবশ্যই ও তোকে পছন্দ করে," মা বললেন। তিনি আমার কথার আসল অর্থ বুঝতে পারেননি। "ও আস্তে আস্তে মানিয়ে নিচ্ছে, হেমা। তোকে কখনও এমন কিছু করতে হয়নি।"

কথাটা সেখানেই শেষ হয়ে গেল। পরে জানা গিয়েছিল যে, তোমার

AMARBOI.COM

ছবিটা দেখার কোনও আগ্রহ ছিল না। কারণ, তুমি 'স্টার ওয়ার্স'ই দেখোনি।

একদিন দেখলাম, তুমি পিয়ানোয় বসে তর্জনী দিয়ে পিয়ানো উলটোপালটা বাজাচ্ছ। আমাকে দেখে তুমি উঠে দাঁড়িয়ে সোফায় ফিরে গেলে।

"তোমার কি এখানে খুব খারাপ লাগে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার ভারতেই ভাল লাগত," তুমি বললে। আমি নিজের মত প্রকাশ করলাম না। বললাম না যে, আমার ভারতে বেড়াতে গেলে একঘেয়ে লাগে। বললাম না যে, সন্ধেবেলা যে টিকটিকিগুলো দেওয়ালে ঘোরাফেরা করত, ফ্লুরোসেন্ট আলোর পিছন থেকে বেরিয়ে আসত, ঢুকে যেত, বা যে বিশাল আরশোলাগুলো আমার চান করার সময় তাকিয়ে থাকত, সেগুলো আমার ভাল লাগত না। আমার আত্মীয়স্বজনরা আমার সামনেই যে মন্তব্যগুলো করতেন— আমি মায়ের সুডৌল হাত পাইনি, আমি ছেলেবেলার চেয়ে বেশ কালো হয়ে গিয়েছি— সেগুলো আমার ভাল লাগত না।

"কলকাতার সঙ্গে মুম্বইয়ের কোনও মিল নেই," তুমি বললে। যেন আমার মনের কথা পড়ে ফেলেছ।

"ওটা কি তাজমহলের কাছে?"

"না।" তুমি একাগ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে যেন প্রথমবার আমার উপস্থিতি উপলব্ধি করছ। "তুমি কখনও কোনও ম্যাপ দেখোনি?"

মল-এ গিয়ে তুমি একটা রেকর্ড কিনেছিলে। রোলিং স্টোনস-এর কোনও একটা অ্যালবাম। ঢাকাটা সাদা, ওপরে সম্ভবত একটা কেকের ছবি। আমার যে কয়েকটা রেকর্ড ছিল— অ্যাবা, শন ক্যাসিডি, টিভির বিজ্ঞাপন দেখে অর্ডার দিয়ে আমার পকেটমানি খরচ করে কেনা একটা ডিস্কোগানের সংগ্রহ— তাতে তোমার কোনও আগ্রহ ছিল না। আমার ঘরের প্লাস্টিকের রেকর্ড প্লেয়ারটাতেও তুমি তোমার রেকর্ড বাজাতে চাইলে না। যে ক্যাবিনেটে বাবা তাঁর টার্নটেবিল এবং রিসিভার রাখতেন, তুমি সেটা খুলে ফেললে। বাবা নিজের গান শোনার সরঞ্জাম সম্পর্কে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন। আমার ওগুলোয় হাত দেওয়া বারণ ছিল, এমনকী মা'রও ওগুলো চালানোর অনুমতি ছিল না। স্টিরিয়োটা ছিল বাবার জীবনের একমাত্র বিলাস সামগ্রী। সবকিছু তিনি নিজের হাতে পরিষ্কার করতেন। শনিবার সকালে, তাঁর সংগ্রহের ভারতীয় কণ্ঠশিল্পীদের সংগীত শোনার আগে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বিশেষ কাপড় দিয়ে স্টিরিয়োর বিভিন্ন অংশ মুছতেন।

"তুমি ওটায় হাত দেবে না," আমি বললাম।

তুমি ঘুরে তাকালে। প্লেয়ারের ঢাকনাটা তুলে ফেলেছিলে। রেকর্ডটা ঘুরছিল, তুমি পিনটা আঙুল দিয়ে ধরে ছিলে "কী করে রেকর্ড বাজাতে হয় আমি জানি," বিরক্ত মুখে বললে। তারপর পিনটা ছেড়ে দিলে।

এখন ভাবি যে, আমার মেয়েলি জিনিসে ভরতি ঘরে থাকতে তোমার কত একঘেয়ে লাগত। হয়তো তোমার এমনও মনে হত যে, সারাদিন মায়েদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তুমি পাগল হয়ে যাবে। তাঁরা রান্না করতেন আর টিভি-সিরিয়াল দেখতেন। সত্যি কথা বলতে কী, আমার মা-ই রান্না করতেন, তোমার মা শুধু তাঁকে সঙ্গ দিতেন। মাঝে মাঝে কোনওকিছুর খোসা ছাড়িয়ে দিতেন বা কেটেকুটে দিতেন। কিন্তু কেমব্রিজে থাকাকালীন রান্নাবান্নায় তাঁর যে আগ্রহ ছিল, তা এসময় আর ছিল না। তিনি বললেন যে, মুম্বইতে জ্বারিন নামে তোমাদের এক দারুণ পারসি রাঁধুনি ছিল, সে-ই তাঁর অভ্যেস খারাপ করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে তিনি কথা দিতেন আমাদের ইংলিশ ট্রাইফল তৈরি করে খাওয়াবেন। ওই একটি জিনিস তিনি সবসময় নিজে তৈরি করতে চাইতেন। কিন্তু সেটা কখনও আর করে ওঠা হয়নি। মায়ের কাছ থেকে শাড়ি নিয়ে পরতেন এবং মল-এ গিয়ে আরও সোয়েটার এবং ট্রাউজার কিনে আনতেন। তাঁর হারিয়ে যাওয়া সুটকেস আর ফিরে আসেনি। তিনি সেটা মেনে নিয়েছিলেন এবং বলতেন যে, নতুন জিনিস কেনার অজুহাত পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তোমার বাবা লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং হাল ছেড়ে দেওয়ার আগে বিমানসংস্থাতে পরপর বেশ কয়েকটি ক্রুদ্ধ ফোনকল করেছিলেন।

তুমি যথাসম্ভব বাড়ির বাইরে সময় কাটাতে। সেই শীতে বনের মধ্যে হাঁটতে, ফাঁকা রাস্তায় একা হেঁটে বেড়াতে। আমি একবার বাড়ি ফেরার পথে স্কুলবাস থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে, তুমি কতদূর চলে এসেছ ভেবে আঁতকে উঠেছিলাম। "তোমার শরীর খারাপ হবে কৌশিক, সবসময় এভাবে বাইরে ঘোরাঘুরি করলে," মা বলতেন। তিনি তোমার সঙ্গে বাংলাতেই কথা চালিয়ে যেতেন। যদিও তুমি ক্রমাগত ইংরেজিতেই উত্তর দিতে। শেষে তোমার মায়েরই ঠান্ডা লেগে গেল। সেই কারণে তিনি পরপর বেশ

AMARBOI.COM

কয়েকদিন বিছানায় শুয়ে কাটালেন। বাকিদের জন্য মা যা রান্না করতেন সেসব না খেয়ে শুধু ক্যানের মুরগির সুপ খেতে চাইতেন। তুমি আমাদের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরের মিনিমার্ট থেকে সেই সুপ এবং 'ভোগ' ও 'হার্পার্স বাজার' পত্রিকা কিনে এনে দিয়েছিলে। "যা, পারুলমাসিকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর উনি চা খাবেন কি না," এক দুপুরে মা আমাকে বললেন। ওপরে গেস্টরুমে যাওয়ার আগে আমি বাথরুমে ঢুকলাম। সেখানে তোমার মা গায়ে একটা রোব জড়িয়ে বাথটাবের ধারে বিষণ্ণভাবে বসে, পায়ের ওপর পা তুলে একটা সিগারেট খাচ্ছিলেন।

"ওহ, হেমা!" তিনি চেঁচিয়ে উঠে প্রায় টাবের ভিতর পড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এতই চমকে গিয়েছিলেন যে, সিগারেটটা তাঁর হাতের ছোট্ট স্টেনলেস স্টিলের অ্যাশট্রেতে না ফেলে পোর্সিলিনের গায়ে দুমড়ে ফেললেন। অ্যাশট্রেটা নিশ্চয়ই তিনি মুম্বই থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

"সরি," বলে আমি চলে যাওয়ার জন্য ফিরলাম।

"না, না, প্লিজ, আমি চলেই যাচ্ছিলাম," তিনি বললেন। আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম তিনি সিগারেটটা ফ্লাশ করে দিলেন, সিঙ্কে কুলকুচি করে মুখ ধুলেন, নতুন করে লিপস্টিক লাগালেন, সেটা ক্লিনেক্স দিয়ে শুষে নিলেন, তারপর ক্লিনেক্সটা ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। টিপ ছাড়া আমার মা কোনও মেকআপ ব্যবহার করতেন না। আমি তোমার মায়ের সাজগোজ ভাল করে লক্ষ করলাম। আরও অবাক হলাম ভেবে যে, অসুস্থ এবং দিনের বেশিরভাগ সময় বিছানায় শুয়ে কাটানো সত্ত্বেও তিনি মেকআপের বিষয়ে এত সতর্ক। নিজেকে ভালভাবে আয়নায় দেখলেন, যাতে কোনও খুঁটিনাটি চোখ না এড়িয়ে যায়। আমার হঠাৎ এসে যাওয়ায় তিনি যে অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন, লিপস্টিক লাগিয়ে মনে হল যেন সেই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠেছেন। আয়নায় আমাকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসলেন। "দিনে একটা সিগারেট খেলে তো আর আমি মরে যাব না, যাব কি?" তিনি প্রফুল্লভাবে বললেন। জানলা খুলে তাঁর সাজ-সরঞ্জামের ব্যাগ থেকে পারফিউম বের করে হাওয়ায় ছিটিয়ে দিলেন। "এটা আমাদের মধ্যে একটা ছোট্ট সিক্রেট, হেমা?" তিনি বললেন। কথাটা প্রশ্নের চেয়ে বেশি আদেশ মনে হল। তারপর তিনি তাঁর পিছনে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধেবেলা আমরা মাঝে মাঝে তোমাদের সঙ্গে বাড়ি খুঁজতে যেতাম। আমরা স্টেশন ওয়াগনেই বেরোতাম। তোমার বাবা যে সুন্দর গাড়িটা কিনেছিলেন, সেটার ভিতর সকলে আরাম করে বসা যেত না। বাবা দ্বিধাগ্রস্তভাবে গাড়ি চালিয়ে অচেনা পাড়ায় নিয়ে যেতেন। সেখানে বাড়ির লনগুলো আমাদের চেয়ে একটু বড়। বাড়িগুলো আমাদের পাড়ার চেয়ে একটু বেশি বিচ্ছিন্ন। তোমার মা-বাবা প্রথমে লেক্সিংটন এবং কনকর্ডে বাড়ি খুঁজলেন, যেখানকার স্কুল সবচেয়ে ভাল। যে বাড়িগুলো দেখা হল, তার কয়েকটি ফাঁকা, কয়েকটিতে তখনকার মালিক এবং তাঁর পরিবার-আসবাবপত্র ভরতি হয়ে আছে। রাতে ঘুমোনোর আগে আমি মা-বাবার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারতাম যে, সেই বাড়িগুলোর মধ্যে কোনওটাই আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে নয়। তোমার মা-বাবা যখন রিয়াল এস্টেট দালালের সঙ্গে দাম নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন আমার মা-বাবা একপাশে সরে দাঁড়াতেন। কিন্তু পয়সাটা সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল বাড়িগুলোই। বাড়ি ফেরার পথে তোমার মা-বাবা সবসময়ই বলতেন যে, কোনটায় আলো কম, কোনটায় নিচু ছাদ, কোনটার ঘর দেখতে ভাল নয়। বাড়ির নকশা সম্বন্ধে তোমার মা-বাবার নিজস্ব, সুনির্দিষ্ট মতামত ছিল, যা আমার মা-বাবার ছিল না। তোমার মা-বাবা নতুন ধরনের নকশা খুঁজছিলেন। লম্বা লম্বা গাছের পিছনে লুকোনো একটা সাদা বাক্সের মতো বাড়ি দেখে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা চাইছিলেন যে, বাড়ির ভিতর সুইমিং পুল থাকুক। বা পুল তৈরি করার জন্য যথেষ্ট জায়গা। তোমার মা মুম্বইতে তাঁর ক্লাবের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতেন, এখানে তার অভাববোধ করছিলেন। "জলের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় এমন বাড়িই আমাদের খোঁজা উচিত," এক দুপুরে 'গ্লোব'-এর শ্রেণিবদ্ধ অংশটা পড়তে পড়তে তোমার মা বললেন। এতে খোঁজাটা আরও কঠিন হয়ে গেল। জানলা থেকে মহাসাগর দেখা যায়, এমন বাড়ি দেখতে আমরা গাড়ি করে সোয়াম্পস্কট এবং ডাক্সবারিতে গেলাম। বনের ভিতর এমন বাড়ি দেখতে গেলাম, যেখানে নিজস্ব হ্রদ আছে। বেভার্লির এক বাড়ির জন্য তোমার মা-বাবা প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার বাড়িটি দেখতে যাওয়ার পর তাঁরা প্রস্তাব ফিরিয়ে নিলেন। তোমার মা বললেন যে, বাড়িটা যথেষ্ট ছড়ানো নয়।

তোমার মা-বাবার চাহিদার মাত্রা দেখে আমার মা-বাবা হীনম্মন্যতায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুগতেন। আমাদের সাধারণ বাড়ির কথা ভেবে লজ্জিত হতেন। "তোমাদের নিশ্চয়ই এখানে খুব অসুবিধে হচ্ছে," মা বাবা বললেন। কিন্তু তাঁরা যেমন প্রতি রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে অভিযোগ করতেন, তেমন তোমার মা-বাবা কখনও করতেন না। প্রায় এক মাস কেটে গিয়েছে খেয়াল করে মা বললেন, "এত দিন লাগবে তা তো ভাবিনি।" তোমরা থাকাকালীন আর কোনও অতিথির এসে থাকা সম্ভব ছিল না। "দাশগুপ্তরা পরের শনি-রবিবার এসে থাকতে চাইছিল। আমাকে 'না' বলতে হল," মা বললেন। বারবার আমি শুনলাম তোমার মা-বাবা কত বদলে গিয়েছেন। কেমন করে আমরা অজ্ঞাতসারে নিজেদের বাড়িতে আগন্তুকদের থাকতে দিয়েছি। ডিনারের পর তোমার মা পরিষ্কারে সাহায্য করতেন না, যখন খুশি ঘুমোতে যেতেন এবং দুপুরে খাওয়ার সময় পর্যন্ত ঘুমোতেন। এসব নিয়েই মায়ের অভিযোগ ছিল। মা বললেন তোমার বাবা তোমার মাকে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দেন, তাঁর বড্ড বেশি যত্ন নেন। সবসময় জিজ্ঞেস করেন তাঁর কোনও ড্রিঙ্ক চাই কি না। ঠান্ডা লাগলে তাঁকে কার্ডিগান এনে দেন।

মা বললেন, "ওর জন্যই ওরা এখনও এখানে রয়েছে, প্রাসাদের কমে ও কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না।"

"কাজটা সহজ নয়," বাবা সাবধানে উত্তর দিলেন। "নতুন চাকরি শুরু করা, নতুন করে জীবনটা শুরু করা। আমার মনে হয় ও এখান থেকে যেতেই চায়নি। ওর স্বামী এখন সেটাই পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।"

"আমি ওরকম করলে তো তুমি কখনও সহ্য করতে না।"

"ছেড়ে দাও," বাবা পাশ ফিরে গায়ে চাদরটা টেনে নিলেন। "চিরকালের ব্যাপার তো নয়। ওরা শিগগিরই চলে যাবে আর তখন আমাদের জীবনটাও আবার আগের মতো হয়ে যাবে।"

ঠাসাঠাসি করে থাকা সত্ত্বেও বাড়ির ভিতর আমাদের দু'পরিবারের মধ্যে একটা রেখা টানা হয়ে গিয়েছিল। আমরা সবসময়ই যে জীবনযাপন করেছি, একদিকে ছিল সেই জীবন— প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে মা-বাবা আমাকে স্টার মার্কেট-এ নিয়ে যেতেন এবং তারপর ম্যাকডোনাল্ডস এ খাওয়াতেন। প্রতি রবিবার আমি আমার সাপ্তাহিক বানান পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করতাম। ষাট মিনিট পর বাবা আমাকে বানান ধরতেন। তোমাদের পরিবারও

AMARBOI.COM

আলাদাভাবে চলা শুরু করেছিল। মাঝে মাঝে তোমার বাবা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে তোমার মাকে নিয়ে বেরোতেন। বাড়ি দেখতে বা মল-এ কেনাকাটা করতে। তোমার মা আস্তে আস্তে, এক-এক করে নিজের বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে শুরু করলেন, চাদর, কম্বল, প্লেট, গ্লাস, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি। তাঁরা একের পর এক ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ফিরতেন আর সেগুলো আমাদের বেসমেন্টে রাখতেন। যা কিনতেন, তা মাঝে মাঝে মাকে দেখাতেন, মাঝে মাঝে দেখাতেন না। প্রায় শুক্রবার তোমার মা-বাবা আমাদের বাইরে খাওয়াতে নিয়ে যেতেন, শহরের কোনও অতিরিক্ত দামি সাধারণ মানের রেস্তোরাঁয়। জীবনের গতির সেই বৈচিত্র্য তাঁরা উপভোগ করতেন। অদ্ভুতভাবে তাঁদের পছন্দের খাদ্য ছিল বেক্‌ড আলু ও স্টেক কিন্তু আমার মা-বাবা সেগুলো ভালবাসতেন না। বাইরে খেলে মা রান্না থেকে একটু রেহাই পাবেন বলেই ধরে নেওয়া হত, কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়েও মা অভিযোগ করতেন।

আমিই একমাত্র মানুষ, যার তোমাদের এই বাড়িতে থাকাতে কোনও অসুবিধে হত না। আমি আমার মতো চুপচাপ অদ্ভুতভাবে তোমাকে তখনও পছন্দ করতাম। দিনের পর দিন শুধুমাত্র তোমাকে দেখতে পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম। আর তোমার মা-বাবাকেও আমার ভাল লাগত, বিশেষ করে তোমার মাকে। তাঁর কাছ থেকে যে আদরযত্ন পেতাম, তা তোমার কাছ থেকে পাত্তা না পাওয়া প্রায় পুষিয়ে দিত। একদিন তোমার বাবা রোমের ফোটোগুলো ডেভেলপ করলেন। সাবধানে, শুধু ধারটুকু ধরে ফোটোগুলো দেখতে আমার বেশ ভাল লাগল। প্রায় সব ফোটোতেই তুমি এবং তোমার মা ছিলেন। পিয়াৎজ্জায় দাঁড়িয়ে বা ফোয়ারার পাশে বসা। ট্রাজান্‌স কলাম-এর দুটো ফোটো ছিল। প্রায় অবিকল এক রকমের। "একটা তোমার রিপোর্টের জন্য নাও," তোমার বাবা একটা ফোটো আমাকে দিয়ে বললেন। "তোমার টিচারের এটা ভাল লাগা উচিত।"

"কিন্তু আমি তো সেখানে ছিলাম না।"

"তাতে কিছু এসে যায় না। বোলো তোমার কাকু রোমে গিয়ে তোমার জন্য ফোটো তুলে এনেছেন।"

ফোটোটায় তুমি এক দিকে দাঁড়িয়ে ছিলে, নীচের দিকে তাকিয়ে।

AMARBOI.COM

ভিসরের জন্য মুখ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তোমাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না, ফ্রেমের ভিতর যে পর্যটকদের দেখা যাচ্ছিল, তাদেরই একজন মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাও ফোটোয় তোমার উপস্থিতির প্রতি আমি নিস্পৃহ থাকতে পারলাম না। তোমার উপস্থিতি যেন ভয় দেখাচ্ছিল যে, আমার গোপন আকর্ষণ প্রকাশ করে দেবে। যদিও মনে মনে আমার আশা ছিল, সেই আকর্ষণ কোনওভাবে স্বীকৃত হবে। আমার স্কুলের সব প্রেমঘটিত কল্পনা তুমি সফলভাবে আমার মন থেকে মুছে দিতে পেরেছিলে। আমি শুধু বাড়িতে থাকার কথাই ভাবতাম, ভাবতাম দুপুরবেলা, সন্ধেবেলা কোথায় আমরা সামনাসামনি এসে পড়তে পারি। ভাবতাম খাবার টেবিলে তুমি একবারও আমার দিকে তাকাবে কি না। মা-বাবার ঘরে খাটে শুয়ে কয়েক ঘণ্টা কেটে যেত আমাদের চুম্বন কল্পনা করে। তার চেয়ে বেশি কিছু কল্পনা করার মতো বয়স বা অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। আমি ফোটোটা নিয়ে আমার রিপোর্টে আটকালাম। কিন্তু তার আগে ফোটোর যে দিকে তুমি ছিলে, সেই অংশটা কেটে নিলাম। সেই টুকরোটা আমার ডায়রির সাদা পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। অনেক বছর সেটা সেখানেই চাপা দিয়ে রাখা ছিল।

তোমরা আসার পর থেকে তোমার বরফ দেখার ইচ্ছেটা পূরণ হয়নি। কখনও সখনও অল্প বরফ পড়ত বটে, কিন্তু তা মাটিতে জমে থাকত না। তারপর একদিন বরফ পড়তে শুরু করল। প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না, তারপর দুপুর গড়াতে গড়াতে তুষারপাতের জোরও বাড়ল। যতক্ষণে আমি বাসে করে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলাম, বরফের ইঞ্চিখানেক চওড়া আস্তরণ রাস্তা ঢেকে দিয়েছিল। ঝড়টা বিপজ্জনক না হলেও সেই শীতের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য যথেষ্ট। সেই সন্ধেয়, মা বেশ খোশ মেজাজে। ঠিক করলেন যে, এক বড় হাঁড়িতে খিচুড়ি রাঁধবেন, যেমন তিনি বৃষ্টি পড়লেই রাঁধতেন। তোমার মা-ও সেদিন সাহায্য করতে চাইলেন। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আলু এবং ফুলকপির টুকরো ভাজলেন। একটা সসপ্যানে ঘিয়ের জায়গায় মাখন গলিয়ে নিলেন। এও ঠিক করলেন যে, অনেকদিনের প্রতিশ্রুত ট্রাইফলটা সেদিন তৈরি করবেন। মা যখন বললেন যে, বাড়িতে যথেষ্ট ডিম নেই, তখন তোমার বাবা ডিম এবং অন্যান্য উপকরণ কিনে আনতে গেলেন। "মাঝরাতের আগে তৈরি হবে না," তোমার মা স্টোভের ওপর গরম দুধ এবং ডিম ফেটাতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেটাতে বললেন। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমাকে ফেটাতে দিলেন। "ওটা জমতে অন্তত চার ঘণ্টা লাগে।"

"তা হলে আমরা ওটা কাল সকালে প্রাতরাশে খাব," তুমি বললে। যে পাউন্ড কেকটা তোমার মা কেটেছিলেন, তার এক টুকরো ভেঙে মুখে পুরলে। তুমি সচরাচর রান্নাঘরে পা রাখতে না, কিন্তু সেই সন্ধেয় ট্রাইফ্‌লের লোভে তুমি রান্নাঘরে ঘুরঘুর করছিলে। আমি বুঝলাম খাবারটা তোমার বিশেষ পছন্দের। আমি নিজে ওটা কখনও খাইনি।

ডিনারের পর আমরা সবাই লিভিং রুমে এলাম, খবরে বলছিল, তুষারপাত চলছে। এবং সেজন্য আমার স্কুল বন্ধ ও বাবার ক্লাসও হবে না শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। "তুমিও ছুটি নাও না," তোমার মা তোমার বাবাকে বললেন। সকলকে অবাক করে দিয়ে তোমার বাবাও রাজি হয়ে গেলেন।

"সেই যে শীতে আমরা কেমব্রিজ ছেড়ে চলে গেলাম, সেই শীতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে," তোমার বাবা বললেন। তিনি এবং তোমার মা তাঁদের জনি ওয়াকার-এ চুমুক দিচ্ছিলেন। এবং সে রাতে, যদিও মা তখনও রাজি হননি, বাবা তাঁদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য ওয়াইনের স্বাদগ্রহণে রাজি হলেন। তোমার বাবা মা-বাবার দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা আমাদের জন্য যে পার্টিটা দিয়েছিলে, সেটা মনে আছে?"

মা বললেন, "সাত বছর আগে, তখন জীবনটা কত অন্যরকম ছিল।" তাঁরা গল্প করলেন তখন আমি কত ছোট ছিলাম, তাঁরা সকলেই তখন কত অল্পবয়সি ছিলেন।

"কী সুন্দর ছিল সন্ধেটা," তোমার মা স্মৃতিচারণ করলেন। তাঁর গলায় একটা দুঃখ টের পাওয়া গেল যা তাঁরা সকলেই অনুভব করছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। "সবকিছু কত আলাদা ছিল তখন।"

সকালে আমাদের জানলা থেকে জমাট বরফের কাঠি ঝুলছিল। বরফের এক ফুট মোটা কম্বল জমি ঢেকে দিয়েছিল। ট্রাইফ্‌লটার জন্য আমরা আগের রাতে অপেক্ষা করতে পারিনি। সেটা টোস্ট এবং চা সহকারে প্রাতরাশে পরিবেশন করা হল। আমি যেমন ভেবেছিলাম, সেটা সেরকম খেতে ছিল না। যে গরম মিশ্রণটা আমি স্টোভের ওপর ফেটাতে সাহায্য করেছিলাম, সেটা এখন ঠান্ডা এবং হড়হড়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুমি বাটির পর বাটি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেটেপুটে খেলে। শেষে তোমার পেটব্যথা হবে ভেবে তোমার মা ট্রাইফলটা সরিয়ে রাখলেন। জলখাবারের পর বাবারা পালা করে ড্রাইভওয়ে থেকে বেলচা দিয়ে বরফ পরিষ্কার করলেন। ঝড়টা কমলে আমাকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। সাধারণত আমি একাই স্নোম্যান তৈরি করতাম। হাড্ডিসার এবং হেলে-পড়া স্নোম্যান। গাজর চাইলে মা-বাবা খাবার নষ্ট হবে বলে আপত্তি করতেন। কিন্তু সেদিন তুমি আমার সঙ্গে যোগ দিলে। খালি হাতে বরফ স্পর্শ করলে। এখানে আসার পর সেই প্রথম তোমাকে খুশি দেখাচ্ছিল। তুমি বরফ নিয়ে একটা বল পাকিয়ে আমার দিকে ছুড়লে, আমি চট করে সরে গেলাম। তারপর একটা গোলা নিয়ে, তোমার গলায় ক্যামেরা ঝুলছে বলে পায়ের দিকে গোলাটা ছুড়লাম।

"হার মানছি," তুমি হাত তুললে। "ভীষণ সুন্দর লাগছে," আমাদের লনের দিকে তাকিয়ে বললে। বরফ পড়ে লনের চেহারাটাই পালটে গিয়েছিল। আমি বেশ পরিতৃপ্ত বোধ করলাম, যদিও আবহাওয়ার পরিবর্তনে আমার কোনও হাত ছিল না। তুমি বনের দিকে হাঁটতে শুরু করলে। আমি ইতস্তত করায় তুমি বললে বনের ভিতর কিছু দেখাবে। সেই বরফঢাকা দিনে, সেই উজ্জ্বল নীল আকাশের তলায়, গাছের পাতাবিহীন ডালপালাগুলো দেখে নিরাপদ মনে হচ্ছিল, যেন সেগুলো সেদিন কিছু লুকিয়ে রাখেনি। আমি আর ভাবলাম না সেই ছেলেটার কথা, যে বনে হারিয়ে গিয়েছিল। যাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাঝে মাঝে তুমি থেমে গিয়ে কোনও জিনিসের ওপর ক্যামেরা তাক করছিলে। কিন্তু আমার ফোটো তুলছিলে না। আমরা অনেক দূর হাঁটলাম। শেষে আমি আর বরফ পরিষ্কার করার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমাদের বাড়িটাও আর দেখা যাচ্ছিল না। প্রথমে বুঝতে পারিনি তুমি হাঁটু গেড়ে বসে, মাটি থেকে বরফ সরিয়ে কী করছ। নীচে একটা পাথর ছিল। তারপর দেখলাম, ওটা একটা সমাধি-ফলক। তুমি এক সারি সমাধি ফলক বের করলে, ওগুলো মাটির ওপর চিত হয়ে পড়ে ছিল। আমি তোমাকে সাহায্য করতে শুরু করলাম, সমাধিস্থদের অসমাধিস্থ করতে। প্রথমে আমার মিটেন-পরা হাত দিয়ে, তারপর গোটা হাত দিয়েই। সেগুলো সাইমন্ডস নামে এক ছ'সদস্যের পরিবারের সমাধি ছিল। "ওরা সকলে এখানে একসঙ্গে শুয়ে আছে," তুমি বললে। "মা, বাবা, চার ছেলেমেয়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি জানতাম না এগুলো এখানে আছে।"

"কেউ জানে কি না সন্দেহ। আমি প্রথম যখন খুঁজে পেলাম তখন পাতার তলায় ঢাকা ছিল। শেষজন, এমা, ১৯২৩ সালে মারা গিয়েছে।"

আমি ঘাড় নাড়লাম। আমার নামের সঙ্গে ওই নামটার মিল দেখে অস্বস্তি লাগছিল। ভাবছিলাম মিলটা তোমার চোখে পড়েছে কি না।

"এটা দেখে আমার ইচ্ছে হয় যদি হিন্দু না হতাম, তা হলে মাকে কোথাও সমাধিস্থ করে রাখা যেত। কিন্তু মা আমাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে মায়ের ভস্ম অতলান্তিকে ছড়িয়ে দিতে হবে।"

আমি বুঝতে না পেরে তোমার দিকে তাকালাম, তুমি তখন আমাকে বুঝিয়ে বললে যে, তোমার মায়ের বুকে ক্যান্সার হয়েছে, রোগ বাকি শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেইজন্যই তোমরা ভারত ছেড়ে চলে এসেছিলে। যত না চিকিৎসার জন্য, তারচেয়ে বেশি একলা থাকার জন্য। ভারতে লোকে জানত যে, তাঁর কঠিন রোগ হয়েছে এবং তোমরা সেখানে থাকলে সমুদ্রের ধারে তোমাদের সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন অবধারিতভাবে জড়ো হত। তাঁকে রক্ষা করার চেষ্টা করত, যা থেকে তাঁর রেহাই নেই। তোমার মা সেই মনোযোগের চাপে দমবন্ধ করে বাঁচতে চাননি। চাননি যে, তাঁর মা-বাবা তাঁর মৃত্যুর সাক্ষী হন। তাই তিনি তোমার বাবাকে আমেরিকায় ফিরিয়ে আনতে বলেছিলেন। মা মাস জেনারাল-এ একজন নতুন ডাক্তার দেখাচ্ছেন। বাড়ি দেখতে যাচ্ছেন বলে বেরিয়ে অনেক সময় বাবা মাকে সেখানে নিয়ে যান। বসন্তকালে মায়ের অপারেশন হবে, কিন্তু তাতে শুধু আর-একটু সময় পাওয়া যাবে। মা চান না যে, এখানে কেউ ব্যাপারটা জানুক, অন্তত সব শেষ হওয়া পর্যন্ত নয়।"

খবরটা আমাকে এতটাই আঘাত করল যে, মনে হল যেন তুমি আমাকে থাপ্পড় মেরেছ। আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। প্রথমে আমার ঠান্ডায় প্রায় জমে যাওয়া মুখের ওপর দিয়ে চোখের জল নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ছিল। তারপর আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। ঠান্ডায় আমার নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করল, চোখ লাল হয়ে গেল। আমাকে তখন কুৎসিত দেখতে লাগছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার গালে হাত দিয়ে চোখের জল আটকানোর চেষ্টা করছিলাম। আমি মরমে মরে যাচ্ছিলাম যে তোমাকে ওরকম শোচনীয় দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। যদিও তুমি জীবনে কখনও আমার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোটো তোলোনি, ভয় হচ্ছিল, তুমি তখন ক্যামেরা উঠিয়ে আমার সেই অবস্থার ফোটো তুলে নেবে। বলাই বাহুল্য, তুমি কিছুই করলে না, কিছুই বললে না। তুমি ততক্ষণে যথেষ্ট বলে ফেলেছিলে। তুমি যেখানে ছিলে, সেখান থেকেই এমা সাইমন্ডসের সমাধি-ফলকের দিকে তাকিয়ে থাকলে। অবশেষে, আমি শান্ত হলে তুমি আমাদের উঠোনের দিকে হাঁটতে শুরু করলে। তোমার খুঁজে বার করা পথ ধরে আমি পিছন পিছন হাঁটতে থাকলাম। তারপর আমরা যে যার রাস্তায় চলে গেলাম। তুমি ড্রাইভওয়েতে বরফ পরিষ্কার করতে শুরু করলে। আমি গরম জলে চান করব বলে বাড়ির ভিতর গেলাম। আমার লাল, ফুলে যাওয়া মুখ দেখে মায়েরা ধরে নিলেন যে, ঠাণ্ডায় আমার ওই দশা হয়েছে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করেছিলে যে, আমি তোমার জন্য বা তোমার মায়ের জন্য কাঁদছিলাম। কিন্তু তা নয়। তখনও আমার দুঃখ বা সহানুভূতি অনুভব করার মতো বয়স হয়নি। আমি শুধু বাড়িতে একজন মৃত্যুপথগামী মহিলা থাকায় প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল, আমি তোমার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ফিটিং রুমে। দু'জনেরই ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন ছিল, যখন আমি আমার প্রথম ব্রা পরে দেখছিলাম। তাঁর অসুখের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলাম ভেবে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। তুমি আমাকে কথাটা জানিয়েছিলে বলে, আবার বলোনি বলে, তোমার ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। একই সঙ্গে মনে হচ্ছিল যেন, আমার ওপর গুরুভার চাপানো হয়েছে এবং আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আরও একবার তোমার প্রতি চরম বিদ্বেষ অনুভব করলাম।

দু'সপ্তাহ পর তোমরা চলে গেলে। তোমার মা-বাবা নর্থ শোর-এ, ম্যাসাচুসেটসের এক নামকরা স্থপতির নকশায় তৈরি একটি বাড়ি কিনলেন। বাড়িটার ছাদ ছিল নিখুঁতভাবে সমতল। কয়েকটি দেওয়াল সম্পূর্ণ কাচের। ওপরের ঘরগুলো ভিতরের একটি বারান্দার বাইরের দিকে সাজানো। লিভিং রুমের ছাদটা বিশ ফিট উঁচু। বাড়িটা থেকে কোনও জলাশয় দেখা যেত না বটে, কিন্তু তোমার মায়ের সাঁতার কাটার জন্য একটা সুইমিং পুল ছিল। ঠিক যেমন তিনি চেয়েছিলেন। সেই বাড়িতে তোমাদের প্রথম রাতে, মা তোমাদের জন্য খাবার নিয়ে গেলেন যাতে তোমার মাকে রান্না করতে না হয়। মা জানতেন না যে, তিনি তোমাদের কত বড় সাহায্য করছেন। আমরা

AMARBOI.COM

বাড়িটার, জায়গাটার প্রশংসা করলাম। ফাঁকা ঘরগুলো, যার মধ্যে তখন প্রতিধ্বনি হচ্ছিল এবং পরে যেগুলো অসুস্থতায়, শোকে ভরে যাবে, সেগুলোর প্রশংসা করলাম। একটা শোওয়ার ঘরে স্কাইলাইট ছিল। তোমার মা আমাদের বললেন যে, তিনি তার নীচে তাঁর খাটটা রাখবেন। সব কিছুই তাঁকে মাত্র দু'বছরের আনন্দ দেওয়ার জন্য করা হচ্ছিল। অবশেষে যখন মা-বাবা খবরটা পেয়ে তোমার মাকে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় দেখতে গেলেন, তখন তুমি আমাকে বনের মধ্যে যা বলেছিলে তার কিছুই তাঁদের কাছে প্রকাশ করলাম না। সেদিক দিয়ে আমি বিশ্বাসভঙ্গ করিনি। ততদিনে আমাদের মা-বাবাদের সম্বন্ধ শুধুই পরিচিতদের পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। সেই কয়েক সপ্তাহ বাধ্য হয়ে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করার পর যে যাঁর রাস্তায় চলে গিয়েছিলেন। তোমার মা কথা দিয়েছিলেন যে, গ্রীষ্মকালে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার জন্য আমাদের এসে থাকতে বলবেন। কিন্তু তাঁর শরীর যত খারাপ হতে শুরু করল— ডাক্তার যা বলেছিলেন তার চেয়ে দ্রুতগতিতে— তোমার মা-বাবা যোগাযোগ তত কমিয়ে দিলেন। তখনও তোমার মায়ের অসুখ নিয়ে তাঁরা কোনও কথা বলতেন না। খুব কম সময়েই কাউকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন। কিছুদিন আমার মা-বাবা অভিযোগ চালিয়ে গেলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল তাঁদের অবজ্ঞা করা হয়েছে। "আমরা ওদের জন্য যা করেছি, সেসবের পরও," ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাঁরা বলতেন। কিন্তু ততদিনে আমি নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছি। দেওয়ালের অন্য পাশে, যে বিছানায় তুমি ঘুমিয়েছিলে, সেই বিছানায়। আমি আর মা-বাবার কথা শুনতে পেতাম না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর শেষ

আমি আমার বাবার বিয়েতে যাইনি। সোয়ার্থমোর-এ আমার শেষ বছরে, এক রবিবার সাতসকালে বাবা ফোন করে খবর জানানোর আগে আমি জানতামও না যে, তাঁর বিয়ে হয়েছে। আমার দরজায় কারও ধাক্কায় এবং তারপর এক হল মেট আমার পদবি ধরে ডাকছে শুনে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সাড়া দেওয়ার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, বাবা ফোন করেছেন। আর কেউ আমাকে সকাল ন'টার আগে ফোন করবে না। বাবা সবসময়ই তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতেন। বিশ্বাস করতেন যে, ভোর পাঁচটা থেকে সকাল সাতটা দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। সেই সময়টা তিনি খবরের কাগজ পড়তেন এবং হাঁটতে বেরোতেন। আমরা মুম্বইতে থাকার সময় মেরিন ড্রাইভ-এ এবং নর্থ শোর এ থাকার সময় শহরের নির্জন রাস্তাগুলোয় হাঁটতেন। এবং তিনি যতই মা ও আমাকে তাঁর সঙ্গে হাঁটতে যেতে বলুন না কেন, আমি জানতাম তিনি একলা হাঁটতেই বেশি পছন্দ করেন। এখন অবশ্য সবকিছুই বদলে গিয়েছে। যে নিঃসঙ্গতা তিনি একসময় উপভোগ করতেন, তা এখন তাঁর কাছে কারাগারের মতো, ক্লান্তিদায়ক হয়ে উঠেছে। আমি জানতাম যে, তিনি আর হাঁটতে বেরোন না এবং মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তিনি খুবই কম ঘুমোন। বহু সপ্তাহ হয়ে গেল আমার বাবার সঙ্গে কথা হয়নি। তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন আমার দাদু-দিদিমা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে, তাঁরা চারজনই জীবিত। ফোনটা আমার জন্য উলটো করে তারে ঝুলিয়ে রাখা ছিল। ফোনটা তোলার সময় আমি ভেবেছিলাম, তিনি শুধু জানাবেন যে তিনি নিরাপদে ম্যাসাচুসেটসে ফিরে এসেছেন। ভাবিনি যে, তিনি জানাবেন, আমার এক সৎমা এবং দু'জন সৎবোন লাভ হয়েছে।

"তোমাকে একটা কথা জানানো দরকার, যা শুনলে তোমার খারাপ লাগবে," বলে তিনি শুরু করলেন। আমি ভাবলাম দাদু ঠাকুমাদের কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কি না। বিশেষ করে হয়তো দাদু বা দিদিমা তাঁদের একমাত্র মেয়ের বেয়াল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যু সহ্য করতে পারেননি। সেটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ। মা মারা যাওয়ার পরের মাসগুলোয়, বাবার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে সেই বাড়িতে ঢোকা, যেখানে মা তাঁর ছেলেবেলা কাটিয়েছিলেন। সেই দু'জন মানুষের সঙ্গে দেখা করা, যাঁরা মাকে মানুষ করেছিলেন। বাবা এবং আমার থেকে অনেক আগে যাঁরা মাকে জানতেন, ভালবাসতেন। ১৯৬২ সালে যখন মা-বাবার বিয়ে হয়, তখন থেকেই দাদু-দিদিমার জীবনে শোকের ছায়া পড়েছিল। কখনও সখনও মা প্রথমে বস্টন থেকে, তারপর মুম্বই থেকে তাঁদের কাছে যেতেন। পুরাকাহিনির পার্সিফোনের মতো সাময়িকভাবে ঘরগুলো নিজের উপস্থিতিতে, আলোয় ভরিয়ে দিতেন। ড্রেসিং টেবিলের ওপর তাঁর ক্রিম এবং পাউডার ছড়ানো থাকত, ছোটবেলার কাপে চুমুক দিয়ে চা খেতেন, ছেলেবেলার ঘরে ঘুমোতেন। ম্যাসাচুসেটস থেকে দাদু-দিদিমাকে ফোন করে মায়ের মৃত্যুর খবর জানানোর পরও তাঁরা আশা ছাড়েননি যে, কয়েকদিন বাদেই মা প্লেনে চড়ে কলকাতা পৌঁছে বাড়ির দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবেন। বাবা এবং আমি বাড়িতে ঢোকার পরও দিদিমা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, মা ট্যাক্সিতে বসে আছেন কি না। যদিও ট্যাক্সিটা ততক্ষণে চলে গিয়েছিল এবং তাঁদের লিভিং রুমের দেওয়ালে রজনীগন্ধার মালা ঝোলানো মায়ের এক বিশাল বড় ফোটো টাঙানো ছিল। "মা আর আমাদের সঙ্গে নেই, দিদুন," আমি বলেছিলাম। তখন তাঁরা দু'জনেই ভেঙে পড়েছিলেন। নতুন করে মায়ের জন্য শোক করেছিলেন, যা বাবা বা আমি কেউই করিনি। মায়ের অসুখের সময় দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে থাকার ফলে আমরা সেই সুযোগ পাইনি।

কিন্তু দাদু-দিদিমা ভালই আছেন, বাবা এখন জানালেন। বললেন যে, তাঁদের আমার কথা মনে পড়ে এবং আমাকে তাঁদের ভালবাসা জানিয়েছেন। তারপর বাবা আমাকে চিত্রার কথা বললেন। চিত্রার স্বামী দু'বছর আগে মারা গিয়েছেন। ক্যান্সার নয়, এনকেফালাইটিস। চিত্রা স্কুলশিক্ষিকা, বয়স পঁয়ত্রিশ। বাবার চেয়ে প্রায় কুড়ি বছরের ছোট। তাঁর মেয়েদের বয়স সাত এবং দশ। এইসব বিশদ তথ্য বাবা জানালেন, যেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যা আমি জিজ্ঞেস করিনি। বাবা বললেন, "আমি বলছি না যে তোমাকে ওকে ভালবাসতে হবে, এমনকী ওকে পছন্দ করতে হবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি বড় হয়েছ, তাই তোমার ওকে দরকার নেই। কিন্তু আমার আছে। আমি শুধু চাই যে, তুমি কোনও একদিন আমার সিদ্ধান্তটা বুঝতে পারবে।" আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, বাবা নিজেকে আমার ক্রোধ, কটু কথা, দোষারোপ, সশব্দে ফোন নামিয়ে রাখা ইত্যাদির জন্য প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু তিনি কথা বলার সময় আমার মধ্যে কোনও উত্তাল আবেগ তৈরি হল না। মুম্বইতে যেদিন জানতে পেরেছিলাম যে, মা মৃত্যুপথগামী, সেদিন যেমন লেগেছিল, শুধু সেই গা গুলোনো ভাব আবার অনুভব করলাম, সেই ভাবটা কখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "উনি কি তোমার সঙ্গে ওখানে আছেন? তুমি কি চাও আমি ওঁর সঙ্গে দু'-একটা কথা বলি?" আমি বাবাকে ঠিক বিশ্বাস করিনি, ভদ্রতার চেয়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যই প্রশ্নটা করেছিলাম। মা মারা যাওয়ার পর যেমন বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় তাঁর অনেক কথাই আমি বিশ্বাস করতাম না। যেমন, বিশ্বাস করতাম না যে, রাতটা তিনি স্রেফ টিভির সামনে আর এক টিন আমন্ড বাদাম এবং কয়েক পেগ জনি ওয়াকার খেয়ে কাটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সেই ইতালীয় রেস্তোরাঁয় ডিনার খেয়েছেন, আমি বাড়ি গেলে যেখানে তিনি আমাকে নিয়ে যেতেন।

"ওরা দু'সপ্তাহের মধ্যে আসছে। তুমি ক্রিসমাসে বাড়ি এলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে," বাবা বললেন। তারপর যোগ করলেন, "চিত্রার ইংরেজি অত ভাল নয়।"

"আমার বাংলার চেয়েও খারাপ?"

"সম্ভবত, থাকতে থাকতে শিখে যাবে।"

আমার মুখে যে কথাটা এল বললাম না। বললাম না যে, মা ছেলেবেলাতেই ইংরেজি শিখেছিলেন। তাঁকে আমেরিকায় এসে ইংরেজি শিখতে হয়নি।

"মেয়েগুলো বরং ভালই ইংরেজি জানে," বাবা বলে চললেন। "ওরা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে। আমি জানুয়ারি মাসে ওদের ক্লাস শুরু করার জন্য নাম লিখিয়ে দিয়েছি।"

তাঁর সঙ্গে চিত্রার মাত্র কয়েক সপ্তাহের আলাপ। বিয়ের আগে মাত্র দু'বার তাঁদের দেখা হয়েছে। রেজিস্ট্রি বিয়ের পর একটা হোটেলে ছোট করে খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। "গোটা ব্যাপারটাই আত্মীয়স্বজনরা আয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল," বাবা এমনভাবে কৈফিয়ত দিলেন, যেন বলতে চাইছেন যে, দোষটা তাঁর নয়। তাঁর এই কথাটাই আমার সবচেয়ে খারাপ লাগল। আমার বাবা সহজে প্রভাবিত হওয়ার মতো মানুষ নন। আমি জানতাম যে, তিনি নিজে অনুরোধ না করে থাকলে তাঁর জন্য নতুন বউ খুঁজে দেওয়ার সাহস কারও হবে না।

"আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, কৌশিক," বাবা বললেন। "ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম প্রতি রাতে ফাঁকা বাড়িতে ফিরে আসতে।"

বুঝতে পারছিলাম না কোনটা বেশি খারাপ— বাবার দ্বিতীয়বার ভালবেসে বিয়ে করা, নাকি একাকিত্ব কাটানোর জন্য এক অচেনা সঙ্গীকে খুঁজে বের করা। মা-বাবা ভালবেসে বিয়ে করেননি, কিন্তু তাঁদের বিয়েতে প্রণয়ের ছোঁয়াও ছিল। এক বিয়েবাড়িতে মাকে দেখে বাবা এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তার পরের সপ্তাহেই তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবসময়ই স্নেহের, সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মায়ের অসুখের পরই যেন বাবা সম্পূর্ণভাবে মায়ের প্রেমে পড়ে যান। তাই যে অনুরাগ আমি জন্মানোর আগেই বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেই অনুরাগের সাক্ষী হয়েছিলাম আমি। বাবা তখন মায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। আমাদের মুম্বইয়ের ফ্ল্যাটে মায়ের জন্য ফুল নিয়ে আসতেন, সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে দেরি করতেন, দেরি করে অফিস যেতেন। মায়ের সঙ্গে এতটাই একলা সময় কাটাতে চাইতেন যে, সেই কিশোরবয়সে আমার মনে হত যেন আমি তাঁদের প্রেমে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি।

"আমি ভেবেছি," বাবা বলতে থাকলেন, "তোমার শোওয়ার ঘরটা যেহেতু বেশ বড় মাপের, তাই মেয়ে দুটো একসঙ্গে সেখানেই থাকবে। এখানে আসলে তোমার গেস্টরুমে থাকতে কি খুব খারাপ লাগবে, কৌশিক? এমনিতেও তোমার বেশিরভাগ জিনিস এখন তোমার কাছে। শুধু কোথায় শোবে, সেটাই প্রশ্ন। কিন্তু প্লিজ় তোমার খারাপ লাগলে বলো।" মনে হচ্ছিল যেন, বাবা নতুন পরিবারের চেয়ে আমার নতুন ঘরের সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া নিয়েই বেশি চিন্তিত।

"ঠিক আছে।"

"সত্যি বলছ তো?"

"বললাম তো খারাপ লাগবে না।"

AMARBOI.COM

আমি ডর্মেটরিতে ফিরে গেলাম। সেই সকালে আমার বিছানায় একটি মেয়ে ছিল। আমি যখন গায়ে জামাকাপড় গলিয়ে, খালি পায়ে হোঁচট খেতে খেতে হলওয়েতে গিয়েছিলাম ফোন ধরার জন্য, সে তখনও ঘুমোচ্ছিল। এখন সে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, হাতে পেন। আমি যে শব্দসন্ধান শুরু করেছিলাম, সেটা শেষ করছিল। ওর নাম জেসিকা, স্প্যানিশ ক্লাসে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

"কে ফোন করেছিল?" সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল। পিছনের জানলা থেকে চড়া রোদ কোনাকুনি এসে এমন ছায়া তৈরি করেছিল যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অস্পষ্ট লাগছিল।

"আমার বাবা," আমি তার পাশে বিছানায় বসলাম। কিছুক্ষণ জেসিকা শব্দসন্ধান-এর সমাধান করতে থাকল। আমি তার পাশে গুটিয়ে শুয়ে রইলাম। তার গায়ের অপরিচিত গন্ধ তখনও আমাকে রোমাঞ্চিত করছিল। সে আমার পরিবার, বাবার কলকাতায় যাওয়া, আমার কলেজ শুরু হওয়ার আগের গ্রীষ্মে মায়ের মৃত্যু, কোনও কথাই জানত না। আমরা যে ক'টা শনি-রবিবার একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সে ক'টা দিন আমি জেসিকাকে সেসব কিছুই জানাইনি। সেই সকালে, কিছুক্ষণ তার শরীরে মুখ রেখে কাঁদার পর আমি তাকে সব বললাম।

AMARBOI.COM

পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি গাড়ি চালিয়ে ম্যাসাচুসেটস গেলাম, পথে কানেকটিকাটে থেমে জেসিকাকে তার মা-বাবার ফার্মহাউসে নামিয়ে দিলাম। আমি সোয়ার্থমোর-এ পড়বার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বাবা আমাকে সেই অডি গাড়িটা দিয়েছিলেন, যেটা তিনি মুম্বই থেকে ফিরে আসার পর কিনেছিলেন। বলেছিলেন গাড়িটা থাকলে শনি-রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে পেনসিলভেনিয়া থেকে বাড়ি আসতে আমার সুবিধে হবে। কিন্তু আমি জানতাম যে, আসলে সেটা ছিল মায়ের স্পর্শ করা, মায়ের পরিচিত বা মায়ের সঙ্গে জড়িত আরও একটি জিনিস নিজের চোখের আড়াল করার জন্য বাবার অজুহাত। যেদিন আমরা শেষবারের মতো হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছিলাম, সেদিন তিনি ফ্রেম এবং অ্যালবাম থেকে মায়ের সব ক'টি ফোটো বের করে একটা জুতোর বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন। "কয়েকটা বেছে নাও। আমি জানি তোমার কাছে এ ছবির গুরুত্ব আছে," বাবা আমাকে

বলেছিলেন। তারপর বাক্সটা টেপ দিয়ে আটকে কোনও এক দেওয়াল-আলমারিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। মায়ের জামাকাপড়, হ্যান্ডব্যাগ, কসমেটিক্স এবং কোলোনের বাক্স বিলিয়ে দিতে বাবা একটুও সময় নষ্ট করেননি। সেটাই বোধহয় আমার মনে সেই সময়ের, তোমার শেষ স্মৃতি। তুমি এবং তোমার মা একদিন আমাদের বাড়িতে এসে সারা দুপুর মায়ের দেরাজ ঘেঁটেছিলে, যেমন আরও অনেকে ঘেঁটেছিলেন। মায়ের জিনিসে হাত দিয়ে, মায়ের সোয়েটার এবং শাল নিজেদের বুকের কাছে তুলে দেখেছিলেন মানায় কি না। পরীক্ষা করে দেখেছিলেন 'চ্যানেল নাম্বার ফাইভ' তাঁদের ত্বকের উপযোগী কি না। তোমার, তোমার মায়ের এবং অন্যান্য বাঙালি মহিলাদের যে জিনিসগুলো দরকার ছিল না, সেগুলো ভারতে দান-বিতরণ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ নিউ ইংল্যান্ডে কোথাও আর সেইসব শাড়ি এবং তাদের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা সায়া-ব্লাউজ পাঠানোর জায়গা ছিল না। মায়ের তাই নির্দেশ ছিল। "আমি চাই না ওইসব সুন্দর কাপড় দিয়ে পরদা বানানো হোক," তিনি হাসপাতালের খাটে শুয়ে আমাদের বলেছিলেন। বাবার এক সহকর্মী জিম স্কিলিংস একটি নৌকোর ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই নৌকোয় চেপে গ্লাস্টারের উপকূলে গিয়ে মায়ের ভস্ম মহাসাগরের জলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর গয়নাগাটি অবশ্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। যে গরিব মহিলারা আমাদের পরিবারে আয়া, রাঁধুনির কাজ করেছিলেন, তাঁদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

মায়ের জিনিসপত্র চলে যাওয়ায় আমার কিছু আসে যায়নি। মুম্বইয়ের পর শাড়ি, গয়নাগাটি পরার উপলক্ষ মায়ের কমই ছিল। তাঁকে এবং বাবাকে কোথাও নিমন্ত্রণ করা হলে, বেশিরভাগ সময়েই তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতেন। শেষের দিকে, আমি স্কুল থেকে ফিরে দেখতাম যে, মা গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে সুইমিং পুলের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। তাঁর আর সাঁতার কাটার মতো সামর্থ্য ছিল না। মাঝে মাঝে আমি মাকে বাইরে নিয়ে যেতাম তাজা হাওয়ায় শ্বাস নেওয়ার জন্য। বাড়ির পিছনের বার্চ এবং পাইনগাছের মধ্যে দিয়ে সাবধানে হেঁটে গিয়ে একটা নিচু পাথরের পাঁচিলের ওপর বসতাম। কখনও সখনও, একটু সাহস করে মা আমাকে বলতেন তাঁকে গাড়ি চালিয়ে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যেতে। "মনে করে আমার চুনি বসানো চোকার আর মুক্তো-পান্নার সেটটা তোর বউয়ের জন্য রেখে দিস" একদিন হাঁটতে বেরিয়ে

AMARBOI.COM

মা বলেছিলেন। "আপাতত বিয়ে করার কোনও প্ল্যান নেই আমার," আমি উত্তর দিয়েছিলাম। মা বলেছিলেন যে, তিনিও মৃত্যু সম্পর্কে একই কথা বলতে চান। শেষ পর্যন্ত, আমি তাঁর অবাধ্য হয়েছিলাম। মা চলে যাওয়ার পর তাঁর দেওয়াল-আলমারির তাকে, সুটকেসের ভিতর লুকিয়ে রাখা অতগুলো চ্যাপটা লাল বাক্স আমি খুলে দেখতে পারিনি। আমার ভবিষ্যতের সুখের কথা ভেবে কিছু সরিয়ে রাখা তো দূরের কথা।

বিকেলের দিকে, যে রাস্তাটা আমাদের ড্রাইভওয়েতে গিয়ে পড়ে, সেই রাস্তা ধরে উঠতে শুরু করলাম। আশপাশে বহু কঠিন বরফের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে আমাদের বাড়িটাই আলোর একমাত্র উৎস ছিল। জায়গাটা খুব একটা সহজ বা মনোরম ছিল না। অসমান মাটির ওপর পাথরের সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছিল। দু'পাশের যথেচ্ছ বেড়ে ওঠা রডোডেনড্রনের ঝোপ সদর পর্যন্ত উঠে যাওয়া সিঁড়িগুলোর শোভাবর্ধন করত। ড্রাইভওয়েতে অন্য গাড়িটা দেখে বুঝলাম বাবা বাড়িতে আছেন। তিনি ঝড়ের জন্য দরজাটার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ভিতরে ঢোকার অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি বললেন, "আমরা ভেবেছিলাম তুমি আরও আগে আসবে। তুমি তো বলেছিলে লাঞ্চের আগেই এসে পড়বে।"

তখনই বুঝলাম যে, কথাটা সত্যি। বাড়িতে আর-একজন আছেন, যেজন্য বাবা দ্বিধাহীনভাবে 'আমি'-র জায়গায় 'আমরা' ব্যবহার করছিলেন। আমি জেসিকার বাড়ি গিয়ে সেখানে দু'ঘণ্টা কাটানোর কথা না বলে বললাম, যানজট ছিল। ভাবলাম বাবা কি আমার জন্য তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে এসেছেন, নাকি সেদিন অফিস যাননি? তাঁকে দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। তিনি সুট পরা ছেড়ে দিয়েছিলেন। শনি-রবিবারের কায়দায় গাঢ় নীল ফ্লপপ্যান্ট এবং একটা ক্রিম রঙের সোয়েটার পরেছিলেন। মনে হল, তাঁর চুল আরও পেকে গেছে। এবং যদিও তিনি তখনও যথেষ্ট সুপুরুষ, কিন্তু তাঁর মুখে বার্ধক্যের ছাপ পড়েছিল। নাকের পাশে চামড়া ঝুলে পড়া, ফ্যাকাশে সবুজাভ চোখ— মা ওই চোখ দেখে জোর দিয়ে বলতেন যে, বাবাদের পরিবারে আইরিশ রক্ত আছে, আর আগের মতো কৌতূহলী নয়। আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই তিনি সিল্কের পাঞ্জাবি এবং মাথায় বরের টোপর পরেছিলেন। কে জানে কে বিয়ের ফোটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলেছিল এবং বাবা সেই ফোটো আমাকে দেখাবেন কি না।

বাড়িতে ঢুকতেই রান্নার যে তীব্র গন্ধ পেলাম, তাতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। তা ছাড়া বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত লাগল। আমার তোলা আশপাশের বনের সাদা-কালো ফোটো, যেগুলো মা জোর করে ফ্রেমে বাঁধিয়েছিলেন, সেগুলো এখনও ঢোকার মুখে একদিকের দেওয়ালে সার বেঁধে টাঙানো ছিল। বাড়িটায় বরাবরই একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব ছিল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চিহ্ন লুকোনো থাকত একগাদা কাবার্ডে। আমি আর যখন এখানে থাকতাম না, বাড়িটা কত বিশাল, দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। লিভিং রুমের সুউচ্চ দোতলা পর্যন্ত ছাদ কত ওপরে উঠে গিয়েছে। কাচের বিরাট দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বাইরের গাছপালা দেখা যাচ্ছিল। ব্যক্তিগত ব্যবহারের চেয়ে সেটা কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্যই বেশি উপযুক্ত। কাচের দেওয়ালটার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত লম্বা উইন্ডো সিট ছিল, কুড়িজন লোকের পাশাপাশি বসার পক্ষে যথেষ্ট জায়গা। মায়ের শ্রাদ্ধের সময় সেখানে অতজনই বসে ছিলেন।

আমি কোটটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা সেটা একটা কাবার্ডে টাঙিয়ে রাখলেন। তারপর আমাকে খাবার টেবিলের দিকে নিয়ে গেলেন। বাড়িটার আধুনিক স্থাপত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আসবাবপত্র সাজানোর ওপর মা-ই জোর দিয়েছিলেন। ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের আকারে কালো চামড়ার সোফা; একটা ক্রোমের ফ্লোর-ল্যাম্প মাথার ওপর ঝুঁকে আছে। কাচের কিডনি আকারের ককটেল টেবিল। সাদা ফাইবারগ্লাসের ডাইনিং টেবিল এবং তার চারপাশে একইরকম চেয়ার। মা কখনও টেবিলের ওপর কোনও কাপড়ের ঢাকা দিতে দেননি। কিন্তু এখন একটা ভারতীয় নকশা ছাপা ঢাকা টেবিলের ওপর পাতা ছিল, চওড়ায় টেবিলটার চেয়ে খাটো। খুব সহজেই বিছানার চাদর বলেও চালানো যায়। টেবিলের মধ্যিখানে মা তাজা ফল বা ফুল এনে সুন্দর করে সাজিয়ে দিতেন। এখন তার বদলে একটা স্টেনলেস স্টিলের প্লেটের ওপর একটা সাধারণ নুন-গোলমরিচ রাখার শিশি এবং দুটো আচারের বয়াম রাখা ছিল। ঝাল আম এবং লেবুর আচার, বয়ামের ঢাকা নেই, লেবেলে আচারের দাগ লেগেছে। তেলের ভিতর চামচ ডোবানো। একদিকে আমার জন্য খাবার বেড়ে রাখা ছিল। প্লেটের ওপর লুচি এবং প্লেট ঘিরে অর্ধবৃত্তে অনেকগুলো ছোট ছোট বাটিতে ডাল ও তরকারি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা বললেন, "বোসো। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।" আমার মতো তিনিও নার্ভাস। তাঁর হাতে কোনও ড্রিঙ্ক ছিল না। সাধারণত ততক্ষণে জনি ওয়াকার এর যে বোতলটা ককটেল টেবিলের ওপর বের হয়ে যাওয়ার কথা, সেটাও ছিল না।

আমি টেবিলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। খেতে ইচ্ছে করছিল না, ভারতীয় খাবারের অভ্যেস চলে গিয়েছিল। স্কুলে ক্যাফেটেরিয়ায় খেতাম। মায়ের মৃত্যুর পর বাড়িতে থাকলে বাবা আর আমি হয় বাইরে খেতে যেতাম, নয়তো পিৎজা কিনে আনতাম। এ বাড়িতে এসে যে গ্রিলার সহ গ্যাস স্টোভটা দেখে মা উত্তেজিত হয়ে এই গ্রিলে কাবাব রাঁধবেন বলেছিলেন, সেটায় তখন শুধু চায়ের জন্য জল ফোটানো হত। টেবিলের ঠিক ওপরে ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এক কোণে রং উঠে জল পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে।

"ওটা কখন হল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কিছুদিন আগে।"

"সারাবে না?" বাবা বাড়ি তৈরির সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে সবসময় এই ধরনের জিনিস নিয়ে খুঁতখুঁত করতেন।

বাবা বললেন, "প্রোজেক্টটা বড়, এইসব জায়গায় ঢালু ছাদ করার একটা বিশেষ কারণ আছে।"

আমি কারও গলা বা পায়ের শব্দ পেলাম না। রান্নাঘর থেকে রান্নার বা জলের শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন চিত্রা এবং তাঁর মেয়েরা সাবধানে বাড়ির কাবার্ডে লুকিয়ে আছে, অন্য অনেক জিনিসের মতো কাবার্ডের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছেন। "ওরা কোথায়?" অবশেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তখন চিত্রা রান্নাঘরের ঘোরানো দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসলেন। বাবার চেয়ে আমার সঙ্গেই তাঁর বয়সের ব্যবধান কম। সে কথা আমি আগে থেকেই জানতাম, কিন্তু তাঁকে দেখে আমি মনে মনে ধাক্কা খেলাম। তাঁর মাথায় লম্বা কালো চুল। সুশ্রী মুখে চওড়া নাক। আমার তাঁকে সুন্দরী মনে হল না কারণ তাঁর মুখ আমার একটু বেশিই গোল মনে হচ্ছিল। আমি যা ভেবেছিলাম তিনি তার চেয়ে লম্বা। মায়ের চেয়ে একটু বেশি। তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর লাগানো ছিল, এই পরম্পরা মা বর্জন করেছিলেন। চিত্রার মাথায় ওই লাল গুঁড়োর দাগই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি চাই যে, তুমি আমাকে 'মামণি' বলে ডাকো," চিত্রা বাংলায় বললেন। তাঁর গলার স্বর মায়ের চেয়ে মৃদু, কণ্ঠস্বরের ক্ষীণ কর্কশভাবে তাঁর স্বর যেন অদ্ভুত শান্ত লাগছিল। "তোমার কোনও আপত্তি আছে?" তিনি সদয়ভাবে, হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন। আমার প্রতিক্রিয়ার প্রতি সতর্ক ছিলেন। আমি মাথা নেড়ে জানালাম, আপত্তি নেই। তবে হাসলাম না।

"প্লিজ," তিনি এবার ইংরেজিতে বললেন। চেয়ারে বসতে বললেন।

আমি বাবার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, "আর সকলে খাবে না?"

"আমরা খেয়ে নিয়েছি," চিত্রা বাংলায় বললেন। "তুমি এত দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছ। আরও আনছি।"

তিনি চট করে রান্নাঘরে ফিরে গেলেন। আমি বসলাম। খাওয়ার অনিচ্ছা থাকলেও, জিভে জল এসে গেল। হঠাৎ, সামনে রাখা প্রচুর খাবারের জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। শেষ খেয়েছিলাম জেসিকাকে নামিয়ে দেওয়ার সময় তার মায়ের বেক করা এক টুকরো ফ্রুটকেক। কেকটা দারুণ সুস্বাদু ছিল এবং জেসিকার মা রাস্তায় খাওয়ার জন্য কয়েকটি বাড়তি টুকরো আমাকে তবকে মুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেগুলো তাঁদের লিভিং রুমের কফিটেবিলের ওপর ভুলে ফেলে এসেছিলাম। জেসিকার ছেলেবেলার ঘরে তার চার-খুঁটিওয়ালা খাটের ওপর জেসিকা আমাকে চুমু খাওয়ার পর একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম।

AMARBOI.COM

"শুরু করো, কৌশিক," বাবা আমার পাশের চেয়ারে বসে বললেন। "খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

যে ছোট কাচের বাটিতে আমরা সাধারণত আইসক্রিম খেতাম, সেইগুলোয় আমাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল। বাটিগুলো দেখে ব্যাপারটা বড্ড আনুষ্ঠানিক লাগছিল। মনে আছে, কলকাতায় দাদু-ঠাকুরদারা এমন প্রাচীন, কেতাদুরস্তভাবে প্রতিদিন সকালে স্নানের পর রাজার মতো খেতে বসতেন। ভাবলাম কী উপায়ে এত কিছু খাওয়া যায়? এক এক চামচ করে নিয়ে সব খাবারের স্বাদ নেব, নাকি একেবারে সবকিছু প্লেটের ওপর ঢেলে নেব। লুচিগুলো এমনি এমনিই খেলাম। সেগুলো তখনও গরম এবং তারিফ করার মতো ফুলকো ছিল। এক রবিবার সকালের কথা মনে পড়ে গেল, তখন আমরা মুম্বইতে থাকি। আমাদের পারসি রাঁধুনি জারিনের তৈরি লুচি খাচ্ছিলাম। মা রান্নাঘরে চেঁচিয়ে জারিনকে নতুন করে আর এক গোছা লুচি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাজতে বলছেন। বলছেন যে, তেল যথেষ্ট গরম হওয়ার আগেই সে লুচিগুলো ভেজে ফেলেছে।

চিত্রার সঙ্গে এবার তাঁর দুই মেয়ে এল। উচ্চতায় কয়েক ইঞ্চি ছাড়া প্রথম দেখায় দু'জনের মধ্যে বিশেষ তফাত ছিল না। আমাদের আরামপ্রদ উষ্ণ বাড়ির পক্ষে তারা জামাকাপড় বেশিই পরে ছিল। মোটা বেমানান ভারতীয় সোয়েটার এবং মোজা। আমি জানতাম যে, খুব শিগগিরই সেগুলো বাতিল হয়ে মল-এর জামাকাপড় আসবে। সোয়েটারগুলো বিশ্রী রকমের ক্যাটকেটে গোলাপি রঙের উল দিয়ে তৈরি। চিত্রার সঙ্গে তাঁর মেয়েদের খুব একটা সাদৃশ্য ছিল না। মেয়েদের রং আরও চাপা। মুখ বেশ মিষ্টি, পানপাতা আকারের। মাথার দু'পাশে লাল ফিতে বাঁধা দুটো কালো ঝুঁটি।

"তোমরা খাবে?" আমি প্লেটের লুচি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, দু'জনেই এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। অন্য হাত মুখে চাপা দিয়ে ফিকফিক করে হাসতে থাকল। চোখে পড়ল দু'জনের মধ্যে যে বেঁটে, তার সামনের একটা দাঁত নেই।

"দাদাকে শান্তিতে খেতে দাও," চিত্রা বললেন। আমি তাঁকে কী বলে ডাকব সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন, কিন্তু এখন দেখলাম তিনি নির্দ্বিধায় আমাকে তাঁর মেয়েদের দাদা বলে উল্লেখ করলেন।

"তোমরা আমাকে কৌশিক বলে ডাকতে পারো," আমি দুই বোনকে বললাম। এতে তারা আবার মুখে হাত চাপা দিয়ে আরও জোরে ফিকফিক করে হাসতে শুরু করল।

"কেডি কেমন হবে?" বাবা বললেন।

বুঝতে না পেরে আমরা সকলেই বাবার দিকে, যে মানুষটির জন্য আমরা একত্র হয়েছিলাম, তাঁর দিকে তাকালাম।

"কৌশিকদাদা'কে সংক্ষেপ করে 'কেডি'," বাবা বোঝালেন। আমি চেষ্টা করলাম ভাবতে যে, কথাটা হঠাৎ তাঁর মাথায় এসেছে, নাকি তিনি আগে থেকেই কথাটা ভেবে রেখেছিলেন? শব্দচয়নের ব্যাপারে বাবার সবসময়ই একটা উদ্ভাবনী ক্ষমতা ছিল। শনি-রবিবার তিনি নিজে কবিতা লিখে মাকে পড়ে শোনাতেন। মায়ের মন্তব্য থেকে বুঝতাম যে, বাবা বুদ্ধিদীপ্ত কবিতা লিখতেন। একথা আমাদের পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল যে, আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বাবা একজন কবিও বটে। যদিও আমি কখনও সে ব্যাপারে তাঁকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু জিজ্ঞেস করিনি, ধরে নিয়েছিলাম যে, মায়ের মৃত্যুর পর অন্য অনেক কিছুর মতো তিনি কবিতা লেখাও ছেড়ে দিয়েছেন।

"বেশ ভাল তো নামটা," চিত্রা বললেন। আমার আসার পর তিনি সেই প্রথম বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন। কথাটা বেশ প্রসন্ন সুরে এমনভাবে বললেন যেন ছোটখাটো সাফল্যের প্রশংসা করতে তিনি অভ্যস্ত। তখন আমার মনে পড়ল যে, ভারতে তিনি স্কুলশিক্ষিকা ছিলেন। "হ্যাঁ, 'কেডি'ই বেশি ভাল।"

ডাকনামটা আমার অর্থহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু বাবাকে দেখে মনে হল তিনি ওটা মাথা খাটিয়ে বের করতে পেরে বেশ গর্বিত। দাদা বলে ডাকার চেয়ে ওই নামটা বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল আমার কাছে। "আর আমি তোমাদের কী বলে ডাকব?" আমার সৎবোনদের জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি রূপা," লম্বা মেয়েটি বলল, তার গলা মায়ের মতো কর্কশ ফ্যাঁসফেঁসে।

"আর আমি পিউ," যার একটা দাঁত নেই, সে বলল।

"তোমার ঘরটা বেশ ভাল," রূপা বলল। সে একটু আড়ষ্ট, একটু ভাসাভাসাভাবে কথাটা বলল। যেন এমন কিছু বলছে, যা তাকে জোর করে মুখস্থ করানো হয়েছে। "আমাদের ভাল লাগছে।"

দু'জনেই আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছিল। তাদের বাচনভঙ্গি, স্বরক্ষেপণ বেশ তীব্র লাগছিল, তেমন আমার ভাষাও নিশ্চয়ই তোমার পুরোপুরি আমেরিকান কানে তীব্র শুনিয়েছিল, যখন আমরা রিফিউজির মতো তোমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। জানতাম যে, তাদের ভাষার সেই টান তাড়াতাড়িই ঠিক হয়ে আসবে। এবং শেষপর্যন্ত তাদের বেমানান সোয়েটার এবং উস্কুটে চুলের কায়দার মতো সেই টানও মিলিয়ে যাবে।

বাবা বললেন, "রূপা এবং পিউ অ্যাকোরিয়াম এবং সায়েন্স মিউজিয়াম দেখতে খুব আগ্রহী, তুমি একদিন ওদের নিয়ে সেখানে যেতে পারো, কৌশিক।"

আমি উত্তর দিলাম না। বাংলায় বললাম, "খুব ভাল খেতে হয়েছে।" মা শিখিয়েছিলেন যে, কারও বাড়িতে খাওয়ার পর একথা বলতে হয়। প্লেটটা রান্নাঘরে রাখার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

"তোমার খাওয়া শেষ হয়নি তো," চিত্রা আমাকে বাধা দিলেন। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেটটা আমার হাত থেকে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি সেটা নিয়ে নিজের জন্য খানিকটা জানি ওয়াকার ঢেলে নিতে রান্নাঘরে গেলাম। বাবা বোতলটা ডিশওয়াশের ওপরের কাবার্ডে রাখতেন।

"কী লাগবে তোমার, বলো? আমি আনছি," চিত্রা আমার পিছন পিছন এসে বললেন। হঠাৎ তাঁকে দেখে, আমাদের রান্নাঘরে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার মনটা বিরক্তিতে ভরে গেল। মা সেখানে রান্না করছেন, এরকম কোনও স্মৃতি আমার ছিল না। কিন্তু ওই জায়গাটাতেই বাড়ির অন্য কোনও অংশের চেয়ে মায়ের অস্তিত্ব বেশি অনুভব করলাম। যে জেড এবং স্পাইডার গাছে মা জল দিতেন, সেগুলো তখনও জানলার চৌকাঠে বেড়ে উঠছিল। যে সাদা-কমলা সানবার্স্ট ঘড়িটার নকশা মা অত ভালবাসতেন, সেটা তার সেকেন্ডের চলন্ত কাঁটাসমেত তখনও দেওয়ালে সময়ের জানান দিচ্ছিল। যদিও মা প্রায় কখনওই বাসনকোসন ধুতেন না এবং সেই দিনগুলোয় আমিই বেশিরভাগ সময় কাজটা করতাম, তবুও আমি সিঙ্কের কলের ওপর মায়ের হাত দুটো কল্পনা করতে পারলাম। কল্পনা করতে পারলাম, তাঁর তন্বী দেহ কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চিত্রাকে উপেক্ষা করে আমি গ্লাসের জন্য একটা কাবার্ড এবং স্কচ-এর জন্য আর-একটা কাবার্ড খুললাম। কিন্তু এখন সেখানে সিরিয়ালের বাক্স এবং কলকাতা থেকে আনা চানাচুরের প্যাকেট ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেলাম না।

বাবা রান্নাঘরে ঢুকলেন। "স্কচটা কোথায়?" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

বাবা চিত্রার দিকে আড়চোখে তাকালেন। তাঁদের মধ্যে যেন নিঃশব্দে কোনও কথা হল, তারপর চিত্রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। "আমি ওটা সরিয়ে রেখেছি," চিত্রা চলে যাওয়ার পর বাবা বললেন।

"কেন?"

"আমি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। দেখলাম যে, তাতে রাতে বেশি ভাল ঘুম হয়।"

"কবে থেকে?"

"বেশ কিছুদিন হল। তা ছাড়া, আমি চাইনি যে, চিত্রা ঘাবড়ে যাক।"

"ঘাবড়ে যাবে?"

"ও একটু রক্ষণশীল।" বাবা ফ্রিজের পাশে রাখা ঘরাঞ্চিটা বের করে খুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে ফ্রিজের ওপরে একটা কাবার্ড খুললেন। দরাজের ওপর থেকেও সেটার নাগাল পাওয়া কঠিন ছিল। একটা আধ-খালি বোতল বের করলেন।

আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম, তাঁর মাথায় কী ভূত চেপেছিল যে, তিনি তাঁর অর্ধেক বয়সি, রক্ষণশীল এক মেয়েকে বিয়ে করতে গেলেন। তার বদলে আমি তাঁর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বললাম, "আশা করি আমি ওঁকে ঘাবড়ে দিলে কোনও সমস্যা হবে না?"

"শুধু একটু চেপে রেখো, বিশেষ করে মেয়েগুলো কাছাকাছি থাকলে।"

আমার মা-বাবা কোনওদিন জনি ওয়াকারের প্রতি তাঁদের দুর্বলতা লুকোনোর চেষ্টা করেননি। আমি সামনে থাকলেও না, অন্য কেউ কাছাকাছি থাকলেও না। মা মারা যাওয়ার পর, আমার যখন সবে আঠারো বছর বয়স, তখন আমিই মায়ের জায়গা নিয়েছিলাম। সন্ধেবেলা যতক্ষণ না আমাদের দু'জনেরই শুতে যাওয়ার মতো অজুহাত তৈরি হত, ততক্ষণ আমিই বাবাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য একের পর এক জল মেশানো পেগ নিঃশেষ করতাম। আমি কলেজে কখনও এটা খেতাম না, বিয়ারই বেশি পছন্দ করতাম। কিন্তু বাড়ি আসলেই আমি ওই স্বাদটার জন্য মুখিয়ে থাকতাম। কোনও বিলবোর্ড বা পত্রিকায় জনি ওয়াকার-এর বিজ্ঞাপন দেখলেও মায়ের কথা না ভেবে পারতাম না।

বাবা বললেন, "আমি ভাবছিলাম, কাল আমি অফিসে গেলে তুমি একটা গাছ নিয়ে আসতে পারো, একটা জায়গা আছে, ১২৮-এর থেকে বেশি দূরে নয়। মেয়েরাও হয়তো তোমার সঙ্গে যেতে চাইবে। ওরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে ব্যাপারটা নিয়ে।"

আমি বাবার দিকে তাকালাম। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তখনও পর্যন্ত আমার মাথায় পুরোপুরি ঢোকেনি যে, দিনের বেলা বাবা অফিস যাবেন এবং আমি চিত্রা ও তাঁর মেয়েদের সঙ্গে একলা থাকব।

"মানে ক্রিসমাস ট্রি?" মায়ের মৃত্যুর পর, গত তিন বছর ধরে আমরা বাড়িতে বড়দিন পালন করিনি। তার বদলে আমরা বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সকালবেলা, বাড়ির সকলে যখন রাতের পোশাকও ছাড়েনি, তখন আমরা পরিপাটি হয়ে উপস্থিত হতাম। আমি একটিমাত্র বাক্স পেতাম, ভিতরে একটা সোয়েটার বা বোতাম লাগানো শার্ট থাকত। সেইসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের কয়েক ডজন উপহারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্স খুলতে দেখতাম। মুম্বইতে মা সবসময় বড়দিনে পার্টি দিতেন। আমাদের ফ্ল্যাটটা আলোয় সাজিয়ে, একটা টবের জবাগাছের তলায় উপহার রেখে দিতেন। বছরের সেই সময়টা তিনি সস্নেহে কেমব্রিজের কথা, তোমাদের পরিবার এবং আরও যাঁদের ছেড়ে এসেছিলেন, তাঁদের কথা বলতেন। বলতেন যে, সেই শীত, সেইসব সাজানো দোকান এবং ডাকে আসা কার্ড ছাড়া বড়দিনটা আগের মতো লাগে না।

"মনে হয় কয়েকটা উপহারও কিনতে হবে, এখনও কয়েক দিন আছে। বেশি বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই অবশ্য," বাবা বললেন।

আমি জানতাম যে, চিত্রা এবং তাঁর মেয়েরা সম্ভবত খাবার জায়গায় একসঙ্গে আড়ালে বসে বাবা এবং আমার প্রতিটি কথা কান পেতে শুনছিলেন, কিন্তু সেই সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি বলে উঠলাম, "ওই মেয়েগুলো আমার অর্ধেক বয়েসেরও নয়। তুমি কি আশা করো আমি ওদের সঙ্গে খেলা করব?"

"আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই আশা করি না," বাবা অবিচলিত স্বরে বললেন। আমার মন্তব্য শুনে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। হয়তো তিনি আশ্বস্তই হয়েছিলেন দেখে যে, অবশেষে আমরা খোলাখুলিভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করছি। অন্য কোনও ভান করার আর প্রয়োজন ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন, তিনি সেই দৃশ্যটা আগেই নিজের মনে অনেকবার ঝালিয়ে নিয়েছেন এবং ক্লান্ত হয়ে গিয়েছেন। "আমি শুধু তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে, একটা গাছ কিনে আনতে তোমার কোনও অসুবিধে আছে কি না।"

আমার তখনও পানীয়টা গ্লাসে ঢালা হয়নি। আমি রান্নাঘরের কাউন্টারের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। এক হাতে গেলাস, আর-এক হাতে সেই বোতলটা, যেটা বাবা তাঁর লুকোনো জায়গা থেকে আমাকে বের করে দিয়েছিলেন। আমি এবার পানীয়টা গ্লাসে ঢাললাম, যেভাবে মা ঢালতেন। জল না দিয়ে শুধু একটা বরফের কুচি যোগ করে। যা ঢেলেছিলাম, সেটা শেষ করলাম, তারপর আর-এক পেগ ঢাললাম।

"ইজ়ি," বাবা বললেন।

আমি তাঁর দিকে তাকালাম। মায়ের মৃত্যুর পর বাবার মুখে এমন এক অভিব্যক্তি এসে গিয়েছিল, যা তাঁর মুখভঙ্গি স্থায়ীভাবে পালটে দিয়েছিল। সেই অভিব্যক্তিতে যত না দুঃখ, তার চেয়ে বেশি ছিল এক বিরক্ত, হার মেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেওয়া ভাব। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন আমার হাত থেকে কোনও গেলাস পড়ে ভেঙে গেলে বা কোনওদিন পিকনিকের পরিকল্পনা করার পর দিনটা মেঘলা হলে তাঁর মুখে ওইরকম অভিব্যক্তি দেখা যেত। যে সকালে আমরা শেষবারের মতো হাসপাতালে মায়ের ঘরে ঢুকেছিলাম, তাঁর মুখে এরকম ভাব দেখা দিয়েছিল। তারপর আমি যখনই কলেজ থেকে ফিরতাম, তাঁকে একইরকম দেখাত। যেন, তাঁর আশাভঙ্গ করার জন্য তিনি মায়ের প্রতি একই ভাব পোষণ করেন। "ইজ়ি নয়," সন্ধের অন্ধকার প্রেক্ষাপটে নিজের প্রচ্ছায়ার দিকে ঘাড় নাড়তে নাড়তে আমি বললাম, "আমার জন্য সহজ নয়।"

পরের দিন সকালে আমি ওঠার আগেই বাবা অফিসের জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ আমি শুয়ে রইলাম, ক'টা বেজেছে বুঝতে পারছিলাম না। প্রথমে মাথায় ঢুকছিল না কেন আমি গেস্টরুমে শুয়ে আছি বা কেন ওপরের ঘর থেকে চাপা মেয়েলি গলার হাসি শুনতে পাচ্ছি। গেস্টরুমটা বাড়ির দোতলায়, রান্নাঘরের পিছনের করিডোর সংলগ্ন একটা অন্য অংশে। আমি একটা ডাবল বেডে শুয়েছিলাম, তোশকটা নিচু প্ল্যাটফর্মের ওপর পাতা। উলটোদিকের দেওয়ালে একটা স্লাইডিং কাচের দরজা। তার মুখোমুখি পিছনের উঠোন এবং কালো টার্প দিয়ে ঢাকা সুইমিং পুল। এ বাড়িতে আসার পর মা অন্য ঘরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছিলেন গেস্টরুমটা সাজাতে। খাটের ওপর গঙ্গাফড়িং-সবুজ কাঁথা, স্লাইডিং কাচের দরজার জন্য পরদা, খাটের পাশের টেবিলটার জন্য একটা অ্যালার্ম ক্লক, লাগোয়া বাথরুমের জন্য সাবান রাখার জায়গা, সব নিজে কিনে এনেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন দেরাজের ওপর একটা গোলাপি-বেগুনি মধুবনী পেন্টিং টাঙিয়ে দিতে। জানি না তিনি এমন কোন অতিথির আশা করেছিলেন, যিনি আমাদের সঙ্গে এসে থাকবেন। কিন্তু ততদিনে, যা করলে মায়ের মন ভাল থাকত, আমরা তাই করতাম। এখন আমি ঘরটার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। আশ্বস্ত হলাম যে, ওপরে আমার পুরনো শোওয়ার ঘরে থাকতে হবে না। মা-বাবার ঘর আর আমার ঘরের মাঝে শুধু একটা দেওয়াল আছে। রাতে মায়ের কর্কশ শব্দে শ্বাস নেওয়া, কাতরানি শোনা আমার পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর ছিল। এখন সেই ঘরে থাকলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে ঘুমোনোর আগে বাবা এবং চিত্রার কথাবার্তা শুনতে হত। একই কম্বলের তলায় পাশাপাশি তাঁদের শরীর কল্পনা করতে হত।

আমি যতদূর জানি, আমাদের গেস্টরুমে মাত্র একজন এসে থেকেছিলেন। মিসেস ঘ্যারিবিয়ান নামে একজন নার্স, তিনি মায়ের দেখাশোনা করতে এসেছিলেন। সেটা ছিল মায়ের প্রয়োজনে, বাবা এবং আমার পক্ষে যে সেবা করা সম্ভব ছিল না সেজন্য এবং মা যে বাড়িতে নয়, হাসপাতালে মারা যেতে চান, তাঁর সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে। মিসেস ঘ্যারিবিয়ান ছিলেন মধ্যবয়সি। ছোট করে ছাঁটা বাদামি চুল, ভাষায় উত্তরের মৃদু টান। তিনি এক আর্মেনিয়ানকে বিয়ে করেছিলেন এবং শাশুড়ির কাছ থেকে নানা ধরনের জলখাবার তৈরি করা শিখেছিলেন। তিনি টাপারওয়্যার-এর পাত্রে পাঁঠার টার্নোভার এবং পুরভরতি আঙুরের পাতা আনতেন। ওই খাবারগুলো এখন আমাকে মায়ের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি খাবারগুলো ফ্রিজে রেখে দিতেন বাবার এবং আমার খাওয়ার জন্য। বলার আগেই পাউরুটি এবং দুধ কিনে রাখতেন। সাধারণত সন্ধেবেলা চলে যেতেন, কিন্তু দু'সপ্তাহ তিনি রাতটা আমাদের সঙ্গেই কাটিয়েছিলেন। মাকে মর্ফিন ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন, বেডপ্যান খালি করেছিলেন, একটা ছোট্ট কাপড়ের বইতে নোট নিচ্ছিলেন। বইটা দেখে মনে হচ্ছিল, সেটায় রান্নার প্রণালী লেখা উচিত। তাঁর শান্ত, আশাবাদী ব্যবহার দেখে আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মিসেস ঘ্যারিবিয়ান মাকে ধরে রাখতে পারবেন। তাঁকে হয়তো সুস্থ করে তুলতে পারবেন না, কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, "এটাই সবচেয়ে খারাপ পর্ব, তোমরা নিশ্বাস বন্ধ করে আছ এই ভেবে যে, আরও খারাপ সময় আসবে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী এটাই সবচেয়ে খারাপ সময়। তোমাদের পক্ষেও এবং ওঁর পক্ষেও।" সেই সময় তাঁর কথাগুলো আমাকে কোনও সান্ত্বনা দেয়নি। মা আর নিশ্বাস নেবেন না, তাঁর ক্লান্ত চোখ মেলে আমাদের দেখবেন না, এর চেয়ে খারাপ সময় আমি কল্পনা করতে পারতাম না। যখন মায়ের মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি, রোজ মায়ের সেই মুখ দেখতে পাব না, তার চেয়ে খারাপ কিছু আমার কল্পনাতীত। মায়ের মৃত্যুর পর আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, মিসেস ঘ্যারিবিয়ান ঠিকই বলেছিলেন। শেষ মুহূর্তের অপেক্ষা করার চেয়ে খারাপ আর কিছুই ছিল না। তার আগের দিনগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহ্য ভারের চেয়ে পরের শূন্যতা সহ্য করা ছিল বেশি সহজ।

আমি একটা সোয়েটার গলিয়ে স্লাইডিং দরজাটা খুলে একটা সিগারেট ধরালাম। ঝরা পাতাগুলো পরিষ্কার করা হয়নি, সেগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে, হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। সুইমিং পুলটার জন্য আমার কলেজের গরমের ছুটিটা সহ্য করা যেত। কিন্তু আগের গ্রীষ্মে বাবা পুলে জল ভরতি করেননি। আমি ছুটিটা এক বন্ধুর সঙ্গে তার ব্রুকলিনের বাড়ি পাহারা দিয়ে কাটিয়েছিলাম কারণ তার মা-বাবা ইউরোপ গিয়েছিলেন। কাল রাতে বাবা বলেছিলেন যে, পুলের ফিল্টার বদলাতে হবে। এই বাড়িতে আমাদের প্রথম গ্রীষ্মে মা নিয়মিত পুলটা ব্যবহার করতেন। প্রাতরাশের আগে চল্লিশবার পুলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সাঁতার কাটতেন। তার পরের গ্রীষ্মের আগেই, কেমোথেরাপির জন্য মা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তখন শুধু পুলে নামতেন বা গরমের দিনে পুলের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতেন। আর সেই গ্রীষ্মের শেষেই মা মারা গিয়েছিলেন।

ভিতরে, আমি টিভির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম— গেস্টরুম থেকে বেরোলেই ওদের দেখতে হবে। আমি জিনস পরলাম। বিরক্ত লাগল যে, বাড়ির ভিতর শুধু বক্সার পরে ঘুরতে পারব না। বাথরুমে গিয়ে দাঁত মাজলাম, সময় নিয়ে দাড়ি কামালাম। খাবার নয়, শুধু কফি খেতে খুব ইচ্ছে করছিল। ডিনারেও সেই একইরকম মশলাদার অস্বস্তিকর খাবারের আয়োজন ছিল। চিত্রা বাবা, আমি এবং মেয়েদের পাশে ঘুরঘুর করছিলেন। আমাদের খাওয়ার পর খেলেন, যেমন মুম্বইতে আমাদের কাজের লোকরা করত। কল্পনায় দেখলাম খাবার টেবিলের ওপর আমার জন্য আর একটা উপচে পড়া খাবারের থালা অপেক্ষা করছে, কিন্তু কোনও প্রাতরাশই তৈরি হয়নি। লিভিং রুমে চিত্রা এবং তাঁর মেয়েদের কাছে যাওয়ার পর আমাকে কিছুই খেতে বলা হল না। তাঁরা সোফাটার ওপর পা উঠিয়ে বসে 'ফ্যামিলি ফিউড'-এর এপিসোড দেখছিলেন। বিশাল উঁচু ছাদটার নীচে তাঁদের ভীষণ ছোট লাগছিল। ঘরটা সকালবেলার সূর্যের আলোয় ভেসে যাচ্ছিল। মেয়েরা জামাকাপড় পরে তৈরি, কিন্তু চিত্রার পরনে একটা চেন-আটকানো লাল-হলুদ ক্যালিকো ছাপের বেখাপ্পা হাউসকোট। মেকআপ বা গয়নাগাটি ছাড়া তাঁকে আরও অল্পবয়সি লাগছিল। তিনি চা খাচ্ছিলেন, মায়ের বিস্কুটের টিন তাঁর পাশে খুলে রাখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সুপ্রভাত," আমি বললাম।

"সুপ্রভাত," পিউ এবং রূপা সুর করে উত্তর দিল, তারপর দু'জনেই টিভির দিকে চোখ ফেরাল।

"আমি তোমার চা আনছি," চিত্রা চায়ের কাপ ককটেল টেবিলটার ওপর রেখে উঠতে গেলেন। "তোমার জন্য চা করিনি। তোমার বাবা বললেন যে, বাড়ি আসলে তুমি বেশ দেরি করে ওঠো।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "উঠতে হবে না। আমার চা দরকার নেই।"

আগের রাতের মতোই, তিনি আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছিলেন। আর আমি ইংরেজিতে। ভাবলাম হয়তো আমার শিথিল, আমেরিকান উচ্চারণ তিনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু মনে হল তিনি আমার কথা বুঝতে পারছেন।

চিত্রা ভুরু কোঁচকালেন, "সকালে চা খাবে না?" মেয়েরাও টিভি থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার উত্তরের অপেক্ষায় ছিল।

"আমার কফি দরকার। স্কুলে কফিই খাই, তাই অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।"

"কিন্তু রান্নাঘরে তো কফি নেই। অন্তত আমি তো দেখিনি।"

"চিন্তা করার কিছু নেই। আমি 'ডানকিন ডোনাটস'-এ গিয়ে খেয়ে নিচ্ছি।" তাঁকে কোনও প্রশ্নর সুযোগ না দিয়েই বলতে থাকলাম, "ওটা একটা দোকান যেখানে ডোনাট বিক্রি হয়। ডোনাট এক ধরনের কেক যার মাঝখানে ফুটো থাকে।"

"দোকানটা কি দূরে?"

"কয়েক মিনিটের দূরত্ব।"

"কিন্তু তোমাকে তো গাড়ি নিয়ে যেতে হবে?"

আমি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললাম। চিত্রাকে হতাশ লাগল। "গাড়ি ছাড়া কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?"

"নেই বললেই চলে। আপনি গাড়ি চালাতে পারেন?"

চিত্রা মাথা নেড়ে না বললেন।

"এমন কিছু কঠিন নয়। লাইসেন্স নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।"

"ওহ, না," তিনি বললেন। যেন প্রশ্নটা তাঁর গাড়ি চালাতে পারা নিয়ে নয়, বরং কাজটা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী নয়। "আমি শিখতে চাই না।"

"আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি," আমি বললাম। মেয়েরা আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা আমার সঙ্গে আসতে চাও?"

"হ্যাঁ, প্লিজ," রূপা এবং পিউ একসঙ্গে বলল। চিত্রার দিকে তাকাতে তিনি ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি দিলেন।

আমি ওয়ালেট এবং গাড়ির চাবি আনতে গেস্টরুমে গেলাম। ফিরে দেখি, ততক্ষণে মেয়েরা কোট পরে ফেলেছে। একইরকম লাল পার্কা কোট, নিশ্চয়ই তারা আসার পর বাবা কিনে দিয়েছিলেন। কোটের মোটা চেন এবং উজ্জ্বল নাইলনের কাপড় তাদের চেহারা পালটে দিয়েছিল, হঠাৎ করে তাদের মধ্যে পুরোপুরি আমেরিকান ছাপ এসে গিয়েছিল। তারা একসঙ্গে আমার গাড়ির পিছনের সিটে খবরের কাগজ, ফাঁকা সোডার বোতল, পাঠ্যবই এবং ক্যাসেট টেপের মাঝে বসল। "সরি এসব জঞ্জালের জন্য," আমি সবকিছু সিট থেকে গাড়ির মেঝেতে ফেলে দিলাম। দু'জনে সাবধানে সিট-বেল্ট লাগাল, বকলশ ফাঁক থেকে বের করল। রূপা পিউকে সাহায্য করল। চিত্রা হাউসকোট পরে দাঁড়িয়ে স্টর্ম দরজাটার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেখছিলেন। তিনি বিশ্বাস করে তাঁর দু'মেয়েকে আমার সঙ্গে এমন এক জায়গায় পাঠাচ্ছিলেন, যার নাম তিনি কখনও শোনেননি এবং যে জায়গাটা তিনি খুঁজে পাবেন না। তবুও, তিনি হাত নাড়লেন এবং চেষ্টা করে একটু হাসলেন। আমি ক্লাচে পা রেখে গাড়িটা ঘোরাতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় চিত্রা দরজা খুলে মাথা বের করে বললেন, "আর আমি ঠিক থাকব তো?"

"মানে?"

"আমি একা এই বাড়িতে নিরাপদ তো?"

"অবশ্যই," আমি বললাম। অবাক লাগল যে, সেই প্রথমবার তিনি বাড়িতে একা থাকবেন। আমি প্রায় হেসে ফেলেছিলাম। "একা সময়টুকু উপভোগ করুন।"

"মা আমাদের ওঁর সঙ্গে ছাড়া বাইরে যেতে দেন না," পিউ বলল।

"মা ভয় পান। কোনও পড়শিকে দেখতে পান না তো," রূপা যোগ করল।

"আরও ভয় পান যে, আমরা সুইমিং পুলে পড়ে যাব।"

এই কথাগুলোর কোনওটার উত্তরেই কী বলব ভেবে না পেয়ে আমি কিছুই বললাম না। লম্বা ড্রাইভওয়ে থেকে গাড়িটা নিয়ে ব্যাক করে শহরের দিকে এগোলাম। সবচেয়ে কাছের ডানকিন ডোনাটস-এর দূরত্ব বাড়ি থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনেরো মিনিটেরও নয়। পৌঁছে মনে হল বড্ড তাড়াতাড়ি এসে গিয়েছি। ইচ্ছে হচ্ছিল আর একটু গাড়ি চালাই। তাই আরও এগিয়ে গেলাম, পরের শহরের দিকে চললাম। সেখানে একটা সমুদ্রতটে মা মাঝে মাঝে হাওয়াবদলের জন্য যেতে চাইতেন। সেখানে যাওয়ার জন্য হাইওয়েতে উঠতে হত। অল্প কিছুক্ষণের জন্য ফাঁকা, জনমানবহীন রাস্তাটায় গতি বাড়িয়ে আমার দারুণ লাগল। কোথায় যাচ্ছি সে বিষয়ে মেয়েরা কোনও প্রশ্ন করল না। দু'জনেই পিছনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। সফরটা তখনও এত লম্বা হয়নি যে, কথাবার্তার অভাবে অস্বস্তিকর লাগবে। পরের শহরে ঢুকে আমি এমন একটা রাস্তা ধরলাম, যেটা থেকে মহাসাগরের ধূসর রেখা দেখা যায়। পিউ এবং রূপাকে রেখাটা দেখালাম, কিন্তু তারা কিছু বলল না। "ড্রাইভ-থ্রুতে যেতে পারি বা ভিতরেও যেতে পারি। তোমাদের কী পছন্দ?"

"কোনটা সবচেয়ে ভাল?" রূপা জিজ্ঞেস করল।

"ড্রাইভ-থ্রু হলে কফি নিয়ে খেতে খেতে বাড়ি ফিরব। নয়তো ভিতরে গিয়ে বসতে হবে।"

রূপা ড্রাইভ-থ্রু চাইল, পিউ ভিতরে যেতে চাইল। আমি বললাম, "এক কাজ করা যাক, আমরা ভিতরে যাই, তারপর বাড়ি ফেরার পথে ড্রাইভ-থ্রু থেকে আর-একবার কফি নিয়ে নেব।"

মনে হল, কারও ইচ্ছেই অগ্রাহ্য করা হয়নি দেখে দু'জনেই খুশি হল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'জনে হাত ধরাধরি করে পার্কিং লট-এর অন্যদিকে হেঁটে গেল। ডানকিন ডোনাটস একটা শপিং প্লাজার অংশ। সেখানে একটা মদের দোকান, একটা 'বেড অ্যান্ড বাথ' আর একটা পার্টির জিনিসপত্রের দোকানও ছিল। শেষ মুহূর্তে বড়দিনের কেনাকাটা করতে এসেছে এমন খদ্দেরদের গাড়িতে জায়গাটা ভরতি। কিন্তু ডানকিন ডোনাটস ফাঁকা। সাউন্ড সিস্টেম-এ ক্রিসমাস ক্যারল বাজছিল। গানগুলোর বস্তাপচা সুর রূপা এবং পিউয়ের কাছে বিদেশি লাগছিল। আমি নিজের কফি অর্ডার করে তাদের জিজ্ঞেস করলাম তারা কী খেতে চায়। পিউ পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এবং রূপা মুখটা সামান্য হাঁ করে, মুখের এক কোণে জিভটা আটকে খাবারের তালিকার দিকে তাকিয়ে রইল। পিউ যাতে ভাল করে দেখতে পায়, তার জন্য তাকে তুলে ধরাই উচিত ছিল। জিজ্ঞেস করতে পিউ তার হাত দুটো তুলে আমার কোলে উঠে পড়ল। যা ভেবেছিলাম, সে তার চেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ ভারী। আমি তাকে কাউন্টারের ওপর বসিয়ে দিলাম, যেখান থেকে সে তালিকার দিকে তাকিয়েই রইল।

"তোমার প্রিয় কোনটা, কেডি?"

"বস্টন ক্রিম।"

"আমি সেটাই খাব তা হলে।"

"আমিও," রূপা বলল।

"তিনটে দিন," আমি ক্যাশিয়ারকে বললাম।

আমরা একটা ছোট ঘরে বসলাম। ফর্মিকা টেবিলের এক পাশে আমি, আর-এক পাশে আমার দুই সৎবোন। তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গে খেতে শুরু করল, শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামল না। নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল, বোনে-বোনে কিছু কথা হল, যা থেকে আমি বাদ পড়ে গেলাম। আমিও আমার ডোনাটটা খেলাম। দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে, তাদের হাঁ-মুখ কত ছোট এবং আমার চেয়ে কত বেশি সময় লাগল খাওয়া শেষ করতে। প্রতিটি বিষয়েই আমি ছিলাম তাদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু একই সঙ্গে যে বিষয়গুলো আমাদের একসূত্রে জুড়ে রেখেছিল, সেগুলো অস্বীকার করতে পারছিলাম না। তার মধ্যে ছিলেন বাবা। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন, প্রথমে তিনিই সবচেয়ে অপ্রাসঙ্গিক। রূপা এবং পিউয়ের মতো আমিও ভারত থেকে ম্যাসাচুসেটস এসেছিলাম। সেই ধাক্কা বোঝার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করার মতো বয়স হয়নি। এই সবকিছু তাদের মনে থাকবে। হয়তো তোমাদের বাড়িতে সেই প্রথম কয়েক মাস আমার যেমন পরিষ্কার মনে আছে, তেমন না হলেও, তাদের অস্পষ্ট মনে থাকবে। নিজেদের মতো আমিও মা-বাবার একজনকে হারিয়েছি। এবং এখন আমাকেও তাঁর জায়গায় অন্য একজনকে মেনে নিতে বলা হচ্ছিল। ভাবার চেষ্টা করলাম পিউ এবং রূপার নিজেদের বাবাকে কতটা মনে আছে। তাঁর মৃত্যুর সময় পিউয়ের মাত্র পাঁচ বছর বয়স ছিল। মায়ের মৃত্যুর সাড়ে তিন বছর পর আমার মনেও মায়ের স্মৃতি মুছে যেতে শুরু করেছিল। তাঁর সঙ্গে কাটানো হাজার-হাজার দিনগুলো এক মুঠো দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল। রূপা এবং পিউয়ের তুলনায় আমি সৌভাগ্যবান ছিলাম। আমি মাকে বেশিদিন কাছে পেয়েছিলাম। দুই বোনের মধ্যেই মৃত্যু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা টের পাওয়া যেত— তাদের ভাবভঙ্গিতে বোঝা যেত, এমন কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা বড় তাড়াতাড়ি ভেঙে গিয়েছিল এবং আর গড়ে ওঠেনি। তাদের হালকা মেজাজ সত্ত্বেও লক্ষ করা যেত।

"ভাল লাগল?"

দু'জনেই সায় দিল। পিউ বলল, "আর-একটা দাঁত আলগা হয়ে গিয়েছে।" সে মুখ খুলে জিভ দিয়ে একটা ছোট্ট চকোলেট লাগা নীচের দাঁত সামনের দিকে ঠেলে দিল।

কফিটা বেশ গরম ছিল, তাই আমি ঢাকা সরিয়ে সেটা কাউন্টারের ওপর রাখলাম। পিউ জানলার বাইরে পার্কিং লট-এ গাড়ির আসা-যাওয়া দেখছিল। রূপা সাজিয়ে রাখা ডোনাট, কফির ডিসপেন্সার এবং বুদবুদ ওঠা লাল পাঞ্চের ট্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে ছিল।

"আর-একটা খাবে?"

রূপা আমার চোখ এড়িয়ে মাথা নাড়ল। সে পিউয়ের চেয়ে বেশি চাপা স্বভাবের। মাঝে মাঝে মনে হত নতুন পরিবেশ তার মনে খুব একটা দাগ কাটতে পারেনি। "আমি মায়ের জন্য বাড়িতে একটা নিয়ে যেতে চাই।"

"ওই যেটার ওপর নানা রকমের রং দেওয়া," পিউ হাঁটু গেড়ে বসে আঙুল দিয়ে দেখাল। "ওটা সবচেয়ে সুন্দর দেখতে।"

রূপা রাজি হল না। "যেটা বরফ দিয়ে ঢাকা, আমার ওইটা ভাল লাগছে।"

"এই নাও এক ডলার," আমি একটু উঠে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করলাম। "তোমরা আর-একটা করে নেবে?"

"আমাদের টাকাপয়সায় হাত দেওয়া বারণ," রূপা বলল।

"এটা তো মোটে এক ডলার। যদি এখান থেকে ওখানে যেতে এটা হারিয়েও ফেলো," আমি ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললাম, "নো বিগ ডিল।"

"বিগ ডিল?" পিউ তার কালো ভুরু দুটো কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

"এমন কিছু ব্যাপার নয়।"

দু'জনে ছোট ঘরটা থেকে বেরিয়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। দু'জনেই টাকাটার এক-একটা করে কোণ এমনভাবে ধরে ছিল, যেন নোটটা কোনও প্যারেডের খুদে ঝান্ডা। আমি কাউন্টারের দিকে পিছন ফিরে বসেছিলাম, তাই দেখার জন্য ঘাড় ঘোরাতে হল। দেখলাম, রূপা দু'বার আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল, তারপর দু'জনে নোটটা ক্যাশিয়ারের দিকে ঠেলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিল। ক্যাশিয়ার ব্যাগের মুখটা মুড়ে, কোন বোনকে দেবে বুঝতে না পেরে শেষে ব্যাগটা রূপার জন্য কাউন্টারের ওপর রেখে দিল।

"মুখে কিছু বললে না কেন?" ফিরে আসার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম।

রূপা আমাকে বাকি টাকা ফেরত দিয়ে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে বলল, "আমরা কি কোনও ভুল করেছি?"

"না। কিন্তু তোমরা কী ধরনের ডোনাট চাও সেটা আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে মুখ ফুটে বলতেই পারতে। ক্যাশিয়ার সেটা দেওয়ার পর তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। আর সবসময় 'হ্যালো' বলে শুরু করবে।"

রূপা মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "সরি।"

"সরি বোলো না। আমি শুধু বলছি যে, এতে তোমাদের লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তোমরা যত ইংরেজিতে কথা বলবে, তত তোমাদের সুবিধে হবে। তোমরা তো এমনিতে ভালই ইংরেজি বলো।"

"তোমার মতো নয়," রূপা বলল। "স্কুলে সকলে শুনে হাসবে।"

"আমার স্কুলে যেতে ভয় করছে," পিউ মাথা ঝাঁকিয়ে হাত দিয়ে চোখ ঢাকল।

তাদের আশ্বস্ত করার কোনও অভিপ্রায় আমার ছিল না, কিন্তু না করাটা নিষ্ঠুরতা হবে। "দেখো, আমি জানি তোমাদের কেমন লাগছে। প্রথমদিকে কেউ হাসতেও পারে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমায় নিয়েও হাসত। আমি ষোলো বছর বয়সে মুম্বই থেকে এখানে এসেছিলাম। সবকিছু নতুন করে বুঝতে হয়েছিল। আমার জন্ম এখানেই হয়েছিল, কিন্তু তাও ব্যাপারটা সহজ ছিল না। চলে যাওয়া, তারপর আবার ফিরে আসা।"

"সেটা কি তোমার মা মারা যাওয়ার আগে?" পিউ জিজ্ঞেস করল। সে শ্রদ্ধার সঙ্গে, সামান্য দুঃখিতমুখে প্রশ্নটা করল। যেন সে মাকে চিনত। অথবা হয়তো তার নিজের বাবার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, ঠিক বলতে পারব না।

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

"তিনি কেমন ছিলেন?"

"তিনি— তিনি আমার মা ছিলেন," আমি প্রশ্নটা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। হঠাৎ এই দু'টি ছোট্ট মেয়ে, যাদের সঙ্গে আমার একদিনেরও আলাপ নেই, অথচ যারা আমাকে কিছু দিক দিয়ে বহু দিনের পুরনো বন্ধুদের চেয়েও বেশি ভাল বুঝতে পারছিল, তাদের সামনে আমার নিজেকে অসহায়

AMARBOI.COM

মনে হল। চার বছর আগে হলে, আমার উলটোদিকে মা বসে থাকতেন। চায়ে চুমুক দিয়ে অভিযোগ করতেন সেটা কত বিস্বাদ। সমুদ্রতটে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে হাঁটার পর আমরা এখানে এসে বসতাম।

"তোমার কাছে তাঁর ছবি আছে?" রূপা জিজ্ঞেস করল। এক মুহূর্তের জন্য আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"না," আমি মিথ্যে উত্তর দিলাম। আমার ওয়ালেটে আইডি কার্ডের পিছনে গোঁজা মায়ের ফোটোটা তাদের দেখাতে ইচ্ছে করল না। ফোটোটা আমাদের মুম্বইয়ের ফ্ল্যাটে একটা পার্টিতে তোলা হয়েছিল, মায়ের অসুস্থ হওয়ার অনেক আগে। এত দূর থেকে যে, তাঁর মুখটা ভাল করে বোঝাই যাচ্ছিল না। আমি ফোটোটা মাপমতো কেটে, মা মারা যাওয়ার পর ওয়ালেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু তারপর থেকে কখনও সেটা বের করে দেখিনি।

"বাড়িতে তাঁর কোনও ছবি নেই কেন?" রূপা জিজ্ঞেস করল।

"বাবা মায়ের কোনও ফোটো রাখতে চাননি।"

"মা খুঁজছিলেন," পিউ বলল। "প্রত্যেকটা ঘরে খুঁজেছেন, কিন্তু একটাও খুঁজে পাননি।"

AMARBOI.COM

আমরা যখন ফিরলাম, চিত্রা তখন জানলার সিটে বসে ছিলেন। তাঁর উদ্বেগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি জিজ্ঞেস করলেন না, কেন আমাদের দেরি হয়েছে। পিউ এবং রূপা তাঁকে সেই সুযোগই দিল না। এমনভাবে তাঁর কাছে ছুটে গেল, যেন অনেক দিন তাঁকে দেখেনি। তাঁকে ডোনাটটা দিয়ে বলল তারা কত মজা করেছে, আমি কত ভাল ব্যবহার করেছি। পিউ বলল যে, তারা নিজে গিয়ে ডোনাটের টাকা দিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছিল, মেয়েদের আমাকে পছন্দ হয়েছে এবং মেয়েরা খুশি হয়েছে বলে চিত্রাও আমাকে পছন্দ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আমার একটু একা থাকার দরকার ছিল। বাড়িটার খোলামেলা নকশার জন্য তাদের থেকে আলাদা ভাবে টিভি দেখা বা গান শোনা সম্ভব ছিল না। তাই তার বদলে আমি গেস্টরুমের খাটে বসে 'গ্লোব'-এর পাতা ওলটাতে ওলটাতে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর দৌড়োতে বেরোলাম। ঠান্ডা আঁকাবাঁকা রাস্তায় পাঁচ মাইল। যখন ফিরলাম, তখন তাঁরা তিনজন মিলে গুরুপাক, বাঙালি রান্না খেতে বসেছিলেন, ভাত-ডাল এবং আগের রাতের বেঁচে যাওয়া খাবার। তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে খেতে বসার জন্য চিত্রার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আমি স্নানে গেলাম। এবং তারপর ফোনটা গেস্টরুমে টেনে নিয়ে গিয়ে জেসিকাকে ফোন করলাম।

"তুমি এখানে চলে আসছ না কেন?" জেসিকা বলল। আমার ইচ্ছে হল সেটাই করি, গাড়িতে উঠে জেসিকার মা-বাবার বাড়িতে চলে যাই। কিন্তু আমার বেরোনো সম্ভব ছিল না, অন্তত তখনও না। ফোনটা হলওয়েতে ঠিক জায়গায় রাখতে গিয়ে বুঝলাম যে, ওপরে তিনজনই ঘুমোচ্ছে, যেমন ভারতে আমার আত্মীয়স্বজনরা দুপুরে ঘুমোন। আসার পর সেই প্রথমবার আমি টিভি দেখব বলে সোফাতে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর নিজের অজান্তেই কখন যেন আমিও ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন উঠলাম, তখন তাঁরা নীচেই ছিলেন, কিন্তু আমার অত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও এমন ব্যবহার করছিলেন, যেন আমি অনুপস্থিত। ইতিমধ্যে বাইরে আঁধার নেমেছিল। ককটেল টেবিলের ওপর ল্যাম্পের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। টিভির চ্যানেল বদলে একটা 'টক শো' চালানো হয়েছিল। চিত্রা মেয়েদের চুল আঁচড়ে বেঁধে দিয়ে নিজের চুল আঁচড়াতে শুরু করলেন। নিজের চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালাচ্ছিলেন, বিনুনিতে বাঁধা তাঁর মাথাভরতি চমৎকার চুলের ঢাল প্রায় কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছিল। তাঁর চুল দেখে আমার কেমন বিতৃষ্ণা হল, মনে পড়ে গেল মায়ের মাথা থেকে কেমন করে গোছা গোছা চুল পড়ে গিয়েছিল। যে কুৎসিত পরচুলা তিনি হাসপাতালেও শেষ দিন পর্যন্ত পরে ছিলেন, তাঁর শরীরের সেই কৃত্রিম অংশটিই সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর লাগত।

রূপা চিত্রার পিছনে বসে মাথায় ম্যাসাজ করে দিচ্ছিল এবং কয়েকটা পাকা চুল তুলে দিচ্ছিল। চিত্রা পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে ছিলেন। বুঝলাম যে, এটি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার যার জন্য কোনও নির্দেশ বা কথার প্রয়োজন হয় না। আমি উঠে বসে দেখতে থাকলাম। কল্পনা করলাম তাঁর সব চুল পেকে যাচ্ছে, তিনি বাবার পাশাপাশি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। যেমন মায়ের হওয়ার কথা ছিল। সেই চিন্তা করার মুহূর্তে চিত্রার প্রতি আমার ঘৃণা সম্বন্ধে সচেতন হলাম। যেন আমার মনের কথা টের পেয়েছেন, এমনভাবে চিত্রা চোখ খুলে আমার দিকে তাকালেন। তারপর অপ্রতিভ হয়ে চট করে তাঁর চুলে খোঁপা করে রান্নাঘরে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পর একটা ট্রে-তে এক পট চা এবং ওভালটিনের কাপ নিয়ে ফিরলেন। তার সঙ্গে

AMARBOI.COM

বাটিতে দু'ধরনের চানাচুর এবং একটা ছোট প্লেটে চার টুকরো করা ডোনাট।

"এখন কি চা খাবে?" তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি ট্রে থেকে চায়ের কাপ নিলাম। চিত্রা ইতিমধ্যেই আলাদা করে দুধ গরম করে এবং বেশি চিনি মিশিয়ে সেটি তৈরি করে ফেলেছিলেন।

"এটা হলদিরাম-এর," তিনি একটা বাটি আমাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন। "কলকাতার সবচেয়ে ভাল।"

"না, ধন্যবাদ।"

চিত্রা বললেন, "এই ঘরটা ঠান্ডা, কাচের মধ্যে দিয়ে ঠান্ডা আসে। পরদা নেই কেন?"

"ভিউ নষ্ট হয়ে যাবে তা হলে," আমি বললাম।

"সিঁড়িগুলোও পেছল," তিনি তিনতলার দিকে উঠে যাওয়া ঝুলন্ত সিঁড়ির দিকে দেখালেন। "আর কোনও রেলিং নেই। আমার ভয় করে রূপা আর পিউ পড়ে যাবে।"

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে সিঁড়িগুলোর দিকে তাকালাম। ফাঁকা তাকের মতো সাজানো কাঠের চওড়া টুকরো সাদা দেওয়ালের গা বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। মায়ের শরীর যখন সবচেয়ে দুর্বল ছিল, তখনও তিনি কোনও অভিযোগ ছাড়াই ওই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতেন।

"রেলিং নেই কেন?" চিত্রা আবার বললেন।

"কারণ, আমাদের এইরকমই ভাল লাগত," আমি বললাম। পণ্ডিতি দেখালাম, "কারণ, ওইভাবেই সিঁড়িগুলো সুন্দর লাগে।"

আমাদের পরস্পরকে আর কিছু বলার ছিল না। বসে একের পর এক অনুষ্ঠান দেখতে থাকলাম। চিত্রা একটা ক্রোশে কাঁটা দিয়ে কিছু কাজ করছিলেন। আমি ভাবছিলাম, কী করে চিত্রার সঙ্গে পরবর্তী চার সপ্তাহ কাটাব। আমরা সকলেই বাবার অপেক্ষায় ছিলাম। ভাবছিলাম তিনি কখন ফিরে আসবেন এবং আর কিছু না হলেও তাঁর উপস্থিতিতে বোধগম্য হবে কেন চিত্রা এবং আমি একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছি। বাবা ফিরে আসার পর আমাকে সাহায্য করতে বললেন, তাঁর গাড়ির ছাদে একটা ক্রিসমাস ট্রি বাঁধা ছিল। "আমি কাল যেতাম," গাছটা খুলতে সাহায্য করতে করতে বললাম। আমার হাতে দস্তানা না থাকায় সন্ধের সেই শীতল হাওয়ায় কাজটা একইসঙ্গে সহজ অথচ কঠিন হয়ে পড়ল। আমরা গাছটা ভিতরে টেনে নিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে লিভিং রুমের এক কোণে পাথরের উঁচু ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড় করালাম, চিত্রা এবং তাঁর মেয়েরা গাছটা ঘিরে দাঁড়াল।

"কিন্তু এটা তো বাইরের সব গাছগুলোর মতোই," চিত্রা কাচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বাইরে দেখিয়ে বললেন।

"আসলে এটা আলাদা। বাইরেরটা পাইন গাছ, এটা স্প্রুস গাছ।"

বাবা বললেন, বেসমেন্টে কোথাও একটা বাক্সে গাছের স্ট্যান্ড, আলো, গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে সাজানোর জিনিসপত্র আছে। এই বাড়িতে আমাদের প্রথম শীতে সেসব ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই শেষবার মা বড়দিন পালন করেছিলেন। আমি বিস্মিত হলাম যে, বাবা সবকিছু ফেলে দেননি। বাবা আমাকে নীচে গিয়ে বাক্সটা খুঁজতে বললেন। আমাদের বেসমেন্টে অন্য বাড়ির মতো জমে থাকা জঞ্জাল ছিল না। কারণ, আমরা এই বাড়িতে মাত্র কয়েক বছরই ছিলাম এবং সেই সময়টুকুর মধ্যেও বেশিদিন মা বেঁচে ছিলেন না এবং আমি কলেজে চলে গিয়েছিলাম। ফালতু জিনিস জমানোর পরিস্থিতিই ছিল না। এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, যে জন্য অল্প জিনিস সরাতে হয়েছিল। তাও, বেশ কয়েকটা বাক্স দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল। টিভি আর স্টিরিয়ো স্পিকারের ফাঁকা বাক্স, আর কয়েকটায় তখনও টেপ সাঁটা। অদরকারি জিনিসপত্র যা মা-বাবা মুম্বই থেকে এনেছিলেন, কিন্তু খুলে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আমি গাড়ির চাবি দিয়ে টেপ ছিঁড়ে কয়েকটা বাক্সের ঢাকনা খুলে দেখলাম। একটার মধ্যে বাবার পুরনো ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বই রাখা ছিল। আর-একটা বাক্সে 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র পাতায় মোড়া একটা ডিনার সেট। বহু বছর ধরে আমি সেই প্লেটগুলোয় খাবার খেতাম, কিন্তু সেগুলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম, প্লেটগুলোর ধারে ছোট ছোট কমলা রঙের হিরে আঁকা। হাই স্কুলের শেষ বছরে যে ডার্করুম তৈরি করেছিলাম, সেটার এনলার্জার, সাঁড়াশি, এক সেট ট্রে এবং ফিক্সারের পুরনো বোতল খুঁজে পেলাম। কখনও কখনও মা নেমে এসে আমাকে সঙ্গ দিতেন। আমি যখন ডেভেলপিং রিল-এ ফিল্ম ভরার চেষ্টা করতাম, তখন মা চুপ করে অন্ধকারে বসে থাকতেন। আমরা একসঙ্গে কেমিক্যালের ক্ষতিকর গন্ধে শ্বাস নিতাম, আমার হাত রাবারের দস্তানার ভিতর সুরক্ষিত থাকত। মায়ের শরীরের ভিতর যা হচ্ছিল, সে তুলনায় কেমিক্যালগুলোর ক্ষতি কিছুই ছিল না। মা

AMARBOI.COM

আমার জন্য তাঁর বাড়িতে সময় দেখাতেন। পদ্ধতিটা এত দূর বুঝে গিয়েছিলেন যে, কখন প্রসেসিং ট্যাঙ্ক থেকে কোনও কেমিক্যাল কমাতে হবে বা তার ভিতর ঢালতে হবে তা আমাকে বলে দিতেন। আমরা দু'জনেই জানতাম যে, একদিন আমাকে একটা টাইমার কিনতেই হবে। "এরকমই হবে নিশ্চয়ই," একবার সেই সম্পূর্ণ অন্ধকার, নিঃশব্দ, বদ্ধ জায়গায় বসে মা বলেছিলেন। তিনি আর কিছু না বললেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি কল্পনা করছেন মৃত্যু কীরকম হতে পারে। "আমি এরকমই ভাবতে চাই।"

যে বাক্সটা আমি খুঁজছিলাম, সেটার গায়ে মায়ের হস্তাক্ষরে 'X-MAS' লেখা ছিল। লেখাটা ওপরের দিকে এক কোণে ছিল, এক পাশে নয়, যেখানে সেটা পরিষ্কার দেখা যাবে। ভিতরের জিনিসগুলোর প্রতি আমার কোনও দুর্বলতা ছিল না, কিন্তু তবুও সেগুলো দেখতে ইচ্ছে করল না। বাক্সের জিনিসগুলো চিত্রা নাড়াচাড়া করবে ভেবে আমি বিচলিত বোধ করলাম। ঠিক যেরকম বিচলিত বোধ করছিলাম সারাদিন তাঁকে বাসনকোসন ব্যবহার করতে দেখে, চায়ের কেটলি ব্যবহার করতে দেখে— একসময় বাবাকে টেলিফোন করে তিনি জেনেছিলেন যে, বাবা রাস্তাতেই আছেন, বাড়ি ফিরছেন— দেখে। বাবা যখন বাড়ি থেকে মায়ের সব চিহ্ন মুছে দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি বাড়াবাড়ি করছেন বলে তাঁকে দোষারোপ করেছিলাম। কিন্তু এখন, তিনি এসব যথেষ্ট করেননি বলে আমি মনে মনে তাঁকে দোষ দিলাম।

"খুঁজে পেলাম না," ওপরে গিয়ে বললাম। বাবা আর কথা বাড়ালেন না, নীচে গিয়ে বাক্সটা খুঁজতে চাইলেন না। চিত্রার সঙ্গে থাকলে তিনি অন্যরকম আচরণ করতেন, জীবনের ছোটখাটো ত্রুটিগুলো বেশ সহজে মেনে নিতেন। আমি দোকানে গিয়ে যা-যা দরকার কিনে আনতে চাইলাম। বাড়ি থেকে বেরোনোর আর-একটা অজুহাত পেয়ে স্বস্তি হল। আমি ফিরে আসার পর বাবা এবং আমি মিলে গাছটা ছোট করে ছাঁটলাম। চিত্রা এবং তাঁর মেয়েরা সোফায় বসে আমাদের দেখলেন। গাছটা স্ট্যান্ডে রেখে, শক্ত করে স্ক্রু এঁটে, ডালপালার ওপর আলো সাজিয়ে দিলাম। সাজানোর জন্য এমন কিছুই ছিল না, শুধু এক বাক্স নীল বল। তাই গাছটা কারও বাড়ির গাছের চেয়ে কোনও ব্যাংক বা অফিসের লবিতে দাঁড় করানো গাছের মতোই দেখাচ্ছিল। কিন্তু রূপা এবং পিউ তাতেই খুব খুশি হয়ে বলল, তারা এর চেয়ে বেশি সুন্দর কিছু

AMARBOI.COM

দেখেনি। বাবা ওপরে গিয়ে একটা শপিং ব্যাগ ভরতি উপহার নিয়ে এলেন। সব ক'টি জিনিসই দোকান থেকে কাগজে মুড়ে দিয়েছিল। একই সবুজ-সোনালি কাগজে পেশাদারিত্বের সঙ্গে মুড়ে, টেপ সেঁটে, ফিতে বেঁধে দেওয়া। বাবা সেগুলো গাছের নীচে সাজিয়ে রাখলেন। মোট আটটি বাক্স। "প্রত্যেকের জন্য দুটো করে," তিনি বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না করেই বললেন। রূপা এবং পিউ উঠে উপহারের বাক্সগুলো দেখতে গেল। বাক্সের ওপর নিজেদের নাম দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

"এগুলো খুলতে পারি?" পিউ চিত্রাকে জিজ্ঞেস করল। চিত্রা উত্তর দিলেন না।

আমি বললাম, "ক্রিসমাসের সকাল পর্যন্ত নয়, ততদিন শুধু দেখতে পারো। আর চাইলে একটু ঝাঁকাতেও পারো।"

"কী সুন্দর," ছেঁটে দেওয়ার পর গাছটি দেখে মুগ্ধ হয়ে চিত্রা বললেন।

"কৌশিক, একটা ফোটো হয়ে যাক?" বাবা বললেন।

আমি মাথা নাড়লাম। ক্যামেরাটা, বাবার পুরনো ইয়াশিকা, স্কুলে ফেলে এসেছিলাম।

"কিন্তু তোমার সঙ্গে তো সবসময়ই ক্যামেরা থাকে," সেই বিরক্ত, হতাশ অভিব্যক্তি, যা মায়ের মৃত্যুদিন বারবার মুখে দেখা দিয়েছিল এবং চিত্রাকে বিয়ে করার পর মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে দেখা গেল।

"ভুলে ফেলে এসেছি," আমি বললাম। সত্যিই ক্যামেরাটা সবসময় আমার সঙ্গে থাকে। সপ্তাহশেষে বাড়ি আসলে, যখন আমাদের শান্তভাবে কাটত, আমি ক্যামেরাটা সঙ্গে রাখতাম। হাঁটতে বেরোলে ক্যামেরা নিয়ে বেরোতাম। এবার আমি ক্যামেরা সঙ্গে আনিনি। জানতাম যে, কোনও কিছুই ফোটোয় ধরে রাখতে চাইব না।

"আমি বুঝতে পারছি না," বাবা বললেন।

"আমিও না," আমি উত্তর দিলাম। "বহু বছর হল তুমি কোনও কিছুরই ফোটো তুলতে চাওনি।"

"এটা ঠিক নয়।"

"হ্যাঁ, এটাই ঠিক।"

আমরা দু'জনেই সত্যি কথাই বলছিলাম, আবার একই সঙ্গে তর্কও

AMARBOI.COM

করছিলাম। সেই তর্কের গভীরতা শুধু বাবা এবং আমিই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। আমি রান্নাঘরে গিয়ে নিজের জন্য একটা ড্রিঙ্ক ঢাললাম। কয়েক মিনিট পর চিত্রা যখন বললেন খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছে, তখন ড্রিঙ্কটা খাবার টেবিলে আনলাম। খাওয়ার সময় কেউ কোনও কথা বলল না। খাওয়া হয়ে গেলে চিত্রা আগের রাতের মতোই প্লেটগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। বাবা এবং আমি খাওয়ার পর আরাম করে বসার একটা সুযোগ পেলাম, যা মায়ের জীবনের শেষ কয়েক বছরে কখনও পাইনি। আমাদের বাসন মাজা এবং ডিশওয়াশার ভরতি করার দায়িত্ব নিতে হল না, যাতে মা বিশ্রাম নিতে পারেন। আমি বসে বসে ড্রিঙ্কটা শেষ করলাম। রূপা এবং পিউ তাদের চেয়ার থেকে গলে বেরিয়ে আবার টিভি দেখার জন্য সোফায় গিয়ে বসল। বাবা উঠে তাদের অনুসরণ করে খবরের কাগজ নিয়ে তাঁর রিক্লাইনারে বসলেন। লেকমিয়ার-এর একটি বড় বিজ্ঞাপনের পাতা খুলে বলপয়েন্ট পেন দিয়ে ক্যামেরা বিক্রির বিজ্ঞাপনে গোল দাগ দিতে শুরু করলেন।

দু'দিন পর ক্রিসমাস ইভ ছিল, অর্থাৎ বড়দিনের আগের দিন। বাবা অফিসে না গিয়ে প্রস্তাব দিলেন, আমরা সকলে বস্টন গিয়ে চিত্রা এবং তাঁর মেয়েদের শহরটা ঘুরে দেখাই। অন্য কোনও অজুহাত না থাকায় আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। বাবার গাড়ির পিছনের সিটে রূপা এবং পিউয়ের মাঝখানে বসলাম। যদিও আমরা অল্প সময়ের জন্যই ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, তবুও সফরটি অদ্ভুতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হচ্ছিল। মায়ের জীবনের শেষ দু'বছর, যখন তাঁর হাসপাতালে আসা-যাওয়া লেগেই থাকত, তখন আমরা অন্য কোথাও যাইনি। সেই সমুদ্রের ধারে মাঝে মাঝে হাঁটতে বেরোনো ছাড়া, শুধু আনন্দ করার জন্য কোথাও যাইনি। আমার জীবনে, মুম্বই থেকে ফেরার সময় মা-বাবার সঙ্গে কয়েকদিন রোমে কাটানো ছিল শেষ ছুটি। আমাদের বাড়ির চারপাশ এবং মাস জেনারাল-এ আসা-যাওয়া করার রাস্তা এই ছিল আমার নিউ ইংল্যান্ড সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি। সেই রাস্তায় আমি অনেক আসা-যাওয়া করেছি, যতদিন না সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

বাবা প্রথমে হার্ভার্ড এবং এমআইটি দেখাতে কেমব্রিজ নিয়ে গেলেন। চিত্রা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এর মধ্যে কোনওটায় ভরতি না হয়ে এত

AMARBOI.COM

দূরের একটি কলেজ বেছে নিয়েছি কেন। আমাকে বলা তাঁর অনেক কথার মতো আমি এই প্রশ্নটিও অগ্রাহ্য করলাম। "ও ম্যাসাচুসেটসের বাইরে যেতে চাইছিল," বাবা বোঝালেন।

ভেবেছিলাম যে, আমরা বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে একটু ঘোরাফেরা করব, কিন্তু চিত্রা বললেন, বড্ড শীত। বাবাও তাতে সায় দিলেন। কেম্ব্রাল স্কোয়্যার-এ একবার চক্কর কাটার পর বাবা মাস অ্যাভিনিউ ব্রিজের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আলো এবং মালা দিয়ে সাজানো কমনওয়েলথ অ্যাভিনিউয়ে গেলেন। তারপর পাবলিক গার্ডেন এবং কমন-এর চারপাশে ঘুরলেন। স্টেট হাউস-এর সোনালি গম্বুজ এবং বিকন হিল-এর খাড়া উঠে যাওয়া রাস্তার ধারের সুন্দর বাড়িগুলো দেখালেন। সেই বাড়িগুলোর পিছনেই মাস জেনারাল, যেখানে বাবা এবং আমি একসঙ্গে কতবার গিয়েছি। একদিন ভোরবেলা একটা ফোনকল এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল। ঠিক যখন দিনের প্রথম আলো গাঢ়, কমলা রেখায় আকাশের অন্ধকার বিদীর্ণ করছিল, আমরা গাড়ি করে বস্টনে এসেছিলাম। মাকে আগের রাতের মতোই দেখাচ্ছিল, চোখ বুজে খাটে শুয়ে ছিলেন। শুধু সব যন্ত্রপাতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যে ঘরটায় আমরা অনেক নীরব সময় কাটিয়ে ছিলাম, সেই ঘরটা আরও নৈঃশব্দ্যে ভরে গিয়েছিল। স্পর্শ করে দেখেছিলাম মায়ের ত্বক শীতল হয়ে গিয়েছে, যেন তিনি সবে শীতের হাওয়ায় দ্রুত হেঁটে ফিরেছেন। আমি এখন হাসপাতালের জানলার দিকে তাকালাম, কিন্তু বাবা চিত্রার দিকে ফিরলেন। "এখানে আমেরিকার ব্রাহ্মণরা থাকে," বলে তিনি নিজের কথায় নিজেই হাসলেন। সামনের সিটে বসে চিত্রা এমনভাবে হাসলেন যে, আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তিনি প্রেমে পড়ছেন।

বড়দিনে বাবা আমাকে একটা সোয়েটার আর একটা শার্ট দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরে একটা খামে দশটা একশো ডলারের নোটও দিলেন। টাকা খুব বেশি দিয়েছেন বলাতে তিনি বললেন, "এটা-ওটার জন্য লাগবে তোমার।" বাবা মেয়েদের উপহার হিসেবে গাছের নীচের খেলনাগুলো এবং পাঁচদিনের জন্য ডিজনি ওয়ার্ল্ড যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। "তুমি ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে আসতেই পারো," বড়দিনের সকালে খবরটা জানিয়ে বাবা আমাকে বললেন। কিন্তু আমি সোয়ার্থমোর-এ শীতের ক্লাসটাস নিয়ে কিছু একটা অজুহাত দিয়ে

AMARBOI.COM

প্রত্যাখ্যান করলাম। বাবা তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য আর আমাকে জোর করলেন না। কিন্তু রূপা এবং পিউ ভেঙে পড়ল। "তুমি কেন আসতে চাও না?" তারা আমাকে সমানেই প্রশ্ন করতে থাকল। আমি আগে কখনও ডিজনি ওয়ার্ল্ড-এ যাইনি শুনে তারা আরওই বিস্মিত হল। আমার মনে হল, আমার যেমন তাদের দরকার ছিল, তাদেরও তেমন আমাকে প্রয়োজন ছিল। এই অনস্বীকার্য সত্যটা থেকে তাদের আড়াল করার জন্য যে, চিত্রা এবং আমার বাবা এখন স্বামী-স্ত্রী। আমার উপস্থিতি যেমন একসময় আমার মায়ের অস্তিত্বের সাক্ষী ছিল ঠিক তেমনি রূপা এবং পিউ ছিল তাদের পরলোকগত বাবার অস্তিত্বের জীবিত প্রমাণ। "একা একা লাগবে না?" চিত্রা আমাকে একাধিকবার জিজ্ঞেস করলেন। সেই সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম বাবার মতো তিনিও আমার পরিকল্পনা শুনে স্বস্তি পেয়েছেন। বলাই বাহুল্য, বাড়িতে একা থাকা ছাড়া আমার আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

তাঁরা বেড়াতে যাচ্ছেন শোনার পর আমি মেয়েদের প্রতি আরও সহানুভূতি বোধ করলাম। ডিজনি ওয়ার্ল্ড-এ না যাওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি তাদের একদিন সায়েন্স মিউজিয়ামে, আর-একদিন অ্যাকোয়ারিয়ামে নিয়ে গেলাম। এইসব উপলক্ষে তারা নির্ভুল আচরণ করত, কখনও নালিশ বা বায়না করত না। একটা করে সস্তা রাবারের কাঁকড়া কিনে দেওয়ায় দু'জনেই ভীষণ খুশি হয়েছিল। হার্ভার্ড স্কোয়্যার-এ আমি যখন একটা রেকর্ড কিনতে গিয়েছিলাম, তারা আমার সঙ্গেই ছিল। হেরেল্‌স-এ আইসক্রিম খাচ্ছিল, এমন সময় আইসক্রিম কোন-এ কামড় বসাতে গিয়ে পিউর আলগা দাঁত পড়ে গেল। ন্যাপকিন দিয়ে তার মুখের রক্ত মুছে চটচটে দাঁতটা আমার পকেটে রেখে দিলাম। বাড়ি ফেরার পথে তাদের টুথ ফেয়ারির গল্প বললাম। মনে আছে, যদিও তখন আমার মাত্র একুশ বছর বয়স, আমি ভেবেছিলাম নিজের ছেলেমেয়ে হলে কেমন লাগে। রূপা এবং পিউ আমার বাবাকে 'ড্যাডি' বলতে শুরু করেছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ ছিল না। তারা কখনও নিজেদের বাবার কথা বলত না। কিন্তু এক রাতে পিউর চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, সে দুঃস্বপ্নের ঘোরে বারবার তার বাবাকে ডাকছিল।

বছরশেষের কয়েকদিন আগে বাবা এবং চিত্রা মা-বাবার কয়েকজন বন্ধুর বাড়িতে এক হলিডে পার্টিতে নিমন্ত্রিত হলেন। অদ্ভুত লাগছিল যখন চিত্রা

AMARBOI.COM

ঝুলন্ত সিঁড়িগুলো দিয়ে নামছিলেন, পরনে একটা গাঢ় সবুজ শাড়ি এবং গলায় গার্নেটের হার। বাবা তাঁর পিছনে, ঠিক তাঁর পাশে পাশে নামলেন। তখন তিনি সবসময় চিত্রার পাশেই থাকতেন। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, গায়ে একটা টুইডের স্পোর্টস জ্যাকেট যেটা আমি তাঁকে মায়ের মৃত্যুর পর আর পরতে দেখিনি। আমি পার্টিতে যাব এমন আশা করা হয়নি, কিন্তু রূপা এবং পিউ যাচ্ছিল। তারা একই রকমের পোশাক পরেছিল। লাল-কালো চেককাটা স্কার্ট এবং মাথায় কালো মখমলের হেডব্যান্ড। শেষ মুহূর্তে, ঠিক যখন বাবা কাবার্ড থেকে কোট বের করছেন, তখন রূপা চিত্রার দিকে ফিরে বলল, "আমরা কি বাড়িতে থাকতে পারি?"

"অবশ্যই না," চিত্রা বললেন। "না গেলে খুবই খারাপ দেখাবে।"

"কিন্তু কেডি তো যাচ্ছে না।"

"সত্যি কথা বলতে কী, ওদের ওখানে একঘেয়ে লাগতে পারে। আমার মনে হয় না ওদের বয়সি কোনও ছেলেমেয়ে ওখানে থাকবে।" বাবা বললেন।

"কিন্তু আমি ওদের খাবার করিনি," চিত্রা বললেন। "ওরা খায়নি তো।"

"আমি একটা পিৎজা আনতে পারি," আমি মুখ তুলে সোফা থেকে বললাম। রূপা এবং পিউয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলাম। "আমরা আমাদের নিজস্ব পার্টি করব।"

AMARBOI.COM

মেয়েরা হাততালি দিয়ে উঠল। পিউ তার ফোকলা দাঁত বার করে হাসল। চিত্রা আমাকে বললেন ন'টার মধ্যে মেয়েদের শুইয়ে দিতে। তারপর তিনি এবং বাবা কোটের বোতাম লাগিয়ে পার্টিতে চলে গেলেন। সেই প্রথম তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে কোথাও বেরোলেন। উপলব্ধি করলাম, আমি শুধু রূপা এবং পিউয়েরই নয়, তাঁদেরও উপকার করেছি। মেয়েরা জুতো খুলে ফেলল, কিন্তু টাইটস এবং পার্টির পোশাক পরেই আমার সঙ্গে টিভি দেখতে বসল। আমরা একটা আলু চিপ্‌স-এর প্যাকেট দেওয়া নেওয়া করে নিঃশেষ করলাম। পিৎজা কিনতে রেস্তোরাঁ যাওয়ার জন্য গায়ে কোট চাপাতে রূপা এবং পিউ আমার দিকে তাকাল।

"কোথায় যাচ্ছ?" পিউ জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের খাবার আনতে।"

"আমাদের একলা রেখে যাচ্ছ?"

"মোটে দশ মিনিটের পথ। তোমরা টের পাওয়ার আগেই আমি ফিরে আসব।"

তারা কিছু বলল না, কিন্তু মুখ দেখে মনে হল সত্যিই ভয় পেয়েছে। আমার রাগ হল যে, চিত্রা তাদের মনে এই ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। "তোমরা আসতে চাইলে এসো।"

গাড়ি করে রেস্তোরাঁয় গেলাম এবং পিৎজাটাও সেখানে বসেই খেলাম। খাওয়ার সময় আমি একটা বিয়ার আর কয়েকটা সিগারেট খেলাম আর রূপা এবং পিউ লম্বা কাগজের কাপ থেকে কোক খেল। তারা আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি ডিজনি ওয়ার্ল্ড যাব কি না। আমি বললাম, ভেবে দেখব। সেই মিথ্যে কথাটা তাদের মনে নতুন আশা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন ফোন বাজছিল। জেসিকা ফোন করছিল, তাই আমি নিজের জন্য একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে ফোনটা গেস্টরুমে নিয়ে গেলাম। জেসিকাকে যখন জানালাম যে, বাবা চিত্রা এবং মেয়েদের ডিজনি ওয়ার্ল্ড-এ নিয়ে যাচ্ছেন, তখন সে প্রস্তাব দিল, তাঁরা চলে গেলে আমাদের বাড়িতে আসতে পারে। আমি জেসিকার কথা ভাবতাম, রাতে বিছানায় শুয়ে তাকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছে হত। কিন্তু তবুও, তাকে মা-বাবার বাড়িতে দেখতে চাইছিলাম না। যদিও আমি সে কথা বললাম না, কিন্তু জেসিকা আমার অনীহা আন্দাজ করেছিল এবং সেই প্রথম আমরা ঝগড়া করতে শুরু করলাম। সেই অস্বস্তিকর কথোপকথনের মাঝে মাঝে আমরা চুপ করে থাকছিলাম। যদিও সেটা সত্যিকারের তর্কাতর্কির রূপ নেয়নি, তাও ক্লান্ত লাগছিল। জেসিকাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অপরাধবোধ হচ্ছিল, যেমন ডিজনি ওয়ার্ল্ড যেতে রাজি না হওয়ার জন্যও লাগছিল। কিন্তু আমি জানতাম যে, যদি আমি দুটো প্রস্তাবের একটাতেও রাজি হই, তা হলে আমার আরও খারাপ লাগবে। রূপা এবং পিউকে যে মিথ্যে বলে ভুলিয়েছিলাম, জেসিকাকেও একই মিথ্যে বললাম যে, আমি ভেবে দেখব এবং তারপর ফোন রেখে দিলাম।

পুনরায় ড্রিঙ্ক নেওয়ার জন্য দরজা খুলে দেখি, রূপা এবং পিউ টিভি দেখছে না। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, তারা এতক্ষণ টিভিই দেখছিল। তাদের নাম ধরে ডাকলাম। রান্নাঘর, বাথরুমে উঁকি মেরে দেখে তারপর ওপরে আমার পুরনো ঘরের দরজার সামনে গেলাম। কোনও কথাবার্তা শুনতে পেলাম না। ঘড়িতে দশটা বেজে গিয়েছে দেখে মনে হল হয়তো তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

AMARBOI.COM

দরজা খুলে, বাড়ি আসার পর সেই প্রথম ঘরটার ভিতরে তাকালাম। ঘরে আলো জ্বালানো, আমার পুরনো খাটটার লাগোয়া আর একটা ফোল্ডিং খাট পাতা। আমি দেওয়ালে যে জিমি হেন্ড্রিক্সের পোস্টার এবং একটা পত্রিকা থেকে ছিঁড়ে পল স্ট্র্যান্ডের 'ব্লাইন্ড উওম্যান'-এর নকল লাগিয়েছিলাম, সেগুলো দেওয়াল থেকে সরানো হয়নি। দেওয়াল-আলমারির দরজা খোলা, সামনে একটা চেয়ার রাখা। যেন তাক থেকে কিছু টেনে পাড়ার জন্য রাখা হয়েছে। ধারণা হয়েছিল, ঘরটার চেহারা রূপা এবং পিউয়ের জিনিসে বদলে যাবে। কিন্তু বাড়তি খাটটা এবং এক কোণে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা বড়দিনে পাওয়া খেলনাগুলো ছাড়া ঘরে তাদের আর কোনও চিহ্ন ছিল না। খেলনার স্তূপের কাছে রূপা এবং পিউ তাদের পার্টির পোশাক পরে বসে ছিল। আমার দিকে পিছন ফিরে কার্পেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখছিল যা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। "এটাতে ওঁকে দুঃখী-দুঃখী লাগছে," পিউকে ফিসফিস করে বলতে শুনলাম। তারপর রূপা বলল, "উনি এবং কেডি একইভাবে হাসেন।"

"কী করছ তোমরা?" আমি বললাম।

আমার উপস্থিতি টের পেয়ে তারা হকচকিয়ে উঠে দাঁড়াল। যে বাক্সটা বাবা মায়ের মৃত্যুর পর টেপ দিয়ে বন্ধ করে, লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেটা থেকে মায়ের ডজনখানেক ফোটো বের করে, ধুসর কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে, সলিটেয়ার খেলার তাসের কায়দায় সাজিয়ে রাখা ছিল। দূর থেকে দেখলেও সেই সরিয়ে রাখা ছবিগুলো আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করল। মুম্বইতে আমাদের পুরনো ক্লাবে মা সুইমসুট পরে পুলের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের কেমব্রিজের বাড়ির বাদামি কাঠের সিঁড়ির ওপর মা আমাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। মা এবং বাবা একটা বরফে ঢাকা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তখনও জন্মাইনি।

"হোয়াট দ্য হেল ডু ইউ থিঙ্ক ইউ আর ডুয়িং?"

রূপা আমার দিকে তাকাল, চকিতে তার কালো চোখ ঝলকে উঠল। পিউ কাঁদতে শুরু করল। আমি ঘরে ঢুকে ফোটোগুলো তুলে আমার পুরনো ড্রেসারে উলটো করে রেখে দিলাম। তারপর রূপা মাটিতে যেখানে গুটিসুটি মেরে বসে ছিল, সেখান থেকে তার কাঁধ ধরে তুলে তাকে জোরে ঝাঁকাতে শুরু করলাম। তার দেহ নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। কালো টাইটস পরা সরু পা দুটো

AMARBOI.COM

কাঁপছিল। ইচ্ছে করছিল তাকে দেওয়ালের দিকে ছুড়ে ফেলে দিই, কিন্তু কোনওমতে নিজেকে সামলে তাকে ফোল্ডিং খাটের কাছে নিয়ে গিয়ে জোর করে বসিয়ে দিলাম। বুঝতে পারছিলাম যে, আমি জোরে চেপে ধরেছি তাকে। "বলো, এগুলো কোথায় পেয়েছ? বলো?" তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইলাম।

এবার রূপাও কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু সে দেওয়াল-আলমারির দিকে দেখিয়ে দিল। আমি সেদিকে এগোতে পিউ, যে তখনও কার্পেটের ওপর বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, মাথা নেড়ে বলল, "ওখানে আর নেই।" তার বোন যেখানে বসে ছিল, সে হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে গিয়ে একটা কালো জুতোর বাক্স টেনে বের করল। বাক্সটার ধারগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল। যে টেপটা দিয়ে বাক্সটা বন্ধ করা ছিল, সেটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এবার আমি পিউকে ধরে জুতোর বাক্সটা থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেলাম। যেন সে কাছে গেলে বাক্সর ভিতরের জিনিসগুলো দূষিত হয়ে যাবে। তাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিলাম।

"তোমাদের কোনও অধিকার নেই ওগুলো দেখার," আমি বললাম। "ওগুলো তোমাদের জিনিস নয়, বুঝেছ?"

তারা ঘাড় নাড়ল। রূপা এমনভাবে কাঁপছিল, যেন তার শীত করছে। পিউ ঠোঁট দুটো জোরে চেপে রেখেছিল। তাদের চোখ দিয়ে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছিল। আমার মুখ থেকে তখনও সেই কথাগুলো বেরিয়ে আসছিল যে কথাগুলো বলা অন্যায়, শোনাও অনুচিত। "দেখেছ তো? নিজেরাই দেখেছ তো আমার মা কত সুন্দর ছিলেন? তোমাদের মায়ের চেয়ে কত বেশি সুন্দর, কত বেশি অভিজাত? তাঁর তুলনায় তোমাদের মা কিছুই নন, শুধুমাত্র আমার বাবার জামাকাপড় কাচার আর রান্না করার একজন কাজের লোক। শুধু সেইজন্যই তিনি এখানে আছেন আর সেইজন্যই তোমরাও এখানে আছ।"

মেয়েরা আর কাঁদছিল না, তাদের চকচকে কালো মাথা দুটো কার্পেটের দিকে তাকিয়ে নিচু হয়ে ছিল। নড়ছিল না বা কোনও উত্তর দিচ্ছিল না। আমি জুতোর বাক্সটা এবং মায়ের বাকি ফোটোগুলো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। ফোটোগুলো ওই বাড়ি থেকে যত দূরে সম্ভব সরাতে চাইছিলাম। গেস্টরুমে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র গুছিয়ে তারপর গাড়িতে উঠলাম। নিজেকেই বললাম যে, বাবা এবং চিত্রা শীঘ্রই পার্টি থেকে ফিরে আসবেন। যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছিলাম, তা স্বতঃস্ফূর্ত, প্রায় আমার অজ্ঞাতসারেই মনে হচ্ছিল। কোনও গুরুতর পরিস্থিতিতে স্রেফ অ্যাড্রেনালিনের তাগিদে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারি যে, অবচেতন মনে আমি অনেকদিন ধরেই পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। রূপা এবং পিউ একবারও তাদের ঘর থেকে বেরোল না। একবারও দরজা খুলে দেখল না বা প্রশ্ন করল না যে, আমি কী করছি। আমি যখন গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করলাম, তারা বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে, থেকে যাওয়ার জন্য আমাকে মিনতি করল না।

কিচ্ছু জানতাম না কোথায় যাব। কিন্তু হাইওয়েতে গিয়ে উত্তরের দিকে যেতে থাকলাম। নিউ হ্যাম্পশায়ারের একটি ছোট অংশ এবং ব্রিজের ওপর দিয়ে মেন-এ ঢুকে ম্যাসাচুসেটস থেকে অল্পক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এলাম। পোর্টল্যান্ডে যাওয়ার পথে বাঁক ঘুরে একটা ছোট রাস্তায় ঢুকলাম যেটা মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়ে। অন্ধকার, ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে চললাম। রাস্তায় মাঝে মাঝে গির্জা-রেস্তোরাঁ-বাড়ি-ঘর পড়ল। তখনও মহাসাগর দেখা না গেলেও নোনা জলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। তার সঙ্গে হাওয়ার অদ্ভুত একটা ঝাঁকুনি খাওয়ার মতো শব্দ, যেন কোথাও আগুন জ্বলছে। গাড়ির বন্ধ দরজা-জানলার মধ্যে দিয়ে শব্দটা ঢুকে আসছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম সারা রাত গাড়ি চালাব, কিন্তু তারপর ক্লান্ত লাগল। ঘুমোনোর জন্য একটা জায়গা খুঁজতে শুরু করলাম। বেশিরভাগ হোটেল এবং মোটেলই সেই ঋতুর মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেগুলো দেখে মনে হল খোলা আছে, সেগুলোও অত রাতে খোলা ছিল না। গাড়ি একদিকে থামিয়ে ঘুম দেব কি না ভাবছি, এমন সময় একটা মোটেল চোখে পড়ল। তার '২৪ ঘণ্টা' চিহ্নটা পার্কিং-লট-এ জ্বলজ্বল করছিল।

পরের দিন সামুদ্রিক পাখিদের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। একটা ঝুলে পড়া পেতলের খাটে উঠে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে প্রথমবার জল দেখতে পেলাম। মনে আছে, ঘরটার তুলনায় জানলাগুলো বেশ ছোট ছিল। যেন গোটা মোটেলটাই একটা জাহাজ। জলে এলোমেলো ঢেউ উঠছিল। রং আকাশের চেয়ে দু'-এক পোঁচ বেশি গাঢ় ধূসর। ঘুমোনোর সময় জলের নৈকট্য বা উপস্থিতি টের পাইনি। ঘরটা স্যাঁতসেঁতে এবং ভিজে ভিজে, দেওয়ালের ওয়ালপেপারে সাদা প্রেক্ষাপটে ছোট ছোট নীল নোঙর। বাথরুমের ভিতর ফাঁকা ওষুধের ক্যাবিনেটের ধারে মরচে পড়েছিল। ডেস্কে বসা কেরানি বলল

AMARBOI.COM

যে, কয়েক মাইল দূরে একটা রেস্তোরাঁ আছে এবং আমি পেনবস্কট উপসাগরে এসে পৌঁছেছি।

প্রাতরাশের পর পায়ে হেঁটে শহরটায় ঘুরে বেড়ালাম। জাহাজঘাটার পাশে, তালাবন্ধ দোকানপাট এবং সেসব বাড়ি-ঘর যার মালিকরা আবার গ্রীষ্মে এসে বসবাস করবে, তার পাশে হেঁটে বেড়ালাম। কিন্তু দিনের বেশিরভাগ সময়টাই মোটেলে আমার ঘরের আরামকেদারায় বসে মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে রইলাম বা নীচে বার-এ বসে ড্রিঙ্ক করলাম। আগের রাতের কথা ভেবে রীতিমতো অসুস্থ লাগছিল। নিজেকে নিয়েই আশঙ্কা হচ্ছিল, লজ্জিত লাগছিল। চোখের সামনে ভাসছিল রূপা এবং পিউ মাথা নিচু করে, আবার ঝাঁকুনি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা এবং চিত্রাকে যে কথাগুলো বলার আমার সাহস হয়নি, সেইসব কথা তারা শুনেছে। আমি তাদের ফেলে চলে আসার পর তারা বাড়িতে একলা ছিল। জানতাম তারা একলা থাকতে কত ভয় পায়। কে জানে বাবা এবং চিত্রা পার্টি থেকে ফেরার পর কী হয়েছে, রূপা এবং পিউ তাঁদের কী বলেছে। ধরে নিলাম যে, তারা সবই বলে দিয়েছে। যে কথাগুলো আমি বলে উঠতে পারিনি, সেই কথাগুলো প্রকাশ করার অপ্রিয় কাজটা তারাই করে দিয়েছে। বুঝতে পারছিলাম, এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে আমি বাবাকে চিন্তায় ফেলেছি। কিন্তু রূপা এবং পিউয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যই আমার বেশি খারাপ লাগল। তাদের কাছেই আমার ক্ষমা চাওয়ার বেশি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে আমি এও জানতাম যে, যা হয়ে গিয়েছে, তা আর ফেরানো যাবে না। এরপর আমি যা-ই বলি না কেন, যে অঘটন ঘটে গিয়েছে, তা আমি কোনওদিন ঠিক করতে পারব না।

দুপুরবেলা একটা পে-ফোনে গিয়ে বাবার অফিসে ফোন করলাম। "আমি জানি তোমার মন ভাল নেই। জানি তোমার পক্ষে গোটা ব্যাপারটাই কঠিন," বাবা বললেন। যেন আমার চলে যাওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। "কিন্তু তুমি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতে। সেটাই ভদ্রতা হত। তুমি আমাদের বলে যেতে পারতে।"

আমি কোনও কৈফিয়ত দিলাম না। কোনও কৈফিয়ত ছিল না আমার। তার বদলে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা এবং চিত্রা যখন ফিরেছিলেন, তখন মেয়েরা কেমন ছিল?

"ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল," বাবা বললেন। "তাও, অত রাতে ওদের বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে রেখে বেরিয়ে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি, কৌশিক। কিন্তু একটা হয়ে যেতে পারত। চিত্রা রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। ও ভাবছে যে, তুমি ওর দোষেই পালিয়ে গিয়েছ। ভাবছে ও ভুল কিছু বলেছে বা করেছে যা তোমার খারাপ লেগেছে। ও যথাসম্ভব চেষ্টা করছে।"

তখন বুঝলাম, মেয়েরা কিছুই বলেনি। চিত্রার কোনও ধারণা নেই যে, আমি তাঁর মেয়েদের ওপর চোটপাট করে এসেছি। তাদের ক্ষতি করেছি, আতঙ্কিত করে এসেছি।

"আমরা পরশু ফ্লোরিডায় রওনা দিচ্ছি," বাবা বললেন। "তুমি কি তার মধ্যে ফিরবে?"

"মনে হয় না।"

"সময়মতো কলেজে ফিরবে তো?"

"হ্যাঁ।"

"কয়েক সপ্তাহ পর কথা হবে তা হলে।"

বাবা ফোন রেখে দিলেন। আমি কোথায় আছি তা জিজ্ঞেস করার দরকার বোধ করেননি।

পরের দিন সকালে আমি আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। বেশ কয়েকদিন ধরে এইভাবে চলতে থাকলাম: উপকূল ধরে গাড়ি চালিয়ে, খিদে পেলে রেস্তোরাঁয় খেতাম, ক্লান্ত হয়ে পড়লে মোটেল খুঁজে নিতাম। বাবা বড়দিনে যে টাকাটা দিয়েছিলেন সেটা থেকে সবকিছুর খরচ মেটাচ্ছিলাম। কোনও ম্যাপ সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি। একটা পেট্রল পাম্পের কর্মী আমাকে বললেন যে, ওই রাস্তা ধরে এগোলে আমি কানাডায় গিয়ে পড়ব। মাঝেমধ্যেই জল, ছোট ছোট দ্বীপ, ডোরাকাটা লাইটহাউস এবং জমির টুকরো চোখে পড়ত। এতই প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল যে, গাড়ির বাইরে বেরোনো যাচ্ছিল না। তাও, মাঝে মাঝে মহাসাগর দেখার জন্য বা কোনও পায়ে-হাঁটা রাস্তায় ঘুরে দেখার জন্য গাড়ি থেকে বেরোতাম। সেরকম জায়গা আমি আগে কখনও দেখিনি। ম্যাসাচুসেটসের নর্থ শোর-এর সঙ্গে কোনও মিল ছিল না। আকাশটাও অন্যরকম। রংহীন, আঁটসাট, নির্মম। কিন্তু সবচেয়ে নির্মম মনে হত মহাসাগরের জল। কখনও কখনও প্রায় কালো। এতই হিমশীতল যে, জানতাম সেই জল আমাকে মেরেও ফেলতে পারে। তার প্রচণ্ডতা আমাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। প্রকাণ্ড ঢেউগুলো বালিহীন পাথরের তটে ক্রমাগত

AMARBOI.COM

আঘাত করত। আমি যত দূর এগোলাম, জায়গাটা তত জনমানবশূন্য হতে থাকল। আমার দেখা যে-কোনও জায়গার চেয়ে বেশি নিরালা। কিন্তু ঠিক এই কারণেই সেই দৃশ্য আমাকে টানছিল। এমনভাবে আমাকে আকর্ষণ করছিল, যেমন অনেকদিন কোনও কিছুই আমাকে টানেনি।

বেশিরভাগ মাছধরা গ্রামগুলোয় কেউ ছিল না। কাঁকড়া ধরার নৌকোগুলো শীতের জন্য জল থেকে সরে এসেছিল। কাঠের মাছধরার ফাঁদগুলো ফাঁকা, স্তূপ করে রাখা ছিল। মাঝে মাঝে ক্যামেরার অভাববোধ করতাম, কিন্তু সেইসব দিনের কোনও ছবি আমার কাছে নেই। সাধারণত খুব খারাপ খাবারই পাওয়া যেত। কিন্তু এখনও মনে করলে আমি সেই স্বাদ উপভোগ করতে পারি। ছোট দোকানের তেতো এবং বিস্বাদ কফি, চিনির রসে ডোবানো ওয়্যাফল, আঠালো চাউডার, তেলতেলে ডিম। এখনও মনে করলে এমন তৃপ্তি পাই, যেন তার আগে কখনও কোনও খাবার আমাকে তৃপ্ত করেনি। একমাত্র পানশালাগুলোতেই প্রাণের চিহ্ন দেখা যেত। সেই অদ্ভুত, ছোট্ট জায়গাগুলো দেখে মনে হত যেন কারও বাড়ির বসার ঘর। অ্যাশট্রের জায়গায় ক্ল্যামশেল, দেওয়ালে জাল জড়ানো। সেখানে যে জেলে এবং অন্যান্য লোকজন আসত, যারা আজীবন সেই গ্রামগুলোয় থেকেছে, সেই পানশালাগুলোয় পান করতে এসেছে, তাদের সঙ্গে বলার মতো আমার কোনও কথা ছিল না। তাদের তামাকের দাগলাগা দাড়িতে মুখ ঢাকা, হাত খসখসে, ফেটে চৌচির। ভাষা অবোধ্য। তারাও আমার প্রতি নিস্পৃহ ছিল। আমি নিজের মতোই থাকতাম। জানতাম যে, আমি সেখানে বেমানান। টিভিতে যা-ই চালানো থাকত, যা-ই পুল খেলা হত, তাই দেখতাম। কারও সঙ্গ চাইতাম না। তার আগে কখনও আমি একা ভ্রমণে বেরোইনি। এই প্রথম আবিষ্কার করলাম যে, একা ভ্রমণ করতে আমার ভাল লাগছে। পৃথিবীতে কেউ জানত না আমি কোথায় আছি। কারও আমাকে হাত বাড়িয়ে ধরার উপায় ছিল না। মৃত হওয়ার মতো অভিজ্ঞতা ছিল সেটা। পালিয়ে গিয়ে আমি সেই ভীষণ ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিলাম, যা মা চিরকালের জন্য পেয়ে গিয়েছিলেন।

কানাডার সীমান্তে পৌঁছোতে আমার পাঁচ দিন লাগল, ফিরে আসতে আরও চার দিন। বাবার দেওয়া টাকাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সেই কয়েক দিনের মধ্যে কোনও একদিন বছরটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এক রাতে একটা বার-এ এক পেগ হুইস্কি বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল বলেই আমি বছরশেষের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে পেরেছিলাম। দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, মা যদি পৃথিবীর সেই প্রান্ত দেখার জন্য বেঁচে থাকতেন, তা হলে তিনি বাবাকে রাজি করাতেন, যে শয়ে শয়ে বাড়ি আমার রাস্তায় পড়েছিল, তার মধ্যে কোনও একটি বাড়ি কিনে নিতে। সমুদ্রের দিকে মুখ করা সব বাড়ি। অনেকগুলো আবার নিজস্ব দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। বার এবং ডাইনারে সবসময় একগাদা প্যামফ্লেট পাওয়া যেত—সমুদ্রের মুখোমুখি সম্পত্তির তালিকা। সাধারণ টাইমশেয়ার থেকে শুরু করে টারেটযুক্ত প্রাসাদ, সবকিছু। মাঝে মাঝে পড়ার আর কিছু না পেলে আমি সেগুলোর ওপরই চোখ বোলাতাম। মুম্বই ছেড়ে আসার পর মা-বাবার বাড়ি খোঁজার কথা মনে পড়ে যেত। তখনই, সেই শীতকালে মেন-এর উপকূলে একা একা ঘুরে বেড়ানোর সময় আমার, তোমার কথা, পাঁচ বছর আগের শীতে তোমাদের বাড়িতে কাটানো সপ্তাহগুলোর কথা মনে পড়ে গেল।

ততদিনে তোমার কলেজে ভরতি হয়ে যাওয়ার কথা। আমার মতো বড়দিনের ছুটি কাটানোর কথা। কিন্তু আমার স্মৃতিতে তুমি রূপার চেয়ে খুব বেশি বড় ছিলে না। মনে পড়ল, একদিন, তুষারঝড়ের পর, আমার কোনও কথা শুনে রূপা এবং পিউয়ের মতো তুমিও কেঁদে ফেলেছিলে। তোমার মা-বাবার ছাদের তলায় থাকার প্রতিটি দিন আমি ঘৃণা করতাম। কিন্তু এখন সেই দিনগুলোর কথা ভেবে মন কেমন করল। সেই বাড়িটা আমাদের নিজেদের না হলেও, শেষ সেই বাড়িটাই স্বগৃহের মতো লেগেছিল। মা অসুস্থ নন, এমন ভান করতে করতে এবং তাঁর অসুখের কথা জানে না এমন মানুষজনের মাঝে থাকতে থাকতে আমার মনে কোথাও একটা বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সেটাই সত্যি। তোমার মায়ের মতো আমার মা-ও বেঁচে থাকবেন। দ্বিতীয় বাড়িটা অন্যরকম ছিল। সেখানে সরাসরি ডাক্তারদের ফোন করা হত, চারদিকে ওষুধের বোতল ছড়ানো থাকত। মায়ের অসুখের হাজারও জিনিসপত্র প্রতিটি ঘরের প্রতিটি কোণ দখল করেছিল। মা ওই বাড়িটার পিছনে অত সময় এবং টাকা খরচ করা সত্ত্বেও, আমরা কখনও বাড়িটায় যথাযথভাবে বসবাস করতে পারিনি। মাকে যা ভোগ করতে হচ্ছিল, সেজন্য আমরা কখনও সেখানে সুখী হতে পারিনি। ওই বাড়িতে থেকেই মা অন্য এক জায়গায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এমন এক জায়গা, যেখানে আমরা তাঁকে সঙ্গ দিতে পারতাম না, যেখান থেকে তিনি কোনওদিন ফিরবেন না।

একদিন, কানাডার সীমান্তের কাছাকাছি এসে বে অফ ফান্ডি-র ওপর খাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড়ের ধারে হাঁটতে হাঁটতে আমি এক বিশেষ চমকপ্রদ জায়গায় এসে পৌঁছোলাম। একটা সাইনপোস্টে লেখা ছিল আমি দেশের পূর্বতম স্টেট পার্কে দাঁড়িয়ে আছি। পাইনগাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নেমে যাওয়া পায়ে-চলা পথটা সহজ ছিল না। পাইনের কড়া গন্ধে ভরে ছিল। গাছগুলোর উপরিভাগ লম্বা সরু। নীচের ডালপালায় ধুলোর মতো বরফের আস্তরণ। প্রবল হাওয়া যেন সবকিছু ছিঁড়ে, চিবিয়ে ফেলছিল। জলটা প্রপাতের মতো লাফিয়ে নেমে গিয়েছিল। রাস্তায় আমার কারও সঙ্গে দেখা হল না। অনেকক্ষণ ধরে আমি ঢেউয়ের আসা-যাওয়া দেখলাম। ঢেউয়ের স্ফীত চুড়োগুলো পাথরের ওপর পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। সেই চিরকালীন অস্থির আসা-যাওয়া আমাকে শান্ত করল। পরের দিন আমি আবারও একই জায়গায় ফিরে গেলাম। সেদিন মায়ের ফোটোসমেত সেই জুতোর বাক্সটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। মাটিতে বসে, বাক্সটা খুলে একের পর এক ফোটোগুলো দেখতে শুরু করলাম। যেন সেগুলো ডাকে আসা চিঠিপত্র যা আমি চট করে উলটেপালটে দেখছি, পরে ভাল করে পড়ে দেখব। কিন্তু বাক্সে বড্ড বেশি ফোটো ছিল। কয়েকটা দেখার পর, বাবার মতো আমিও সেগুলোর দিকে তাকাতে পারলাম না। আমার আঙুলের ডগাটা একটু আলগা করলেই যে ফোটোগুলো ধরে ছিলাম, সেগুলো সেই অশান্ত, উন্মত্ত সমুদ্রে যেখানে ইতিমধ্যেই মায়ের ভস্ম ছিল, সেখানে উড়ে চলে যেত। কিন্তু তা-ও আমি সহ্য করতে পারতাম না। তাই ফোটোগুলো আবার বাক্সে ঢুকিয়ে রেখে সেই কঠিন জমি খুঁড়তে শুরু করলাম। আমার কাছে শুধু একটা লাঠি এবং একটা ধারালো পাথর ছিল। গর্তটা খুব বড় হল না, কিন্তু বাক্সটা লুকোনোর জন্য তা যথেষ্ট। আমি সেটা মাটি এবং পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে দিলাম। যখন আমার কাজ শেষ হল, চাঁদের প্রথম আলো মাটিতে এসে পড়েছে। সেই আলোয় পথ দেখে আমি গাড়ির কাছে ফিরে গেলাম।

আমার স্নাতক হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে বাবা ফোন করে জানালেন যে, তিনি বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছেন। তিনি, চিত্রা এবং মেয়েরা বস্টনের এক কম নিরিবিলি অংশে, একটু পুরনো নকশায় তৈরি একটী বাড়িতে থাকতে যাচ্ছেন। সেখানে কাছাকাছি অন্যান্য বাঙালিরা থাকে এবং শহরে একটা ভারতীয় মুদিখানার দোকান আছে। মায়ের কাছে মহাসাগরের নৈকট্য এবং আধুনিক স্থাপত্য যত প্রয়োজনীয় ছিল, তার চেয়ে এইসব জিনিসগুলো চিত্রার কাছে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি বাবার সেই নতুন বাড়িতে যাচ্ছিলাম না। স্নাতক হওয়ার পর দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল আমার। বড়দিনের ঘটনাগুলো কখনও জানাজানি হয়নি, ওই নিয়ে কোনও আলোচনাও হয়নি। বাবার সঙ্গে চিত্রা, রূপা এবং পিউও ঘাসের ওপর পাতা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আমার ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠান দেখল। আমার ডায়াসে ওঠার সময় হাততালি দিল। ক্যাপ এবং গাউন পরে আমি তাঁদের সঙ্গে ফোটো তুললাম। ওরা আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করল। সেই দিনটা যে বিশেষভাবে আমার, সে-বিষয়ে সচেতন এবং শ্রদ্ধাশীল হলেও, তারা এমন ব্যবহার করল, যেন আমাদের আগে কখনও দেখা হয়নি। আমি জানতাম, সে রাতে আমি যা-যা বলেছিলাম এবং করেছিলাম, কিছুই তারা চিত্রা বা বাবাকে বলেনি। জানতাম যে, সেই ঘটনা চিরকাল আমাদের তিনজনের মধ্যেই থাকবে। এও জানতাম যে, তাদের নীরবতা আমাকে রক্ষাও করছিল, শাস্তিও দিচ্ছিল। সেই রাতের স্মৃতিই ছিল তখন আমাদের মধ্যে একমাত্র বন্ধন। যা আর সবকিছুকে ঢেকে ফেলেছিল। তাদের চরম ভদ্রতা দিয়ে তারা আমাকে সেটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল। তারা শুধু পরস্পরের সঙ্গেই কথা বলছিল এবং যদিও ততদিনে তাদের বাচনভঙ্গি আমেরিকান হয়ে গিয়েছিল, তাও আমার সৎ বোনদের— একমাত্র যে দু'জন আমার সহোদর ভাইবোনের সমতুল্য— সেদিন তাদের যখন তারা সদ্য আমেরিকায় এসেছিল তখনকার চেয়েও বেশি অবোধ্য মনে হচ্ছিল। "সকলে আরও কাছে এসো," বাবা তাঁর নতুন ক্যামেরার পিছন থেকে নির্দেশ দিলেন। আমি রূপা এবং পিউয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'জনের কাঁধে হাত রাখতে দু'জনেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল। "আমরা দু'জনেই এগিয়ে যাচ্ছি, কৌশিক," অনুষ্ঠানের পর বাবা আমাকে বললেন। "নতুন পথে এগিয়ে যেতে হবে।" আমরা কেউ কিছু না বললেও, আমি জানতাম যে, আমরা দু'জনেই চিত্রার প্রতি কৃতজ্ঞ। শেষ যে জায়গাটিকে মা তাঁর নিজের গৃহ বলে জেনেছিলেন, সেই জায়গায় মায়ের যেটুকু অস্তিত্ব থেকে গিয়েছিল, সেই অস্তিত্বের সান্নিধ্যে থাকতে না পেরে, সেই বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিতে আমাদের বাধ্য করার জন্য আমরা চিত্রার কাছে কৃতজ্ঞ ছিলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীরের অভিমুখে

আবার সে তার রোমে আসার মিথ্যে কারণ জানিয়েছিল। একটি অনুদানের জন্য তাকে এই হেমন্তে ওয়েলেসলিতে পড়াতে হয়নি। কিন্তু হেমা ইতালিতে কোনও দায়িত্ব নিয়ে আসেনি, শুধুই গেস্তোয় এক সহকর্মীর ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে থাকার সুযোগ নিতে এসেছিল। বানিয়ে বলে দিয়েছিল ক্লাসিকাল স্টাডিজ-এর এক প্রতিষ্ঠানে ভিজিটিং লেকচারশিপে এসেছে, যাতে ব্যাপারটা গুরুগম্ভীর শোনায় এবং তার মা-বাবা অথবা নবীন কেউই কোনও প্রশ্ন করেনি। তার বিদ্যাচর্চা তাঁদের কাছে একটা রহস্য, সম্ভ্রম করেন, অথচ তাঁদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। সে যে পিএইচডি এবং একটি টেনিওর-ট্র্যাক কাজ পেয়েছে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। হেমা যাতে আমেরিকান আকাদেমির লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে, তার সহকর্মী জিওভানা ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। রোমে ফোন করার জন্য কয়েকজনের নম্বরও দিয়েছিল। অক্টোবরে হেমা তার ল্যাপটপ এবং জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে মহাসাগরের এপারে চলে এসেছিল এই হঠাৎ নেওয়া ছুটি কাটাতে। ঠিক বড়দিনের আগে সে কলকাতায় যাবে যেখানে তার মা-বাবা দীর্ঘ জীবন ম্যাসাচুসেটসে কাটানোর পর ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে জানুয়ারি মাসে তার সঙ্গে নবীনের বিয়ে।

এটা নভেম্বর, থ্যাঙ্কসগিভিং-এর আগের সপ্তাহ। এই সেমেস্টারে যাকে এড়াতে সে পালিয়ে এসেছে, তার কথা ভাবলে হেমা ওয়েলেসলির ক্যাম্পাসে গাছের পাতাঝরা ডালপালা দেখতে পায়। লেক ওয়াবানের জল ইতিমধ্যেই কিছু কিছু জায়গায় জমে যাবে। তার ছাত্রছাত্রীরা উইলকের লাতিন বাক্য— *id factum esse tum non negavit*— নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে ক্লাসরুমের জানলা দিয়ে অন্ধকার নেমে আসবে। রোমেও পাতা ঝরার মরশুম এসে গিয়েছে। টাইবার নদীর দু'দিকে তামাটে স্তূপ জমা

AMARBOI.COM

হচ্ছিল, কেউ সরাচ্ছিল না। কিন্তু দিনগুলো অলস, অবসাদগ্রস্ত লাগে। শুধু একটা কার্ডিগান গায়ে চাপিয়েই রাস্তায় বেরোনো যায়। যে রেস্তোরাঁয় হেমা রোজ লাঞ্চ খেতে যায়, তার বাইরের টেবিলগুলো তখনও ভরতি থাকে।

রেস্তোরাঁটা জিওভানার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাঁচ মিনিটের পথ, পোর্টিকো দি অক্তাভিয়ার পাশে। সেখানে আরও শয়ে শয়ে রেস্তোরাঁ আছে যেখানে হেমা যেতে পারে। একশো রকমের ক্যাচিও এ পেপে (cacio e pepe), কার্বোনারা এবং ভাজা আর্টিচোক খেয়ে দেখতে পারে। কিন্তু যে ক'বার সে অন্য কোথাও খেতে গিয়েছে, হয় খাবারটা তার পছন্দ হয়নি, নয়তো তাকে নিজের ভাঙা-ভাঙা ইতালিয়ানের জন্য অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। তাই সে একটি চেনা রেস্তোরাঁতেই নিয়মিত যায়, যেখানে তাকে কোনও প্রশ্ন করা হয় না। এই রেস্তোরাঁর বেয়ারারা এতদিনে জেনে গিয়েছে যে, তাকে এক বোতল অ্যাকোয়া গসাতা (gassata), আধ লিটার ভিনো বিয়াঙ্কো এনে দিতে হবে এবং চট করে দ্বিতীয়জনের জন্য রাখা প্লেট-চামচ সরিয়ে ফেলতে হবে। সঙ্গে যে বইটা নিয়ে সে যায়, তারা সেটার সান্নিধ্যে একলা থাকতে দেয়। হেমা অবশ্য বেশিরভাগ সময় পোর্টিকোর ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। ভারা দিয়ে ঘেরা ক্ষয়ে যাওয়া স্তম্ভ, প্রকাণ্ড পেডিমেন্ট যার অনেক অংশই খসে পড়েছে। সুদৃশ্য পোশাক পরা রোমানরা কথা বলতে বলতে একবারও সেদিকে না তাকিয়ে নিজেদের রাস্তায় চলে যায়। পর্যটকরা থেমে, খননকার্যটি দেখে থিয়েটার অফ মার্সেলাস-এর দিকে পা বাড়ায়। পোর্টিকোর সামনে একটা ছোট্ট পিয়াৎজা আছে। হেমা তার একটা ফলকের লেখা অনুবাদ করে পড়ে জেনেছিল যে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে, হাজারেরও বেশি ইহুদি সেখানে নির্বাসিত হয়েছিল। রেস্তোরাঁটা আবিষ্কার করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সে একা নিতে পারে না। বহু বছর আগে, আর-একবার যখন সে মিথ্যে অজুহাতে রোমে এসেছিল, তখন সে জুলিয়ানের সঙ্গে এখানে খেয়েছিল। এবং যদিও আবার এখানে খাওয়ার তার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, জেট-ল্যাগের মধ্যে জিওভানার পাড়ায় প্রথমবার খাবারের খোঁজে বেরিয়ে সে রেস্তোরাঁটা দেখতে পেয়েছিল। আগের বার যখন সে লুকিয়ে জুলিয়ানের সঙ্গে এসেছিল, তখনও তার বিশ্বাস ছিল যে, জুলিয়ানের ডিভোর্স হতে শুধু কিছু সময়ের অপেক্ষা। সেই মে মাসে শহরটা লোকে গিজগিজ করছিল। সে যা জামাকাপড় নিয়ে

AMARBOI.COM

এসেছিল, তার তুলনায় অনেক বেশি গরম পড়েছিল। সে এবং জুলিয়ান কলোসিয়ামের পিছনে একটা হোটেলে থাকত। জুলিয়ান একটা কনফারেন্সে একটা গবেষণাপত্র উপস্থাপনা করেছিল। পেট্রোনিয়াসের ওপর তার গবেষণার একটা নতুন ব্যাখ্যা সংবলিত অধ্যায়। অন্য সময় হলে হেমাও তার নিজের পেপারের উপস্থাপনা করত। মা-বাবাকে তাই করবে বলে ছিল, এবং তাঁরা কোনও প্রশ্ন করেননি। কিন্তু আসলে সে সবে ডেসার্টেশনটা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা শেষ করেছিল এবং কয়েক মাসের ছুটি নেওয়া ঠিক করেছিল।

তারও আগে হেমা আর একবারই রোমে এক বান্ধবীর সঙ্গে ব্রিন মার (Bryn Mawr) থেকে স্নাতক হওয়ার পর এসেছিল। সে এবং তার বান্ধবী, দু'জনেই ধ্রুপদী সাহিত্যের স্নাতক। রোমে সেই প্রথম ভ্রমণে তারা পানিনি এবং জেলাটো খেয়ে প্রাণধারণ করে, খোদাই করা লিপি অনুবাদ করতে করতে মন দিয়ে একটার পর একটা জায়গা ঘুরে দেখেছিল। সেই ভ্রমণ হেমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু জুলিয়ানের সঙ্গে রোমে আসার পর্ব শুধুই ভাঙাচোরা ইঁটপাথরের টুকরোর মতো অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে হোটেলের ছাদে বসে প্রাতরাশ খাওয়া মনে পড়ে। হেমার পায়ের কাছে ছোট্ট বাদামি রঙের পাখিগুলো লাফিয়ে বেড়াত। ঝকঝকে নীল আকাশের তলায় বসে তারা তাজা রিকোটা, মর্টাডেলা এবং সালামি খেত। দিনের শুরুতেই সেই নোনতা, শাঁসালো মাংস খেতে হেমার একটু অস্বস্তি হত, কিন্তু সে কখনও লোভ সামলাতেও পারত না। হোটেলের ঘরটা, গোলাপি নকশাবোনা ওয়ালপেপার এবং চওড়া বিছানাটাও তার মনে আছে। কয়েক দিন অন্তর অন্তর জুলিয়ান তার স্ত্রী এবং মেয়েদের সঙ্গে কথা বলত। জিজ্ঞেস করত ভার্মন্টে, লেক জানমোর-এ যেখানে জুলিয়ানের পরিবার গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে যেত, সেখানে তারা কেমন আছে। হেমা এবং জুলিয়ানের সম্পর্কের অনেকটাই হোটেল এবং মোটেলের ঘরে কেটেছে। উত্তর অতলান্তিকের উপকূলে জুলিয়ানের আবিষ্কার করা ছোটখাটো কয়েকটা জায়গায়। সিইউএনআই-তে হেমা অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকত, তার চেয়ে সেই জায়গাগুলোই জুলিয়ানের বেশি পছন্দ ছিল। অ্যামহার্স্টে জুলিয়ানের বাড়িতে তাদের দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না। তাদের প্রথম ডেটও একটা হোটেলেই হয়েছিল। হেমার ডিপার্টমেন্টে জুলিয়ানের লেকচারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর ছাত্রছাত্রীরা জুলিয়ানকে খাইয়েছিল। তারপর ড্রিঙ্কসের জন্য জুলিয়ান হেমাকে দ্য মার্ক-এ নিমন্ত্রণ করেছিল।

নবীনের রোমে আসার কোনও প্রশ্নই ছিল না। বাগদানপর্বের আগে তারা তিন মাসের মধ্যে মাত্র তিনটি শনি-রবিবার একসঙ্গে কাটিয়েছে। প্রতিবারই নবীন হেমার সঙ্গে দেখা করার জন্য মিশিগান থেকে এসেছিল। তারা বস্টনে সহজভাবে ঘুরে বেড়াত। মিউজিয়াম, সিনেমা, কনসার্ট, ডিনারে যেত। তারপর, দ্বিতীয় সপ্তাহশেষের শুরুতে, নবীন হেমাকে তার বাড়ির দরজায় শুভরাত্রি জানিয়ে, চুমু খেয়ে, নিজের এক বন্ধুর বাড়িতে ঘুমোতে গিয়েছিল। সে হেমার কাছে স্বীকার করেছিল যে, অতীতে তার একাধিক প্রেমিকা থাকা সত্ত্বেও, ভাবী স্ত্রীর ব্যাপারে সে তখনও প্রাচীনপন্থী। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে এই কিশোরীসুলভ মর্যাদা হেমাকে স্পর্শ করেছিল। গ্র্যাজুয়েট স্কুলে ঢোকা পর্যন্ত তার কোনও প্রেমিক ছিল না। এবং ততদিনে অত মাপাজোকা প্রেম নিবেদনের পক্ষে সে অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল।

রোম থেকে সে নবীনের সঙ্গে ই-মেলে যোগাযোগ করে। মাঝে মাঝে ফোনে কথাও বলে। সেসব কথা ভবিষ্যতের ভাবনায় ভারী হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে কোনও যৌথ সম্পর্কের ইতিহাস নেই। তারা গোয়ায় তাদের মধুচন্দ্রিমার কথা আলোচনা করে। নবীনই সেই পরিকল্পনা করছিল। কোন রিসর্ট দু'জনেরই পছন্দ হবে, সেসব কথা হয়। হেমা নবীনের অভাব বোধ করে না, কিন্তু সে কলকাতায় যেতে আগ্রহী। নবীনকে বিয়ে করে, সময়মতো ফিরে এসে ওয়েলেসলিতে আবার পড়ানো শুরু করার অপেক্ষা করছে সে। তার মা-বাবার ভাষায় নবীন 'অবাঙালি' অর্থাৎ সে পশ্চিমবঙ্গের লোক নয়। নবীনের মা-বাবা হিন্দু, পঞ্জাবি। কলকাতাবাসী নবীন আমেরিকায় পিএইচডি করতে এসেছিল। সেও মিশিগান স্টেট-এ, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করে। কিন্তু এমআইটি তাকে হেমন্তে একটা চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর তাই সে হেমার সঙ্গে থাকার জন্য ম্যাসাচুসেটসে আসছে।

হেমা বিয়েটাকে 'অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ' মনে করতে চায় না, কিন্তু সে মনে মনে জানে যে, সেই কথাটাই সত্যি। যদিও মা-বাবার আগে তার সঙ্গেই নবীনের দেখা হয়েছে, আসলে তাঁরাই নবীনকে হেমার জন্য খুঁজে বার করেছিলেন। তাঁরা হেমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নবীন তাকে ফোন করতে পারে কি না। এবং অবশেষে, বহু বছর একই ধরনের অনুরোধ উপেক্ষা করার

AMARBOI.COM

পর, অনেক বছর ধরে বিশ্বাস করার পর, জুলিয়ান তার স্ত্রীকে ছেড়ে দেবে, হেমা মা-বাবার কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। মা-বাবার ধারণা ছিল, হেমা লাজুক প্রকৃতির। পড়াশোনায় মনোযোগী বলে ছেলেদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। এমনকী তার পঁয়ত্রিশতম জন্মদিনে মা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তার মেয়েদের বেশি পছন্দ কি না। তাঁদের কোনও ধারণাই ছিল না যে, এতগুলো বছর, কোনও বিবাহিত পুরুষ তো দূরের কথা, হেমার আদৌ কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল। নিউটনে যে বাড়িটা কিনতে মা-বাবা তাকে সাহায্য করেছিলেন, সেটা খোঁজার সময়ও, উকিলের অফিসে বসে দলিল-দস্তাবেজে সই করার সময়, যেখানে সবসময় দু'জনের সইয়ের জায়গা থাকে, সেখানে একা সই করার সময়ও, তার বিশ্বাস ছিল যে, একদিন তার সইয়ের পাশে জুলিয়ান নিজের নাম লিখবে। হেমার মা-বাবা এখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকেন। স্বামীর সঙ্গ, সন্তানের সঙ্গ ছাড়া মধ্যবয়সের দিকে এগোনোতে প্রকাশ হয় তার অক্ষমতা, অথচ নিজের বাড়িতে থাকা, বরফ পড়লে ড্রাইভওয়ে পরিষ্কার করা, মর্টগেজের বিল এলে টাকা মিটিয়ে দেওয়া— যদিও হেমা নিজের কাছে মা-বাবার কাছে এবং সকলের কাছেই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, এই প্রত্যেকটি কাজ সে একা করতে পারে— তবুও, অনন্তকাল সেই জীবনযাপন করার অনিচ্ছাই অবশেষে তাকে নবীনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

AMARBOI.COM

প্রথম থেকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, নবীন এবং সে যদি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, পরস্পরের সঙ্গে সহজ, স্বচ্ছন্দ হতে পারে, তা হলে তারা বিয়ে করবে। এবং জুলিয়ানের সঙ্গে বছরের পর বছর অনিশ্চয়তায় কাটানোর পর, এই নিশ্চয়তাতেই, ভালবাসার প্রতি এই যে মনোভাব সে এতদিন অবজ্ঞার চোখে দেখেছিল, সেই মনোভাবেই হেমা মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। জুলিয়ান যেভাবে তাকে আকৃষ্ট করেছিল, এই নিশ্চয়তা তাকে সেভাবেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। এবং এই মনোভাবের জন্যই সে নবীনের মধ্যে শারীরিক আবেদনও খুঁজে পেয়েছিল। তার শান্ত বাদামি রঙের চোখ, লম্বাটে তামাটে মুখ, কালো গোঁফের রেখা হেমার ভাল লেগেছিল। নবীন আসার পর জুলিয়ানের কোনও আচমকা আগমন তাকে চমকে দিত না। ভরদুপুরে কোনও ঘণ্টা বেজে উঠে তার বাকি দিনটা নষ্ট করে দিত না। প্রায় এক দশক পরে, একটি মাত্র ফোনকল সব শেষ করে দিয়েছিল। শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন জুলিয়ান একসঙ্গে শনি-রবিবার কাটানোর কথা বলেছিল, হেমা তাকে জানিয়েছিল, "আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে।" জুলিয়ান তাকে বিশ্বাসভঙ্গ করার দোষ দিয়েছিল, তাকে হৃদয়হীন বলেছিল। তারপর আর কখনও জুলিয়ান ফোন করেনি।

এখন সে তার অতীত আর ভবিষ্যৎ, দুটি থেকেই মুক্ত। কোনও মস্ত বড় সমাবেশে অতিথিরা যেমন পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমন এই জায়গাটায় ইতিহাসের বিভিন্ন সময় একসঙ্গে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তার কাজ নিয়ে সে একলা থাকতে পারে। জীবনে প্রথমবার হেমা বিদেশে একা থাকছে। সে জানে যে, তার একা জীবন শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে। তাই রোমে সে তার একাকিত্ব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল। দিনগুলোর নীরব, বাঁধা গতে বিনা চেষ্টায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। রাতে, স্নানের পর, সে জিওভানার খাটের ওপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। ঘরটা মাপে ছোট, কিন্তু তার উচ্চতা শ্বাসরোধকারী। বিশাল খড়খড়িওলা জানলা দিয়ে রোদ আসতে পারে না, কিন্তু সবরকমের আওয়াজ এসে ঢোকে। ভিয়া আরেনুলা-র (Via Arenula) গাড়ি আর স্কুটারের আওয়াজ, ব্যাবসার জন্য দোকানের ঝাঁপ খোলার আওয়াজ, অ্যাম্বুলেন্স সাইরেনের যে অবিরত সুরেলা শব্দ তার অদ্ভুতভাবে আরামদায়ক মনে হয়, সেই আওয়াজ। রোমের কয়েকটি ব্যাপার তাকে কলকাতার কথা মনে করিয়ে দেয়। রোদে-জলে পোড় খাওয়া বিরাট বিল্ডিংগুলো, তালগাছ, বড় রাস্তা পার হওয়ার দুঃসাধ্যতা। ছেলেবেলায় হেমা নিয়মিত কলকাতায় যেত। কলকাতার মতো রোমও, একদিকে যেমন সে ঘনিষ্ঠভাবে চিনত, তেমন অন্যদিকে একেবারেই চিনত না— দুটো শহরই তাকে নিজেদের অঙ্গীভূত করে নিত, অথচ তাকে নিজেদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। সে রোমের প্রাচীন ভাষা জানে। রোমের সম্রাট, লেখক, রোমের স্থাপনা থেকে পতনের ইতিহাস জানে। কিন্তু দৈনন্দিন ইতালির জীবনযাত্রায় সে একজন পর্যটক মাত্র। এবং জিওভানা, যে এখন বার্লিনে, ছাড়া হেমার একজনও রোমান বন্ধু নেই।

সকালে হেমা এসপ্রেসো তৈরি করে, দুধ গরম করে এবং চারচৌকো টোস্টের ওপর জ্যাম মাখায়। আটটার মধ্যে সে জিওভানার ডেস্কে বসে পড়ে। এতদিনে ডেস্কটা হেমার বই, নোটবই, ল্যাপটপ, লাতিন ব্যাকরণ এবং অভিধানে বোঝাই হয়ে গিয়েছে। শহরে করার বা দেখার একশো রকম

AMARBOI.COM

জিনিস থাকলেও প্রতিদিন বেলা একটা পর্যন্ত হেমা এই কার্যসূচি বজায় রাখে। এটাই তার অবলম্বন। অনেক বছর ধরে এটাই তার অবলম্বন হয়ে আছে। সে এখন একজন অধ্যাপিকা। লুক্রেশিয়াসের ওপর তার তত্ত্বালোচনা বাঁধাই হয়ে, প্রকাশিত হয়ে, প্রশংসাও অর্জন করেছে। কিন্তু তবুও, তার কাজের যে অংশের জন্য তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একলা একটা ডেস্কে বসে থাকতে হয়, সেটাই তাকে সবচেয়ে বেশি তৃপ্ত করে। অষ্টম শ্রেণি থেকেই, লাতিন পড়া হেমার নেশা। প্রতিটি লাইনের মানে খুঁজে বের করা একটা প্রিয় ধাঁধার মতো। যে জ্ঞান সে ধীরে ধীরে অর্জন করেছে, যে প্রাচীন কথা, শব্দরূপ এবং বাক্যগঠন তার মস্তিষ্কে অবস্থান করে, সেগুলো তার পবিত্র মনে হয়। সেগুলোর সাহায্যে এক মৃত জগৎকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে সে।

আপাতত সে এট্রুস্কানদের (Etruscan) দিকে মনোযোগ দিয়েছে। কয়েক মাস আগে সে বস্টনে, ভার্জিল-এ এট্রুস্কানদের উল্লেখের বিষয়ের ওপর একটি লেকচারে উপস্থিত ছিল। সেই লেকচারই তাকে রোমের চেয়েও প্রাচীন সেই রহস্যময় সভ্যতার খোঁজে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই মানুষদের ইতিহাসের খোঁজে, যারা সম্ভবত এশিয়া মাইনর থেকে মধ্য ইতালিতে চলে এসেছিল। চার শতাব্দী ধরে যাদের সভ্যতা ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল, লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে যারা একশো বছর রোম শাসন করেছিল। তাদের সাহিত্যের আর কোনও অস্তিত্ব নেই, তাদের ভাষা মিশে গিয়েছে অপরিচিতের অন্ধকারে। তাদের প্রধান উত্তরাধিকার হল সমাধি এবং সমাধির ভিতরের জিনিস : মৃতকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য গয়নাগাটি, মৃৎশিল্প, অস্ত্রশস্ত্র। সে আরুস্পিচেস (Haruspices) সম্বন্ধে পড়াশোনা করছিল। প্রাচীন রোমের সেই দৈবজ্ঞ, যাঁরা পশুপাখিদের নাড়িভুঁড়ি, বজ্রবিদ্যুৎ, গর্ভবতী মহিলাদের স্বপ্ন এবং পাখিদের উড়ান পড়ে দেবতাদের ইচ্ছার ব্যাখ্যা করতেন। ওয়েলেসলিতে ফেরার পর তার একটা সেমিনারের আয়োজন করার ইচ্ছে আছে। বিষয় হবে রোমের প্রাচীনত্বে এট্রুস্কানদের প্রভাব এবং সম্ভবত, তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তার দ্বিতীয় বইয়ের প্রস্তাব। এট্রুস্কানদের সংগ্রহ দেখতে সে ভাটিকানে গ্রেগোরিয়ান মিউজিয়াম এবং ভিলা গুইলা (Villa Guila) দেখতে গিয়েছিল। সিচেরো (Cicero) এবং সেনেকা (Seneca), লিভি (Livy) এবং প্লিনি-র (Pliny) মধ্যে খুঁজে বার করছিল, তান্ত্রিক সেনেটর নিজিডিয়াস ফিগুলস এর (Nigidius Figulus) লেখার কিছু অংশ

AMARBOI.COM

পড়ছিল, ল্যাপটপে নিজের নোট টাইপ করছিল, যে বেশ কয়েকটি বই সে পড়ে ফেলেছিল, সেগুলো দাগ দিয়ে রাখছিল।

আর তাই হেমা এখনও কাউকে ফোন করেনি। জিওভানা আশ্বাস দিয়েছিল যে, তার বন্ধুরা হেমার সঙ্গে কফি খেতে বা তাকে গাড়ি করে তিভোলি (Tivoli) বা অস্টিয়ায় (Ostia) নিয়ে যাবে। কিন্তু হেমা এখনও তাদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। একা-একা দিনগুলোয়, কাজ করে, পড়াশোনা করে, তারপর পোর্টিকোয় খাওয়াদাওয়া করেই সে সন্তুষ্ট ছিল। দুপুরবেলা সে যেত যে অন্ধকার, সংকীর্ণ রাস্তাগুলো বিশাল, রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গণে গিয়ে পড়ে, সেই রাস্তাগুলো দিয়ে গির্জাগুলোয়। সব জায়গায় সে হেঁটেই যায়। প্রায় কখনওই বাস বা মেট্রোয় চাপে না। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে এসে বাড়িতেই সাদাসিধে কোনও খাবার রান্না করে। খেতে খেতে ইতালিয়ান টেলিভিশন দেখে। রাতে একা বেরোনো তার অসমীচীন মনে হয়। দুপুরের খাবারের চেয়ে রাতের ডিনার একা খেতে বেশি অস্বস্তি লাগে। যে ক'বছর সে জুলিয়ানের সঙ্গে ছিল, তখন একা থাকলেও, অন্য পুরুষরা বুঝতে পারত যে, তার হৃদয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে তাদের কাউকে সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করবে না। যেমন করে কোনও ট্যাক্সি অফ-ডিউটি আলো জ্বালিয়ে সামনে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু এখন, যদিও সে কারও বাগদত্তা, তবুও সে বুঝতে পারে যে, কোনও কোনও রোমান পুরুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে তাকে ডাক দেয়। এবং যদিও তাদের প্রশংসার দৃষ্টিতে সে খুশিই হয়, একই সঙ্গে তাকে এও মনে করিয়ে দেয় যে, তার হৃদয়ে নবীনের জন্য সেই স্থান নেই।

শনিবার সকালগুলোয়, কাজ করার বদলে, সে ক্যামপো দি ফিয়োরি-তে (Campo de Fiori) যায়। কেতাদুরস্ত মায়েরা উঁচু হিলের জুতো, নরম জ্যাকেট এবং গয়নাগাটি পরে বাচ্চাদের স্ট্রোলার ঠেলে নিয়ে যায় এবং কিলোদরে শাকসবজি কেনে। হেমা তাদের দেখে। তাদের চুল ঘন, এলোমেলো। সানগ্লাসে মুখের বলিরেখা ঢাকা পড়ে না। যদিও তারা হেমার চেয়ে বয়সে ছোট, তবুও, তাদের কাছাকাছি থাকলে হেমার নিজেকে অনভিজ্ঞ মনে হয়। ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্ব, ঘর-সংসার সামলানো এবং তরল গলায় সবজিওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করার সম্বন্ধে হেমা কিছুই জানে না। জুলিয়ানের সঙ্গে এত বছর থাকতে থাকতে সে অভ্যস্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে যে, জুলিয়ানের জীবনে তার স্থান হল অন্য নারীর। এবং যদিও তাদের সম্পর্কের গোড়ার দিকে এই ব্যাপারটা তার ভীষণ পরিশীলিত মনে হয়েছিল, আসলে এই ভূমিকাই তাকে জীবনটা এগিয়ে নিয়ে যেতে দিচ্ছিল না। যে মানুষটিকে সে ভালবাসত, তার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে জীবনটা ভোগ করার আনন্দ সে নিজেকে পেতে দেয়নি। সন্তানের সম্বন্ধে ভাবার সম্ভাবনাও অস্বীকার করেছিল। কিন্তু নবীন সেটা বদলে দিয়েছে। তারা দু'জনেই হেমার বয়স সম্বন্ধে সচেতন। এবং নবীন তাকে জানিয়েছে যে, তাদের বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে সন্তানের জন্য চেষ্টা শুরু করতে চায়।

একদিন, দুপুরে খাওয়ার পর, চনমনে বোধ করছিল বলে, হেমা হেঁটে হেঁটে পিয়াৎজা দেল পোপোলো (Piazza del Popolo) পর্যন্ত গেল। তারপর আর-একবার ভিলা গুইলায় গেল। মিউজিয়ামে প্রাচীন কাপ এবং চামচগুলো আরও একবার তার মনকে নাড়া দিল। একসময় সেগুলো অন্য কোনও মানুষের ঠোঁট স্পর্শ করেছিল। এখনও একই রকম আছে। যে ব্রোচ তাদের জামাকাপড় আটকে রাখতে সাহায্য করেছিল, যে সরু দণ্ডগুলো দিয়ে তারা নিজেদের গায়ে সুবাস ছড়িয়েছিল। কিন্তু সেদিন, একটা কাচের বাক্সে এক বর-বধূর বিশাল শবাধার দেখে হেমার চোখে জল এসে গেল। সে নবীনের কথা না ভেবে পারল না। কারুকার্যখচিত শবাধারের ঢাকার ওপর বসা সেই হাস্যমুখ, স্নেহময় দম্পতির মতো, তার আসন্ন বিবাহতেও কিছু যেন মারা গিয়েছে। এবং যদিও সে জানে যে, আগামী বছরগুলোয় সেই বিবাহে নতুন প্রাণ আসার সব সম্ভাবনাই আছে, তবুও, বাড়ি ফেরার পথে, সন্ধের হলুদ আলোয়, শুধু তার আসন্ন বিবাহিত জীবনের সেই নিষ্প্রাণ দিকটির কথাই তার মনে হতে লাগল। সে ভিয়া দেই জুব্বোনারি-র (Via dei Giubbonari) একটি আলিমেন্টারি-তে (alimentari) রাতের খাবার কিনল। তার হাতে এখন লেটুস পাতার ব্যাগ, স্প্যাঘেতির ব্যাগ এবং সস তৈরি করার জন্য মাশরুম ও ক্রিম। সে জিওভানার বিল্ডিং-এর লোহার পেরেক লাগানো দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। টিকিট বুথের মতো একটা জানলায় দু'-একজন পোর্টার রোজ তাকে বাইরে বেরোনোর এবং ভিতরে ঢোকার সময় স্বাগতসম্ভাষণ করে, সেই জানলাটার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। উঠোনে একটা পাথরের সিংহ অবিরত মুখ থেকে জল ঢেলে যায়। তারপর পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। সিঁড়িতে আলো নেই। হেমার ক্লান্ত পায়ের তলায়

AMARBOI.COM

সেগুলো অনড় হয়ে পড়ে থাকে। চওড়া তিন সার সিঁড়ি দশ সার মনে হয়।

জিওভানার লম্বা হলওয়েতে হেমা দেখতে পেল, আনসারিং মেশিনটা দপদপ করছে। সে টেপটা চালিয়ে দিল। নবীনের গলা নয়, জিওভানার এক বন্ধুর গলা শোনা গেল। সাধারণত এই বন্ধুরা ইতালিয়ান ভাষায় বার্তা রেখে দেয়, যা জিওভানা বার্লিন থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু এই বার্তাটি হেমার জন্য, ইংরেজিতে রাখা হয়েছিল। এডো নামে একজন ফোন করেছিল, যার নাম হেমা জিওভানার রেখে যাওয়া তালিকা থেকে চিনতে পারল। এডো বলছিল যে, সে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করছে হেমা কবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সব ঠিক আছে তো? তার গলা শুনে দয়ালু মনে হল। এবং তার কথায় এতটাই উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছিল যে, হেমা তাকে পালটা ফোন করল। এডোকে আশ্বাস দিল যে, সব ঠিক আছে। এবং তার কাছে অন্য কোনও অজুহাত ছিল না বলে, পরের রবিবার এডো এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

এডোর স্ত্রী পাওলা *L' Espresso* (লেসপ্রেসো)-তে চিত্রসম্পাদক, কিন্তু কৌশিকের সঙ্গে তার আলাপ নেতান্যা-তে (Netanya) । ইজরাইলের উপকূলে নেতান্যা একটি রিসর্ট শহর। সেখানে একটি হোটেলে বাসিন্দারা যখন পাসওভার খাবার খেতে বসতে যাচ্ছিল, তখনই হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হল-এ বোমা পড়ে। পাওলা এবং কৌশিক দু'জনেই ঘটনাটির ছবি তুলতে গিয়েছিল। কৌশিক ইতালিতে খুব কমই কাজ করে। ব্রেশায় (Brescia) সেনেগালের অভিবাসীদের নিয়ে একটা ফোটো-এসে (photo essay) অথবা কলোসিয়ামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া উনিশটি বাক্স, যাতে ইরাকি সৈন্যদের দেহ ছিল, তার ছবি। গত পাঁচ বছরের বেশিরভাগ সময়েই, কৌশিকের কাছে রোম শুধু এমন একটা শহর, যেখান থেকে সে তার গন্তব্যস্থলে রওনা দিত। তার পকেট-ক্যালেন্ডারের প্রতিটিতে তিনশো পঁয়ষট্টিটি আকাশি-নীল পাতা আছে। সেই পাতাগুলো উলটে দেখলে এবং দিন গুনলে কৌশিক নিশ্চিত হয়ে বলতে পারত যে, তার বেশিরভাগ দিনই গাজায় এবং ওয়েস্ট ব্যাংকে ছবি তুলে কেটেছে।

কৌশিকের চিত্র-সাংবাদিক জীবনের শুরু হয়েছিল প্রায় কুড়ি বছর আগে। ১৯৮৭ সালে সে লাতিন আমেরিকায় ঘুরছিল। কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার

AMARBOI.COM

পর বাবা তাকে যে টাকাটা দিয়েছিলেন, সেই টাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বন্ধু ডগলাসের সঙ্গে টিউয়ানা থেকে শুরু করে তাদের প্যাটাগোনিয়া পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। গুয়াতেমালা এবং এল সালভাডরের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণের দিকে এগোতে এগোতে তারা মেক্সিকোয় কয়েক মাস কাটায়। এবং সেখানেই ডগলাস ঠিক করে যে, সে মধ্য আমেরিকা যথেষ্ট ঘুরে নিয়েছে, স্পষ্টতই আমেরিকান দেখতে হওয়ার জন্য যথেষ্ট ঝামেলা ভোগ করেছে, এবং সে মাদ্রিদের টিকিট কাটে। মেক্সিকান এবং গুয়াতেমালানদের মতো, সালভাডোরানরাও বুঝতে পারেনি, কৌশিককে কোন গোষ্ঠীতে ফেলবে। যে সৈনিকরা প্রায় তাদের দেহের সমান বড় বন্দুক নিয়ে রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ায়, তারাও না, এবং তার ক্যামেরা দেখলে যে ছেলেমেয়েরা সাগ্রহে ছবি তোলার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ত, তারাও না। কৌশিক একাই দেশটা ঘুরে দেখতে শুরু করল। সে গাইডবইয়ে পড়েছিল দেশটা নাকি ম্যাসাচুসেটসের চেয়েও ছোট। রাজধানীর পশ্চিমে আগ্নেয়গিরির ফোটো তুলল, বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া এবং সে বছরের ভূমিকম্পে চিড় খেয়ে আধখানা হয়ে যাওয়া বিল্ডিং-এর ফোটো তুলল।

কৌশিক আগে কখনও এমন জায়গায় যায়নি, যে জায়গায় অত প্রত্যক্ষভাবে গৃহযুদ্ধ চলছে। সে গুয়াতেমালায় গিয়ে বুঝেছিল যে, গেরিলারা সেখানে সক্রিয়। অন্যান্য অভিযাত্রীদের কথায় বুঝেছিল, দেশের কয়েকটা অংশ এড়িয়ে চলতে হবে। সে এবং ডগলাস টিকালে যাওয়ার জন্য একটি বাসে সারারাতব্যাপী সফর করছিল। বাসটি থামিয়ে তাদের এবং বাকি প্যাসেঞ্জারদের নেমে তাদের পাসপোর্ট দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। একদল মাতাল চেকপয়েন্ট গার্ড তাদের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলছিল। একজন গার্ড ডগলাসের মানিব্যাগ দেখতে চেয়েছিল, তারপর টাকাটা হস্তগত করে ব্যাগটা ডগলাসের মুখে ছুড়ে মারে। গুয়াতেমালায় সেটাই ছিল সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা। কিন্তু এল সালভাডোরে পরিস্থিতি আরও হিংস্র, আরও ভয়াবহ। পর্যটকও কম দেখা যাচ্ছিল। সান্টা আনায় কৌশিক এস্পেন নামে এক ডাচ সাংবাদিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে যাত্রা শুরু করল। সংঘর্ষের ইতিহাস মন দিয়ে শুনল। এস্পেন তাকে ডেথ স্কোয়াড-এর গল্প, হাইওয়েতে পড়ে থাকা শিরশ্ছেদ করা দেহ, গাছ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া কিশোর-কিশোরীদের দেহ তাদের আঙুলের নখ নেই এবং বুড়ো আঙুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহের পিছনে বাঁধা— সেই সব গল্প শোনাল। এম্পেনের সঙ্গে কৌশিক দেখেছিল, এয়ার ফোর্স প্লেন রাতে এফ এম এল এন অঞ্চলের ওপর বোমা ফেলছে। এম্পেনের সঙ্গে হন্ডুরাস-এর সীমান্তে এক রিফিউজি ক্যাম্পে গেল। সে জায়গাটার এবং সেখানকার মানুষদের আতঙ্ক নিজে উপলব্ধি করল। মেশিনগানের আওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে গেল, বাকি সকলের মতো সেও মেনে নিল যে, সে যে-কোনও মুহূর্তে, যে-কোনও পরিস্থিতিতে, রাস্তা পার হতে গিয়ে অথবা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায়, মরে যেতে পারে। কিন্তু সেই সময় কখনওই, কৌশিকের নিজের জন্য ভয় হয়নি।

এক দুপুরে, মোরাজানের বাইরে এক গ্রামে এম্পেনের সঙ্গে বসে দুপুরের খাবার খেতে খেতে, টেবিলটা কাঁপতে শুরু করল। গাঢ় রঙের স্টু বাটি থেকে উপচে পড়ে গেল। ততদিনে কৌশিক ভূকম্পনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, প্রকৃতির হিংস্রতা এক মুহূর্তের বিরতি দিল। তারা চামচ উঠিয়ে আবার খেতে শুরু করল। কিন্তু তারপর লোকজনের ডাকাডাকি শুরু হল। অনেক মানুষ তাদের পাশ দিয়ে, ছোট খোলা চত্বরের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। কৌশিক এবং এম্পেন লাফিয়ে উঠে তাদের পিছন পিছন ছুটল, ভাবল বোধহয় কোনও বিল্ডিং ধসে গিয়েছে, কিন্তু কম্পনের সঙ্গে গোলমালের কোনও সম্পর্ক ছিল না। একটা বাঁক ঘুরে তারা দেখতে পেল, একজন অল্পবয়সি ছেলে রাস্তায় পড়ে আছে। তার মাথায় গুলি মারা হয়েছিল। ধীরে ধীরে প্রশস্ত হওয়া কোনও নদীর মতো, রক্ত তার মাথা থেকে বয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কৌশিকের মনে আছে, এক ফোঁটা রক্ত বা এমনকী ধুলোর এক কণাও ছেলেটার তামাটে রঙের শার্ট বা প্যান্টে লাগেনি। ছেলেটা ফুটপাথের ওপর কুঁকড়ে শুয়ে ছিল, চোখ দুটো বোজা, যেন ঘুমোচ্ছে। গলা থেকে খুব ক্ষীণ একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল। কবজিতে একটা সস্তার সোনালি ঘড়ি সময় দেখাচ্ছিল।

দেহটা ঘিরে একদল লোক জড়ো হল। ডাক্তারের খোঁজ পড়ল। গোলাপি হাতকাটা ব্লাউজ পরা একজন অল্পবয়সি মেয়ে, স্ত্রী বা প্রেমিকা, মাটিতে বসে, হাত মুঠো করে মুখে গুঁজে কাঁদছিল। যথারীতি কৌশিকের ক্যামেরা তার কাঁধেই ঝুলছিল। এম্পেন তাকে একটা ফোটো তুলতে বলল। সঙ্গে লম্বা লেন্স ছিল না বলে কৌশিককে দেহটার কাছে যেতে হল। প্রতি পদক্ষেপে সে ধরে নিচ্ছিল ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ তাকে আটকাবে, শাপশাপান্ত

AMARBOI.COM

করবে, তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু কেউ তার দিকে কোনও মনোযোগ দিল না। তাই সে এগিয়ে গিয়ে ক্যামেরাটা মুখের সামনে তুলল। সেই দুপুরের কথা মনে করলে, কৌশিকের মনে পড়ে যে, তার হাত কাঁপছিল, কিন্তু তা ছাড়া পরিস্থিতিটা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। একবার ক্যামেরায় চোখ লাগানোর পর তার আর কোনও হেলদোল হয়নি। রোল শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ফোটো তুলেছিল। যখন তার ফোটো তোলা শেষ হল, তখন ডাক্তারের খোঁজও শেষ হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা মারা গিয়েছিল।

কৌশিকই একমাত্র মানুষ, যে ঘটনাটা নথিবদ্ধ করেছিল। এবং যদিও সে ছেলেটিকে প্রাণে বাঁচায়নি, তবুও তার মনে হয়েছিল যে, সে কোনও কাজে লেগেছে। সচেতন ছিল যে, সেই অপরাধ প্রশমিত করতে সে খানিকটা সাহায্য করেছে। তাও, এম্পেন সঠিক লোকের কাছে ফোটোগুলো পাঠানো পর্যন্ত তার কখনও বিশ্বাস হয়নি যে, সেগুলো প্রকাশিত হবে। এক সপ্তাহ পর, একটা ফোটো অ্যামস্টারড্যাম থেকে প্রকাশিত একটি ক্যাথলিক খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। তখন কৌশিক একটি ছোট অঙ্কের চেক পেয়েছিল। তারপর, ফোটোটা একটা ইউরোপিয়ান সংবাদপত্র নিয়ে নেওয়ার পর, তাকে আরও মোটা অঙ্কের চেক দেওয়া হয়। এই সেভাবেই কৌশিক ফোটো তুলে জীবিকা উপার্জন করতে শুরু করে। প্রথমদিকে সে শুধু খবরের পিছন পিছন যেত, এম্পেনের কাছাকাছি থাকত। নির্বাচনের সময়, পরিবহন ধর্মঘট চলাকালীন, ছ'জন ইহুদি পুরোহিত এবং তাদের হাউসকিপারদের হত্যার সময় এল সালভাডোরে থেকেছিল। যে দেহগুলোর ছবি তুলত, সেগুলোর মুখ থেঁতলানো, গলা কাটা, পায়ের মধ্যে থেকে পুরুষাঙ্গ কুপিয়ে কাটা। ফোটোগুলো মানবাধিকার সংস্থাদের হাতে তুলে দিত যাতে আত্মীয়স্বজনরা নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের শনাক্তর চেষ্টা করতে পারে। এম্পেনের এক যোগাযোগের দৌলতে কৌশিককে এপি-তে স্বাধীন সাংবাদিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাই সে লাতিন আমেরিকাতেই থেকে গিয়েছিল। প্রথমে মেক্সিকো, তারপর বুয়েন্স এয়ারস-এ, ওয়্যার সার্ভিসেস এবং ইংরেজি খবরের কাগজের জন্য কাজ করত। তার যখন ত্রিশ বছর বয়স, তখন সে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ চাকরি পেয়েছিল। তারা তাকে আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যে পাঠায়। যেসব লাশের ফোটো সে তুলেছিল— মুখ ফুলে ঢোল, মুখের ভিতর ধুলো ভরতি, নিষ্প্রাণ চোখে মাথার ওপর ভেসে যাওয়া মেঘের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিচ্ছবি, সেইসব মৃতদেহ সে আর মনে করতে পারে না।

কাজের প্রয়োজনে তার পক্ষে স্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়েছিল। কদাচিৎ কোনও সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে বা যন্ত্রপাতি নিতে নিউ ইয়র্ক যাওয়া, এইটুকু সময়ই সে আমেরিকায় কাটাত। এবং অনেক সময়, আমেরিকায় থাকলেও, সে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করত না। একদিনের দুঃসহ সফরে সে ম্যাসাচুসেটস গিয়ে বাবার নতুন জীবন প্রত্যক্ষ করা এড়িয়ে যেত। যদিও ততদিনে তার বাবার সেই জীবন সময়ের দিক দিয়ে তাঁর পুরনো জীবনের চেয়ে কয়েক বছর অতিক্রম করে গিয়েছিল। তার বাবার বয়স এখন সত্তরের ওপরে। মোটা পেনশনের টাকায়, বেশিরভাগ সময় গলফ খেলে তাঁর দিন কাটে। ইতস্তত কয়েকটি ই-মেল থেকে কৌশিক জানতে পেরেছিল যে, রূপা, অর্থাৎ বড় মেয়েটি, পিটার নামে এক আমেরিকানকে বিয়ে করেছে এবং কলোরাডোয় একটি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আর্ট শেখায়। কৌশিককে তার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই, কাজের অজুহাতে সে এই উপলক্ষটাও এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। ছোট মেয়েটি, পিউ, টাফটস-এর মেডিকাল স্কুলে পড়ে। তা সত্ত্বেও, সেই কাজের মাধ্যমেই, কৌশিক বারবার তার বাবার দরজায় ফিরে আসত। বাবা যে সাময়িকপত্রগুলো পড়তেন, তার একটিতে কৌশিকের তোলা ফোটো তার নামসহ ছাপা হত। জানা যেত যে, সে বেঁচে আছে, কোথায় আছে এবং কী দেখেছে।

কৌশিক ত্রাস্তিভেরে-তে (Trastavere) একটা বাসস্থান রেখেছিল। পিয়াৎজা দি সান কোসিমাতো-য় (Piazza di San Cosimato) বিস্তৃত চাতালসহ একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট, যেখানে বিভিন্ন কাজের ফাঁকে সে বিশ্রাম নিতে পারত। কৌশিকের ইতালি আসার কারণ একজন মহিলা। ফ্রাঙ্কা আসার আগে কৌশিকের ইউরোপের চেয়ে লাতিন আমেরিকাই বেশি ভাল লাগত। এবং এখনও, তার কাজ চালানোর মতো ইতালিয়ান ভাষার ফাঁকে ফাঁকে অত বছর আগে শেখা স্প্যানিশ ভাষা ঢুকে পড়ে। ফ্রাঙ্কা কৌশিককে মিলান চলে আসার জন্য রাজি করিয়েছিল। সে একটি মাঝামাঝি অভিজাত ধরনের বংশের মেয়ে। যখন প্রথম তার কৌশিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার পানপাতার মতো মুখ এবং গভীর ধূসর চোখ এমন এক পরিশীলিত চরিত্রের কথা বলত, যা ফ্রাঙ্কা লুকোতে পারেনি। তখন সে

AMARBOI.COM

ক্যামেরুনে এক ত্রাণ সংস্থার জন্য কাজ করছিল। বছরের পর বছর কৌশিক পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কারও সঙ্গে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ বন্ধনে কখনও আটকে পড়েনি। তারপর একদিন হঠাৎ সে এবং ফ্রাঙ্কা একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে শুরু করল। রবিবার পোলেন্টা এবং খরগোশের ঝলসানো মাংস খাওয়ার জন্য গাড়ি চালিয়ে বের্গামোয় (Bergamo) ফ্রাঙ্কার ননা'র বাড়িতে যেত। জানত যে, ফ্রাঙ্কার দিদিমা, যিনি বছরের পর বছর ফ্রাঙ্কার জন্য বিয়ের রাত্রিবেশ এবং শয্যা-জ্যাকেট হাতে সেলাই করে এবং এমব্রয়ডারি করে কাটিয়েছেন, তিনি কৌশিককে পছন্দ করতেন। সম্পর্কটা শেষ হয়েছিল তিক্ততার মধ্যে। যদিও সেই সময় কৌশিক কিছুতেই ফ্রাঙ্কাকে বিয়ের প্রস্তাব না দেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে বের করতে পারেনি, তবুও, সে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটা দিতেও পারেনি। ফ্রাঙ্কা কৌশিকের হৃদয়ে নিজের জায়গা করে নিতে পারেনি। এখন কৌশিক বুঝতে পারে যে, সমস্যা ছিল সেইখানেই। আর তাই কৌশিক ক্রোধ এবং চোখের জল মিলানে ফেলে রেখে রোমের প্রথম ট্রেনে উঠে বসেছিল। প্রথমে সে ভেবেছিল, রোমে এক সপ্তাহ থাকবে, শহরটা একটু ঘুরে দেখবে, তারপর বুয়েন্স এয়ারেস-এ ফিরে যাবে। কিন্তু সেকেন্ড ইন্টিফাডা তাকে আবার মধ্য প্রাচ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তাই কৌশিক ইউরোপেই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ফ্রাঙ্কাকে একবারও জানায়নি যে, সে তার দেশেই আছে। একবারও ফ্রাঙ্কার সঙ্গে দেখা হয়নি তার।

এর আগে একবারই কৌশিক রোমে এসেছিল, মা-বাবার সঙ্গে ম্যাসাচুসেটস যাওয়ার পথে। বলা বাহুল্য, তার মনে রোমের যা স্মৃতি ছিল, সবই সে সময়ের। তার মা তখন মৃত্যুপথগামী। কিন্তু সেই সময়, রোগা হয়ে যাওয়া ছাড়া, তাঁর চেহারায় অসুখের আর কোনও চিহ্ন ছিল না। তিনি সদা চল্লিশ পেরিয়ে ছিলেন। পরের জন্মদিনে কৌশিকেরও একই বয়স হবে। এখনও কৌশিকের মনে আছে, তাঁরা যে হোটেলে থেকে ছিলেন, সেই হোটেলটার চেহারা, যে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে তাঁরা ব্রেকফাস্ট রুমে যেতেন, প্যানথিয়ন-এর গম্বুজের মধ্যে দিয়ে যে উজ্জ্বল আলোর কিরণ এসে পড়ত, মা যখন মেনু দেখতেন, তখন বেয়ারারা যে প্রশংস দৃষ্টি লুকোতে পারত না, তা কৌশিকের মনে আছে। মনে আছে জেনিকুলাম (Janiculum)-এর পাশ দিয়ে হাঁটার সময় ঝাঁকে ঝাঁকে চড়াইপাখি দেখেছিল। যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশের ওপরে বিশাল কোনও বুড়ো আঙুলের ছাপ টানা হয়েছে। এবং কৌশিক তীর্থযাত্রীর মতো আবার সেই সব জায়গায় ফিরে গিয়েছিল। মনে ছিল যে, হোটেলটা স্প্যানিশ স্টেপ্স-এর কাছে। কোনওমতে সেটা খুঁজে বার করেছিল।

গত বছর তার বাবা এবং চিত্রা রোমে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কলকাতায় যাওয়ার পথে রোমে চারদিন কাটিয়েছিলেন। কৌশিক কর্তব্য পালন করার মতো তাঁদের জন্য হোটেল দি ইনগিলতেরা-য় (Hotel d' Inghilterra) একটা ঘর সংরক্ষণ করেছিল এবং তাঁদের সব জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। কলোসিয়াম দেখার জন্য তাঁদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে ফোরাম-এর ভিতর দিয়ে হেঁটেছিল। তাঁদের ফোটো তুলেছিল। এবং অন্য যে-কোনও কাজের মতোই, তাঁরা চলে যাওয়ার আগে ফিল্মের রোলটা বাবার হাতে তুলে দিয়েছিল। ইতালিয়ান কফির স্বাদ চিত্রার পছন্দ নয় বলে প্রতিটি রেস্তোরাঁ এবং ক্যাফেতে তাঁর জন্য দুধ দেওয়া চায়ের অর্ডার দিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা জায়গাটায় কোনও ছাপ ফেলতে পারেননি। এবং সে কখনও রোমের রাস্তায় তাঁদের কথা ভাবত না, যেমন করে সে এখনও, বারবার মায়ের কথা ভাবে।

বাবা এবং চিত্রার সঙ্গে সেই দিনগুলোতেই, একটা আলপিনের মাথার চেয়েও ছোট ক্ষীণ, ধূসর বিন্দু কৌশিকের বাঁ চোখের সামনে ভাসতে শুরু করেছিল। বাবা কিটস-এর সমাধি দেখতে চেয়েছিলেন বলে যে দুপুরে তাঁরা তেস্তাচো (Testaccio) গিয়েছিলেন, সেদিনই প্রথম কৌশিক ছোট কণাটা লক্ষ করেছিল। প্রোটেস্টান্ট সিমেট্রি-র সবুজঘন জমিতে, কৌশিক ভেবেছিল যে, কোনও ডাঁশমাছি বোধহয় তার মাথার চারপাশে উড়ছে। সে বারবার হাত নাড়িয়ে সেটা তাড়ানোর চেষ্টা করছিল, আঙুল দিয়ে টুসকি মেরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে যেখানেই যাচ্ছিল, দাগটা তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। শান্তভাবে তাকে উত্ত্যক্ত করতে থাকল। তখনই কৌশিক বুঝতে পারল যে, দাগটা তার মধ্যেই আছে, সেটাকে সরানো বা থামানো যাবে না। একজন চোখের ডাক্তার তাকে বুঝিয়েছিলেন যে, তার চোখের দেওয়াল থেকে ভিট্রাস জেল দলা পাকিয়ে টান দিচ্ছে বলেই এমন হচ্ছে। বলেছিলেন যে, এটা বয়স বাড়ার এক নির্দোষ চিহ্ন। কৌশিককে বলা হয়েছিল যে, সে দাগটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এবং সে অভ্যস্ত হয়েও

AMARBOI.COM

গিয়েছিল। আজকাল, কোনও উজ্জ্বল সাদা দেওয়ালের ঘরে না থাকলে বা সানগ্লাস ছাড়া বাইরে না-বেরোলে দাগটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার গাড়ি চালানো বা ছবি তোলার ওপরও কোনও প্রভাব পড়েনি। কিন্তু তবুও মনে হত যেন, তার শরীরের এক অংশে, বেশ মূল্যবান দৈহিক অনুভূতিতে অনধিকারপ্রবেশ ঘটেছে। দাগটা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাও করছিল, আবার তার সঙ্গও ছাড়ছিল না।

রবিবার, কৌশিক তার ফিয়াটে চেপে, শহরের দক্ষিণে শহরতলিতে, এডো এবং পাওলার বাড়ি রওনা দিল। শহর ছেড়ে, যে রাস্তাগুলোয় এখন সে অনায়াসেই ঘোরাফেরা করতে পারে, সেই রাস্তাগুলো ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ, সে চলে যাচ্ছিল। নতুন বছরে সে আর এখানে থাকবে না। হংকং-এ একটি আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ খালি ছিল, কৌশিক পদটি গ্রহণ করেছিল। কয়েকবার টোকিয়োয় যাওয়া ছাড়া, কৌশিক পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। জীবনে প্রথমবার তার এমন একটা চাকরি হবে, যে জন্য রোজ ঘুম থেকে উঠে তাকে একই জায়গায় যেতে হবে। এই প্রথম তার একটা অফিস হবে। একটা ডেস্ক থাকবে, তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করার জন্য, তার জন্য আসা ফোনকলের উত্তর দেওয়ার জন্য একজন সহকারী থাকবে। এতদিন, সে যতক্ষণ না কিছুর পিছনে ছুটতে শুরু করত, ততক্ষণ সে তার জন্য প্রস্তুত থাকত না। এবার সে প্রতিদিনের আসন্ন ঘটনার জন্য আর অপ্রস্তুত থাকবে না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, তার বাবা কয়েক দশক ধরে যে চাকরি-জীবন যাপন করেছিলেন, কৌশিক এবার তার স্বাদ পাবে। তার মনে হচ্ছিল যে, তার খুব খারাপ লাগবে। পাওলা তাকে বলেছিল, সে ভুল করছে। সাবধান করেছিল, এ ধরনের চাকরি একজন ফোটোগ্রাফারের মৃত্যুর সমান। সম্পাদক হওয়ার পর থেকে সে নিজে একটাও ভাল ফোটো তোলেনি। এখনকার চেয়ে বেশি টাকাপয়সা পাওয়া যাবে, সেই ভেবে কৌশিক আকৃষ্ট হয়নি। অন্য এক জীবনযাপন করার প্রয়োজন তাকে এশিয়ায় নিয়ে যাচ্ছিল। অন্তত পরবর্তী কয়েক বছরের জন্য যে সে এক জায়গায় থাকতে পারবে, সেই প্রতিশ্রুতি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

তার হংকং যাওয়ার খরচ কোম্পানিই দিচ্ছিল, কিন্তু ফিয়াটটা ছাড়া

AMARBOI.COM

কৌশিকের মালপত্র বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। ফ্ল্যাটটাও সে ইতিমধ্যেই এক বন্ধুকে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। যে দু'বার সে তার মা-বাবার সঙ্গে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় থাকতে গিয়েছে, ছেলেবেলার সেই দুটি বিপুল ওলট-পালটের তুলনায় হংকং যাওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। প্রথমে আমেরিকা ছেড়ে যাওয়া, তারপর সাত বছর পর ফিরে আসা। যে আসবাব এবং পেন্টিং এবং টি-সেট ছাড়া তার মায়ের মনে হত তিনি থাকতে পারবেন না, সেগুলো দু'বারই, আস্তে আস্তে, মালবাহী জাহাজে চড়ে তাঁদের পিছন পিছন এসেছিল। মা জীবনে একাধিকবার সংসার পেতেছিলেন। তিনি পৃথিবীর কোথায় আছেন, বা তিনি মৃত্যুর দোরগোড়ায় বসে আছেন কি না, তাতে কিছু এসে যেত না। তিনি সবসময় তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর ঘর-সংসার সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করতেন। সবসময় তাঁর জিনিসপত্র, বাড়ির দেওয়াল প্রভৃতি সাজানো থেকেও, বাঁচার শক্তি অর্জন করতেন। কিন্তু কৌশিক যে-যে জায়গায় থেকেছে, তার কোনওটার ওপরই কখনও পুরোপুরি ভরসা করেনি। কখনও আশ্রয়ের জন্য সেই জায়গাগুলোয় ফিরে যায়নি। এখন উপলব্ধি করতে পারে যে, ছেলেবেলা থেকেই, সে বাইরে থাকতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। জীবনের ব্যক্তিগত জঞ্জালের থেকে দূরে। ফোটোগ্রাফার হিসেবে প্রথমে সেটাই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে যে, এই কাজটার জন্য সে বাড়ির বাইরে আসতে পেরেছে। কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, তার জন্মস্থানের সর্বপ্রথম স্মৃতি, সবই বাড়ির বাইরের। ফরসাইথিয়া দিয়ে আচ্ছাদিত একটা চেন-লিঙ্ক বেড়া। একটা ফুটপাথে হেরিংবোনের নকশা করে পাতা ইট। সে প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে আর মা তার নাম ধরে ডাকছেন।

প্রতিবার রিফিউজি ক্যাম্পে গেলেই, অথবা কোনও পরিবারকে ধুলোবালির মধ্যে তাদের জিনিসপত্র খুঁজতে দেখলেই তার সেই সপরিবারে নতুন জায়গায় থাকতে যাওয়ার কথা মনে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত, এটাই তো জীবন— কয়েকটা থালা, একটা প্রিয় চিরুনি, একজোড়া চটি, একটা বাচ্চার পুঁতির মালা। সে বিশ্বাস করতে চায় যে, সে এরকম নয়। দশ মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গার উদ্দেশে সে বেরিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সে এটাও জানে যে, যেখানেই যাক না কেন, সে-জায়গার প্রতি একেবারে কোনও টান অনুভব না করা অসম্ভব। সে ত্রাস্তিভেরের কাবার্ডের ছোট, রঙিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াইন গ্লাসগুলোর অভাববোধ করবে। দুপুরবেলা তার বিছানায় রোদের যে ক্রমশ ছোট হতে থাকা অসমান্তরাল চৌকো রেখা এসে পড়ে, তার কথা মনে পড়বে। এবং সে জানে যে, তার নিজস্ব ধরনে, সে এবং তার ক্যামেরা এই বস্তুগত পৃথিবীটার ওপর নির্ভরশীল সে এই জগৎটা থেকেই চুরি করে, এই জগৎটা থেকেই সঞ্চয় করে, সেটাই ছাড়তে চায় না। এশিয়ায় যাওয়ার কথা পাকা হয়ে গিয়েছে। তার বাড়িওয়ালা, কোণের জেলাটেরিয়া-র মালিক, নতুন ভাড়াটে খুঁজে নিয়েছে। এবং গতকালই সে টিকিট কেটে ফেলেছে। হংকং যাওয়ার আগে, পথে থাইল্যান্ডে নেমে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহটা কাটিয়ে যাবে ঠিক করেছে।

এডো রান্না করতে ভালবাসে বিশেষত, তাঁর বাসভূমি ক্রেমোনার রান্না। কৌশিক ভেবেছিল যে, এবারও ব্যাপারটা— এডো এবং পাওলার আয়োজিত অন্যান্য সমাবেশের মতোই হবে, অর্থাৎ সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার এবং অধ্যয়ন সম্পর্কিত লোকজনের একটা আন্তর্জাতিক দল। যেখানে টেবিলে সবসময় তিন থেকে চারটে ভাষায় কথা বলা হয়। পাওলা বলেছিল যে, আজ একজন আমেরিকান ঔপন্যাসিক আসছে। থ্যাঙ্কসগিভিং-এর জন্য মনখারাপ লাগছে বলে একটা আপেলের পাই আনছে। একজন সুপণ্ডিত ভারতীয় মহিলাও থাকবে, পাওলা বলেছিল— সে এডোর এক বন্ধুর বন্ধু। কৌশিক কল্পনা করে নিয়েছিল, মধ্যবয়স্ক, চশমা এবং শাড়ি পরা কেউ, এডোর মতোই এক প্রত্নতত্ত্ববিদ। ভারতের সঙ্গে কৌশিকের প্রায় কোনও সম্পর্কই নেই। মা মারা যাওয়ার পর সে ভারতে আর যায়নি। কাজের সূত্রেও যেতে হয়নি। ফোটোগ্রাফার হিসেবে তার জন্মভূমি ছিল অপ্রাসঙ্গিক। অথচ গোটা ইউরোপে এবং রোমে, তাকে সবসময় এক ভারতীয় হিসেবে বিবেচনা করা হত।

এডো এবং পাওলার বাড়ি থেকে কয়েক ব্লক দূরে সে গাড়িটা রেখে নেমে পড়ল। পাড়াটা নিজস্ব ধরনে চমৎকার। সাইপ্রেসের সারি-বাঁধা চওড়া রাজপথ, কংক্রিটের যুদ্ধোত্তর বিল্ডিং-এ কাচের প্রবেশদ্বার এবং একের ওপর এক বাইরে বেরিয়ে আসা বারান্দা। ইতালি ছাড়ার আগে সে হয়তো আর কখনও এখানে আসবে না উপলব্ধি করে ইচ্ছে হল একটা ছবি তুলে রাখে। কিন্তু ক্যামেরাটা সে বাড়িতেই ফেলে এসেছিল। পাওলা এবং এডো একটা উঁচু বাড়িতে থাকে, খোলামেলা অ্যাপার্টমেন্টটা থেকে একটা পার্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যায়। তাদের বাড়ির রাস্তায় ঢুকে, কৌশিক দেখল একজন মহিলা ফুটপাথের ওপর, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে একটা ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছে। লম্বা চুলে তার মুখ ঢাকা। *"Signorina, dove deve andare?"* কৌশিক জিজ্ঞেস করল।

মহিলাটি মুখ তুলে তাকাল। ঠিক বুঝতে পারল না। এবং কৌশিক বুঝতে পারল যে, মহিলাটির কালো চুল এবং চামড়ার মানানসই কোট সত্ত্বেও সে ইতালিয়ান নয়, ভারতীয়। এবং তাকে অত ভদ্রভাবে সম্বোধন করার প্রয়োজন ছিল না। মহিলাটি কৌশিকের পরিচিত।

... ...

যে মুহূর্তে তারা একসঙ্গে পাওলা এবং এডোর বাড়িতে পৌঁছোল, সেই মুহূর্ত থেকেই অন্যান্য অতিথিরা ধরে নিয়েছিল যে, তারা পুরনো বন্ধু। একজন তো ভেবেছিলেন, তারা প্রেমিক-প্রেমিকা। জিজ্ঞেস করলেন তারা কতদিন একসঙ্গে আছে, কীভাবে তাদের দেখা হয়েছিল। 'আমাদের মা-বাবার মাধ্যমে,' কৌশিক হালকাভাবে বলল। কিন্তু সেই সাধারণ কথা শুনে হেমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে মনখারাপ হয়ে গেল। সে লক্ষ করল, কৌশিক সেই অতিথিটির ভুল ধারণা সংশোধন করে দেয়নি। লাঞ্চের সময় টেবিলের উলটো দিক থেকে কৌশিক কীভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তাও লক্ষ করল, যেন এত দেরিতে হেমার মধ্যে এই আকর্ষণ খুঁজে পেয়ে বিস্মিত। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, তার চোখে কৌশিককে একই রকম দেখাচ্ছিল। সেই যে তীক্ষ্ণ চেহারার ছেলেটা অনিচ্ছাসহকারে হেমার মা-বাবার বাড়িতে এসেছিল, শুধু কৌশিকের চোখ দুটো দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। চোখের চারপাশের চামড়া কালো হয়ে গিয়েছিল আঘাতের ক্ষীণ চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। পরনে ইতালিয়ানদের মতো পোশাক, জিনস, পাতলা কালো পুলোভার এবং ভেলক্রোর স্ট্র্যাপ লাগানো বাদামি-সাদা স্নিকার্স। প্রথম দেখায় কৌশিক তার মনে যে ছাপ ফেলেছিল তা আজও হেমার মনে আছে। জ্যাকেট আর টাই পরা একজন শান্ত কিশোর। হেমার মায়ের দেওয়া খাবার খেতে আপত্তি করত। সে রাতে হেমা যে অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করেছিল, তাও তার মনে আছে। তখন তার তেরো বছর বয়স। যে কয়েক সপ্তাহ তারা একসঙ্গে থেকেছিল, হেমা গোপনে সেই আকর্ষণ

AMARBOI.COM

নিজের মনে পালন করেছিল। আজ মনে হচ্ছিল যেন, মাঝখানে কোনও সময়ই কাটেনি।

লাঞ্চের পর কৌশিক হেমাকে নিমন্ত্রণ করে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেল। একটা শান্ত পাড়ায়, যেখানে কমলা-লাল রঙের বাড়ির মাঝখানে কাচা জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া হয় এবং রাস্তায় বুড়ো লোকেরা ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসে থাকে, সেখানে সে থাকে। কৌশিক যখন দরজার হুড়কো খুলছিল এবং হেমা তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, লোকগুলো নীরবে তাদের দেখল। তারা যে এক্ষুনি আলাদা হয়ে যাবে না, তাই নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। যদিও কয়েক দশক তারা পরস্পরকে দেখেনি বা পরস্পরের কথা ভাবেনি, এবং পরস্পরকে খোঁজেওনি, তবুও, আজ যে তারা দু'জনেই আচমকা অমূল্য কিছু খুঁজে পেয়েছে, নবোদ্ভিন্ন এক সম্পর্ক— যাকে উপেক্ষা করা যায় না, যা তাদের সবটুকু মনোযোগ দাবি করছিল, তাই নিয়েও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। এই বিল্ডিংটার সঙ্গে জিওভানার বিল্ডিং-এর কোনও মিল নেই। দরজাটা সহজেই নজর এড়িয়ে যায়, একটা ঢাকা সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি কৌশিকের ছোট জগতে পৌঁছে যাওয়া যায়। অ্যাপার্টমেন্টটায় একটা ঘর, একটা বাথরুম আর-একটা টু-বার্নার স্টোভ আছে। আশপাশের ছাদগুলো এবং চকের ওপর গির্জার প্রায়-রোমান বেল-টাওয়ার দেখাতে কৌশিক হেমাকে চাতালে নিয়ে গেল। "তুমি ওদিকে থাকো," কৌশিক আলতোভাবে হেমার কাঁধে হাত রেখে তাকে সঠিক দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দিল। হেমাকে বলল, সে সম্প্রতি রোমে ফিরেছে, এক সপ্তাহ আগে সে রামাল্লায় ছিল। আরাফাতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ফোটো তুলছিল। বিশ হাজার লোক এসেছিল সেখানে। দেওয়ালের ওপর উঠেছিল, কাঁটাতার ছিঁড়ে ফেলেছিল তারা শুধু একবার কফিনটা দেখবে বলে।

চাতালে দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতেই সন্ধে হয়ে গেল। হেমা কৌশিককে নিজের কলেজ এবং গ্র্যাজুয়েট স্কুলের কথা বলল। জানতে পারল যে, ব্রিন মার-এ তার প্রথম বছরে কৌশিক তার কাছাকাছিই ছিল, সোয়ার্থমোর-এ। কৌশিককে নিউ ইয়র্কে কাটানো বছরগুলো— পিএইচডি করা, ওয়েলেসলিতে কাজ করার কথা বলল। এবং যদিও সে জুলিয়ানের ব্যাপারে কোনও কথাই বলেনি— বহুদিনের সেই সম্পর্ক, যা শেষ হওয়ার পর মাঝে মাঝে হেমার মনে হত যেন তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে, তার অতীতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাবলি অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল একসময় সে কৌশিককে বলল যে, সে নবীনকে বিয়ে করতে চলেছে।

একটা ছোট, ধাতব টেবিলে বসে কৌশিক হেমার দিকে ঝুঁকে পড়ল। এডোর পাম্‌কিন তরতেল্লি (pumpkin tortelli) এবং মোস্তার্দা (mostarda) যুক্ত বোলিতো মিস্টো (bollito misto) অনেকক্ষণ আগেই হজম হয়ে গিয়েছিল। কয়েক গ্লাস পানীয়ের প্রভাবে তাদের মাথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কৌশিকের ফ্রিজে কোনও খাবার ছিল না। শুধু এক বাক্স নোনতা বিস্কুট, দুটো গ্লাস এবং এক বোতল মিনারাল ওয়াটার সে দু'জনের মাঝখানে টেবিলে এনে রেখেছিল। কৌশিক কয়েকটা সিগারেট খেল। হেমা টেবিলের ওপর হাত দুটো উপুড় করে রেখেছিল, যেন টেবিল থেকে উষ্ণতা পাওয়ার চেষ্টা করছে। কৌশিক অল্প জোরে একটা আঙুল দিয়ে হেমার হাতের সোনার চুড়িটা আঁকড়ে ধরে হাতটা নিজের দিকে টেনে আনল।

"তুমি যখন ছোট ছিলে, এটা পরে থাকতে।"

চুড়িটা হেমার দিদিমার উপহার। দশ বছর বয়স থেকে সে ওটা হাতে পরে আছে। ওটাই একমাত্র গয়না, যেটা হেমার কখনও খুলে ফেলতে ইচ্ছে করেনি। নকশাটা হেমার খুবই পছন্দের। একটা লতার চারপাশে চারটে-পাপড়িওয়ালা ছোট ছোট ফুল। তার কবজি চওড়া হয়ে যাওয়ার পরও হেমা চুড়িটা কাটিয়ে বড় করে নিয়েছিল। "তোমার মনে আছে।"

"কিন্তু আঙুলে তো এনগেজমেন্ট রিং পরোনি।"

"আমার এনগেজমেন্ট রিং নেই।"

কৌশিক চুড়িটা ধীরে ধীরে ঘোরাতে ঘোরাতে খুঁটিয়ে দেখল। "কোন ধরনের লোক এনগেজমেন্ট রিং ছাড়া বিয়ের প্রস্তাব দেয়?"

হেমা তখন বোঝাল যে, সেই অর্থে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। সে নবীনকে প্রায় চেনেই না। সে কৌশিকের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে চাতালের ওপর একটা শুকিয়ে যাওয়া গাছের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু নিজের ওপর কৌশিকের দৃষ্টি অনুভব করতে পারছিল, কৌতূহলী ভয়হীন দৃষ্টি।

"তা হলে তুমি ওকে বিয়ে করছ কেন?"

হেমা তাকে সত্যি কথাটাই বলল, যে সত্য সে আর কাউকে বলেনি। "ভেবেছিলাম, এতে হয়তো সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

কৌশিক তাকে আর কোনও প্রশ্ন করল না। হেমার আমেরিকান বন্ধুরা হয়

AMARBOI.COM

ভাবত যে, সে চরম মূর্খামির কাজ করছে, নয়তো ভাবত কাজটা রোমাঞ্চকরভাবে দুঃসাহসিক। কৌশিক তাদের মতো হেমাকে বিচারও করল না, তারিফও করল না। এবং সত্যের সেই অকপট উপস্থাপনা, হেমা যে অন্য কারও বাগদত্তা, সেই কথাটাই তাদের মধ্যের দরজাটা খুলে দিল। শুধু কৌশিকের রুক্ষ, আগ্রাসী চুম্বন, যার সঙ্গে নবীনের বালকসুলভ ব্যবহারের কোনও মিল ছিল না, সেই চুম্বনের জন্য হেমার মনে অপরাধবোধ জাগল। কিন্তু তা ছাড়া সে রাতে তারা আর যা-যা করল, সব হেমার কাছে নতুন, অজ্ঞাতপূর্ব মনে হল। কারণ, তুলনা করার মতো কিছুই ছিল না। সে এবং নবীন কখনও তেমন কিছু করেনি। নবীন কখনও তার নগ্ন দেহের দিকে তাকায়নি, কখনও তার হাত দিয়ে হেমার শরীর অন্বেষণ করেনি। কখনও তাকে বলেনি যে, সে কত সুন্দর। হেমার মনে ছিল যে, কৌশিকের মা-ই প্রথম মানুষ, যিনি তাকে সুন্দর বলেছিলেন, অন্তর্বাস কিনতে গিয়ে একটি ফিটিং রুমে দাঁড়িয়ে। এবং সে কৌশিককে সে কথা বলল। সেই প্রথম তাদের মাঝে কৌশিকের মায়ের নাম উচ্চারিত হল, কিন্তু সে জন্য তাদের মধ্যে কোনও অস্বস্তি দেখা দিল না। বরং কথাটা তাদের পরস্পরের আরও কাছে এনে দিল। কিছু না বলা সত্ত্বেও হেমা জানত যে, সে-ই কৌশিকের প্রথম শয্যাসঙ্গিনী, যে কৌশিকের মাকে চিনত, যে তাঁকে কৌশিকের মতো করে মনে রেখেছিল। কৌশিকের অনাবৃত পায়ের পাতা উষ্ণ হয়ে ছিল। পরে, পাশাপাশি শুয়ে, হেমার পায়ের তলায় তার পায়ের পাতা বিস্ময়করভাবে মসৃণ ঠেকছিল। কৌশিক চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। একসময় দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে জেগে উঠল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে খাটের ধার থেকে প্রায় পড়ে গিয়ে, আবার ঘুমিয়ে পড়ল। হেমা জেগেই ছিল, কান পেতে কৌশিকের নিশ্বাসের শব্দ শুনছিল। আকাশে আলো ফুটতে আবার কৌশিকের স্পর্শ কামনা করছিল। সকালে, কৌশিকের বাথরুমে, সিঙ্কের ওপর ছোট আয়নাটায় তাকিয়ে হেমা দেখল যে, তার ঠোঁটের চারপাশের ত্বক ছোট ছোট লাল বিন্দুতে ফুলে উঠেছে। এবং সেই অশোভন চিহ্নে সে খুশি হল। খুশি হল ভেবে যে, কৌশিক ইতিমধ্যেই তাকে আপন বলে চিহ্নিত করেছে।

প্রথমদিকে, হেমা জিওভানার ডেস্কে বসে তার প্রাত্যহিক কর্মসূচি মেনে চলার চেষ্টা করত। কিন্তু বেলা এগারোটার মধ্যেই ফোনটা বেজে উঠত এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ মিনিট পর হেমা কৌশিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য পন্তে গ্যারিবল্ডি (Ponte Garibaldi) পার হত, অথবা কৌশিক তার ফিয়াটে চেপে জিওভানার বিল্ডিং-এ পৌঁছে যেত সারা দিনের জন্য হেমাকে নিয়ে বেরোবে বলে। তাই হেমা বইগুলো সরিয়ে রাখল, ল্যাপটপের স্ক্রিন নামিয়ে দিল। বুঝতে পারল যে, ওয়েলেসলিতে ফেরার আগে সে আর ওগুলো স্পর্শ করবে না। রাতে কৌশিক তাকে অপরিচিত কোনও রেস্তোরাঁ এবং বার-এ নিয়ে যেত। অথবা পরিত্যক্ত কোনও চত্বরের ফোয়ারায়, যেখানে তারা একজোড়া কিশোর-কিশোরীর মতো বসে চুমু খেত। কখনও-কখনও শহরের বাইরে এমন সব জায়গায় যেত যেখানে হেমা কখনও যায়নি। যে জায়গাগুলো কৌশিক শেষবারের মতো দেখতে চাইত। কৌশিকই তাকে গাড়ি চালিয়ে অস্টিয়া এবং তিভোলিতে এবং এট্রুস্কান কবরস্থানের পার্বত্য সমাধি দেখতে চেরভেতেরি-তে (Cerveteri) নিয়ে গেল।

হেমা কৌশিককে সেই সব জায়গার ইতিহাস বলল। কারা জায়গাগুলো গড়েছিল এবং কেন। এট্রুস্কানদের সম্বন্ধে কী জানতে পেরেছিল তা বলল। বলল যে, তারাই রোমানদের শিখিয়েছিল, কী করে রাস্তা তৈরি করতে হয়, কী করে জমিতে জলসেচন করতে হয়। এট্রুস্কানদের প্রকৃতিপ্রেম, সংকেত এবং পূর্বাভাসের ওপর তাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে তাদের সর্বগ্রাসী চিন্তার কথা বলল। তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করল না। একসঙ্গে কাটানো এই দিনগুলো তাদের কোন পথে নিয়ে যাবে, সে কথাও বলল না। অতীতের কথাও আলোচনা করল না। সেই যে ক'মাস কৌশিক হেমার বাড়িতে থেকেছিল, তাদের মা-বাবাদের মধ্যের বন্ধুত্ব, যা সেই সময়ই কৌশিকের মায়ের জীবনের মতোই শেষ হওয়ার দিকে এগোচ্ছিল। তাদের মা-বাবা পরস্পরকে পছন্দ করেছিলেন শুধু তাঁদের একই উৎসের খাতিরে, যে সময় এবং স্থানে তাঁরা আর পৌঁছোতে পারছিলেন না, তার খাতিরে। এখনও পর্যন্ত হেমা কখনও কোনও মানুষের প্রতি এই কারণে আকৃষ্ট হয়নি।

কৌশিকের অ্যাপার্টমেন্টে, ছোট টেলিভিশনটায় প্রায় সবসময়ই, একটা আন্তর্জাতিক খবরের চ্যানেল চালানো থাকত। কৌশিকের কাজ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত বর্তমানের ওপর এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার ওপর। যা আগেই রচনা হয়ে গিয়েছে, সেই লেখারই পুনরাবৃত্তি নয়, যে সময়, যে মানুষরা চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে, তাদেরই পুনরুত্থান নয়। আর এটাই হেমাকে সচেতন করে দিত যে, শুধু তার নিজের জীবনটাই নয়, তার মনটাও কত নিশ্চিত আশ্রয়ে রয়েছে। একদিন হেমা কৌশিকের ওয়েবসাইট দেখতে চাইল। কৌশিক তাকে ওয়েবসাইট দেখার জন্য একলা রেখে ডিনারের জন্য খাবার কিনতে বেরোল। হেমা গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে, কৌশিকের খাটে বসে ছিল। পায়ের ওপর কৌশিকের ল্যাপটপের গুন গুন শব্দ অনুভব করছিল।

অসংখ্য ছবি ছিল ওয়েবসাইটটায়। ভয়াবহ সব ঘটনা, যা হেমা খবরের কাগজে পড়েছে এবং দ্বিতীয়বার তাই নিয়ে ভাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। বোমা বিস্ফোরণে বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া বাস, স্ট্রেচারের ওপর মানবদেহ, পাথর ছুড়তে উদ্যত ছোট ছোট ছেলে। কৌশিক এ সবের সাক্ষী। নিজে আড়ালে থেকে, এত কাছে থেকেও, জড়িত না হয়ে সবকিছু দেখেছে। অথচ এমন এক তাৎক্ষণিকতার সঙ্গে, যা হেমা কখনও অনুভব করে না। এখন কৌশিক তার প্রেমিক বলে, এই ছবিগুলো দেখে হেমা বিচলিত বোধ করল। কৌশিক তাকে সেই সব ফোটোগ্রাফারদের কথা বলেছিল, যারা এই কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। বলেছিল, একবার এক ইজরাইলি পুলিশ অফিসার কৌশিকের ক্যামেরা দিয়ে তার মুখে সজোরে আঘাত করেছিল। কৌশিকের মা থাকলে যেরকম অনুভব করতেন, হেমাও মনে মনে তেমনই আশ্বস্ত বোধ করল যে, শীঘ্রই কৌশিকের কাজটা অন্যরকম হয়ে যাবে। সে হংকং-এ একটা ডেস্কের পিছনে বসে মিটিং পরিচালনা করবে, ক্রমাগত বিপদের মুখে পড়বে না।

আরও ছবি ছিল। ধুলোময় রাস্তা এবং গ্রাম, বাজার এবং বাড়ি এবং দোকানের জানলা, রুক্ষ, ঊষর দৃশ্য, মানুষের ছবি। একটা গাছের তলায় বসে একজন বুড়ো লোক কমলালেবুর খোসা ছাড়াচ্ছে, পায়ের কাছে একটা ঘেয়ো কুকুর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মাথায় স্কার্ফ বাঁধা একদল মেয়ে পিছনে মাথা হেলিয়ে হাসছে। একটা পেরেক লাগানো ধাতব গেটের পিছন থেকে একটা অল্পবয়সি মেয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে আর ফোকলা দাঁত বের করে হাসছে। ছবিগুলো দেখতে দেখতে, অচেনা মানুষদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার কৌশিকের এই ক্ষমতা (হয়তো তার প্রয়োজনও বটে), এবং সেই অচেনা মানুষগুলোর তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ইচ্ছে, হেমার কাছে প্রশংসনীয় মনে হল। যে-কোনও মুহূর্তে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ার কৌশিকের যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দ্বিধা— হেমার মনে হল, এটা হয়তো তার প্রয়োজনও। হেমা বুঝতে শুরু করল। কৌশিক একটা ভাড়া করা ঘরে, ভাড়া করা আসবাব এবং ভাড়া করা চাদর-তোয়ালে নিয়ে থাকে। এক কোণে তার ক্যামেরার ব্যাগ এবং ট্রাইপড সবসময় গুছিয়ে রাখা থাকে। পাসপোর্ট সবসময় কৌশিকের পকেটে থাকে। ওয়েস্ট ব্যাংকের একটা বিশদ মানচিত্র ছাড়া তার ঘরের দেওয়ালে কিছুই নেই। হেমার সন্দেহ হল যে, যদি সময় উলটে দেওয়া যেত, যদি নবীনের সঙ্গে তার কখনও দেখা হত না, যদি সে কৌশিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য রোমেই অপেক্ষা করত, তা হলেও কোনও তফাত হত না। সে আন্দাজ করেছিল যে, কৌশিক অর্থহীনভাবে অনেক মেয়ের সঙ্গেই সময় কাটিয়েছে এবং তার নিজেকে তাদের চেয়ে আলাদা ভাবা উচিত নয়। এবং জুলিয়ান তাকে যে চরম বেদনাদায়ক অবস্থায় বারবার টেনে নিয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ এমন এক জিনিসের আশায় বাঁচা, যা কোনওদিন পরিবর্তন করা যাবে না, সেই অবস্থায় আবার নিজেকে নিয়ে যেতে হেমা রাজি নয়।

তালায় চাবির শব্দে সে বুঝল কৌশিক ফিরে এসেছে। অ্যাপার্টমেন্টটায় খাট ছাড়া একমাত্র আসবাব একটা ছোট চৌকো টেবিল আর দুটো চেয়ার। কৌশিক খাবারের ব্যাগগুলো টেবিলের ওপর রাখল। সেই প্রথমবার হেমার উপস্থিতিতে তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল। এসেই আগে হেমাকে চুমু খেল না। একটা হুকে কোটটা ঝুলিয়ে রেখে গলায় বাঁধা পাতলা লাল উলের স্কার্ফটা আলগা করল।

"ছবিগুলো অসাধারণ," হেমা বলল।

"এগুলো দিয়ে সব বিল মেটানো যায় না।"

"তোমার কেমন লাগে এসব দেখলে?"

কৌশিক কাঁধ ঝাঁকাল। কাবার্ড খুলে দুটো ওয়াইনের গ্লাস বের করল। "আমার ওপরও এর প্রভাব পড়লেও তো কারও কোনও সাহায্য হয় না।"

সে রাতটা তারা অ্যাপার্টমেন্টেই কাটাল। কৌশিকের কিনে আনা পাউরুটি, চিজ, মাংস আর ওয়াইন খেল। কৌশিক কিছুক্ষণ ক্যামেরা থেকে ওয়েবসাইটে ফোটো আপলোড করল, তাদের পরিচয়লিপি লিখল। মালপত্র যখন সরানো হবে, তখনকার জন্য একগাদা কনট্যাক্ট শিট বাক্সে ঢোকানোতে, ফেলে দেওয়ার জন্য পুরনো চিত্র-পত্রিকা জড়ো করতে হেমা তাকে সাহায্য করল। কৌশিক তাকে ছবির একটা পোর্টফোলিও দেখাল, যা দিয়ে একদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই তৈরি করার আশা আছে। সেই প্রথম তারা সহবাস ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়ল। কামনার অভাবে নয় বরং এইজন্য যে, তাদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠছিল। কিন্তু তারপর হেমা অনুভব করল কৌশিক তার কাছে ঘেঁষে এসেছে। নিজের ঘাড়ে কৌশিকের নিশ্বাস এবং ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করল। এবং সে কৌশিকের দিকে ফিরে নিজের ঠোঁট দিয়ে তার চুম্বন গ্রহণ করল। অন্য যে-কোনও বিষয়ের মতো বিছানাতেও কৌশিক নির্লিপ্ত হতে পারে। হেমার শরীরের কোনও অংশে এমনভাবে মনোনিবেশ করে, যেন মনে হয় হেমাকেই ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সেই দূরত্বকে হেমা আর ভয় পায় না। একমাত্র বিছানাতেই কৌশিক হেমার নাম উচ্চারণ করে। সেই উষ্ণ শব্দে হেমার কান ভরে যায়। সেই শনিবারের রাতে, চকে গুনগুন করা ক্ষীণ কণ্ঠস্বরগুলো অবশেষে শুধু দূরে কয়েকটি কুকুরের ডাক এবং নৈঃশব্দে হারিয়ে গেল।

"আমাকে প্রভাবিত করে," কিছুক্ষণ পরে কৌশিক বলল। তারা অন্ধকারে জেগে শুয়ে ছিল।

"কী?"

"ছবি তোলা। সবসময় না, কিন্তু কখনও কখনও করে। মাঝে মাঝে এমনভাবে, যা আমার ভাল লাগে না।" কৌশিক একটা সিগারেট ধরাল। তারপর হেমাকে বলল, শেষ গ্রীষ্মে, একদিন সে ফ্রিজেনে (Fregene) থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল। পথে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, একটা মোড়ে দুটো গাড়ির ধাক্কা লেগেছিল। জায়গাটা ঘিরে ভিড় হয়েছিল, কিন্তু তখনও পুলিশ এসে পৌঁছোয়নি। একটা গাড়ির ভিতর একটা বাচ্চা কাঁদছিল। দেখা গেল যে, যাত্রীরা কেউই গুরুতর আহত হয়নি। কৌশিক গাড়ি থামিয়ে ছুটে গিয়েছিল; কিন্তু সবচেয়ে আগে সে একটা ফোটো তুলে নিয়েছিল। "সবচেয়ে আগে," সে হেমাকে বলল। "তারা ঠিক আছে কি না জিজ্ঞেস করারও আগে।"

তিন সপ্তাহ কেটে গেল। ডিসেম্বরের এক সন্ধেয়, তারা যখন জিওভানার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেছে, তখন নবীন ফোন করল। ফোনটা বেজেই গেল, তখন নবীন আনসারিং মেশিনে একটা মেসেজ রেখে ছেড়ে দিল। সে এমনিই, হ্যালো বলতে ফোন করেছিল। সে যখন তার বার্তা দিচ্ছিল,

AMARBOI.COM

কৌশিক তখন হেমাকে দরজায় ঠেস দিয়ে তার জ্যাকেট এবং ব্লাউজের ওপরের বোতাম খুলতে শুরু করেছিল। সে হেমার বুকের আবরণ সরিয়ে দিল। হেমার হাত থেকে চাবির গোছা টেরাকোটা মেঝের ওপর পড়ে গেল। প্রথম থেকেই হেমা স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে চলার চেষ্টা করেছিল। সে জানত যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। আরও দু'সপ্তাহের মধ্যে সবকিছু মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে— সে এবং কৌশিক আলাদা আলাদা দেশে চলে যাবে, কৌশিক এবং জিওভানার অ্যাপার্টমেন্টের চাবি অন্য লোকের হাতে থাকবে। এবং তা জানত বলেই সে আরও একবার তার জিনস খুলে ফেলল। নবীনের গলা তখনও ঘরের ভিতর কথা বলছিল। এমনকী কৌশিককে যে কন্ডোম ব্যবহার করতে হয়, সেই কথাটাও কৌশিককে হেমার মনে তার নির্ধারিত স্থানে রাখতে সাহায্য করত। যখনই কৌশিক ছোট্ট প্যাকেটটা খুলবে বলে এক মুহূর্তের জন্য থামে, তখনই হেমার মনে পড়ে যায় যে, তারা যা করতে চলেছে, তা ঘটা সত্ত্বেও তারা আলাদাই থাকবে। সে জানত যে, এমন ভাবনা জুলিয়ান-পর্বের পরিণাম। হয়তো, অত বছর এক অসৎ মানুষকে ভালবেসে সে কিছু শিক্ষা পেয়েছে।

হেমা নবীনকে জানাল, ইতালিতে তার শেষ সপ্তাহে সে ঘুরতে বেরোবে। আরও একটি মিথ্যে, যাতে নবীন তার সঙ্গে যোগাযোগ না করে। এবং এই থেকেই হেমা এবং কৌশিকের মাথায় একসঙ্গে কোথাও বেড়িয়ে আসার পরিকল্পনাটা এল। ঠিক করল, তারা উত্তরে যাবে, এট্রুস্কানদের স্থাপিত শহর ভলতেরায়। এবং সেই চাকচিক্যহীন, সাদামাটা, নির্জন স্থানেই তাদের যৌথ সময়ের বাকি কয়েকটি দিন কাটাল। কৌশিকের গাড়ি করে সেখানে গেল। টাস্কানি পর্যন্ত উপকূল ধরে, তারপর মেরেমার নীল ধোঁয়াশা এবং সিসিনা ভ্যালির সাদা চকের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ বের করে, একটা সরু রাস্তা দিয়ে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে। দূরে ভলতেরা দেখা গেল। বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের ওপর একটা পর্বতগাত্রের মাথায় অবস্থিত, যেন কোনও মাটি দিয়ে ঘেরা দ্বীপ। সেই রুক্ষ, অনাড়ম্বর স্থাপত্য, সেই সব কুলমর্যাদার চিহ্ন আঁকা বর্ম এবং সেই কঠিন, অন্ধকার দেওয়াল হেমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল। এই মধ্যযুগীয় নির্মাণগুলো ফোরাম-এর চেয়ে বেশি সাম্প্রতিক। অথচ ভলতেরাকে আরও দূরবর্তী, পর্যটক এবং সময়ের পক্ষে আরও দুর্ভেদ্য মনে হল। রোম হেমা এবং কৌশিককে লুকিয়ে রেখেছিল, তাদের একসঙ্গে

AMARBOI.COM

থাকতে দিয়েছিল। সেখানে তাদের প্রেম হাজার হাজার মানুষের প্রণয়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে হেমার মনে হচ্ছিল যেন, তাকে সকলের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, তার সত্য প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। সে এক নিস্পৃহতাও টের পেল। তাদের আশপাশে মাত্র গুটিকয়েক লোকজন ছিল, যাদের দেখে মনে হল তারা ভলতেরার কেউ নয়। এবং হেমার মনে হল, যারা সেখানে থাকে, তারা যেন ভদ্র অথচ আন্তরিকভাবে হেমা এবং কৌশিকের চলে যাওয়ার অপেক্ষা করছে।

তাদের পদক্ষেপের সুস্পষ্ট আওয়াজ, ঘণ্টার অবিরাম আবেদনময় দ্বৈত স্বর এবং হাওয়ার শনশন ছাড়া জায়গাটা প্রায় নিঃশব্দ। সেই বিশাল উচ্চতায় সারাক্ষণ হাওয়া তাদের মুখে এসে ঝাপটা মারছিল, চুল এলোমেলো করে দিচ্ছিল। বড়দিনের আগের সপ্তাহে শহরটা মোটামুটি সাজানো হয়েছিল। রেস্তোরাঁয় অ্যান্টিপাস্তি টেবিলে হলি জড়ানো হয়েছিল। সেইসব কারখানায় তারা গেল, যেখানে শ্বেতস্ফটিক কাটা এবং পালিশ করা হয়। ভলতেরায় হাজার-হাজার বছর ধরে সেই প্রায় স্বচ্ছ পাথর খনন করা হয়ে আসছে।

ঠান্ডাটা পাথর থেকে আসার ফলে রোমের চেয়ে বেশি শীত সেখানে। চামড়ার জ্যাকেটের বদলে হেমা এখন কৌশিকের একটা পি-কোট পরেছিল। কাঁধের ওপর সেই ভারটার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করছিল আর মনে পড়ছিল কৌশিকের সেই অন্য কোটটার কথা যেটা ছেলেবেলায় সে অত অপছন্দ করত। সেই সময়, যখন তারা পরস্পরের কাছে কিছুই ছিল না, কিন্তু কী যেন হয়ে উঠেছিল।

তারা যে হোটেলটায় থাকছিল, সেটা একসময় একটা কনভেন্ট ছিল। সন্ন্যাসিনীদের প্রাক্তন মহলে তারা ঘুমোল। খাবারটা আরও সাদামাটা—কয়েক বাটি রিবোলিতা (Ribollita), নুন ছাড়া পাউরুটি, বিকেলে তিক্তমধুর গরম চকোলেট। সেই খাবার খেয়ে, হাঁটার পর নিজেদের পা-গুলোকে বিশ্রাম দিতে-দিতে তারাও শহরটার মতো দৃঢ়, শান্ত বোধ করল। এক মেঘহীন দুপুরে, পশ্চিমে ত্রিশ মাইল দূর থেকে কৌশিক এখানকার কয়েকটা ফোটো তুলল। খুব বেশি না, হেমার একটাও না। আর ফোটোগুলো শহরটার যত না তার চেয়ে শহর থেকে দেখা যায় এমন অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের। উত্তরে কারারা পাহাড় এবং অস্পষ্টভাবে ঝলকানো লিগিউরিয়ান সমুদ্র। একটা রোমান অ্যামফিথিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ ঘুরে দেখল। বাসসে-র

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Balze) দেওয়ালের ওধারে, খাড়া একটা গিরিচূড়া দেখল, যার তলায় মাটি খসে পড়ে গিয়েছিল— একসময় একটা গির্জা ছিল সেখানে। চূড়োটা সবসময়ই শহরের আরও বেশি অংশ নিয়ে ধসে পড়ার আশঙ্কা দেখাত। এট্রুস্কান প্রবেশদ্বার পোর্তা অল আর্কো-র (Porta all 'Arco) নীচের দিক থেকে, তিনটে কালো হয়ে যাওয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন মাথা প্রহরীর মতো তাদের প্রতি এবং তারা যে জগৎটা পিছনে ফেলে এসেছে, তার প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

প্রধানত শীতের জন্যই তারা গির্জা এবং মিউজিয়ামে আশ্রয় নিল। গুয়ার্নাচি এট্রুস্কান মিউজিয়ামটা (Guarnacci Etruscan Museum) একেবারে শেষে দেখবে বলে রেখে দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখল, তাকের ওপর সারি দিয়ে শয়ে-শয়ে ভস্মাধার রাখা আছে, যার মধ্যে ভলতেরার প্রাচীন মানুষরা তাদের মৃতের ভস্ম জমিয়ে রেখেছিল। জিনিসগুলোকে ভস্মাধার বলা হলেও সেগুলো দেখতে শ্বেতস্ফটিক বা টেরাকোটা দিয়ে তৈরি ছোট-ছোট সিন্দুকের মতো। ঢাকনার ওপর উদ্ভট কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে জীবন্ত সব মূর্তি। সেগুলোর বড় বড় মাথা এবং সামঞ্জস্যহীন ছোট শরীর। মেয়েরা অবগুণ্ঠিতা, হাতে পাখা অথবা ডালিম ফল। ভস্মাধারের ধারগুলো কারুকার্যখচিত— পরিযায়ী মানুষের যাত্রা, ছাউনি দেওয়া চার চাকার গাড়িতে চেপে পাতালে প্রস্থান, কত আশ্চর্য জন্তু-জানোয়ার এবং মাছের মতো লেজবিশিষ্ট সামুদ্রিক দেবতার ছবি খোদাই করা। সেদিন মিউজিয়ামে হেমা এবং কৌশিকই একমাত্র দর্শনার্থী ছিল। রেডিয়েটর থেকে হিসহিস শব্দ করে বেরিয়ে আসা গরম এবং ফোল্ডিং চেয়ারের ধৈর্য ধরে বসে থাকা রক্ষীরা ছাড়া তারা একলাই ছিল। মিউজিয়ামে আর-একটি স্বামী-স্ত্রীর শবাধার ছিল। কিন্তু হেমা রোমে যাদের দেখেছিল, তাদের মতো এরা অলস, প্রেমপূর্ণ নয়। এখানে তারা আরও বয়স্ক, অমার্জিত, বিয়ের অনেক বছর পরেও অস্থির হয়ে আছে, স্বচ্ছন্দ হতে পারছে না।

মিউজিয়াম দেখার পর তারা দুপুরের খাবার খেতে গেল পিয়াৎজা দেই প্রিয়রি-র (Piazza dei Priori) সেই রেস্তোরাঁয়, যেখানে তারা ইতিমধ্যেই খেয়েছিল এবং পছন্দ করেছিল। খাওয়ার পর তারা রোমে ফিরে যাবে এবং পরের দিন হেমা ভারতের প্লেনে উঠবে। তারা সকালেই হোটেল থেকে চেক-আউট করেছিল। ব্যাগগুলো গাড়ির ভিতর রাখা। পাদ্রোনি তাদের

AMARBOI.COM

কোণের সেই টেবিলটায় বসাল যেখানে তারা আগের দিন বসেছিল। ব্ল্যাক ক্যাবেজের সঙ্গে ব্রুশেটা (bruschetta) এবং সফ্‌ট পাপারডেলে ক্লেক্‌ড উইথ ওয়াইল্ড বোর অর্ডার করল। হেমা মিউজিয়ামে কেনা পোস্টকার্ডগুলো দেখছিল। ওয়াইনের প্রথম গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে সেগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখছিল। সেখানে একটা জিনিস দেখেছিল তারা, যা অন্য সবকিছুর থেকে আলাদা মনে হয়েছিল। একটা ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য। বেশ লম্বাটে একটি ছেলের শরীর, মাংসের চেয়ে বেশি কঙ্কালসার, দুই বাহু পাশে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। রেস্তোরাঁর মাঝখানে একটা লম্বা, অগোছাল টেবিলে সামান্য হইচই-করা একদল প্রধানত সুট পরিহিত তিরিশোর্ধ্ব পুরুষ জড়ো হয়েছিল।

"কোনও অফিসের হলিডে পার্টি", কিছুক্ষণ তাদের কথাবার্তা শোনার পর কৌশিক বলল, "ব্যাংকে কাজ করে।" সে শুনতে থাকল তারপর বলল, "ওরা এখানেই সারাজীবন থেকেছে, পরস্পরের সান্নিধ্যে। এখানেই মারা যাবে।"

"শুনে হিংসে হচ্ছে", হেমা বলল।

"তাই?"

"আমি কখনও কোনও জায়গাকে এভাবে আপন করে নিতে পারিনি।"

কৌশিক হাসল। "তুমি ভুল লোকের কাছে অভিযোগ করছ।"

"তোমার যদি হংকং খারাপ লাগে? কোথায় যাবে?"

"জানি না।"

"ইতালিতে ফিরে আসবে?"

"না।"

"কেন নয়?"

কৌশিক হেমার গ্লাসে আরও ওয়াইন ঢেলে নিজের গ্লাসেও ঢালল। হেমার দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসল। তারপর, মনে হল যেন যা বলতে যাচ্ছিল সে-সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করল। "আমি এখানে একটা শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি, সেই অনেক।"

আর কোনও কথা না বলেই, ভিন সান্তো (vin santo) এবং এক ফালি চেস্টনাট কেক দিয়ে খাওয়াদাওয়া শেষ হল। গোধূলির প্রথম আলোয় তারা বাইরে এসে দাঁড়াল, শেষবারের মতো শহরটাকে দেখবে বলে। সেটা পাসেজাতা র (passegiata) প্রহর। রাস্তা দিয়ে বয়স্ক মানুষরা হাতে হাত

AMARBOI.COM

জড়িয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পুরুষরা পুরুষদের সঙ্গে মহিলারা মহিলাদের সঙ্গে। একসময় হেমা এবং কৌশিকের মা-বাবাদের কোনও পার্টিতে গিয়ে এরকম পৃথক থাকার প্রবণতা ছিল । মানুষগুলোর চেহারায় একটা মিল ছিল— তাদের মুখে এবং তাদের জামাকাপড়ে, পুরুষদের মাথার চ্যাপটা উলের টুপিতে, মহিলাদের সোজা স্কার্ট এবং পায়ে নিচু হিল তোলা নেভি-ব্লু জুতোতে। তাদের সঙ্গে, তাদের পাশাপাশি ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিরাও হাঁটছিল। বিভিন্ন প্রজন্ম আলগাভাবে কিন্তু সস্নেহে সংবদ্ধ।

"আমার সঙ্গে চলো", কৌশিক বলল।

"কোথায়?"

"হংকং-এ।" তারপর কৌশিক বলল, "ওকে বিয়ে কোরো না, হেমা।"

হেমা থেমে গেল। তারা একটা সিঁড়ির রাস্তায় ওপর থেকে নীচে নামছিল, দু'ধারে সারিবাঁধা সাইপ্রেস গাছ। হেমার পিছনে যারা ছিল, তারা বিড়বিড় করে পেরমেসো (premesso) বলে তার গা ঘেঁষে এগিয়ে গেল। মাথা ঘুরে গেলে যেমন হয়, সেরকম হেমার পা টলে গেল। যে ছেলেটা তার দিকে কোনও মনোযোগ দেয়নি, যে পুরুষ তার সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হয়েছিল এই কথা জেনে যে, হেমা কখনও তার হতে পারবে না, শেষ মুহূর্তে সে হেমার কাছে আরও কিছু পেতে চাইছিল। হেমার মনের একটি অংশ উদ্দীপিত বোধ করল, কিন্তু একই সঙ্গে সে কৌশিকের স্বার্থপরতা দেখে মর্মাহত হল। কৌশিক তাকে বলে দিচ্ছে তাকে কী করতে হবে। নবীন যেমন হেমার কাছে আসার প্রস্তাব দিয়েছিল, কৌশিক কিন্তু তা করল না।

"এখনই কিছু বোলো না", কৌশিক হেমাকে নিজের কাছে টেনে আনল। তার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ি নীচে নিয়ে গেল। "আগে ভারতে যাও, সবকিছু সামলে নাও। আমি অপেক্ষা করব।"

হেমা সরে গেল, এই প্রথম কৌশিকের স্পর্শে সে বিচলিত বোধ করছিল। "বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে, কৌশিক।"

কৌশিক হেমার চোয়ালে একটা আঙুল দিয়ে আলতো করে হেমাকে ঘুরিয়ে নিজের মুখোমুখি আনল, হেমার চোখে চোখ রাখল। সেই ক্লান্ত চোখ দুটো হেমা ভালবাসতে শুরু করেছিল। হেমার জন্য ভালবাসায়, আশায় কৌশিকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ছিল। তখন হেমা বুঝতে পারল, এটা শুধুই ওয়াইনের প্রভাব নয়, কৌশিক যা বলছে, তা তার মনের কথা। "আর

AMARBOI.COM

কয়েক সপ্তাহ পর বড্ড দেরি হয়ে যাবে। এখনও হয়নি।"

সে আবার হেমার হাত ধরল। তারা হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট চত্বরে ঢুকল। সেখানে সর্বত্র হেমা শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের দেখতে পাচ্ছিল। পাঁচ-সাত বছরের, আট-দশ বছরের ছেলেমেয়েরা তাদের চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। যেন তক্ষুনি কোনও স্কুল ছুটি হয়েছে। সেই বয়সে হেমা কৌশিককে চিনত। কৌশিকের কোট পরেছিল, নিজের খাটে তাকে শুতে দিয়েছিল, তাকে চুম্বনের স্বপ্ন দেখেছিল। অতীতের এই সত্যগুলো তাকে কষ্ট দিল, কিন্তু একই সঙ্গে তাকে সুস্থিত করল। ইতালিয়ান বাচ্চাগুলো, বড়দিন আসার অধীর অপেক্ষায়, সম্বোধন করার সময় বুয়ন নাতালে (Buon Natale) ডাক দিয়ে শীতের হাওয়ায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছিল। তাদের প্রাণোচ্ছল উত্তেজনা এতই বিশুদ্ধ এবং ছোঁয়াচে যে, তাদের সঙ্গে হেমার মনও নেচে উঠল। সে কল্পনা করল, আরও দশ বছরে, এই ছেলেমেয়েগুলো পরস্পরের প্রেমে পড়তে শুরু করবে। তার আরও পাঁচ বছর পর, তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েরা তাদের পায়ের কাছে ঘুরে বেড়াবে।

ভলতেরা থেকে ফেরার পথে, যখন চারপাশের দৃশ্য অন্ধকারে ঢেকে যেতে শুরু করেছে এবং তারা রাত্রির মধ্যে দিয়ে পথ চলছে, হেমা কৌশিককে নিজের কথা বলল। তার কারণগুলো বোঝাল। সেই সব কারণ, যার সঙ্গে নবীনের কোনও সম্পর্ক ছিল না। সে কৌশিককে বলল, সে তার, নিজের জীবনটা ছেড়ে কৌশিকের পিছন-পিছন ঘুরে বেড়াতে পারবে না। কৌশিক তার জন্য এমন করবে, তাও সে আশা করে না। সে কৌশিককে পালটানোর চেষ্টা করতে চায় না। চায় না যে, একদিন তাকে দোষ দেওয়া হবে, সে কৌশিককে এক জায়গায় বেঁধে রেখেছে।

"তার মানে এই নয় যে, আমরা আর পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ চালিয়ে যেতে পারি না", হেমা বলল। প্রস্তাবটা দিতে তার ভয় করছিল, না দিতে আরও ভয় করছিল।

"আমি অন্য কোনও ধরনের ব্যবস্থায় আগ্রহী নই", কৌশিক ঠান্ডা গলায় বলল। তার সেই কণ্ঠস্বর হেমা তাদের কৈশোরের পর কখনও শোনেনি। মাঝরাতে জিওভানার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছোনো পর্যন্ত, সারা রাস্তা কৌশিক আর কোনও কথা বলল না। তারপর সে বলল, "তুমি একটা কাপুরুষ।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমা কাঁদতে শুরু করল, নিজেকে সামলাতে পারল না। সে জানত যে, তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য কৌশিক কোনওদিন তাকে ক্ষমা করবে না। এও জানত যে, সে যদি এখন নিজের মত পালটায়, তা হলেও, কৌশিক নিজের আমন্ত্রণ ফিরিয়ে নিয়েছে। কৌশিক তাকে নবীনকে বিয়ে না করতে বলেছিল, কিন্তু সে হেমাকে বলেনি যে, "তুমি আমাকে বিয়ে করো।" হেমা জানত, এটা অন্যায্য। সে যখন কাঁদছিল, কৌশিক অবিচলিত হয়ে বসে রইল। ফোটো তোলার সময়ও নিশ্চয়ই সে এমনই অবিচলিত থাকে। সেই সকালে, যখন হেমার বয়স তেরো, এবং কৌশিক সমাধির ওপর থেকে বরফের আস্তরণ সরিয়ে দিয়েছিল, তখনও সে এমনই অবিচল ছিল। হেমা বুঝতে পারল, কৌশিকের আর কিছু বলার নেই। সে শুধু অপেক্ষা করছে হেমা কখন গাড়ি থেকে নেমে যাবে। তারা রাতটা আলাদা কাটাল। হেমা আর তাকে দেখতে পাওয়ার আশা করছিল না। কিন্তু পরের দিন সকালে কৌশিক ফোন করে জানতে চাইল হেমার গোছগাছ হয়েছে কি না। বলল, সে এক ঘণ্টার মধ্যে আসছে।

কৌশিক গাড়ি চালিয়ে হেমাকে ফিউমিচিনো (Fiumicino) নিয়ে গেল। হেমার হয়ে ইতালিয়ান বলল। চেক-পয়েন্ট পর্যন্ত তার সঙ্গে গেল। সিকিউরিটি অবধি হেমাকে পৌঁছে দিয়ে হালকাভাবে তার ঠোঁটে চুমু খেল, তারপর হেমাকে চোখের জল মোছার জন্য ফেলে রেখে চলে গেল। হেমা জুতো খুলে, যে সুন্দর মুদ্রাগুলো দিয়ে শীঘ্রই সে আর কিছু কিনতে পারবে না, সেই মুদ্রাগুলো বের করে নিজের পকেট ফাঁকা করে দিল। গেটে পৌঁছে একটা এয়ার-ট্রেনে উঠে জানলার ধারে বসল। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল, টারম্যাক-এর (tarmac) ওপর অ্যালিটালিয়া (Alitalia) জেট ধীরে ধীরে আড়াআড়ি যাতায়াত করছে। হেমা অন্য যাত্রীদের লক্ষ করল, বেশিরভাগই ভারতীয়। এক-এক করে সিটগুলো ভরতি হয়ে গেল। সে একলাই বসে থাকল। বিমানের ডাক পড়ার আগে পর্যন্ত একটা ইতালিয়ান ফ্যাশন-পত্রিকার পাতা ওলটাল।

প্লেনে ওঠার ঢালু পথে এগিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত হেমা বুঝতে পারেনি, সে কী পিছনে ফেলে যাচ্ছে। তার চুড়ি, যেটা সে কখনও হাত থেকে খোলে না, সেই প্রথম রাতে যেটা দিয়ে আঙুল গলিয়ে কৌশিক তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল। হেমা মনে মনে দেখতে পেল, সিকিউরিটি গেটের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে পার হওয়ার সময় যে ধূসর প্লাস্টিকের ট্রে তে সে চুড়িটা রেখেছিল, সেটা সেখানেই পড়ে আছে। হেমা ঘুরে উলটোদিকে সেই মহিলাটির দিকে হাঁটতে শুরু করল, যিনি তার বোর্ডিং পাস নিয়েছিলেন।

"সকলে বসে পড়ছে", মহিলাটি ইংরেজিতে বললেন, "প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে।"

"আমি একটা জিনিস ফেলে এসেছি", হেমা বলল। "গয়না।"

মহিলাটি সামান্য আগ্রহের সঙ্গে তার দিকে তাকালেন। "কী ধরনের গয়না?"

"একটা চুড়ি", হেমা বলল, একটা হাত তার নগ্ন কবজি স্পর্শ করল।

"আপনি যেখানে বসেছিলেন, সেখানে চেক করাতে চান?"

"না।" হেমার এয়ার-ট্রেনে যাত্রা, পথে যে ক'টা দোকান পড়েছিল, সব মনে পড়ল। "ওটা সিকিউরিটিতে আছে। আমি আজ সকালে ওখান দিয়ে এসেছি।"

মহিলাটি মাথা নাড়লেন। এতক্ষণ তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন। অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে বোর্ডিং পাস নিচ্ছিলেন। "এখন তো আর কোনওভাবেই সিকিউরিটির কাছে পৌঁছোনো যাবে না। আপনি চাইলে আমরা একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিতে পারি।"

হেমা ঢালু পথটা দিয়ে ফিরে গেল। প্লেনে উঠে নিজের সিট খুঁজে নিল। সিট-বেল্ট আটকাল। তার ডান হাতটা অচেনা লাগছিল। ধাতব বকলশটার সঙ্গে ঠোকা লেগে চুড়িটার যে আওয়াজ হত, তার অভাব অনুভব করল। বিয়ের সময় চুড়িটার দশগুণ বেশি গয়না পাবে সে। তবুও, হেমার মনে হল যেন, সে তার শরীরের একটা অংশ পিছনে ফেলে এসেছে। সে মায়ের কাছে এ কথা শুনে বড় হয়েছে যে, সোনা হারানো অমঙ্গল। প্লেনটা যখন জমি ছেড়ে উঠতে শুরু করল, সেই মুহূর্তে হেমা তখনও সেটার গতি টের পাচ্ছিল, একটা ভয়ংকর আশঙ্কা তার মনের মধ্যে বয়ে গেল যে, সেটা ভেঙে পড়বে অথবা বিস্ফোরণে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তারপর ভয়টা অসাড় হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই প্লেনের মাঝখানে স্ক্রিনের ওপর একটা মানচিত্র দেখা যাচ্ছিল। একটা সাদা লাইন রোম থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে ভারতের দিকে এগোচ্ছিল। এবং এই সহজ ছবিটা তাকে আশ্বস্ত করল। তার একমাত্র গন্তব্য পরিষ্কার দেখিয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌশিক এমন এক জায়গায় এসেছিল, যেখানে সে কাউকে চেনে না। খাও লাক থেকে সামান্য উত্তরে একটা রিসর্টের, খুঁটির ওপর দাঁড় করানো, এক ঘরের, ঢালু ছাদের একটা বাংলোয়। এটা সমুদ্রতটে তার তৃতীয় দিন এবং এর মধ্যেই এই বাঁধা গতে পড়ে তার একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে। বিছানা থেকে ওঠা, প্রাতরাশে ফলমূল আর চটচটে রোল খাওয়া, সুইমিং ট্রাঙ্ক পরে গরম বালির ওপর শুয়ে থাকা। যে পত্রিকায় সে কাজ শুরু করতে চলেছে, তার পুরনো সংখ্যাগুলোয় চোখ বোলায় বটে, কিন্তু আসলে সে ঝিমোয়। দাড়ি কামানো ছেড়ে দিয়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজাতে শুরু করেছে। খাবারটা তাকে ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দেয়— ধোঁয়া ওঠা ভাত, ঘন বাদামি আর হলুদ তরকারি, ঝোলে ভাসমান গোটা-গোটা লাল-সবুজ লঙ্কা। পরিণত বয়েসে কৌশিক এত রকমের রান্না খেয়েছে যে, সে নিজের ছেলেবেলার বিশেষ কোনও উপাদানের কথা ভেবে নস্টালজিয়া বোধ করে না। কিন্তু এই খাবারটা তাকে অদ্ভুত আবেগপ্রবণ করে দেয়। চোখের ভাসমান বিন্দুটা মন বিক্ষিপ্ত করে দেয়, সানগ্লাস সরিয়ে দিনের অপ্রশমিত ঔজ্জ্বল্যের মুখোমুখি হলেই বারবার সরে যাওয়া দাগটা দেখা দেয়।

সমুদ্রতীরটা পশ্চিমমুখী। প্রতিদিন সন্ধেবেলা কৌশিক একটা বিয়ার অর্ডার দিয়ে জলের ওপর সূর্যাস্ত দেখে। জলটা শান্ত এবং অগভীর, কিন্তু সে পুলে সাঁতার কাটতেই বেশি পছন্দ করে। বহু বছর আগে একবার, ভেনেজুয়েলার উপকূলে ঢেউয়ের টানে সে এমনই বেসামাল হয়ে পড়েছিল যে, উঠে আসার জন্য রীতিমতো কষ্ট করতে হয়েছিল। নোনা জলে বিষম খেতে খেতে এও ভেবেছিল যে, আর বোধহয় ফিরতে পারবে না। পাশে যাঁরা স্নান করছিলেন, তাঁদের একজন তাকে উঠে আসতে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু সেই থেকে সে মহাসাগরে চান করে না। জলটাকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে জানে, তার মা, যিনি জল এতই ভালবাসতেন যে, শ্যাওলা ভরতি-ডোবাতেও চান করতে পারতেন, তিনি থাকলে তার সংকোচ দেখে উপহাস করতেন। সমুদ্রতটের পিছনে পাহাড়ের ওপর রাবার গাছ ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছিল। জল পেরিয়ে, আন্দামান সাগর পেরিয়ে, কোথাও আছে বঙ্গোপসাগর। এবং কলকাতা। যেখানে হেমা আছে।

ইতালি থেকে ফেরার প্লেনেই কৌশিকের রাগ পড়ে গিয়েছিল। এখন, থাইল্যান্ডে, তার মনে শুধুই হেমার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা রয়ে গিয়েছে। সে

AMARBOI.COM

ভাবল, তার কি আগেই কথাটা তোলা উচিত ছিল? তার কথাগুলো যথেষ্ট আন্তরিক শুনিয়েছিল তো? হেমার আপত্তির পর নিজের রূঢ়তার কথা ভেবে তার অনুশোচনা হল। তার বর্তমান জীবনে পরিচিতদের মধ্যে হেমাই একমাত্র মানুষ যে তার অতীতের কথা একটু বোঝে। একমাত্র মহিলা, যার সঙ্গে কৌশিক সম্পর্ক রাখতে চায়। হেমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে, তা সে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে চায় না। হেমাকে সে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে ভাগ করে পেতে চায় না। ভলতেরায় সেই শেষ দিনে সে হেমাকে এইসব কথা বোঝানোরই উপায় খুঁজেছিল। হেমা তাকে কোনও দোষারোপ করেনি, যেমন ফ্রাঙ্কা করেছিল। তাকে তার নিজের কাপুরুষতা, কারও সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের অক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দেয়নি। কিন্তু তাকে দোষারোপ করতে হেমার এই আপত্তিই কৌশিককে আরও কষ্ট দিচ্ছিল। হেমাকে ছাড়া তার জীবন অর্থহীন।

পাশের বাংলোয় একটা সুইডিশ পরিবার এসে উঠেছে। তাদের একটা ছেলে এবং মেয়ে আছে, যারা অন্তর্বাস পরেই সাঁতার কাটে, যেন সুইমসুট আনতে ভুলে গিয়েছে। ছেলেমেয়েগুলো বয়সের তুলনায় লম্বা। রিসর্টে যে মহিলারা পানীয় পরিবেশন করে, তাদের একজনকে ছেলেমেয়েগুলোর মা বলছিলেন যে, তাদের বয়স মাত্র পাঁচ আর সাত। শুনে কৌশিক চমকে গিয়েছিল। ওদের মায়ের চেহারা আকর্ষক। ফুট-ফুট দাগে ভরতি রোগাটে মুখ, ছোট করে ছাঁটা চুল। দেখে মনে হত, সে কয়েক ঘণ্টা অন্তর একটা করে নতুন সুইমসুট পরে। সকালবেলায়, সে তরমুজের শাঁসের রঙের একটা পাতলা রোব পরে তাদের বাংলোর সামনের ছোট গোল টেবিলে বসে ফলের খোসা ছাড়ায়, ছেলেমেয়েদের নারকেল বা পেঁপের টুকরো খেতে দেয়। ছেলেমেয়েরা বালির ওপর খেলা করে, পরস্পরের পেছনে ছুটে বেড়ায়। তাদের মা একটা চেয়ারে বসে বই পড়ে আর ছেলেমেয়েরা তাকে খেলায় টানতে গেলে সস্নেহে তাদের মাথায় পত্রিকাটা দিয়ে চাঁটি মারে। মহিলাটি এবং তার স্বামী এক বেমানান দম্পতি। স্বামীটি একজন লম্বা-চওড়া মানুষ। তার চামড়া রোদে পুড়ে গিয়েছে, খড়ের রঙের সোনালি চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার স্ত্রীর চুলের চেয়ে তার চুল বেশি লম্বা। হাঁড়ির মতো মুখ। বেশিরভাগ দিনই সে দুটো গাছের মধ্যে বাঁধা একটা দোলনায় ঘুমিয়ে কাটায়। দোলনার গিঁটগুলো তার ভারে টানটান হয়ে থাকে।

AMARBOI.COM

কৌশিকের যতদূর মনে হয়, এখানে সে এবং এই সুইডিশ পরিবারটিই আছে। রিসর্টের এই প্রান্তে, প্রধান হোটেল বিল্ডিংটা থেকে একটা পথ ধরে হেঁটে গেলে যে তৃতীয় বাংলোটা পড়ে, সেটা ফাঁকা।

কৌশিক ভেবেছিল একটু ঘুরে বেড়াবে, বড়দিনের পর ফুকেটে যাবে, কিন্তু এখন আর তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না। সে কয়েকটা ফোটো তুলেছে। তার বাংলো থেকে যে দৃশ্য দেখা যায়, জলের ওপর লম্বা-লম্বা নৌকো, সুইডিশ ছেলেমেয়েগুলো বালির ওপর খেলা করছে। পাহাড়ের গা দিয়ে হেঁটে মন্দিরের ফোটো তুলতে যেতে বা নৌকোয় চড়ে সিমিলিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যেতেও সে কোনও উৎসাহ বোধ করছিল না। তিন দিনের মধ্যে সে মাত্র একবার রিসর্টের বাইরে গিয়েছিল। সারবাঁধা কয়েকটা সুভেনির আর ডাইভিং-এর দোকানে, যেগুলো তার খুব সাধারণ লেগেছিল। একটা ইন্টারনেট সেন্টার দেখে ভেবেছিল গিয়ে দেখবে হেমা চিঠি পাঠিয়েছে কি না। তারপর তার মনে পড়ল, সে হেমাকে তার ই-মেল অ্যাড্রেস দেয়নি। তাই সে শুধু নিজের ওয়েবসাইটে কয়েকটা নতুন ফোটো আপলোড করল। ভলতেরার ফোটো, যেখানে হেমা তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। হেমার চুল হাওয়ায় উড়ছিল, কয়েক গোছা চুল মাঝে মাঝে লেন্সের সামনে এসে যাচ্ছিল। আর কয়েকটা আন্দামান সাগরের ছবি।

অন্যান্য দিনের মতো বড়দিনও কৌশিক সমুদ্রতীরেই কাটাল। রিসর্টের রেস্তোরাঁয় একটা ছোট নকল ক্রিসমাস ট্রি রাখা হয়েছিল। কৌশিক রিসর্টের উঠোনে বসে ডিনার খেল। পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়ে জলটা চিকচিক করছিল। পাশের টেবিলে সুইডিশ পরিবারটি বসে ছিল। কথা বলতে বলতে, হাসাহাসি করতে করতে খাওয়াদাওয়া করছিল। ছেলেমেয়েদের লম্বা হাত-পা রোদে পুড়ে কালো। পরিবারটি একগাদা খাবার অর্ডার দিয়েছিল। অপটুভাবে একটা গোটা মাছের ঝোল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। হেমার কথা মনে পড়ায় কৌশিকের মনটা আবার রাগে ভরে গেল। ভাবল, হেমা এবার বিবাহিত জীবনে পদার্পণ করবে, তার ছেলেমেয়ে হবে। সারা জীবন এমন একজনের সঙ্গে বেড়াতে যাবে, এমন একজনের শয্যাসঙ্গিনী হবে, যাকে সে ভালবাসে না।

খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর সুইডিশ মহিলাটি উঠে পড়ল। স্বামীর কপালে চুমু খেয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেল। "একটা ড্রিঙ্ক হয়ে যাক?" তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে যাওয়ার পর লোকটি কৌশিককে ডেকে বলল।

তারা ভিতরে এয়ারকন্ডিশন্ড বার এ গিয়ে হুইস্কি অর্ডার দিল। একটা ব্যান্ড গান-বাজনা শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সুইডিশ লোকটির নাম হেনরিক। সে স্টকহোমে একটি টিভি স্টেশনে চলচ্চিত্র-সম্পাদকের কাজ করে। তারা সুইডেন এবং ইতালির সংবাদমাধ্যমের বিষয়ে কথা বলল, ইরাকের যুদ্ধ নিয়ে কথা বলল, "আমাদের কাজ অনেকটা একই রকম", হেনরিক বলল। "আমাদের নামগুলোও।"

কৌশিক ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

হেনরিক জানাল, এই চতুর্থবার তারা এই রিসর্টে বড়দিন কাটাচ্ছে। "প্রথম বছর, লার্স একদম বাচ্চা ছিল।"

"তোমাদের পরিবার কিছু মনে করে না?"

"কী মনে করবে?"

"তোমরা বড়দিন কাটাতে থাইল্যান্ডে আসো, সে ব্যাপারে?"

"আমার স্ত্রীর মা-বাবা অভিযোগ করেন কিন্তু তাও আমরা আসি। তাঁরা স্টকহোমে থাকেন। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার ওপারেই। আমার মা-বাবার ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। দু'জনেই আবার বিয়ে করেছেন।" হেনরিক তার বড় মাথাটা নাড়ল। "দেখা করতে হলে বড্ড বেশি লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে হয়। আর তুমি? তোমার পরিবার কোথায়?"

"মা মারা গিয়েছেন। বাবা আমেরিকায় থাকেন।"

"কিন্তু তুমি তো ভারতীয়, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"ভারতে থাকো?"

"এই মুহূর্তে তো কোথাওই থাকি না। এবার হংকং-এ যাব।"

"বিয়ে করেছ?" হেনরিক জিজ্ঞেস করল।

কৌশিক মাথা নেড়ে না জানাল।

"কিন্তু আমার বউ বলে, তুমি কারও কথা ভাবছ। তার কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছ।"

কৌশিক ভাবেনি যে, তার মনের ভাব এত স্পষ্ট, ভাবেনি যে পরিবারটি তার দিকে লক্ষ করেছে। একবার ভাবল অস্বীকার করে। "কখনও-সখনও।"

"তার সঙ্গে শিগগিরই দেখা হবে তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না।"

হেনরিক কাঁধ ঝাঁকাল। "একা থাকাও ভাল।" সে তার হুইস্কি নিঃশেষ করে দিল।

কৌশিকের মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। সে যতই হেমাকে কাছে পেতে চাক না কেন, সে জানে যে, হংকং-এ জীবন একলা শুরু করাই বেশি সহজ হবে। জানে যে, হেমার সেখানে কিছুই করার নেই। সেখানে থাকলে হেমা নিজের কাজ, নিজস্ব জগৎ, সব কিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ব্যান্ডটা গান শুরু করল। বাসি হয়ে যাওয়া সুরটা বিরক্তিকর শোনাচ্ছিল। কৌশিক একা থাকতে চাইছিল। শুয়ে শুয়ে একটু ভাববে। "আমি শুতে চললাম," সে বলল।

"শুভরাত্রি", বলে হেনরিক আর-একটা হুইস্কি অর্ডার দিল। "আমার জন্য আরেকটা।"

আরও একটি ঝকঝকে দিনের উদয় হল। কৌশিক উঠে, প্রাতরাশ খেতে রেস্তোরাঁয় গেল। হেনরিক বার-এর ভিতর আগের রাতের জায়গাতেই বসে ছিল, কিন্তু এখন সে চান করে, সুইমিং ট্রাঙ্ক এবং হাওয়াই শার্ট পরে কফি খেতে-খেতে রোলটা টুকরো করছিল। "আজ সকালে খাটের কাঁপুনি বুঝতে পেরেছিলে?"

কৌশিক মাথা নাড়ল। বুঝতে পারেনি।

"হোটেলে বলছিল, এটা ছোটখাটো ভূমিকম্প," হেনরিক বলল। "এখন থেমে গিয়েছে।"

যাই হয়ে থাকুক না কেন, কৌশিকের ঘুম ভাঙেনি। সে এল সালভাডোরের সেই দিনটার কথা ভাবল, যেদিন বলতে গেলে সে তার প্রথম কাজের সঙ্গে সংযুক্ত ফোটো তুলেছিল। সেদিন, ঠিক তার আগেই, একটা কাঁপুনি টের পেয়েছিল। বাটি থেকে স্টু উপচে পড়ে গিয়েছিল। সেই পরিপাটি পরিষ্কার তামাটে রঙের প্যান্ট পরা অল্পবয়সি ছেলেটা রাস্তার ওপর পড়ে ছিল, জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল।

"কাছাকাছি একটা কোরাল রিফ আছে, খুব একটা গভীর নয়। যাবে নাকি? আমার বউ-ছেলেমেয়ে শহরে যাচ্ছে কেনাকাটা করতে।"

কৌশিক জলের দিকে তাকাল। "আমি খুব একটা ভাল সাঁতার জানি না।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেনরিক হাসল। "আমাদের হয়ে অন্য একজন সাঁতার কেটে দেবে।" সে ডাঙায় থাকা একটা মাছ ধরার নৌকো দেখাল। "ভাল দামে ব্যবস্থা করেছি। ওখানে পৌঁছোলে তুমি স্রেফ গা এলিয়ে বসে থাকবে, আমি নাহয় একটু ঘোরাঘুরি করব।"

প্রাতরাশের পর তারা নৌকোর দিকে হাঁটা লাগাল। নৌকোর মালিক এক থাই কিশোর। তার পরনে লম্বা লাল শর্টস, গায়ে জামা নেই। সে নৌকো থেকে শুকিয়ে যাওয়া পাতা ফুলের পাপড়ি পরিষ্কার করছিল। দুটো ছোট ছোট লেবু রঙের ব্যাং লাফাতে-লাফাতে বালিতে বেরিয়ে আসল। হেনরিক সেই দুটোকে তার বড়-বড় দু'হাতে তুলে তার ছেলেমেয়েদের কাছে নিয়ে এল। তারা মাথা হেঁট করে ব্যাং দুটোর পিছনে তাড়া করতে শুরু করল। থাই ছেলেটা নৌকোটা জলে টানতে টানতে নিয়ে চলল। কৌশিক তার পিছন-পিছন এগোল। সাবানজলের মতো সাদা ফেনা তার গোড়ালির কাছে হিসহিস করছিল। কৌশিক একটা ক্যামেরা এনেছিল, সেটা তার গলায় ঝুলছিল। হেনরিকের সঙ্গে স্নরকেলিং-এর একটা বাড়তি পোশাক ছিল। যদি কৌশিক মন বদলায়, সে জন্য।

তারা নৌকোয় উঠতে ছেলেটা সামনে তার জায়গায় গিয়ে বসল। সমুদ্রতটে হেনরিকের বউ যেখানে বসে ছিল, সেখান থেকে একটা রোগা হাত তুলে অলস ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। ছেলেমেয়েরা অল্প সময়ের জন্য মুখ তুলে হেনরিক আর কৌশিকের নৌকোতে ঠিক করে বসা দেখল। নৌকোয় অনেক জায়গা ছিল। হেনরিক বউকে ডেকে, ফাঁকা জায়গাগুলোর দিকে দেখিয়ে সুইডিশ ভাষায় কিছু বলে উঠল। কৌশিক আন্দাজ করল, হেনরিক বউ-ছেলেমেয়েকে তাদের সঙ্গে আসতে বলছে। কিন্তু হেনরিকের বউ রাজি হল না। মাথা নেড়ে না বলে একটা পত্রিকায় মুখ গুঁজল।

হেনরিক এত লম্বাচওড়া বলে মুহূর্তের জন্য কৌশিকের নার্ভাস লাগল। কিন্তু নৌকোটা ভারসাম্য বজায় রাখল। থাই ছেলেটা তার বইঠা ওঠানোর পর নৌকো চলতে শুরু করল। কৌশিক নৌকোর খোলের তলায় সমুদ্রের স্ফীতি অনুভব করছিল। তার শরীরের কাছে, তাকে স্পর্শ করছিল না, কিন্তু একই সঙ্গে তার শরীরে যেন প্রবেশ করছিল। রিসর্টটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তালগাছের তলায় বাংলোগুলো, হেনরিকের ছেলেমেয়ের দুরন্ত চেহারা, সব কয়েকটি বিন্দুতে পরিণত হয়ে গেল। পরিচিত উপকূলরেখাটা

AMARBOI.COM

কোনও চ্যাপটা, হাস্যমুখ জানোয়ারের মতো বেঁকে গেল। থাই ছেলেটা সামান্য ইংরেজি জানে। সে আগের দিন এক ঝাঁক প্যারটফিশ দেখেছিল, হেনরিককে সেই গল্প বলতে লাগল। ইতিমধ্যেই সকালের রোদ কড়া হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পর হেনরিক তার শার্ট খুলে ফেলল। কৌশিক হেনরিকের চওড়া, ঘামে-ভেজা গোলাপি পিঠের দিকে তাকাল। তারা একটা পরিত্যক্ত খাঁড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। "গরম লাগছে", বলে হেনরিক ছেলেটার কাঁধে টোকা মারল। "আমি ঠান্ডা হওয়ার জন্য এখানে একটা ডুব দিয়ে নিই।"

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে বইঠা নামাল। হেনরিক নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল। তার কদাকার শরীরটা ত্বরিত এং পটু হস্তসঞ্চালনে সুন্দর, সুষ্ঠুভাবে জলের মধ্যে দিয়ে এগোতে থাকল। এক মুহূর্তের জন্য, হেনরিকের পাশে কৌশিক নিজের মাকেও সাঁতার কাটতে দেখল। দেখল তাঁর শরীর এখনও প্রাণোচ্ছল। নৌকোর তলায় মাঝেমধ্যেই যে রামধনুর মতো বর্ণোজ্জ্বল মাছ ক্ষিপ্রগতিতে এপাশ থেকে ওপাশে চলে যাচ্ছিল, তার মতোই অবলীলাক্রমে একটা ক্ষণিকের আবছা দাগের মতন তাঁর শরীরটা দেখতে পেল। সমুদ্রের ওপর কৌশিকের ঊর্ধ্বাঙ্গের ছায়া পড়ছিল। সে ভলতেরায়, এট্রুস্কান মিউজিয়ামে হেমার সঙ্গে দেখা একটা ছেলের দেহের আকারে তৈরি সরু, বোঞ্জের ভাস্কর্যের কথা মনে করল। সেটার নাম ছিল লমব্রা দেল্লা সেরা (*L 'Ombra della Sera*): অর্থাৎ সন্ধেবেলার ছায়া। কিন্তু খাও লাক-এ এখন সকাল। সূর্যের তীব্র আলো কৌশিককে দগ্ধ করছে, তার ছায়া এখনও তার শরীরের সমানুপাতে আছে।

কৌশিক দেখল, ছেলেটা তাদের তীরের কাছে এনে ফেলেছে। হেনরিক জল থেকে উঠে আসল। আনাড়ি কায়দায় ছপছপ করে পা ফেলে পরিত্যক্ত খাঁড়িটার দিকে এগোল। শুভ্র বালির পিছনে চুনাপাথরের খাড়া পাহাড় উঠে গিয়েছে। কৌশিক ক্যামেরাটা উঠিয়ে একটা ফোটো তুলে ক্যামেরাটা আবার পায়ের কাছে রেখে দিল। জলে হাত ডুবিয়ে গলা, মুখ জলের ঝাপটায় ঠান্ডা করল। জলের নোনাভাবের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। তারপর শার্টের বোতাম খুলল। তার খালি গা রোদে চড়চড় করল। ইচ্ছে হল, হেনরিকের মতো সাঁতার কেটে খাঁড়িটায় যায়। মাকে দেখিয়ে দেয় যে, সে ভয় পাচ্ছে না। সে সানগ্লাসটা খুলে নৌকোয়, ক্যামেরার পাশে রেখে দিল। চোখের সামনে

AMARBOI.COM

দাগটা ওঠা-নামা করছিল। ক্ষণে ক্ষণে দাগটার এলোমেলো পথচিহ্ন মুছে যাচ্ছিল। কৌশিক নৌকোর এক প্রান্ত হাতে ধরে, পা দুটো বাইরের দিকে ঝুলিয়ে জলে নামল। সমুদ্রটা স্নানের জলের মতোই উষ্ণভাবে তাকে স্বাগত জানাল। কৌশিকের পা তলদেশে গিয়ে ঠেকল, তাই সে নিজেকে ছেড়ে দিল।

সারা দিন আমি অনবহিত ছিলাম। মা এবং দুই কাকিমার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, ব্লাউজের ফিটিং করাতে, গয়নাগাটি কিনতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা পাতলা তোশকের ওপর বসে, কোক আর মাটন রোল খেলাম। শাড়ির দোকানের লোকেরা মজুত জিনিসপত্রের বেশির ভাগটাই আমাদের সামনে খুলে ধরল। আমার যা-যা করণীয় করলাম, একটা লাল বেনারসি পছন্দ করলাম। কিন্তু সারাক্ষণ আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। যে ভুলটা করছি, তার কথা ভেবে ভয় করছিল। তখনও পুরোপুরি জেট-ল্যাগ কাটেনি। যে খাবারগুলো আমরা একসঙ্গে খেতাম, সেই খাবার, সেই ভাল কফি এবং ওয়াইন খেতে ইচ্ছে করছিল। ত্রিকোণ পার্কে মা-বাবার ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে-যেতে ভিড় রাস্তায় বোকার মতো তোমার মুখ খুঁজছিলাম। "একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে," বাড়ি পৌঁছোনোর পর দারোয়ান খবর দিল।

ফ্লুরোসেন্ট আলোয় আলোকিত গোলাপি রঙের বসার ঘরের টিভিতে দেখলাম, ভারত এবং শ্রীলঙ্কার উপকূলের ছবি দেখাচ্ছে। ছুটি কাটাতে যাওয়া পর্যটকদের ভিডিও ক্যামেরায় তোলা হয়েছে সেই সব ছবি, যে ছবি তোলার কোনও কথা ছিল না। দেখলাম, এক প্রকাণ্ড উত্তাল ঢেউ এমন ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে এল যে, মনে হল যেন কেউ টেপটা অস্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে দিয়েছে। প্রথমে শুধু দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ক্ষতির সম্বন্ধেই বলছিল। জেলেদের যে গ্রামগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, বিবেকানন্দ রক-এ যে পর্যটকরা আটকে পড়েছে, তাদের কথা। তারপর জানতে পারলাম যে, থাইল্যান্ডও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জানতাম না, তুমি থাইল্যান্ডের কোথায় আছ। শুধু এটুকু জানা ছিল, তুমি কোনও সমুদ্রতটে থাকবে। তোমাকে ছেড়ে চলে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যখন, তখন আর কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। ভেবেছিলাম, তাতে আরও খারাপ লাগবে। পরের দিন সকালে বাইরে গিয়ে খবরের কাগজ কিনলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকটি ছবি খুঁটিয়ে দেখে, ফোটোগ্রাফারদের পরিচয়লিপিতে তোমার নাম খুঁজলাম। এই আশায় যে, তোমার ভাগ্য ভাল ছিল এবং তুমি তোমার কাজ করতে পেরেছ। একটা ইন্টারনেট সেন্টারে গিয়ে তোমার ওয়েবসাইট খুলে তোমার পোস্ট করা শেষ ছবিগুলো দেখলাম। ভলতেরা থেকে দেখা তীরের ক্ষীণ এক ফালি। তিনটে কালো হয়ে যাওয়া মুখ, তথাকথিত এট্রুস্কান দেবতা, আমাদের মাথার ওপর বিরাজ করছিলেন। আর তারপরে, আর-এক উপকূলের দৃশ্য। দুটো ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে। একটা শান্ত, ফিরোজা রঙের সমুদ্র।

সেই সপ্তাহের শেষে, নবীন আমাকে বিয়ে করতে আসল। তাকে দেখে মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি বলে নয়। এই জন্য যে, সে আমার জন্য উপস্থিত ছিল এবং আরও অসংখ্য দিন বেঁচে থাকবে। অথচ, কিছু না জেনে, না বুঝেই, সুনিশ্চিতভাবে, অথচ কোনও বলপ্রয়োগ না করেই, নবীন আমাকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। যেমন শরতের শেষ দমকা হাওয়া এসে গাছের শেষ পাতাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমাদের বিয়ে হল। আমাদের আশীর্বাদ করা হল, নবীনের হাতের ওপর আমার হাত রাখা হল, আমাদের বস্ত্রের প্রান্ত একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। আমি প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুভব করলাম। উপলব্ধি করলাম, আমার পায়ের তলায় আবার শক্ত মাটি এসে গিয়েছে। গোয়ায় আমাদের মধুচন্দ্রিমার পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হল। কারণ নবীন বলল, সেই সময় যে দূষিত জল ভারতকে ঘিরে ছিল, তাতে সাঁতার কাটা উচিত নয়।

আমি আমার পুরনো জীবনে ফিরে গেলাম, তোমার পরিবর্তে যে জীবনটা বেছে নিয়েছিলাম, সেই জীবনে। ম্যাসাচুসেটসে আবার শীত আসল। তোমার এবং তোমার মা-বাবার চলে যাওয়ার পর ত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে, জিওভানা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল এই বলতে যে, সে পাওলার কাছ থেকে খবরটা পেয়েছে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ ছোট করে মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়েছিল। ততদিনে এই পৃথিবীতে তোমার অনুপস্থিতির কোনও প্রমাণ আমার দরকার ছিল না। তোমার অনস্তিত্ব ততটাই পরিষ্কার এবং নির্দয়ভাবে অনুভব করতে পারতাম, যতটা সেই জীবনকে, যা আমার শরীরের ভিতর বড় হচ্ছিল, নির্দিষ্ট আকার ধারণ করছিল। বিছানায় শুয়ে

AMARBOI.COM

কাটানো আমার সেই সব শীতল, আঁধার দিনগুলোতে, যখন আমি কথা বলতে পারতাম না, নতুন জীবনের তেজে দগ্ধ হয়ে যেতাম, এবং একই সঙ্গে তোমার শোকে স্তব্ধ হয়ে থাকতাম, সেই সব দিনে নবীন কোনও প্রশ্ন করেনি। সে ইতিমধ্যেই আমার অবস্থায় মৃদু গর্ববোধ করতে শুরু করেছিল। মা আমার খবর নিতে প্রায় ভারত থেকে ফোন করতেন। তিনিও খবরটা শুনেছিলেন। "সেই চৌধুরীদের মনে আছে, সেই যারা একবার আমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছিল?" মা শুরু করলেন। এই সন্তান তোমার হতে পারত। কিন্তু এ তোমার নয়। আমরা সাবধানী ছিলাম এবং তুমি তোমার কোনও চিহ্নই রেখে যাওনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল ইংরেজি গ্রন্থ দুটির কয়েকটি গল্প অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় পূর্বে একটু অন্যভাবে প্রকাশিত হয়েছিল:

একটি সাময়িক ব্যাপার ('A Temporary Matter'): *দ্য নিউ ইয়র্কার*-এ প্রকাশিত।
মি. পিরজ্বাদা ('When Mr. Pirzada Came to Dine'): *দ্য লুইসভিল রিভিউ*-তে প্রকাশিত।
বেদনার ভাষ্যকার ('Interpreter of Maladies'): *অগ্নি রিভিউ*-তে প্রকাশিত।
পাহারাদার ('A Real Durwan'): *হার্ভার্ড রিভিউ*-তে প্রকাশিত।
সেক্সি ('Sexy'): *দ্য নিউ ইয়র্কার*-এ প্রকাশিত।
মিসেস সেন ('Mrs. Sen's'): *স্যালামান্ডার*-এ প্রকাশিত।
মহিমান্বিত ('This Blessed House'): *ইপক*-এ প্রকাশিত।
বিবি হালদারের চিকিৎসা ('The Treatment of Bibi Halder'): *স্টোরি কোয়ার্টারলি*-তে প্রকাশিত।
পাতাল-আকাশ ('Hell-Heaven'): *দ্য নিউ ইয়র্কার*-এ প্রকাশিত।
অনধিকার চর্চা ('Nobody's Business'): *দ্য নিউ ইয়র্কার*-এ প্রকাশিত।
জীবনে একবার ('Once in a Lifetime'): *দ্য নিউ ইয়র্কার*-এ প্রকাশিত।
বছর শেষ ('Year's End'): *দ্য নিউ ইয়র্কার*-এ প্রকাশিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~